খেলা আর খেলা

ভারবি
১৩/১ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রিট, কলকাতা ১২

প্রথম প্রকাশ : জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৬

প্রকাশক : গোপীমোহন সিংহরায়, ভারবি, ১৩।১ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রিট,
কলকাতা ১২ ॥ মুদ্রক : কালীপদ মজুমদার, শ্রীদুর্গা প্রিন্টিং হাউস,
৩৩বি শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলকাতা ১২

সূচিপত্র





খেলা আর খেলা

বাজিকর

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

"ভগবান, আর কষ্ট দিও না।"

লোকটির বয়স ৬০ বৎসরের নিতান্ত কম হইবে না। গালের মাংসগুলি ঝুলিয়া গিয়াছে, চুল ও গোঁফ বিলকুল পাকা, লাঠি ধরিয়া একটু ডোঙা হইয়া পথ চলেন। দেহের বর্ণটি এককালে খুব সুন্দর ছিল, এখন মলিন হইয়াছে, স্থানে স্থানে মেছেতা পড়িয়াছে; তথাপি এখনও রাগিলে গাল ও কপাল হইতে লাল আভা ফুটিয়া বাহির হয়। চোখ দুটি বড় বড়, তবে সাদা অংশগুলি ঘোলাটে হইয়া গিয়াছে। এককালে ইনি সুপুরুষ বলিয়া গণ্য ছিলেন সন্দেহ নাই।

ইঁহার নাম শ্রীরামরতন বসু— অথবা প্রোফেসর বোস। বাড়ি বরিশাল জেলায়। আজ ৭/৮ দিন হইল রঙ্গপুরে আসিয়াছেন ; স্থানীয় টাউন হল ভাড়া লইয়া প্রতি সন্ধ্যায় ম্যাজিক দেখাইতেছেন। বাজারের নিকট টিনের ছাপ্পরওয়ালা দুইখানি দর্মাঘেরা ঘর ভাড়া লইয়াছেন। একখানিতে রান্না হয় ; অপরখানির এক দিকে এক তক্তপোষে তিনি ও তাঁহার সহকারী যুবক, সম্পর্কে ভাগিনেয়, কুলদাচরণ শয়ন করেন। অন্য দিকে আর একখানি তক্তপোষের উপর তাঁহার ম্যাজিকের আসবাবপত্র স্তূপীকৃত— তাহারই প্রান্তভাগে এক হাত চওড়া খালি স্থানটিতে ভৃত্য হরিদাস গুটিশুটি হইয়া কোনমতে রাত্রিযাপন করে। তক্তপোষ দুইখানি জরাজীর্ণ ও ছারপোকাবহুল, তথাপি তাহার জন্য স্বতন্ত্র ভাড়া দিতে হয়।

অপরাহ্নকাল। ফাল্গুনমাস, কিন্তু এখনও রঙ্গপুরে বেশ শীত আছে। দিবানিদ্রা হইতে উঠিয়া, আলাপোষ গায়ে দিয়া, তক্তপোষে বসিয়া বসুজ মহাশয় ধূমপান করিতেছেন—আর ভাবিতেছেন। বারান্দায় হরিদাস বসিয়া সশব্দে মশলা বাটিতেছে ; বামুন ঠাকুর তরকারি কুটিতেছে।

কুলদা গিয়াছে বিজ্ঞাপন বিলি করিতে। একখানা তৃতীয় শ্রেণীর ঠিকাগাড়ি ভাড়া করিয়া, বেলা ২টা হইতে ৫টা পর্যন্ত সহরময় সে "অদ্যকার অত্যাশ্চর্য" ম্যাজিক খেলার বিজ্ঞাপন বিলি করিয়া বেড়ায়, গাড়ির ছাদে ইংরাজি বাজনা বাজিতে থাকে।

রামরতন বসু তামাক খাইতেছেন, আর ভাবিতেছেন— ভাবিয়া কোনও কূলকিনারা পাইতেছেন না। গৃহে তাঁহার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী এবং দুইটি কুমারী কন্যা। উভয় কন্যার বিবাহকাল উত্তীর্ণ হইয়াছে, কিন্তু অর্থাভাবে বিবাহ দিতে পারিতেছেন না। বড়টির ত বৈশাখ নাগাদ না দিলেই নয়। অন্ততঃ পক্ষে একটি হাজার টাকার প্রয়োজন, কিন্তু আর্থিক অবস্থা শোচনীয়।

রামরতন যৌবনকালে বাড়ি হইতে পলাইয়া গিয়া, প্রসিদ্ধ বাজিকর ভূরে খাঁ ও চাঁদ খাঁ

ভ্রাতৃদ্বয়ের শাগরেদী করিয়া ম্যাজিক শিখিয়াছিলেন। তাহার পর গৃহে ফিরিয়া বিবাহ করেন। কিছু পৈতৃক জোৎজমি ছিল, তাহারই উপর নির্ভর করিয়া সংসারযাত্রা নির্বাহ করিতেন। কিন্তু তাঁহার সেই প্রথম পক্ষের স্ত্রী, স্বামীকে একে একে তিনটি কন্যা উপহার দিলেন। সে তিনটির বিবাহ দিতে দিতে জোৎজমিগুলি সমস্তই গেল। উপরন্তু কিছু ঋণও হইল। ঋণদায়ে ব্যতিব্যস্ত হইয়া, স্ত্রীর অলঙ্কার বিক্রয় করিয়া, রামরতন কলিকাতা হইতে ম্যাজিকের সরঞ্জাম কতক কতক ক্রয় করিয়া আনিলেন। তখন হইতে মাঝে মাঝে ম্যাজিক দেখাইতে বাহির হন। এই উপায়ে ঋণদায় হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন।

তখন তখন তিন চারি মাস ম্যাজিক দেখাইয়াই সংবৎসরের খোরাক সংগ্রহ করিতে পারিতেন। কিন্তু ইদানীং ৫/৭ বৎসর হইতে এ ব্যবসায়ে কিছু মন্দা পড়িয়াছে। লোকে আর ম্যাজিক দেখিতে বড় চাহে না—তাহারা চাহে থিয়েটর কিংবা সার্কাস। সুতরাং এখন বৎসরে ছয় মাসেরও অধিক ঘুরিয়া বেড়াইতে হয়; কিন্তু বয়স ত দিন দিন কমিতেছে না—বাড়িয়াই চলিয়াছে। আর সে শক্তি-সামর্থ্য নাই—এ দেশ ও দেশ ছুটাছুটি করিবার ক্ষমতা নাই। কিন্তু না করিয়া উপায়ও ত নাই?

রঙ্গপুরে আসিয়া প্রথম দুই এক দিন রোজগার মন্দ হয় নাই। দুই দিনে শতাধিক টাকার টিকিট বিক্রয় হইয়াছিল। পল্লীগ্রাম হইতে মোকর্দমা প্রভৃতি উপলক্ষে কৃষক-শ্রেণীর যে সকল লোক সহরে আসে,—স্থানীয় ভদ্রলোকেরা যাহাদিগকে "বাহে" বলেন,— তাহারা এ দুই দিন অনেকেই চারি আনার টিকিট লইয়া "তাম্‌সা" দেখিতে আসিয়াছিল। কিন্তু এ তামাসায় কোনও স্ত্রীলোক না থাকায় তাহারা চটিয়া গেল। বলাবলি করিতে লাগিল— "না একটা বিটিছাওয়া, না কিছু, শুধুই পয়সা দিমু—হঃ!"—বিগত পৌষমাসে এখানে এক সার্কাস কোম্পানি আসিয়াছিল; গোলাপি রঙের গেঞ্জি পরিহিত যুবতীগণের ব্যায়ামলীলা দেখিয়া ইহারা খুব খুসী ছিল; এখন লোলচর্ম বৃদ্ধের বক্তৃতা ও বুজরুকি তাহাদের পছন্দ হইল না। প্রতিদিন ঘরভাড়া, তক্তপোষ-ভাড়া চারিজন লোকের আহারের ব্যয়, বিজ্ঞাপন ছাপার ব্যয় ও তাহা বিতরণের জন্য গাড়ি ভাড়া, বাজনাওয়ালাদের মজুরি, টাউনহলের ভাড়া ও আলো— খরচ ত বড় সামান্য নয়। লোক না জুটিলে এমন ভাবে কয়দিন চলিবে? খরচপত্র কুলাইয়া প্রতিদিন অন্ততঃ ২০/২৫ টাকা উদ্‌বৃত্ত না থাকিলে, বৈশাখমাসে কন্যার বিবাহের আশা যে মরীচিকায় পরিণত হয়!— এই সকল কথা ভাবিতে ভাবিতে বৃদ্ধের মনটি বড়ই অবসন্ন হইয়া পড়িল। তিনি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "হে ভগবান! আর কষ্ট দিও না।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ছেলেগুলো ভারি জ্যাঠা হইয়াছে।

প্রথমে বাদ্যের, ক্রমে তাহার সহিত ছক্কড়ের চক্রশব্দ শ্রুতিগোচর হইল; কুলদা ফিরিয়া আসিতেছে।

গাড়ি হইতে নামিয়া কুলদা গাড়োয়ান ও বাজনাওয়ালাদের ভাড়া প্রভৃতি মিটাইয়া দিয়া, আগামী কল্য ঠিক দুইটার সময় তাহাদের পুনরাবির্ভাব প্রার্থনা করিল। ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিতেই রামরতন জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইস্কুলে কি রকম হল?"

কুলদা ওষ্ঠ কুঞ্চিত করিয়া বলিল, "বড় সুবিধে নয়।"

"কোন কোন ইস্কুলে গিয়াছিলে?"

"জেলা ইস্কুল, টাউন ইস্কুল, কৈলাসরঞ্জন— তিনটেতেই গিয়েছিলাম। মোটে ৫২

খানি টিকিট বিক্রি হয়েছে।"

"তিনটে ইস্কুলে কিছু না হবে হাজার বারো শো ছেলে, মোটে ৫২ খানি টিকিট বিক্রি! সবাই চার আনা বোধ হয়?"

কুলদা বলিল, "না, চার আনাও আছে, আট আনাও আছে।" —বলিতে বলিতে পকেটে হাত দিয়া সে গোটা কয়েক টাকা, আধুলি ও সিকি বাহির করিয়া তক্তপোষের উপর রাখিল।

রামরতন সেগুলি গণিতে লাগিলেন। কুলদা বলিল, "ছেলেগুলো বলে, ম্যাজিক আর দেখবো না। ও ত আমরাও করতে পারি।"

রামরতন বলিলেন, "হ্যাঃ— ভারি ত মুরদ! কই কর্ না বেটারা, দেখি। ছেলেগুলোও সব জ্যাঠা হয় উঠলো। আমরা যখন ইস্কুলে পড়তাম, মনে আছে, ম্যাজিক হচ্চে শুনলে ত উন্মত্ত হয়ে উঠতাম। একেবারে হিতাহিতজ্ঞানশূন্য। মায়ের বাক্স ভেঙে পয়সা নিয়ে ম্যাজিক দেখতে ছুটতাম। আর আজ ছোঁড়াগুলো বলে কি না, ম্যাজিক আর দেখব কি! হায় রে কলিকাল!"—বলিয়া তিনি উদাস দৃষ্টিতে সম্মুখে রাজপথের পানে চাহিয়া রহিলেন।

কুলদাও বিষণ্ণ মুখে তক্তপোষের একপ্রান্তে বসিয়া রহিল। অল্পক্ষণ পরে বলিল, "আচ্ছা মামা, ইস্কুলের ছেলেদের অর্ধমূল্য ক'রে দিলে হয় না?"

রামরতন বলিলেন, "আসবে কি? যদি বেশি ছেলে আসে ত হাপ প্রাইসে আপত্তি নেই।"

কুলদা বলিল, "হাপ প্রাইস হ'লে অনেক ছেলে আসে বোধ হয়।"

"আচ্ছা, কাল থেকে না হয় তাই ক'রে দাও। সকালে উঠেই হ্যান্ডবিলটে ছাপতে দিয়ে এস।"

কুলদা একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "ছাপাখানার ২০/২২ টাকা বাকি প'ড়ে গেছে; তারা বলেছে ধারে আর ছাপবে না। কাল গোটা পনের টাকা অন্ততঃ দিতে হবে।"

"দেখি আজ কি রকম হয়।" —বলিয়া বৃদ্ধ চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন।

পরদিন বিদ্যালয়ের বালকগণের জন্য টিকিট অর্ধমূল্য করা হইল, কিন্তু তাহাতে বিশেষ ফল দর্শিল না।

তৎপরদিন ঘোষিত হইল— "অদ্য শেষ রজনী! শেষ রজনী!! শেষ রজনী!!! সকলে আসুন, দেখুন, বিস্মিত হউন।" তাহাতে অন্য দিন অপেক্ষা গোটা ৫/৭ টাকা মাত্র বেশি পাওয়া গেল।

পরদিন আবার বিজ্ঞাপন বিলি হইল— "বহু সম্ভ্রান্ত ও পদস্থ মহোদয়গণের বিশেষ অনুরোধে প্রোফেসর বসু অদ্য তাঁহার যাত্রা স্থগিত রাখিলেন। অদ্য রজনীতে নূতন নূতন খেলা, নূতন নূতন বিষয়, কেহ কখন দেখেন নাই, শোনেন নাই, স্বপ্নেও ভাবেন নাই। এই শেষ, এই শেষ, এই শেষ।" কিন্তু রঙ্গপুরের ভবী তাহাতেও ভুলিল না।

সে দিন রাত্রে ম্যাজিক হইতে ফিরিয়া বাসায় আসিয়া রামরতন একখানি ডাকের পত্র পাইলেন। ইহা তাঁহার স্ত্রী লিখিয়াছেন।

পত্র পড়িয়া বৃদ্ধ মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন। স্ত্রী লিখিয়াছেন, ছোট মেয়েটির এগারো দিন জ্বর, ডাক্তার বলিয়াছে, বিকারে দাঁড়াইতে পারে। ঘরে একটি পয়সা নেই, পাড়াপ্রতিবেশীর নিকট কর্জ করিয়া দুই দিন ডাক্তারের ভিজিট দেওয়া হইয়াছে; অর্থাভাবে চিকিৎসা ও পথ্য দুই বন্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছে। তিনি আরও লিখিয়াছেন— "তুমি

যদি দিন কতকের জন্য একবার আসিতে পার ত বড়ই ভাল হয়। যদি নিতান্তই আসিতে না পার, তবে অন্ততঃ পঁচিশটি টাকা পত্রপাঠ মাত্র আমায় পাঠাইয়া দিবে, ইহাতে কোনমতে যেন অন্যথা না হয় !"

হরিদাস তামাক সাজাইয়া আনিয়া দিল। রামরতন হুঁকা হাতে লইয়া বসিয়া রহিলেন। এই মেয়েটি তাহার বড় আদরের ; তাহার রোগশয্যা যেন চোখের সম্মুখে দেখিতে লাগিলেন। কল্পনাচক্ষে আদরিণী কন্যার রোগখিন্ন মুখখানি দেখিতে দেখিতে, তাঁহার বাস্তব চক্ষু দুইটিতে জল ভরিয়া আসিল।

কুলদা ম্যাজিকের পোশাক ছাড়িয়া বাহিরে বারান্দায় দাঁড়াইয়া গোপনে তামাক খাইতেছিল। ভিতরে আসিয়া অবস্থা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "মামা, কি হয়েছে ?"

রামরতন চিঠিখানি ভাগিনেয়কে পড়িতে দিলেন। ঢিবরীর আলোকে ধরিয়া চিঠি পড়িয়া কুলদা বলিল, কি করবেন ?"

আজিকার টিকিট বিক্রয়ের টাকা লইয়া, তহবিলে মোটে ত্রিশ টাকা আছে। এখানকার দেনাপাওনা মিটাইতেই তাহা প্রায় শেষ হইয়া যাইবে ; চারিজনের রাহা খরচ কুলাইবে না।

রামরতন বলিলেন, "কাল সকালে উঠেই পোস্টঅফিসে গিয়ে ২৫ টাকা টেলিগ্রাফ মনি অর্ডারে পাঠিয়ে দাও।"

কুলদা বলিল, "পাঠাতেও পাঁচসিকে খরচ। তার পর উপায় ?"

রামরতন উর্ধ্বদিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মাতুলের মাথা খারাপ

পরিদিন বেলা ৯টার সময় কুলদা টেলিগ্রাফ করিয়া পোস্ট অফিস হইতে ফিরিয়া দেখিল, মাতুল তক্তপোষে বসিয়া একমনে কি লিখিতেছেন। কাছে গিয়া দেখিল, অদ্যকাব বিজ্ঞাপনের জন্য হ্যান্ডবিল রচনায় তিনি ব্যস্ত।

লেখা শেষ হইলে কাগজখানি ভাগিনেয়কে দিয়া রামরতন কহিলেন, "ছাপাখানায় যাও। তুমি বসে থেকে কম্পোজ করিয়ে, দু হাজার ছাপতে অর্ডার দিয়ে এস। যেন দুটোর মধ্যে পাই।"

কুলদা কাগজখানি পড়িতে পড়িতে বলিল, "কিন্তু আজ তাদের গোটা দশেক টাকা দেবো বলে রেখেছিলাম যে, ছাপতে আবার গোলমাল না করে।"

রামরতন বলিলেন, "তাদের বোলো, কাল সকালে তাদের সমস্ত বাকি টাকা চুকিয়ে দেবো, পাই পয়সা বাকি রাখব না।"

কুলদা পুনরায় হ্যান্ডবিলের খসড়াখানির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "এটা লিখে ত দিলেন, কিন্তু —কি রকম হবে— কিছু যে বুঝতে পারছি নে ! শেষ কালে একটা ধাষ্টমো না হয়।"

রামরতন রাগিয়া বলিলেন, "তু-তু তুমি ছাপিয়েই আন না ! কি রকম হবে না হবে, সে তখন জানতে পারবে। যাও দেরি কোর না।"

কুলদা চিন্তিত মুখে প্রস্থান করিল। তাহার চিন্তার কারণ এই যে, হ্যান্ডবিলে অদ্য শেষতম— নিতান্তই শেষতম রজনীতে যে নূতন ম্যাজিক দেখাইবার কথা ঘোষণা করা হইতেছে, তাহা শুধু দর্শকমণ্ডলীর নহে—কুলদার পর্যন্ত অশ্রুতপূর্ব। মাতুল এ ম্যাজিক

এতাবৎকাল কোথাও দেখান নাই ; এমন কি, তিনি প্রসঙ্গক্রমেও কখনও এ ম্যাজিকের উল্লেখ করেন নাই। অপর কোনও ম্যাজিকওয়ালা যে ইহা দেখাইতে পারে, তাহা পর্যন্ত কুলদা কস্মিনকালেও শুনে নাই। সে ভাবিতে লাগিল, মাতুল এরূপ বিজ্ঞাপন কেন দিতেছেন ? গতকল্য সারারাত্রি তিনি ঘুমান নাই। খালি ছটফট করিয়াছেন এবং মাঝে মাঝে উঠিয়া আলো জ্বালিয়া তামাক খাইয়াছেন। দুশ্চিন্তায় তাঁহার মাথা খারাপ হইয়া গেল না কি ? কুলদা কিছুই বুঝিতে পারিল না। এইরূপ বিজ্ঞাপন দিয়া লোক জড় করিয়া, শেষে ফাঁকি দিলে, অদৃষ্টে কি আছে বলা যায় না। রঙ্গপুরের ছাত্রগণ যেরূপ দুর্দান্ত, প্রহার পর্যন্ত করিতে পারে !

যাহা হউক, মাতুলের হুকুম কুলদা তামিল করিতে গেল।

প্রেসের ম্যানেজার বাবু তখনও আসেন নাই কম্পোজিটরগণ বিজ্ঞাপনের কাপি পড়িয়া কুলদাকে আসিয়া ঘিরিয়া দাঁড়াইল এবং জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, "হ্যাঁ মশায়, এ কি সত্যি ?"

কুলদা গম্ভীরভাবে বলিল, "সত্যি অবশ্য নয়, ইন্দ্রজাল।"

"সে আপনাদের ইন্দ্রজালই হোক, চন্দ্রজালই হোক— এতে যা সব লেখা আছে, আমরা তা চোখে দেখতে পাবত ?"

"নিশ্চয় পাবেন।"

"তবে মশায়, আজকে আমাদের পাশ দিতে হচ্ছে। আমরা তিন জন কম্পোজিটর, জমাদার, আর ম্যানেজার বাবুও যেতে চাইবেন নিশ্চয়—এই পাঁচজনের পাশ লিখে দিয়ে যান।"

"তা দিচ্চি। কিন্তু হ্যাণ্ডবিলগুলি দুটোর মধ্যে চাই।"

"দুটো কি বলছেন !— একটার মধ্যেই ছাপা হ্যাণ্ডবিল আপনাদের বাসায় আমরা পৌঁছে দেবো। পাশখানা লিখুন।"

বিজ্ঞাপনটিতে এইরূপ লেখা ছিল—

শেষ রজনী শেষ রজনী
অদ্য নিতান্তই শেষ রজনী
বিপরীত ব্যাপার— লোমহর্ষণ কাণ্ড
অদ্য সর্ব্বজনসমক্ষে, প্রোফেসার বসু
একটা জীবন্ত মানুষ ধরিয়া ভক্ষণ করিবেন,
আবার ইন্দ্রজাল প্রভাবে সর্ব্বজনসমক্ষে
তাহাকে পুনরুজ্জীবিত করিয়া দিবেন ইত্যাদি।

আহারাদি করিয়া, কুলদা বিজ্ঞাপন লইয়া গাড়িতে বাহির হইল। রামরতন বাজাওয়ালাদের বলিয়া দিলেন, "আজ তোরা খুব জোরে জোরে বাজাবি। কাল আমরা চ'লে যাব— তোদের ভাল ক'রে বখশিস্ দিয়ে যাব।"

বেলা ২টা হইতে বিকাল ৫টা অবধি সহরময় বিজ্ঞাপনটি রাশি রাশি বিতরিত হইল।

ইহা পাঠ করিয়া সহরময় একটা হৈহৈ ব্যাপার পড়িয়া গেল। অন্য দিনের ন্যায় অদ্যও সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় খেলা আরম্ভ। কিন্তু ছ'টার সময় রামরতন বাসায় বসিয়া সংবাদ পাইলেন, টাউনহলের মাঠে ইতিমধ্যেই লোক জমিতে সুরু হইয়াছে। ভাগিনেয়কে বলিলেন, "ঠাকুরকে বল, চটপট তৈরি হয়ে নিক। রান্না যদি কিছু বাকি থাকে, নামিয়ে

রাখুক, ফিরে এসে তখন হবে।"

খেলার সময় টিকিট বিক্রয়ের ভার এই ব্রাহ্মণ ঠাকুরের উপর। হরিদাস ও কুলদা গেটে বসিয়া থাকে, টিকিট লইয়া শ্রেণী অনুসারে দর্শকগণকে স্থান নির্দেশ করিয়া দেয়। রামরতন হরিদাসকে বলিলেন, "আমাদের ফাস্টো কেলাস দু-টাকার টিকিট এক সারি চেয়ার ত ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"আর এক টাকার সেকেন্ড কেলাস তিন সারি ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"আচ্ছা, দড়ি খুলে, এই চারি সারিই আজ ফার্স্ট কেলাস বানিয়ে দিও। বাকী অর্ধেকে সেকেন কেলাস, থার্ডো কেলাস, ফোর্থো কেলাস—ফোর্থো কেলাসে দু'তিন সারি বেঞ্চি রেখ মাত্র।"

কুলদা বলিল, "তাতে চার আনার টিকিট বড় কমে যাবে যে !"

রামরতন বলিলেন, "তা যাক। গুণতিমত টিকিট নিয়ে বসবে। এক কেলাসের টিকিট ফুরিয়ে গেলেই তার উঁচু কেলাসের টিকিট বেচবে।"

তাড়াতাড়ি প্রস্তুত হইয়া, জিনিসপত্র ও লোকজন সহ রামরতন রওয়ানা হইলেন। টাউন হলে পৌঁছিয়া দেখিলেন, প্রাপ্ত সংবাদ মিথ্যা নহে,— মাঠে বিস্তর লোক টিকিটের জন্য অপেক্ষা করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। বামুন ঠাকুর দ্বারের কাছে গিয়া টিকিট বিক্রয় করিতে বসিল। কুলদা ও হরিদাস গেটে বসিল। রামরতন স্টেজের উপর পর্দার আড়ালে ম্যাজিকের সরঞ্জামগুলি গুছাইতে প্রবৃত্ত হইলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

মনুষ্য-ভোজন

সাড়ে সাতটার সময় পর্দা উঠিলে রামরতন দেখিলেন, হল একেবারে কানায় কানায় পূর্ণ ; প্রথম শ্রেণীর দুই টাকা মূল্যের সমস্ত চেয়ার বিক্রয় হইয়া গিয়াছে ; স্বয়ং পুলিস সাহেব সস্ত্রীক প্রথম সারির মধ্যস্থলে উপবিষ্ট। অপরাপর শ্রেণীর সমস্ত আসন পূর্ণ—উভয় পার্শ্বের দেওয়ালের নিকট বিস্তর লোক দণ্ডায়মান। স্টেজ হইতেই রামরতন ঝুঁকিয়া, পুলিস সাহেব ও তদীয় মেমকে ভক্তিভরে সেলাম করিলেন।

খেলা আরম্ভ হইল। প্রথমে তাসের কৌতুক। স্টেজ হইতে নামিয়া, প্রথম সারির দর্শকগণের সম্মুখে ঘুরিয়া ঘুরিয়া রামরতন তাসক্রীড়া দেখাইতে লাগিলেন। তাহার পর ভৌতিক ফুলগাছ জন্মানো, দর্শকের ঘড়ি লইয়া চূর্ণীকরণ এবং অবশেষে তাহা অখণ্ড অবস্থায় প্রত্যর্পণ, ছড়ির মধ্যে অঙ্গুরীয় প্রবেশ, কুলদাচরণকে হিপ্নটাইজ করিয়া এবং তাহার চোখ বাঁধিয়া তাহার কর্তৃক দর্শকলিখিত প্রশ্নের যথাযথ উত্তর প্রদান ইত্যাদি মামুলি খেলাগুলি শেষ হইতে প্রায় নয়টা বাজিল।

অবশেষে রামরতন বলিলেন—

"ভদ্র মহোদয়গণ, এবার আমি একটা নূতন খেলা আপনাদিগকে প্রদর্শন করিব— সেটি জীবন্ত মনুষ্যভক্ষণ। ইহা অত্যন্ত আশ্চর্য ব্যাপার। ঔরঙ্গজেব বাদশাহের আমলে জনৈক মুসলমান ফকির কর্তৃক ইহা প্রথম প্রদর্শিত হয়। এই অত্যদ্ভুত ক্রীড়াটি ভারতীয় প্রতিভারই অক্ষয় কীর্তি। পাশ্চাত্য জাদুকরগণ ইহা অবগত নহে— ইহা সম্পূর্ণ ভারতীয়। আমি বহু সাধনায় গুরুর নিকট ইহা শিক্ষা করিয়াছি। একটি মনুষ্যকে

আপনাদের সমক্ষে ক্রমে ক্রমে আমি সম্পূর্ণরূপে ভক্ষণ করিয়া ফেলিব এবং অবশেষে উহাকে অক্ষতদেহে আপনাদের নিকট উপস্থিত করিব। দর্শকগণের মধ্যে কে ভক্ষিত হইতে ইচ্ছা করেন, অনুগ্রহ করিয়া এখানে আসুন।"

রামরতন দর্শকমণ্ডলীর উপর তাঁহার সপ্রতীক্ষ দৃষ্টি স্থাপন করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। সভামধ্য হইতে একটা গুঞ্জনধ্বনি উত্থিত হইল। এক মিনিট গেল, দু মিনিট গেল, তিন মিনিট গেল,— কিন্তু ভক্ষিত হইবার জন্য কেহ অগ্রসর হইল না।

রামরতন তখন বলিলেন— "মহাশয়গণ, আপনারা কি ভয় পাইতেছেন ? ভয়ের কোনও কারণ নাই। আমি মানুষ্যটিকে আহার করিয়া, আবার তাহাকে বাঁচাইয়া দিব। আপনারা তখন সকলেই দেখিবেন, তাহার দেহে কোনও আঘাতের চিহ্নমাত্রও নাই। কে আসিবেন, আসুন।"

রামরতন পূর্ণ দুই মিনিটকাল অপেক্ষা করিলেন। সভাস্থলে বহুলোকের চাপা গলায় কথা ও চাপা হাসির শব্দ শ্রুত হইল। কিন্তু কেহই খাদিত হইতে আগ্রহ দেখাইল না।

অবশেষে রামরতন বলিলেন, "আপনারা কি ভয় পাইতেছেন যে, পাছে আমি তাহাকে বাঁচাইয়া দিতে সমর্থ না হই ? সে আশঙ্কা করিবেন না মহাশয়গণ, ইহা নির্দোষ আমোদ মাত্র। আমি যদি খাইয়া আবার বাঁচাইয়া দিতে না পারি, তাহা হইলে ত আমি খুনী— খুনের দায়ে পড়িব। স্বয়ং ধর্মাবতার পুলিশ সাহেব বাহাদুর, পুলিশের বড় ইন্সপেক্টার বাবু, স্থানীয় হাকিমগণের মধ্যে অনেকেই আজ দয়া করিয়া এখানে পদধূলি দিয়াছেন দেখিতেছি ; যদি আমি মানুষটিকে আবার বাঁচাইয়া দিতে না পারি, তবে ইঁহারা আমাকে ধরিয়া লইয়া গিয়া ফাঁসি দিবেন সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহা ঘটিবে না। কোনও ভয় নাই, কে আসিবেন আসুন।"

তৃতীয় শ্রেণীর একখানি বেঞ্চিতে কয়েকজন ছাত্র বসিয়া গোলমাল ও হাসিতামাসা করিতেছিল ; তাহারা ঠেলিয়া এক বালককে উঠাইয়া দিল। সে উঠিয়া স্টেজের দিকে অগ্রসর হইবামাত্র, সমস্ত দর্শক তাহার প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল।

বালক ক্রমে স্টেজের পাদদেশে গিয়া দণ্ডায়মান হইল। রামরতন বলিলেন, "উঠে এস বাবা, উঠে এস। কোন ভয় নেই তোমার।"

বালকের বয়স পঞ্চদশ কিংবা ষোড়শ বর্ষ মাত্র। রঙ্গপুর টেকনিক্যাল স্কুলে পড়ে, সাহসী বলিয়া সহপাঠীমহলে তাহার খ্যাতি আছে। কিন্তু স্টেজের উপর উঠিতে তাহার পা দুটি কাঁপিতে লাগিল।

রামরতন বালককে তাহার গাত্রবস্ত্র খুলিয়া ফেলিতে বলিলেন। দেহের উর্ধ্বভাগ নগ্ন করিয়া বালক দাঁড়াইল। ভয়ে তাহার বুকটি দুরু দুরু করিতেছে, মুখখানি ম্লান হইয়া গিয়াছে !

রামরতন দর্শকগণের প্রতি চাহিয়া বলিলেন— "দেখুন ভদ্রমহোদয়গণ, আমি এই বালককে ভক্ষণ করি।" —বালকের দিকে চাহিয়া মাথা হেলাইয়া বলিতে লাগিলেন— "বাঃ বাঃ—খাসা নধর দেহ। অনেক দিন মানুষ খাইনি, কচি মাংস বেশ লাগবে খেতে।"— বলিয়া জিহ্বা বাহির করিয়া, তদ্দ্বারা নিজ ওষ্ঠযুগল সিক্ত করিতে লাগিলেন।

হলভরা সমস্ত লোক একেবারে নিস্তব্ধ। একটি সূচ পড়িলে তাহার শব্দটুকু শুনা যায়। বালকের একবার ইচ্ছা হইল, সরিয়া পড়ে— কিন্তু লোকলজ্জায় সে তাহা করিতে পারিল না। উভয় চক্ষু মুদ্রিত করিয়া, কোনমতে খাড়া হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

রামরতন সহসা বালকের স্কন্ধোপরি সজোরে এক কামড় বসাইয়া দিলেন।

"বাপ রে—মা রে— উহুহু"— বালকের এই আর্তচিৎকারে সেই গভীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ হইল। দর্শকগণের মধ্যে কয়েকজন দাঁড়াইয়া উঠিয়া ক্রুদ্ধস্বরে বলিল, "ও কি মহাশয়, ওকে কামড়ালেন কেন ?"

রামরতন বলিলেন, "কামড়াব না ত খাব কি করে মশায় ? অত বড় মানুষটা ত গপ করে গিলে খেতে পারিনে, একটু একটু করে আমায় খেতে হবে ত ! সমস্তটা খাব, খেয়ে ইন্দ্রজালের জোরে আবার বাঁচিয়ে দেব।"

ইহা শ্রবণমাত্র, বালক স্টেজ হইতে এক লম্ফ দিয়া, খোলা দরজায় দণ্ডায়মান প্রহরীকে ঠেলিয়া উর্ধ্বশ্বাসে পলায়ন করিল।

হলের ভিতর তখন মহা গণ্ডগোল আরম্ভ হইল। কেহ কেহ উচ্চস্বরে চিৎকার করিতে লাগিল— "এ কি জুচ্চুরি না কি মশায় ? ইন্দ্রজালের প্রভাবে খাবেন ত কামড় দিলেন কেন ? সব বুঝি ফাঁকি ?"

রামরতন দেখিলেন, হলের অধিকাংশ লোকই অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছে, কেবল পুলিস সাহেব ও তাঁহার মেম মৃদু মৃদু হাসিতেছেন। রামরতন কহিলেন, "কেন মশায়, ফাঁকিটা আমি কি দিলাম ? বিজ্ঞাপন পড়ে দেখুন, ইন্দ্রজালপ্রভাবে খাব বলিনি, ইন্দ্রজালপ্রভাবে বাঁচিয়ে দেবো বলেছি। আগে খাই, তবে ত বাঁচাব। যার ইচ্ছে হয়, আসুন না, বিজ্ঞাপনে যে খেলা দেখাব বলেছি, তাই দেখাচ্চি।"

দর্শকগণ উত্তেজিত স্বরে বলিতে লাগিল, "থাক থাক, ঢের হয়েছে, আর খেলা দেখাতে হবে না। আমরা তোমায় কি রকম খেলা দেখাই, তা দেখ। হল থেকে বেরোও দিকিন একবার জোচ্চোর কাঁহেকা !"

রামরতন ক্রন্দনের স্বরে বলিয়া উঠিলেন, "অ্যাঁ—অ্যাঁ, তোমরা আমায় মারবে না কি ? মারবে না কি ? কেন, আমি কি দোষ করেছি ? (জোড়হস্তে পুলিস সাহেবের পানে চাহিয়া) দোহাই গবর্নমেন্টের, দোহাই ইংরেজ বাহাদুরের—আমি নির্দোষ। তোমরা আমার হ্যাণ্ডবিল প'ড়ে দেখ, আমি কি জুচ্চুরি করেছি।"

পুলিস সাহেব তাঁহার মেমকে হাসিতে হাসিতে কি বলিতেছিলেন, রামরতনের ক্রন্দন ও দোহাই শুনিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন, "এ বুঢ়া, টুমি ভয় করিও না। কেহ তোমায় মারিটে পারিবে না। (পশ্চাৎ ফিরিয়া) বাবুলোগ, টোমরা সব চুপ-চাপ আপন আপন গৃহে গমন কর। বে-আইন জনটা করিলে গ্রেফটার হইবে।"

অতঃপর দর্শকগণ গজগজ করিতে করিতে উঠিয়া বাহির হইতে লাগিল। পুলিস সাহেব চুরুট মুখে করিয়া তথায় নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

হল খালি হইয়া গেলে, রামরতন স্টেজ হইতে নামিয়া পুলিস সাহেব ও তাঁহার মেমকে দীর্ঘ সেলাম করিয়া, করজোড়ে কহিলেন, "আজ হুজুর ছিলেন বলে অধীনের প্রাণ বাঁচলো। আমাকে বাড়ি পৌঁছে দেবার জন্যে যদি দয়া ক'রে দু'জন কনেস্টবল হুকুম ক'রে দেন, তবে ভাল হয় ; কি জানি রাস্তায় যদি—"

পুলিস সাহেব রামরতনের স্কন্ধে মৃদু মৃদু করাঘাত করিয়া হাসিতে হাসিতে কহিলেন— "তুমি বড় শয়টান আছ— A down right scoundrel পুলিসের উপরযুক্ট লোক। টোমার বয়স কম হইলে আমি টোমায় পুলিশে ডারোগা কার্য দিট। এমন গৃহে যাও— কল্য প্রাটেই টুমি রঙ্গপুর পরিত্যাগ করিয়া যাইবে।" —মেমসাহেবও হাসিতেছিলেন।

পুলিস সাহেবের হুকুম অনুসারে তথায় উপস্থিত দুই জন কনেস্টবল রামরতনকে বাসায় পৌঁছাইয়া দিল।

পরদিন পাওনাদারগণের প্রাপ্য নিঃশেষে চুকাইয়া দিয়া, বাকি টাকার রাশি পুঁটুলি বাঁধিয়া লইয়া, রামরতন রঙ্গপুরের মায়া পরিত্যাগ করিলেন। গৃহে পৌঁছিয়া দেখিলেন, ঈশ্বরকৃপায় মেয়েটির পীড়া অনেকটা উপশম হইয়াছে।

হরতনের গোলাম

মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়

তোমরা অনেক আশ্চর্য ঘটনা কানে শুনেছ, কিন্তু আমি চোখে দেখেছি এক অত্যাশ্চর্য অদ্ভুত ঘটনা। তখন আমার বয়স অল্প, বোধ হয় বারো-তেরো।

বৃন্দাবন, ডাক-নাম বিনু, ছিল আমার সবচেয়ে ভালোবাসার বন্ধু। এক ক্লাসে পড়তুম, দিনরাত একসঙ্গে থাকতুম, সে ছাড়া আর কারো সঙ্গে খেলতে, কথা-কইতে আমার ভালো লাগত না। আমাদের পাশেই ছিল তাদের বাড়ি।

তখন আমরা নতুন তাস খেলতে শিখেছি। বিনু সেবার একদিনের জন্য মামার বাড়ি গিয়ে বিন্তি খেলা শিখে এসেছিল। এসেই সে আমায় ঐ খেলা শিখিয়ে দিলে। দু-জনেই নতুন খেলিয়ে, কিন্তু বিনু দু-চার বাজি খেলেই পাকা ওস্তাদ হয়ে উঠলো। আমি প্রায় প্রতি হাতেই তার কাছে হারতুম। কোথায়ই বা তাকে জিতেছি? স্কুলের লেখা-পড়ার প্রাইজে, খেলা-ধূলার প্রাইজে সে বরাবরই আমায় হারিয়ে এসেছে; এমন কি নিমন্ত্রণ খেতে বসেও কোনো দিন তাকে জিততে পারিনি, সে বরাবর আমার চেয়ে বেশী খেয়েছে। এক-এক সময় সন্দেহ হতো আমার মায়ের স্নেহটিও বুঝি সে আমার চেয়ে বেশি করে জিতে নিলে। কিন্তু এতে আমার দুঃখ ছিল না। কারণ তাকে যে আমি সত্যিই ভালো বাসতুম।

রোজ সন্ধ্যার পর স্কুলের পড়া শেষ করে খাওয়া-দাওয়া সেরে নিয়ে আমরা দুই বন্ধুতে আমাদের সদর বাড়ির পশ্চিম কোণে ভাঙা নহবৎ-খানার নিচের অন্ধকার ঘরটায় লুকিয়ে বসে তাস খেলতুম। এই ঘরটায় পুরাকালে কে থাকত জানি না; এ বাড়ি যখন জমজমাট ছিল, তখন হয় তো কর্তাদের সানাই-ওয়ালারা এইখানে বসবাস করত। এখন এখানে দিনে-রাতে কারো পায়ের ধুলো পড়ে না— এক চুপি-চুপি আমাদের ছাড়া। এই ঘরটা আমাদের দুই বন্ধুর ভারি মনের মতো ঘর ছিল। এর মধ্যে বাড়ির ভিতরকার তাড়াহুড়ো এসে পৌঁছতে পারত না, আমরা দু-জনে পায়রার খোপের মতো একটুখানি জায়গায় বেশ নির্জনে নিশ্চিন্তে মুখোমুখি বসে মনের সুখে অবিরাম গলগল করতে পারতুম। আমাদের ছুটির দিনগুলো নির্বিঘ্নে নিবিড় আনন্দে কাটত— এই ঘরখানির কোলে মাথা রেখে শুয়ে। বিনু নিজের হাতে ওই ঘরের একটি কোণ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে রাখত। এর কোনো আভরণ ছিল না—এর সমস্ত অভাব ও দৈন্যকে আমরা আমাদের অন্তরের আনন্দ দিয়ে ঢেকে রেখেছিলুম। নইলে সেই কঙ্কাল-সার জীর্ণ অন্ধকার কোটরের মধ্যে আমাদের কচি দুটো প্রাণ কিছুতেই তিষ্ঠতে পারত না।

বিনু মামার বাড়ি থেকে এক-জোড়া তাস সংগ্রহ করে এনেছিল— বোধ হয় তার

মামাদের আড্ডার পরিত্যক্ত তাস। তাস-জোড়াটা' ছিল খুবই পুরানো— ভদ্রসমাজে নিতান্তই অচল। সম্ভবত তাই এত সহজে সে বেচারা ওস্তাদ খেলোয়াড়দের কড়া হাতের কঠিন চাপড় থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে বিনুর ছোট্ট নরম হাতখানিতে এসে পড়বার সৌভাগ্য পেয়েছিল। বেচারাকে যে অনেক দিন ধরে অনেক চড়-চাপড় সইতে হয়েছে সে তার চেহারা দেখলেই বোঝা যেত। কিন্তু কোন্ গুরুতর অপরাধে তার কান-গুলো যে এমন নির্দয়-ভাবে কাটা গিয়েছিল এবং কেনই বা তার বুকের উপর আঁচড় টেনে টেনে এমন ক্ষত-বিক্ষত করা হয়েছে তা আমরা বুঝতে পারতুম না। এ তার কোন পাপের শাস্তি ?— কে জানে !

তার এই জীর্ণশীর্ণ চেহারা দেখে আমাদের কেমন মায়া করত। সেই জন্যে তার উপর জোরজবরদস্তি করতে পারতুম না। একে নিয়ে অতি সন্তর্পণে খেলতুম, আস্তে আস্তে তুলতুম, আস্তে আস্তে ফেলতুম, ভাঁজাতুম খুব আলগা হাতে। খেলা শেষ হয়ে গেলে ধীরে-ধীরে গুছিয়ে একখানি রুমাল মুড়ে তুলে রাখতুম— অতি যত্নে। সত্যি বলছি, এই তাসকে এত ভালোবাসতুম আমরা যে এর বদলে নতুন ঝকঝকে তাস কিনে আনতে আমাদের লোভটুকু পর্যন্ত হয়নি কোনো দিন। এই তাসের ছবি দেখে আমাদের মনে হত—এরা যেন এক-কালে এই বাড়িরই মানুষ ছিল, এখন তাস হয়ে গেছে। তোমরা হেসো না, এর হরতনের গোলামটিকে আমার মনে হতো ঠিক যেন বুড়ো ঠাকুর্দার দারোয়ান ! এর ফোঁটা-ওয়ালা তাসগুলোও যেন কেমন এক-রকমের। এক একদিন বিনুর সঙ্গে খেলতে খেলতে প্রদীপের ঝাপসা আলোয় এর আটা-নওলা-দওলার রঙিন ফুটকিগুলোর দিকে চেয়ে চেয়ে হঠাৎ আমার চোখ কেমন ধাঁধিয়ে যেত— মনে হত আমি যেন তাদের ঐ ফুটকিগুলোর ফাটলের মধ্যে দিয়ে কতদূর চলে গেছি— সে যেন কতকালের আগেকার কোনখানে ! যারা অনেককাল আগে এখানে ছিল যেন তাদের কাছে ! সেখানে কি দেখতুম, কি শুনতুম মনে নেই কিন্তু সে সব দেখে শুনে কেমন তন্ময় হয়ে যেতুম। হঠাৎ বিনুর ডাকে আবার ফিরে আসতুম। সে ধমক দিয়ে বলতো— "কি বসে-বসে ভাবচিস ? খেল না !" আমি অমনি তাড়াতাড়ি যা হোক একখানা তাস ফেলে দিয়ে খেলায় আবার মন দিতুম। কিন্তু বুকটা কেমন ছমছম করতে থাকত। মনে হত এ নিশ্চয় জাদুকরা তাস !

বিনুকে একদিন জিজ্ঞাসা করেছিলুম— "এই তাস নিয়ে তোর মামার বাড়িতে কারা খেলত রে বিনু ?" বিনু বলেছিল—" শুনেছি দাদামশাই খুব পাকা খেলিয়ে ছিলেন, কেউ না-কি তাঁকে তাস-খেলায় হারাতে পারত না। লোকে হিংসে কোরে বলত, সে তাঁর খেলার গুণ নয়, তাসের গুণ ! তিনি তাস গুণ-করতে জানতেন। বোধ হয় এ তাঁরই আমলের তাস।" বিনুর দাদামশাইকে আমরা চোখে দেখিনি, তার মামাদেরই দেখতুম খুব বুড়ো ! উঃ, তাহলে না-জানি তিনি কত বুড়ো ! এ সেই আদ্যিকালের বদ্যি-বুড়োর হাতের গুণ-করা তাস ! এ তাস ছুঁতে বুক ছমছম করত, কিন্তু তবু ভালোবাসতুম বিনুর দেওয়া এই তাস জোড়াটাকে।

এই তাস নিয়ে বিনু গম্ভীর মুখে রোজ আমার সঙ্গে খেলত। তাকে খেলায় জিততে পারতুম না বলে সে প্রায়ই হাসতে হাসতে বলতো— "জানিস মল্লি, এ আমার দাদামশাইয়ের গুণ-করা তাস ! এ তাস হাতে থাকলে কেউ আমায় জিততে পারবে না, —তুইও না !"

আমাদের আড্ডা ঘরের দেওয়ালে গোরুর চোখের মত একটা সরু কুলুঙ্গিতে ছোট্ট

একটি তেলের প্রদীপ জ্বলত— আমাদের বসবার কোণটুকু আলো করে। বাকি ঘরটা অন্ধকারের আবছায়ায় পড়ে থাকত— কালো চাদর মুড়ি দিয়ে। খেলা জমে উঠত, সঙ্গে সঙ্গে রাতের অন্ধকারও জমে উঠত। একে একে বাড়ির প্রদীপ সব নিভে যেত, ঘরের পাশে সরু গলির পথটা ক্রমে নির্জন হয়ে আসত। চৌধুরি-বাড়ির দোতলার জানলা থেকে যে একফালি সরু আলো এসে অন্ধকার গলির উপর পড়ত, ক্রমে সেটুকুও অস্ত যেত। গলির ফাঁকটা ভরাট হয়ে উঠত—জমাট অন্ধকার। আর সেই কালো পাথরের মতো অন্ধকারের উপর দিয়ে মাঝে মাঝে শুনতুম কে যেন পায়চারি করছে লাঠি হাতে, খড়ম পায়ে— খটখটাস ! খটখটাস ! তার পরেই খুব দূর থেকে একটা খেঁকি কুকুর বুক-ফেটে কাৎরে উঠত—কেঁই-কেঁই ! আর অমনি ঝুলের ঝালর ও মাকড়সার জাল দিয়ে ঘেরা আমাদের ঠাকুর্দার আমলের পুরানো ঠাকুরদালানের কালপ্যাঁচা ও চামচিকে-বাদুড়গুলো অন্ধকারের মধ্যে কখনও হুস হুস কখনও হিসহিস শব্দে তাদের বাচ্চাগুলোকে সাবধান করে দিত। এবং মাঝে মাঝে ফটফট করে হাততালির আওয়াজে কাকে যেন আমাদের ঘরের দিকে তাড়িয়ে দিত ! ঐ বুঝি সে এল ! এই ভাবতে ভাবতে আমার সর্বাঙ্গ অসাড় হয়ে আসত। হাতের তাস মাটিতে নামত না ! বিনু ধমক দিয়ে বলতো— "কি করছিস ? খেল্ না !" তার এই ধমকানিতে আমার চটকা ভাঙত। আর সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকের ঐ বিশ্রী শব্দগুলোও যেন ভয়ে ভয়ে চুপ করে যেত। তা যদি না হত তাহলে বোধ হয় ঘর থেকে ছুটে আমি বাবার কাছে পালিয়ে যেতুম, কিছুতেই বিনুর সঙ্গে খেলতুম না।

সেদিন খেলা আরম্ভ করতেই হঠাৎ খুব জোরে ঝড়বৃষ্টি এল। একটা ঝড়ের দমকা আমাদের কোলের তাসগুলোকে উলটে পালটে ভেস্তে দিয়ে ঘর থেকে খানিকটা ঝুল ও ধুলো উড়িয়ে নিয়ে চলে গেল। বিনু বললে— "মল্লি, দরজা-জানালাগুলো বন্ধ করে দে !" আমি উঠে জানলাগুলো বন্ধ করতে লাগলুম। পশ্চিমের জানালাটায় হাত দিতেই কে যেন সজোরে আমার হাতে একটা ঝাঁকানি দিয়ে সেক্‌হ্যান্ড করে চলে গেল ! আমি তাড়াতাড়ি হাতটা ঘরের ভিতর ঢুকিয়ে নিলুম— কিছু বুঝতে পারলুম না। বুকটা ধুকধুক করতে লাগল।

খেলতে বসেই সে বাজি জিতলুম। আশ্চর্য কাণ্ড ! যা কখনও হয়নি, তাই হল। বিনুও অবাক। সে একটু বেশি করে মন দিয়ে খেলতে বসল। কিন্তু পরের বাজিও জিততে পারলে না। আমার কেমন সন্দেহ হল—এলোমেলো ঝড় এসে তাসের জাদুটা উড়িয়ে নিয়ে গেল নাকি !

আমি ক্রমাগতই জিততে লাগলুম। কিন্তু আমার কেমন মনে হচ্ছিল এ জেতায় আমার কোন বাহাদুরি নেই। প্রতিবারেই এমন তাস আসছিল যে খেললেই পিট পাওয়া যায়। কে যেন ম্যাজিক করে ভালো ভালো তাসগুলো বেছে বেছে আমার হাতে তুলে দিচ্ছে। বিনু বার বার হেরে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে উঠল— "আজ আমার পড়তা খারাপ পড়ল দেখছি !" তার এই দীর্ঘশ্বাসটি আমার বুকে গিয়ে বাজল। আমি চঞ্চল হয়ে উঠলুম। আমার মন কেঁদে বলতে লাগল— "আমি জিত চাই না বিনু জিতুক।" আমি ফন্দি করে বিনুকে জিতিয়ে দেবার জন্যে হাঁকুপাঁকু করতে লাগলুম, কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। আজকের ওই ঝড়ে কেমন যেন সব এলোমেলো হয়ে গেছে !

বিনু ফেললে হরতনের বিবি,তাকে সেই পিটটা দেবার জন্য আমি তাড়াতাড়ি খেললুম

গোলাম, কিন্তু পিট তোলবার সময় দেখা গেল গোলামটা চেহারা বদলে সাহেব হয়ে গেছে। কাজেই পিঠটা আমাকেই নিতে হল। পরের হাতে আমি খেললুম চিঁড়ের দশ, আমি জানতুম বিনু এ দশ ফোঁটার লোভ কিছুতেই ছাড়তে পারবে না, সে নিশ্চয় গোলাম দিয়ে পিটটা নেবে। বিনু ফেললেও গোলাম, কিন্তু আমার দশ-খানা হঠাৎ দুই ফোঁটা চুরি কোরে কেমন কোরে যে আটটা হয়ে গেল, আমি কিছুতেই বুঝতে পারলুম না। আমি অবাক, বিনু বাজি হেরে গোঁ হয়ে বসে রইল।

রাগ হলে বিনুর বড় বড় চোখ দুটো আরও বড় হয়ে উঠতে দেখেছি, কিন্তু আজ যেন অস্বাভাবিক রকম বড় হয়েছে বলে মনে হতে লাগল। সেবারের খেলাতে তার হাতের ফ্রাই ইস্কাবনের দশখানার উপর চিঁড়ের সাতা পাশিয়ে দিতে গিয়ে যখন সেটা রঙের সাতার তুরুপ হয়ে গেল, তখন তার সেই হঠাৎ-বড়-হয়ে-যাওয়া চোখ দুটো কেমন এক রকম ভাবে বিস্ফারিত করে সে আমার দিকে চাইলে যে সে-চাহনিতে আমার সর্বশরীর ঝিমঝিম করে এল।

বিনুকে ভয়ে ভয়ে বললুম— "ভাই, আর খেলে কাজ নেই। চল্ যাই।" বিনু সে কথা কানেই তুললে না।

ক্রমে রাত গভীর হয়ে এল। মনে হল বাড়ির সবাই ঘুমিয়েছে। আমাদের এ ঘরখানারও যেন ঘুম ধরেছে— এর দরজা, জানালা, ইঁট, কাঠ, ঘুমে ঢুলছে। প্রদীপের আলোটা থেকে থেকে কেবল হাই তুলছে। কড়ি কাঠের খোপে খোপে চড়াই পাখিগুলো গল্প শেষ করে শুয়ে পড়েছে। চারদিক নিস্তব্ধ নিঝুম! হাতের তাসগুলোর দিকে চেয়ে দেখি সাহেব বিবিদের চেহারা ঘুমে জড়িয়ে আসছে। ক্রমে মনে হল সমস্ত পৃথিবীটাই যেন ঘুমের ঝোঁকে দুলছে— ঝুম ঝুম ঝুম ঝুম!

হঠাৎ চটকা ভাঙল চৌধুরি-বাড়ির ঘড়ির শব্দে— ঢং। সেই শব্দ অন্ধকারের ঘুম ভাঙাতে ভাঙাতে অনেক দূর বলে গেল।

ও কি? ও কিসের শব্দ? কড়িকাঠের কাছে ওই কোণের গর্ত থেকে কে অমন বিশ্রী সুরে নিশ্বাস টানছে হুউউউসসস। —হুউউসস! আমি চমকে উঠে বিনুকে জিজ্ঞাসা করলুম— "ও কিসের শব্দ ভাই?"

বিনু কথা কইলে না। শুধু তাস থেকে চোখ তুলে কড়িকাঠের দিকে চাইলে, আর আমার মনে হল তার সেই ড্যাবডেবে চাহনিটা চোখ থেকে ঠিকরে বেরিয়ে কড়িকাঠের অন্ধকার কোণে গিয়ে এঁটে রইল— জ্বল জ্বল করে চেয়ে আমার দিকে। বিনুকে আমি কান্নার সুরে বললুম— "ভাই, আমার বড় ঘুম পেয়েছে।"

বিনু বললে— "আচ্ছা, আর দু-হাত খেল।" আমি চমকে উঠলুম— তার গলা শুনে। কি গম্ভীর আওয়াজ! এ তো বিনুর গলা নয়। কে তার গলার ভিতর থেকে কথা কইলে?

কোনও রকমে এই দু-হাত খেলা এখন শেষ করতে পারলে বাঁচি! কোনও দিকে কান দেবার, কোনও দিকে চোখ দেবার, আমার আর সাহস হচ্ছিল না। ইচ্ছা হচ্ছিল এই তাস দিয়ে চোখ-কান ঢেকে ফেলি। আমি খুব চোখের কাছে তাস এনে একমনে খেলতে লাগলুম।

সে-হাত বিনু খেলেছিল রঙের নওলা। আমার হাতে গোলাম ছিল, কিন্তু পিট নেবার ইচ্ছা ছিল না। কি করে লুকোলে বিনু সেটা ধরতে পারবে না ভাবছি, বিনু বলে উঠল সেই রকম বিষম ভারি গলায় ঘর কাঁপিয়ে— "গোলামটা আছে তো?"

ভয় হল ধরা পড়ে গেছি। বাঁ হাতের তাসের সারি থেকে চট করে হরতনের গোলাম তুলে নিয়ে হরতনের নওলার উপর ফেলতে গিয়ে দেখি— সামনে নওলা নেই, বিনুও নেই। অ্যাঁ।

বুকটা ধক করে উঠল।

এপাশ ওপাশ চেয়ে দেখি শুধু বিনু নয়, একখানি তাসও নেই।

বোঁ করে মাথাটা ঘুরে গেল। চোখে অন্ধকার দেখলুম। গা হাত পা ঝিমঝিম করতে লাগলো। ঘরের চার কোণ থেকে চারটে বিকট হাসি খিল খিল শব্দে ছুটে বেরিয়ে গেল। আর উপরে নহবৎখানা থেকে ঢাক ঢোল কাঁসি বাঁশি সব এক সঙ্গে বেজে উঠল। আমি কাঁপতে কাঁপতে মাটিতে শুয়ে পড়লুম। মনে হল আমার হাত-পায়ের সমস্ত খিল যেন আলগা হয়ে গেছে— উঠে-হেঁটে পালাবার আর উপায় নেই।

আমার কান্না আসতে লাগল— বিনু— আমার বিনু কোথায় গেল ? উপর থেকে ভাঙা কাঁসিখানা ফাটা আওয়াজে বলতে লাগল— কৈ না না ! কৈ না না ! আমি খুব চেঁচিয়ে ডাকলুম— বিনু, বিনু ! কিন্তু আমার গলার স্বর মুখ দিয়ে না বেরিয়ে পেটের ভিতর চলে গেল— ঘুরতে ঘুরতে, গোঁ গোঁ শব্দে !

একবার আশা হল বিনু হয়তো বাইরে গেছে— এখনি আসবে। কিন্তু বাঁ হাত থেকে ডান হাতে তাসটা নিয়েছি মাত্র— এই এতটুকু সময়ের মধ্যে সে এতবড় ঘর পেরিয়ে বাইরে গেল কেমন করে ? হয়তো আমি অন্ধকারে দেখতে পাইনি। তাই হবে। এই মনে করে দরজার দিকে এগিয়ে গেলুম, কিন্তু গিয়ে দেখি— একি, যেমন খিল বন্ধ করেছিলুম, ঠিক তেমনিই আছে। তবে ? তবে সে কেমন করে বাইরে গেল ?

হঠাৎ মনে হল বিনু আমাকে ভয় দেখাবার জন্যে এই ঘরের মধ্যে লুকিয়ে নেই তো !

কিন্তু কোথায় লুকোবে ? ঘর যে ফাঁকা। আসবাবের মধ্যে মাত্র একটা ভাঙা আলমারি। তার পিছনে বড় জোর আঙুল পাঁচেক জায়গা। তার মধ্যে একটা মানুষ থাকতে পারে না। তবু সেখানটা একবার দেখলুম। ঘরের একোণ ওকোণ, এধান ওধার প্রদীপ ধরে দেখলুম তন্ন তন্ন করে। কিন্তু সে কোথাও নেই— কোথাও নেই !

কতক্ষণ পড়ে পড়ে কেঁদেছিলুম জানি না। যখন ঘর থেকে বেরিয়ে এলুম, তখনও কান্নার জলে চোখ আমার ঝাপসা। রাত তখন নিশুতি। চারিদিক নিঝুম। কেউ কোথাও নেই। কেবল আমাদের তিন মহল প্রকাণ্ড বাড়িখানা দেখলুম ভয়ঙ্কর আতঙ্কে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। যেন তার সর্বাঙ্গে কাঁটা দিয়ে উঠছে। চৌধুরিদের চৌতলার চিলের ছাদটা আমাদের দিকে এতখানি গলা বাড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলে— "কি হল রে, কি হল ? কোথায় গেল ?" পশ্চিম কোণের ঢেঙা সুপুরিগাছটা কিছু না বলে শুধু ডিঙি মেরে আকাশের দিকে মুখ তুলে ইশারায় দেখিয়ে দিলে— আমাদের বাড়ির ঠিক মাথায় একটা মস্ত বড় কালো পাখি তাসের মতো নানা রঙে চিত্র-বিচিত্র করা ডানা মেলে মেঘের ধার দিয়ে অন্ধকারে ভেসে চলেছে—কাকে ঠোঁটে নিয়ে ! তাই দেখে চারিদিক থেকে চাপা গলায় সবাই বলে উঠল— "আ হা হা !" অমনি আমার বুকের ভিতরটা করে উঠল— "আহাহা। বিনুকে ওরা ভেলকি বাজিতে উড়িয়ে নিয়ে গেল !"

ভাবতে ভাবতে আমার চোখের সামনে থেকে যেন সব একে একে মুখে আসতে লাগল, পায়ের তলা থেকে পৃথিবীটা ধীরে-ধীরে সরে যেতে লাগল, আমি যেন একটা অতল অন্ধকারের মধ্যে ডুবতে লাগলুম— পলে পলে, তালে তালে !

তারপর মনে পড়ে অন্ধকারে চেনা পথ ধরে বাড়ির ভিতরের দিকে যাচ্ছিলুম। হঠাৎ কানে এল তাস পেটার শব্দ— চটাস চটাস! এত রাত্রে এখানে অন্ধকারে তাস খেলে কে? মুহূর্তের মধ্যে আমার চলা বন্ধ হয়ে গেল। আমি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে শুনতে লাগলুম।

বারান্দার পশ্চিম কোণে ঘুরঘুট্টে অন্ধকারের মধ্যে আমাদের খাজনাঘর। দিনের বেলা এর সামনে দিয়ে যেতে আমাদের গা ছমছম করে, সে জন্য এদিকটা আমরা কেউ মাড়াতুম না। আমাদের বিশ্বাস যত রাজ্যের ভূতপ্রেত ওইখানে বাসা বেঁধে মনের সুখে ঘরকন্না করছে। আমরা ওই মহলটা তাদের ছেড়ে দিয়েছিলুম। সেখানে কস্মিনকালে সকাল সন্ধ্যায় আলো-গঙ্গাজল পড়ত না, ঝাঁটিও কেউ দিত না। এই খাজনাঘর যে কত কালের তা কেউ জানে না। বাড়ির মধ্যে সব চেয়ে পুরানো এই জায়গাটা। শোনা যায় ঠাকুরদাদার যিনি ঠাকুরদাদা ছিলেন তাঁর আমলে জমিদারির খাজনা এলে এই ঘরে গচ্ছিত রাখা হত—মাটির তলায় একটা চৌখুপির মধ্যে। সরু সুড়ঙ্গের মতো এই ঘর, সামনে মোটা মোটা লোহার গরাদ দেওয়া খাঁচার মতো দরজা—পিতলের শিকল দিয়ে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়ানো। সামনে দাঁড়ালে একটা স্যাঁৎসেঁতে পচা গন্ধ নাকে আসে, আর চোখে পড়ে কালিঝুলিমাখা একটা অন্ধকারের কুণ্ডলী—দিন-রাত ঘূর্ণির মতো ঘুরচে!

এই ঘর কতকাল যে খোলা হয়নি তার ঠিক নেই। খোলবার দরকারই হয়নি। কারণ বহুদিন হল আমাদের সে জমিদারি নেই। তার খাজনাও আর আসে না। ঠাকুরমার মুখে গল্প শুনেছি, আমার ঠাকুরদাদার যিনি দাদামশাই ছিলেন তাঁর অগাধ টাকা ছিল— একটা রাজারাজড়ার তেমন থাকে না। কিন্তু তিনি ভারি কৃপণ ছিলেন। একটি পয়সাও কাউকে প্রাণ থাকতে দিতে পারতেন না— এমন কি নিজের ছেলে মেয়েকেও নয়। তিনি কেবল টাকার পর টাকার রাশ জমা করে চলতেন। লোকে টাকা খরচ করে নাম কেনে, তিনি টাকা না খরচ করার বাহাদুরিতে লোকের কাছে খেতাব পেয়েছিলেন! টাকার উপর তাঁর এমন মায়া ছিল যে, পাছে মারা যাবার পর তাঁর টাকা খরচ হয়ে যায় এই ভয়ে তিনি তাঁর যথাসর্বস্ব যখের হাতে সমর্পণ করে যান— যার কাছ থেকে একটি কাণা-কড়িও বার হবার যো নেই!

এই যখের কাহিনী একটা মস্ত বড় গল্প! কেমন করে একটি সুন্দর নয় বছরের ছেলেকে মেঠাই ও খেলনার লোভ দেখিয়ে তার বাপ-মায়ের কাছ থেকে চুরি করে আনা হয়, কেমন করে তাকে লাল চেলির গরদ পেরিয়ে, কপালে সিঁদুরের ফোঁটা দিয়ে ওই অন্ধকার খাজনাঘরের তলায় বন্ধ চৌখুপির মধ্যে—যেখানে কেবল ঘড়াঘড়া টাকা সাজানো আছে, আর কিছু নেই, আর কেউ নেই— না বাপ, না মা, না আলো, না বাতাস—সেইখানে একলাটি বসিয়ে রেখে, তারপর ওই চৌখুপিতে ঢোকবার পথটা দশ মন পাথর দিয়ে চিরদিনের মতো বুজিয়ে দেওয়া হয়, সে কথা শুনতে শুনতে আমার চোখে জল আসত—বুক দুরদুর করত। আর ঠাকুরদাদার, সেই পাষণ্ড ঠাকুর্দার উপর রাগ হত। ঠাকুরমা বলতেন— "আহা, ঐ সুন্দর নয় বছরের ছেলেটি কত কেঁদেছে, বাবা বাবা করে বুক ফেটে কত চেঁচিয়েছে, তেষ্টায় একফোঁটা জলের জন্য ছটফট করেছে, তবু কেউ তাকে ওই চৌখুপির দরজা খুলে দেয়নি।" শুনে আমার গলা কাঠ হয়ে আসত। তারপর ক্ষিদে-তৃষ্ণায়-ভয়ে কাতরাতে কাতরাতে বেচারা কখন যে হাঁপিয়ে মরে গেছে, সে হয়তো নিজেই বুঝতে পারেনি। এখন সে যখ হয়ে আছে— ওইখানে বসে বসে কেবল টাকার ঘড়া আগলাচ্ছে। কারও সাধ্য নেই যে ওই টাকা সেখান থেকে নিয়ে আসে! আমার

ঠাকুরদাদার বাবা না কি একবার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু বেশি দূর যেতে হয়নি, মেঝের পাথরে একটি মাত্র সাবলের ঘা দিতেই তিনি গোঁ-গোঁ করতে করতে অজ্ঞান হয়ে পড়েন। তিন দিন তাঁর কাঁপুনি ছিল। সাত দিন তাঁর মুখে রা ছিল না। কেন যে এমন হল, কেউ জানে না, তিনি নিজেও কিছু বলেননি। কারও সাহসও হয়নি— জিজ্ঞাসা করতে। সেই থেকে ওই ঘরের দিকে আর কেউ যায় না।

মনে হল ওই খাজনাঘর থেকেই যেন তাসখেলার শব্দ পেলুম। যদিও ওদিকে যেতে বুক দুরদুর করতে লাগল, কিন্তু বিনুর জন্যে না গিয়ে পারলুম না। যদি সে ওখানে থাকে— যদি সে আমায় দেখতে পেয়ে ছুটে আসে।

বুকটা দু হাতে চেপে খাজনাঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়ালুম। লোহার গরাদ-দেওয়া দরজা দিনের বেলা শিকল দিয়ে বাঁধা থাকে কিন্তু এখন দেখলুম খোলা। অন্ধকারে চোখে কিছু দেখা গেলনা, কিন্তু কানে শোনা গেল— কারা দুজন যেন দরজার দুইধার থেকে সজোরে ছুটে এসে মাথায় মাথায় অনবরত ঠোকাঠুকি করছে— দুম, দুম, দুম! আমার কেমন মনে হল যেন এইখানকার এই অগাধ সম্পত্তি, এই যখের ধন—কে নেবে তাই নিয়ে দুই ভূতের লড়াই চলেছে।

আমি এক মনে এদের লড়াইয়ের তাল গুণছি, হঠাৎ বিনুর মতো কার গলা পেলুম। সে বলছে—"বিবির চেয়ে রঙের গোলাম বড়।" আর একজন কে সরু গলায় বলে উঠল— "দূর বোকা, তা কখনও হয়? গোলাম হল সাহেব-বিবির চিরকেলে কেনা-গোলাম। হলই না-হয় সে রং মেখেছে!"

গোড়ায় গোড়ায় আমিও একদিন বিনুকে বলেছিলুম— "গোলাম কেন বিবির চেয়ে বড় হবে বিনু?" বিনু বলেছিল— "এই রকম যে নিয়ম।" আজও আবার সেই কথা উঠেছে। এও তাহলে আমাদের মতন নতুন খেলিয়ে দেখছি।

আবার শুনলুম—"তুই কিচ্ছু খেলতে পারিস না! মল্লি তোর চেয়ে ঢের ভালো খেলে।" বিনু আমায় ডাকত মল্লি বলে।

মনে হল, আমার যখন নাম করেছে, এ তখন নিশ্চয় বিনু! বিনুর গলায় আমার নাম শুনে ওই ঘরের মধ্যে ছুটে যাবার জন্যে আমার প্রাণটা আকুলি বিকুলি করতে লাগল, কিন্তু পারলুম না। ভয় হল, পাছে ওই দুটো পাগলা ভূতের মাথা ঠোকাঠুকির মধ্যে পড়ে থেঁৎলে যাই! আমি চুপ করে সেখানে দাঁড়িয়ে রইলুম।

হঠাৎ অন্য লোকটা চেঁচিয়ে উঠল— "অ্যাঁ, হরতনের গোলাম কোথায় গেল? হরতনের গোলাম! ভারি আশ্চর্য!— এই ছিল, এই নেই! চোখের পাতা ফেলতে-না-ফেলতেই উড়ে গেল?"

আমার ভারি হাসি পেল— ঐ জাদু-করা তাস এদের সঙ্গেও জাদু খেলছে দেখছি!

বিনু বলে উঠল— "হরতনের গোলাম?—সে তো মল্লির হাতে।"

আমি নিজের হাতের দিকে চেয়ে দেখি— সত্যিই তো, সেই হরতনের গোলাম, যা দিয়ে বিনুর নওলার পিঠ নিতে গিয়েছিলুম, সেখানা আমার হাতেই রয়েছে তো!

অন্য লোকটা বলে উঠল— "কই হ্যায়—মল্লিবাবুকো পাকাড় লে আও!"

সেই শুনে আমি তাড়াতাড়ি হরতনের গোলামখানা খাজনাঘরের ভিতর ছুঁড়ে দিয়ে একছুটে নিজের শোবার ঘরে পালিয়ে এলুম।

ঘরে এসেও ভয়ে বুকটা ধক ধক করতে লাগল— এই বুঝি সে এসে আমায় জাপটে ধরে নিয়ে যায়! আমি পা থেকে মাথা পর্যন্ত চাদর মুড়ি দিয়ে মড়ার মতো পড়ে রইলুম।

খানিকক্ষণ কেউ এল না, তারপর কে একজন খসখস শব্দে বারান্দা দিয়ে চলে গেল— বোধ হয় আমার ঘর চিনতে পারলে না। আমি হাঁফ ছেড়ে বাঁচলুম। নিশ্চিন্ত হয়ে পাশ ফিরতে যাচ্ছি, এমন সময় কে আবার তড়াক করে লাফিয়ে আমার বিছানায় উঠল। আমি ভয়ে কাঠ! যে এল, সে খানিক বিছানার এদিক ওদিক ঘুরে ঘুরে আমার গা শুঁকে শুঁকে বেড়াতে লাগল; তারপর আমার মাথার কাছে এসে মুখঢাকা চাদরখানা ধরে সজোরে টানতে লাগল—মুখ খুলে দেখবে। ওরে বাবারে! আমি প্রাণপণে চাদরখানা আঁকড়ে রইলুম, কিছুতেই মুখ খুলতে দিলুম না। তারপর সে পায়ের দিকে গেল। তার নিশ্বাসের হাওয়ায় আমার পা দুখানা ঠাণ্ডা হিম হয়ে এল। আমার পা ধরে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে যাবে না ত? ভয়ে পা গুটিয়ে নেবার চেষ্টা করলুম, পারলুম না। খানিকক্ষণ সে চুপ করে রইল, বোধ হয় কি ভাবলে, তারপর আমার পাশে এসে ধুপ করে শুয়ে পড়ল। সর্বনাশ! এখন করি কি! কিন্তু ঠিক সেই সময় আমার পুষি বেড়ালটা ম্যাঁও-শব্দে ডেকে উঠতেই, সে তড়াক করে বিছানা থেকে লাফিয়ে পালিয়ে গেল।

পুষিকে কাছে পেয়ে আমার ভয় অনেক ভেঙে গেল। তখন আবার বিনুর ভাবনা এল— তাহলে সত্যিই কি বিনুকে ওরা ওইখানে— ওই চৌখুপির মধ্যে নিয়ে গেল! সেখান থেকে পালিয়ে আসবে কি করে? এই সব ভাবছি, হঠাৎ সে কানের কাছে মুখ এনে খুব চুপিচুপি ডাকলে— "মল্লি, ভাই মল্লি! বিনুর কাছে যাবে? বিনুর কাছে!"

আমি ধড়মড় করে উঠে বসলুম— বিনুর কাছে যাবার জন্যে বুকটা লাফিয়ে উঠলো। কিন্তু ভারি ভয় হতে লাগল—যদি আর ফিরে আসতে না পারি?

সে তখন বললে— "ভয় কি! চল না! বিনু তোমার জন্যে বড় কাঁদছে।"

বিনুর কান্নার কথা শুনে বুক ফেটে যেতে লাগল। আমি ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলতে লাগলুম— "ওগো তোমার দুটি পায়ে পড়ি, বিনুকে এবার ফিরিয়ে এনে দাও। বিনুর জন্যে আমার বড্ড মন কেমন করছে।"

আমার কান্না শুনে সে চুপিচুপি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। যাবার সময় দেখলুম, একটা মস্ত পাগড়িওয়ালা চেহারা—ঠিক যেন হরতনের গোলাম।

এই হরতনের গোলামটিকে তাসের মধ্যে সবচেয়ে আমি বেশি ভালোবাসতুম। আমাদের বাড়িতে যে বড়ো ঘুরথুরে দারোয়ান ছিল— ঠাকুরদাদার আমলের, তাকে খুব ছেলেবেলায় দেখেছিলুম, অল্প অল্প তার চেহারা মনে পড়ে। কিন্তু বেশ মনে আছে রোজ সকালে সে একটি করে রসমুণ্ডি আমার খাওয়াত। কি মিষ্টি লাগত সে রসমুণ্ডি! এখনও যেন তার স্বাদ মুখে লেগে আছে। আমার মনে হল, এই হরতনের গোলাম যেন সেই বুড়ো দরোয়ান— এখন তাসের ছবি হয়ে গেছে। সে বোধ হয় আমার কান্না দেখে লাঠিহাতে বিনুকে খুঁজে আনতে গেল। আবছায়ার মতো মনে পড়ে ছেলেবেলায় আমার পুষি বেড়ালটা হারিয়ে যেতে, আমার কান্না দেখে, সে এমনি করে একদিন তাকে খুঁজে আনতে বেরিয়েছিল।

কতক্ষণ গেল, ঘরের ঘড়িটা টক টক শব্দ করতে করতে কতদূর চলে গেল, মনের মধ্যে কত ভাবনা এল গেল— তবু বিনু এল না। হায়, সে কি আর আসবে? ওই ভয়ঙ্কর চৌখুপি ঘর—যার সামনে দুটো ভীষণ ভূত মাথা ঠোকাঠুকি করছে অনবরত, সেখান থেকে বিনুকে কে উদ্ধার করে আনবে? ভাবতে ভাবতে আমার শরীর এলিয়ে আসতে লাগল, চোখের পাতা জড়িয়ে আসতে লাগল, কপালে যেন কে নরম ঠাণ্ডা হাত বুলিয়ে দিলে, আর অমনি এক নিমিষে মনে হল, আমি যেন একখানা তাসের উপর শুয়ে কোথায়

চলেছি— হাওয়ার সঙ্গে ভেসে ভেসে !

তাসখানা ভাসতে ভাসতে এসে আমায় একটা চারিদিক আঁটা অন্ধকার ঘরের মধ্যে নামিয়ে দিলে। দেখলুম সেই অন্ধকারে বসে দুজন এক মনে তাস খেলছে। বিনু আর একটি ছোট ছেলে— সুন্দর দেখতে, থোকা-থোকা কোঁকড়া চুল চাঁদের মতো কপালের উপর ছড়িয়ে পড়েছে। ঠিক যেন বিনুর ছোট ভাইটি। বিনু তার সঙ্গে খেলতে লাগল, আমার দিকে একবার চেয়েও দেখলে না। আমার ভারি রাগ হল— হিংসেও হল। এর মধ্যে এর সঙ্গে এত ভাব ! আমি মুখ গোঁ-করে রইলুম।

ছেলেটি একবার তাস থেকে মুখ তুলে মিষ্টি সুরে জিজ্ঞাসা করলে— "এ কে, বিনু ?"

বিনু গম্ভীর গলায় বললে— "ও মল্লি !"

সে বললে— "বেশ হল, আমরা তিনটি ভাইয়ে কেমন একসঙ্গে এইখানে থাকব।"

আমি রেগে চিৎকার করে উঠলুম— "না, না—আমি এখানে কিছুতেই থাকব না।"

অমনি হরতনের গোলাম এসে আমার পিঠে করে তুলে নিলে। বিনু সেটার উপর লাফিয়ে চড়তেই সেখানা ভারী হয়ে মাটিতে পড়ে গেল। মজা দেখে ছেলেটা খিলখিল করে হেসে উঠল।

বিনু বললে— "দাঁড়া, আমরা তিন জনেই এক-সঙ্গে যাব।" বলে, ছেলেটির কানেকানে কি বললে। ছেলেটি বললে— "চল, যাই।" কিন্তু উঠে দাঁড়াতে গিয়েই ধুপ করে পড়ে গেল। দিন রাত এক জায়গায় বসে থেকে থেকে তার পা অসাড় হয়ে গেছে। বিনু তাকে কোলে করে তুলে নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল। তাসগুলোকে কি বললে, তারা ফরফর করে উড়ে এসে পাখির মতো ডানা ছড়িয়ে দাঁড়াল। আমরা উড়তে যাচ্ছি, এমন সময় কড়িকাঠ থেকে দুটো কালো চামচিকে এসে তাসগুলোর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। তারপর দুই দলে যা যুদ্ধ। —আঁচড়া আঁচড়ি, কামড়াকামড়ি। আমি ভয়ে ঠকঠক করে কাঁপতে লাগলুম। চারিদিক থেকে অন্ধকারগুলো ছুটে আমাদের সামনে তালগোল পাকিয়ে পথ আটকে দাঁড়াল ! যেন আমরা পালাতে না পারি ! ছেলেটি কাঁদো কাঁদো হয়ে বললে— "বিনু, দেখেছিস তো, এরা আমায় যেতে দেবে না ! তোরা কেন প্রাণে মরবি ? পালা !"

বিনু বললে— "না ভাই, তোকে ছেড়ে কিছুতেই যাব না।" চামচিকে দুটো তাই শুনে ফ্যাঁস করে উঠল। এমন সময় হরতনের গোলামটা ছুটে গিয়ে একটা চামচিকের পেটে সজোরে এক ঘুষি বসিয়ে দিলে। চামচিকেটা তার ধারালো নখ দিয়ে হরতনের গোলামখানাকে আঁকড়ে ধরে মাটিতে গড়িয়ে পড়ল, আর সেই ফাঁকে অন্য তাসগুলো আমাকে নিয়ে উড়ে পালাল। বিনু আর সেই ছেলেটি দেখলুম সেই ঝটাপটির মধ্যে হিমসিম খাচ্ছে। আমি তাসের উপর থেকে হাত বাড়িয়ে বিনুকে ডাকতে লাগলুম— "বিনু, আয় আয় !" বিনু আমার দিকে ফিরেই চাইলে না, ছেলেটাকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে রইলে। আমার কান্না পেতে লাগল ! তাসগুলো উড়তে উড়তে এসে আমাকে বিছানায় ফেলেই উড়ে গেল—বোধ হয় বিনুদের উদ্ধার করতে। তার পর কি হল জানি না।

"মল্লি ! মল্লি !"

আমি ধড়মড় করে উঠে বসলুম। ঝড়ের মতো ধাক্কা দিয়ে কে ঘরের মধ্যে ঢুকল। সকালের আলোয় ঘরটা আলো হয়ে উঠল। মনে হল যেন একটা প্রকাণ্ড দুঃস্বপ্ন কেটে গেল। আমি ছুটে গিয়ে দুই হাতে বিনুর গলা জড়িয়ে ধরলুম— "বিনু, এসেছিস ভাই,

এসেছিস ?”

সে বললে— “আসব না ত কি। তুই স্টুপিড এত বেলা অবধি ঘুমচ্ছিস কেন ?”

আমি বললুম— “কখন এলি ভাই ?”

সে বললে— “অনেকক্ষণ। তোকে ডেকেডেকে আমার গলা চিরে গেল। তোর আজ হয়েছে কি ? চোখ অমন রাঙা কেন ?”

আমার ধাঁধা লাগল। বিনু তো সবই জানে, তবে এমন আশ্চর্য হচ্ছে কেন ?

আমি আমতা-আমতা করে বললুম— “কাল রাত্রে এই খেলতে খেলতে হঠাৎ অমন অন্তর্ধান—”

সে বাধা দিয়ে বললে— “আমি কেন অন্তর্ধান হতে যাব ? তুইতো খেলা ফেলে চোখ মুছতে মুছতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলি।”

আমার আরও ধাঁধা লাগল। এ কি ঘুমের ঝোঁকে সবই স্বপ্নের মতো দেখলুম। কিন্তু এত যে কাণ্ড, সে সবই স্বপ্ন ? ইচ্ছা হচ্ছিল আগাগোড়া সব কথা বিনুকে খুলে বলে হেঁয়ালিটা পরিষ্কার করে নিই, কিন্তু পারলুম না। দিনের আলোয় কথাগুলো এমন অদ্ভুত বোধ হতে লাগল সে বলতে লজ্জা হল। আমার ভূতের ভয়ের জন্যে বিনু যা আমায় ঠাট্টা করে।

বিনু বললে— “কি ভাবছিস ? চল বাইরে যাই।”

আমরা দুই বন্ধুতে আমাদের সেই বাইরের ঘরে গিয়ে দেখি— ঘরময় তাস ছড়ানো। সমস্ত দেহ তাদের ক্ষতবিক্ষত ! তাদের বুকের উপর কে যেন মনের আনন্দে ধারালো নখ দিয়ে কেবল আঁচড়ের পর আঁচড় টেনেছে। বেশ বোঝা গেল রাত্রের মধ্যে খুব একটা মারামারি কাণ্ড হয়ে গেছে। আমি সভয়ে বিনুর দিকে চেয়ে বললুম— “বিনু দেখছিস।”

বিনু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে— “আমারই জন্যে তাসগুলো গেল !”

“আঁ। তোমারই জন্যে ? তার মানে ? —সেই চৌখুপি ঘর থেকে তোমাকে উদ্ধার করবার জন্যে ? তা হলে তো সবই ঠিক।”

কিন্তু বিনুর মুখ দেখে কিছু বুঝতে পারলুম না। একটু ইশারা পাবার আশায় আমি বিনুকে আবার জিজ্ঞাসা করলুম— “কি করে এমন হলো বিনু।” বিনু কোনো জবাব দিলে না, শুধু আঙুল দিয়ে ভাঙা আলমারিটা দেখিয়ে দিলে।

আমি আলমারি খুলতেই একরাশ আরসোলা ফরফর করে ঘরময় ছড়িয়ে পড়ল। তারপর ডানা-মেলে উড়ে অন্ধকার কোণের একটা গর্ত দিয়ে কোথায় চলে গেল— বোধ হয় মাটির তলা দিয়ে সেই চৌখুপির মধ্যে। আমি হতভম্ব হয়ে চেয়ে রইলুম।

বিনু বললে—“তাসগুলো কুড়ো।”

আমি তাসগুলো, কুড়িয়ে, গুছিয়ে দেখি সবই আছে, কেবল একখানা নেই—সেই হরতনের গোলাম।

তবে ?

এই তো ঠিক মিলছে। সেই হরতনের গোলাম— যাকে নিয়ে কাল রাত্রের ওই সমস্ত অদ্ভুত ঘটনার উৎপত্তি—সে নেই কেন। সে গেল কোথা।

সে কোথায় আছে, আমি জানি। সে আছে সেইখানে— সেই চারিদিক বন্ধ চৌখুপির মধ্যে, যেখানে সেই নয় বছরের সুন্দর ছেলেটি চিরদিন একা অন্ধকারে বসে আছে।

কালকের সব কাণ্ড বিনু নিশ্চয় ভুলে গেছে, সকালে ঘুম থেকে উঠে তার আর কিছুই মনে নেই। তার যে ঘুম ! এমন তো আমারও এক-একদিন হয়। রাতের ঘটনা স্বপ্ন

দেখার মতো সকালে সব ভুলে যাই। কাল রাত্রে আমি যদি ঘুমিয়ে পড়তুম, তা হলে আমিও হয়ত সব ভুলে যেতুম, আজ সকালে উঠে অবাক হয়ে ভাবতুম—তাই তো হরতনের গোলাম বেচারা গেল কোথায় ?

মুষ্টিযোগ

শিবরাম চক্রবর্তী

স্থানীয় ফার্স্ট-এইড-সেন্টারের সাহায্যকল্পে পাড়ার ছেলেরা একটা বক্সিং প্রতিযোগিতা খুলেছিল। আমাকে এসে ধরল— নাম দেবার জন্যে।

নাম দিলে আর চাঁদার টাকা দিতে হবে না, আমায় লোভ দেখাল আরো।

টাকা লাগবে না অথচ নাম হবে— এহেন সুযোগ কেউ ছাড়ে ? এমন প্রলোভন দমন করা সকলের পক্ষেই শক্ত, কাজেই, সহজেই রাজি হয়ে গেলাম।

কিন্তু নাম দেবার ভেতর যে এত ল্যাঠা ছিল, জানতো কে ? প্রথম রাউন্ডেই আমার নাম উঠেছে, খবর পেয়ে বেশ উৎফুল্ল বোধ করছি, এমন সময়ে হঠাৎ আমার খটকা লাগল— রাউন্ড ! রাউন্ড কি আবার ? রাউন্ড কেন রে বাবা ? আমার নাম তো বেশ লম্বা-চওড়া—তার মধ্যে আবার রাউন্ড আসে কোথ্থেকে ? অ্যাঁ ? এত গোলমাল কিসের জন্য ?

সবিশেষ জানতে হল। জানতে গিয়ে যা জানলাম তা যদি আগে জানতাম !

আদ্ধেক টাকার ওপর আবার প্রাইজ— আমার পক্ষে এক সারপ্রাইজ ! আদ্ধেক রাজত্বের সঙ্গে গোটা একটা রাজকন্যা !

"কত উঠেছে ?" উৎসুক হয়ে আমি জিজ্ঞেস করি। কথাটা শোনার পর, বলতে কি, আমার একটু উৎসাহ হয়।

"তা— বেশ কয়েক হাজার। ...অবিশ্যি, যদি আপনি জিততে পারেন।" তারা জানায়।

"যদি জিতি তবেই !" আবার আমাকে মুষড়ে পড়তে হল, বক্সিঙের ব্যাপারে আমার আদ্ধেক বয়সের একটা বাচ্চার সামনেও আমি দাঁড়াতে পারব কি না সন্দেহ !

"অবিশ্যি, পাবার পরে, তারপরে টাকাটা আপনি আবার ফাস্ট-এইডের জন্যেই দাতব্য করে দেবেন।" তাদের কথাটা শেষ করে।

"বা রে ! তাহলে আমার লাভ ? এত মারধোর খেয়ে, এত কষ্ট করে জিতে-টিতে শেষটায়—অ্যাঁ ?"

"আপনার নাম হবে যে ! খুব নাম হবে ! নাম হওয়াটা কি কম লাভ নাকি ?" তাদের সেই এক কথা— গোড়াতেও যা, আগায় এসেও তাই ! নাম-মাহাত্ম্য— আর আমার নামাবলী !

বাড়ি ফিরে বিপদের কথাটা বিনির কাছে পাড়লাম। বললাম, "চ' বিনি, পালাই এখান

থেকে। পাড়া ঠাণ্ডা হলে বক্সিঙের গোলমাল মিটে-টিটে গেলে ফেরা যাবে আবার।"

বিনি অভয় দেয়— "ঘাবড়ো না দাদা, লড়বে, আর ভয় কি? জিততে পারো ভালোই। না যদি পারো —দ্যাখো যে বেগতিক— ব্যাপারটা তেমন সুবিধের না, তক্ষুনি 'নক-আউট' হয়ে যাবে, রেফারির দশ গোনা পর্যন্ত চোখ বুজে মড়ার মতন পড়ে থাকবে চুপচাপ— 'নক-আউট' কাকে বলে জানো তো?"

"তা আর জানিনে!" আমি বলি— "নক-আউট কিংবা 'নাক'-আউট যা বলিস! ও হচ্ছে এক রকমের ব্লো— বি এল ও ডবলু— ব্লো মানে ঘুষি। সেই ঘুষিকেই বলে নাকি— যার চোটে একজনের নোখ উড়ে যায়, আরেকজনের নাম। এক্ষেত্রে নাক যাবার দায় হচ্ছে আমার। কিন্তু নাক খোয়াতে আমি পারব না। নাক গেলে আমার কি থাকবে? একটি তো মোটে নাক!"

"টিংচার-আইডিন থাকবে। ব্যান্ডেজ বাঁধবার থাকবে— তারপরো কতো কি থাকবে। আরে দাদা, তার-নামই তো ফার্স্ট-এইড। আর সেই ফার্স্ট-এইডের জন্যেই তো এই লড়াই। আর, তারই সাহায্যের জন্যে তুমি নাকি নামতে চাইছ না।"

তা বটে! অতএব নামতে হল— নাকের স্বার্থেই নামলাম। নাক যাক, সেজন্যে কিছু না; নাক গেলেও ফার্স্ট-এইড যাতে মেলে সেই সুবিধার দিকে তাকিয়েই, না নেমে পারা গেল না।

ব্যাডমিন্টন-কোর্টের মতো একটুখানি জায়গা— চারধারে দড়ির বেড়া দিয়ে ঘেরা। বেশ মোটা কাছির দড়া— পালাব যে তার কোনো যো নেই। বক্সিংগ্লাভ হাতে এঁটে তার মধ্যে গিয়ে উৎরাতে হল।

আমার পাল্লাদারও নামল— ইয়া ষন্ডামার্কা চেহারা। লোকটা পাড়ারই— আমার মুখচেনা। পাশের বস্তির— দস্তিদার না কী যেন তার নাম! এর আগে হাতে-কলমে আলাপের সুযোগ না ঘটলেও, যেতে-আসতে ওকে দেখেছি। পাড়ার একজন পপুলার গুণ্ডা— হাতাহাতির ব্যাপারে শুনেছি সে অদ্বিতীয়।

ও নামতেই খুব হাততালি পেল। আমি নামলে সবাই হো-হো করে হাসতে লাগল। হাসবেই, জানা-কথা। আমাকে পিটিয়ে তক্তা বানানো হচ্ছে— সেই অনির্বচনীয় সিনারি দেখতেই সবাই জুটেছে। তার আগামী আনন্দেই ওরা হাসিখুশি।

অবশেষে রেফারিও এলেন আমাদের মাঝখানে— তাঁর পর্বতপ্রমাণ দেহ নিয়ে। তাঁকে দেখে এতক্ষণে তবু একটু ভরসা পেলাম। তেমন বেগতিক দেখলে, এই পাহাড়ের আড়ালেই আশ্রয় নেওয়া যাবে।

বলতে কি, প্রথম খানিকক্ষণ আমি তাঁর পেছনে-পেছনেই রইলাম। বাহানা দিয়েই টাল সামলাতে লাগলাম। ওদিকে ঐ লোকটা লাফাচ্চে— আমাকে মারবার জন্যই লম্ফমান—এদিকে আমার এই টালবাহানা! মাঝখান থেকে রেফারি ব্যস্ত আমাদের দু'জনকে সামনাসামনি আনতে— কিন্তু আমি প্রাণপণে ওঁর আড়ালে আবডালে রয়েছি। এইভাবে অনেক ঘুষোঘুষি ঝড়-ঝাপটা ওঁর ওপর দিয়েই কাটিয়ে দেওয়া গেল।

"দেখছেন লোকটার চোট্টামি!" ষন্ডামার্কা অবশেষে আমার দিকে রেফারির দৃষ্টি আকর্ষণ করতে বাধ্য হল। "চোট মারব কি, ছুঁতেই দিচ্ছে না একদম!"

রেফারিও আমাকে ঘাড় বেঁকিয়ে দেখবার চেষ্টা করলেন। —"ভয় কি? এগিয়ে আসুন না, ভয় কিসের!" গাল কাত করে তিনি বললেন।

না, ভয় কিছুই নেই, তা জানি— তবুও, তিনি এগুলেই তো আমি এগুতে পারি ! তিনি পেছুলে আমাকেও যে পিছিয়ে আসতে হয়— ঠিক তাঁর পিছু-পিছু। তিনি যেদিকে যতখানি নড়েন, আমাকেও সেদিকে তত ডিগ্রি সরতে হয়। একেবারে জ্যামিতিক নিয়মে।

এখন হল কি, অনেকক্ষণ ধরে অনেক তাক করে গুণ্ডাটা একটা দুর্দান্ত ঘুষি ঝাড়ল আমার দিকে। আমারও তাকাবার কোনো কসুর ছিল না, আমিও তড়াক করে লাফিয়েছি। লাফিয়ে সরে গেছি— রেফারি-নামক সাঁচিস্তূপের অন্তরালে। লোকটার সযত্ননিক্ষিপ্ত ঘুষিটা, অগত্যা, তাঁরই কোঁকে এসে লাগল। লাগতেই তিনি কোঁক্ করে উঠলেন।

পাঁজরায় হাত বুলোতে-বুলোতে তিনি ককিয়ে উঠলেন। কিছুটা কটমট—কিছুটা কাতর চক্ষে আমার দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন— "দ্যাখো বাপু, ঘুষি দিয়েই ঘুষি সামলাতে হবে, আমাকে দিয়ে নয়। বুঝেছ ?"

বুঝেছি অনেক আগেই— না খেয়েই— যা খেয়ে এখন উনি টের পাচ্ছেন। কিন্তু কথায় বলে, 'প্রিভেনসন ইজ্ বেটার দ্যান কিওর।' মানে, মার খাবার আগেই মালুম হওয়াটা কি ভালো নয় ?

অবিশ্যি, আমারও ঘুষি ছোড়ার কিছু কসুর ছিল না, লোকটাকে লক্ষ্য করে ঝাড়ছিলাম এনতার। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তার একটাও তার কিংবা রেফারির গায়ে লাগছিল না—আকাশের পিঠেই বরবাদ হচ্ছিল। বিলকুল বাজে খরচ ! কিন্তু এই শূন্য-আস্ফালনের দাপটেই আমার ডানহাতের দস্তানা খুলে পড়ল।

আমি বললাম— "টাইম্ !" এই বলে মাটির থেকে দস্তানা কুড়িয়ে নিয়ে হাতে পরছি— ও বললে, "টাইম না তোর মুণ্ডু !"

বলা আর সঙ্গে সঙ্গে আমার ঝুঁকে-পড়া মাথার ওপর বিরাট এক গাঁট্টা ! রামগাঁট্টা যার নাম ! দস্তানা-আঁটা মুঠোর সেই জবরদস্তি— অন্যের মাথা হলে কি হত বলা যায় না, আমারটা নেহাত নিরেট বলেই রক্ষে !

কিন্তু তাহলেও আমার মাথার ঘিলু চলকে গেল ! গাঁট্টা খেয়ে আমি গেলাম বিগড়ে। কে না বিগড়ায় ? আমার ছিল খোলা হাত, রাগের মাথায় ছুটে গিয়ে খালি-হাতে তার রগের উপর বিরাশি-শিকের এক চড় কষিয়ে দিয়েছি।

সে বললে— "চড় মারা কি বক্সিং ?" রেফারিকেই বললে। গালে হাত বুলোতে বুলোতে বললে। আর বলতে-না-বলতে চারধারের দর্শকরা ক্রিকেটের মাঠের মতো 'হাউজ দ্যাট' বলে চেঁচিয়ে উঠল। আর ও করল কি, রেফারি কোনো সুবিচার করার আগেই নিজের ডানহাতের গ্লাভটা খুলে ফেলল— ফেলে এগিয়ে এসে মুক্তহস্তে আমার মুখের খানিকটা খামচে নিল।

এতক্ষণে রেফারি মুখ খুললেন, বললেন, "বক্সিং-কথাটার ব্যুৎপত্তি আমি ঠিক বলতে পারব না। খুব সম্ভব এটা এসেছে, বক্স্ থেকে— বাকসো থেকেই। আমার ধারণা, আগে এটা বাকসো ছুঁড়ে মারামারি ছিল। কালক্রমে সব জিনিসই যেমন কমে আসে…আগে দুধ টাকায় ক'সের ছিল আর এখন কত ভেবে দেখুন— সেই হিসেবে বাকসোও আস্তে-আস্তে তোরঙ্গ, পোর্টম্যান্টো, ক্যাসবাকসো থেকে— ক্ষয়ে-ক্ষয়ে হাতবাকসো হয়ে দাঁড়াল। ভারী একটা সিন্দুক কিংবা আলমারি কি স্টিলট্রাঙ্ক ছুঁড়ে মারার চেয়ে, হাতবাকসো লাগানো ঢের সোজা। আর, বেশ হালকাও বলতে হয়। অবশেষে

হাতবাকসো থেকে হাতের গ্লাভ। অতএব আমার সিদ্ধান্ত এই, শুধু-হাতে বক্সিং হতেই পারে না, দস্তানা দিয়ে মারাটাই দস্তুর।"

ষণ্ডামার্কা মন দিয়ে রেফারির মন্তব্য শুনছিল— সেই সুযোগে, তার ওই হাঁ-করা আবহাওয়াতেই আমার হাতের দস্তানা হাঁকড়ে দিয়েছি— সটান তার মুখের ওপর। দস্তানা খেয়ে সেও চুপ করে থাকবার ছেলে নয়— সেও হচ্ছে দস্তিদার! সেও তার দস্তানা চালিয়েছে। তখন দস্তুরমতন গ্লাভ-ফাইট!

তারপর আর হোমিওপ্যাথিক-ডোজের শূন্য আস্ফালন নয়— একেবারে এলোপাথাড়ি চিকিৎসা। আমার হাতে এলোপ্যাথি আর ওর হাতে কবরেজি। হাকিমি-দাবাইয়ের মিষ্টি সরবতও না— রীতিমত তিক্ত ব্যাপার। পাচন আর মুষ্টিযোগ।

বক্সিং খতম হলে ছিন্নভিন্ন দশায় টলতে-টলতে বাড়ি ফিরলাম। ঠোঁট কেটেছে, নাক ফেটেছে, তবে একেবারে 'আউট' হয়ে যায়নি, চুল উঠে গেছে, গাল চটে গেছে, (আমিও চটেছি কম না), তিনটে দাঁত নড়ছিল, আর ঘাড়ের কাছটা গেছে ছ'ড়ে। একটা কান লাল, মলার জন্য নয়; দস্তাঘাতে লাল, বলাই বাহুল্য!

নড়বড় করতে-করতে এলাম। বিনি তো আমাকে দেখেই আঁতকে উঠল— "এ কী দাদা, এ-দশা তোমার করলো কে?"

"বক্সিং আর দোস্তিতে এমন হয়েই থাকে।" আমি বললাম। ভগ্নকণ্ঠেই বললাম। "আমরাই করেছি। আর কে করবে!"

"নাক ফেটে চৌচির, ঠোঁট কেটে রক্ত পড়ছে! একটা কান রক্তাক্ত— কী সর্বনাশ!"

"এ আর কি দেখছিস? সর্বনাশের কি হয়েছে এখন! কাল আমাকে আবার লড়তে হবে— সেকেন্ড রাউন্ডে— আরেক ষণ্ডামার্কার সঙ্গে। সবাই বললে, আমি নাকি জিতেছি।"

খেলোয়াড়

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী

বালিগঞ্জের নতুন বাড়তি অঞ্চল।

তখনও বাড়ির ঠাসবুনোনি হয়নি ওখানটায়। পাথরের টুকরোর ওপর গরম পিচ ঢেলে ঢেলে সবে একটা রাস্তা তৈরি হচ্ছিল আর রাস্তার দু'পাশে চোরকাঁটায় ভরতি মাঠ, তালখেজুরের বাগান, বাসক কি কাঠমালতীর জঙ্গল অথবা বৃষ্টি হলে জল জমে এমন সব ঢালু পড়ো জমির বিস্তীর্ণ ব্যবধান রেখে ফ্যাশনেবল বাড়ি উঠছিল একটি দু'টি।

আমরা ও পাড়ার সব মিলিয়ে এক বয়সের পাঁচটি ছেলে একত্র হয়েছিলাম। একসঙ্গে থাকতাম অষ্টপ্রহর। একসঙ্গে ওঠা একসঙ্গে বসা একসঙ্গে গল্প করা। ইস্কুলে, ইস্কুল থেকে এসে, ছুটির দিন— হায় ছুটির দিন। কখন না ? সেই পাঁচজন। পাড়ার এ মাথা ও মাথায় তো সারা সময় টুঁ-টুঁ মেরেছিই, পাড়া ছেড়ে যখন অন্যত্র গেছি তখনও একজন আর একজনের কাছ-ছাড়া হইনি।

তের থেকে চৌদ্দ বয়স।

পরনে নীল ব্লেজারের প্যান্ট আর হাফ-শার্ট।

রুক্ষ চুল, জুতোহীন পা। আর সবচেয়ে প্রশংসনীয় যেটা, আঙুলে বড় বড় নোখ, হাঁটু অবধি ধুলো। বলতে কি, তৎকালীন বালিগঞ্জী সমাজের আমরাই ছিলাম প্রকৃত আতঙ্ক। বড়দের বুড়োদের গিন্নীদের।

আর সবাই শান্ত হয়ে গিয়েছিল, সুশ্রী সংযত।

সবাই বলত আমাদের জংলী জানোয়ার অশিষ্ট। সেজন্যে বাড়িতে কারো ঠাঁই ছিল না। ঘরে ধুলো আনব, ড্রয়িং-রুম নোংরা করব, বাগানের ফুল ছিঁড়ব, ছাদের কার্নিশ ভাঙব, অথবা সুবিধা পেলে কারো ছাদের জলনামা পাইপের মুখেই হয়ত পাথর গুঁজে দেব। এই ছিল সকলের সন্দেহ ও ভয় আমাদের ওপর। পাড়ার পাঁচটি বখাটে কিশোর-রত্ন,— পিণ্টু, মিণ্টু, গুর্খা, হাবুল ও আমি।

কিন্তু বাড়ি থেকে বাতিল হয়েও পাঁচজনের মনে তিলমাত্র অসুখ ছিল না। শীতের সারা দুপুর হকি-স্টিক পিটিয়েছি, সারাটা বর্ষা মনের আনন্দে ফুটবল খেলেছি, কখনও বা ইঁট ছোড়াছুড়ি। এমনি। খেলার রকমও মাঝে মাঝে বদলাতো। কোনোদিন মাঠে জল জমলে বাজার থেকে কিনে-আনা এবং বাড়ি থেকে চুরি-করে-আনা পোনার বাচ্চা ছেড়ে দিতাম। আর, চেয়ে দেখতাম, কোন্‌টা মরে কোন্‌টা সাঁতার কাটে। পাখির বাচ্চা ধরেছি, গুলতি ছুড়ে কাঠবিড়াল মেরেছি। আমাদের খেলার উপকরণ ও প্রকরণের অভাব ছিল না। নিত্য নতুন।

একটা কিছু নিয়ে সময় কাটানো। খেলার অর্থ। বরং নিত্য নতুন খেলা আবিষ্কার করতে পারলেই যেন সুখী হতাম।

একদিনের নতুন খেলার কথাই বলছি। পাঁচ কিশোর কাপ্তেন কি কাণ্ড বাধিয়েছিলাম।

মনে আছে। চৈত্রের বিকেল। পিন্টুদের বাগানের ওপাশটায় ছাতিম গাছের মাথা ফুলে ফুলে ছেয়ে গেছে। গন্ধে ম' ম' করছে পৃথিবী। মৃদু-মন্দ বাতাস ছিল। আর হাওয়ায় ছিল কোনদিক থেকে উড়ে-আসা সদ্য-ফেটে-পড়া শাদা ঝকঝকে শিমুল তুলোর রাশ। যেন সিল্কের মেঘ উড়ছিল বাতাসে। তার সঙ্গে পাখির কিচিরমিচির, ভল্টুদের সুপুরি বাগান থেকে উঠে-আসা ঝিঁঝির ডাক।

যেন বিলিতি জাজ্ বাদ্য চলছিল বিকেলী বাতাসে। নতুন একটা কিছু খেলার জন্যে আমাদের বুকের ভিতর নাচানাচি করছিল।

পিং-পং ক্যারম লুডো তাস। বা এমনি একটা কিছু ফ্যান্সি খেলা। ওয়ার্ড-মেকিং, বাগাটেলি, ফিগার-ড্রয়িং। যাতে ছোটাছুটি ও দস্যামি নেই। ভাবছিলাম মাঠে জঙ্গলে থেকে তো আর এসব খেলা হয় না, সুতরাং আর কি রংদার মজাদার খেলা আছে যা বাইরে থেকেও খেলা চলে।

হঠাৎ নজরে পড়ল আগুনের মত দগদগে লাল ঝাঁকের পর ঝাঁক ফড়িং উড়ছে মাথার ওপর। শিমূল তুলোর মেঘ ঢাকা পড়ে গেল ফড়িং-এর পাখায়। এত ফড়িং একসঙ্গে আর দেখিনি।

আর, অমনি, ফড়িং ধরার নেশা চেপে বসল পাঁচজনের। আশ্চর্য, এখন ভাবি, কি অদ্ভুত সব খেলায় মেতে যেতাম, যেতে পারতাম তখন।

হ্যাঁ, ঠিক হল শুধু ধরা নয়, বাজি রেখে ফড়িং ধরা হবে, তারপর সেগুলি মারা হবে। কে কত বেশি ফড়িং মারতে পারে তার প্রতিযোগিতা। বুঝুন মজা।

আইডিয়াটা প্রথম এসেছিল গুর্খার মাথায়। রাজী হয়ে গেলাম সব। অবশ্য তখনই জানতাম সবচেয়ে বেশি শিকার করবে গুর্খা।

হ্যাঁ, ও ছিল আমাদের সর্দার।

গুর্খার কথায় তখন আমরা উঠি বসি।

মোটে এক বছরের বড় হয়েও ও গায়ে জোর রাখত চারজনের চেয়ে অনেক বেশি। আর ঢেঙা হয়ে উঠেছিল অসম্ভব। এ-ই লম্বা ছিল হাত পা। বৃষ্টি হলে প্রায়ই আমরা লেংটা হয়ে মাঠের জলে নামতাম। আর গুর্খার শরীরটাকে তখন মনে হত রাঁদা করা তালের গুঁড়ি। ওই বয়সে।

বলত ও, মামাবাবুর কাছে রিং করে। আর একদিন বলেছিল ফি শীতে ও এক ডজন করে কডলিভার অয়েল চালাচ্ছে। কোনটা সত্য তা অবশ্য আজও আমরা জানি না। তবে ওর চিকচিকে কালো রং, ঝকঝকে দাঁত আর লম্বা শরীর আমাদের মুগ্ধ করেছিল।

হ্যাঁ, যা বলছিলাম, ফড়িং ধরার বাজি সুরু হল। দেখতে দেখতে গুর্খা একলা এক হাতে প্রায় সব ফড়িং সাবাড় করে এনেছে। কেউ কাছে ঘেঁসতে পারছি না ; কনুই দিয়ে গুঁতো মেরে মেরে ও আমাদের সরিয়ে দিচ্ছে আর ছোঁ মেরে সকলের মাথার ওপরের শিকার কেড়ে নিচ্ছে। এক দমে গুর্খা ধরল একশো একান্নটা. আর আমরা কেউ ত্রিশ কেউ বত্রিশ।

এমন সময় দেখি গুর্খার মাথার ওপর থেকে ছোঁ মেরে একসঙ্গে পাঁচটা ফড়িং নিয়ে

গেল একখানা হাত। ফর্সা হাতটাকে সোনালী বর্শার মত মনে হলেও মূর্তি দেখে আমাদের মেজাজ টং।

কতক্ষণ চোখ ফেরাতে পারিনি।

ঘাড়ের নিচেটা ছেলেদের মাথার মতন চাঁছা, আবার চুলে এত বড় একটা গোলাপী রিবন। গায়ে আঁট গেঞ্জি অথচ ঊরুর কাছে লাল শাটিনের কুঁচি হিল্‌হিল করছে। পায়ে মোজা এবং ছেলেদের জুতোর মতন মোটা মাথাওলা ফ্ল্যাট সু।

কি বলব, কি বলার ছিল।

এত বড় মেয়েকে ওই পোষাকে ছেলেদের সামনে আসতে, কেবল আসা নয়, থাবা মেরে ছেলেদের শিকার কেড়ে নিতে আর কোনোদিন দেখিনি।

গরম হয়ে গিয়েছিল বেশি গুর্খা। চেহারা দেখেই অনুমান করলাম। ভয় হচ্ছিল, গোঁয়ার বলে। ওর এমনি একটু বদনাম আছে। ধাঁ করে না চড়টড় বসিয়ে দেয়। তা অবশ্য আর হল না। আমাদের বয়সের মেয়ে বলেই যেন প্রথমটায় ও চুপ করে রইল, দাঁতে দাঁত চেপে। বুঝলাম, প্রাথমিক রাগটা গুর্খা কোনোমতে দমন করল।

মেয়ের পা থেকে মাথা দুবার চোখ বুলিয়ে সে আমাদের দিকে তাকাল, অর্থাৎ কিংকর্তব্য।

আমাদের বলবার কিছু ছিল না।

আমরা শাগরেদ। যা করার তুমিই কর। তোমার হাতে ছেড়ে দিলাম মামলা। যেন এই মনের ভাব নিয়ে চারজন চুপ করে মেয়েটাকে ভালো করে দেখা শেষ করার পর ফের গুর্খাকে দেখলাম। আমরা পরতুম নীল ব্লেজারের প্যাণ্টের ওপর সাদা হাফ-শার্ট আর ওর ছিল সাদা প্যাণ্ট,— না শার্ট নয়, লাল ও বেগনী রঙে মেশানো জাফরি-কাটা টেনিস-গেঞ্জি। ওর মামাবাবু দিয়েছিল।

হঠাৎ শুনলাম গুর্খা প্রশ্ন করছে, 'তোমার নাম কি ?'

'মোনা।' চকচকে চোখে মেয়ে গুর্খাকে নিরীক্ষণ করছে।

তারপরই শুনলাম গুর্খার মিলিটারি নিনাদ। 'তুমি সরে যাও। ছেলেদের খেলায় কোনো মেয়ের আসা আমরা পছন্দ করি না।'

বলে গুর্খা আমাদের মুখের দিকে তাকিয়েছিল।

চারজন সমর্থনসূচক মাথা নাড়লাম।

বস্তুত কোনো মেয়েকে নিয়ে আমরা এর আগে খেলিওনি। কটা ব' বাড়ি। ঐ বয়সের কোনো মেয়ে আছে বলে জানতুম না। এবং গুর্খার চাউনি ও হুঙ্কারে শ্রীমতীর চেহারায় কোনো ভয়ডরের চিহ্নও দেখলাম না। বরং যেন একটু বেশি টান হয়ে দাঁড়ালো গুর্খার সামনে। বাঁ হাতের একটা সুস্পষ্ট আঙুলে ফ্রকের কুঁচিটা নাড়াচাড়া করছিল।

'আমাদের বাড়ির সামনের ফড়িং আমিই ধরবই।' যেন বিনা কায়ক্লেশে, দিব্যি চোখ বুজে, রূপালী ঝিনুকের মত থুঁতনিটা আকাশের দিকে তুলে ধরে মোনা-নাম্নী মহিলা বলল, 'তাতে তোমাদের কি।

মহিলা শব্দটা প্রয়োগ করলাম আমাদের বয়সী মেয়ে বলে। অন্তত আমরা ওকে সেই চোখেই দেখতাম। চার শাগরেদ।

কিন্তু গুর্খা ঠিক গরম হয়ে গেছে। তেরছা কথা সে কোনোদিনই বরদাস্ত করত না।

'বেশ, গায়ে জোর থাকে নিয়ে যাও।' গুর্খা হেঁকে উঠল। একবার আমাদের দিকেও তাকাল।

'এসো না।' বেশ চিবুক নেড়েই মোনা ডাকল সর্দারকে। গা কাঁটা দিয়ে উঠল।

লাল তিনটে ফড়িং ফর্‌র্‌ শব্দ করে দু'জনের মাথার ওপরে উড়ছিল।

অল্প অল্প বাতাসে মেয়েলী চুলের গন্ধ এসে ঢুকছিল নাকে। আমরা চুপ করে দেখছিলাম।

তবে এটা ঠিক, অই বয়সে গুর্খার উরু দু'টো যদি ছিল রাঁদা করা তালের গুঁড়ির মত সুডোল শক্ত, অই বয়সের মেয়ের উরু দু'টোও কম যাচ্ছিল কি। যেন দেখছিলাম সোনালী দু'টো থাম। অল্প সরু হয়ে নিচের দিকে নেমে এসেছে।

এখানেও মাংসের ঠাসবুনোনি। তবে মসৃণতা বেশি। বেশি ঝকঝকে। সোনালী থামের মাথায় লাল ফ্রকের কুঁচিটা সাপের গায়ের মতন কিলবিল করছিল। হিলহিল করছিল গুর্খার ভাষায়, কেননা পরবর্তী জীবনেও যখন ও মোনার গল্প করত তখন ঐ শব্দটাই ব্যবহার করত বারবার।

এবং মেয়ের শরীর দেখে আমাদের মনে হয়েছিল যেন রিং-করা কি কডলিভার-খাওয়া তেজী শরীর। টন্‌কো। মাজাঘষা। তা হলেও সমান বয়সী ছেলেদের বিক্রমই গুর্খা সহ্য করেনি, আর এ তো মেয়ে।

এর পর গুর্খা কি বলে নিশ্বাস বন্ধ করে শুনবার জন্যে অপেক্ষা করছিলাম।

'বেশ, বাজি রেখেই ফড়িং ধরা হোক। কার গায়ে কত জোর আছে দেখা যাবে। বলল গুর্খা।

'আমি রাজী।' মেয়ে উত্তর করল।

'জুতো মোজা খুলে ফেল, আর ওটা।' নিচের পাতলা শাটিনের দিকে চোখ ছিল গুর্খার।

মেয়েটা একটু হাসল ও কথায়। 'পুরুষের সামনে আমি খালি-গা হব নাকি।'

গায়ের জামা না খুলে ও জুতো মোজা খুলল। আমাদের রাগও হচ্ছিল হাসিও পাচ্ছিল। অথচ পুরুষের সঙ্গে লড়বার শখ, যেন মনে-মনে বললাম চারজন।

গুর্খা বকের মত গম্ভীর। বুঝলাম ও শুধু অপেক্ষা করছিল কখন খেলা সুরু হয়। একটা চাপা নিঃশ্বাস ফেলতে শুনলাম ওকে।

আরম্ভ হল লাফালাফি।

প্রথমবার গুর্খা ধরল পাঁচটা ফড়িং, মোনা পাঁচটা। সমান সমান। মোনা হাসল, গুর্খা গম্ভীর।

চোরকাঁটার বিছানায় আধমরা ফড়িংগুলো ছুড়ে ফেলে দিয়ে দু'জন আবার তৈরি হল।

কুরচি ফুলের গন্ধ, চুলের গন্ধ, ঝিঁঝির ডাক এবং পাখির অশ্রান্ত কিচিরমিচির সত্ত্বেও আমাদের বুকের ভিতর বেশ ঢিবঢিব করছিল। পশ্চিম আকাশে একখণ্ড লাল মেঘ।

কেননা আমরা জানতাম গুর্খাকে, ওর স্বভাব।

হলও তাই।

ছুটে গিয়ে হাত বাড়িয়ে মোনা গুর্খার মাথার কাছাকাছি একটা শিকার ধরতে গিয়েছিল। গুর্খা মারল মেয়ের পাঁজরে কনুইয়ের গুঁতো। মেয়ে মারল ওর মাথায় চাঁটি। গুর্খা সাপটে ধরল ওর চুল। মোনা টেনে ধরল টেনিস-গেঞ্জির কলার। আকাশের ফড়িং আকাশে রেখে জাপটাজাপটি করে দু'জন পড়ে গেল মাটিতে।

আমরা চারজন নিষ্পলক নিস্পন্দ।

বাধা দিইনি। কেননা কারো বাধা গুর্খা তখন শুনত না। উচিত ছিল মোনায় ছেড়ে

দেওয়া। শত হলেও তুমি মেয়ে।

কিন্তু নিমিষের মধ্যে চোখ চড়কগাছ হয়ে গেল আমাদের সকলের। গুর্খা নিচে পড়ে গেছে।

ভাবতে পারিনি, যেন চোখকে বিশ্বাস করা কঠিন হল। উজ্জ্বল সোনার রঙের উরু দিয়ে চেপে ধরেছে মেয়ে গুর্খার মিশমিশে কালো শরীর। যেন কুঁকড়ে যাচ্ছে গুর্খা।

ভয়ের মাত্রা আমাদের বেড়ে গেল তখন। বেকায়দায় পড়লে গুর্খা কি সাংঘাতিক হয়ে ওঠে, ভালো করে মনে পড়ল। ওর বাঘা নখের আঁচড় ও রাক্ষুসে দাঁতের কামড় খেয়েই চার সাঙাত বড় হয়ে উঠছিলাম।

জোরে চিৎকার করে মোনা দূরে ছিটকে পড়ল আর ধুলো ঝেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে গুর্খা কুকুরের মত ধুঁকতে লাগল। জ্বলন্ত দৃষ্টি।

মোনার উরুর পুরু মাংসে জোরে নখ বসিয়ে দিয়েছে সে। দিয়ে দেখছে।

মেয়ের চিৎকার শুনে পাশের একটা নতুন হলদে বাড়ির ভিতর থেকে যিনি ছুটে বেরিয়ে এলেন, বুঝলাম, মোনার মা। তাঁর উঁচু ফর্সা সুন্দর শরীরই আমাদের বলে দিল।

হ্যাঁ, ভালো কথা, সেদিন খেলতে খেলতে কি করে যে নতুন বাড়িটার কাছাকাছি এসে গেছলাম খেয়াল ছিল না। তখন খেয়াল হল। আর নতুন করে ভয় ঢুকল চারজন কেন, পাঁচজনের মনেই। গুর্খার চেহারায়ও একটু ভয় ঝুলছিল।

আ! কে বিশ্বাস করে আজ আমাদের কথায়।

সত্যি ভালো ছিলেন মহিলা। অত্যন্ত ভদ্র ও শান্ত।

আমরা আশাই করতে পারিনি, মেয়ের অবস্থা দেখে রাগ না করে তিনি হাসবেন। সত্যি সুন্দর করে হেসে মহিলা বললেন,— 'কি হয়েছে ?' মেয়েকে প্রশ্ন করার পর তিনি আমাদের দিকে তাকালেন।

'তোমরা এই পাড়ার ছেলে ?'

আমরা ঘাড় নাড়লাম।

'তোমার নাম কি ?'

সকলের আগে সর্দারের দিকে চোখ পড়েছিল মহিলার।

চোখ তুলে নরম গলায় গুর্খা বলল, 'গুর্খা।'

'চমৎকার নাম।' মোনার মা মুখ ফিরিয়ে মেয়েকে বলল, 'নাও, ওঠ, আর কাঁদে না। খেলতে গেলে এমন এক আধটু লাগেই।' মোনা মাটিতে বসে একটু একটু কাঁদছিল।

'হ্যাঁ, খেলোয়াড়ের মন নিয়ে খেলতে হয়।' বললে গুর্খা। রীতিমত হাসিহাসি মুখ হয়ে গেছে তার তখন। আমরা চুপ। গুর্খা সাহসী ছিল বলতে হয়।

'রিং-করা শরীর ?' ফের প্রশ্ন করেন মহিলা।

বড় বড় দাঁতে হেসে গুর্খা মাথা নাড়ে।

'আর ওকে রিং ডাম্বেল দুটো করিয়েও তেমন শরীর তৈরি করতে পারলাম না', মেয়ের দিকে চেয়ে মা বিষণ্ণ নিশ্বাস ফেললেন।

আমরা চুপ। মোনা ইতিমধ্যে উঠে দাঁড়িয়েছে। যেন কি ভেবে মুখ নিচু করে গুর্খা টিপিটিপি হাসছে।

হ্যাঁ, চৈত্রের সেই মাজাঘষা বিকেল, মৃদুমন্দ হাওয়া ছাড়ছে, রোদের হলুদ রং মজে গিয়ে কমলা রং ধরেছে, শিমূল তুলোর রাশ আর রক্তবর্ণ ফড়িঙের শবশয্যা ছেড়ে আমরা খেলোয়াড়ের দল চলে আসতুম। তিনি আটকালেন। 'এসো, চা খেয়ে যাও।'

শুনে খুশিতে সব বোকা হয়ে গিয়েছিলাম। আমাদের মত ডানপিটে মাথাভাঙা বাউণ্ডুলে ছেলেদের সেদিন এক মহিলা তাঁর বাড়িতে চায়ের নিমন্ত্রণ করছেন, যেন বিশ্বাস করাই কঠিন ছিল। সত্যি কতকাল আমরা কারো বাড়ির অন্তঃপুর দেখিনি।

গুর্খার হাত ধরে মহিলা আগে আগে হাঁটেন, পাশে মোনা। আমরা চার শাগরেদ পিছনে।

বলতে কি, মেয়ের শরীরের তুলনায় মার শরীর যে কত বেশি সুন্দর উজ্জ্বল সুপরিস্ফুট, পিছন থেকে চারজন মনে মনে তাই আবার আলোচনা করলাম। শ্বেতপাথরের মতো সাদা ধবধবে রং। ঘাড় বেয়ে পা অবধি ঝুলছিল মনোরম ভায়লেট ক্রেপ্। ময়ূরপেখম রঙের ব্লাউস গায়ে। অগাধ বিস্তৃত বেণী। ওখানে রিবন এখানে ফুল।

মেয়ের চেয়ে অনেক বলশালিনী তো নিশ্চয়ই, দীপ্তিশালিনীও মা। আমরা মনে মনে স্বীকার করলাম।

আর তিনি, হাঁটতে হাঁটতে শুনলাম, আবার প্রশংসা করছিলেন গুর্খার শরীরের। এই বয়সে ওর কব্জি কেমন পুরু হয়েছে, কত চওড়া হয়েছে বুক। যেন মেয়েকে বোঝাচ্ছিলেন। 'সমান বয়সের একটি ছেলে ও একটি মেয়ের শরীরের অইখানেই তফাৎ।' মেয়ে মাথা তুলছিল না।

বাড়িতে ঢুকবার পর, মার প্রস্তাব শুনে কিন্তু আমরা ঘাবড়ে গেলাম। অবশ্য দেখলাম, গুর্খা অবিচল অকুতোভয়। মহিলা হাসতে হাসতে কথাটা তুললেন।

'ওখানে বাজি রেখে মোনা আর তুমি ফড়িং ধরেছিলে। এসো, এখানে আমি আর তুমি বাজি রেখে প্রজাপতি ধরি। রাজী ?'

গুর্খা হেসে দিব্যি ঘাড় নাড়ল।

আমাদের বুকের ভিতর ঢিবঢিব করে উঠল।

মহিলা খেলাচ্ছলেই বলছিলেন যদিও।

তাঁর বাগানে জাফরির গায়ে ফুলের চেয়েও প্রজাপতির সংখ্যা ছিল বেশি। ডিমের মতো গোল আইভি পাতার ওপর চুপচাপ বসেছিল হাতের তেলোর মতো বড়, ছড়ানো, দীর্ঘপক্ষ হলুদ রঙের রাশি রাশি প্রজাপতি। চোখ জুড়িয়ে গেল।

আর এদিকে চক্ষুস্থির, গুর্খার কাণ্ড দেখে।

মোনার মা শাড়ির ঝুলন্ত আঁচল কোমরে নামান। বেণী দুটোকে ইংরেজী আটের মতন করে তুলে দেন মাথার ওপর। ইয়ারিং-সহ কান দুটোকে শ্বেতপাথরের পাপড়ির মত দেখাচ্ছিল। কি আলাদা দুটো প্রজাপতি। শ্বেতপাথরের গাছের গায়ে যেন লেগে আছে।

খুব ছোট দেখাচ্ছিল গুর্খাকে মোনার মার সামনে। তার ওপরে ওর রং বেজায় কালো। মনে হচ্ছিল ওকে বন্দুকের কুঁদা, ছুরির বাঁট, কি বুরুশের হাতল একটা। শক্ত ক্ষুদে কাঠের জিনিস। দাঁড়িয়ে আছে সুন্দর বিস্ফারিত শরীরের সামনে।

তার ওপর হাঁটু অবধি ধুলো লেগে ছিল গুর্খার। নোংরা বেশভূষা খাড়াখাড়া চুল।

আমাদের কেমন লজ্জা করছিল, সঙ্কোচ। কিন্তু গুর্খার তো আর সেসব বালাই ছিল না। বড় বড় দাঁত পুরো চামড়ার মধ্যে ঢুকিয়ে হাসি বন্ধ করে গম্ভীর গলায় বলল, 'ওটা খুলে ফেলুন।'

অর্থাৎ মহিলার ময়ূরপেখম রঙের জামাটি।

হাসতে হাসতে তিনি তা-ও খুললেন।

সাদা বডিজে-ঘেরা খোলা গা সোনার হারে চিকচিক করছিল।

'নিয়মকানুনগুলো তুমি এর মধ্যেই শিখে ফেলেছ?' মা একবার মেয়ের দিকে এবং পরে আমাদের দিকে চেয়ে হাসলেন।

গুর্খা গম্ভীর। মহিলা তাই চুপ করে গেলেন।

'রেডি।' গুর্খা জোর গলায় হাঁকল।

এখনই লাফ সুরু হবে। সত্যিকারের একটা বাজির আবহাওয়া থমথম করছিল যেন। না, বাগানের ফুল ছেঁড়া বা বেড়া ভাঙা নয়, আমাদের বুক কাঁপছিল গুর্খার চরিত্রের কথা ভেবে। সত্যি না ও আবার মার সঙ্গেই ধস্তাধস্তি সুরু করে দেয়। এতবড় মহিলা।

খেলা আরম্ভ হল। একবার দু'বার। যেন ইচ্ছে করে মোনার মা সব প্রজাপতি গুর্খাকে ধরতে দিচ্ছেন, হয়ত বাগানসুদ্ধ প্রজাপতি তিনি ওকে দিয়ে দিতেন। খেলাচ্ছলেই এমন করছিলেন তিনি।

বললাম তো গুর্খার স্বভাব।

মহিলা একটু কাছে ঘেঁসেছিলেন। কনুইয়ের গুঁতো নয় এবার, বেমক্কা একটা ঠ্যাং গলিয়ে দিলে গুর্খা মার দুই পায়ের মাঝখানে আর ধুপ করে তিনি পড়ে গেলেন লতা-ঝোপের ওপর। আকাশ ছেয়ে গেছে প্রজাপতির হলদে পাখায়।

আমরা নিথর নিস্পন্দ। মোনার দুই চোখ বড় হয়ে গেছিল। আর চোখের নিমেষে গুর্খা যা করবার তাই করল। যন্ত্রণায় মহিলা একবার আঃ করে উঠেও থেমে যান।

গুর্খা উঠে দাঁড়াবার পর তিনি উঠে দাঁড়িয়ে কাপড় সামলান, চুল ঠিক করেন। হেঁচকা টান মেরে গুর্খা তাঁর বেণীসুদ্ধ খুলে ফেলেছিল। কেবল কি তাই, কানের পিছনে ঘাড়ে গুর্খার রাক্ষুসে দাঁতের কামড় আমাদের চোখ এড়াল না। রক্ত এসে গেছে।

'এসো, তোমরা চা খেয়ে যাও।' তারপরও সুন্দর হেসে মহিলা বলেছিলেন, 'খেলতে গেলে অমন এক আধটু লাগেই।'

আমরা চা খাব কি।

সর্দারি গুর্খা, যেন ভয়ঙ্কর অন্যায় করেছে, ভয় পেয়ে তাড়াতাড়ি গেট পার হয়ে বেরিয়ে এল, সঙ্গে সঙ্গে আমরা। অবশ্য বাইরে অন্ধকারে এসে গুর্খা আমাদের কানে কানে বলছিল, 'আসল খেলোয়াড়ের মন ওঁর।'

আমরা কোনো কথা বলিনি।

বলতে কি, সেদিন থেকে, তারপর থেকে এ ধরনের খেলাই যেন আমরা মনে মনে খুঁজতুম। এমন সুন্দর হাস্যরসিকা মহিলার দেখা আর একটিও পাইনি। ক'টাই বা বাড়ি ছিল তখন ও'পাড়ায়।

নদুস্কোপ

রূপক সাহা

রেড রোডের মাঝামাঝি এসে গাড়িটা হঠাৎ দাঁড়িয়ে গেল। আর তারপরই ড্রাইভার বাঁকেলাল আঁতকে উঠে বলল, "সর্বনাশ, পেট্রল শেষ।"

বিরক্তি চেপে রেখে বললাম, "এখন কী হবে? গাড়ি নিয়ে বেরোবার সময় একবার দেখে নিতে পারলে না, পেট্রল আছে কি নেই?"

দরজা খুলে বেরোতে-বেরোতে বাঁকেলাল বলল, "দেখে নিলেই ভাল হত। অফিস গিয়ে পেট্রল নিয়ে আসা ছাড়া আর কোনও উপায় নেই।"

হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি, রাত তিনটে। নাইট ডিউটি করে বাড়ি ফিরছি। যাব বেহালা। তার মাঝে এই বিপত্তি। বাঁকেলাল অফিস ফিরে যেতে চাইছে। প্রায় দেড় কিলোমিটার পথ। হেঁটে গিয়ে ফিরে আসতে-আসতে লাগবে প্রায় আধ ঘণ্টা। গাড়িতে আরোহী বলতে শুধু আমি। বাঁকেলালের অফিসে যাওয়ার অর্থ, গড়ের মাঠে এই নির্জন রাস্তায় গাড়ি পাহারা দেওয়ার জন্য একা আমাকেই দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। বিশ্রী ব্যাপার। ময়দানের এই অঞ্চলটা সুবিধের নয়। ছিনতাইবাজরা তো আছেই, তার ওপর ট্যাক্সি-ভূত আর স্টোনম্যানের ভয়। একমাত্র আশা, কোনও গাড়িতে যদি অফিস পর্যন্ত লিফট পাওয়া যায়। এত রাতে কোনও গাড়ির দেখা মেলাও ভাগ্যের ব্যাপার।

কী করব ভাবছি, হঠাৎ ফোর্ট উইলিয়ামের আইল্যান্ড থেকে দুটো জোরালো হেড লাইট এগিয়ে এল। মনে হল পুলিশের গাড়ি। বাঁকেলাল চট করে রাস্তা পেরিয়ে ওদিকে চলে গেল। তারপর হাত নাড়িয়ে ভ্যানটাকে থামালও। উলটো দিক থেকে টুকরো-টুকরো কথা কানে আসছিল। এঞ্জিনের শব্দে ভাল করে তা শুনতে পাচ্ছিলাম না। সত্যি বলতে কি, বাঁকেলালের ওপর আমার তখন বেশ রাগই হচ্ছিল। এমন বিপদে ফেলার কোনও মানে হয়! সকাল হতে ঘণ্টা আড়াই দেরি। অফিসেই ফিরে যাব কি না তখন ভাবছি।

রাস্তার এদিক থেকে আমি কিছু বলার আগেই, ওদিক থেকে চিৎকার করে বাঁকেলাল বলল, "অফিসে যাচ্ছি। মিনিট পনেরো গাড়ির ভিতর থাকুন। দরজাটা কিন্তু লক করে দেবেন।"

কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই পুলিশের গাড়িটা মিলিয়ে গেল। সেদিকে তাকিয়ে থাকতে-থাকতেই টের পেলাম, রেড রোডটা কত বড়। সকাল-বিকেল কতবার এই রাস্তাটার ওপর দিয়ে গেছি। এর মসৃণতা নিয়ে মনে-মনে প্রশংসাও করেছি। কলকাতায় এত সুন্দর রাস্তা আর কোথাও নেই। দু'পাশে হলুদ রঙের রেলিং। বাহারি গাছ, স্ট্যাচু। ভিক্টোরিয়ার বাগান বাদে ময়দানের সব থেকে ভাল জায়গা এটা।

কিন্তু ওই গভীর রাতে ওখানে দাঁড়িয়ে থাকতে-থাকতে আ-ার বেশ ভয়-ভয়ই করতে লাগল। এত সোজা আর ঘন কালো, মনে হল গিলে খেতে আসছে। গাড়ির ভিতর বসে থাকাই ভাল, এই কথা ভেবে দরজার হাতলে যেই হাত দিয়েছি, এমন সময় দক্ষিণ-পশ্চিম দিকটায় চোখ গেল। হালকা সবুজ আর নীল আলোয় ওই জায়গাটা যেন ছেয়ে আছে। চাঁদের আলোর মতো মোলায়েম নয়। একটু অন্য ধরনের। এত রাতে, ইস্টবেঙ্গল মাঠ আর ফোর্ট উইলিয়ামের মাঝে ওইরকম একটা রহস্যময় আলো দেখে, সত্যি বলতে কী একটু অবাকই হলাম।

গা-ছমছম করে উঠল। দরজাটা খুলতে যাব, ঠিক সেই সময় শুনলাম মিহি গলায় একজন অন্যজনকে বলছেন, 'নদুবাবু এই লোকটার কথাই বলেছিল। ময়দানে রোজ দেখি। খবরের কাগজে লেখে।"

চমকে উঠে দেখি, আশপাশে কেউ নেই। তবে কি আমার মনের ভুল ? হতে পারে। হঠাৎ একটু ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা লাগছে। গাড়ির ভেতরে ব্যাগে মাফলার রাখা ছিল। বের করে গলায় জড়িয়ে নিলাম। মনে-মনে ঠিক করলাম নাইট ডিউটি থাকলে এর পর থেকে আর বাড়ি ফিরছি না। দু-তিনটে ঘণ্টার তো ব্যাপার। অফিসেই কাটিয়ে দেব।

হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলাম, মিনিট দুয়েকও কাটেনি। বাঁকেলালের ফিরতে অনেক দেরি। নির্জনতা অনেক সময় মানুষকে দুর্বল করে দেয়। আমিও কেমন যেন আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলতে লাগলাম। বাঁ দিকে বি এন আর ক্লাবের তাঁবু। লনে কয়েকটা চেয়ারও রয়েছে। সন্ধেবেলায় ওখানে জমাটি আড্ডা বসে। বলরাম, অরুণ ঘোষ— আরও অনেকে আসেন। ইন্টারভিউ নিতে বেশ কয়েকবার ওই আড্ডায় আমিও গেছি। একবার মনে হল, পাঁচিল টপকে ওই তাঁবুতে চলে যাই। দাঁড়িয়ে থাকার চেয়ে অন্তত নিরাপদ। কিন্তু মালিরা আমাকে চেনে না। এত রাতে একজন অজানা লোকের জন্য ওরা ঘুম ছেড়ে উঠবেই বা কেন ?

এইসব সাত-পাঁচ ভাবছি, এমন সময় ঝুপ করে চারদিক অন্ধকার হয়ে গেল। রেড রোডের সব আলো একসঙ্গে নিভে গেল। আর সেই ঘন অন্ধকারের মাঝে টের পেলাম, খুব কাছেই কারা যেন দাঁড়িয়ে আছেন। গা-টা শিরশির করে উঠল। গাড়ির পিছনের দরজার হ্যান্ডেলটা শক্ত করে চেপে ধরলাম। কানের কাছে একজন ফিসফিস করে বললেন, "আপনি কি রিপোর্টার ?"

আতঙ্কে গলা দিয়ে কোনও স্বর বেরোল না। বুকে প্রচণ্ড ধুকপুকুনি, পা দুটো অবশ। আবার ফিসফিসানি, "অনেকক্ষণ আপনার জন্য দাঁড়িয়ে আছি। নদুবাবু আপনাকে নিয়ে যেতে বলেছেন।" কথা শেষ হতে-না-হতেই কে একজন আমার মাথায় বড়সড় হেড ফোন জাতীয় একটা জিনিস বসিয়ে দিল। তারপর আর কিচ্ছু মনে নেই।

আবার চোখ খুলেই দেখি, অন্য পরিবেশ। সামনে একটা ফুটবল মাঠ। চারপাশে কয়েক ধাপ কাঠের গ্যালারি। তিলধারণের স্থান নেই। ফিকে নীল আর সবুজ আলোয় রহস্যময় পরিবেশ। মাথার ওপর মেঘহীন আকাশ। তারাগুলো ঝকমক করছে। পুব দিকে, বেশ দূরে একটা গম্বুজ। আবছা আলো সত্ত্বেও যেন মনে হল, অক্টারলোনি মনুমেন্ট। কোথায় বসে আছি, আন্দাজ করতে লাগলাম। ময়দানে খুব চেনা জায়গায়, অথচ অচেনা। পুব দিকের, গ্যালারির পিছনে রাস্তায় গ্যাস বাতি। টিমটিম করে জ্বলছে। রেড রোড ? হতে পারে। দু-একবার শেয়ালের ডাকও শুনতে পেলাম। পশ্চিম দিক থেকে ঠাণ্ডা বাতাসের ঝলক গায়ে লাগল।

ওই রহস্য-মাখানো পরিবেশে বসে থাকতে-থাকতে ইন্দ্রিয়গুলিকে একটু সজাগ করছি। গ্যালারিতে এত লোক, অথচ কোনও শব্দ নেই। হয় আমি কাচের বদ্ধ ঘরে বসে আছি, না হয় তো কেউ জাদুবলে সাউন্ড সিস্টেম অকেজো করে রেখেছে। গ্যালারিতে সামান্য অস্থিরতাও লক্ষ করছি। কোনও ম্যাচ শুরু হওয়ার আগে যেমনটি হয়, সেইরকম। দর্শকরা সাগ্রহে কিছু একটা দেখার জন্য অপেক্ষা করে রয়েছেন। ...কারও মুখ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি না। অথচ তাঁরা যে উপস্থিত আছেন, তা বুঝতে পারছি। মনে হল, আমি কি তা হলে স্বপ্নের ঘোরে রয়েছি ?

ঠিক এই সময় মিহি গলায় একজন বললেন, "নমস্কার, আপনি আসায় আমরা অত্যন্ত খুশি। আমিই নদু মিত্তির। মোহনবাগান ক্লাবে আছি।"

চমকে উঠে বাঁ পাশে তাকিয়ে দেখি, ধুতি-পাঞ্জাবি-পরা এক ভদ্রলোক বসে আছেন। মোটাসোটা চেহারা। আতরের সৌরভ ছড়িয়ে কখন যেন হাজির হয়েছেন। আঙুলে সাত-আটটা মূল্যবান আংটিও চোখ পড়ল। কে এই নদুবাবু ?

আমাকে চমকে উঠতে দেখে ভদ্রলোক হেসে ফেললেন। মনে হল, মজাও পেয়েছেন। বললেন, "অবাক হবেন না। বিশেষ উদ্দেশ্যেই আজ আমরা আপনাকে নিয়ে এসেছি। কিছুদিন আগে খবরের কাগজে আপনি একটা প্রবন্ধ লিখেছিলেন, 'বাষট্টির জাকর্তা এশিয়ান গেমসে আমাদের টিমই, ভারতের সর্বকালের সেরা ফুটবল টিম।' এই মন্তব্যটাতে আমরা খুবই বিচলিত হয়ে উঠেছি।"

মিটিমিটি হাসছেন নদুবাবু। বললেন, "ব্রিটিশ যুগের কিছু টিমের খেলা দেখার সৌভাগ্য আপনাদের হয়নি। সেজন্যই বোধ হয় ওই মন্তব্যটা করেছেন। বাষট্টির চুনী-বলরাম-পি· কে·'র দলটাকে যখন-তখন তিন-চার গোলে হারিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা রাখত ব্রিটিশ যুগের দু-তিনটি দল। দুর্ভাগ্য, ওঁরা তেমন প্রচার সে-সময় পাননি।"

হাঁ করে ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে রইলাম। উনি বলছেন কী ! আস্তে-আস্তে যেন বাস্তবে ফিরে আসছি। ফুটবল আমার খুবই প্রিয় বিষয়। ঘণ্টার পর ঘণ্টা তর্ক করতে ভালবাসি। স্বাধীনতার আগের যুগ আর পরের যুগের ফুটবল নিয়ে এই সন্ধেবেলাতেও কয়েকজনের সঙ্গে তুমুল বাকবিতণ্ডা করেছি। আমার ব্যক্তিগত ধারণা, ব্রিটিশ যুগে ভারতীয় দলগুলি এলেবেলে ফুটবল খেলত। না ছিল কোনও কোচ, না ছিল বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি। নদুবাবু না কে, এই লোকটা ফালতু কথা বললে মানব কেন ?

কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলাম, তার আগেই নদুবাবু শুরু করলেন, "কলকাতার ফুটবলের সঙ্গে বহুদিন জড়িয়ে আছি। কোনটা ভাল, কোনটা মন্দ টিম— আমরাই তা বলতে পারি। আমাদের মতে, উনিশশো এগারোর শিল্ড-জয়ী মোহনবাগান টিম অথবা তিরিশ দশকের শেষ দিকের মহমেডান টিম— ভারতের সর্বকালের সেরা।"

আর চুপ করে থাকা যায় না। বলে ফেললাম, "বাহাত্তরের ইস্টবেঙ্গল টিম আর আটাত্তরের মোহনবাগান তা হলে কিছুই না ?"

নদুবাবু কিন্তু এ-কথা শুনে একটুও উত্তেজিত হলেন না। বললেন, "আমার তো মনে হয় কিছুই না। এই দুটো টিম কমপক্ষে চার গোল করে খেত। যদি এগারোর শিল্ড-জয়ী মোহনবাগান অথবা তিরিশের দশকের মহমেডান স্পোর্টিংয়ের বিরুদ্ধে খেলত। বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি। ওই ম্যাচ যদি নিজের চোখে দেখতে চান, তা হলে সে-ব্যবস্থাও করতে পারি।"

কথাটা ঠিক বুঝতে পারলাম না। ভদ্রলোক একটু অদ্ভুত ধরনের বটে, কিন্তু যা

বলছেন, এমন আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলছেন যে, থামিয়ে দেওয়াও যাচ্ছে না। নদুবাবু আরও বললেন, "আজ আপনাকে এখানে আনার উদ্দেশ্যটা তা হলে বলেই ফেলি। শিল্ড-জয়ী মোহনবাগানের সেই দলটার সঙ্গে আজ আমরা আটত্রিশের লিগ-জয়ী মহমেডান স্পোর্টিংয়ের ম্যাচ খেলাচ্ছি। এই খেলাতেই ঠিক হয়ে যাবে— ভারতের সর্বকালের সেরা কোন টিম ?"

শুনে আমার হাসি পেয়ে যাচ্ছিল। ভদ্রলোক বলছেনটা কী! উনিশশো এগারো সালের টিমের সঙ্গে আটত্রিশ সালের একটা টিমের ম্যাচ ? কীভাবে সম্ভব ? কোনও সন্দেহ নেই, দুটো দলই দুর্দান্ত। মোহনবাগান প্রথম শিল্ড জিতেছিল ব্রিটিশ টিমদের হারিয়ে। সেকালে যা ভাবাই যেত না। ভারতের খেলার ইতিহাসে ওই জয় একটা বিরাট মাইল-স্টোন। অন্যদিকে চৌত্রিশ থেকে আটত্রিশ— এই পাঁচ বছর টানা কলকাতার লিগ-চ্যাম্পিয়ান হয়েছিল মহমেডান দল। সে-সময় এই সাফল্য কোনও ব্রিটিশ দলেরও ছিল না। মহমেডানের এই কৃতিত্ব ছাপিয়ে যায় ইস্টবেঙ্গল। সত্তর দশকে। অর্থাৎ কি না তিরিশটা বছর মহমেডানের রেকর্ড অটুট ছিল।

তা নয় হল। কিন্তু নদুবাবুর এই ম্যাচ কী করে সম্ভব! মোহনবাগানের শিল্ড-জয়ী টিমে এমন অন্তত পাঁচজন প্লেয়ার ছিলেন, যাঁদের বয়স তিরিশের বেশি। সাতাশ বছর পর— আটত্রিশে, তাঁদের বয়স ষাটের কাছাকাছি। কী করে তাঁরা শ্রেষ্ঠত্বের পরীক্ষা দেবেন মহমেডানের যুবকদের সঙ্গে!

নদুবাবু বোধ হয় আমার মনের কথাটা বুঝতে পারলেন। তাই বললেন, "দুই টিমের প্লেয়ারদের বয়সের কথা ভাবছেন বুঝি। ভাবনাটা অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু বিজ্ঞানের যুগে এখন অনেক কিছুই সম্ভব। এই তো কিছুদিন আগে, ব্রাজিলে এমন একটা ম্যাচ হয়ে গেছে। ওদের বাষট্টির জুলে রিমে কাপ-জয়ী টিমের সঙ্গে সত্তরের টিমের। পেলে দুটো টিমের হয়েই খেললেন। এক-একটা হাফে। খেলাটা শেষ পর্যন্ত ১—১, ড্র থেকে গেল। একটা গোল পেলে-র। অন্যটা গ্যারিঞ্চার। এইরকম ম্যাচ বা লড়াই সারা বিশ্বে এখন আকছার হচ্ছে।"

আমার চোখে-মুখে অবিশ্বাসের চিহ্ন দেখে নদুবাবু ফের বলতে শুরু করলেন, "এই তো সেদিন ফিলাডেলফিয়ায় হয়ে গেল হেভিওয়েট জো লুই আর মহম্মদ আলির লড়াই। সারা আমেরিকা জুড়ে সে কী হইচই। বারো রাউন্ড লড়াইয়ে শেষ পর্যন্ত কিন্তু জিতলেন জো লুই। ওদের ফিরতি লড়াই আগামী শুক্রবার।"

বিশ্বাস আর অবিশ্বাসের টানাপোড়েনে তখনও আমি দুলছি। নদুবাবু যা বলছেন, তা কি সত্যি ? সারা বিশ্বে এতসব ঘটনা ঘটে যাচ্ছে, তার কিছুই জানি না। নদু মিত্তির বোধ হয় এবারও আমার মনের কথা পড়ে ফেললেন। তারপর বললেন, "শুনতে যতই অবাস্তব মনে হোক, যা বলছি তা ঘটনা। মস্কোতে এই মুহূর্তে একটা দাবা ম্যাচ চলছে, যা কয়েক দশকের একটা বিতর্ককে থামিয়ে দেবে। বিশ্বের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ দাবাড়ু কে, এই প্রশ্নেরও মীমাংসা করে দেবে। হ্যাঁ, আমেরিকার ববি ফিশার আর রাশিয়ার গ্যারি কাসপারভের কথাই বলছি। কিছুদিন আগে কাসপারভ রেটিংয়ে ছাপিয়ে গেছেন ফিশারকে। আর তারপরই এই ম্যাচের ব্যবস্থা। পনেরো রাউণ্ডের খেলা। সাত রাউন্ড হয়ে গেছে। ফিশার ৪-৩ পয়েন্টে এগিয়ে আছেন। এই খবরটা তো আপনার জানা উচিত।"

নদুবাবুর এই কথাটায় খুব লজ্জা পেয়ে গেলাম। আমতা-আমতা করে বললাম,

"আপনি যা বলছেন, তা খুবই ইন্টারেস্টিং। তবে, দু যুগের দুই খেলোয়াড়কে নিয়ে এই ধরনের খেলা কীভাবে সম্ভব? ধরুন, ডন ব্র্যাডম্যান আর সুনীল গাওস্কর— কে সেরা, সেটা বিচার করবেন কী করে?"

নদুবাবু হাসলেন। আত্মবিশ্বাসের হাসি। অর্থাৎ কিনা, এতক্ষণ যা বোঝাতে চাইছেন, শেষ পর্যন্ত আমার মাথায় তা ঢোকাতে পেরেছেন। বললেন, "আপনাকে তো প্রথমেই বলেছি, বিজ্ঞানের যুগে অনেক কিছুই সম্ভব। টাইম মেশিনের কথা কখনও শুনেছেন? টাইম মেশিনের দ্বারা এখন সব কিছুই সম্ভব। কথাটা হয়তো একটু বাড়িয়েই বললাম। টাইম মেশিন দিয়ে এখন অনেক কিছুই সম্ভব। সারা বিশ্বে গত একশো বছরে ঘটে যাওয়া সব ঘটনাই এখন ইচ্ছে করলে প্রত্যক্ষ করতে পারেন। বিজ্ঞানীরা এই মেশিন আরও উন্নত করেছেন। এখন তো এক যুগের ঘটনার সঙ্গে অন্য যুগের ঘটনাবলীর তুলনাও করতে পারছেন। তবে কিনা, সেই একশো বছরের মধ্যেই। এখন যদি আপনি প্রশ্ন তোলেন, পাণ্ডবদের সঙ্গে যুদ্ধে আলেকজাণ্ডার দ্য গ্রেট জিততে পারতেন কি না, টাইম মেশিনের এখনও পর্যন্ত যা পাল্লা, তাতে বলা সম্ভব হবে না। কিন্তু যা দিন আসছে···ভবিষ্যতে একদিন যা সম্ভব হলেও হতে পারে। সেসব কথা থাক, আজকের কথা বলি। নিজের চোখেই আজ একটা ম্যাচ প্রত্যক্ষ করে যান। আমাদের মতে, ভারতের সেরা দুটো টিমের। তারপর আপনি নিজেই না হয় সিদ্ধান্ত নেবেন, ভারতের সর্বকালের সেরা টিম কোনটি?"

মাঠের দিকে তাকালেন নদুবাবু। তারপর বললেন, "ফেন্সিংয়ের ধারে ওই যে সোফাটা দেখছেন, তাতে খাতা-কলম নিয়ে বসে আছেন তিন প্রাক্তন ফুটবলার। সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ টিমের নর্মান প্রিচার্ড, মোহনবাগান ক্লাবের গোষ্ঠ পাল এবং ই বি আর টিমের সামাদ। নিশ্চয়ই জানেন, এই তিনজন অতীতের দিকপাল খেলোয়াড়। তবে তুলনায় নর্মান প্রিচার্ড একটু কম পরিচিত। কেননা, উনি এই শতাব্দীরই খেলোয়াড় নন। কলকাতার ফুটবলে এই প্রিচার্ডই প্রথম হ্যাটট্রিক করেন। শুধু ফুটবলার হিসেবেই নন, অ্যাথলেটিকসেও তিনি দক্ষ ছিলেন। উনিশশো সালে প্যারিস ওলিম্পিক থেকে প্রিচার্ড দুটো ব্যক্তিগত পদক জিতে এনেছিলেন। এশীয় হিসেবে তিনিই প্রথম পান ওলিম্পিক পদক।"

একটু থেমে নদুবাবু আবার বললেন, "প্রিচার্ডের ডান পাশেই বসে আছেন গোষ্ঠ পাল। ইংরেজরা যাঁর নাম দিয়েছিলেন 'চাইনিজ ওয়াল'। খুব বেশি পরিচয় দেওয়ারও বোধ হয় দরকার নেই। গোষ্ঠ পালের পাশে আছেন সামাদ। বল নিয়ে এমন ভেলকি দেখাতেন যে, সবাই তাঁকে বলতেন জাদুকর সামাদ। এই তিন শ্রেষ্ঠ ফুটবলারকে আমরা আজ খেলার পর সংবর্ধনা দিচ্ছি। এঁরা আবার আজকের ম্যাচের বিচারকও।"

এই নদুবাবুকে একটু গণ্ডগোলে-মার্কা লোক বলে মনে হচ্ছিল। একে তো, যে ম্যাচ দেখাবেন বলছেন, সেটাই অবাস্তব। তার ওপর আবার সাইড লাইনে বিচারক বসিয়ে রেখেছেন! ফুটবল মাঠে তো রেফারিই বিচারক। ভদ্রলোক আমাকে ভেবেছেনটা কী? আরও আশ্চর্য, দেখা হওয়ার পর থেকে আমি মনে-মনে যা কিছু ভাবছি, ভদ্রলোক যেন সব কিছু টের পেয়ে যাচ্ছেন। মুখ ফুটে কিছু বলার আগেই ঝটপট তার উত্তর দিচ্ছেন। নদুবাবু কি অন্তর্যামী? এ-কথাটিও বোধ হয় বুঝে ফেললেন নদুবাবু। মিটিমিটি হেসে বললেন, "আপনি যে-ধরনের ম্যাচের কথা ভাবছেন, মোটেই এটা সে-ধরনের হচ্ছে না। ফুটবল-বিজ্ঞান এখন এমন এগিয়েছে, শব-ব্যবচ্ছেদের মতো একটা ফুটবল ম্যাচও আমরা

কাটাছেঁড়া করতে পারছি। একটা টিমের সঙ্গে অন্য একটার তুলনা করতে পারছি। খোলসা করেই বলি। ফুটবল ম্যাচকে আমরা দুটো ভাগে ভাগ করেছি। দু' দলের ফরোয়ার্ড লাইন আর ডিফেন্স— কতটা দক্ষ, পালটাপালটি করে আমরা সেটা যাচাই করব। এই ম্যাচে যেমন মোহনবাগানের অ্যাটাকিং লাইন কতটা দক্ষ, সেটা প্রথমে যাচাই করব মহমেডান স্পোর্টিংয়ের ডিফেন্সের বিরুদ্ধে তারা কেমন খেলেন তা দেখে। এর জন্য চল্লিশটা পয়েন্ট। এর পর উলটোটা হবে, অর্থাৎ কি না, মহমেডানের ফরোয়ার্ড লাইন মোহনবাগান ডিফেন্সের বিরুদ্ধে কেমন খেলছে সেটাও দেখা হবে। এর জন্যও বরাদ্দ চল্লিশ পয়েন্ট। তা হলে দাঁড়াল মোট আশি পয়েন্ট। বাকি কুড়ি পয়েন্ট গোলকিপিং দক্ষতার জন্য। ম্যাচ চলার সময়ই পয়েন্টগুলি দেবেন ওই তিন বিচারক, যাঁদের নাম আপনাকে আগে বলেছি। এর পরও একটা কথা আছে। প্রতি দশ পয়েন্টে আমরা ধরব একটা করে গোল। একটা টিম যদি ৬০ পয়েন্ট পায়, আর অন্য দল ৪০, তা হলে ম্যাচের ফল দাঁড়াবে ৬-৪ গোলে। অর্থাৎ এক টিম অন্য টিমকে হারাবে ২-০ গোলে। এই পদ্ধতিটা আমাদের নিতে হচ্ছে টাইম মেশিনের সুবিধার্থে।"

এইসব অদ্ভুত নিয়ম-টিয়ম শুনে মাথায় জট পাকিয়ে যাচ্ছিল। এতসব অঙ্ক কষে একটা দলের উৎকর্ষ যাচাই করাও সম্ভব কি না, সে-প্রশ্নও জাগছিল। টাইম মেশিনের কথা অবশ্য আগেও পড়েছি— প্রোফেসর শঙ্কুর লেখা ডায়েরিতে। কিন্তু তাতেও সব কিছু পরিষ্কার হল না। এই কথা ভাবার মাঝেই নদুবাবুর পাশে উদয় হলেন ঢ্যাঙামতন এক ভদ্রলোক। হাতে ছোট একটা বাক্স, পোর্টেবল টাইপরাইটারের মতো। বাক্সটি নদুবাবুর হাতে তুলে দিয়ে ঢ্যাঙা ভদ্রলোক কী যেন বললেন, শুনতে পেলাম না। বস্তুত, গ্যালারির মাঝে এতক্ষণ বসে আছি, এত লোকের মাঝে। নদুবাবুর গলা ছাড়া আমি আর কিছুই শুনতে পাচ্ছি না। কী অদ্ভুত জায়গায় এসে পড়েছি, নিজেও জানি না। সেই ঢ্যাঙা লোকটি নদুবাবুর সঙ্গে ফিসফিস করে কথা বলেই যাচ্ছেন। মুখের ভঙ্গি দেখে আন্দাজ করলাম, ছোট বাক্সটা নিয়ে সম্ভবত কোনও কিছু নির্দেশ দিচ্ছেন। তারপর, যেমনভাবে উদয় হয়েছিলেন, চোখের পলকে ঠিক তেমন ভাবেই ঢ্যাঙা ভদ্রলোক মিলিয়ে গেলেন। ঠিক সিনেমায় যেমনটি হয়, সেই রকম।

আমার মুখের দিকে তাকিয়ে নদুবাবু এবার বললেন, "তা হলে ম্যাচটা শুরু করা যাক।" মাথায় চট করে একটা হেডফোন লাগিয়ে ছোট বাক্সটা কোলের উপর তুলে নিলেন তিনি। "এই হচ্ছে, টি এম এফ— ফোরটিন। ভাবা রিসার্চ ইনস্টিটিউট থেকে আনা। খুবই সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি দিয়ে তৈরি। একেবারে যাকে বলে কম্পিউটারাইজড। এই টাইম মেশিনটির সাহায্যে গত একশো বছরের ফুটবল আপনি প্রত্যক্ষ করতে পারবেন। সেই সময়ে উপস্থিতও হতে পারবেন। সে যাক, এবার মাঠের দিকে তাকান। দয়া করে আপনার মাথা থেকে হেডফোনটা খুলবেন না। আমি সাউন্ড বাড়িয়ে দিচ্ছি। এখন থেকে মাঠের সব কিছুই আপনি শুনতে পাবেন।"

সঙ্গে-সঙ্গে দু' কানে একটা তীক্ষ্ণ চিঁ-চিঁ শব্দ শুনতে পেলাম। তারপর বিরাট একটা আওয়াজ। ইস্টবেঙ্গল বা মোহনবাগান টিম মাঠে নামার সময় ঠিক এই ধরনের আওয়াজই আমরা শুনতে পাই। নীল আর সবুজ আলোটা আর নেই। মাঠের সব কিছু আমি দেখতে পাচ্ছি। সব কিছু দিনের আলোর মতো ঝকঝকে। মাইক্রোফোনে কে যেন বললেন, "বহু প্রত্যাশিত এই ম্যাচ আজ পরিচালনা করবেন খ্যাতনামা রেফারি ক্লেটন। তাঁকে সাহায্য করবেন পঙ্কজ গুপ্ত এবং রমাকান্ত গাঙ্গুলি।" সঙ্গে-সঙ্গে টানেল দিয়ে উঠে

এলেন রেফারির পোশাক-পরা এক ইংরেজ আর দুই ভারতীয়। গ্যালারির দিকে হাত নাড়লেন ক্রেটন। কিন্তু কেই টু শব্দটি করলেন না। স্পষ্টই বুঝতে পারলাম, এই রেফারিটিকে দর্শকরা ঠিক পছন্দ করছেন না। আই এফ এ-র গোল্ডেন জুবিলি স্মারক পত্রিকায় এই ক্রেটন সাহেবের একটা ছবি দেখেছিলাম। গোষ্ঠ পালের মুখেও শুনেছি, ইংরেজদের দিকে টেনে খেলানোর ব্যাপারে ক্রেটনের খুব বদনাম ছিল।

নদুবাবুর গলা হেডফোনে শুনতে পেলাম। এইবার মোহনবাগান টিম মাঠে নামবে। কিন্তু টানেল দিয়ে বেরিয়ে এলেন একদল ইংরেজ ফুটবলার। মাঠ পর্যন্ত পৌঁছে তাঁরা ছোটাছুটিও শুরু করে দিলেন। দু-একজনকে দেখলাম, ক্রেটনের সঙ্গে গল্পও করছেন। ইংরেজদের দেখে গ্যালারির দর্শকরা খুব চেঁচামেচি শুরু করে দিলেন। "কোথায় মোহনবাগান টিম? আমাদের সঙ্গে চালাকি? ইস্ট ইয়র্কশায়ার টিমকে নামিয়ে মোহনবাগান বলা হচ্ছে।" দর্শকরা দেখলাম, ইংরেজ টিমটা সম্পর্কে খুবই ওয়াকিবহাল। প্লেয়ারদের নাম ধরে টীকা-টিপ্পনীও করতে লাগলেন অনেকে।

পাশে তাকিয়ে দেখি, কোলের ওপর রাখা ছোট্ট বাক্সটা নিয়ে গলদঘর্ম হয়ে উঠেছেন নদুবাবু। একবার সুইচ ঘোরাচ্ছেন, আর-একবার সাঙ্কেতিক লাল, সবুজ আর গোলাপি আলো কমাচ্ছেন-বাড়াচ্ছেন। কিছু একটা অ্যাডজাস্ট করার চেষ্টা চালাচ্ছেন, পারছেন না। আমার দিকে চোখ পড়তেই বললেন, "টাইম মেশিনটা সামান্য একটু ট্রাবল দিচ্ছে। ঘাবড়াবেন না, ঠিক হয়ে যাবে। এগারো সালে আই এফ এ শিল্ড ফাইনাল ম্যাচে মোহনবাগানের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল এই ইস্ট ইয়র্কশায়ার। ম্যাচের দিন ওরাই আগে মাঠে নেমেছিল। তার মিনিট পাঁচেক পর মোহনবাগান। টাইম মেশিনে পাঁচ মিনিট ফাস্ট করে দিলেই ঝামেলা চুকে যেত। কিন্তু ফাস্ট ফরোয়ার্ড করার সুইচটা ঠাহর করতে পারছি না। তাই এই গণ্ডগোল। দেখুন, এখনই ইস্ট ইয়র্ক টিমটাকে ইরেজ করে দিচ্ছি।"

মাঠের দিকে তাকিয়ে দেখি ভৌতিক কাণ্ড। ইস্ট ইয়র্কশায়ার টিম নেই। হেডফোনে নদুবাবুর গলা শুনতে পেলাম, দর্শকদের উদ্দেশে বলছেন, "আপনারা অধৈর্য হবেন না। মোহনবাগান দল এবার মাঠে নামছে। যাঁর হাতে বল তিনি দলের অধিনায়ক শিবদাস ভাদুড়ি। তাঁর পিছনে গোলকিপার হীরালাল মুখার্জি, ডিফেন্ডার সুধীর চ্যাটার্জি, হাফব্যাক নীলমাধব ভট্টাচার্য, রাজেন সেন, মনোমোহন মুখার্জি, ডিফেন্ডার ভুতি সুকুল, ফরোয়ার্ড কানু রায়, হাবুল সরকার, অভিলাষ ঘোষ আর সবার শেষে বিজয়দাস ভাদুড়ি।"

চোখ কচলে দেখলাম, সত্যি-সত্যিই এগারো শিল্ড-জয়ী দলের নায়করা টানেল দিয়ে উঠে এলেন। গায়ে সবুজ-মেরুন জার্সি, ঢোলা প্যান্ট। কারও পায়ে অ্যাঙ্কলেট, কারও শাড়ির পাড় জড়ানো। একমাত্র সুধীর চ্যাটার্জি ছাড়া আর কারও পায়ে বুট নেই। খুবই সুশৃঙ্খলভাবে ওই এগারোজন মাঠের মধ্যিখানে গিয়ে দাঁড়ালেন। মাঠের পূর্ব দিকে বিরাট ইলেকট্রনিক স্কোর বোর্ড। এগারোজনের পরিচিতি জানিয়ে দেওয়া হচ্ছে। স্কোর বোর্ডের পরদায় এক-একজনের মুখ ভেসে উঠছে আর মাইক্রোফোনে তাঁর নাম আর কৃতিত্ব নাটকীয়ভাবে জানাচ্ছেন ঘোষক। গলাটা খুব চেনা-চেনা মনে হচ্ছিল। ঘোষক কি নামকরা ভাষ্যকার বেরি সর্বাধিকারী? হয়তো হবে। দর্শকরা তুমুল অভিনন্দন জানালেন শিবদাস ভাদুড়িকে। যখন শুনলেন ফাইনাল ম্যাচে জয়সূচক গোলটা শিবদাসবাবুই করেছিলেন। পরিচিতির পালা শেষ হয়ে গেল। অবাক লাগল দেখে, মোহনবাগান মাত্র এগারোজনের দল এনেছে। শিল্ড-জয়ী দলে কি রিজার্ভ কোনও প্লেয়ার ছিল না? কেউ চোট পেলে মোহনবাগানকে কি তা হলে দশজনেই খেলতে হত?

মাঠের মধ্যে আশি বছর আগের একটা টিমকে চোখের সামনে দেখে একটু উত্তেজনাও অনুভব করছিলাম। নদুবাবুর কথা একটু-একটু করে বিশ্বাস হচ্ছে। সত্যিই তা হলে আমার সামনে এমন একটা ম্যাচ হতে যাচ্ছে, যা আধ ঘণ্টা আগে ভাবতেও পারতাম না। ঘোষকের গলা ভেসে এল, "এবার মহমেডান স্পোর্টিং দল মাঠে নামছে। খেলোয়াড়দের নামগুলো পর পর বলে যাচ্ছি। টিমের অধিনায়ক আব্বাস, গোলকিপার ওসমান, দুই ব্যাক জুম্মা খান আর সিরাজুদ্দিন, হাফ ব্যাক মাসুম, নুর মহম্মদ আর রসিদ খান, ফরোয়ার্ড লাইনে নুর জুনিয়ার, রহিম, রসিদ আর সাবু।"

গ্যালারি থেকে যেন গর্জন উঠল। মনে হল, দর্শকদের দুই-তৃতীয়াংশই মহমেডানের সমর্থক। একজন উৎসাহী দর্শক বিরাট একটা টাকার মালা পরিয়ে দিয়ে এলেন গোলকিপার ওসমানের গলায়। মাথায় কোঁকড়া চুল, পাঠানদের মতো শরীর। ওসমান সেই মালা জুম্মা খানের হাতে তুলে দিলেন। ...দু' দলের খেলোয়াড়রা মাঠের মাঝখানে সার বেঁধে দাঁড়ালেন। তিন বিচারকের সঙ্গে তাঁদের পরিচয়ও করিয়ে দেওয়া হল। আর তারপরই হঠাৎ মাঠে নৈঃশব্দ্য নেমে এল। নদুবাবু আমাকে বললেন, "খেলা এবার শুরু হয়ে গেল। একটা কথা আপনাকে জানানো দরকার বলে মনে করছি। এই ম্যাচের বাজির দর ৯-৬। মহমেডানের পক্ষে। প্রচুর লোক বাজি ধরেছেন। কয়েক কোটি টাকার ব্যাপার।"

যাই হোক, খেলা সত্যি-সত্যিই শুরু হয়ে গেল। আর চোখের পলক ফেলতে-না-ফেলতেই গোল ! তাও মাত্র চার টাচে। অভিলাষ ঘোষ কিক অব থেকে বল দিলেন লেফট উইংয়ে শিবদাসকে। রাইট জুম্মা খানকে ছোট্ট ডজে কাটিয়ে নিয়েই শিবদাস তরতর করে উঠে গেলেন কর্নার পোলের কাছে। ততক্ষণে জায়গা বদলে রাইট ইন হাবুল সরকার চলে এসেছেন লেফট ইনে। শিবদাসকে বাধা দিতে এসেছিলেন রাইট হাফ মাসুকম। তিনি ট্যাক্‌ল করতে যাওয়ার আগেই শিবদাস বল বাড়িয়ে দিলেন হাবুল সরকারের উদ্দেশে। বলটা না ধরে ছোট্ট একটা টোকা দিলেন হাবুল। অভিলাষ ঘোষ যেন আগেভাগেই জানতেন, বলটা কোথায় পাবেন। বল ধরেই হাফ টার্নে তিনি দুর্দান্ত শট নিলেন গোল লক্ষ্য করে। গোলকিপার ওসমানের দু' হাতের ফাঁক দিয়ে বল গোলে ঢুকে গেল। রেফারি ক্রেটন কিন্তু গোল দিলেন না। অভিলাষের দিকে ইঙ্গিত করে বুঝিয়ে দিলেন, অফ সাইডে ছিলেন।

গোল না হলেও, দুটো ব্যাপার বেশ নজরে পড়ল। এক, মোহনবাগান ফরোয়ার্ড লাইনের সমঝোতা আর জায়গা বদল করে খেলা। দুই, ওসমানের অদ্ভুত বল গ্রিপিং। আমাদের দেশে পাঁচ ফরোয়ার্ডের ছকে যখন খেলা হত, সেই সময় জায়গা বদল করে খেলাটা তেমন চালু ছিল না। দুই ইনসাইড উঠে-নেমে খেলতেন। দুই আউট সাইড ভেতরে ঢুকতেন না। সেন্টার ফরোয়ার্ড ঘুরঘুর করতেন গোল এরিয়ায়। পঞ্চাশের দশকে এই খেলাটা আমূল বদলে দেন হাঙ্গারির কোচ গুস্তাভ সিবেস। তাঁর সময়েই পুসকাস, হিদেকুটি আর কোজিসরা নিজেদের মধ্যে জায়গা বদল করে খেলে সারা বিশ্বকে চমকে দেন। কিন্তু পুসকাসদেরও চল্লিশ বছর আগে সেই খেলাটা মোহনবাগানের ফরোয়ার্ডদের খেলতে দেখে অবাক হলাম। সেই সময় কোচ-ফোচ ছিল না। টিম দেখতেন নাকি শিবদাস ভাদুড়িই। দেখে ভাল লাগল, ফুটবল নিয়ে শিবদাস তা হলে সে-সময় গভীর চিন্তাভাবনা করতেন।

ওই অল্প সময়ের মধ্যে আর চোখে পড়ল গোলকিপার ওসমানের গ্রিপিং। তিরিশের দশকে এই ওসমান ছিলেন কলকাতা লিগের সেরা স্টাইলিশ গোলকিপার। কোয়েটার লোক। এখন ওই জায়গাটা পাকিস্তানে। তিরিশের দশকের সেই সময়টায় মহমেডানের সেক্রেটারি আবদুল আজিজ। কোয়েটা থেকে বলিষ্ঠ চেহারার চার-পাঁচজন প্লেয়ার তিনি ধরে এনেছিলেন। জুম্মা খান, ওসমান তাঁদেরই অন্যতম। যাই হোক, ওসমানকে দেখলাম, বল ধরার চেষ্টা করলেন, দুই পাশ থেকে হাত এনে। এখনকার গোলকিপাররা তো এভাবে বল গ্রিপ করার কথা ভাবতেই পারেন না। তাঁরা দুই হাত বলের পিছনে নিয়ে যান। কী জানি, হয়তো সে যুগে ওসমানের ওই গ্রিপিংই হয়তো ছিল তাঁর স্টাইল!

এইসব ভাবছি, খেলা ততক্ষণে বেশ কিছুটা সময় এগিয়ে গেছে। খেলা তখনও ড্র। মোহনবাগান চেপে ধরেছে। আরও দু' বার গোলের সুযোগ পেলেন অভিলাষ ঘোষ আর রাজেন সেন। কিন্তু একবার ছর্‌রা মেরে বাঁচিয়ে দিলেন ব্যাক সিরাজুদ্দিন। আর অন্যবার রাজেন সেনের হেড-করা বল ফিরিয়ে দিলেন জুম্মা খান। নদুবাবু আমাকে বললেন, "ওই সিরাজুদ্দিনকে দেখছেন, কার ভাই জানেন? ওস্তাদ আলাউদ্দিন খানের। মহমেডানের এই দলটায় মাত্র দুজন বাঙালি ছিলেন। ক্যাপ্টেন আব্বাস আর এই সিরাজুদ্দিন।"

খেলার মধ্যে ক্রমশই ডুবে যাচ্ছি। হেডফোনে মাঝে-মাঝে একটা তীক্ষ্ণ চিঁ-চিঁ শব্দ শুনছি। রেডিও-র অজানা স্টেশন ধরলে যেমনটি হয়। ফাঁসের মতো মাথায় চেপে বসে আছে যেন হেডফোনটা। একটু অস্বস্তিও হচ্ছে। মাঠের দিকে নজর দিলাম। এবার মহমেডান ফরোয়ার্ড লাইন জোরালো আক্রমণ করছে। রসিদ, রহিম আর সাবুর মধ্যেও দেখলাম দারুণ সমঝোতা। বল দেওয়া-নেওয়া করে তাঁরা চমৎকার এগোচ্ছেন। কিন্তু খেই হারিয়ে ফেলছেন গোলের কাছাকাছি গিয়ে। সুন্দর পজিশনাল প্লে দেখলাম, মোহনবাগানের রাইট ব্যাক সুধীর চ্যাটার্জির খেলায়। সেই শিল্ড-জয়ী টিমের সবথেকে কমজোরি প্লেয়ার ছিলেন এই সুধীর চ্যাটার্জি— অনেকের মুখেই এ-কথা শুনেছি। আমার কিন্তু তা মনে হল না। রহিম আর রসিদ বল ধরলেই উৎসাহে ফেটে পড়ছে গ্যালারি। ভূতি সুকুল একবার কড়া ট্যাক্‌ল করলেন রহিমকে। গ্যালারি থেকে দু-একটা ইট উড়ে গেল রেফারি ক্লেটনকে লক্ষ্য করে। সমর্থকদের খুশি করার জন্যই বোধ হয়, ক্লেটনসাহেব দৌড়ে গিয়ে খুব ধমকে দিলেন সুকুলকে। এ ছাড়া আর কিই-বা করতে পারতেন তিনি? সেই সময় তো আর হলুদ কার্ড বা লাল কার্ডের নিয়ম ছিল না!

একটু সময় বাদেই, মহমেডানের মাসুম পিছন থেকে ট্রিপ করলেন বিজয়দাস ভাদুড়িকে। গোল এরিয়ার সামান্য বাইরে ডান দিকে। ইনডাইরেক্ট ফ্রি-কিক। ক্লেটনের এই সিদ্ধান্তে কিন্তু সমর্থকরা সন্তুষ্ট হলেন না। আবার চার-পাঁচটা ইট উড়ে গেল মাঠের মধ্যে। এখন পেশাদার ফুটবলে একে বলে 'গেমসম্যানশিপ'। এটা তা হলে তখনও ছিল!

ফ্রি-কিক নিচ্ছেন শিবদাস। তাঁর ফরোয়ার্ডরা এদিক-ওদিক দাঁড়িয়ে। শিবদাসের সামনে পাঁচ ডিফেন্ডারের দেওয়াল। আর তার পিছনে গোলকিপার ওসমান। দেওয়ালটা আরও জমাট করার জন্য চেঁচিয়ে নির্দেশ দিচ্ছেন ওসমান। তারপর নিজে ডান গোলপোস্টের দিকে সরে দাঁড়ালেন। ক্লেটন বাঁশি বাজিয়ে দিয়েছেন। শিবদাস শট নিতে যাবেন। ঠিক এই সময় তাঁর নাম ধরে ডাকতে-ডাকতে এগিয়ে এলেন দাদা বিজয়দাস। হাত নেড়ে এমন ভঙ্গি করলেন, শিবদাস যেন ফ্রি-কিক না নেন। দু' ভাইয়ের মধ্যে কী যেন কথাও হল। আর কথা বলার মাঝেই শিবদাস বল ঠেলে দিলেন

দাদাকে। ব্যাপারটা এত দ্রুত ঘটে গেল যে, গা-আলগা দেওয়া মহমেডান ডিফেন্ডাররা সজাগ হয়ে ওঠার আর সুযোগই পেলেন না। জোরে শট নেওয়ার ভঙ্গি করে বিজয়দাস প্রথমে ডিফেন্সের দেওয়াল ভেঙে দিলেন। তারপর, ভেতরে ঢুকে আসা হাবুল সরকারকে লক্ষ্য করে বল তুলে দিলেন। সঙ্গে-সঙ্গে ডাইভিং হেড। গোলকিপার ওসমান কিন্তু ঠিক জায়গায় সরে এসেছিলেন। কিন্তু হাবুল সরকার অত ঝুঁকি নিয়ে, শূন্যে শরীর ভাসিয়ে হেড দেবেন ভাবতেই পারেননি। দু' জনের শরীরে লাগল প্রচণ্ড ধাক্কা। দু'হাতে মাথা চেপে শুয়ে রইলেন হাবুল সরকার। আর বুকে হাত দিয়ে জমিতে ছটফট করতে লাগলেন ওসমান। দূর থেকে আমার মনে হল, পাঁজরের কোথাও তাঁর চোট লেগেছে। এবং বেশ ভাল চোটই।

ব্যস, গ্যালারিতে যেন বিস্ফোরণ ঘটে গেল। মাঠে ফেন্সিং নেই। চারপাশের গ্যালারি থেকে হুড়মুড় করে কিছু লোক মাঠে নেমে গেলেন। তাড়া করলেন ক্রেটনকে। ইট, ছাতা, জুতো বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। সঙ্গে-সঙ্গে বোমার আওয়াজ। বিশৃঙ্খল অবস্থা। মাঠে পুলিশও ঢুকে পড়ল।

দু দলের মধ্যে খণ্ডযুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। কাঁদানে গ্যাসের তীব্র ঝাঁঝ চোখে এসে লাগল। পাশে তাকিয়ে দেখি নদুবাবু নেই। পালিয়ে গেছেন। যাওয়ার সময় টাইম মেশিনটা নিয়ে যেতে ভুলে গেছেন। গ্যালারির উত্তর দিকে পুলিশ হোস পাইপে জল ছেটাচ্ছে। দর্শকদের ছত্রভঙ্গ করার জন্য দেখলাম, ডজন খানেক বিরাট চেহারার অ্যালসেশিয়ান কুকুরও পুলিশ গ্যালারিতে ছেড়ে দিয়েছে। তাতেও দর্শকদের সামলানো যাচ্ছে না। একজন দর্শক আমার পাশ দিয়ে নেমে গেলেন, হাতে রিভলভার। ওই ভয়ানক পরিস্থিতিতে কী করব ভাবছি। এমন সময় ঠকাস করে আধখানা ইট এসে পড়ল আমার হেডফোনে…।

আর তারপরই— বাঁকেলালের ডাক শুনতে পেলাম। গাড়ি স্টার্ট নিতে-নিতে ও বিরক্তির সুরে বলল, "শুধু-শুধু আধ ঘণ্টা নষ্ট হল।"

খেলার মাঠ

যোগীন্দ্রনাথ গুপ্ত

[রাজাপুর স্কুলের ক্লাস নাইনের ছাত্র কল্যাণ ব্যানার্জি। দুর্ধর্ষ ক্রিকেটার। কল্যাণের কাকাও চল্লিশ বছর আগে এই হস্টেলে থাকতেন। তাঁর সংগ্রহ-করা কিছু অমূল্য ডাক টিকিট আজও গা ঢাকা দিয়ে রয়েছে কোনো এক গুপ্ত কুলুঙ্গির মধ্যে ছোট্ট একটি বাক্সে। ক্রিকেট খেলার সঙ্গে সঙ্গেই চলছে কল্যাণ আর তার বন্ধুদের গুপ্তধনের অনুসন্ধান।]

যদি কোন দণ্ড পেতে হয়, তবে সেই দণ্ডের জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকিয়া লাভ কি ? শাস্তির জন্য অপেক্ষা করা অপেক্ষা তাহা সহজভাবে সাহসের সহিত নির্ভীকভাবে গ্রহণ করাই কর্তব্য। — কল্যাণের মনে বরাবরই এইরূপ একটা ধারণা বলবৎ ছিল। সে পরদিন ঘুম হইতে উঠিয়াই তাড়াতাড়ি প্রস্তুত হইয়া প্রভাতের কাছে আসিল। তাহার এই আসিবার কথা অমল ও সুরজিৎ পর্যন্ত জানিতে পারে নাই।

সে যে সময় আসিয়া প্রভাতের ঘরে পৌঁছিল তখন সবে মাত্র প্রভাত তাহার টেবিলের কাছে আসিয়া বসিয়াছে। কল্যাণ প্রভাতকে অভিবাদন করিয়া তাহার টেবিলের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। প্রভাত তাড়াতাড়ি কল্যাণ রাত্রি বেলা যে মুগুরটি হাত হইতে ফেলিয়া দিয়াছিল তাহা হাতে তুলিয়া কহিল, কাল তুমি কোথায় এই মুগুরটি ফেলেছিলে বলত ? কল্যাণ মুগুরটির প্রতি কিংবা প্রভাতের কোন কথার দিকে লক্ষ্য না করিয়া নির্ভীকভাবে কহিল,— কাল রাত্রিতে আমি বিছানা ছেড়ে একবার একটু বাইরে গিয়েছিলুম, আমি সে কথাটা বলতে এসেছি।

প্রভাত সন্দিগ্ধভাবে, কল্যাণের দিকে চাহিয়া বেশ একটু কঠোর স্বরে কহিল— তুমি সত্যি করে বল, এই মুগুরটি দিয়ে রাত্রে কি করেছিলে ?

কল্যাণের কাছে এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যে বড় সহজ ছিল না তাহা বেশ ভাল করেই সে জানিত। তাই সে কথাটা যাহাতে অন্যভাবে চলিয়া যায় সেদিকে খেয়াল করিয়া কহিল, —প্রভাত-দা, আজ আমাদের খেলার একটা প্র্যাকটিস হবে সে কথাটাই বলতে এসেছি। আমায় অনুমতি দিতে হবে। প্রভাত মুগুরটা দেখাইয়া কহিল,— তোমাকে আর এটা ফিরিয়ে দেওয়া হবে না, তুমি সত্যি করে বল দেখি এত রাত্রিতে মুগুর হাতে করে কার ঘরের দরজা ভাঙতে গিয়েছিলে ?

কল্যাণ হাসিয়া কহিল— প্রভাত-দা জান, আমার বরাবরই এই কিনা ?— অর্থাৎ কিনা

এই একটু এক্সারসাইজ করবার অভ্যাস আছে, তাই দিনের বেলা ত বড় একটা সময় পাই না তাই বুঝলে এই রাত্রি-বেলা একটু মুগুর ভাঁজি কিনা ; পাছে কারও ডিসটার্ব হয় সে জন্যে— এই সিঁড়িটার পাশে দাঁড়িয়ে খুব জোরে মুগুর ভাঁজছিলাম হঠাৎ কি জানি কেমন করে হাত থেকে মুগুরটা ছিট্‌কে পড়ে গেল বুঝতে পারিনি—

প্রভাত এবার বেশ গম্ভীর ভাবে এবং সে যে এই বোর্ডিংয়ের হেডবয় সেই মর্যাদাটুকু পূর্ণভাবে কল্যাণকে বুঝিতে দিয়া কহিল,— দেখ, তোমাকে আজ আমি এই সাজা দিলুম যে পনের দিনের মধ্যে তুমি কোথাও কোন খেলা-ধূলাতে যোগ দিতে পারবে না,— সে ব্যাডমিন্টন, ক্রিকেট ও টেনিসই হউক বা ফুটবল ইত্যাদি যাই হোক না কেন, তুমি কোন খেলায়ই যোগ দিতে পারবে না। বুঝলে ?

এই কথা শুনিয়াই কল্যাণের মনে হইল যেন সারা পৃথিবী অন্ধকার হইয়া গেল। সে সকল রকমের দণ্ডই সহ্য করিতে পারে কিন্তু পারে না শুধু খেলা সম্বন্ধে কোন রকমেরই দণ্ড সহ্য করিতে, কাজেই প্রভাতের এই দণ্ড বিধানে তাহার মন একেবারে দমিয়া গেল। সে পুনরায় কহিল, আজ তাহলে প্র্যাকটিসের খেলাটাও কি খেলতে পারব না প্রভাত-দা ?

প্রভাত সগর্বে দাঁড়াইয়া উঠিল ও কহিল— আমি তোমার কোন কথা শুনতে চাই না, তোমাকে যে শাস্তি দেওয়া উচিত মনে করেছি আমি তাই দিয়েছি, এখন তুমি যেতে পার। এই কথা বলিয়া প্রভাত ঘর হইতে বাহির হইবার উদ্যোগ করিল।

কল্যাণ পুনরায় মাথা নীচু করিয়া বিনীতভাবে কহিল, তা হলে এইটাই কি তোমার ফাইনাল ডিসিশন বলে মেনে নিতে হবে ?

প্রভাত কহিল : নিশ্চয়, নিশ্চয় ; আমি এই এক পক্ষ কাল খেলার মাঠের দিকে নজর রাখব, তুমি কিছুতেই এ কয়দিন কোন খেলায় যোগ দিতে পারবে না। কথাটা বলিয়া প্রভাত অন্যদিকে চলিয়া গেল। যাইতে যাইতে পুনরায় মুখ ফিরাইয়া কহিল—

সাবধান, যেন তোমার বিরুদ্ধে আর কোন গুরুতর দণ্ডের বিধান না করতে হয়, এখন যেতে পার।

প্রভাত চলিয়া গেল। কল্যাণের মন ক্রোধে ও অপমানে আগুনের মত জ্বলিয়া উঠিল, সে বার বার অনুচ্চ স্বরে বলিতে লাগিল কেন এই অন্যায় দণ্ড তাহাকে দেওয়া হইল ? তাকে দণ্ডিত করবার জন্যে আর অন্য কোন সাজা কি ছিল না ? তাহার চলিতে চলিতে এই কথাই মনে হইতে লাগিল একবার প্রভাতের এই দণ্ডের বিরুদ্ধে একটা ব্যবস্থা করা দরকার। সুপারিন্টেণ্ডেন্ট তারক মাস্টার মহাশয় সেদিন স্নেহের সহিত তাকে খেলার জন্যে উৎসাহিত করিয়া গিয়াছেন, যদি তাঁহাকে এ বিষয়ে কিছু জানান হয়, তাহা হইলে হয়ত বা এর কিছু প্রতিকার হইতে পারে কিন্তু আবার মনে হইল, তাঁহাকে এই বিষয় কিছু জানাইতে গেলে রাত্রির ব্যাপারটা প্রকাশ হইয়া পড়িবে তাহা হইলে ব্যাপারটা আরও জটিল হইয়া পড়িবে কাজেই আর কোন দিকে যাওয়ার পথ নাই।

এইরূপ নানা কথা চিন্তা করিতে করিতে সে তাহার বন্ধুগণের কাছে আসিয়া পৌঁছিল। সে আসিয়া দেখিল সুরজিৎ ও অমল তাহার ঘরের টেবিলের পাশে দুইখানি চেয়ার দখল করিয়া বসিয়া আছে। কল্যাণকে ঘরে ঢুকিতে দেখিয়া তাহারা আনন্দে চিৎকার করিয়া উঠিল।

সুরজিৎ ব্যস্ত-সমস্ত ভাবে কহিল— তুমি এতক্ষণ কোথায় ছিলে কল্যাণ ? সকাল বেলা যে ব্যাপারটা ঘটিয়া গেল কল্যাণ তাহাদের কাছে তাহা একে একে বর্ণনা করিল।

কল্যাণের দুই বন্ধু তাহার এই শাস্তির কথা শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইল। সুরজিৎ ও

অমল দুইজনে কল্যাণকে অন্তরের সহিত ভালবাসিত এবং খেলোয়াড় হিসাবে তাহাদের মনে এইরূপ একটা বিশ্বাস ছিল যে— কল্যাণ একদিন পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়দের মধ্যে একজন হইবে। রণজিৎসিং বা দলীপসিংজীকেও সে নাম ও যশের দিক দিয়া হারাইয়া দিতে পারিবে। —কল্যাণের এই শাস্তির কোন প্রতিকার হয় কিনা তাহারা দুইজনে সেই কথাই চিন্তা করিতে লাগিল। হঠাৎ অমল খুব উৎসাহের সহিত বলিল, এক কাজ কল্লে হয় না, কল্যাণ ?

কল্যাণ বিষণ্ণভাবে কহিল, কি ?

—কেন আমাদের মোহন-দাকে বল্লে হয় না ? তিনি ত আমাদের ক্রিকেট টিমের ক্যাপটেন। তিনি কি এর একটা ব্যবস্থা করতে পারেন না ?

—পারেন বৈকি ! তবে, তিনি কি হেডবয়ের দণ্ডবিধানের বিরুদ্ধে কিছু করতে পারেন ? তাহলে যে আমাদের 'স্কুলের' একটা 'ডিসিপ্লিন' থাকে না। এ বিষয়ে তাহাদের আর কোন কথাই হইল না শুধু সুরজিৎ আপনা আপনি বলিল— আমি একবার মোহন-দা'র সঙ্গে দেখা করে সব কথা বলব। আর অপেক্ষা করা চলে না, খানিক পরেই ঘণ্টা বাজিবে। কাজেই তাহারা তিনজনে স্নান ও আহারের জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িল এবং যে যাহার ঘরে চলিয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল। এ সময় সুরজিৎ কহিল— আজ সন্ধ্যার পর আমাদের সিণ্ডিকেটের আর একটা মিটিং করলে হয় না ? অমল তাহাতে সায় দিল।

কল্যাণ বলিল, মন্দ কি ?

সুরজিৎ বলিল : বেশ হবে, আবার আমরা খোঁজ করে দেখব, কোথায় তোমার কাকার স্ট্যাম্পগুলি লুকানো রয়েছে, এবার কিন্তু ভাই মুগুর দিয়ে নয়।

কল্যাণ সক্রোধে কহিল— এবার মুগুর দিয়ে খুঁজব না, একটা হাতুড়ি নিয়ে খুঁজব, কিন্তু সে খুঁজবার আগে যদি হাতুড়ি দিয়ে প্রভাতদার মাথাটা ঠুকে দিতে পারতাম তাহলে বেশ হত। এই কথা বলিয়া কল্যাণ চুপি চুপি তাহার বন্ধু দুইজনকে কহিল : দেখ ভাই সুরজিৎ ও অমল, তোমরা পুস্তকরামকে খুব সোজা লোক মনে করো না, সেও আমাদের মত স্ট্যাম্পের খোঁজে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কাল রাত্রিতে যে সে খুঁজতে বেরিয়েছিল একথা আমি জোর গলায়ই বলতে পারি— সুরজিৎ ও অমল একসঙ্গে বলিয়া উঠিল, বল কি ?

—সত্যি বলছি।

অমল বলিল : সে কি করে সন্ধান পেলে ?

—খুব সম্ভব দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে আমাদের কথাবার্তা শুনেছিল।

—হতে পারে।

—একবার তাহলে ওর সঙ্গে একটু আলাপ করা ভাল। ভিতরের ব্যাপারটা অনেকখানি বুঝে নিতে পারব। তবে এখন ব্যাপারটা কি দাঁড়াল জান ? এই নিরীহ বুকওয়ার্মের পিছু লাগতে হবে। দেখা যাক সে কি করে। কতটা তার বুদ্ধির দৌড় !

এমন সময় ক্লাসের ঘণ্টা বাজিল—ঢং ঢং ঢং।

সেদিন ক্লাসে সিণ্ডিকেটের ছেলে কয়টির সকলের নজর পড়িল পুস্তকরামের উপর। পড়ার বইয়ের উপর কল্যাণ, অমল ও সুরজিতের মনটা বড় বেশি বসিতেছিল না, তাহারা বুকওয়ার্মের দিকে বহির পৃষ্ঠা হইতে মুখ তুলিয়া লইয়া আড়চোখে চাহিতেছিল।

পুস্তকরাম কিন্তু একটিবারও কাহারও দিকে মুখ তুলিয়া তাকায় নাই, সে তাহার মনে নিবিষ্ট-চিত্তে বহির পাতার দিকেই নত-দৃষ্টিতে চাহিয়াছিল। সেদিন "ইংল্যাণ্ডের ইতিহাস"

পড়ান হইতেছিল। শুধু সে একবার মাস্টারমহাশয়কে একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিল, "If monarchy was to use in popularity, it was only by monarch living a good life, and keeping quite aloof from party." একথা প্রিন্স এলবার্ট রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়াকে কেন বলেছিলেন স্যার ?

তারক মাস্টারমহাশয় ছাত্রের প্রশ্নের উত্তরে এক সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিয়া গেলেন। ভিক্টোরিয়ার রাজত্বের প্রথম ভাগটা কেন শান্তিপূর্ণ ছিল না, আয়ার্ল্যান্ডে কি আন্দোলন চলিতেছে, লর্ড মেলবোর্ন রাজ্ঞীকে রাজনীতি-সম্পর্কে শিক্ষা ও উপদেশ দিতে কিরূপ আগ্রহ ও যত্ন প্রকাশ করিতেন, তারপর একদলের একজনের পরামর্শমত কাজ করিলে অপর দল বিরুদ্ধভাব পোষণ করিতে পারেন, এইসব নানা জটিল প্রশ্নের উত্তর-প্রত্যুত্তর মাস্টারমহাশয় বক্তৃতার সুরে বলিতে লাগিলেন। হঠাৎ তাঁহার নজর পড়িল কল্যাণের উপর। কল্যাণ মাস্টার মহাশয়ের এই সারগর্ভ বক্তৃতা যে শুনিতেছে না তাহা বিজ্ঞ অধ্যাপকের বুঝিতে বাকি ছিল না,— তিনি হঠাৎ কল্যাণকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন— আমরা এবার এ-বিষয়ে কল্যাণের আলোচনা শুনতে চাই। কল্যাণ একেবারে ঘামিয়া গেল এবং দাঁড়াইয়া বলিল— কাকে জিজ্ঞেস কচ্ছেন স্যার ? আমাকে স্যার ?— না অমলকে স্যার ?

ক্লাস শুদ্ধ সকলের দৃষ্টি একসঙ্গে কল্যাণের দিকে পড়িল।

তারক মাস্টারমহাশয় ব্যঙ্গ-সুরে কহিলেন— হ্যাঁ তোমাকে স্যার !

আমাকে স্যার ? আচ্ছা স্যার ! বলছি স্যার ! এই বলিয়া কল্যাণ অনর্গল বলিতে লাগিল 'The batsman is bowled when the stumps are hit and the bails are knocked off!' ক্লাসমধ্যে হা-হা—হো-হো শব্দে একটা হাসির রোল পড়িয়া গেল। অধ্যাপকের মুখ ক্রোধে লাল হইয়া উঠিল। তিনি ঘন ঘন দাড়িতে হাত দিতে দিতে বলিতে লাগিলেন— সাইলেন্স প্লিজ ! সাইলেন্স প্লিজ ! কিন্তু কোন ফল হইল না। ক্লাস ভাঙিয়া গেল। কল্যাণকে কি যে সাজা দিবেন তাহাই ভাবিয়া ঠিক করিতে না পারিয়া তারক মাস্টার কলেজের অধ্যক্ষের ঘরে চলিয়া গেলেন।

কল্যাণের পেছনে পেছনে ছেলেরা হল্লা করিয়া আসিতে আসিতে বলিতে লাগিল— সাবাস ভাই, কল্যাণ দা ! কি চমৎকার জবাবই দিয়েছ। কি ভাই কথাটা— The batsman is blowed when the stumps are hit and the bails are knocked off ! — সেদিন স্কুল ও কলেজের ক্লাসে ক্লাসে বোর্ডিংয়ের সর্বত্র এই অদ্ভুত প্রশ্নোত্তর লইয়া হাসির লহর বহিয়া গেল। —তারক মাস্টার মহাশয়ের নালিশ শুনিয়া অধ্যক্ষ হাসিয়া কহিলেন— The boy dreams in Cricket ! Please excuse him Tarak Babu !

তারক মাস্টার মহাশয় বাহিরে আসিয়া ক্রোধ ও উত্তেজনার সঙ্গে সঙ্গে বার বার বলিতে লাগিলেন— Lack of discipline! Lack of discipline! তারপর নিজের ঘরে চলিয়া আসিলেন। সে-দিন ঘরে ঘরে ছেলেদের মুখে মুখে কল্যাণের অদ্ভুত প্রশ্নোত্তরের বিষয় আলোচিত হইয়া সকলের মুখেই হাসি ফুটাইয়া দিয়াছিল। কল্যাণের যে কোন সাজা হইল না, তাহাতে ছেলেরা সকলেই খুসি হইয়াছিল। আর কল্যাণের সেই সিন্ডিকেটের লোকেরা ত তাহাকে একেবারে দিগ্বিজয়ী বীর আলেকজান্ডার করিয়া তুলিল। —কিন্তু কল্যাণের কিছুই ভাল লাগিতেছিল না, সে কি না খেলিতে পারিবে না,— অত বড় ম্যাচে ! তার কি না প্র্যাকটিস পর্যন্ত করা হইবে না !

সেদিন বিকেল বেলা একটা পরামর্শসভা বসিয়া গেল— স্কুলের লাইব্রেরিয়ানের ঘরে।

সে ঘরটা একটু নিরিবিলি। কলেজ বা স্কুল কম্পাউন্ডের এককোণে। লাইব্রেরিয়ান যামিনী বাবুকে ছেলেরা সকলেই খুব ভালবাসিত এবং লোকটিও ছিলেন খুবই মিশুক। অনেক দুঃস্থ ও দরিদ্র ছাত্র তাঁহারই সাহায্যে লাইব্রেরির বই পাইয়া পড়া চালাইত। যামিনীবাবুর কাছে বসিয়াছিল— স্কুলের ডিবেটিং সোসাইটির বা তর্কসভার সেক্রেটারি পরিতোষ। এই পরিতোষ কবিতা লিখিতে পারিত এবং সাহিত্যিকদিগের অনেকের পরিচয়ও তাহার জানা ছিল। সে রবিবাবুর সম্বন্ধে এমন সব কথা বলিত যে তাহা শুনিতে ছেলেরা সব উৎসুক হইয়া তাহার কাছে জড় হইয়া বসিত। শিলাইদহে রবীন্দ্রনাথ রোজ কয়টা ডাব খাইতেন, পদ্মার চরে বেড়াইতে গিয়া কবে ঝড়ের মুখে পড়িয়া বোট হইতে লাফাইয়া পদ্মা সাঁতরাইয়া পার হইয়াছিলেন সেসব সে জানিত। শুধু কি তাই ? রবীন্দ্রনাথ কোন কবিতাটি তাহার কাকার সঙ্গে পরামর্শ করিয়া ছাপিতে দিয়াছিলেন, কোনটি পদ্মার চরে বসিয়া লিখিয়াছিলেন, সে সবও তাহার অজ্ঞাত ছিল না। কেবল রবীন্দ্রনাথের কথাই নহে, বিশ্বসাহিত্যের সমুদয় শ্রেষ্ঠ লেখকগণের সব সংবাদই ছিল তাহার নখদর্পণে ! কাজেই এহেন শ্রীমান পরিতোষ বসু যে স্কুলম্যাগাজিন ও ডিবেটিং সোসাইটির সম্পাদক হইবে সে ত স্বাভাবিক।

যামিনীবাবু স্কুল ও কলেজের স্পোর্টের ছিলেন একজন পাণ্ডা। প্রিন্সিপালও এজন্য তাঁহাকে ভালবাসিতেন ও অনেক বিষয়ে নির্ভর করিতেন। সে সময়ে তাঁহাকে ধুতি চাদর পরিহিতবেশে মাথায় একটা সোলার হ্যাট পরিয়া ছুটাছুটি করিতে খুব দেখা যাইত। যামিনীবাবু কল্যাণের সম্বন্ধে সব খবরই বেশ আগ্রহের সহিত লইতেন। তাহার বন্ধুদের মত তিনিও মনে করিতেন যে কল্যাণ একটা জিনিয়াস। পড়াশুনার দিক দিয়া না হইলেও খেলার দিক দিয়া ত বটেই ! এজন্যই তিনি তাহার সম্বন্ধে একটু বেশী রকমের কৌতূহলী ছিলেন।

তিনি কল্যাণের উপর প্রভাত যে দণ্ড বিধান করিয়াছে, তাহাও জানিতেন। কল্যাণ ও তাহার দলের ছেলেরা যখন তাঁহার নিকট বই নিতে লাইব্রেরিতে আসিল, তখন তিনি সে বিষয়ে কিছুই জানেন না এইভাবে কল্যাণকে বলিলেন— কি খবর কল্যাণ ?

কল্যাণ বিমর্ষমুখে কহিল— খবর বড় ভাল নয় স্যার ! আমি খেলতে পারব না স্যার। এমন কি প্র্যাকটিসও করতে পারব না স্যার।

কেন বল ত ?

প্রভাত-দা আমাকে খেলতে বারণ করেছেন।

স্যার ! কবি ও সম্পাদক পরিতোষ গর্জন করিয়া বলিয়া উঠিল— ‘How’s that?’

যামিনীবাবু সেদিকে কোন লক্ষ্য না করিয়া স্নেহের সহিত বলিলেন : কেন বারণ করলে ? কি হয়েছিল ? কল্যাণ কিছু বলিল না, বলিল সুরজিৎ। সে সংক্ষেপে সব কথা বলিয়া গেল।

পরিতোষ টেবিলের উপরে প্রচণ্ডবেগে একটা মুষ্ট্যাঘাত করিয়া বলিল— আমি এই Prabhatism-এর against এইবারই একটা প্যারা ‘ম্যাগাজিনে’ দেব। এই বলিয়া সে যামিনীবাবুর দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিল— কি অন্যায় বলুন দেখি স্যার ! এইরকম করেই আমাদের দেশের লোকের কোন প্রতিভা থাকলে তাকে চেপে মারা হয়।

যামিনীবাবু বলিলেন— দেখ, কল্যাণের এখন যেমন প্র্যাকটিস করা প্রয়োজনীয়, তেমনি স্কুলের ডিসিপ্লিনটা যাতে থাকে তাও করা দরকার। প্রভাত ভাল করে থাকে কি মন্দ করে থাকে, সে বিচার আমি করতে চাই না। তার বিরুদ্ধে তোমরা যদি এখন কোন

একটা আন্দোলন কর তা হলে প্রিন্সিপালের কানে গেলে ভালর চেয়ে মন্দই হবে বেশি। একটু ভাবিয়া বলিলেন, তার চেয়ে একটা কাজ করলেই হয়— হ্যাঁ, ঠিক হয়েছে, ওহে গেলবার পুজোর ছুটিতে তোমরা কি নাটক করেছিলে ?

আজ্ঞে রবিঠাকুরের 'ডাকঘর' করেছিলুম।

বেশ, বেশ, বেশ ! তার সাজ-সরঞ্জামগুলি সব ঠিক আছে ত ?

পরিতোষ কহিল, সে তো স্যার, আমি বলতে পারব না। সে আমাদের সুরেশ বলতে পারবে।

আচ্ছা তোমরা তাকে আমার কাছে একবার পাঠিয়ে দাও তো পরিতোষ। আর একটা কাজ কর, সে তুমিই ভাল পারবে। পরিতোষ, তুমি প্রচার করে দাও, যে কলকাতা থেকে আমার ভাইপো মস্তবড় ক্রিকেট-খেলোয়াড় হারাণ বোস এসেছে। সে আজ বিকেলে টেস্ট ম্যাচ খেলার প্র্যাকটিসে যোগ দেবে।

পরিতোষ চলিয়া গেল। এবং খানিক পরে সে সুরেশকে সাজ-সরঞ্জামের বাক্সটিসহ পাঠাইয়া দিল।

বিকেল বেলা একদিকে যখন খেলোয়াড়রা জড় হইতেছিল, তখন অন্যদিকে, যামিনীবাবুর রুদ্ধগৃহে সুরেশ কল্যাণকে এক অনামা হারাণ বোস সাজাইতে আরম্ভ করিয়াছিল।

পরিতোষ অনেক আগেই মাঠে আসিয়া ছেলেদের মধ্যে ও অধ্যাপকগণের মধ্যে প্রচার করিয়া দিয়াছিল যে, যে-সে লোক নয়, বিখ্যাত ক্রিকেট-বীর হারাণ বোস, যে কথায়-কথায় সেঞ্চুরি করে, তিনি হচ্ছেন তাঁহাদের লাইব্রেরিয়ান যামিনীবাবুর ভাইপো। এবং তিনি আজই এখানে এসেছেন কাকার সহিত দেখা করিবার জন্য। আজ স্কুলে খেলার মাঠে ছেলেদের সহিত তাহার দেখা হবে।

এই কথা শুনিয়া মাঠ একেবারে সরগরম হইয়া গেল। কখন যামিনীবাবু তাঁহার বিখ্যাত ভাইপো হারাণ বোসকে লইয়া আসেন, ছেলেরা উৎকণ্ঠিত ভাবে তাহারই প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

সুরেশ কহিল, কল্যাণ মাথাটা এদিকে ফিরাও তো !

কল্যাণ তাহার ওষ্ঠের উপর যে সুদীর্ঘ গোঁফ জোড়াটি পরাইয়া দেওয়া হইয়াছিল, সেইটি দর্পণের ভিতর দিয়া দেখিয়া কহিল —সুরেশদা, একদম যে আমাকে গোঁফওয়ালা জাম্বুবান সাজাচ্ছ ! খুলে যাবে না তো ?

যামিনীবাবু সুরেশকে বলিলেন— হ্যাঁ হে, কল্যাণকে দাড়িও লাগিয়ে দেবে নাকি ? কল্যাণ কহিল, স্যার আমাকে আর W.G (বিখ্যাত ক্রিকেট খেলোয়াড় গ্রেস সাহেব) সাজাবেন না স্যার !

সে যাহাই হোক রূপদক্ষ শিল্পী সুরেশচন্দ্র, কল্যাণের মুখে রং মাখাইয়া, গোঁফজোড়া লাগাইয়া যখন তাহার সাজাইবার কাজ শেষ করিল, তখন কল্যাণের কাছে মনে হইল সে যেন কল্যাণ নহে, প্রকৃতই হারাণ বোস হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

যামিনীবাবু বলিয়া দিলেন— দেখ কল্যাণ, তোমায় বরাবর মাঠে গিয়ে ব্যাট ধরতে হবে। এবং আমরা খেলা শেষ করবার অল্প আগে গিয়ে সেখানে উপস্থিত হব। যেন তোমার সঙ্গে আলাপ করবার সুযোগ ছেলেরা কেউ না পায়।

তাহাই হইল, সকলে যখন খেলার মাঠে বসিয়া বসিয়া নবাগত হারাণ বোসের জন্য অধীরভাবে প্রতীক্ষা করিতেছিল সেই সময়ে যামিনীবাবু— হারাণ বোস ওরফে কল্যাণকে সহ খেলার মাঠে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন চারিদিকে ঘন ঘন হাততালি পড়িল, কিন্তু খেলা আরম্ভ হইবার সময় হইয়া যাওয়ায়, হারাণ বোসকে কাহারো সহিত কথা বলিবার সুযোগ না দিয়া যামিনীবাবু তাহাকে একেবারে ব্যাট হাতে দিয়া খেলিতে পাঠাইয়া দিলেন।

খেলা শেষ হইবার পর 'হারাণ বোস' যামিনীবাবুর ঘরের দিকে যাইতেছিল। যামিনীবাবুর সহিত তাহার সেইরূপ কথাই ছিল। তিনি একটু আগেই চলিয়া গিয়াছিলেন। এমন সময় প্রভাত দৌড়িয়া আসিয়া তাহার নিকট উপস্থিত হইল। তাহার হাতে ছিল একখানা অটোগ্রাফের বই। কল্যাণের বুক দুরু দুরু করিয়া কাঁপিয়া উঠিল, ভয় হইল বুঝি এইবার সে ধরা পড়িবে।

প্রভাত তাহাকে বেশ বিনীতভাবে নমস্কার করিয়া কাছে দাঁড়াইতেই কল্যাণ স্বরটাকে যথাসম্ভব পরিবর্তন করিয়া ত্রস্ত ভাবে কহিল— তোমার কি চাই ?

প্রভাত কহিল,—স্যার !—

—বল, বল, তাড়াতাড়ি বল, আমার গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। এই সাড়ে সাতটার ট্রেনেই কলকাতা ফিরে যেতে হবে। প্রভাত কহিল— আজ্ঞে হাঁ, তা আপনাকে আমি এক মিনিটের বেশি অপেক্ষা করতে বলছি না, এই বলিয়া তাড়াতাড়ি তাহার অটোগ্রাফের বইখানা আগাইয়া দিয়া কহিল— আপনি শুধু একটা সই করে দিন স্যার। আপনার সিগনেচারটা চাই-ই স্যার।

কল্যাণ কহিল— না—না—সে এখন আর হয়ে উঠবে না। আমি পেরে উঠব না, দেখছ ত সময় মাত্র নেই।

—বুঝলেম স্যার, তবু আপনার সিগনেচারের স্যার একটা ভ্যালু আছে ত !

কল্যাণ গুরুগম্ভীর ভাবে কহিল—হাঁ। সে হতে পারে। ইয়েস-ইয়েস-অফ কোর্স তবে—

হঠাৎ কল্যাণ বিপন্মুক্তির একটা পথের সন্ধান পাইল। সে একটু ভাবিয়া কহিল— আচ্ছা এক কাজ কর না কেন ? আমি কাকার ঘরে ফিরে যাচ্ছি, আমি সেখানে আমার সইটা রেখে যাব, তুমি পরে নিয়ে এসে সুবিধা মত খাতায় লাগিয়ে নিও।

—আজ্ঞে, আমি তাই করবো স্যার ! প্রভাত প্রফুল্ল মনে চলিয়া গেল।

কল্যাণ মনে করিল, উঃ কি বাঁচাই বাঁচলাম, অতি দ্রুত চলিলে পাছে কেহ কোনরূপ সন্দেহ করে, সেজন্য সে বেশ ভারিক্কি চালে যামিনীবাবুর বসিবার ঘরের দিকে যাইতেছিল।— কল্যাণ একবার পিছু ফিরিয়া তাকাইয়া দেখিল প্রভাত অনেকটা দূরে চলিয়া গিয়াছে। সে আবার খেলার মাঠের দিকেই ফিরিয়া যাইতেছে। কি মুস্কিল ! —এই গোঁফ জোড়াইত যত ফ্যাসাদ বাঁধাইয়াছে, ইহার হাত হইতে মুক্তি না পাইলে যে আর রক্ষা নাই। ইস্কুলের ছেলেরা সব দলে দলে যে তার হাতের লেখা আদায় করিতে ছুটিয়া আসিয়া তাহাকে বিব্রত করিয়া ফেলিবে।

সামনেই একটা ঘর খোলা ছিল। সেই ঘরটি ছিল স্কুলের কাপ্তেন মোহনের। সে তাড়াতাড়ি সেই ঘরের মধ্যে ঢুকিতেই দেখিতে পাইল মোহনের ঘরের ভিতরে স্কুলের বাড়ি-ঘরের পরিদর্শক রাজেন্দ্রবাবু একজন রাজমিস্ত্রির সঙ্গে স্কুলবাড়িতে নূতন চূণকাম করা এবং রং করা সম্বন্ধে উগ্রভাবে আলোচনা করিতেছেন। —রাজেনবাবু মিস্ত্রিকে

বলিতেছিলেন— দেখ বাপু, বুঝলে হ্যাঁ ?— এই স্কুলবাড়ি দেখতে দেখতে আমার মাথার চুল পেকে গেল হাঁ,— আমি আর বুঝতে পারি না,— তুমি সস্তা বাজে রং দিয়ে কাজ চালিয়েছ। —নইলে এমন মেটে মেটে হবে কেন ? বুঝলে হ্যাঁ !

রাজমিস্ত্রি বলিতেছিল— আপনি হুজুর, মা বাপ ! আমি কি হুজুর এমন বেইমানি কাজ করব, একথা কি বিশ্বেস করেন ?

—সে যাই বল মিস্ত্রি—এবার আর তোমাকে কন্ট্রাক্ট দোব না—প্রিন্সিপালকে বলে আর অন্য একজন ভাল লোককে দিব। বুঝলে হ্যাঁ—

কল্যাণ রাজেন্দ্রবাবু ও রাজমিস্ত্রির কথা শুনিয়াই তাড়াতাড়ি সে ঘর হইতে বাহির হইয়া পড়িল। উহারা দুইজনে এমনভাবে তর্কের মধ্যে নিমগ্ন ছিল যে অন্য কোন লোকের প্রবেশ ও প্রস্থানের সংবাদ তাহারা একেবারেই জানিতে পারে নাই।

কিন্তু এখন সে কি করিবে ? সোজা নিজের ঘরে যাওয়াই সব চেয়ে ভাল এবং নিরাপদ। সে আপনার ঘরের দিকে যাইতেছিল। ছেলেরা বেশির ভাগ তখন পর্যন্ত খেলার মাঠেই ছিল, কাজেই তাহাকে লক্ষ্য করিবার মত বড় কেহ একটা ছিল না। —কিন্তু তাহার এ নিশ্চিত ভাবনা কাটিয়া গেল। সে চলিতেছে এমন সময়ে কাহারা যেন পেছন হইতে ডাকিতে লাগিল—কল্যাণ ! কল্যাণ ! ও কল্যাণ দা— ব্যাটসম্যান—

—কি আশ্চর্য কেমন করিয়া তাহাকে চেনা গেল ? এখানে সুরেশের একটু ভুল হইয়াছিল। মুখের উপরে গোঁফ লাগান হইলে কি হইবে, পেছনের দিকে কোনরূপ সজ্জা, বা মাথায় কোনরূপ পরচুলা না লাগাইবার ফলে কল্যাণকে পেছন হইতে, চেনা লোকের পক্ষে চিনিয়া লইতে কোনরূপেই কঠিন ছিল না।

কল্যাণ প্রথমটায় এতটা বুঝিতে পারে নাই। সে পড়িল মহা বিপদে। পিছন হইতে যাহারা তাহাকে ডাকিতেছিল তাহাদের লক্ষ্য করাও চলে না, অন্যদিকে তাহার কাছে এটাও আশ্চর্য বলিয়া মনে হইল— হারাণ বোসের মত বিখ্যাত খেলোয়াড়কে—এরা কিরূপে চিনিতে পারিল ?

যাহারা কল্যাণকে ডাকিতেছিল তাহাদের নাম হইতেছে ননী আর মণি। এরা দুইটি যমজ ভাই। এমন দুষ্ট দুইটি ছেলে বোর্ডিংয়ে আর বড় কেহ ছিল না। তাহাদের সঙ্গে সহজে কেহ বড় একটা মিশিতে চাহিত না. কোন একটু ছুতানাতা পাইলে তাহারা যা তা করিতে পারিত। মিথ্যা কথা বলিতে, কাহাকেও জব্দ করিতে তাহারা দুই ভাই ছিল অদ্বিতীয়। এরা দুই ভাই কল্যাণের পাশাপাশি ঘরে থাকিত, কাজেই কল্যাণ ইহাদের স্বভাব বেশ ভাল ভাবেই জানিত।

একবার পেছনে তাকাইয়া সে দেখিতে পাইল যে মণি ও ননী তাহার পিছু পিছু ছুটিয়া আসিতেছে। —সর্বনাশ ! একবার যদি ইহাদের কাছে তাহার ছদ্মবেশ ধরা পড়ে, তবে আর কোন উপায় নাই, রাত্রিতেই সারা বোর্ডিংয়ে এই কথা ছড়াইয়া পড়িবে। আর সাজার মাত্রাটা আবার অসম্ভব রকমে বাড়িয়া যাইবে।

কল্যাণ তাড়াতাড়ি দোতালায় তাহার পড়িবার ঘরে আসিয়া পৌঁছিল। দরজাটা সামান্য একটু খোলা ছিল। সে ঘরে ঢুকিয়া দেখিল ঘরটি খালিই আছে।

সে তাড়াতাড়ি একটা চেয়ারের উপর বসিয়া হাঁফ ছাড়িতে ছাড়িতে নিজের মনে বলিল— উঃ বাঁচা গেল। গোঁফের কি জ্বালা ! এখানে ননী ও মণির আসা ত অসম্ভব নয়। তখন হঠাৎ তার মনে পড়িল যে অমরের ঘর খালি আছে। সে এখনও মাঠে প্র্যাকটিস করিতেছে, তাহার ফিরিতে ন্যূনপক্ষে আরও এক ঘণ্টা লাগা ত অসম্ভব নয় !

অমনি সে ২৩নং ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইল। এ ঘরটি একেবারেই খালি ছিল। সে তাড়াতাড়ি দরজাটা বন্ধ করিয়া দিয়া মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল এবং মনে মনে কহিল— গোঁফ জোড়ার হাত থেকে রেহাই পাওয়ার ব্যবস্থা করা যাক।

একি! কল্যাণ গোঁফ টানিয়া খুলিতে গিয়া দেখিল, সে ব্যাপারটাকে যত সহজ মনে করিয়াছিল তাহা নহে। গোঁফ যে খুলিয়া আসে না—এ যেন তাহার আসল গোঁফ। সে শত টানাটানি করিয়াও কিছুতেই মুখ হইতে গোঁফ টানিয়া তুলিতে পারিতেছিল না।

এমন সময় সে শুনিতে পাইল যে মণি ও ননী কাহার সঙ্গে বচসা করিতেছে।

কল্যাণ সিঁড়িতে তাহাদের পায়ের শব্দ শুনিয়া সম্পূর্ণ নিরাপদ হইবার জন্য অমরের বিছানার চাদরটা দিয়া সারা শরীর ঢাকিয়া একেবারে তাহার পড়ার টেবিলের নীচে গিয়া লুকাইল।

সে শুনিতে পাইল মণি ও ননী তাহাদের ঘরের দরজা খুব জোরে ধাক্কা দিতেছে।

খানিক পরে ঝনাৎ করিয়া শব্দ হইল এবং তাহাদের পড়ার ঘরের দরজাটা ভিতর হইতে খুলিয়া গেল। ননী উচ্চৈঃস্বরে কহিল— একি, পুস্তকরাম বাবু, একি স্যার! তুমি আমাদের ঘরে কেন এসেছিলে স্যার?

মণি কহিল— এক্ষুনি ঘর থেকে বেরিয়ে যাও।

ননীও সঙ্গে সঙ্গে বলিল— বেরিয়ে যাও আমাদের ঘর থেকে। মণি আবার কহিল, কেন এসেছিলে বল না?

পুস্তকরাম কাঁদো-কাঁদো স্বরে কহিল— আমি তোমাদের ত কোন ক্ষতি করিনি।

ননী কহিল— জান আমার টেবিলের ড্রয়ারের ভিতর একখানা দশ টাকার নোট ছিল, যদি নোটখানা না পাই, তাহলেই টের পাবে মজাটা— বুঝলে বুকওয়ার্ম, স্যার!

কল্যাণ শুনিয়া হাসিল। পুস্তকরামকে জব্দ করিবার জন্য এই যে একটা মিথ্যা অভিযোগ ননী উপস্থিত করিল, তাহার ভিতরে সত্য কিছুই নাই, শুধু এইরূপ অবস্থায় তাহাকে পাইয়া জব্দ করাই ছিল তাহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য।

পুস্তকরাম কহিল— আমি তোমাদের ঘরের কোন জিনিসে হাত দিই নাই।

—তা বেশ! তবে এই হাতুড়িটা দিয়ে কি কচ্ছিলেন মশাই? হাঁহে— পুস্তকরাম, বাইরে ত দিব্যি ভাল মানুষটি সেজে থাক, দিনরাত বইয়ের পাতার দিকে তাকিয়ে থাক। এদিকে লুকিয়ে লুকিয়ে সিঁদেলগিরি শিখলে কবে, বল না?

কল্যাণ শুনিয়া চমকাইয়া উঠিল। সে যেন অন্ধকারের ভিতর দিনের আলো দেখিতে পাইল। বাঃ রে বাঃ! পুস্তকরাম! বাহবা! ননী ও মণির ঘরের দেওয়াল ঠুকে বেড়াচ্ছিলে? ভারী চমৎকার ত! উঃ—বাছাধন! গোপনে গোপনে আমার কাকার সেই স্ট্যাম্পের খোঁজ করে বেড়াচ্ছেন।

ননী আর মণি দুইজনে খুব শক্ত করিয়া পুস্তকরামের হাত চাপিয়া ধরিল।

পুস্তকরাম অতি করুণ স্বরে কহিল— কি কচ্ছো! হাত যে ভেঙে গেল! উঃ উঃ বড্ড যে লাগছে! ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও—

যাক না ভেঙে! সহজে তোমাকে ছেড়ে দিচ্ছিনে।

পুস্তকরাম কহিল— আঃ হাত ছেড়ে দাও, গোল কর না ভাই। আমার সঙ্গে এস না? তোমাদের ঘরে কেন এসেছিলুম, সে কথা বলব এখন। সে ভাই অনেক কথা। ভেরি ইন্টারেস্টিং, চল না আমার ঘরে—

পুস্তকরাম কহিল— তোমাদের পায়ে পড়ি ভাই, চল আমার ঘরে তখন বুঝতে পারবে

সব কথা। আমি কোন ব্লাফ দিচ্ছিনে, আচ্ছা চল। তাহারা তিনজনে চলিয়া গেল। কল্যাণ নিরাশ হইল। পুস্তকরাম কি কথা ইহাদের কাছে বলিবে তাহা শুনিবার আর কোনও সম্ভাবনা রহিল না।

কল্যাণ বন্ধুদের সাহায্যে গোঁফ মুক্ত হইয়া তাহার পড়িবার ঘরে আসিয়া দেখিল ননী ও মণি সেখানে বসিয়া আছে। কল্যাণকে দেখিয়া ননী কহিল— কল্যাণদা ভাই, তুমি তখন আমাদের দেখে ওরকম করে পালিয়ে গেলে কেন বলত ?

কল্যাণ কহিল— আমার ভাই বড় জরুরি কাজ ছিল। তারপর প্রসঙ্গটা অন্যদিকে ফিরাইবার জন্য সে কহিল— হ্যাঁ হে তোমার হাতে ওখানে কিসের ছবি ? —ননী ছবিখানা কল্যাণের কাছে টেবিলের উপর রাখিয়া দিল। মণি বলিল— কল্যাণদা, এখানা খুব পুরানো ছবি। পুরানো কলকাতা কেমন ছিল এ তারই চিত্র। তুমি আমাদের ঘরের এই ছবিখানাকে বরাবরই খুব সুখ্যাতি করেছ।

কল্যাণ বলিল— তাই নাকি ! আমার তো মনে হয় না।

মণি বেশ জোর করিয়া বলিল— কি যে বল ! তুমি অনেকবার এ-ছবির সুখ্যাতি করেছ। সেজন্যই আমরা তোমার কাছে নিয়ে এসেছি। তুমি যদি ছবিখানা রাখ তা হলে বেশ হয়। আমাদের দু'ভায়ের বড় টাকার টানাটানি যাচ্ছে কিনা তাই আমাদের অনেক আসবাবপত্রই বেচে ফেলতে হচ্ছে। পুস্তকরামের কাছেও কতকগুলো বই নিয়ে গিয়েছিলাম, সে বইগুলি কিনে নেবে। মণি আবার হাসিয়া কহিল— তোমার ঘরে কিন্তু ভাই ছবিটা খুব মানাবে। দেয়ালের গায়ে টাঙিয়ে দিলে বেশ দেখাবে। কত দেবে বলত ? কল্যাণ কহিল— তোমরাই বলে ফেল।

তা হলে ভাই কল্যাণদা আমাদের দু টাকা দিও। ননী বলিতে লাগিল— কল্যাণদা তোমার জোর বরাত তাই এত সস্তায় এমন একখানা চমৎকার ছবি পেলে। দেখ দেখি, সে কালের গঙ্গার পারের দৃশ্য কি চমৎকার দেখাচ্ছে। কোথায় ছিল ভাই এমন সুন্দর সব বাড়িঘর ? কেবল নারকেল গাছের সারি আর জঙ্গল দিয়েই সেকালের কলকাতার শোভা ছিল। ঐ কিনারাটায় দেখ কতকগুলি জেলে ডিঙি সারি সারি জলের ভেতর জড় হয়ে আছে।

কল্যাণ দেখিল— মহাবিপদ ! এই ছবি না কিনে আর উপায় নেই, কেন-না ননী বলিতেছিল কল্যাণদা কি বল, ছবিখানা তোমার দেয়ালের গায়ে একেবারে টাঙিয়ে দি ? যেমন বলা অমনি সে তার পকেট হইতে একটি ছোট হাতুড়ি বাহির করিল এবং দেয়ালের গায়ে পেরেক ঠুকিতে আরম্ভ কবিল।

কল্যাণের বুঝিতে বাকি রহিল না যে এই দুষ্ট ভাই দুইটির কাছে পুস্তকরাম লুকানো স্ট্যাম্পের কথা বলিয়া দিয়াছে। পুস্তকরামই এই দুই জনকে কোন প্রকারে কৌশল করিয়া তাহার ঘরের সন্ধান লইতেও নিযুক্ত করিয়াছে ! তাই ননী যখন বেশ জোরের সঙ্গে দেয়ালে ঠুকিতেছিল তখন কল্যাণ সহসা ননীর হাত ধরিয়া কহিল, খবরদার আমার ঘরের দেয়াল নষ্ট করোনা। তোমাদের টাকা নাও। আর যাও এঘর থেকে— এখন পালাও—

ননী এইবার গর্জন করিয়া বলিল : বাঃ এমন কি করলাম যে তুমি এমন ভাবে ধমকাচ্ছ ?

কল্যাণ একটি কথা না বলিয়া দুই ভাইয়ের সম্মুখে দুইটি টাকা ঝনাৎ করিয়া ফেলিয়া দিল। তাহারা দুই ভাই টাকা দুইটি কুড়াইয়া লইয়া বলিল, তাহলে দেখছি তোমার ঘরে

ছবি টাঙাবার জন্য আমাদের সাহায্যের দরকার নেই।

কল্যাণ কোন কথা না বলিয়া তাহাদের দুই ভাইয়ের হাত ধরিয়া তাহার ঘর হইতে বাহির করিয়া দিল। এই সময়ে তাহাদের সিন্ডিকেটের আরও দুইজন সভ্য তাহার ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহারা ঘরে ঢুকিলে পর কল্যাণ আস্তে আস্তে দরজাটা ভেজাইয়া দিয়া কহিল, কি জ্বালায়ই পড়েছিলুম!

অমল কহিল— কেন কি হয়েছে?

কল্যাণ তখন ননী ও মণির কাছ হইতে ছবি কেনার কথা বলিল এবং তাহারা ছবিটা শুধু বেচিয়াই ক্ষান্ত ছিল না উহা দেয়ালের গায়ে টানাইয়া দিবার জন্যও যে তাহাদের বেশ ব্যগ্রতা ও ঔৎসুক্য দেখা গিয়াছিল এ কথাও বলিল।

সুরজিৎ কহিল— কল্যাণ, তুমি ভাই এত বোকা তা তো জানতুম না! এ ছাই-ভস্ম ছবি কেউ আবার দু টাকা দিয়ে কেনে?

কল্যাণ ধীরভাবে বলিল— দেখ আমি ছবির দাম কি তা বুঝি তবে একটা কথা বেশ বুঝতে পেরেছি, আমার কাকার স্ট্যাম্পের কথা এই বোর্ডিংয়ের সকলেই জানতে পেরেছে। ননী ও মণি শুধু ছবি বেচতেই আসেনি তারা দেয়াল ঠুকে স্ট্যাম্পের খবর নিতেও এসেছিল। আর এদের এই চর পাঠিয়েছিল কে জান? তোমাদের সেই বন্ধু পুস্তকরাম।

অমল ও সুরজিৎ একসঙ্গে চিৎকার করিয়া বলিল— কি বল?

কল্যাণ হাসিতে হাসিতে বলিল— আমি যা বলছি তার এক বর্ণও মিথ্যে নয়। ননী ও মণি আমার ঘরের দেয়াল ঠুকে স্ট্যাম্পের কোন সন্ধান মিলে কিনা সেইজন্যই ছবি বেচবার অজুহাতে দেয়াল ঠুকতে এসেছিল।

এমন সময় তাহারা তিনজনে শুনিতে পাইল, কে বা কাহারা যেন ঠুক ঠক করিয়া দেয়ালে ঘা দিয়া যাইতেছে! কল্যাণ বলিল— ঐ শোন, ননী আর মণি বড় সহজ ছেলে কিনা! তারা চুপ করে থাকবে কেন? তাই তারা দেয়াল ঠুকে ঠুকে বেড়াচ্ছে।

এইবার সুরজিৎ কহিল— তাহলে আমাদের আর চুপ করে থাকা চলে না। সিণ্ডিকেটের একটা জরুরি সভা ডেকে যা হয় একটা ব্যবস্থা করা যাক। কল্যাণ কোন কথা কহিল না। তাহার মনের মধ্যে তখন কি ভাবে কেমন করিয়া কাকার লুকানো স্ট্যাম্প বাহির করা যাইতে পারে সে সম্বন্ধে নানারূপ চিন্তার উদয় হইয়াছিল।

আরও কয়েকদিন কাটিয়া গেল। স্ট্যাম্প সম্বন্ধে যে আগ্রহটা দুইদিন পূর্বে সিণ্ডিকেটের সভ্যদের মনে বিশেষভাবে নাড়াচাড়া দিয়াছিল তাহার গতিও অনেকটা মন্দ হইয়া আসিয়াছিল। কিন্তু কল্যাণের এই কথাটাই বিশেষভাবে মনে হইতেছিল এখন সে কি করিবে, তাহার কাকা স্ট্যাম্পগুলি কোথায় কিভাবে লুকাইয়া রাখিয়াছেন সে কথা ত সে আর জানে না। তারপর এমনই তাহার দুর্ভাগ্য যে তাহার একান্ত প্রিয় যে ক্রিকেট খেলা তাহাও সে খেলিতে পারিবে না। তাহার মনের যখন এইরূপ অবস্থা সে সময় সুরজিৎ বলিল— ভাই ম্যাচ খেলার দিনও তো এগিয়ে এল। প্রভাত-দা যে কি করলেন কিছুই বুঝতে পারলাম না। তোমার কি খেলা হবে না!

কল্যাণ বিমর্ষভাবে কহিল,— আরও কয়েকটা দিন না গেলে ত আর খেলার মাঠে বেরুতে পারব না। কি আর করা।

পরের দিন ঘটিল এক আশ্চর্য ঘটনা। কল্যাণ সেদিন যখন খেলা-ধূলার বিষয়ে যে নোটিশ-বোর্ডটি টাঙান থাকে সেখান দিয়া যাইতেছিল, সে সময় সে দেখিতে পাইল যে

নোটিশ-বোর্ডে খেলোয়াড়দের যে নাম টাঙান আছে তাহার মধ্যে তাহার নামও রহিয়াছে। স্কুল ও কলেজের ওল্ড বয় ও নিউ বয়দের মধ্যে আসছে শনিবার দিন একটা ম্যাচ খেলা হবে, সেই খেলোয়াড়দের মধ্যে অবশ্য নিউ বয়দের মধ্যে তাহার নামও রহিয়াছে।

কল্যাণকে খেলিতে দেওয়া হইয়াছে, এ সংবাদটা যেমন স্কুলের ছেলেদের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িল, তখন তরুণদের মনে যে কিরূপ আনন্দ হইয়াছিল, তাহারা সে পরিচয় শুধু বাক্যে নয়, কার্যেও দেখাইতে আরম্ভ করিল। কল্যাণকে তাহারা কাঁধে করিয়া লইয়া সারা মাঠে ঘুরিয়া বেড়াইল। খেলার মাঠ তাহাদের আনন্দ ধ্বনিতে মুখরিত হইয়া উঠিল।

কল্যাণ তাহার এই সব ভক্তদের হাত হইতে উদ্ধার পাইয়া সকলের আগে কাপ্তেন মোহনের কাছে আসিল। সে মোহনকে আন্তরিক ভাবে ধন্যবাদ দিয়া বলিল— মোহনদা, তোমার জন্যেই ভাই খেলতে পাব।

মোহন কহিল— যামিনীবাবুর জন্যই তুমি খেলতে পেলে। তিনি তোমার জন্য যা করেছেন তা আর বলবার নয়। চল তাঁর কাছে যাই।

মোহন ও কল্যাণ যামিনীবাবুর বসিবার ঘরে আসিলে পর, যামিনীবাবু হাসিয়া বলিলেন, ওহে কল্যাণ, আমাকে একটা অটোগ্রাফ দাও ত! তুমিত আর যে সে লোক নও। প্রভাতকে ত দিয়েছ?

কল্যাণ হাসিল।

যামিনীবাবু বলিলেন— যেমন তোমাকে খেলতে নেওয়া হয়েছে, তেমনি কিন্তু খুব ভাল খেলতে হবে।

আমি যদি একবার বেশ ভাল করে প্র্যাকটিস করতে পারতাম স্যার, তবে বেশ হত।

মোহন কহিল— সে বোধ হয় পারা যাবে। আমি প্রভাতকে বলে দিব, যাতে সে সম্বন্ধে কোন গোল না হয়, তা করব এখন। তারক মাস্টার মহাশয়কে বলিলেই হইবে, তিনি তোমাকে বেশ স্নেহ করেন, যদিও পড়াশুনা কর না বলে— সর্বদাই তোমার মন্দ বলেন। কথাটা ত কেবল মিথ্যেও নয়, যদি খেলার সঙ্গে সঙ্গে পড়াশুনায়ও মন দিতে তাহলে বেশ হত।

তারক মাস্টার মহাশয়ের কাছে কাপ্তেন মোহন কথাটা তুলিতেই তিনি উৎসাহের সঙ্গে কহিলেন— দেখ মোহন, ছেলেটা বেশ খেলে কিন্তু, জান ঐ ক্রিকেট খেলাই তার ধ্যান-জ্ঞান, পড়ার কথা বলতে গিয়েও খেলার কথা বলে। আচ্ছা সে হবে, আমি প্রভাতকে বলে দেব।

প্রভাতের মনে মনে একটা বিশ্বাস ছিল যে, খেলা জিনিসটা কিছুই নয়। প্রায়ই তার মুখে শোনা যেত— Any ass can play games আর সে নিজে একজন ন্যাচারাল অ্যাথলিট। তার মনে হইয়াছিল একজন সিনিয়ারকে ছাড়িয়া কিনা জুনিয়ার কল্যাণকে স্কুলের ও কলেজের ক্রিকেট খেলায় নেওয়া হয়! কি অন্যায়, কি অবিচার! এইবার ওল্ড ও নিউ বয়দের মধ্যে যে খেলা হইবে, তাহাতেও তাহার নাম নাই দেখিয়া সে যখন অত্যন্ত অশান্তি ও অতৃপ্তি বোধ করিতেছিল, ঠিক সেই সময়ে তারক মাস্টার মহাশয় প্রভাতের ঘরে আসিলেন।

তিনি তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ গাম্ভীর্যের সহিত কহিলেন— তুমি বোধ হয় শুনেছ যে আমাদের ওল্ড বয়েজ ও নিউ বয়েজদের— এই দুই দলের মধ্যে একটা খেলা হবে।

হ্যাঁ স্যার।

বেশ, তুমি কল্যাণকে কয়েকদিন পর্যন্ত কোন খেলায় যোগ দিতে পারবে না বলে

আদেশ দিয়েছিলে ? —হ্যাঁ তা ঠিক হয়েছে, শাসন ত চাই-ই নইলে কি ডিসিপ্লিন থাকে ? মাথা নিচু করিয়া প্রভাত কহিল,— হ্যাঁ স্যার !

কিন্তু কল্যাণ বেশ ভাল খেলোয়াড়, তা তুমি মান । — প্রভাত কোন কথা কহিল না ।

তারক মাস্টার মহাশয় বলিলেন— তা কয়েকদিন ত হয়ে গেছে, এইবার তুমি সেই আদেশটা বাতিল করে দাও ।

প্রভাত নেহাৎ নিরুপায় হইয়া আস্তে আস্তে কহিল— আচ্ছা স্যার !

তারক মাস্টার মহাশয় অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন । এইবার স্কুলের বোর্ডিংয়ের সম্বন্ধে অন্যান্য কথার আলোচনা চলিতে লাগিল । ...

ওল্ড বয়েজ ম্যাচের দিন ক্রমশই নিকটে ঘনাইয়া আসিতে লাগিল । — কল্যাণ স্ট্যাম্প খোঁজার জন্য কোনরূপ ব্যগ্রতা প্রকাশ না করিয়া, খুব মন দিয়া খেলার অভ্যাস করিতে লাগিল । তাহার সঙ্কল্প হইল, সমুদয় বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া সে যখন আবার খেলার সুযোগ পাইয়াছে, তখন যাহাতে খেলার মাঠে তাহার পূর্ব কৃতিত্ব সম্পূর্ণভাবে বজায় রাখিতে পারে, তাহাই তাহাকে করিতে হইবে । কাজেই আবার সে পূর্ণ উদ্যমে খেলার দিকে ঝুঁকিয়া পড়িল...

এদিকে স্কুলের কর্তারাও একটু বিশেষভাবে চিন্তিত হইয়াছিলেন, কেন-না, এই খেলার পরই তাহাদের ক্রিকেট-দলের সঙ্গে আবার সহরের দলের একটা বড় খেলা হইবে । কৃষ্ণনগরের দলে— অমরনাথ, নামকরা খেলোয়াড়, তাহার বলের কাছে টিকিয়া থাকা বড় সহজ নয় । কৃষ্ণনগরের দল— সেকালে ঢাকা সহরের, কলিকাতার, হুগলির ও অন্যান্য স্থানের বিখ্যাত খেলোয়াড়দলের সহিতও খেলিয়া বিজয়ী হইয়া আসিয়াছে । এরূপ স্থলে তাহারা যে জয়ী হইতে পারিবে, সে বিষয়ে খুব বেশি ভরসাও ছিল না ! তবু নিশ্চয়ই খেলিতে হইবে এবং যেভাবেই হউক বিজয়ী হইবার জন্য সতর্ক ও সচেষ্ট হইতে হইবে ।

শনিবার খেলার দিন । এক দিকে ওল্ড বয়েজ ইলেভেন আর অন্য দলে স্কুলের বাছাই দল । এই খেলায় দুই দলের মধ্যে যাহারা কৃতিত্ব দেখাইতে পারিবে, তাহাদের মধ্যে হইতেই খেলোয়াড় বাছাই করিয়া কৃষ্ণনগরের খেলার দল গড়িতে হইবে— স্কুল ও কলেজের কর্তৃপক্ষীয়েরা ইহাই স্থির করিয়াছিলেন ।

ওল্ড বয়েজ ইলেভেন দলে বল দিতেছিল শৈবাল । শৈবালের দিকে কল্যাণ বিশেষ লক্ষ্য করিতেছিল । বিড়াল যেমন ইঁদুরের দিকে লক্ষ্য করে, কল্যাণও তেমনিভাবে শৈবালের দিকে লক্ষ্য করিতেছিল ।

শৈবালের বয়স হইবে প্রায় কুড়ি বছরের কাছাকাছি । লম্বা সবল চেহারা । নাকটি সরু নয়, মোটা ও মাঝখানটায় চেপ্টা— ছয় ফিটের মত সে লম্বা । সে যেন মাথা নিচু করিতেই চাহে না । হেড মাস্টার মহাশয় এবং কলেজের অধ্যক্ষ আসিলে পর সে ঘাড়টা একটু নামাইয়াছিল মাত্র । তারপর সে মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইল । সে দলের ক্যাপ্টেন এবং ভাল খেলিতে পারে বলিয়াও তাহার সুনাম আছে । বল দিতে শৈবালের খুবই নাম ছিল । অনেকেই তাহাকে ফাস্ট বোলার বলিয়া অত্যন্ত ভয় করিত ।

কল্যাণদের দলের ও তাহাদের দলের মধ্যে যখন টস হইতেছিল, তখন শৈবাল কহিল হেড, হইলেও তাই । তখন তাহার দলের লোকেরা চলিল ব্যাট করিবার জন্য আর জুনিয়ারের দল প্রস্তুত হইল ফিল্ড করিতে ।

কল্যাণের পাশে অমল দাঁড়াইয়াছিল, সে তাহাকে কহিল— তুই শৈবালের দিকে অমন

করে তাকিয়েছিলি কেন ?

কল্যাণ হাসিয়া বলিল— জানিস ভাই অমল, শৈবাল ভাবছেন, কয়টা উইকেট নেবেন। তাই দেখছিলাম।

ঘণ্টা বাজিল। তাঁবুর ভিতর হইতে কল্যাণ ও দলের সকলে মাঠের দিকে ফিল্ড করিতে চলিল। শীতকালের সেই সুন্দর দিনটিতে সূর্যের উজ্জ্বল কিরণে চারিদিক সজীব হইয়া পড়িয়াছিল। সবুজ মাঠে ঘাসের বুকে শ্যামলতার উজ্জ্বল-শ্রী ফুটিয়াছিল। ছেলের দল ছোট বড় সকলে দল বাঁধিয়া সার দিয়া বসিয়াছিল। আশে-পাশের দশ-পনেরো গ্রামের লোকের প্রত্যেকবার এই স্কুলের খেলাধূলার সময় যেমন আনন্দের সহিত যোগ দেয়, এইবারও তেমনি সব আসিয়াছিল। ছোটদের কি আনন্দ! তাহাদের আনন্দ-কোলাহলে চারিদিক মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল। বিশেষ অনেক দিন পরে কল্যাণকে খেলার মাঠে যাইতে দেখিয়া চারিদিকে হাততালি ও আনন্দ-কোলাহল জাগিয়া উঠিল।

খেলা আরম্ভ হইল। সুবিনয় ও কল্যাণ দুইজনেই প্রথমটায় একটু নার্ভাস হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু ক্রমে ক্রমে তাহাদের হাত বেশ খুলিয়া গেল। লং লেগে দুইটা হিটসের বল প্রথম তাহার হাতছাড়া হইয়াছিল, কিন্তু ক্রমশই সেই ভাবটা কমিয়া আসিল।

শৈবালদের অর্থাৎ ওল্ড বয়েজ ইলেভেনের যে দুইজন ব্যাট করিতেছিল, তাহারা বেশ ভাল খেলিতেছিল। মাঝে মাঝে এমন জোরে বল মারিতেছিল যে একেবারে বাউন্ডারি পার করিয়া দিতেছিল।

কল্যাণের এ পর্যন্ত খেলার মধ্যে দেখাইবার মত বিশেষ কোন সুযোগ আসে নাই, কোন বলটা হয়ত তাহার মাথার উপর দিয়া বোঁ বোঁ করিয়া চলিয়া গেল, সে লাফাইয়াও নাগাল পাইতেছিল না। কোন বলটি বা এতটা দূর দিয়া চলিয়া গেল যে সে উহা ধরিতে ও ছুঁইতে পারিল না। এজন্য সে যেন একটু বিমর্ষ হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার কেবলই ইচ্ছা হইতেছিল, সে এমন একটা কৃতিত্ব দেখাইবে যাহাতে দলের লোকেরা বিশেষভাবে আনন্দিত হয়।

এমন সময় মস্ত বড় একটা হিট উপর হইতে তাহার দিকে ছুটিয়া আসিল। সে যতটা কাছাকাছি পাইবে মনে করিয়াছিল তাহা হইল না। সে যেখানে দাঁড়াইয়াছিল, তাহার অনেকটা দূরে হইলেও সে খুব জোরে দৌড়াইয়া একটা লাফ দিয়া বলটির দিকে লক্ষ্য করিয়া হাত বাড়াইয়া দিল। —আশ্চর্য! —বলটি একেবারে তাহার হাতে আসিয়া পড়িল।

সারা মাঠের লোকেরা একসঙ্গে চিৎকার করিয়া উঠিল— 'ওয়েল কট্ !' 'ওয়েল কট !' আর সঙ্গে সঙ্গে ঘন ঘন হাততালি। কল্যাণের কানে এল 'ওয়েল কট !' শব্দটি যেন একেবারে মধু বর্ষণ করিতেছিল।

যামিনীবাবু মাঠের মাঝখানে দৌড়িয়া আসিয়া বলিলেন— ওয়েল কট কল্যাণ ! আমার ত মনে হইয়াছিল, কি জানি তোমাকে যেমন নার্ভাস দেখলুম, তাতে একটু ভয়ই হয়েছিল, ভেবেছিলাম ফিল্ডিঙে তুমি সুবিধে করতে পারবে না। কিন্তু— উঃ অত দূর থেকে ছুটে এসে কেমন করে যে বলটা ধরলে আশ্চর্য বলতে হবে বই কি ! গুড !

ক্যাপ্টেন মোহনও তাহার কাঁধে হাত দিয়া বেশ একটা ঝাঁকুনি দিয়া কহিল— কি করে যে অতদূর থেকে ছুটে এসে বলটা ধরলে তাই ভেবে ঠিক করতে পাচ্ছি না। খুব সাবধানে এমনি করে খেলো, আজ যদি আমরা জিততে পারি তবে হবে মস্ত বড় একটা গ্লোরিয়াস ডে, বুঝলে ?

এমন সময় স্কোর বোর্ডে উঠিয়াছিল Total 42, 2 Wickets, last man 30। এইবার খেলিতে আসিল ওল্ড বয়েজ ইলেভেনের দলের ক্যাপ্টেন শৈবাল। শৈবালকে ব্যাট হাতে খেলার মাঠে আসিতে দেখিয়া দলের লোকেরা খুব উৎসাহিত হইয়া হাততালি দিতে আরম্ভ করিল।

শৈবাল খেলিতে আসিল। প্রথম আসিয়াই সে দুইবার দু'টা বাউন্ডারি করিয়া চার চার আট রান করিল। তারপর সে আর ভাল খেলিতে পারিল না। পয়েন্টের কাছে একটি ছোট ক্যাচ দিয়া সে আউট হইল।

শৈবাল আউট হইবার পর মাথা নিচু করিয়া প্যাভিলিয়ানে চলিয়া গেল এবং তাহার নির্দিষ্ট আরামকেদারা খানিতে শুইয়া পড়িল— খেলার প্রতি তাহার যে আর কোনোরূপ আকর্ষণ আছে তাহা মনে হইল না।

ওল্ড বয়েজ ইলেভেনের সিক্সথ উইকেটের পর স্কোর বোর্ডে মাত্র রান উঠিয়াছিল ৯০!

এ সময়ে টিফিনের ঘণ্টা বাজিল।

তারপর আবার খেলা চলিল। ওল্ড বয়েজ ইলেভেনের দুইজন অনেকটা সময় বেশ ভাল খেলার দরুন তাহাদের দলের রান একশ চল্লিশে পৌঁছিয়াই ইনিংস ক্লোজড হইল।

গেল বছর ওল্ড বয়েজ ইলেভেনের দল তিন সেঞ্চুরির রান করিয়াছিল। আর এই বৎসর তাদের স্কোর একশো চল্লিশের কোঠাতেই ঠেকিয়া গেল। এজন্য স্কুলের ছেলেদের মনে খুবই আনন্দ হইয়াছিল।

আজ কল্যাণ সহরের এতগুলি সম্ভ্রান্ত লোকের সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ পাইয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছিল।

প্যাভিলিয়ানের একপাশে বসিয়া সুরজিৎ, অমল ও তাহাদের দলের আরও দুই একজনের সহিত টেবিলে বসিয়া খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মাঝে মাঝে তাহার সেই Cape of Good Hope-এর একশত বৎসরের পুরানো ডাক-টিকিটের কথা মনে হইতেছিল। এখন যে তার দাম অনেক বেশী হইবে সে কথা মনে করিয়াও তাহার বেশ আনন্দ হইতেছিল। সে সুরজিৎকে কহিল— দ্যাখো কাকার সেই পুরানো ডাকটিকেট যদি পাওয়া যেত তা হলে আমরা অনেক টাকা পেতাম। কি করব খুঁজে তো আর পেলাম না।..

তাহাদের ডাকটিকেটের কথা আর বলা হইল না, ঘণ্টা বাজিল। এইবার কল্যাণদের দলের ব্যাট করিতে হইবে।

শৈবাল তাহার দলের খেলোয়াড়দের লইয়া খেলিতে গেল। এইবার শৈবালকে খেলার দিকে খুবই উৎসাহী দেখা গেল। সে খেলোয়াড়গণকে কে কোথায় দাঁড়াইয়া বল ধরিবে ফিল্ডিংয়ের জন্য তার ইচ্ছামত সকলকে দাঁড়াইবার ব্যবস্থা করিয়া দিল।

কল্যাণ দেখিল— শৈবাল বাস্তবিকই একজন ভাল বোলার। শৈবালের চেহারাটি যেমন দীর্ঘাকার এবং একহারা তেমনই তার বল দিবার কায়দাটিও বেশ ভাল। সে অনেকটা পেছন হইতে দৌড়িয়া আসিয়া এমন ভাবে বেগে বল দিতে আরম্ভ করিল যে সকলেই বুঝিতে পারিল খেলাটা বড় সোজা হইবে না। শৈবালের প্রথম বলটা এত জোরে ছুটিয়া আসিল যে মোহন কোন রকমেই আত্মরক্ষা করিতে পারিল না। লেগের দিকের স্টাম্পটা ঝনাৎ শব্দ করিয়া অনেকটা পেছনে গিয়া ছিটাকাইয়া পড়িল।

ক্যাপ্টেন মোহন ব্যর্থতা লইয়া চলিয়া আসিল। কল্যাণ দেখিল ছয় জনের পূর্বে তাহার নাম নাই। সে মোহনের কাছে গিয়া কহিল : মোহন-দা আপনার প্যাডটা ভাল করে পরা হয়নি। মোহন তাহাকে বাধা দিয়া কহিল— প্যাড পরতে এদিক ওদিক হয়েছে বলেই যে

আউট হয়েছি তা নয়।

কল্যাণ কহিল— আমার ত সিক্সথ উইকেটের পর, যেতে অনেকটা দেরি হবে, হয়ত আজ যেতে না হতেও পারে আশ্চর্য নয় ত।

মোহন হাসিয়া বলিল— কিছু ভেব না কল্যাণ, দুই ওভারের ভিতরই যেতে হবে।

মোহনের কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য হইয়া দাঁড়াইল।

শৈবালের বলে করিমও আউট হইয়া গেল, এক ওভারের মধ্যে।

এইবার অমল খেলিতে গেল। অমল কিন্তু শৈবালের সেই টেরিবল ওভার বেশ সতর্কতার সঙ্গে কাটাইয়া দিল।

অন্য দিকের ওভারেও বেশ ভাল খেলিতে লাগিল। কেননা এই বোলারটি শৈবালের কাছাকাছি দাঁড়াইবার মতও ছিল না।

দশ রান উঠিবার পরে আবার অন্য ওভারে বল গিয়া পড়িল শৈবালের হাতে। এইবার আর দুইজন শৈবালের ওভারে আউট হইল। চার উইকেটে রান হইল মাত্র বারো।

প্রবাল ও সুধেন্দু তাড়াতাড়ি কল্যাণের কাছে আসিয়া বলিল— কল্যাণ, ভাই তাড়াতাড়ি তৈরি হও। আর দেরি নাই। তাহাকে নূতন এক জোড়া প্যাড আনিয়া দিল ও গ্লাভস পরাইয়া দিল।

হঠাৎ বাইরে শোনা গেল ভয়ানক জোরে হাততালি। কল্যাণ তাড়াতাড়ি তাঁবুর জানালার ভিতর দিয়া উৎসুকভাবে চাহিল। তবে কি আবার একজন আউট হইল নাকি? তা ত নয়, খেলাটা ভয়ানক জমিয়া গিয়াছে! শৈবাল যেমন ভীষণ বল দিতেছে, অমলও স্কোর না করিয়া নিজেকে সামলাইয়া লইয়া খেলিতেছে। ক্রিকেটের ভাষায় যাকে বলে— রক্ লাইক ডিফেন্স।

খেলার ঐরূপ ধৈর্য ও সংযমের ফলে রান ক্রমেই বাড়িয়া চলিল। তাহার সঙ্গীর ভয়টাও যেন কমিয়া যাইতেছিল। চমৎকারভাবে সে খেলিতেছিল। রানের পর রান— লাফাইয়া চলিল— চল্লিশ, পঞ্চাশ, ষাট এইভাবে। কাজেই তাহাদের খেলাটা এখন জয়ের দিকেই চলিয়াছিল।

এইবার তাহার সঙ্গী বিমল— হঠাৎ একটা রাইজিং বলকে হিট করিতে গিয়া স্লিপের দিকে কট আউট হইল। বেচারা খুব ভাল খেলিতেছিল, তাহারা দুইজনে খেলার গতিটা একেবারে ফিরাইয়া দিয়াছিল। এইরূপ সময়ে তাহার আউট হওয়ায় কল্যাণ একটু দমিয়া গেল, ভয় হইল নেক্সট উইকেট ডাউন হিসাবে বুঝি তাহারই পালা এবার। অথচ এখনও যে জয়ের দিকে অনেক রান বাকি।

এইবার আসিল সুবোধ। সে ছেলে মানুষ। বয়স যতই হউক না কেন, তাহাকে ঠিক একটি বালকের মত দেখাইত। কিন্তু সে বেশ স্টেডি প্লেয়ার ছিল, কোথাও কোন খেলায় সে কিছু না কিছু রান করিয়াছে, একেবারে খালি হাতে ব্যাট নিয়া ফিরে নাই।

বিমল যাইবার সময় কল্যাণকে বলিয়া গেল : কিপ ইওর হেড, কল্যাণ! ভয় করোনা ভাই, অন্য দিকের বোলার ভাস্করকে দেখতে যেমন ভয়ানক, বল যে তেমন ভয়ের মত কিছু সে দিচ্ছে না, তা ত তুমি সব দেখতেই পাচ্ছ। যেমন খেলে যাচ্ছ, তেমনি খেলে যাও। গুড লাক!

কল্যাণ সুবোধকে সঙ্গে করিয়া যখন মাঠে আসিল, অমনি তাহার দলের ছেলেরা, গ্রামের লোকেরা হাততালি দিয়া তাহাকে উৎসাহিত করিতে লাগিল।

খেলা আরম্ভ হইল। ভাস্করের একটা বল কল্যাণ এমন জোরে এমন ভাবে আঘাত

করিল যে মাটি হইতে কেবলমাত্র এক ইঞ্চি উঁচু দিয়া বলটা ভীষণ বেগে ছুটিয়া চলিল। ভাস্কর তাহা ধরিতে চেষ্টা করিতে গিয়াও ধরিতে পারিল না। সুবোধকে লইয়া খেলা আরম্ভ করিতেই প্রথম বলেই একটা বাউন্ডারি হইয়া গেল। ভাস্কর বলটি ধরিতে গিয়া হোঁচট খাইয়া এমন বেকায়দায় পড়িয়া গিয়াছিল যে তাহার ডান হাতখানির কব্জিতে ভীষণ চোট লাগিয়াছিল। সে যন্ত্রণায় উঃআঃ করিতে করিতে মাঠের মধ্যে বসিয়া পড়িল।

তাহার ব্যথাটা পরীক্ষা করিবার জন্য মাঠে লোক জড় হইয়া গেল। ভাস্কর যন্ত্রণায় ছটফট করিতে লাগিল, তারপর তার দলের লোকদের সঙ্গে তাঁবুতে চলিয়া গেল।

কল্যাণের দিকে একটু কটাক্ষ করিয়া উইকেট কিপার কহিল— যেমনভাবে পড়ে গিয়েছে, মনে হয় না ত ভাস্কর আজ আর বোলিং করতে পারবে।

কল্যাণ হাসিয়া কহিল— আই অ্যাম ভেরি সরি। হি ইজ হার্ট! উইকেট কিপার হাসিয়া কহিল— বরাত দাদা! বরাত! তোমাদের জোর বরাত হে, নইলে ভাস্কর অমন ভাবে পড়ে যাবে কেন? এবার জয়পতাকা বিধাতা তোমাদের ললাটে বেঁধে রেখেছেন।

কল্যাণ কহিল— সে বলা যায় না স্যার!

ওভার শেষ হইল। ভাস্করের জায়গায় অন্য একজন আসিয়া বল দিতে আরম্ভ করিল।

এক ঘণ্টা খেলা চলিল। শেষ দিকে কল্যাণের সঙ্গীরা কেহই তেমন জোর খেলিতে পারিল না। অল্প কয়েক রানের জন্য ওল্ড বয়েজদের টিম তাহাদের অপেক্ষা জয়ী ছিল।

খেলার আরও চার ঘণ্টা সময় ছিল। একটা সর্ট ইন্টারভেলের পর আবার খেলা আরম্ভ হইল। এইবার কল্যাণের দলের খেলোয়াড়দের সকলের প্রাণেই জয়ের আশা জাগিয়া উঠিতেছিল। ভাস্করকে বোর্ডিংয়ে পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছিল, কেন-না তাহার হাতের আঘাতটা অত্যন্ত গুরুতর হইয়াছিল।

ওল্ড বয়েজের দল সেকেন্ড ইনিংসে ব্যাট করিতে আসিল। ক্যাপ্টেন মোহন সদল বলে ফিল্ড করিতে আসিল। কল্যাণকে পূর্ব বারের ন্যায় এবারও লং লেগে বল ধরিতে রাখা হইয়াছিল।

বিপক্ষ দলের একজন খেলোয়াড় দুইটি বলের— এমন জোরে একটা হিট করিল যে বলটা বাউন্ডারি পার হইয়া ভীষণ বেগে বোর্ডিংয়ের ম্যানেজারের বসিবার ঘরের জানালার মধ্য দিয়া ছুটিয়া গিয়া দেওয়ালের গায়ে যে বড় একটা আয়না টাঙানো ছিল, তাহা ভাঙিয়া চুরমার করিয়া ফেলিল।

কল্যাণ গেটের ভিতর দিয়া বোর্ডিংয়ের সামনের দরজার পথের মধ্য দিয়া ম্যানেজারের ঘরে ঢুকিয়া দেখিল আয়নাটা চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া মেজেতে পড়িয়া আছে। ভাঙা কাচগুলি ইতস্ততঃ ঠিকরাইয়া পড়িয়াছে।

কল্যাণ মাথা নিচু করিয়া বল খুঁজিতে লাগিল। বল খুঁজিতে খুঁজিতে সে দেখিতে পাইল এক টুকরা নোংরা পার্চমেন্ট কাগজ মেজেতে পড়িয়া আছে, সম্ভবতঃ কাগজখানি দর্পণখানির পিছনে ছিল।

কল্যাণের ঐ কাগজখানির দিকে নজর পড়িতেই তাহার বুক দুর দুর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। তাহার কৌতূহল হইল— কিসের এই কাগজখানা।

সে কাগজখানা হাতে লইয়া খুলিয়া দেখিল উহা কোন একটা বাড়ির প্ল্যান।

কল্যাণ ভাবিল, প্ল্যানটা কোন বাড়ির হইতে পারে? তবে কি এটা তাহাদের স্কুল বোর্ডিয়ের নক্সা! বিল্ডিং সুপারভাইজার যেটা হারাইয়া গিয়াছে বলিয়া তাহাকে জানাইয়াছে,

সত্যি কি তাই ?

যদি হয়, তবে তাহার কাকার পড়বার ঘর কোথায় ছিল, তাহা জানার পক্ষে অসুবিধা হইবে না। এই নক্সা হইতেই সেই ঘর চিনিয়া লওয়া যাইবে এবং তারপর অতি সহজেই লুকানো ডাকটিকিটের সন্ধান মিলিবে।

বিদ্যুতের মত অতি দ্রুত বেগে সে নক্সাটা হাতে লইয়া নাড়া-চাড়া করিল। লাল কালি ও কালো কালিতে ঐ নক্সার গায়ে এক রকমের দাগ কাটা। নক্সাটা বেশ বড়, তার ট্রাউজারের পকেটে রাখা চলে না, সে ঐটি সার্টের ভিতরের দিকের পকেটে লুকাইয়া রাখিল। এইবার সুপারভাইজার টের না পাইবার পূর্বেই তাহার কাজ সারিয়া ফেলিতে হইবে যে!

তাই ত বল কোথায় ?— সে যে বলের খোঁজে আসিয়াছে। অই যে ঘরের কোণে বল পড়িয়া আছে। সে তাড়াতাড়ি বলটি কুড়াইয়া লইয়া দৌড়াইয়া খেলার মাঠে চলিয়া গেল।

কল্যাণ মনে করিল, একজন আউট হইলেই সে ঐ কাগজখানি সুরজিৎ বা অন্য কাহারও হাতে দিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারে। পাঁচ মিনিট পরেই ওল্ড বয়েজ ইলেভেন দলের একজন আউট হইল। যেমন সে ব্যাটখানি হাতে করিয়া মাথা নিচু করিয়া তাঁবুর দিকে গেল, সেই সুযোগে কল্যাণ তাড়াতাড়ি সুরজিতের কাছে নক্সাখানি দিয়া বলিল : তাড়াতাড়ি নাও, সাবধান! কেউ যেন দেখতে না পায়। তোমার নিচের জামাটার ভিতর লুকিয়ে রাখ।

সুরজিৎ কহিল— এটা কি ভাই ?

স্কুলের সেই পুরানো নক্সাটা নিশ্চয়!

অ্যাঁ বল কি ? সুরজিতের চোখে ও মুখে একটা আনন্দের হিল্লোল বহিয়া গেল।

কল্যাণ কহিল, একেবারে অবাক হয়ে গেলে যে ?

সুরজিৎ প্রশ্ন করিল কোথায় পেলে ?

কল্যাণ তখন দু'চারটি কথায় সে কাহিনী শেষ করিল। সুরজিৎ প্যাভিলিয়নের দিকে চলিয়া গেল। আর কল্যাণ ফিরিয়া আসিল খেলার মাঠে।

খেলা খুব দ্রুত চলিতে লাগিল। ওল্ড বয়েজ ইলেভেনেরা তাড়াতাড়ি খেলা শেষ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছিল। রান যাহাতে বেশি উঠে সেইটাই ছিল তাহাদের লক্ষ্য, আর খেলাটা তাড়াতাড়ি শেষ হইলে তাহাদের পক্ষে স্কুল টিমকে সময় থাকতেই আউট করিয়া ফেলা যাইবে কি না! দেখিতে দেখিতে রান, উঠিল ৫৫। প্রত্যেক খেলোয়াড়ই হিট করিয়া খেলিতে লাগিল, তবু খুব তাড়াতাড়ি কেহই আউট হইল না। ১৩৮ রান করিয়া ওল্ড বয়েজ ইলেভেনের সকলে আউট হইল। এখন স্কুলের দল জয়ী হইতে হইলে কমপক্ষেও প্রায় দেড়শোর কাছাকাছি রান করিতে হইবে। এইবার স্কুলটিম ব্যাট করিতে প্রস্তুত হইতে চলিল। এই সুযোগে কল্যাণ সুরজিৎকে জিজ্ঞাসা করিল— তুমি কি কাগজটা খুলে দেখেছ ? সুরজিৎ হাসিয়া কহিল— সাহস পাইনি ভাই, কে কোথা দেখে ফেলে।

এমন সময় স্কুলের আর সব ছেলেরা আসিয়া কল্যাণ ও সুরজিৎকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল।

ননী কহিল, কল্যাণ-দা, তুমি আজ খাসা খেলেছ ভাই। মণি কহিল— ভাই কল্যাণ-দা, আমাদের কাছ থেকে ছবিখানা কিনে, তোমার কোন ক্ষতি হয় নাই কিন্তু! কি বল ?

কল্যাণ হাসিয়া কহিল— তাই ত দেখছি।

আর একটি ছেলে কহিল— ওসব বাজে কথা শুনছ কেন কল্যাণ-দা। এখন শুধু খেলার কথাটাই ভাব। এবার কিন্তু ভাই, তোমার খুব-খুবই ভাল করে খেলতে হবে।

ননী কহিল— ডাকটিকিটের খোঁজের চেয়েও বেশি নাকি ? কল্যাণ এই চপল ও দুষ্ট দুই ভাইকে বেশ ভাল ভাবেই জানিত, তাই মনের ভাব গোপন করিয়া বলিল— বেশ বলেছ ননী !

যমজ দুই ভাই চলিয়া গেল।

কল্যাণ সুরজিৎকে কহিল— না দেখেছ বেশি কোন ক্ষতি নেই, পরে অবসর মত দেখে নেওয়া যাবে। সাবধান, যেন হারিয়ে ফেল না। তারপর কি ভাবে দৈবাৎ সে নক্সাটা পাইল, সে কথা বলিল।

ওল্ড বয়েজ ইলেভেন দলের নীলকণ্ঠ বসু এইবার বল দিতে আসিলেন। আজকাল ক্রিকেট খেলায় সহরের কোথাও আন্ডারহ্যান্ড বল করিতে বড় একটা দেখা যায় না। কিন্তু মফঃস্বলে এখন পর্যন্তও আণ্ডারহ্যান্ড বল দেওয়ার রেওয়াজ একেবারে উঠিয়া যায় নাই।

মোহন আন্ডারহ্যান্ড বলে খেলিতে বড় একটা অভ্যস্ত ছিল না তাই সে দুই এক ওভারের পরেই নীলকণ্ঠের বলে আউট হইল। এই ভাবে যখন দুই জন আউট হইল তখন তাহাদের স্কোর, ষাট উঠিল।

সুবিনয় ছেলেটি বেশ ভাল ভাবে খেলিয়া যাইতে লাগিল। তাহার খেলার জন্য স্কুলটিমের অনেকটা রান উঠিল।

যখন চার জন আউট হইল, তখন কল্যাণ আসিয়া সুবিনয়ের সহিত যোগ দিল।

কল্যাণ আন্ডারহ্যান্ড বল বলিয়া একেবারেই তুচ্ছ জ্ঞান করিল না। সে বেশ মন দিয়া দেখিয়া শুনিয়া বল মারিতে লাগিল। এক ঘণ্টা পরে দেখা গেল যে আর যদি ৯৫ রান করা যায়, তাহা হইলে স্কুলটিম জয়ী হইতে পারে।

কল্যাণ ও সুবিনয় দুইজনে বেশ মন দিয়া খেলিতে লাগিল। আর বেশি নয়— ৫৬ রান হইলেই তাহারা জয়ী হইতে পারে। এই ভাবে যদি তাহারা দুইজনে আর খানিকটা সময় খেলিতে পারে তবে নিশ্চয় জয়ী হইতে পারিবে।

যখন মাত্র চল্লিশ রান বাকি, তখন সুবিনয় আন্ডারহ্যান্ড বলে আউট হইয়া গেল। কল্যাণ, সুবিনয় আউট হওয়ায় নিরাশ হইল না। তখন ছিল আরও তিনজন খেলোয়াড় বাকি— এইবার আসিল প্রবাল।

কল্যাণ প্রবালকে কহিল— তুই ভাই শুধু একটু সাবধান হয়ে বল দেখে মারিস, এক্সাইটেড হয়ে যাসনে।

কল্যাণের হাত বেশ খুলিয়া গিয়াছিল। সে দুইটা বাউন্ডারি করিয়া ফেলিল। এখন বাকি রইল মাত্র পঁচিশ রান, সময় মাত্র রহিয়াছে পনের মিনিট। খেলা চলিল।

আর মাত্র ষোল রান ! ক্যাপ্টেন মোহন প্যাভিলিয়ন হইতে চিৎকার করিয়া বলিতে লাগিল— সিক্সটিন টু উইন ! এমন সময় কল্যাণ আর একটা বাউন্ডারি করিল।

সুরজিৎ চিৎকার করিয়া বলিল— টুয়েলভ টু উইন !

এমন সময় খেলার মাঠে চলিতেছিল এক বিরাট উত্তেজনা। ওল্ড বয়েজ ইলেভেন দলের লোকদের মুখ মলিন হইয়া গিয়াছিল। আর গ্রামের জনতার ঘন ঘন হাততালি ও স্কুলের দলের ছেলেদের ঘন ঘন চিৎকার সিক্স টু উইন ! প্রভৃতি শব্দ খেলার মাঠখানি প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিল।

আর একটি বাউন্ডারি। আম্পায়ার হঠাৎ লাস্ট ওভারের সিগনাল দিলেন। মোহন ব্যগ্র ও উত্তেজিতভাবে দাঁড়াইয়া উঠিল। এই ত শেষ ওভার ! আর চারটা রান— একটা মাত্র বাউন্ডারি ! তা হলেই ব্যস !

এদিকে বিপক্ষ দলের বোলার শৈবাল দূর হইতে দৌড়াইয়া বল দিতে আসিতেছে। আর এদিকে কল্যাণ ব্যাটখানি হাতে লইয়া সেই বলের প্রতীক্ষায় রহিয়াছে।

পর মুহূর্তে সকলে দেখিল— বল বাউন্ডারি পার হইয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে।

বোর্ডে দেখা গেল— কল্যাণ ১১০ রান করিয়াছে।

বিজয়ী স্কুল টিমের আনন্দপূর্ণ চিৎকারে "কল্যাণকী জয় !" "হিপ হিপ হুররে' শব্দে— অপরাহ্নের স্বর্ণ-রৌদ্র-কিরণ-ঝলকিত মাঠখানি প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। যে জয়ের কেহই প্রত্যাশা করিতে পারে নাই অবশেষে সেই বিজয়-লক্ষ্মী আসিয়া কিনা স্কুলটিমের দলে জয়ের মালাখানি পরাইয়া দিলেন। ...

বয়সোচিত

মতি নন্দী

“এবার তো ছেলেছোকরাদেরই যুগ এসে গেল। আমি যাচ্ছি, তারপর পবিত্র নাগ যাবে। যারা আঠারো-কুড়ি টাকা মাইনেয় ঢুকেছিল সব একে একে যাবে। দুঃখ হবে কেন, জায়গা জুড়ে কি চিরকাল থাকা চলে ?” মুখ নামিয়ে গুণেন ঘোষ কাজে মন দিল। আর একটা কথাও সেদিন সে বলেনি।

এর চারদিন পরেই ম্যানেজিং ডিরেক্টরের বেয়ারার কাছ থেকে সবাই জানল, গুণেন ঘোষ সন্দীপবাবুর পা জড়িয়ে কেঁদে পড়েছিল এক্সটেনশন পাবার জন্য। পায়নি। তিনি বলেছেন, বুড়োহাবড়াদের আর রাখবেনই না। এখন কোয়ালিফায়েড, স্মার্ট ছেলে অজস্র পাওয়া যায়। এবার থেকে নাকি দরখাস্ত নিয়ে ইন্টারভিউ করে সব চাকরি হবে।

প্রতাপ জানার পক্ষাঘাত হবার পর থেকেই তার ছেলে সন্দীপ কর্তা হয়ে বসেছে। নিজে গাড়ি চালায়, লিফট না পেলে লাফিয়ে লাফিয়ে সিঁড়ি দিয়ে তিনতলায় ওঠে। প্রতাপ জানা থাকলে গুণেন ঘোষ যে দু-বছর এক্সটেনশন পেত, সে বিষয়ে কারুরই দ্বিমত দেখা গেল না। এই বিরাট অফিস আর কারখানা তার একার চেষ্টায় গড়ে তোলার, কর্মচারীদের সঙ্গে তার অমায়িক ব্যবহারের, বিপদে-আপদে অর্থ সাহায্যের কথা ইত্যাদি সবই আলোচিত হল সেদিন।

এরপর থেকেই পবিত্র নাগের রাতের ঘুম কমে গেল। গুণেন তার থেকে মাত্র সাত মাসের সিনিয়র। পবিত্রর ছেলে বুড়ো এ বছরই ডাক্তারি পাস করল। রোজগার করে দাঁড়াতে এখনও বছর তিন-চার। একটি মেয়ের বিয়ে হয়েছে, আরও একটির বাকি। রাতে যতক্ষণ না ঘুম আসে কানে শুধু বাজে গুণেনের কণ্ঠস্বর ‘তারপর পবিত্র নাগ যাবে’।

ব্যাপারটা একদিন খুলে বলল স্ত্রী উমাকে। শোনামাত্র ফ্যাকাশে হয়ে গেল উমার মুখ। শুধু বলল, “রিটায়ার হলে চলবে কি করে ? কটা টাকাই বা আর পাবে। জয়ন্তীর বিয়েতে তো চার হাজার পর্যন্ত তুলেছ।”

উমা পরামর্শ দিল প্রতাপ জানার সঙ্গে দেখা করার। পরদিনই অফিস ছুটির পর পবিত্র হাজির হল মালিকের বাড়ি। ওর মনে পড়ল যখন দর্জিপাড়ার ভাড়াবাড়িতে প্রথম সে প্রতাপ জানার সঙ্গে দেখা করতে যায়, পাঁচ বছরের সন্দীপ তাকে বলেছিল, “বসুন, ডেকে দিচ্ছি।”

প্রায় পনেরো মিনিট পর চাকর এসে পবিত্রকে নিয়ে গেল দোতলার ঘরে। দেড় বছরেই দশাসই মানুষটি কঙ্কালসার হয়ে গেছে। বাঁ দিক একদম পড়ে গেছে। কথা যা

বলেন বোঝা যায় না। ডান হাত কোনোরকমে তুলে ওকে বসতে বললেন। চেয়ারটা খাট ঘেঁষে টেনে পবিত্র বসল।

প্রায় আধঘণ্টা চুপ করে বসে পবিত্র বাড়ি ফিরল। উমা ব্যগ্র হয়ে জানতে চাইল, উনি কিছু করবেন বলে কথা দিলেন কিনা। পবিত্র ভারি অসহায় বোধ করল। যার নড়াচড়ার বা কথা বলারই ক্ষমতা নেই তাকে কি এইসব ব্যাপার জানানো যায়। উমার মুখ দুশ্চিন্তায় কালো হয়ে গেল।

দিন-তিনেক পর রাতে উমা এসে বসল পবিত্রর বিছানায়। ফিসফিস করে বলল, "সন্দীপবাবুর সামনে চটপটে ভাব দেখিয়ে ঘোরাঘুরি করো না। তোমাকে তো খুব বুড়ো আর দেখায় না।"

"তা কি করে হয়। ওতে কি বয়স কমে ?"

"কেন হবে না। ওপরের পাঁচুদাসবাবুর তো সব চুল পাকা, বুঝতে পারবে দেখলে ? আর কেমন সিধে হয়ে হাঁটে।"

"ও তো এককালে ফুটবল খেলত, স্বাস্থ্যটা এখনও ভালো। তাছাড়া প্যাণ্ট পরলে অনেক স্মার্ট দেখায়।"

"তুমিও পরবে। বুড়োর প্যান্ট তোমারও হবে। দরকার হলে দর্জির কাছ থেকে ছোট করিয়ে আনবে।"

পরের সোমবারই চুলে কলপ দিয়ে, ছেলের প্যাণ্ট এবং নতুন বুটজুতো পরে পবিত্র অফিসে এল। দেখে সবাই হাসল, ঠাট্টা করল। দু-একজন ঘুরিয়ে এমন কথাও বলল, রিটায়ারের সময় আসছে বলেই ছোকরা সেজেছে। পবিত্র এ-সবের কিছুই গ্রাহ্য করল না। শুধু খুঁটিয়ে লক্ষ করতে লাগল অল্পবয়সীদের চলাফেরা রকমসকম।

নতুন জুতোর তলায় ভালো করে ধুলোও লাগেনি। এখনও চলতে গেলে পা হড়কায়। তাই পা টিপে টিপে পবিত্র অফিসের সিঁড়ি দিয়ে নামছিল। হঠাৎ ম্যানেজিং ডিরেক্টরকে উঠে আসতে দেখে হকচকিয়ে প্রায় ছুটেই সে নামতে শুরু করল। সিঁড়িটা যেখানে ঘুরেছে তার শেষ ধাপের তিনটি সিঁড়ি উপর থেকে পবিত্র লাফ দিল। হাঁটু নুয়ে পড়ছিল, টাল সামলে উঠতে গিয়ে জুতো পিছলে গেল। ম্যানেজিং ডিরেক্টরই ওকে টেনে তুলল। এবং বেশ সহানুভূতির সঙ্গেই বলল, "সাবধানে নামা-ওঠা করুন। এই বয়সে হাত পা ভাঙলে আর সারবে না !"

শুনে পবিত্র বিমর্ষ হয়ে পড়ল। বহুক্ষণ ভাবল 'এই বয়সে' বলতে কি বোঝাল ? বুড়ো হয়েছি অর্থাৎ শারীরিক অক্ষমতার ইঙ্গিত দিল কি ? 'এই বয়সে' মানে কি ষাট বছর বয়স ! রাতে উমার কাছে পবিত্র ঘটনাটা বিবৃত করল। ক্ষুব্ধ হয়ে উমা বলল, "নিশ্চয় তোমার বয়সকে ঠেস দিয়েই বলেছে। হয়তো রিটায়ারের সময় এই ঘটনাটার কথাই ওর মনে পড়বে তখন আর চাকরি বাড়াতে চাইবে না। কেন ওভাবে নামতে গেলে ?"

"ওভাবেই তো সুধেন্দুকে নামতে দেখি।"

পরদিনই উমা আঁশবঁটি দিয়ে জুতোর তলা ঘষে দিল। জুতো পরে চেয়ার থেকে পবিত্র বার পাঁচ-ছয় লাফিয়ে নামল। অফিস বেরোবার সময় ফিসফিস করে উমা বলে দিল, "এখন কিছুদিন একদম সামনাসামনি হবে না। ভুলে যেতে দাও। বড় বড় ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামায় তো, ছোট ব্যাপার আর কদিনই বা মনে করে রাখবে।"

পবিত্র প্রাণপণ করে চলল যাতে ম্যানেজিং ডিরেক্টরের সঙ্গে তার দেখা না হয়। মাসখানেক পর সন্দীপ জানা তাদের ঘরে ব্যস্ত হয়ে ঢুকে বিল-ইনচার্জ প্রভাকরের সঙ্গে

টেবলে হাত রেখে ঝুঁকে কথা বলতে শুরু করল। পবিত্রর টেবলে তখন চায়ের কাপ আর মুখে টোস্ট। ম্যানেজিং ডিরেক্টরকে দেখেই বিষম খেল। খক-খক করে কাশতে শুরু করল। সন্দীপ ঘাড় ফিরিয়ে তাকাতেই পবিত্র দম বন্ধ করল কাশি চাপতে। চোখ দুটো ঠিকরে পড়ার দশা, মুখের খাবার গিলবার জন্য কোঁত পড়ল। ঘরের সকলেই তার দিকে তাকিয়ে মুখ টিপে হাসছে। সন্দীপ খুব সহানুভূতির সঙ্গেই বলল, "আপনার কি কাশির অসুখ আছে ? আমাদের ডাক্তারকে দেখিয়ে নিন না।"

পবিত্র জোরে নাথা নাড়তে থাকল।

বাড়ি ফিরে পবিত্র ঘটনাটার কথা উমাকে বলল না, শুধু 'কাশির অসুখ' কথাটা তার মনে পাক খেয়ে ফিরতে লাগল। কি বোঝাতে চাইল ? কাশিটা কি যক্ষ্মারোগীদের মতো ছিল ? এটা কি ও মনে করে রাখবে ? যদি রাখে তাহলে এক্সটেনশন কি পাওয়া যাবে ?

কিছুদিন পর অফিসে একটা চাপা উত্তেজনা দেখা গেল। স্পোর্টস হবে। ইতিপূর্বে কখনও হয়নি। এক ছোকরা সহকর্মী পবিত্রকে পরামর্শ দিল, "দাদা, বুড়োদের জন্য ওয়াকিং রেস আছে, নেমে পড়ুন। সন্দীপবাবু প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউট করবেন। যদি ফার্স্ট-সেকেন্ড হন, নজরে পড়বেন। আপনি যে ফিজিক্যালি ফিট সেটা তো প্রমাণ হবে।"

কথাটা মনে লাগল। উমাকে বলামাত্রই সে সায় দিল।

"কতটা হাঁটতে হবে ?"

"তা প্রায় আধ মাইল।"

"পারবে না ?"

পবিত্র কাঁচুমাচু হয়ে বলল, "খুব জোরে হাঁটতে হবে। ফার্স্ট-সেকেন্ড না হলে লাভ কি ?"

"তা তো বটেই। কাল থেকেই জোরে হাঁটা অব্যেস কর। আমি বরং ভোরবেলা তুলে দেব। পার্কে গিয়ে হাঁটবে।"

পবিত্র পরদিন থেকে হাঁটার অভ্যাস শুরু করল। আলো ফোটার আগেই উমা তাকে তুলে দেয়। পার্কে গিয়ে কয়েক চক্কর হেঁটে বেঞ্চে বসে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে বাড়ি ফিরে আসে। একদিন উমা বলল, "চলো আমিও যাই। দেখব তুমি কেমন হাঁটতে পার।"

পার্কের বেঞ্চে উমা বসে রইল। পবিত্র একপাক দিয়ে তার সামনে আসামত্র বলল, "এ তো বেড়ান হচ্ছে। এভাবে চললে কি ফাস্ট সেকেন হওয়া যায় ?"

পবিত্র চলার বেগ বাড়াল। তিনপাক দেবার পর হাঁফিয়ে উঠে, উমার পাশে এসে বসল।

"আধ মাইল হয়ে গেল !"

"আর পাচ্ছি না।"

"তাহলে হবে কি করে ? বুড়োকে ডাক্তারখানা করে দিয়ে বসাতে হবে ; বাসন্তীর বিয়ে এই বছরই দেব ; আর বলছ পাচ্ছি না ? ওঠো ওঠো। আর দিন-পনেরো মোটে সময়।"

পবিত্র জোরে আরও তিন পাক হেঁটে এসে বসল। পা কাঁপছে। হাঁ করে শ্বাস নিতে নিতে উমাকে বলল, "এভাবে কি জোয়ান সাজা যায় !"

উমা কথা না বলে সামনে তাকিয়ে থাকল। পবিত্র হাঁটুতে হাত রেখে ঘাড় নিচু করে কিছুক্ষণ হাঁফাবার পর আস্তে আস্তে বলল, "এতখানি বয়েস হল তার আর কোনো দাম রইল না।"

এরপর থেকে রোজই উমা সঙ্গে আসে। পবিত্র চক্কর দিতে থাকে। যখন কাছে আসে, উমা গলা এগিয়ে ফিসফিস করে, "জোরে। আরও জোরে।" পবিত্র তাই শুনে হাঁটার জোর বাড়ায়। কখনও কখনও উমাও হাঁটে ওর সঙ্গে। কিছুটা গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। পবিত্র চক্কর সম্পূর্ণ করে এলে আবার কিছুটা সঙ্গে থাকে। রাতে সকলে ঘুমিয়ে পড়লে সে পবিত্রর পা টিপে দেয়।

স্পোর্টসের দিন পবিত্রর সঙ্গে উমাও মাঠে গেল। সামিয়ানা খাটানো হয়েছে। অ্যামপ্লিফায়ারে গানের রেকর্ড বাজছে। কর্মকর্তারা তদারকিতে ব্যস্ত। পবিত্র আর উমা একধারে দুটি চেয়ারে বসে রইল। বিরাট এক টেবলে পুরস্কারগুলি সাজানো। উমা বলল, "কোন্‌টা তোমাদের ?"

"কি জানি ! শুনেছি অ্যাটাচি ব্যাগ দেবে।"

"তাহলে বুড়োর কাজে লাগতে পারে।"

পবিত্র মুখ ফিরিয়ে স্পোর্টস দেখতে লাগল। সকাল থেকে উমা কিছু খেতে দেয়নি। তেষ্টায় বুক শুকিয়ে যাচ্ছে। কোকা কোলা বিলানো হচ্ছে প্রতিযোগীদের। পবিত্র উঠে পড়ল। গুটি গুটি এগোতেই উমা পিছু নিল।

"জল খেতে যাচ্ছি।"

"বেশি খেওনা।"

উমা চেয়ারে এসে বসল। পবিত্র দু-বোতল কোকা কোলা শেষ করে তৃপ্তি বোধ করল। ফুরফুরে হাওয়া, রোদটাও মিঠে লাগছে তাই সে ইতস্তত বেড়াতে লাগল। দূরে দূরে ঘেরা ফুটবল মাঠ। মাঝে মাঝে ক্লাবের তাঁবু। অনেক মাঠেই ক্রিকেট খেলা চলছে। এ ধারে মনুমেন্ট, ওধারে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল। ট্রামগুলো খেলনার গাড়ির মতো। পবিত্র কিছুক্ষণ দূরের ট্রাম-বাসের চলা দেখল। এক জায়গায় অনেক লোক ভিড় করে। এগিয়ে গেল সে। ম্যাজিক দেখাচ্ছে দাঁতের মাজনের ফিরিওলা।

অবাক হয়ে সে মাজনওলার বক্তৃতা শুনছিল। হাতে টান পড়তেই ফিরে দেখে উমা।

"এখানে দাঁড়িয়ে থাকলেই কি চলবে ? সন্দীপবাবু এইমাত্র এল, যাও সামনে গিয়ে দাঁড়াও। কত লোক তো ঘুরঘুর করছে, কথা বলছে।"

গজগজ করতে করতে উমা ওকে নিয়ে ফিরে এল সামিয়ানার কাছে। সন্দীপ জানা হেসে হেসে কথা বলছে, কর্মচারীর ছেলে-মেয়েদের পিঠ চাপড়াচ্ছে, গাল টিপছে। পবিত্র ওর সামনে গিয়ে দাঁড়াল। একজন বলল, "পবিত্রবাবু আজ ওয়াকিং রেসের সব থেকে ভেটারেন কম্পিটিটর।"

"তাই নাকি !" ম্যানেজিং ডিরেক্টর খুব অবাক হল, "তাহলে তো আপনাকে জিততেই হবে। যদি জেতেন আপনাকে আমি একটা স্পেশাল প্রাইজ দেব।"

পবিত্র কাছে আসতেই উমা ঝাঁপিয়ে পড়ল যেন। "কি, কি বলল ?"

"যদি জিতি, স্পেশাল প্রাইজ দেবে আমাকে।" পবিত্রর কণ্ঠে উমার মতো উত্তেজনা নেই।

"তা হলে তো জিততেই হবে তোমাকে। ওঃ রাধামাধব ! এইবারটি অন্তত মুখ তুলে চাও। সারা জীবনই তো জ্বালাতন-পোড়াতন হলুম।" উমার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল। ফোঁপানি চাপতে মুখে আঁচল দিল ! ম্যাজিকওলাকে ঘিরে এখনও ভিড় জমে আছে। পবিত্র সেইদিকে মুখ ফিরিয়ে রইল।

সবশেষে ওয়াকিং রেস। মাঠটা গোল হয়ে দুটো চক্কর দিতে হবে। দর্শকরা চেয়ার

থেকে উঠে এসে লাইনের ধারে জড় হয়েছে মজা দেখতে। প্যাণ্টটাকে হাঁটু পর্যন্ত গুটিয়ে পবিত্র প্রতিযোগীদের সঙ্গে দাঁড়াল। অফিস এবং কারখানা মিলিয়ে পনেরো জন। সকলে পঁয়তাল্লিশ বছরের উপরে। দর্শকরা উৎসাহ দিয়ে কথা বলছে। উমা শুধু একধারে ঠায় দাঁড়িয়ে।

পিস্তল ছোঁড়ার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে গেল হাঁটা। দর্শকদের মধ্যে হৈ হুল্লোড়। অনেকে প্রতিযোগীদের সঙ্গে লাইনের পাশ দিয়ে হাঁটতে লাগল চিৎকার করতে করতে। প্রথম চক্করে সিকি পথ পবিত্র সবার আগে! মাঝপথে দেখা গেল তিন-চারজনের পিছনে। চক্করটা শেষ হবার আগেই পিছনের লোকেরা ওকে ধরে ফেলল। দর্শকদের চিৎকারে দূরের পথিকরাও একবার থমকে এদিকে তাকাল।

পবিত্র অসহায় বোধ করল। পাশের লোকটি তাকে ছাড়িয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। উমা কোথায়, তাই দেখতে গিয়ে চোখ পড়ল, ম্যানেজিং ডিরেক্টর হাততালি দিয়ে উৎসাহ দিচ্ছে অগ্রবর্তীদের। পবিত্র দমে গেল। খালি পেট মোচড় দিচ্ছে। ঘাড়টা কাত হয়ে পড়েছে। হাত দুটো পাঁজরের দুপাশে গাছের ভাঙা ডালের মতো দুলছে। সামনের লোকেদের সঙ্গে তার ব্যবধান বেড়ে যাচ্ছে। হঠাৎ সে চমকে উঠল উমাকে দেখে। লাইনের পাশে সর্বস্বান্তের মতো দাঁড়িয়ে।

"এইভাবে তুমি ডোবাবে।" উমাও ওর সঙ্গে পাশাপাশি হাঁটতে শুরু করেছে আর তিক্ত হতাশ কণ্ঠে বলছে, "সবাই এগিয়ে যাচ্ছে। এগোও। আরও জোরে হাঁটো, আরও জোরে, এই তো, এই তো।"

চিবুক তুলে, নিশ্বাস টেনে পবিত্র জোরে হাঁটতে চেষ্টা করল। মাথা নড়ছে ছ্যাকরা গাড়ির টাল-খাওয়া চাকার মতো। দুটো হাত লগবগ করছে। গোটা শরীর আলোড়িত হয়ে হাস্যকর দৃশ্য তৈরি করল। তবে ওর আগের লোকের সঙ্গে ব্যবধান কয়েক মিটার কমল।

উমা তাল রাখতে ছুটতে শুরু করেছে। আর চাপাস্বরে বলে চলেছে, "এই তো, এই তো! সবাই দেখছে, সন্দীপবাবু দেখছে। কে বলে তোমার বয়স হয়েছে? কে বলে বুড়ো হয়েছ?"

মাঠের দর্শকরা এতক্ষণ নাগাড়ে চিৎকার করে যাচ্ছিল। এখন তারা হঠাৎ চুপ করে, পবিত্র আর উমাকে দেখতে লাগল। কথা বলার দরকার হলে ফিসফিস করছে। পবিত্র দ্বিতীয় চক্করের অর্ধেক পার হয়েছে। প্রথম জন ফিতের দিকে এগোচ্ছে।

"সব্বোনাশ হল! পৌঁছে গেছে যে গো।" উমা দাঁড়িয়ে পড়ল। তখন পবিত্র মরিয়া হয়ে হঠাৎ ছুটতে শুরু করল। প্রতিযোগীরা অবাক হয়ে কেউ কেউ থমকে দাঁড়াল। এতক্ষণ সারা মাঠ একটা কিছুর প্রত্যাশায় দম বন্ধ করেছিল। এবার হৈ হৈ করে চিৎকার, হাততালি আর হাসি শুরু করল। পবিত্র সবার আগে ফিতে ছিঁড়ে হাঁফাতে হাঁফাতে, ম্যানেজিং ডিরেক্টরের দিকে তাকিয়ে হাসল।

লাউডস্পিকারে বিজয়ীদের নাম ঘোষণা হচ্ছে। হাততালি পড়ছে। পবিত্র আর উমা তখন অবসন্নগতিতে ধর্মতলার ট্রাম টার্মিনাসের দিকে হেঁটে চলেছে। কেউ কথা বলছে না। পবিত্র একটু পিছিয়ে। মাঝে মাঝে মুখ তুলে দু-ধারে তাকাচ্ছে। প্যাণ্টটা তখনো হাঁটু পর্যন্ত গোটানো।

ট্রামে উঠে পবিত্র উমার সিটের পিছনে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। উমা তাকে বসতে বলল না।

পরদিন ধুতি-পাঞ্জাবি পরে, পবিত্র অফিসে গেল। ফিরে এল দুপুরে। উমা বিস্মিত হয়ে তাকানোমাত্র সে বলল, "আর রিটায়ার করাতে পারবে না। রিজাইন দিয়ে এলুম।"

সপ্তম গুল্প

গৌরকিশোর ঘোষ

সুনীত ঘোষ মরীয়া হয়ে বললে, তাহলে কি কোন উপায়ই নেই বলতে চান ?

সুনীল বোস বললে, উপায় থাকবে না কেন। পাড়ার মস্তানদের দলে ভিড়ে হয় গেট ভেঙে স্টেডিয়ামে ঢুকুন, আর নয় সুবোধ বালকটি হয়ে বড়ির দোকানে রেডিওর কমেন্টারি শুনুন। টিকিট কেনবার বাসনা যদি মনের কোণে পুষে রেখে থাকেন তো সেটাকে গঙ্গাসাগরে ভাসিয়ে দিন। আর-জন্মে যদি ক্রিকেট কত্তাদের রিলেটিভ রূপে কলকাতায় জন্মাতে পারেন, তাহলে হয়ত মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হতে পারে।

সুনীত ঘোষ ব্যাজার হয়ে বললে, খেলা দেখার মনোবাঞ্ছাটা যদি আমার হত, তাহলে আর ভাবনা ছিল কি ? কান দিয়েই খেলা দেখার সুখ মেটাতাম। ইচ্ছেটা জজ সাহেবের কিনা।

সুনীল বললে, জজ সাহেবের ! জজের সঙ্গে আপনার কি সম্পর্ক।

সুনীত থতমত খেয়ে বললে, আমার সঙ্গে তাঁর ডিরেক্ট সম্পর্ক কিছু নেই। তবে উকিলদের সঙ্গে তো সম্পর্ক আছে। তাই আমার উকিলবাবু বললে—

যদুদা টেলিফোনে কার সঙ্গে যেন কথা বলছিলেন আর কান পেতে সুনীতের কথা শুনেছিলেন।

ফস্ করে বলে বসলেন, সে কি মশাই, সে মামলার এখনও নিষ্পত্তি হয়নি !

বলেই জিভ কেটে টেলিফোনে বললেন, ওঃ ভেরি সরি, না আপনাকে নয়, কথাটা বললাম আমার এক ফ্রেন্ডকে। সামনেই বসে আছেন। হ্যাঁ, মেয়াদী মামলা। আবার কি, সেই বাড়িওয়ালা-ভাড়াটিয়ার চিরকেলে ডোমেস্টিক ঝগড়া। কি বললেন, ক'দিনের মামলা ? এই মশাই—

সুনীত বললে, এই তিন বছরে পড়ল।

যদুদা টেলিফোনধারীকে বললেন, এই থার্ড ইয়ারে পড়ল। হাঃ হাঃ হাঃ। যা বলেছেন। আচ্ছা, ঐ কথাই রইল।

রিসিভারটি ঠক করে রেখে যদুদা মন্তব্য করলেন, বাড়ি ভাড়ার বখেড়া মেটাতে আদালতের তিন বছর পার হয়ে যায় ! যা হচ্ছে না আজকাল ! কি আব বলব।

সুনীত ঘোষ বললে, সেই জন্যই তো আমার উকিল টেস্ট খেলার একখানা টিকিট যোগাড় করতে বললে।

সুনীল বোসের মুখে জিজ্ঞাসার চিহ্ন ফুটে উঠল।

যাব্ব্বাবা, তা আপনার মামলার সঙ্গে টেস্ট খেলার রিলেসান কি ?

সুনীত ঘোষ এবার চটে গেল।

একখানা টিকিট দেবার মুরোদ নেই। তখন থেকে খালি টিক টিক করছেন। রিলেসান কি, সম্পর্ক কি? যত সব ফালতু কোশ্চেন। রিলেসান কি একটা যে, এক কথায় বলব!

সুনীত ঘোষ মাটির মানুষ। সাত চড়ে রা কাড়ে না। তাকে দুম করে খেপে উঠতে দেখে সুনীল বোস ঘাবড়ে গেল। টাকে বার দুয়েক হাত ঘষে নিল।

তারপর আমতা আমতা করে বললে, তা চটছেন কেন?

সুনীত ঘোষ লজ্জায় স্বর খাদে নামিয়ে ফেলল।

বললে, মাথার ঠিক নেই মশাই, মাপ করবেন। শিরে সংক্রান্তি কিনা। মামলায় হেরে গেলে যে কেয়ার অফ্ ফুটপাত হয়ে যাব। টেস্টের টিকিট ছিল লাস্ট চান্স। কিন্তু সে চান্সও তো দেখছি পাংকচারড হয় হয়।

ব্যাপারটা তাহলে বলি। যে জজের এজলাসে আমার মামলা, তাঁর একটিই মাত্র মেয়ে। আর সে মেয়ে আবার ক্রিকেট ফ্যান। আব্বাস আলি বেগের গলায় মালা দেবার চান্স পেল না বলে অন্নজল ত্যাগ করেছিল। মাদ্রাজে কুন্দরামের খেলার রেজাল্ট দেখে আশায় বুক বেঁধে বসে আছে। নিজে হাতে রেশমের মালা গেঁথে রেখেছে মশাই। যদি কুন্দরাম কলকাতার টেস্টে কোয়ার্টার সেঞ্চুরিও করতে পারে তাহলে আর কথা নেই। আলুথালু হয়ে মাঠের মধ্যে ছুটে যাবে, কুন্দরামের গলায় মালাটি পরিয়ে দিয়েই তার গলা জড়িয়ে ধরে আনন্দে মূর্চ্ছা যাবে। প্ল্যান সব ঠিক করে রেখেছে। এমন সময় বিসমিল্লায় গলদ, সিজিন টিকিট গায়েব হয়ে গেল। বাপকে বললে, টিকিট একটা যোগাড় করে দেবে তো দাও, নইলে এই হাঙ্গার-স্ট্রাইক করলুম। আদুরে মেয়ে তো। যে কথা সেই কাজ। আজ সাতদিন ধরে সেরেফ অনশন। শুধু সেদ্ধ ডিম আর কফি খাচ্ছে। জজ-গিন্নী দুবেলা কপাল চাপড়াচ্ছেন আর 'কি লোকের হাতে বাপ আমাকে তুলে দিয়েছেন গো' বলে নন্ স্টপ বিলাপ শুরু করেছেন। এ অবস্থায় কেউ মাথা ঠাণ্ডা রেখে কাজ করতে পারে, বলুন। রোজ জজ সাহেব যে মেজাজ নিয়ে এজলাসে আসছেন, তাতে কি করতে যে তিনি কী করে বসবেন, সেই ভাবনায় আমার উকীল অস্থির। না হলে যে উকিল তিন বছর ধরে আমাকে 'নির্ঘাৎ জিতে যাবেন' বলে ভরসা দিয়ে এসেছেন, তিনি এখন বললেন কিনা, 'কিছু বলা যায় না মশাই, হাওয়া বড় খারাপ। বাঁচতে চান তো শিগ্‌গির একখানা টিকিট যোগাড় করুন।'

একটু থেমে সুনীত বললে, এখন বুঝলেন রিলেসনটা! কি করি বলুন তো?

বললুম, এতই যখন দরকার তখন ব্ল্যাক মার্কেটের দ্বারস্থ হন।

সুনীত বললে, সে চেষ্টাও করেছি মশাই। দুদিন আগে আমাদের পাড়ার হেবোদার হাতে উনিশখানা পঁচিশ টাকার টিকিট দেখলাম। আমায় বললে, নিবি। আমার কস্ট প্রাইস পড়েছে চল্লিশ। কাল পর্যন্ত ষাট টাকায় ঝেড়েছি। আজ সেভেনটি ফাইভে তোকে একখানা দিতে পারি। আসছে কাল সেঞ্চুরি করব মাইরি। নিবি তো এই বেলা নিয়ে নে, ক্যাশ ডাউন, নো চেক বিজনেস বাওয়া। একটু হেজিটেট করলাম। পঁচিশ টাকার টিকিট পঁচাত্তরে নেব—

পঁচিশ টাকার টিকিট পঁচাত্তর, এ তো খুব সস্তা রে গাড়োল। খেলার মত খেলা হলে দু

টাকার টিকিটও একশ টাকায় বিক্রি হয়, তা জানিস। হয়েও ছিল।

ব্রজদার আওয়াজ পেতেই চার জোড়া চোখ পিছনে চাইলে। ব্রজদা ততক্ষণে যদুবাবুর টেবিলের কাছে পৌঁছে গেছেন। আমি সসম্মানে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম। ব্রজদা ধপাস করে বসে পড়লেন। সুনীল বোস বারবার মুখ মুছতে লাগল।

একবার বললে, এইবার তাহলে পাখাটা খুলে দেওয়া যাক, নইলে গরমে বসা যাবে না।

ব্রজদা বললেন, তোমার গরমটা একটু বেশি হয়েছে দেখছি। জানুয়ারি মাসে পাখা খুলে বন্ধুবান্ধবের বিপদ ঘটানোর চাইতে এই বেলা একটা বিয়েথা করে ফেল।

ব্রজদার কথায় বাঁকা বাঁকা ভাব দেখে আমি তাড়াতাড়ি বলে উঠলাম, দু টাকার টিকিট একশ টাকায় বিক্রি হয়েছিল। সে কী খেলায়?

ব্রজদা সহজ হলেন।

বললেন, যে খেলায় কলকাতায় টিকিট নিয়ে সব থেকে বেশি কাড়াকাড়ি হচ্ছে, সেই ক্রিকেট খেলায়। সাহেবেরা সেবার বড় মুখ করে বিলেত থেকে খেলতে এসেছিল তো, তা টিমটাও বড় সরেস এনেছিল জার্ডিন। ভারতে নেমে একটার পর একটা খেলায় জিতে ব্যাটার সাহস বড় বেড়ে উঠেছিল, সেই জার্ডিন সাহেব কলকাতার মাঠে এক বাঙালির কাছে রাম প্যাঁদান খাচ্ছে, কথাটা লাঞ্চের আগে মুখে মুখে ছড়িয়ে যেতেই ডালহৌসি স্কোয়ার খালি করে সাহেব মেমেরা এসে ভিড় করল মাঠে। টিকিটের দাম না বেড়ে আর যায় কোথায়? সাহেবদের ঐ একটা অসাধারণ গুণ। খেলাধূলার ব্যাপারে নিতেটার মত অত পুতু পুতু করে না। টিকিট একটা পেলেই হল, অ্যাট এনি দাম। কিনলেও তাই! লাঞ্চের আগে যারা দু টাকার টিকিটে ঢুকেছিল, একশ টাকার নোট পেয়ে গেট পাস ঝেড়ে দিয়ে তারা গাছের ডালে উঠে বসলে।

সুনীত ঘোষ ততক্ষণে নিজের কথা ভুলে গেছে।

উত্তেজনা চেপে জিজ্ঞেস করলে, কার খেলা দেখতে এত ভিড় হয়েছিল ব্রজদা?

ব্রজদা একগাল হেসে স্নেহ ঝরিয়ে বললেন, সত্যিই তুই বড় বোকা নিতে। তোদের ব্রজদা ছাড়া একাজ আর কে করতে পারে? এই সাদা কথাটা ধরতে পারলিনে?

সুনীল বোস বলে উঠল, আপনি আবার ক্রিকেটও খেলেছেন নাকি! কই জানতাম না তো।

ব্রজদা খপ করে প্রশ্ন করলেন, তোর ঠাকুর্দার বাপের নাম কি বল তো।

সুনীল বিষম খেল। কিছুক্ষণ মাথা চুলকাল।

তারপর বোকার মত বললে, জানিনে।

অথচ ঔরঙ্গজেবের ঠাকুর্দার বাপের নামটি মুখস্থ করে রেখেছ। তোমার আর দোষ দেব কি, দোষ আমাদের জাতীয় শিক্ষার।

ব্রজদা একটু থেমে বললেন, আমাদের শিক্ষা তো নিজের লোককে চিনতে শেখায় না। তাই তো ব্র্যাডম্যানের নাড়ি-নক্ষত্রও জানো অথচ তোমাদের ব্রজদা যে ক্রিকেটে ওয়ার্লড রেকর্ড করেছে, পৃথিবীর কোন ক্রিকেটারই যার ধারেকাছে পৌঁছতে পারেনি, সে খবর তুমি, তুমি কেন, কোন বাঙালিই জানে না। বাঙালির অধঃপতন কি সাধে হয়েছে!

বিরক্তি ছড়িয়ে ব্রজদা বললেন, দে যদু, একটা সিগারেট।

হুস করে খানিকটা ধোঁয়া ছেড়ে ব্রজদা বোধ করি মেজাজটাই সাফ করে নিলেন।

বললেন, তবে শুনে রাখ, মাত্র তিন ওভারে সেঞ্চুরি করে শুধু ওয়ার্লড রেকর্ডই করিনি, ক্রিকেট খেলার আইনকানুনে নতুন একটা প্রবলেমও সৃষ্টি করেছি। আজ পর্যন্ত তার সমাধান হয়নি। যদি কখনও চান্স পাস অরিজিন্যাল ব্রিটিশ ক্রিকেট ম্যানুয়ালখানা খুলে দেখিস। দেখবি "ব্রজদাস্ পাজল্" বলে একটা কথা তাতে আছে।

আমরা চারজনে একসঙ্গে বলে উঠলাম, ব্রজদাস্ পাজল্! সে বস্তুটা কি?

ব্রজদা একটু নড়েচড়ে তারপর আবার স্থির হয়ে বসলেন। একেবারে যেন কাম্বোডিয়ার ধ্যানী বুদ্ধটি।

ধীর গম্ভীর গলায় আওয়াজ বেরুতে লাগল, যে বল ব্যাটের ঠুকুস ঘা খেয়ে মাঠের উপর দিয়ে গড়াতে গড়াতে বাউন্ডারি লাইন পার হয়, ক্রিকেট রুলে তাকে বলে বাউন্ডারি, তার রান চার। আর যে বল ঠকাস ঘা খেয়ে বাপ বাপ ডেকে তোল্লা হয়ে বাউন্ডারি পেরোয়, তার নাম ওভার বাউন্ডারি, তার রান ছয়। এসব নিয়ম তো দুধের ছেলেরাও জানে। কিন্তু ব্যাটসম্যানের হাঁকড়ানির চোটে যে বল বিপ বিপ করতে করতে স্পুটনিক হয়ে আকাশের বাউন্ডারি পার হয়, তার রান কত? আর সে বাউন্ডারির নামই বা কি? আজ পর্যন্ত তা ঠিক হয়নি। কারণ ক্রিকেটের জন্ম ইস্তক আকাশের বাউন্ডারি বল পার করতে পারে এমন ব্যাটসম্যান একটাই জন্মেছে—

সুনীল বোস মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলে ফেললে, তিনি আমাদের ব্রজদা।

ব্রজদা কোন কথা না বলে নাকমুখ দিয়ে সেরেফ ধোঁয়া ছাড়তে লাগলেন।

একটু পরে বললেন, কিন্তু একজনের জন্য তো আর রুল হয় না। তাই জার্ডিন সাহেব বলেছিল, ব্রজদা, তোমাকে গ্রেট বললে ছোট করা হয়, ইউ আর ডাবল গ্রেট। দুঃখ এই, তোমার আর জুড়ি জন্মাবে না, তাই ক্রিকেটে তোমার এই থার্ড ডাইমেনশন আর আনাও যাবে না, আমাদের চিরকাল বাউন্ডারি আর ওভার বাউন্ডারি নিয়েই তুষ্ট থাকতে হবে। তবে তোমার যে মারে বল আকাশে মিলিয়ে যায়, সেটা হিস্ট্রিতে ব্রজদাস্ পাজল্ বলে আবহমান কাল ধরে লেখা থাকবে।

আগুনটা সিগারেটের একেবারে লেজে এসে ঠেকেছিল। তাই ব্রজদা তাড়াতাড়ি সুখটান মেরেই সিগারেটটা অ্যাসট্রেতে ফেলে দিলেন।

শুধু ঐ একটাই নয়, আরও আছে।

সুনীতির ডিউটি ছিল, উঠতে যাচ্ছিল। ও কথা শুনে ধপাস করে বসে পড়ল।

ব্রজদা বলে চললেন, কথাটা যখন উঠলই, তাহলে সব খুলেই বলি। জার্ডিনের দল যখন এল, ভারতের ক্রিকেট গগনে তখন সব চন্দ্র সূর্যই বিরাজ করছেন। নাম আর কারও করব না, তোরা কাগজের পুরনো ফাইল দেখে নিস। তবে এটাও সত্যি, ছোকরারা ফাইট দিয়েছিল ভাল। ইন্ডিয়া হারছিল তবে রিয়েল স্পোর্টসম্যানের মত হারছিল। আসলে যারা হারে, স্পোর্টসম্যান স্পিরিটটা দেখাবার চান্স তারাই কিন্তু পায়। এটা আমি বরাবর দেখেছি। জার্ডিনের দল কলকাতায় এলে লাটসাহেব তাঁদের অনারে একটা পার্টি দিলেন। সেই পার্টিতে লাটসাহেবের প্রাইভেট সেক্রেটারি কথায় কথায় আমাকে জাত তুলে একটু খোঁচা দিলে। বললে, ক্রিকেট তো সিভিলাইজড় খেলা, রপ্ত করতে ইন্ডিয়ার সময় নেবে। কি বল ব্রজদা? ন্যাশনাল স্পিরিটে ঘা লাগলে তোদের ব্রজদা ছেড়ে কথা কয় না, জানিস তো। বললাম, সাহেব, যা বললে আমাকে বললে। খবরদার একথা আর কাউকে বল না। একে সাহেব তায় লাটের খাস মুন্সি। তেরিয়া হয়ে বললে, কি বলতে

চাইছ। বললাম, তোমার জার্ডিনের ভাগ্য ভাল বাঙালিদের পাল্লায় পড়েনি। তাই মান-সম্মান বজায় রেখে দেশে ফিরতে পারছে। সাহেব বললে, তার মানে ! বললাম, ঐ যা বললাম তার থেকেই বুঝে নাও। বাঙালিদের খপ্পরে পড়লে তোমার ঐ জার্ডিনের এম সি সি একেবারে টেম সি সি হয়ে যেত। যদি সাহস থাকে, তোমার জার্ডিনকে বল না নেট প্র্যাকটিসের দিন আমাদের সঙ্গে এক হাত খেলে যাক। এমন সময় লাট-গিন্নী সেখানে এসে হাজির হলেন।

হ্যাল্লো ব্রজদা, বলে লাট-গিন্নী আমার সঙ্গে হ্যান্ডসেক করলেন। তারপর একগাল হেসে জিজ্ঞেস করলেন, ব্যাপার কি ? মাথায় যেন কোন মতলব ঘুরছে। বললাম, ম্যাডাম, তুমি চ্যারিটি করে রেডক্রসের জন্য টাকা তুলবে বলেছিলে, তা সেই ব্যাপারে আমার মাথায় এক আইডিয়া এসেছে। জার্ডিন সাহেবকে বল না, আমাদের সঙ্গে এক ইনিংস চ্যারিটি ম্যাচ খেলুক। তাতে তোমার টাকাও উঠবে আর ওদের নেট প্র্যাকটিসও হবে।

লাট-গিন্নী খুব খুশি। বললেন, ভেরি গুড আইডিয়া। ব্রজদা, ইউ আর লাভলি।

ব্যস, এক কথায় ঠিক হয়ে গেল। এম· সি· সি· ভার্সাস গবর্নেসেস্ ইলেভেন।

যদুদা জিজ্ঞেস করলেন, গবর্নেসেস্ ?

ব্রজদা বললেন, গবর্নরস্ ওয়াইফ ইজিকলটু গবর্নেস। তারপরে এপস্ট্রপি এস্। নেস্‌ফিল্ডের গ্রামারখানা দেখে নিস। নে এখন শোন। তারপর মাঠে তো নামলাম। ক্যালকাটা ক্লাবের মাঠে। খেলার শুরুতে ছিল গোটা কতক ক্লাব মেম্বার আর দিশি রাজা-মহারাজা খেতাবধারীর দল। মোস্ট অব দি মাঠ ফাঁকা। তেমন টিকিট বিক্রি হল না দেখে লাট-গিন্নী একটু মনক্ষুণ্ণ হলেন। যা হোক খেলা শুরু হল। তাড়াতাড়িতে টিম যোগাড় করেছি। উইকেট-কিপার অব্দি নেই। জার্ডিনের লাকটা ভাল। টসে জিতে ব্যাটিং নিলে। কি আর করি, আমিই স্টাম্পের পিছনে দাঁড়ালাম। একটার পর একটা ছোকরাকে বল করতে ফিল্ডে পাঠাই আর জার্ডিনের ব্যাটসম্যানেরা তাকে পেঁদিয়ে বিন্দাবন পাঠায়। একশ বারো মিনিটে ওরা পঁচানব্বই ফর নো উইকেট করলে। বেইজ্জতির একশেষ ! আমি আর থাকতে পারলাম না। একটা আনাড়িকে প্যাড পরিয়ে উইকেট কিপিং-এ পাঠিয়ে নিজেই বল হাতে নিলাম। জানিস তো আমি দু হাতেই বল করতুম। ডান হাতে ফাস্ট বল দিতুম আর বাঁ হাতে স্পিন। কার সাধ্যি খেলে। যা হোক, ওভারের প্রথম বলেই লেগ ব্রেক। ব্যাটসম্যানের ডান পায়ের প্যাডে ঠক করে বলটা লাগতেই সে ব্যাটা ওফ্ ফাদার বলে ক্রিজের উপর শুয়ে পড়ল। হেঁটে আর প্যাভিলিয়নে যেতে পারল না। রিয়েল লেগ ব্রেক কিনা।

সেকেন্ড বল দিলাম গুগলি। অফ স্ট্যাম্প ছিটকে পড়ল। পর পর দু বলে দুজন আউট হতেই দেখলাম গ্যালারির সবাই নড়েচড়ে বসল। মৃদু হাততালিও পড়ল। কিছুক্ষণ পরে দেখি জার্ডিন হোঁৎকা মতন এক ব্যাটসম্যান পাঠিয়েছে। সে তো বেশ পোজ নিয়ে ক্রিজে ব্যাট-ট্যাট ঠুকে খুঁটি গেঁড়ে দাঁড়ালে। দেখেই বুঝলাম ব্যাটা খুব তুখোড়। শুধু গুগলিতে কাবু করা যাবে না, বড় শামুক লাগবে। ব্যাট ধরা দেখেই বোলাররা বুঝতে পারে, ব্যাটসম্যানদের দুর্বল স্থানটা কোথায়। দেখলাম বেটা পা দিয়ে লেগ স্ট্যাম্প কভার করেছে আর ব্যাট দিয়ে অফ আর মিডল স্ট্যাম্প। পর পর দুটো বল কোন ক্রমে ঠেকিয়েও দিলে। নো রান। ঘাঘু ব্যাটসম্যান, মার দেখেই বুঝলাম। আচ্ছা

বাবা, তুমি যদি বুনো ওল তো আমি, এই ব্রজরাজ কারফর্মাও, হলাম গে বাঘা ট্যামারিন। কুড়ি স্টেপ পেছিয়ে গেলাম, তারপর ঝড়ের গতিতে ছুটে এসে এক্সট্রা ফাস্ট বলের সঙ্গে লেগ স্পিন মিলিয়ে অফ স্টাম্পে ঝুলিয়ে দিলাম ছুঁড়ে। চোখের পলক না পড়তে সিলি মিড অফে বলটা ড্রপ খেয়েই তীব্র গতিতে মোড় নিয়ে লেগ স্টাম্পের দিকে বোঁ করে ঘুরে গেল। ব্যাটসম্যান ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে কোনক্রমে কভার করতে গেল। পরমুহূর্তেই দেখলাম বাছাধন লাটুর মত পিন পিন করে স্পিন খেতে খেতে সর্ট ফাইন লেগে গিয়ে আছাড় খেয়ে পড়ল। ঐ স্পিন কি আটকান সোজা কথা! ব্যাটসম্যান নিজেই স্পিন করে গেল। আর বলটা ব্যাটের কোনায় ঠেকে গালিতে ইজি ক্যাচ তুলে একেবারে ফিল্ডারের বুক পকেটে ঢুকে পড়ল। টিপখানা দেখেছিস আমার। ক্যাচ মিস করা আমাদের জাতীয় অব্যেস কি না, তাই কোনরকম রিস্ক নিলাম না। তারপর ওঃ, সে কি হাততালি। আমার প্রথম ওভারের রেজাল্ট হল থ্রি উইকেটস— নো রান।

ওয়াটার রিসেস হতেই জার্ডিন সাহেব, লাট-গিন্নী ছুটে এসে আমার সঙ্গে সে কি হ্যান্ডসেক। প্রাইভেট সেক্রেটারি লাট-গিন্নীর আদেশে লাটসাহেবকে ফোন করতে ছুটলেন। সঙ্গে সঙ্গে চারদিকে রটে গেল জবর খেলা শুরু হয়েছে। মাঠে ভিড় বাড়তে লাগল। বাইরে গুঁতোগুঁতি। নিমেষের মধ্যে সব টিকিট নিঃশেষিত। গেট পাস নিয়ে ব্ল্যাক মার্কেট শুরু হল। সে এক এলাহী কাণ্ড।

লাঞ্চের আধ ঘণ্টা আগেই কোন রান অ্যাড না করে জার্ডিনের দল ঐ পঁচানব্বইতেই আউট হয়ে গেল। স্কোর বোর্ডের বোলিং এনালিসিসটা দিচ্ছি, তার থেকেই রেজাল্টটা জানতে পারবি। বি কারফর্মা সেভেন ওভার ফাইভ মেডেন নো রান টেন উইকেটস।

সুনীল ফস করে বলে উঠল, তা আবার কি করে হয়। এই বলছেন নো রান, আবার বলছেন সেভেন ওভার, ফাইভ মেডেন।

ব্রজদা বললেন, তোদের কাছে হয় না, ব্রজর হাতে সবই হয়। এখন শোন। বকবক করিসনি।

আমরা এবার ব্যাট করতে নামলাম। লাঞ্চের আগে মাত্র তেইশ রানে আমাদের চারটে উইকেট ঝপ ঝপ করে পড়ে গেল। লাঞ্চের পর মাত্র সাত রান হতে আরও একটা পড়ল। সিক্স্থ ম্যান নামলাম আমি। ওদের বাঘা বোলারকে ফেস করলাম। সে বল ছুঁড়লে। সেটা ছিল ইন সুইঙ্গার। বল মাটিতে পড়ার আগেই দৌড়ে গিয়ে সর্ট লেগ থেকেই মারলাম একখানা ছয়। বল মাঠ পেরিয়ে লাট সাহেবের বাগানে গিয়ে পড়ল। নতুন বল আনা হল। ঘষে ঘষে তার রঙ চটিয়ে বোলার আবার ছুঁড়ল। অফ ব্রেক। মাথার উপর দিয়ে প্যাভিলিয়ানের ছাতে পাঠিয়ে দিলাম। আবার ছয়। ফার্স্ট ওভারের ছটা বলেই আমার ছত্রিশ রান হল। নেকস্ট্ ওভারে মাত্র দু রানে আমাদের আরও একটা উইকেট গেল। তার পরের ওভারে আমি আবার ছত্রিশ রান করলাম। আমার বাহাত্তর রান নিয়ে মোট রান হল একশ চার ফর সিক্স। পরের ওভারে একেবারে কেলেঙ্কারি। কোন রান না হতেই আরও একটা উইকেট গেল। তারপর আমি আবার ফেস করলাম। বোলার প্রবল বিক্রমে ছাড়লে একটা বাম্পার। আমিও ঝাড়লাম জাম্পার। আমার সঙ্গে চালাকি! লাফিয়ে উঠে এইসা এক তাড়ু মার মারলাম যে বল সোজা উপরে গিয়ে আকাশের নীলিমায় একেবারে বিলীন হয়ে গেল। পুরো দশ মিনিট সকলের চোখ উপরে। রিপোর্টারের কলমে কালি সরল না, ফটোগ্রাফারদের ক্যামেরার ফ্লাশ জ্বলল না। সব হাঁ হয়ে গেছে। মাঠে পিন ড্রপ সাইলেন্স। শুধু খুব দূর থেকে, বোধ হয় চন্দ্র সূর্য গ্রহ

তারার কোলের কাছ্ থেকে একটা অস্পষ্ট আওয়াজ বেতার তরঙ্গে ভেসে উঠলে লাগল। বিপ্ বিপ্ বিপ্। তোরা আজকালকার ছোকরা কীথ মিলারের মারের বড়াই করিস! আরে আমি ছিলাম মিথ কীলার।

হ্যাঁ, তারপর শুরু হল ক্ল্যাপিং। অবিচ্ছিন্ন ধারায় হাততালি পড়তে লাগল। তারপরে সমস্যা হল, এইবারে কত রান দেওয়া হবে। এটা কি বাউন্ডারি, না ওভার বাউন্ডারি, না সুপার বাউন্ডারি, না কি। পঁচিশ মিনিট অপেক্ষা করা হল বলটা পড়ে কিনা দেখার জন্য। কিন্তু কোথায় বল। যাক, শেষ পর্যন্ত ব্রজদাস্ পাজ্ল্ নাম দিয়ে ওভার বাউন্ডারির পয়েন্টই লিখলে।

খেলাও আবার শুরু হল। নেকস্ট্ বলে আরেকটা পাজ্ল্। সেটা আরও মোক্ষম। না, এবার আর আকাশে নয়, মারের চোখে বলটা ফট করে নারকোলের মালার মত দু টুকরো হয়ে ভেঙে গেল। অর্ধেকটা একজন ফাস্ট স্লিপে ক্যাচ ধরে ফেললে আর বাকি অর্ধেকটা ওভার বাউন্ডারি হল। আবার খেলা বন্ধ করে কনফারেন্স বসল। কী করা হবে এখন। আমি কি আউট হয়েছি, না ছয় মেরেছি? ফয়সালা আর হয়ই না। খেলতে গিয়ে বার বার এই ডিস্টার্বেন্স। কার ভাল লাগে বল। এদিকে তখন আবার আমার ইভনিং ডিউটি। সময় হয়ে গেছে। দুত্তোর বলে ব্যাট ফেলে দিয়ে অফিসে চলে এলাম। পরে শুনলাম, জার্ডিন সাহেব নাকি বলে গেছেন, ইন্ডিয়া একদিন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ দলকে হারাবে। ঐ এক খেলাতেই তাঁর চোখ ফুটেছিল, বুঝলি।

দুই ম্যাজিশিয়ান

সত্যজিৎ রায়

'পাঁচ, ছয়, সাত, আট, নয়, দশ, এগারো।'

সুরপতি ট্রাঙ্কগুলো গুনে নিয়ে অ্যাসিস্ট্যান্ট অনিলের দিকে ফিরে বলল, 'ঠিক আছে। দাও, পাঠিয়ে দাও সব ব্রেকভ্যানে। আর মাত্র পঁচিশ মিনিট।'

অনিল বলল, 'আপনার গাড়িও ঠিক আছে স্যার। কুপে। দুটো বার্থই আপনার নামে নেওয়া আছে। কোনো অসুবিধে হবে না।' তারপর মুচকি হেসে বলল, 'গার্ডসাহেবও আপনার একজন ভক্ত। নিউ এম্পায়ারে দেখেছেন আপনার শো। এই যে স্যার— আসুন এদিকে!'

গার্ড বীরেন বকশি মশাই একগাল হেসে এগিয়ে এসে তাঁর ডান হাতখানা সুরপতির দিকে বাড়িয়ে দিলেন।

'আসুন স্যার, যে হাতের সাফাই দেখে এত আনন্দ পেইচি, সে-হাত একবারটি শেক করে নিজেকে কেতাত্থ করি!'

সুরপতি মণ্ডলের এগারটি ট্রাঙ্কের যে-কোন একটির দিকে চাইলেই তার পরিচয় পাওয়া যায়। 'Mondol's Miracles' কথাটা পরিষ্কার বড় বড় অক্ষরে লেখা প্রতিটি ট্রাঙ্কের পাশে এবং ঢাকনার উপর। এর বেশি আর পরিচয়ের দরকার নেই— কারণ ঠিক দু'মাস আগেই কলকাতার নিউ এম্পায়ার থিয়েটারে মণ্ডলের জাদুবিদ্যার প্রমাণ পেয়ে দর্শক বার বার করধ্বনি করে তাদের বাহবা জানিয়েছে। খবরের কাগজেও প্রশংসা হয়েছে প্রচুর। এক সপ্তাহের প্রোগ্রাম ভিড়ের ঠেলায় চলেছে চার সপ্তাহ। তাও যেন লোকের আশ মেটেনি। থিয়েটারের কর্তৃপক্ষের অনুরোধেই মণ্ডলকে কথা দিতে হয়েছে যে বড়দিনের ছুটিতে আবার শো করবে সে।

'কোনো অসুবিধে-টসুবিধে হলে বলবেন স্যার।'

গার্ডসাহেব সুরপতিকে তাঁর কামরায় তুলে দিলেন। সুরপতি এদিকে ওদিকে দেখে নিয়ে একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। বেশ কামরা।

'আচ্ছা স্যার, তাহলে...'

'অনেক ধন্যবাদ!'

গার্ড চলে যাবার পর সুরপতি তার বেঞ্চের কোণে জানালার পাশটায় ঠেস দিয়ে বসে পকেট থেকে এক প্যাকেট সিগারেট বার করল। এই বোধহয় তার বিজয়-অভিযানের শুরু। উত্তর প্রদেশ, দিল্লী, আগ্রা, এলাহাবাদ, কাশী, লক্ষ্ণৌ। এ যাত্রা এই ক'টিই— তারপর আরো কত প্রদেশ পড়ে আছে, কত নগর কত উপনগর। আর শুধু কি

ভারতবর্ষই ? তার বাইরেও যে জগৎ রয়েছে একটা—বিরাট বিস্তীর্ণ জগৎ। বাঙালী বলে কি আর অ্যাম্বিশন নেই ? সুরপতি দেখিয়ে দেবে। এককালে যে-দেশের জাদুকর হুডিনির কথা পড়ে তার গায়ে কাঁটা দিত, সেই আমেরিকা পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়বে তার খ্যাতি। বাংলার ছেলের দৌড় কতখানি, তা সে প্রমাণ করবে বিশ্বের লোকের কাছে। যাক না ক'টা বছর। এ তো সবে শুরু।

অনিল হাঁপাতে হাঁপাতে এসে বলল, 'সব ঠিক আছে স্যার। এভরিথিং !'

'তালাগুলো চেক করে নিয়েছ তো ?'

'হ্যাঁ স্যার।'

'গুড।'

'আমি দুটো বোগি পরেই আছি।'

'লাইন ক্লিয়ার দিয়েছে ?'

'এই দিল বলে। আমি চলি। ...বর্ধমানে চা খাবেন কি ?'

'হলে মন্দ হয় না।'

'আমি নিয়ে আসব'খন।'

অনিল চলে গেল। সুরপতি সিগারেটটা ধরিয়ে জানালার বাইরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করল। প্ল্যাটফর্ম দিয়ে কুলি যাত্রী ফেরিওয়ালার দু-মুখো কলমুখর স্রোত বয়ে চলেছে। সুরপতি সেদিকে দেখতে দেখতে কেমন অন্যমনস্ক হয়ে গেল। তার দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে এল। স্টেশনের কোলাহল মিলিয়ে এল। মনটা তার চলে গেল অনেক দূরে, অনেক পিছনে। এখন তার বয়স তেত্রিশ, তখন সাত কি আট। দিনাজপুর জেলার ছোট একটি গ্রাম—পাঁচপুকুর। শরতের এক শান্ত দুপুর। এক বুড়ী চটের থলি নিয়ে বসেছে বটতলায় মতি মুদির দোকানের ঠিক সামনে। তাকে ঘিরে ছেলেবুড়োর ভিড়। কত বয়স বুড়ীর ? ষাটও হতে পারে, নব্বুইও হতে পারে। তোবড়ানো গালে অজস্র হিজিবিজি বলিরেখা, হাসলেই সংখ্যায় দ্বিগুণ হয়ে যাচ্ছে। আর ফোকলা দাঁতের ফাঁক দিয়ে কথার খই ফুটছে।

ভানুমতীর খেল !

ভানুমতীর খেল দেখিয়েছিল বুড়ী। সেই প্রথম আর সেই শেষ। কিন্তু যা দেখেছিল তা সুরপতি কোনদিন ভোলেওনি, ভুলবেও না। তার নিজের ঠাকুরমার বয়সও তো পঁয়ষট্টি ; ছুঁচে সুতো পরাতে গেলে সর্বাঙ্গ ঠকঠক করে কাঁপে। আর ওই বুড়ীর কুঁকড়ানো হাতে এত জাদু ! চোখের সামনে নাকের সামনে হাত-দু'হাতের মধ্যে জিনিসপত্তর সব ফুসমন্তরে উধাও করে দিচ্ছে, আবার পরক্ষণেই ফুসমন্তরে বার করে দিচ্ছে— টাকা, মার্বেল, লাট্টু, সুপুরি, পেয়ারা ! কালুকাকার কাছ থেকে একটা টাকা নিয়ে বুড়ী ভ্যানিশ করে দিলে, তাতে কাকার কী রাগ আর তম্বি ! তারপর খিলখিল হাসি হেসে বুড়ী যখন আবার সেটি বার করে ফেরত দিলে, তখন কাকার চোখ ছানাবড়া।

সুরপতির বেশ কিছুদিন ভালো করে ঘুম হয়নি এই ম্যাজিক দেখে। আর তারপর যখন ঘুমিয়েছে তখনও নাকি মাস কয়েক ধরে মাঝে মাঝে ঘুমের মধ্যে ম্যাজিক-ম্যাজিক বলে চেঁচিয়ে উঠেছে।

এর পরে গাঁয়ে যখনই মেলা-টেলা বসেছে, সুরপতি ম্যাজিক দেখার আশায় ধাওয়া করেছে সেখানে। কিন্তু তেমন অবাক-করা কিছুই আর চোখে পড়েনি।

ষোলো বছর বয়সে সুরপতি চলে আসে কলকাতার বিপ্রদাস স্ট্রীটে কাকার বাড়িতে

থেকে ইন্টারমিডিয়েট পড়বে বলে। কলেজের বইয়ের সঙ্গে পড়া চলেছিল ম্যাজিকের বই। কলকাতায় আসার দু-এক মাসের মধ্যেই সুরপতি সেসব বই কিনে নিয়েছিল, আর কেনার কিছুদিনের মধ্যেই বইয়ের সব ম্যাজিকই তার শেখা হয়ে গিয়েছিল। তাসের প্যাকেট কিনতে হয়েছিল অনেকগুলো। ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাস হাতে নিয়ে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ম্যাজিক অভ্যাস করতে হয়েছিল তাকে। কলেজের সরস্বতী পুজোয়, বন্ধুবান্ধবের জন্মদিন-টন্মদিনে সুরপতি এসব ম্যাজিক মাঝে মাঝে দেখাত।

সে যখন সেকেণ্ড ইয়ারে পড়ে, তখন তার বন্ধু গৌতমের বোনের বিয়েতে তার নেমন্তন্ন হয়। সুরপতির ম্যাজিক শেখার ইতিহাসে এটা একটা স্মরণীয় দিন, কারণ এই বিয়েবাড়িতেই তার প্রথম দেখা হয় ত্রিপুরাবাবুর সঙ্গে। সুইনহো স্ট্রীটের বিরাট বাড়ির পিছনের মাঠে শামিয়ানা পড়েছে; তারই এক কোণে একটি ফরাসে অতিথি-অভ্যাগত-পরিবেষ্টিত হয়ে বসে আছেন ত্রিপুরাচরণ মল্লিক। হঠাৎ দেখলে নেহাত নগণ্য লোক বলেই মনে হয়। বছর আটচল্লিশ বয়স, কোঁকড়ানো টেরিকাটা চুল, হাসি-হাসি মুখ, ঠোঁটের দু'কোণে পানের দাগ। রাস্তায় ঘাটে এরকম কত লোক দেখা যায় তার ইয়ত্তা নেই। কিন্তু তার ঠিক সামনেই ফরাসের উপর যে কাণ্ডটা ঘটছে সেটা দেখলে লোকটির সম্বন্ধে মত পালটাতে হয়। সুরপতি প্রথমে নিজের চোখকে বিশ্বাসই করতে পারেনি। একটা রুপোলি আধুলি গড়িয়ে গড়িয়ে তিন হাত দূরে রাখা একটি সোনার আংটির কাছে গেল, তারপর আংটিটাকে সঙ্গে নিয়ে আবার গড়গড়িয়ে ত্রিপুরাবাবুর কাছেই ফিরে এল। সুরপতি এতই হতভম্ব যে তার হাততালি দেবারও সামর্থ্য নেই। এদিকে পর মুহূর্তেই আবার আরেক তাজ্জব জাদু। গৌতমের জ্যাঠামশাই ম্যাজিক দেখতে দেখতে চুরুট ধরাতে গিয়ে তাঁর দেশলাইয়ের কাঠি সব বাক্স থেকে মাটিতে ফেলে বসলেন। তাঁকে উপুড় হতে দেখে ত্রিপুরাবাবু বললেন, 'আপনি আর কষ্ট করে ওগুলো তুলছেন কেন স্যার ? আমাকে দিন। আমি তুলে দিচ্ছি।'

তারপর কাঠিগুলো ফরাসের এক কোণে স্তূপ করে রেখে নিজের বাঁ হাতে বাক্সটা নিয়ে ত্রিপুরাবাবু ডাকতে লাগলেন— 'আঃ তুতুতু—আঃ আঃ আঃ···' আর কাঠিগুলো ঠিক পোষা বেড়াল-কুকুরের মতোই একে একে গুটি গুটি এসে বাক্সের ভিতর ঢুকে যেতে লাগল।

সেই রাত্রে খাওয়াদাওয়ার পর সুরপতি ভদ্রলোককে একটু একা পেয়ে তাঁর সঙ্গে আলাপ করে। সুরপতির ম্যাজিকে আগ্রহ দেখে ভদ্রলোক খুবই অবাক হন। বলেন, 'বাঙালীরা ম্যাজিক দেখেই খালাস, দেখাবার লোক তো কই বড় একটা দেখি না। তোমার এদিকে ইন্টারেস্ট দেখে আমি সত্যিই অবাক হচ্ছি।'

এর দু দিন পরেই সুরপতি ত্রিপুরাবাবুর বাড়ি যায়। বাড়ি বললে ভুল হবে। মির্জাপুর স্ট্রীটের একটি মেস-বাড়ির একটি জীর্ণ ছোট্ট ঘর। অভাব-অনটনের এমন স্পষ্ট চেহারা সুরপতি আর দেখেনি। ভদ্রলোক সুরপতিকে তাঁর জীবিকার কথা বলেছিলেন। পঞ্চাশ টাকা করে ম্যাজিক দেখানোর 'ফী' তাঁর। মাসে দুটো করে বায়না জোটে কিনা সন্দেহ। চেষ্টায় হয়তো আরো কিছুটা হতে পারত, কিন্তু সুরপতি বুঝেছিল ভদ্রলোকের সে চেষ্টাই নেই। এত গুণী লোকের এমন অ্যাম্বিশনের অভাব হতে পারে সুরপতি তা ভাবতে পারেনি। এর উল্লেখ করাতে ভদ্রলোক বললেন, "কী হবে ? ভালো জিনিসের কদর করবে কেউ এ পোড়া দেশে ? কটা লোক সত্যিকারের আর্ট বোঝে ? খাঁটি আর মেকির তফাত কটা লোকে ধরতে পারে ? সেদিন যে বিয়ের আসরের ম্যাজিক তুমি এত তারিফ

করলে, কই, আর তো কেউ করল না! যেই খবর এল পাত পড়েছে, সব সুড়সুড় করে চলে গেল ম্যাজিক ছেড়ে পেটপুজো করতে।

সুরপতি কয়েকজন আত্মীয়-বন্ধুর বাড়িতে অনুষ্ঠানে ত্রিপুরাবাবুর ম্যাজিকের বন্দোবস্ত করে দিয়েছিল। কিছুটা কৃতজ্ঞতা এবং বেশিটাই একটা স্বাভাবিক স্নেহবশত ত্রিপুরাবাবু সুরপতিকে তাঁর ম্যাজিক শেখাতে রাজী হয়েছিলেন। সুরপতি টাকার কথা তোলাতে তিনি তীব্র আপত্তি করেন। বলেন, 'তুমি ও কথা তুলো না। আমার একজন উত্তরাধিকারী হল, এইটেই বড় কথা। তোমার যখন এত শখ, এত উৎসাহ, তখন আমি শেখাব। তবে তাড়াহুড়ো কোরো না। এটা একটা সাধনা। তাড়াহুড়োয় কিচ্ছু হবে না। ভালো করে শিখে নিলে একটা সৃষ্টির আনন্দ পাবে। খুব বেশি টাকা বা খ্যাতির আশা কোরো না। অবিশ্যি আমার দুর্দশা তোমার কোনদিনই হবে না, কারণ তোমার মধ্যে অ্যাম্বিশন আছে, আমার নেই…'

সুরপতি ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'সব ম্যাজিক শেখাবেন তো? ওই আধুলি আর আংটির ম্যাজিকটাও শেখাবেন তো?'

ত্রিপুরাবাবু হেসে বলেছিলেন, 'ধাপে ধাপে উঠতে হবে। ব্যস্ত হোয়ো না। লেগে থাকো। সাধনা চাই। এসব পুরাকালের জিনিস। মানুষের মনে যখন সত্যিকারের জোর ছিল, একাগ্রতা ছিল, তখন উদ্ভব হয় এসব ম্যাজিকের, আজকের মানুষের পক্ষে মনকে সে স্তরে নিয়ে যাওয়া সহজ নয়। আমার কত কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে জান?'

ত্রিপুরাবাবুর কাছে যখন প্রায় ছ মাস তালিম নেওয়া হয়ে গেছে সেই সময় একটা ব্যাপার ঘটে।

একদিন কলেজ যাবার পথে সুরপতি চৌরঙ্গির দিকে লক্ষ করল চারিদিকে দেয়ালে, ল্যাম্পপোস্টে আর বাড়ির গায়ে রঙীন বিজ্ঞাপন পড়েছে— 'শেফাল্লো দি গ্রেট।' কাছে গিয়ে বিজ্ঞাপন পড়ে সুরপতি বুঝল শেফাল্লো একজন বিখ্যাত ইতালীয় জাদুকর— কলকাতায় আসছেন তাঁর খেলা দেখাতে। সঙ্গে আসছেন সহজাদুকরী মাদাম প্যালার্মো।

নিউ এম্পায়ারেই এক টাকার গ্যালারিতে বসে শেফাল্লোর ম্যাজিক দেখেছিল সুরপতি। আশ্চর্য চোখ-ধাঁধানো মন-ধাঁধানো ম্যাজিক সব। এতদিন এসব ম্যাজিকের কথা সুরপতি কেবল বইয়েই পড়েছে। চোখের সামনে গোটা গোটা মানুষ ধোঁয়ায় মিলিয়ে যাচ্ছে, আবার আলাদিনের প্রদীপের ভেল্কির মতো ধোঁয়ার কুণ্ডলীর ভিতর থেকে বেরিয়ে আসছে। একটি মেয়েকে কাঠের বাক্সের মধ্যে পুরে বাক্সটাকে করাত দিয়ে কেটে আধখানা করে দিলেন শেফাল্লো, আবার পাঁচ মিনিট পরেই হাসতে হাসতে বেরিয়ে এল অন্য আরেকটা বাক্সের ভিতর থেকে— তার গায়ে একটি আঁচড়ও নেই। সুরপতির হাতের তেলো সেদিন লাল হয়ে গিয়েছিল হাততালির চোটে।

আর শেফাল্লোকে লক্ষ করে বার বার অবাক হচ্ছিল সেদিন সুরপতি। লোকটা যেমন জাদুকর, তেমনি অভিনেতা। পরনে কালো চকচকে সুট, হাতে ম্যাজিক-ওয়ান্ড, মাথায় টপ-হ্যাট। সেই হ্যাটের ভিতর থেকে জাদুবলে কীই না বার করলেন শেফাল্লো। একবার খালি হ্যাটে হাত ঢুকিয়ে কান ধরে একটা খরগোশ টেনে বার করলেন। বেচারা সবে কানঝাড়া শেষ করেছে এমন সময় বেরোল পায়রা— এক, দুই, তিন, চার। ফরফর করে স্টেজের চারদিকে ঘুরে বেড়াতে লাগল ম্যাজিক পায়রা। ওদিকে শেফাল্লো ততক্ষণে সেই একই হ্যাটের ভিতর থেকে চকোলেট বের করে দর্শকদের মধ্যে ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিচ্ছেন।

আর এর সবকিছুর সঙ্গেই চলেছে শেফাল্লোর কথা। যাকে বলে কথার তুবড়ি সুরপতি বইয়ে পড়েছিল যে একে বলে 'প্যাটার।' এই 'প্যাটার' হল ম্যাজিশিয়ানদের একটা প্রধান অবলম্বন। দর্শক যখন এই প্যাটারের স্রোতে নাকানি-চোবানি খাচ্ছেন, ম্যাজিশিয়ান সেই ফাঁকে হাতসাফাইয়ের আসল কাজগুলো সেরে নিচ্ছেন।

কিন্তু এর আশ্চর্য ব্যতিক্রম হলেন মাদাম প্যালার্মো। তাঁর মুখে একটি কথা নেই। নির্বাক কলের পুতুলের মতো খেলা দেখিয়ে গেলেন তিনি। তাহলে তাঁর হাতসাফাইগুলো হয় কোন্ ফাঁকে ? এর উত্তরও সুরপতি পরে জেনেছিল। স্টেজে এমন ম্যাজিক দেখানো সম্ভব যাতে হাত সাফাইয়ের কোন প্রয়োজন হয় না। সেসব ম্যাজিক নির্ভর করে কেবল যন্ত্রের কারসাজির উপর এবং সেসব যন্ত্র চালানোর জন্য স্টেজের কালো পর্দার পিছনে লোক থাকে। মানুষকে দুভাগে ভাগ করে কেটে আবার জুড়ে দেওয়া, বা ধোঁয়ার ভিতর অদৃশ্য করে দেওয়া— এসবই কলকব্জার ব্যাপার। তোমার যদি পয়সা থাকে, তুমিও সেই সব কলকব্জা কিনে বা তৈরি করিয়ে সেই সব ম্যাজিক দেখাতে পার। অবিশ্যি ম্যাজিকগুলো জমিয়ে, রসিয়ে সাজপোশাকের বাহারে চিত্তাকর্ষক করে দেখানোর মধ্যেও একটা বাহাদুরি আছে, আর্ট আছে। সবাইয়ের সে আর্ট জানা নেই, কাজেই পয়সা থাকলেই বড় ম্যাজিশিয়ান হওয়া যায় না। সবাই কি আর—

সুরপতির স্মৃতিজাল হঠাৎ ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে গেল।

ট্রেনটা একটা প্রকাণ্ড ঝাঁকুনি দিয়ে প্ল্যাটফর্ম ছেড়েছে, আর ঠিক সেই মুহূর্তে এক হ্যাঁচকা টান দিয়ে দরজা খুলে কামরার মধ্যে ঢুকেছে— এ কী ! সুরপতি হাঁ-হাঁ করে উঠে বাধা দিতে গিয়ে থমকে থেমে গেল।

এ যে সেই ত্রিপুরাবাবু ! ত্রিপুরাচরণ মল্লিক !

এরকম অভিজ্ঞতা সুরপতির আরো কয়েকবার হয়েছে। একজন পরিচিত লোকের সঙ্গে হয়তো অনেককাল দেখা নেই। হঠাৎ একদিন তাঁর কথা মনে পড়ল বা তাঁর বিষয়ে আলোচনা হল, আর পরমুহূর্তেই সশরীরে সেই লোক এসে হাজির।

কিন্তু তাও সুরপতির মনে হল যে ত্রিপুরাবাবুর আজকের এই আবির্ভাবটা যেন আগের সব ঘটনাকে ম্লান করে দিয়েছে।

সুরপতি কয়েক মুহূর্ত কোন কথাই বলতে পারল না। ত্রিপুরাবাবু ধুতির খুঁট দিয়ে কপালের ঘাম মুছে হাতের একটা পোঁটলা মেঝেতে রেখে সুরপতির বেঞ্চের বিপরীত কোণটাতে বসলেন। তারপর সুরপতির দিকে চেয়ে একটু হেসে বললেন, অবাক লাগছে, না ?'

সুরপতি কোনমতো ঢোক গিলে বলল, 'অবাক মানে— প্রথমত, আপনি যে বেঁচে আছেন তাই আমার ধারণা ছিল না।'

'কী রকম ?'

'আমি আমার বি· এ· পরীক্ষার কিছুদিন পরেই আপনার মেসে যাই। গিয়ে দেখি তালা বন্ধ। ম্যানেজারবাবু— নাম ভুলে গেছি— বললেন যে আপনি নাকি গাড়ি চাপা পড়ে…'

ত্রিপুরাবাবু হো হো করে হেসে উঠলেন। বললেন, 'সেরকম হলে তো বেঁচেই যেতাম ! অনেক ভাবনাচিন্তা থেকে রেহাই পেতাম।'

সুরপতি বলল, 'আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে— আমি এই কিছুদিন আগেই আপনার কথা ভাবছিলাম।'

'বল কী ?' ত্রিপুরাবাবুর চোখেমুখে যেন একটা বিষাদের ছায়া পড়ল। 'আমার কথা

ভাবছিলে ?' এখনো ভাব আমার কথা ? শুনে আশ্চর্য হলাম।'

সুরপতি জিভ কাটল। 'এটা আপনি কী বলছেন ত্রিপুরাবাবু! আমি কি অত সহজে ভুলি ? আমার হাতেখড়ি যে আপনার হাতেই। আজ বিশেষ করে পুরোনো দিনগুলোর কথা মনে পড়ছিল। আজ বাইরে যাচ্ছি 'শো' দিতে। এই প্রথম বাংলার বাইরে। —আমি যে এখন পেশাদারী ম্যাজিশিয়ান তা আপনি জানেন কি ?'

ত্রিপুরাবাবু মাথা নাড়লেন।

'জানি। সব জানি। সব জেনেশুনেই, তোমার সঙ্গে দেখা করব বলেই আজ এসেছি। এই বারো বছর তুমি কী করেছ না করেছ, কী ভাবে তুমি বড় হয়েছ, এ অবস্থায় এসে পৌঁছেছ—এর কোনোটাই আমার অজানা নেই। সেদিন নিউ এম্পায়ারে ছিলাম আমি, প্রথম দিন। একেবারে পিছনের বেঞ্চিতে। সবাই তোমার কলাকৌশল কেমন অ্যাপ্রিসিয়েট করল তা দেখলাম। কিছুটা গর্ব হচ্ছিল বটেই। কিন্তু—'

ত্রিপুরাবাবু থেমে গেলেন। সুরপতিও কিছু বলার খুঁজে পেল না। কীই বা বলবে সে ? ত্রিপুরাবাবু যদি কিছুটা ক্ষুণ্ণ বোধ করেন তাহলে তাঁকে দোষ দেওয়া যায় না। সত্যিই উনি গোড়াপত্তনটা না করিয়ে দিলে সুরপতির আজ এতটা উন্নতি হত না। আর তার প্রতিদানে সুরপতি কীই বা করেছে ? বরং উলটে এই বারো বছরে ক্রমশ তার মন থেকে ত্রিপুরাবাবুর স্মৃতি মুছে এসেছে। তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতার ভাবটাও যেন কমে এসেছে।

ত্রিপুরাবাবু আবার শুরু করলেন, 'গর্ব আমার হয়েছিল তোমার সেদিনের সাক্সেস দেখে। কিন্তু তার সঙ্গে আপসোসও ছিল। কেন জান ? তুমি যে রাস্তা বেছে নিয়েছ, সেটা খাঁটি ম্যাজিকের রাস্তা নয়। তোমার ব্যাপারটা অনেকখানি লোকভুলানো রং-তামাশা, অনেকখানি যন্ত্রের কৌশল। তোমার নিজের কৌশল নয়। অথচ আমার ম্যাজিক মনে আছে তোমার ?'

সুরপতি ভোলেনি। কিন্তু সেই সঙ্গে এও মনে ছিল তার যে ত্রিপুরাবাবু যেন তাঁর সেরা ম্যাজিকগুলো তাকে শেখাতে দ্বিধা বোধ করতেন। তিনি বলতেন, 'এখনো সময় লাগবে।' সেই সময় আর কোনদিন আসেনি। তার আগেই এসে পড়ল শেফাল্লো, আর তার দু মাসের মধ্যেই ত্রিপুরাবাবু উধাও।

কিছুটা বিস্ময় ও কিছুটা আপসোস সুরপতির হয়েছিল সেদিন— মেসে গিয়ে ত্রিপুরাবাবুকে না পেয়ে। কিন্তু সেটা ক্ষণস্থায়ী। কারণ তখনও তার মনের অনেকখানি জায়গা জুড়ে রয়েছে শেফাল্লো। শেফাল্লোর জায়গায় নিজেকে কল্পনা করে সে অনেক স্বপ্নজাল বোনে। দেশে দেশে ম্যাজিক দেখিয়ে রোজগার করবে, নাম করবে, লোকে আনন্দ দেবে, লোকের হাততালি পাবে, বাহবা পাবে।

ত্রিপুরাবাবু অন্যমনস্কভাবে জানালা দিয়ে বাইরে চেয়ে আছেন। সুরপতি তাঁকে একবার ভালো করে দেখল। ভদ্রলোককে সত্যিই দুঃস্থ বলে মনে হচ্ছে। মাথার চুল প্রায় সমস্ত পেকে গেছে, গালের চামড়া আলগা হয়ে এসেছে, চোখ ঢুকে গেছে কোটরের ভিতরে। কিন্তু চোখের দৃষ্টি কি ম্লান হয়েছে কিছু ? মনে তো হয় না। আশ্চর্য তীক্ষ্ণ চাহনি ভদ্রলোকের।

ত্রিপুরাবাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'অবিশ্যি তুমি কেন এ পথ বেছে নিয়েছ জানি। আমি জানি তুমি বিশ্বাস কর— হয়তো আমিই তার জন্য কিছুটা দায়ী— যে খাঁটি জিনিসের কদর নেই। স্টেজে ম্যাজিক চালাতে গেলে একটু চটক চাই, চাকচিক্য চাই।

তাই নয় কি ?’

সুরপতি অস্বীকার করল না। শেফাল্লো দেখার পর থেকেই তার এ ধারণা হয়েছিল। কিন্তু জাঁকজমক মানেই কি খারাপ ? আজকাল দিনকাল বদলেছে। বিয়ের আসরে ফরাসের উপর বসে ম্যাজিক দেখিয়ে কীই বা রোজগার করবে তুমি, আর কেই বা জানবে তোমার নাম ? ত্রিপুরাবাবুর অবস্থাটা তো সে নিজের চোখেই দেখেছে। খাঁটি ম্যাজিক দেখাতে গিয়ে যদি মানুষের পেট না চলে তো সে ম্যাজিকের সার্থকতা কোথায় ?

সুরপতি ত্রিপুরাবাবুকে শেফাল্লোর কথা বলল। যে-জিনিস হাজার হাজার দর্শক দেখে আনন্দ পাচ্ছে, তারিফ করছে, তার কি কোনই সার্থকতা নেই ? খাঁটি ম্যাজিক তো সুরপতি অশ্রদ্ধা করছে না। কিন্তু সে পথে কোন ভবিষ্যৎ নেই। তাই সুরপতি এই পথ বেছে নিয়েছে।

ত্রিপুরাবাবু হঠাৎ যেন উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। বেঞ্চির উপর পা তুলে দিয়ে তিনি সুরপতির দিকে ঝুঁকে পড়লেন।

‘শোনো সুরপতি, তুমি যদি সত্যিই বুঝতে পারতে আসল ম্যাজিক কী জিনিস তাহলে তুমি নকলের পিছনে ধাওয়া করতে না। হাতসাফাই তো ওর শুধু একটা মাত্র অঙ্গ। অবিশ্যি তারও যে কত শ্রেণীবিভাগ আছে তার শেষ নেই। যৌগিক ক্রিয়ার মতো সে-সব সাফাই মাসের পর মাস, বছরের পর বছর অভ্যাস করতে হয়। কিন্তু এ ছাড়াও তো আরো কত কী আছে। হিপ্‌নটিজিম ! কেবল চোখের চাহনির জোরে মানুষকে সম্পূর্ণ তোমার বশে এনে ফেলতে পারবে। এমন বশ যে সে তোমার হাতে কাদা হয়ে যাবে। তারপর ক্লেয়ারভয়েন্স, বা টেলিপ্যাথি, বা থটরীডিং। অপরের চিন্তার জগতে তুমি অবাধ চলাফেরা করতে পারবে। একজনের নাড়ী টিপে বলে দেবে সে কী ভাবছে। তেমন তেমন শেখা হয়ে গেলে পরে তাকে স্পর্শও করতে হবে না। কেবল মিনিট খানেক তার চোখের দিকে চেয়ে থাকলেই তার মনের কথা, পেটের কথা সব জেনে ফেলবে। এসব কি কম ম্যাজিক ? জগতের সব সেরা ম্যাজিকের মূল হচ্ছে এইসব জিনিস। এতে কলকব্জার কোন ব্যাপারই নেই। আছে শুধু সাধনা, নিষ্ঠা, একাগ্রতা।’

ত্রিপুরাবাবু দম নেবার জন্য থামলেন। ট্রেনের শব্দের জন্য তাঁকে গলা উঁচিয়ে কথা বলতে হচ্ছিল। তাতে বোধ হয় তিনি আরো ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। এবারে তিনি সুরপতির দিকে আরো এগিয়ে এসে বললেন, ‘আমি তোমাকে এর সব কিছুই শেখাতে চেয়েছিলাম, কিন্তু তুমি গ্রাহ্য করলে না। তোমার তর সইল না। একজন বিদেশী বুজরুকের বাইরের জাঁকজমক তোমার মাথা ঘুরিয়ে দিল। আসল পথ ছেড়ে যে পথে চট করে অর্থ হয়, খ্যাতি হয়, সেই পথে চলে গেলে তুমি।’

সুরপতি নির্বাক। সত্যি করে এর কোন অভিযোগেরই প্রতিবাদ সে করতে পারে না।

ত্রিপুরাবাবু এবার সুরপতির কাঁধে একটা হাত রেখে গলার স্বর একটু নরম করে বললেন : ‘আমি তোমার কাছে একটা অনুরোধ নিয়ে এসেছি সুরপতি। আমায় দেখে বুঝেছ কিনা জানি না—আমার অবস্থা খুবই খারাপ। এত জাদু জানি, কিন্তু টাকা করার জাদুটা এখনও অজানা রয়ে গেছে। অ্যাম্বিশনের অভাবই আমার কাল হয়েছে, নাহলে কি আর আমার অন্নচিন্তা করতে হয় ? আমি এখন মরিয়া হয়েই এসেছি তোমার কাছে সুরপতি। আমি নিজে যে নিজের পায়ে দাঁড়াব সে শক্তি আর নেই, বয়সও নেই। কিন্তু আমার এটুকু বিশ্বাস আছে যে আমার এ দুর্দিনে তুমি আমাকে—কিছুটা স্যাক্রিফাইস করেও—সাহায্য করবে। ব্যস্— তারপর আর আমি তোমাকে বিরক্ত করব না।’

সুরপতির মনটা ধাঁধিয়ে উঠল। কী সাহায্য চাইছেন ভদ্রলোক ?

ত্রিপুরাবাবু বলে চললেন, 'তোমার কাছে হয়তো প্ল্যানটা একটু রূঢ় বলে মনে হতে পারে, কিন্তু এ ছাড়া উপায় নেই। মুশকিল হচ্ছে কি, আমার যে শুধু টাকারই প্রয়োজন তা নয়। বুড়ো বয়সে একটা নতুন শখ হয়েছে জান। একসঙ্গে অনেকগুলো লোকের সামনে আমার সেরা খেলাগুলো একবার দেখাতে ইচ্ছে করছে। হয়তো এই প্রথম এবং এই শেষবার, কিন্তু তাও এ শখটাকে কিছুতেই দমন করতে পারছি না সুরপতি !'

একটা অজানা আশঙ্কা সুরপতির বুকটাকে কাঁপিয়ে দিল।

ত্রিপুরাবাবু এবার তাঁর আসল প্রস্তাবটা পাড়লেন।

'লক্ষ্ণৌতে তোমার ম্যাজিক দেখানোর ব্যবস্থা হয়েছে। তুমি সেখানেই যাচ্ছ। ধরো যদি শেষ মুহূর্তে তোমার অসুখ করে ! দর্শককে একেবারে হতাশ করে ফিরিয়ে দেওয়ার চেয়ে ধরো যদি তোমার জায়গায় আর কেউ··· ।'

সুরপতি হকচকিয়ে গেল। ত্রিপুরাবাবু বলেন কী ! সত্যিই মরিয়া হয়েছেন ভদ্রলোক, নাহলে এমন অদ্ভুত প্রস্তাব করেন কী করে ?

সুরপতি চুপ করে আছে দেখে ত্রিপুরাবাবু বললেন, 'অনিবার্য কারণ হেতু তোমার বদলে তোমার গুরু ম্যাজিক দেখাবেন—এইভাবেই খবরটা দিয়ে দেবে তুমি। এতে কি লোক খুব হতাশ হবে বলে মনে হয় ? আমার তো তা মনে হয় না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে আমার ম্যাজিক লোকের ভালোই লাগবে। কিন্তু তাও আমি প্রস্তাব করি যে প্রথম দিনের হিসেবে তোমার যা টাকা পাওনা হত, তার অর্ধেক তুমিই পাবে। তাতে আমার ভাগে যা থাকবে তাতেই আমার চলে যাবে। তারপর তুমি যেমন চলছ চলো। আমি আর তোমাকে বিরক্ত করব না। কেবল এই একদিনের সুযোগটুকু তোমাকে করে দিতেই হবে সুরপতি !'

'অসম্ভব !' সুরপতির মাথা গরম হয়ে উঠেছে।

'অসম্ভব। আপনি কী বলছেন আপনি নিজেই বুঝতে পারছেন না ত্রিপুরাবাবু। বাংলার বাইরে এই আমার প্রথম প্রদর্শনী। লক্ষ্ণৌয়ের 'শো'-এর উপর কত কিছু নির্ভর করছে তা আপনি বুঝতে পারছেন না ? আমার কেরিয়ারের গোড়াতেই আমি একটা মিথ্যের আশ্রয় নেব ? কী করে ভাবছেন আপনি এমন কথা ?'

ত্রিপুরাবাবু স্থির দৃষ্টিতে সুরপতির দিকে চেয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর ট্রেনের শব্দের উপর দিয়ে তাঁর ধীর, সংযত কণ্ঠস্বর সুরপতির কানে ভেসে এল।

'সেই আধুলি আর আংটির ম্যাজিকের উপর তোমার এখনো লোভ আছে কি ?'

সুরপতি চমকে উঠল। কিন্তু ত্রিপুরাবাবুর চাহনিতে কোন পরিবর্তন নেই।

'কেন ?'

ত্রিপুরাবাবু মৃদু হেসে বললেন, 'তুমি যদি আমার প্রস্তাবে রাজী হও তাহলে আমি তোমায় ম্যাজিকটা শিখিয়ে দেব। যদি এখনই কথা দাও তো এখনই। আর যদি না দাও—'

হুইশল্-এর বিকট শব্দ করে একটা হাওড়াগামী ট্রেন সুরপতিদের ট্রেনের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল। তার কামরার আলোয় ত্রিপুরাবাবুর চোখ বার বার ধকধক করে জ্বলে উঠল। আলো আর শব্দ মিলিয়ে গেলে পর সুরপতি জিজ্ঞাসা করল, 'আর যদি রাজী না হই ?'

'তাহলে ফল ভালো হবে না সুরপতি। তোমার একটা কথা জানা দরকার। আমি যদি

দর্শকের মধ্যে উপস্থিত থাকি তাহলে ইচ্ছা করলে আমি যে-কোন জাদুকরকে অপদস্থ, নাকাল এমন কি একেবারে অকেজো করে দিতে পারি।

ত্রিপুরাবাবু তাঁর কোটের পকেট থেকে একজোড়া তাস সুরপতির দিকে এগিয়ে দিলেন।

'দেখাও তো দেখি তোমার হাতসাফাই! কঠিন কিছু না। একেবারে প্রাথমিক সাফাই। পিছনের এই গোলামটা সামনের এই তিরির উপর নিয়ে এসো দেখি হাতের ঝাঁকানিতে।'

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ষোলো বছর বয়সে সুরপতির এই সাফাইটা আয়ত্ত করতে লেগেছিল মাত্র সাতদিন।

আর আজ ?

সুরপতি তাস হাতে নিয়ে দেখল তার আঙুল অবশ হয়ে আসছে। শুধু আঙুল নয়,— আঙুল, কব্জি, কনুই— একেবারে পুরো হাতটাই অবশ। ঝাপসা চোখে সুরপতি দেখল ত্রিপুরাবাবুর ঠোঁটের কোণে এক অদ্ভুত হাসি ; এক অমানুষিক তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে তিনি সুরপতির চোখের দিকে। সুরপতির কপাল ঘেমে গেল, সর্বাঙ্গে একটা কাঁপুনির লক্ষণ অনুভব করল সে।

'এবার বুঝেছ আমার ক্ষমতা ?'

সুরপতির হাত থেকে তাসের প্যাকেটটা আপনা থেকেই পড়ে গেল বেঞ্চির উপরে। ত্রিপুরাবাবু তাসগুলো গোছ করে তুলে নিয়ে গম্ভীর গলায় বললেন, 'রাজী আছ ?'

সুরপতির অসুস্থ অবশ ভাবটা কেটে গেছে।

সে ক্লান্ত ক্ষীণ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল, 'ম্যাজিকটা শেখাবেন তো ?'

ত্রিপুরাবাবু তাঁর ডান হাতের তর্জনী সুরপতির নাকের সামনে তুলে ধরে বললেন, 'লক্ষ্ণৌ'য়ের প্রথম শোতে তোমার অসুস্থথাহেতু তোমার পরিবর্তে তোমার গুরু ত্রিপুরাচরণ মল্লিক তাঁর জাদুবিদ্যা প্রদর্শন করবে। তাই তো ?'

'হ্যাঁ, তাই।'

'তুমি তোমার প্রাপ্য টাকার অর্ধেক আমাকে দেবে। ঠিক তো ?'

'ঠিক।'

'তবে এসো।'

সুরপতি পকেট হাতড়ে একটা আধুলি, আর নিজের আঙুল থেকে পলাবসানো আংটিটা খুলে ত্রিপুরাবাবুকে দিল।...

বর্ধমানে গাড়ি থামতে চা নিয়ে তার 'বস্'-এর কামরার সামনে এসে অনিল দেখে সুরপতি ঘুমে অচেতন। অনিল একটু ইতস্তত করে একবার 'স্যার' বলে মৃদু শব্দ করতেই সুরপতি ধড়মড়িয়ে উঠে বসল।

'কী...কী ব্যাপার ?'

'আপনার চা এনেচি স্যার। ডিসটার্ব করলুম, কিছু মনে করবেন না।'

'কিন্তু... ?' সুরপতি উদভ্রান্ত দৃষ্টিতে কামরার এদিক-ওদিক দেখতে লাগল।

'কী হল স্যার ?'

'ত্রিপুরাবাবু... ?'

'ত্রিপুরাবাবু ?' অনিল হতভম্ব।

'না, না...উনি তো সেই ফিফটি-ওয়ানেই...বাস্ চাপা পড়ে...কিন্তু আমার আংটি ?'

'কোন্ আংটি স্যার ? আপনার পলাটা তো হাতেই রয়েছে।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ। আর...'

সুরপতি পকেটে হাত দিয়ে একটা আধুলি বার করল। অনিল লক্ষ করল সুরপতির হাত থরথর করে কাঁপছে।

'অনিল, ভেতরে এসো তো একবার। চট করে এসো। ওই জানালাগুলো বন্ধ করো তো। হ্যাঁ। এইবার দেখো।'

সুরপতি বেঞ্চির এক মাথায় আংটি আর অন্য মাথায় আধুলিটা রাখল। তারপর ইষ্টনাম জপ করে যা-থাকে-কপালে করে স্বপ্নে-পাওয়া কৌশল প্রয়োগ করল আধুলির দিকে তীব্র সংহত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে।

আধুলিটা বাধ্য ছেলের মতো গড়িয়ে আংটির কাছে গিয়ে সেটাকে সঙ্গে নিয়ে সুরপতির কাছে গড়িয়ে ফিরে এল।

অনিলের হাত থেকে চায়ের পেয়ালাটা পড়ে যেতে যদি না সুরপতি অদ্ভুত হাতসাফাইয়ের বলে সেটাকে পড়ার পূর্বমুহূর্তেই নিজের হাতে নিয়ে নিত।

লক্ষ্ণৌয়ে জাদুপ্রদর্শনীর প্রথম দিন পর্দা উঠলে পর সুরপতি মণ্ডল সমবেত দর্শকমণ্ডলীর সামনে উপস্থিত হয়ে তাঁর স্বর্গত জাদুবিদ্যাশিক্ষক ত্রিপুরাচরণ মল্লিকের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করল।

আজ প্রদর্শনীর শেষ খেলা— যেটাকে সুরপতি খাঁটি দেশী ম্যাজিক বলে আখ্যা দিল— হল আংটি ও আধুলির খেলা।

পৃথিবীর ছাদে অঘটন

জ্যোতির্ময় দত্ত

আমরা সকলেই কাগজে পড়েছি, কোনও সালে বেলজিয়ামের ১নং ইউরো চ্যাম্পিয়ন স্টীন ভ্যান রোঁদো, কোনও সালে কেনিয়ার ভারতীয় বংশোদ্ভুত এবং তিন-বার কিলিমাঞ্জারো র‍্যালি বিজয়ী ডিকি মেহ্‌তা জিতেছেন এবারের হিমালায়ান র‍্যালি।

র‍্যালি—মানে মোটর দৌড়। আমাদের কাছে ঐটুকুই যথেষ্ট। কে প্রথম এল, কে দ্বিতীয়, তাই বা আমরা কজন মনে রাখি কাগজে পড়ার দু-ঘণ্টা পর ?

অথচ ফুটবল-ক্রিকেটের চেয়ে বহুগুণ গতিময় এবং একেবারে আধুনিক গ্ল্যামারাস, হাই-টেক, বিপজ্জনক, ১০০০ মিটার খাদে তোবড়ানো মেশিন আর থেঁতলানো মানুষের রক্তময় এই স্পোর্ট— মোটর র‍্যালি।

আর হিমালায়ান র‍্যালি ?

পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্বতে সিধা-সাদা রাস্তা তো নয়, সব প্যাঁচের পর প্যাঁচের জিলিপি ! কখনও বা বাংলা 'ঙ' অক্ষরের মত লুপ আর বাঁক। কখনও বা দয়-দয় রেফের—'র্দ্দ'-এর মত জিগজ্যাগ টার্ন।

যা কখনও কুয়াশা ঢেকে দেয়। কখনও বরফ। আছে কুমায়ুন ও গাড়োয়ালে ওঠার আগে, তরাইয়ের জিম করবেট ন্যাশনাল পার্কে বাঘ, হরিণ, হাতি।

কোথাও রাস্তাই নেই। শুকনো ঝর্ণার উপলখণ্ডের উপর দিয়ে চলে গেছে র‍্যালি রুট। সাসপেনশন ও গিয়ারবক্সের সর্বনাশ।

ঘণ্টায় ২০০ কি·মি· বেগে সেরা ড্রাইভারও কুয়াশায় ভুল করতে পারে বাঁক। বৃষ্টিতে ব্রেক না-করে অভয়ারণ্যের বাঘকে মারতেই পারে ধাক্কা— যা খেয়ে জঙ্গলের সম্রাট টুশকি খাওয়া সিকির মত ছিটকে যান।

কেন তবে হিমালায়ান র‍্যালি পাঁচশ-পাওয়ার বাল্বের মত আকর্ষণ করে ইংল্যান্ড, আমেরিকা, জাপান, জার্মানি, হল্যান্ড, কেনিয়া, বেলজিয়াম থেকে প্রতিযোগী পতঙ্গদের ?

হ্যাঁ, পতঙ্গই বটে। দূর থেকে, খাদের উল্টোদিকের পাহাড়ের গায়ে, গোঁ-গোঁ-এঞ-এঞ ভুড়ুম-ভুড়ুম-এঞ-এঞ শব্দে এঁকে-বেঁকে দ্রুত ওঠা লাল-নীল-হলুদ রেসিংকারগুলিকে যান্ত্রিক গুবরে পোকা কিংবা বোলতা কিংবা কাঁচ পোকাই মনে হয়। ব্রিটেনের জাগুয়ার-এক্স টু কিংবা জাপানের মিটসুবিসির ভালকান দেখতে স্থলের মোটরগাড়ির চাইতে স্ট্র্যাটোসফিয়ারে জেট ফাইটার প্লেনকেই বেশি মনে করিয়ে দেয়— এতো ঢালু, নিচু, চোঙা, এয়ারোডাইনামিক, যার ককপিটে রেডিওফোন ও ইন্টারকম-সহ হেলমেট ও অ্যাসবেসটস ফায়ারস্যুট-পরা ড্রাইভার ও ন্যাভিগেটরকে মনে হয় মঙ্গল গ্রহের কোনও অ্যাস্ট্রনট !

কেন হিমালায়ান র‍্যালিতে আসে এই পতঙ্গেরা ? আসে কারণ বিদেশে এর পেছনে ঢালা হয় বড় টাকা। মিটসুবিসি পাঠায় একটা নয়, তিনটি-এন্ট্রি, সঙ্গে সাপোর্ট টী-ভি-এইচ-এফ রেডিও এবং কুয়াশাভেদী রেডারসহ। উপরে থাকে হেলিকপ্টার— যাতে মিটসুবিসির কোনও প্রতিযোগীর গিয়ারবক্স ভাঙলে, কি সাসপেনশন গেলে, কিংবা দুর্ঘটনায় উল্টে কাছিম-চিৎ হলে, সঙ্গে সঙ্গে সাহায্য পৌঁছয়। আগুন কিংবা ক্র্যাশে— হেলিকপ্টার সঙ্গে সঙ্গে নাবিয়ে দেয় রেসকিউ ক্রু, ডাক্তারসহ। একেকটা র‍্যালি জেতা মানে মোটরগাড়ির বিশ্ববাজারে একেকটি পানিপথের যুদ্ধ জয়। তাই ক্রাইসলার ডলার-ব্যয়ে অকৃপণ, ইয়েন-ব্যয়ে উদার টয়েটা, পাউন্ড স্টার্লিং ব্যয়ে মুক্তহস্ত লেল্যান্ড। আমেরিকায় গুডইয়ার টায়ার-এর গর্ব— অন্য সব প্রতিযোগী টায়ার কোম্পানির দ্বিগুণ র‍্যালি গুডইয়ার জিতেছে। ভারতের এম আর এফ এরও সেই দাবি, সেই দেমাক। র‍্যালিতে লক্ষ টাকা পুরস্কারের টাকা তো নস্যি ! প্রধান হচ্ছে স্পন্সরশিপের সাপোর্ট।

হ্যাঁ, হিমালায়ান র‍্যালিতে সবাই যায় স্পন্সরের দৌলতে। কেবল একটা দল বাদে।

স্বাভাবিকভাবেই, এটা কলকাতার দল। মাদ্রাজে এলাহি স্পন্সর—এম আর এফ। বম্বেতে—প্রিমিয়ার অটো। দিল্লিতে— আর্মি স্পোর্টস ফাউন্ডেশন। কিন্তু কলকাতার কোনও প্রতিষ্ঠান মোটরদৌড়ে উৎসাহী নন। খবরের কাগজগুলিও ততো পাত্তা দেয় না। বামফ্রন্টের রাজ্য। মানতেই হয়, মোটর র‍্যালি হচ্ছে 'এলিটিস্ট'। প্রচার হয়ে গেছে যে এটা বড়লোকদের স্পোর্ট। সুতরাং সরকারি মদতের প্রশ্নই ওঠে না। যদিও, ঘটনা হল ওদেশে মোটরদৌড় তারকারা কেউ মিলিয়নেয়ারের পুত নয়, তারা পেশাদার। বিজ্ঞাপন থেকেই তাদের ছয়-অঙ্কের উপার্জন। কলকাতার যে দলটি যায় তারা অবশ্যই শৌখিন এক বনেদি স্টিভেডোর-পরিবারের তিন জেন্টলম্যান— র‍্যালিইস্ট।

তিন ভাই অরিদমন, জয়সাধন, সরোদবাদন চৌধুরী। অরিদমন থাকে ইংল্যান্ডে, জয়সাধন ও সরোদবাদন কলকাতায়, তারা দেখে পারিবারিক বিবিধ ব্যবসা। কিন্তু এই পুজোর সময়টা হিমালায়ান র‍্যালিকে উপলক্ষ্য করে তিন ভাই এক সঙ্গে যায় মোটরদৌড়ে, নিজেদের পয়সায় কেনা ফোর্ড লোটাস কিংবা করোলা নিয়ে—সঙ্গে একটা সাপোর্ট মারুতি জিপসি যাতে থাকে তাদের প্রিয় পারিবারিক মেকানিক, হরিশ পাণ্ডে আর (১) স্লিপিং-ব্যাগ আর নাইলন তাঁবু, (২) স্টোভ-কুকার-ফ্লাস্‌ক, (৩) এক ক্রেট বিয়ার, (৪) চার বোতল রাম। আর আছেন দলের সবচেয়ে গম্ভীর আর জ্ঞানী সদস্য— ভালুকের মত বিশালাকায় রোমশ ভুটানী কুকুর : ইয়াংচুক দোরজি। সারা বছর সমতলের গরমে বড় কষ্ট পান এই ৭ বছর বয়সেই ৫০ বছরের মতো বিজ্ঞ ও নাক-উঁচু ইয়াংচুক। পুজোয় পাহাড়ে বেড়াতে তিনি মোটেই কেবল হাওয়া খাওয়ার জন্য যান না। রাশভারী ইয়াংচুক নিজেকে এই দলটির পরামর্শদাতা ও গার্জেন বিবেচনা করেন।

চৌধুরীদের বালিগঞ্জ পার্ক রোডের প্রাসাদোপম অট্টালিকার তেতলার দক্ষিণ বারান্দায় প্রাতরাশে বসে তিন ভাই এবং ইয়াংচুক সাহেবের (এঁরা তাকে 'কুকুর' বললে রাগ করেন) সঙ্গে এবারের র‍্যালির প্রস্তুতি নিয়ে কথা হচ্ছিল।

'মুশকিল যে পাণ্ডের দেশ থেকে চিঠি এসেছে, ও যেতে পারবে না', অরিদমনকে দুঃসংবাদ দিল সরোদবাদন। কিন্তু তাতে বিশেষ ভ্রূক্ষেপ করল না অরি— কারণ তার অখণ্ড মনোযোগ তখন গলদাচিংড়ির মালাইকারি দিয়ে লুচি খাওয়ায়। বিরাট বাটিতে লাল দাঁড়া আর মুড়োসহ গোলাপি গলদার দিকে আড়চোখে না চেয়ে পারছিল না এমনকি সদা-সম্ভ্রান্ত ইয়াংচুকও।

অপ্রাসঙ্গিকভাবে অরি সরোদকে জবাবে বলে : 'কী তোরা ছাই এই সোনার দেশে থেকেও সকালে ডিম আর বেকন আর টিনের হেরিং সার্ডিন খাস ! ভাগ্যিস বিদেশে ঐসব খাই বলে মা আমার জন্যে লুচির ব্যবস্থা রাখেন ।'

'ইংল্যান্ডে থেকে থেকে তোর 'আই লাভ লুসি'-র বদলে, আই লাভ লুচি হয়ে গেছে', টেবিলে তবলার তেরে-কেটে-তাক তাল দিয়ে জয় বললে, 'সমস্যার একটাই সমাধান, পাণ্ডে দিয়ে যাবে এক বদলি, কিন্তু সে একেবারে অচেনা ।'

ইয়াংচুককে মুড়োটা ভেঙে একটা প্লেটে এগিয়ে দিয়ে অরি কিছুক্ষণ চিন্তা করে। গলদাচিংড়ির মাখনের মত মাংসের স্বাদ ? হিমালয়ের হেয়ারপিন বাঁকে কোনও অজানা মেকানিকের উপর নির্ভর করার রিস্ক ? সে কী ভাবছে, সেই জানে !

এমন সময় বেয়ারা একটা কার্ড দিয়ে যায়। ইন্দ্রনীল রুদ্র। আজকাল-এর দুর্ধর্ষ ক্রীড়া সাংবাদিক। কাউকে পরোয়া করে না। এমনকি গাভাসকারকেও দু-চার কথা প্রয়োজনে শুনিয়ে দেয়।

ইন্দ্রনীল রুদ্র ঢুকতে ঢুকতে বলে : 'আবার যাচ্ছেন হেরে আসতে তিন ভাই ? ইয়ার্কি নাকি ? আধুনিক স্পোর্টসে পরাজয়ের কোনও স্থান নেই। ইউ হ্যাভ টু উইন অ্যাট এনি কস্ট।'

ইন্দ্রনীল ওদের তিনজনের বাল্যবন্ধু। এবং যেটুকু কভারেজ হিমালায়ান র‍্যালি কলকাতার প্রেসে পায় তা ইন্দ্রনীলের কারণেই। কিন্তু সে বরদাস্ত করতে পারে না এই তিন ভায়ের সৌখিন, অপেশাদার অ্যাটিচ্যুড।

'বুঝলাম, তোমাদের কাছে এটা একটা হাই-রিস্ক পারিবারিক পুনর্মিলন, র‍্যালির অজুহাতে হিমালয়ে এক পিকনিক', ইন্দ্রনীল চীজ অমলেটে কাঁটা বিঁধিয়ে বলে। 'কিন্তু একবার এটাকে প্রোফেশনালি অ্যাটেম্প্ট করতে ক্ষতি কি ?'

অরি মুচকি হাসে।

জয় বলে : 'যে কোনক্রমে জয় নয়, খেলাটাই বড়। সরোদ গতবার ল্যান্সডাউন থেকে মুসুরি একটাও পেনাল্টি পয়েন্ট সংগ্রহ না-করে পৌঁছেছিল— যা রাঁদো কি ম্যাকনিস পারেনি, যা র‍্যালির ইতিহাসেই নেই। কিন্তু জানো, আমাদের দুবার ভেঙে গিয়েছিল গিয়ারবক্স— যা ঐখানে বসে মেরামত করে দেয় পাণ্ডে। সেটা একটা অসম্ভব কাজ ! কিন্তু করে উঠল তো। ঐ রাতে, ঐ শীতে, সঠিক স্পেয়ারপার্টস ছাড়াই ? কিন্তু মিটসু হলে ? ওরা গিয়ারবক্স সারাতো না। তৎক্ষণাৎ নতুন একটা বসিয়ে দিত। ঠিকই সেটা সময় নেয় কম। কিন্তু কৃতিত্ব কিসে বেশি ? আমাদের টায়ারই বদলাতে হল ১৩ বার। সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলাম এক ডজন। পকেটের পয়সায় আর কত পারা যায় ?'

'তাহলে যাওয়া কেন ?'

'বাঃ চেষ্টার কোনও মূল্য নেই ? সাহসের ? পারদর্শিতার ? সংগঠন ও বিজ্ঞাপন ও স্পন্সরই সব ?' জয়-এর আবেগে বাধা দিয়ে, অরি একটা আঙুল তোলে।

'এসব কথা থাক। আমরা যাই বিশুদ্ধ উপভোগের জন্য। হিমালয়ের ঐসব শৃঙ্গ থেকে শিব-দুর্গা নিশ্চয় দেখেন কে প্রকৃত খেলোয়াড়, আর কে জুয়াচোর, ঠগ, খুনী, ডোপ-ফিন্ড।'

'খুনী ? ডোপ-ফিন্ড', ইন্দ্রনীল ভুরু কুঁচকোয়।

'এক নামী কোম্পানীর টিমের প্রধান প্রতিযোগী দলের বিয়ারে ঘুমের ড্রপ, কিংবা সুযোগ পেলে কার্বুরেটরে চিনি, কিংবা নাট ঢিলে করে দেওয়া কোনও ব্যাপারই নয়।'

'বুঝলুম, তোমরা এ-সবের উর্ধ্বে। রওনা হচ্ছ কবে ?'

'কালকে ভোরে। যদি পাশুের বদলি পাই।

'র‍্যালির খবরটা তাহলে রাতে দিচ্ছি। কলকাতার টিম! টিমটিমে একটিই তো প্রদীপ। কাগজে নামটা অন্তত তো তুলতে হবে।'

'দোহাই তোমার প্লিজ না। নো পাবলিসিটি। এক্কেবারে চেপে যাও। যদি একটি শব্দও না লেখো, ফিরে এসে তাজ-বেঙ্গলের চৌরঙ্গী বারে 'ফায়ারবল' খাওয়াব।'

টিমটিমে একটিই প্রদীপ নয়।

আসলে আরও দুটি এন্ট্রি ছিল কলকাতার, যা জওহরলাল নেহেরু স্টেডিয়াম থেকে র‍্যালির শুরুতে জানা গেল। বর্ধমান রোড-এর সুনীল রুইয়া এসেছে কোত্থেকে ডানলপ-এর স্পন্সরশিপ জোগাড় করে। গাড়িটাও ঝিনচ্যাক, ভুড়ুম-ভুড়ুম। নিস্‌সান টু হান্ড্রেড। আটটা গিয়ার। একসিলারেটারে পা দিয়েছ কি দাওনি— হুউশ করে বুঝতে না বুঝতেই ১৬০/২০০ কি·মি·! আর এসেছে রডন স্ট্রিট এবং কয়লুনের আদিত্য পাটিল যার র‍্যালির অভিজ্ঞতা আছে কেনিয়া ও মালয়েশিয়ায়।

টপ ফেবারিট অবশ্য মিটসুবিসির কানাকা, নং ৬, এবং ফোর্ড ব্রিটেনের ডিকি মেহতা, নং ১৯।

এক মিনিটের ব্যবধানে জে এন ইউ স্টেডিয়ামের র‍্যাম্প থেকে জেটবিমানের গর্জন তুলে, লটারির নম্বর অনুযায়ী প্রতিযোগীরা ছাড়ছিল। প্রথমে নন-কমপিটিটিভ স্ট্রেচ, হরিয়ানা ও উত্তরপ্রদেশের জনপদ ও সমতলভূমির মধ্য দিয়ে, ৮০ কি·মি· এটা পার হতে হবে এক গতিতে, মসৃণভাবে, সক্কলের জন্য সময় বাধা— ৬৫ মিনিট। তাব মধ্যেই অবশ্য দুটি অত্যন্ত বিস্ময়কর আঘাত এল। এত নামজাদা ভলভো দল পথ হারিয়ে মোদিনগরের পর উল্টোদিকে চলে গেল। আর, ভারতীয় আর্টিলারির এন্ট্রি মেজর কাউল তাঁব মারুতি জিপসিসুদ্ধ পড়ে গেলেন ইরিগেশন ক্যানালে।

কিন্তু কলকাতার সম্মানের পক্ষে সবচেয়ে যা অঘটন : কমপিটিটিভ সেকশন শুরু হতে না হতেই, সুনীল রুইয়া সকলের থেকে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টায়, তাঁর নিস্‌সান ২০০ তে দিল অ্যাকসিলারেটরে চাপ এবং জিম করবেট ন্যাশনাল পার্কে প্রবেশেব মুখে, হাইওয়েব শেষ সোজা স্ট্রেচে সকলের চোখের সামনে ছোট হতে হতে হল উধাও।

কিন্তু বেশিক্ষণ নয়।

হাইওয়ে থেকে অভয়ারণ্যে ঢোকার প্রথম বাঁকে দর্শন মিলল নিস্‌সান টু হান্ড্রেডের।

বাঁকে বাহন সামলাতে পারেনি রুইয়া। সড়ক ছেড়ে সোজা গমের ক্ষেত চষে এক জোড়া-শালগাছে চিতাবাঘের মত আঁচড়ে-হিঁচড়ে উঠে গেছে নিসসান এবং দুই গাছেব ফাঁকে, মাটি থেকে অন্তত ১৮/২০ ফুট উপরে, তখনও গোঁঞঞ-ভুড়ুম-ভুড়ুম করছে ক্রুদ্ধ, হিংস্র, অপটু আরোহীর রক্তপীপাসু মেশিন।

নৈনিতালে, হ্রদের পাশের ব্যান্ডস্ট্যান্ডে র‍্যালির প্রথম ল্যাপ শেষ। একে একে ঢুকছে প্রতিযোগীরা। স্ট্যান্ডে অভ্যর্থনায় আছেন গাড়োয়ালের এক প্রাক্তন মেজর-জেনারেল। এবং চাঁপা-রঙা নৈনিতালের সোসাইটি-সুন্দরীরা। আতিথ্য চমৎকার। বিয়ারের বিশাল ফেনময় মাগ তুলে দিচ্ছেন ঐ শীতেও ঘর্মাক্ত-কলেবর ড্রাইভার ও ন্যাভিগেটরের হাতে।

ফেভারিটরাই এগিয়ে। নং ৬ কানাকা। নং ১৯, মেহতা।

চৌধুরী ভ্রাতৃদ্বয়, জয় এবং সরোদ, পাক্কা ৩০ পয়েন্ট হারিয়েছে, স্রেফ ভালোগিরির

কারণে। চৌধুরী ভ্রাতাদের এন্ট্রি নং ৩৩। গাড়ি 'ফোর্ড লোটাস'। চমৎকার চলছে এঞ্জিন। ফাইন টিউনিং। বনের পথে সামনে একপাল হরিণ দেখে, ন্যাভিগেটর জয় হাতটা তুলল— সতর্কতার সংকেত। ইন্টারকমে বলল : 'চিত্তল হরিণ। ফড়িঙের মত লাফায়!' গতি একটু কমিয়ে দিল প্রথমে চালক সরোদ কিন্তু দেখা গেল জয়ের কথাই ঠিক। পিড়িং-পিড়িং করে লাফ দিয়ে গাড়ির বনেটের উপর দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল চিত্তলগুলি। 'উড়ুক্কু মাছের মত, নারে?' ইন্টারকমে জয়কে বলে সরোদ। ভায়েদের মধ্যে সে বয়সে সবচেয়ে ছোটো, স্নায়ু সবচেয়ে স্থির, স্টিয়ারিঙে হাত সবচেয়ে পরিষ্কার। হঠাৎ সামনে একটি চকচকে চোখের হতভম্ব মা-হরিণ আর তার সদ্য প্রসূত বাচ্চা! ঐ স্পীডে এক্কেবারে ব্রেক করা যায় না। গাড়ি উল্টে যাবে। ব্রেকে পর-পর ছোটো চাপে গতি যতটা সম্ভব সামলে নেয় সরোদ, যদিও কিছুটা স্কিড সে ঠেকাতে পারে না। রাস্তার পাশের কাঁটা ঝোপঝাড় উপড়োতে-উপড়োতে শেষে পথপার্শ্বের শুকনো নালায় গিয়ে শান্ত হয় লোটাস। ওদের সাপোর্ট-মারুতি ১৫ মিনিট মত পেছনে আসছিল; তাতে ছিল দলনায়ক অরিদমন, মেকানিক শেখ আসগর, লোকাল গাইড-কাম সিকিউরিটি ও লিয়াজঁ অফিসার—কুমায়ুন রেজিমেন্টের প্রাক্তন হাবিলদার, বিক্রম সিং— আর অভিভাবক-স্থানীয় ইয়াংচুক দোরজি!

ঐ বিন্দুতে পৌঁছনোর মাইল তিনেক আগে থেকেই সদা-গম্ভীর ইয়াংচুক আকাশের দিকে মুখ তুলে গলা দিয়ে এমন একটা সুর বার করছিল যা নাকি সাইরেনের মত, কাঁপা-কাঁপা ঢেউতোলা, উঁচু-নিচু— যা নাকি স্পটে পৌঁছানোর ঠিক আগের বাঁকে থেমে যায়, এবং ওর মাথা থেকে ল্যাজ টান-টান করে কম্পাসের কাঁটার মত, একেক ডিগ্রি করে ঘুরে, লোটাস ঠিক কোথায় আছে ওদের দেখিয়ে দেয়।

ততক্ষণ মা-হরিণ ছানা নিয়ে জঙ্গলের আশ্রয়ে চলে গেছে।

আংটায় হুক লাগিয়ে, শেকল দিয়ে, জিপসি লোটাসটাকে রাস্তায় টেনে তুলল।

'বহুৎ পয়েন্ট নষ্ট হল বটে, হরিণের বাচ্চাটাকে যে ১৬০ কি·মি· স্পীডে তুই বাঁচাতে পেরেছিস, এজন্য বাহবা দিতেই হবে,' সব শুনে রায় দেন অরিদমন।

'সত্যি, দাদা, সরোদ ছাড়া কেউ পারত না, ঐভাবে ১৬০ থেকে শূন্যে ৮০ মিটারের মধ্যে নামতে। অস্কার ম্যাকনীলও নয়, ল্যাজারোটিও নয়', সগর্বে বলে জয়সাধন। এদের হালচালে মনে হয়, একটা হরিণের বাচ্চা বাঁচানো যেন হিম্যালায়ান র‍্যালি জেতার চাইতে বড়। জিম করবেটে অবশ্য, নতুন নিয়মে, ইচ্ছাকৃতভাবে প্রাণীহত্যার পেনাল্টি মারাত্মক। তাতে ডিসকোয়ালিফায়েড হয়ে যাওয়ার ঘোর সম্ভাবনা।

সাধে কি ইন্দ্রনীল রুদ্র এদের অ্যামেচারিশ অ্যাটিচিউডে খাপ্পা!

অরি ৩৩নং-এর ফ্ল্যাগ দেখায়। ইয়ারফোন লাগিয়ে, হেলমেট চাপিয়ে, ককপিটে কুঁজো হয়ে বসে, ভুড়ুম-ভুড়ুম-ভুড়ুম-এএএএ শব্দে নৈনিতালের পথে রওনা হয়ে যায় লোটাস।

র‍্যালির প্রথম ল্যাপ শেষ হচ্ছে নৈনিতালের হ্রদের তীরবর্তী ব্যান্ডস্ট্যান্ডে। এলাহি ব্যবস্থা। স্বাগত জানাতে প্যাভিলিয়নে উপস্থিত কুমায়ুনের শ্রেষ্ঠ সুন্দরীরা। আতিথ্যের স্পন্সরশিপ মোহন মিকিনের। যেই একেকটা যান্ত্রিক দানব জিম করবেট পার্কের বহির্দ্বারস্বরূপ হালদোয়ানি ছেড়ে কাঠগোদাম (১৭১৪ ফুট) ও রাণীবাগ (২০৫০ ফুট) ও জেওলিকোট (৪৩০০ ফুট) হয়ে, ৫ মাইল দূরবর্তী বলদিয়া খানের ৫০০০ ফুট অল্টিচিউড মার্কটা পার হয়, পাহাড়ে-পাহাড়ে প্রতিধ্বনিত গর্জন জানিয়ে দেয় তাদের আগমনবার্তা।

একেকটা যেন মঙ্গলগ্রহের কাঁকড়া— শুধু দাঁড়ার আগায় এরোপ্লেনের মত মোটা-মোটা টায়ার। র‍্যালির মার্শাল সাদা-কালো-বরফি পতাকা ধরে থাকেন ফিনিশ লাইনে। গর্জমান ও ধূম্রমান মেশিনগুলি লাইন পার হতেই মার্শাল পতাকা একবার তুলেই ডিপ করেন। প্রত্যেক প্রতিযোগীর জন্য আলাদা-আলাদা নির্দিষ্ট বিন্দু। ককপিটের ঢাকা তুলে সেফটি-বেল্ট খুলে, যখন বেরিয়ে আসেন একেকটি জুটি, দৃশ্যটি মনে হয় একাধারে ভবিষ্যতের ও মধ্যযুগের। এদের সাজ ইয়োরোপের মধ্যযুগের বর্ম-আচ্ছাদিত নাইট কিংবা জাপানের সামুরাইদের মনে করিয়ে দিতে বাধ্য। তারা হেলমেট খোলার সঙ্গে সঙ্গে সোনালী বিয়ারের ফেনময় মাগ এগিয়ে ধরেছেন সুন্দরী স্বেচ্ছাসেবী, মাইক এগিয়ে ধরেছে আকাশবাণীর রিপোর্টার, দূরদর্শনের হ্যান্ডহেল্ড স্পটে কপালে চিক্‌চিক্ করছে ঘাম।

পয়েন্টে ফেব্বারিটরাই এগিয়ে। কিন্তু তাদের ঘাড়ের উপর প্রায় নিঃশ্বাস ফোঁশ-ফোঁশ করছে দক্ষিণ কোরিয়ার টীম। চতুর্থ—চ্যানেল দ্বীপপুঞ্জে রেজিস্টারি এক দল, যাদের হাব-ভাব, হেকনার-অ্যান্ড-কোক অস্ত্রে সজ্জিত সিকিউরিটি ব্যবস্থা ও গোপনীয়তা মোটেই স্পোর্টসম্যানোচিত নয়। গুজব— মোটরদৌড় নেশাগ্রস্ত এক সৌদি আরব রাজকুমারী, পর্দা আইন লঙ্ঘন করে, মৌলবাদী রোষের ভয়ে ছদ্মবেশে এই র‍্যালিতে অংশগ্রহণ করছেন। র‍্যালির দুই সুবিধে : (১) বুড়ো আঙুল থেকে ব্রহ্মতালু সবই ঢাকা থাকে র‍্যালি চালকের এয়ারকন্ডিশন্ড ফায়ারস্যুট ও শিরস্ত্রাণে এবং (২) নম-দ্য-প্লুম অর্থাৎ ছদ্মনাম ব্যবহার নিষিদ্ধ নয়।

প্রতিযোগীদের কার পার্ক র‍্যালি কর্তৃপক্ষের বিশেষ সিকিউরিটি প্রাচীরে ঘেরা। পাস ছাড়া কারও প্রবেশ নিষেধ। তাছাড়া, প্রত্যেক প্রতিযোগী নিজ-নিজ স্টলে রেখেছে নিজস্ব পাহারা। যখন ড্রাইভার-ন্যাভিগেটর জুটি বিশ্রামরত, তখন মেকানিকরা বসাচ্ছে নতুন স্পার্কপ্লাগ বদলে দিচ্ছে অয়েল এবং এয়ারফিল্টার, টেস্ট করছে টিউনিঙ। খোলা আকাশ। ভীষণ ঠাণ্ডা। একটা নাগাদ বিভিন্ন টিমের মেনটেনেন্স ক্রুগুলি কাজ শেষ করে বিশ্রামে গেল। দুটো নাগাদ হ্রদ থেকে সাবানের ফেনার মত ভারী, পুঞ্জ-পুঞ্জ কুয়াশা রেস্ট্রিক্টেড পার্কিং জোন দিল ঢেকে। লোটাসের পাহারায় বিক্রম সিং। ছুঁচোলো গোঁফ, কাঁধের কুমায়ুন রেজিমেন্ট-লেখা এপোলেট, হায়দরাবাদ ও গোয়া ও বাংলাদেশ যুদ্ধে তাঁর অংশগ্রহণসূচক রিবন— সবই হারিয়ে গেল কুয়াশায়। এক হাতও সামনে কেউ দেখতে অক্ষম। ইয়াংচুক ছাড়া। শেখ আসগর তার মেনটেনেন্সের কাজ শেষ করে, গাড়ির মধ্যেই ইয়াংচুককে জড়িয়ে—কুঁকড়ে জড়াপুঁটলি হয়ে শুয়েছিল। আশ্চর্য, যদিও কাউকে দীর্ঘদিন পরীক্ষা না করে ইয়াংচুক কারও উপর আস্থা স্থাপন করে না, এবং যদিও ছেঁড়া জামা কি ঝোলা-ঝুলি কি মিস্ত্রি ব্যাগ দেখলেই সে সন্ধিগ্ধ হয়ে ওঠে, প্রথম দিনে একবার আসগরের পাৎলুন শুঁকে, হাত চেটে তাকে একেবারে প্রাণের দোসর করে নিয়েছে ইয়াংচুক।

কুয়াশা ঘন হতেই, আসগরের কোল থেকে লাফ দিয়ে বেরিয়ে গা ঝাড়া ও হাই তুলে আড়মোড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াল যে প্রাণীটি সে বালিগঞ্জ পার্ক রোডের সম্রান্ত ও নাক-উঁচু ইয়াংচুক নয়— সে ১০,০০০ ফুট উঁচু ভুটানী জঙ্গলের শ্রেষ্ঠ শিকারী কুকুর, যাকে ভালুক ও তুষার-চিতাও সমীহ করে চলে। আসগর সজাগ হয়ে বসে। নিঃশব্দে ইয়াংচুক একের পর এক প্রতিযোগীদের স্টলে রাউন্ড দেয়। ডিকি মেহতার বুথে অটোমেটিক-ধারী গার্ড ধারণাই করতে পারল না যে তার গায়ের পাশ দিয়ে নরম তুষারে পাখীর পালকপাতের চেয়ে নিঃশব্দে কী তীক্ষ্ণ শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন এক চতুষ্পদ স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড প্রবেশ

করল। ইয়াংচুক যা খুঁজছিল, শুঁকে শুঁকে তাই বার করল। সামনের ফেন্ডারের ভেতরের বাঁকে লেগে আছে এক চিলতে ছিলে-যাওয়া চামড়া ও রোম। গাড়ি ধোওয়া হয়েছে বটে, ঐ সূক্ষ্ম সাক্ষ্যটি মেনটেনেন্স ক্রুর চোখ এড়িয়ে গেছে। পেছনের চাকার মাডগার্ডের অন্তর্ভাগে রক্ত। হ্যাঁ, ডিকি মেহ্‌তা ইচ্ছাকৃতভাবে, গাড়ি না থামিয়ে, অভয়ারণ্যের একটি আশ্রিত মানুষর সখ্যতায় বিশ্বাসী বাঘকে ধাক্কা মেরে হত্যা করেছিল, এবং তা র‍্যালি মার্শালদের রিপোর্ট করেনি। ইয়াংচুক জানে, সরোদ কি জয় কি অরিকে এসব জানিয়ে লাভ নেই। কিন্তু কোনও না কোনভাবে আসগরকে জানাবে। এই ডিকি মেহ্‌তারা স্পোর্টসম্যান ? এরা তো পেশাদার খুনী ? শুধু মানুষ না মারলেই খুন নয় ? ইয়াংচুক আসগরের প্যান্ট ধরে টান দেয়। অন্ধ গায়ক যেমন সঙ্গীর হাত ধরে ভিড়ের কামরাতেও চক্ষুষ্মানের মত অবলীলায় চলাফেরা করে, আসগর ওর পিঠে হাত দিয়ে নির্ভয়ে কুয়াশায় ডিকি মেহ্‌তার স্টলে চলে যায়। মুখ দিয়ে আলতোভাবে কবজি কামড়ে ইয়াংচুক গোপন বিন্দুগুলিতে আসগরের হাত ছোঁয়ায়। আসগর বুঝে নেয় যে পরের দিন সকালে স্ক্রুটিনির সময় মার্শালদের মনোযোগ এদিকে আকর্ষণ করতে হবে।

সকালে মার্শালেরা পরিদর্শনে এলে প্রত্যেক ক্রু নিজ নিজ গাড়ির পাশে সসম্ভ্রমে দাঁড়িয়ে থাকে। এক-একটি আইটেমে তাঁরা টিক দিচ্ছেন, ক্রুরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছে। সম্ভাব্য চ্যাম্পিয়ন ডিকি মেহ্‌তার গাড়ি পরীক্ষা করে মার্শালরা বেরুবেন, এতৎ মুহূর্তে হাত জোড় করে আসগর জানায় যে সে দেখেছে কালাডুঙ্গির আগে, ১৯নং স্পিডে ধাক্কা দিয়ে বাঘ মেরে পালিয়েছে।

প্রমাণ ?

'হুজুর, বাঘটা বাঁ থেকে ডানে রাস্তা পার হচ্ছিল, বহুদূর থেকে দেখা যাচ্ছিল, আমরা চ্যাম্পিয়ন। সাহাব যাবেন বলে গাড়ি থামিয়ে উৎনা বড়িয়া ড্রাইভারকো দেখার জন্য অপেক্ষা করছিলাম। ১৯নং যে স্পিডে আসছিল, তেমনই মাপা ১৬০ কি·মিটারে বেরিয়ে গেল, বাঘটা গোলমাল বুঝে জোরে হেঁটে রাস্তা পার হওয়ার চেষ্টা করেছিল বটে, ডান ফেন্ডারে লাগল বাঘের পাছা, ছিটকে উলটে, পেছনের চাকায় চটকে, পড়ে গেল নিচের ৩০০ মিটার খাদে।'

'হোয়াট ননসেন্স' বলল ডিকি মেহ্‌তা। কিন্তু তার চোখ পড়ে যায় গরিব লোকটার পার্শ্ববর্তী কুকুরটার দিকে। মেহ্‌তা মিলিয়নেয়ার। সে আন্তর্জাতিক সার্কিটের ৯নং স্পিড রেসিং ড্রাইভার। ডিউক এবং মারকুইস এবং হলিউড স্টারদের সঙ্গে তার দহ্‌রম-মহ্‌রম। একটা নোংরা-জামার লোকের অভিযোগে তার কী এসে যায় ?

কিন্তু ঐ কুকুরটা।

ঝুপশো, ভালুকের মত গোলচে, চিতাবাঘের মত চকরাবকরা। কুকুরটা এক দৃষ্টিতে তাকে দেখছে। চোখ দিনের বেলাতেও প্রতিশোধের স্পৃহায় যেন জ্বলছে। তার মুখ বোজা বটে, কিন্তু একটা কৃপাণের চেয়েও ধারালো দাঁত ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে বার করা।

তার দৃষ্টি যেন বলছে : 'দুনিয়াকা গরিব ঔর জানোয়ারোঁ ঔর মাছলিয়োঁ ঔর পেঁড়ো ঔর পঞ্ছিয়োঁ এক হ্যায় ! ইয়েহ্ কাতিল আমীরোঁ দুনিয়াকা বেইমান হ্যায় !'

মার্শালরা গাড়িটা পরীক্ষার হুকুম দিয়ে ডিকিকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করলেন। হ্যাঁ, ফোনে ডি এফ ও এরকম একটা ঘটনার কথা জানিয়েছেন বটে, কিন্তু জিম করবেটে যে বিন্দুতে ঘটার অভিযোগ, সেখানে ঠিক নয়।

পরীক্ষকেরা ক্লিন চিট দিতে যাচ্ছিলেন, আস্‌গর তাঁদের ফেন্ডার ও মাডগার্ডের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ম্যাটে চিত হয়ে শুয়ে জোরালো আলো এবং আতস কাচ দিয়ে পরীক্ষা করতেই অভিযোগের সারবত্তা প্রমাণিত হয়।

হায়, নিজের খ্যাতি ও বড়লোক বন্ধুদের ইনফ্লুয়েন্সে আস্থাবান ডিকি মেহতা! হায়, অভয়ারণ্যে মানুষের বন্ধুত্বে আস্থাবান বাঘ! ডিকির পেনাল্টি পয়েন্ট নষ্ট হল ৫০০।

দ্বিতীয় ল্যাপে ২০ মাইল পরে ভাওয়ালি। অল্টিচিউড ৫,৫০০ ফুট। তারপর ১৮ মাইল পরে গরমপানি। সেখানে চমৎকার পুরি পাওয়া যায়, কিন্তু প্রতিযোগীদের থামার উপায় নেই। তারপর চড়াই-উৎরাই-বাঁক-প্যাঁচ-ধস-বোল্ডার-ভাঙা কালভার্ট-জলপ্রপাত— উপর থেকে খসা পাথরের আশঙ্কা অতিক্রম করে পৌঁছনো গেল ৬০৭ ফুট উচ্চতায় কৌসানি। সেখানে দ্বিতীয় ল্যাপে প্রথম জমায়েতে শুরু হল আতঙ্ক। শোনা গেল, গরমপানি থেকে মাত্র ১৯ মাইল এসেই, ভরসাঁও-তে পর-পর দুটি গাড়ির বুটে ঘটেছে ছোট ছোট বিস্ফোরণ। সেখান থেকে ৩১ মাইল দূরে, মাঝখালিতে ৫৪৪০ ফুট উচ্চতায় আরও কয়েকজন কম্পিটিটারের সমস্ত ইন্সট্রুমেন্ট রহস্যময় ভাবে জিরোতে আটকে যায়। তারপর এই ৬০ মাইল কৌসানিতে আসার মধ্যে, একটা আজানা হেলিকপ্টার ওদের করেছে খুব নিচু অল্টিচিউডে অনুসরণ, এবং কয়েকজন স্টার রেসার অকারণেই কক্‌পিটে হয়ে গেছে অজ্ঞান। সাধারণত, র‍্যালিতে যত দুর্ঘটনা ঘটে, তা তো আছেই। কিন্তু এগুলি একেবারে আলাদা। ফেটাল নয়। কিন্তু প্রত্যেকের পয়েন্ট নষ্ট হচ্ছে। হচ্ছে না কেবল কারাকার মিটসুর, আইল অব ম্যানে রেজিস্ট্রি 'অ্যারেবিয়ান স্ট্যালিয়নের' এবং কলকাতার ৩৩ নম্বরের। কে দোষী? কী ব্যাপার? প্রয়োজনীয় প্লাগ ফিল্টার ইত্যাদি বদলানর পর সরোদ কৌসানি থেকে মাসুরির পথে যেতে যেতে জয়কে বলে: 'দেখছিস তো দাদা, অন্যেরা আমাদের দিকে কেমন বিষদৃষ্টিতে তাকাচ্ছে!'

'তাকাবে না আবার! সকালে আসগর কী কাণ্ডটাই না করল। ঐ রকম ওয়ার্ল্ড ফেমাস একজন চ্যাম্প। তাকে প্র্যাকটিক্যালি আউট করে দিয়েছে র‍্যালি থেকে!'

ঠিক তখনই, তাদের গিয়ারবক্সটা খুলে পড়ে গেল।

আর একটা চড়াই মাত্র। তারপরেই ৬৩৪০ ফুট উচ্চতায় গোয়ালধাম। কিন্তু ওদের কিচ্ছু করার নেই সাপোর্ট ক্রু না আসা পর্যন্ত। ভুড়ুম-ভুড়ুম-এঞ-এঞ করতে করতে পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছে একের পর এক কম্পিটিটররা। কিচ্ছু করার নেই। এও কি তবে সেই রহস্যময় শক্তির হস্তক্ষেপ?

অরি, আসগর, ইয়াংচুক এবং বিক্রম সিং এসে পৌঁছুলো প্রায় দেড় ঘণ্টা পরে।

অরি বললো: 'হেলিকপ্টারটা আমাদের বিশেষ পাত্তা দিচ্ছিল না; ওরা আসলে কানাকাকে করছিল অনুসরণ। কিছু একটা ব্যাপার নিশ্চয় আছে। যেই পাহাড়ের গা ঘেঁষে তলার ফিতে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে কানাকা, হেলিকপ্টারটা পাহাড়টার অনেক উপর দিয়ে, সঙ্গে সঙ্গে শুরু হচ্ছে উপর থেকে বোল্ডার প্রপাত। সেই বোল্ডারের কারণেই আমাদের পৌঁছুতে এত দেরি।'

আসগারের হাত লাগাতেই যা দেরি। রেকর্ড সময়ে গিয়ারবক্স ফিক্সড।

ওরা মাসুরিতে যখন পৌঁছল তখন কানাকাও আউট। অবিশ্বাস্যভাবে ওরা ফিফ্‌থ্ পজিশনে। প্রথম: দক্ষিণ কোরিয়া। দ্বিতীয়: আইল অব ম্যান-এর 'অ্যারেবিয়ান স্ট্যালিয়ন'। তৃতীয়: জার্মানির হাইজেনমুটেল। চতুর্থ: ভারতীয় আর্মি অ্যাডভেঞ্চার ফাউন্ডেশন।

মাসুরিতে ২য় ল্যাপ শেষ ঐতিহ্যময় স্যাভয় হোটেলে। যথারীতি রাজকীয় অভ্যর্থনা। কিন্তু ব্যাঙ্কোয়েটের নাচ ও ব্যান্ড সত্ত্বেও সকলের মধ্যে একটা ভয় ভয় ভাব।

সে রাত্রে কুয়াশা নয়, কার পার্কে সকলের শত্রু শীত। ঝপ করে তাপাঙ্ক নেমে গেছে শূন্যের নিম্নে। সকলেই রেডিয়েটরে দিয়েছে অ্যান্টিফ্রিজ— যাতে রেডিয়েটরের জল বরফ হয়ে না যায়। তাহলে সব পাইপ ফেটে যাবে। সকলেই মাথার উপরে গরম আশ্রয় খুঁজছেন, স্লিপিং ব্যাগের উপর নিচেও কম্বল। মনে হচ্ছে জাগ্রত শুধু একটি জুটি— ইয়াংচুক ও আসগর।

ইয়াংচুক টহলে বেরয়। কার পার্ক নিস্পন্দ। কিন্তু উত্তর দিকে ঠাণ্ডা হাওয়ার সঙ্গে ভেসে আসছে কিসের বিজাতীয় গন্ধ ?

সিগারের ? স্ম্যাকের ? ক্র্যাকের ?

স্যাভয় থেকে দু-মাইল চড়াইয়ে— সুবিখ্যাত হল অফ ফ্লাওয়ার্স।

আগে জনৈক বিলাসী ইংরেজের ছিল। মাঝে এক ধনী বাঙালী, মিঃ জে কে সেন, বার অ্যাট-লয়ের। এখন পোড়ো।

ইয়াংচুক আসগরকে ঠেলতে-ঠুকতে নিয়ে চলে ঐ হল অফ ফ্লাওয়ার্সে।

আপাতদৃষ্টিতে যদিও পরিত্যক্ত, ইয়াংচুকই দেখিয়ে দেয়, কোনাব একটা কাঁচ ও ব্লাইন্ড ঢাকা ঘরের ভেতর থেকে বেরুচ্ছে এক চুল আলো। এবং ইয়াংচুকেরই গাইডেন্সে আসগব এমন এক জায়গায় পৌঁছাল, যা থেকে ভেতরের কথাই শুধু নয়, ভেতরটা দেখাও যায়।

একটা নেড়া, মাকড়শার জাল আর ঝুলভরা ঘর। তারই একপাশে একটা ওয়ার্লেস ট্রান্সমিটারে একজন কানে হেড ফোন লাগিয়ে বসে আছে। ঘরের মাঝখানে একটা টেবিলে মোটামত একজন লোক। উল্টোদিকে একজন গাড়োয়ালি সর্দার।

'ঐ তিনটি গাড়ি থেকে মাল সংগ্রহ হয়ে গেছে,' হিন্দিতেই রিপোর্ট দিচ্ছিল সর্দার। 'রিপেয়ারের সুযোগে ডামি ফুয়েলপাম্প সরিয়ে দিয়েছি। মাল এতক্ষণে দিল্লি রওনা হয়ে গেছে।'

রেডিও-অপারেটার একটি মেসেজ দিল টেবিলের লোকটাকে।

সেটা পড়তে-পড়তে দাঁত খিঁচুল মালয়েশিয় বস।

তারপর ভাঙা-ভাঙা হিন্দিতে বলল : 'এই রেসে স্ম্যাক স্মাগলিংটা বড় কথা নয়। লাস ভেগাসে ইতালির মাফিয়ার সঙ্গে আমেরিকার ১নং স্পেকুলেটর ডনাল্ড ট্রাম্প-এর বাজি হয়ে গেছে। মাফিয়ার এন্ট্রি হচ্ছে আইল অফ ম্যানের 'অ্যারাবিয়ান স্ট্যালিয়ন।' এতে আছে সিসিলির বসদের টাকা, পানামা-র টাকা, কলম্বিয়ার টাকা, থাইল্যান্ডের গোল্ডেন ট্র্যায়াঙ্গলের টাকা ! অ্যারাবিয়ান স্টালিয়নকে জেতানোর সব বন্দোবস্ত পাকা। ডন ট্রাম্প এক অবিশ্বাস্য অড দিয়েছিল।. সবচেয়ে আউটসাইডার-এর উপর ও বাজি ধরেছিল ওয়ান-টু-হান্ড্রেড। আমরা তাই কলকাতার একটা লক্কড় টীম, নং ৩৩-কে একেবারে হেরো ভেবে বাজি ধরি। সেই ৩৩ দেখছি ৫ম প্লেসে এসে গেছে। 'কী করা', এই বলে সে ঘ্যাচ করে নিজের বাঁ হাতে একটা ইঞ্জেকশন বসিয়ে দিল : 'ঐ মাছলি খেকোদের বন্দোবস্ত আগেই করে রেখেছি। ব্যাঙ্কোয়েটে আজ প্রণ-কক্‌টেল ছিল। বাঙালি দুটোর ককটেলে ক্রিমের মধ্যে গন্ধহীন কড়া পার্গেটিভ মিশিয়ে দিয়েছে স্যাভয়ে আমাদের লোক। কাল ওরা লোটাসে নয়, টয়লেট বোলে চেপে বসে থাকবে সারাদিন।

শুনে এত রাগ হল আসগরের, ও একটা রাগ ও বিরক্তিসূচক 'ধুস' শব্দ না করে পারল

না।

গাড়োয়াল সর্দার ততক্ষণে মৌজ করছে। মালয়েশিয় বসের দশাও তাই। কিন্তু ওদের প্রোটেকশন গ্রুপ প্রোফেশন্যাল। সঙ্গে-সঙ্গে দু-দিক দিয়ে বেরিয়ে আসে এল এম জি হাতে। ইয়াংচুক নিস্পন্দ ও নিশ্চুপ হয়ে ঘাপটি মেরে থাকে। আসগর পা টিপে-টিপে ঝোপ থেকে ঝোপে মিলিয়ে যায়। এরা শক্তিশালী টর্চ মারে এদিক-ওদিক। নেহাৎই কাকতালবশত একবার আলো নড়ে বিলীয়মান আসগরের উপর। কিন্তু রক্ষী ট্রিগার টেপার আগেই ইয়াংচুক কুমিরের কামড় বসিয়ে দেয় গার্ডের হাতে। এক ঝটকায় তাকে মাটিতে ফেলে দেয় ইয়াংচুক। রক্ষী গোঙাতে থাকে। ততক্ষণে ইয়াংচুক দোরজি শব্দহীন উধাও।

জে এন ইউতে র‍্যালি শেষে উপস্থিত ছিল মার্কিন স্পেকুলেটর ডনাল্ড ট্রাম্প— যে দিল্লি এসেছে তার নিজস্ব ৭২৭ জেটে। সঙ্গে প্রচুর মডেল, নাইট ক্লাব সিঙ্গার, স্ট্রিপ টীজ স্টার। একগাদা বডি গার্ড। এসেছে পৃথিবীর মাফিয়ার টপ ব্রাস— যদিও র‍্যালি কর্তৃপক্ষের ধারণা তারা সকলে বিবিধ ইন্ডাস্ট্রির প্রতিনিধি। এসেছেন ভারতের প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী, কমান্ডার-ইন-চীফ। এবং ৭০ হাজার সাধারণ দর্শক যার মধ্যে ১০,০০০ দিল্লির বাঙালি।

কন্ট্রোল খবর : শেষ রেডিও পয়েন্ট দিল্লি থেকে ৫০ কি·মি· দূরত্বের একটু আগে পর্যন্ত ৩৩নং এন্ট্রিই ছিল প্রথম। কিন্তু তার রেডিয়েটর ড্যামেজ হয়েছে। সে বিন্দুতে ঝালাই অসম্ভব। তাদের সাপোর্ট ক্রু কখন পৌঁছবে কে জানে। সুতরাং 'অ্যারাবিয়ান স্ট্যালিয়ন' সিওর চ্যাম্পিয়ন।

ভুড়ুম-ভুড়ুম-ভটাস-ভটাস শব্দ নিকটবর্তী হয়। সারা স্টেডিয়াম উত্তেজনায় শিহরিত। তবে ডনাল্ড ট্রাম্প অদম্য। সে তার পার্শ্বে-উপবিষ্ট মাফিয়া-মক্ষিরাণী শুশু ফিক্‌ল্-কে বলে : ডাব্‌ল্।

শুশু : ডাবল ডাবল ! কোয়াড্রপল !

৩৩নং লোটাস ভুড়ুম-ভুড়ুম শব্দে, সাদা-কালো বরফি পতাকার অভিনন্দনে, ফিনিশ লাইন পার হয়ে প্রেসিডেন্টের সামনে র‍্যাম্পে উঠেই সেখানে না থেমে, এঞএঞএঞএঞএঞএঞ শব্দে এগজিট দিয়ে বেরিয়ে যায়।

বিজয়ীকে ইন্টারভিউ করা হল না, ছবি তোলা হল না। টিভি ক্রু গাড়ি নিয়ে এদিকে ছুটল, মার্শালরা ওদিক।

তাতে ডন ট্রাম্পের কী ?

সে তো বাজি জিতেছে।

অপর প্রতিযোগীদের নানান অবজেকশন তার উকিলেরা ৩৩-এর হয়ে লড়ছে।

৩৩-এর ক্রুকে পরদিন লোকেট করা গেল হোটেল মেরিডিয়েনে।

সরোদ এবং জয় বলল, তারা এত ওভারটেন্স ছিল, কারো সঙ্গে কথা না বলে সোজা মেরিডিয়েনে চলে গেছে, ঐ হোটেলের স্পেক্ট্যাকুলার র‍্যাম্প দিয়ে গাড়ি সোজা তুলেছে চারতলায়, তারপর পর-পর চারটে হুইস্কি মেরে সটান ঘুম।

আজকাল-এ ওদের অনেক—অনেক ছবি ছাপা হয়েছিল। বাংলার বিরাট জয় দারুণভাবে ফ্ল্যাশ করেছিল আজকাল। শুধু একটা তথ্য এমনকি ইন্দ্রনীল রুদ্রকেও বলা হয়নি। মাসুরি থেকে র‍্যালি রুটে ঘুরে-ঘুরে না-নেমে, অসুস্থ জয় ও সরোদ সোজা আশ্রয়

নিয়েছিল মেরিডিয়েনে। পা থেকে মাথা ঢাকা পরিচ্ছদে গাড়ি চালিয়েছে আসলে অরিদমন। ন্যাভিগেটর ছিল আসগর। সেজন্য গিয়ারবক্সই বল, সাসপেনশনই বল, আর রেডিয়েটরই বল— যা কিছু গোলমাল হয়েছে তা সঙ্গে সঙ্গে মেরামত করতে পেরেছে তারা।

এসব ওরা কাউকে বলেনি।

কিন্তু হিমালয়ান র‍্যালি কাপ নিয়ে একক ছবি তারা তুলেছিল শুধু একজনের।

সিংহের মত বসে আছে ইয়াংচুক। বুকে রিবনে ঝুলছে র‍্যালির মডেল। হ্যাঁ, চ্যাম্পিয়ন একেই বলে।

ডার্বির টিকিট

সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

নীরদ চৌধুরি মার্চেন্ট অফিসের কেরানি। বি-এ পাশ। মাছি-মারা দলের নয়। সখ আছে, এবং সে সখ মিটাইতে অপব্যয়ও করে। সখ জাগিলে ব্যয়ের কথা মনে থাকে না, তার পর মাসের শেষাশেষি আয়ের অঙ্ক কুলাইয়া ওঠে না দেখিয়া একেবারে শিব-তাণ্ডবে নৃত্য বাধাইয়া দেয়।

স্ত্রী প্রজ্ঞা দেবী হাসিয়া জবাব দেন— রাগ করো কেন? রাগ করলে যে-পয়সা অপব্যয় করেচ, তা কি আর ফিরে আসবে!

নীরদ গর্জন তুলিয়া বলে— ঐ হতভাগা বটা! তার পাল্লায় পড়ে সেদিন অফিস-ফেরত গিয়েছিলুম রেসে। বললে, ধ্যালো, খ্যালো…'লেডি পী' ঘোড়া— নির্ঘাৎ শ'খানেক পকেটে আসবে!…রাস্কেল!

প্রজ্ঞা দেবী বলিলেন— নিজের বুদ্ধির দোষে পয়সা খোয়াবে আর রাগ করবে সারা দুনিয়ার ওপর! মন্দ নয়! এবার থেকে পণ করো, কারো কথায় রেস খেলার নেশায় মজবে না!

নীরদ হাঁকিল— আমি কি ইচ্ছে করে যাই! পাঁচ শয়তান মিলে—

এমনি কলরব নিত্য লাগিয়া আছে। প্রজ্ঞা দেবী কোনোমতে সংসার-তরী চালাইয়া যান। দুঃখ কোনওদিন ঘুচিল না। অভাব আর অভিযোগ লাগিয়াই আছে। এটা কিনিলে ওটা কিনিবার সামর্থ্য থাকে না।

নীরদ ছোটে জ্যোতিষীর কাছে— হাত পাতিয়া বলে— আর পারি না, সত্যি। দেখুন তো, কোনো আশা আছে কি না? এই নেই-নেই রবে সংসার যেন সাহারামরুভূমি হয়ে আছে! স্ত্রী-পুত্রের সঙ্গে দু-দণ্ড বসে গল্প করবো, তার অবসর মেলে না।

জ্যোতিষী হাতখানা ঘুরাইয়া ফিরাইয়া বহুক্ষণ পর্যবেক্ষণ করিয়া বলে— এই যে দাগটা চলে গেছে·· হতেই হবে। তবে বাগড়া দিচ্ছে এই তিনটে ছোট-ছোট বাঁকা রেখায়! তা লটারির টিকিট কিনুন…লাগতেই হবে। এই যে এক, দুই, তিন…ওদিক থেকেও এই এক, দুই, তিন…না হয়ে যায় না। কিনুন টিকিট। আমি বলচি।

জ্যোতিষীর কথা—।

নীরদ ভাবিল, তারও কেমন মনে হয়, এমন দশা চিরদিন থাকিবে না। মনের মধ্যে বসিয়া আছে যেন শাহানশা বাদশাহ…কানের কাছে মৃদু গুঞ্জনে বলিতেছে— এভাবে ছেঁড়া জুতা পায়ে দিয়া পাওনাদারদের নজর এড়াইয়া থাকিবার জন্য তোমার জন্ম হয় নাই! তুমি এক দিন…

নীরদ লটারির টিকিট কিনিতে লাগিল। দেশি-বিলাতি যেসব পত্রিকা ক্রশ-ওয়ার্ড-পাজলের প্রচণ্ড জাল পাতিয়া স্বর্ণমৃগ ধরিবার লোভ দেখায়, সে পত্রিকাগুলা কিনিয়া আনে। এবং পাঁচ সাতখানা ডিক্সনারি হাতড়াইয়া ফর্দ-ঘরে ইংরেজি হরফ বসাইয়া অপব্যয়ের বন্যায় মেজাজকে দিলদরিয়া করিয়া তোলে। কিন্তু হায়রে, পদাবলীর গানের সেই শেষ পংক্তিই আকাশে বাতাসে ধ্বনিয়া ওঠে,— মাধব হে পরিণাম নিরাশা !

সেদিন অফিসে আসিতে হরেন্দ্র তাকে দেখাইল, স্টেটসম্যান কাগজ। টেলিগ্রাম-কলমে বড়-বড় অক্ষরে লেখা—

Derby Sweep Drawings.

সে তালিকায় অসংখ্য অঙ্ক-রেখা।

হরেন্দ্র কহিল— তোমার নম্বর কত, নীরদ-দা ?

টিকিটের নম্বর নীরদের মুখস্থ ছিল। নীরদ বলিল— N 20304.

—মেরে দিছ নীরদদা! আমারও কেমন মনে হচ্ছিল। তোমার নম্বরটা একটু peculiar কিনা !

ঝুঁকিয়া নীরদ দেখিল, তাই তো। এই যে তার টিকিটের নম্বর ছাপা— N 20304. ঘোড়ার নাম ব্ল্যাক প্রিন্স।

পাশে ছিল ডি-ক্রুজ সাহেব। ডি-ক্রুজ বলিল— এ ঘোড়া ভেরি হট্। নেরোডের গুড চান্স। লাকি ডগ। হার্টি কনগ্রাচুলেশন্স !

হেমন্ত বলিল— টিকিটটা বাড়ি থেকে আনাও। মিলিয়ে নির্ঝঞ্ঝাট হওয়া ভালো।

কে যায় ?

বেয়ারা আকলুকে বাড়িতে পাঠান হইল ট্রামের ভাড়া দিয়া। মিড-ডে চিপ ফেয়ার।

আকলু অচিরে টিকিট লইয়া ফিরিয়া আসিল এবং চকিতে যে আনন্দ-ধ্বনি জাগিল…

ব্যাটল অফ হেস্টিংসে জিতিয়া নর্মানরা এমন জয়ধ্বনি তোলে নাই। মোহনবাগান সেবারে যখন শিল্ড পায়, তখনও মাঠে এমন জয়-জয়কার জাগে নাই !

ডি-ক্রুজ বলিল— আমি লিখিয়া দিতেছি নেরোড, নোট ডাউন করো। যার মানে—থ্রী ল্যাক্স !

কথাটা পৌঁছিল গিয়া বড় সাহেব ম্যাকফার্শনের কানে ! ম্যাকফার্শন নীরদকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। বলিলেন— Hearty congratulations, Nerode...তোমায় ছুটি দিলাম। বাড়ি যাও…Tell your wife, of your luck...

মাসের সেদিন দশ তারিখ। মাহিনার টাকাটা পুরাপুরি খরচ হয় নাই। অফিস হইতে বাহির হইয়া নীরদ ট্যাক্সি ধরিল এবং ট্যাক্সিতে চড়িয়া…

প্রজ্ঞা দেবী খাইতে বসিয়াছেন। নীরদকে ফিরিতে দেখিয়া ভাতের থালা ফেলিয়া রাজ্যের দুশ্চিন্তা বহিয়া ছুটিয়া আসিলেন, কহিলেন— খপর কি ? ফিরলে যে ?

নীরদ কহিল— সাহেব ছুটি দেছে। সুখপর আছে। ডার্বি জিতেছি।

—তার মানে ?

—আমার টিকিটে ভালো ঘোড়া উঠেছে ! রেসে ফার্স্ট হবার সম্ভাবনা। ফার্স্ট না হলেও সেকেন্ড প্লেস মারে কে ? কম-সে-কম তিন লক্ষ টাকা আসবেই— সকলে বলচে।

প্রজ্ঞা দেবী কহিলেন— রেসে ফার্স্ট হলে টাকা আসবে, এইতেই তুমি নেচে উঠেছ। —হুঁ, একেই বলে, গাছে কাঁঠাল, গোঁফে তেল !

প্রজ্ঞা দেবী নিশ্বাস ফেলিলেন, তাঁর মুখখানি ম্লান হইয়া রহিল।

দেখিয়া নীরদ কহিল— তুমি এর মর্ম বুঝবে না। এর মর্ম ওরা বোঝে, যারা এ কারবারে পোক্ত!

নীরদ চলিয়া গেল দোতলায়, প্রজ্ঞা দেবী আবার খাইতে বসিলেন।

ঘরে পায়চারি করিতে করিতে নীরদ আয়নার সামনে দাঁড়াইল। মুখখানা…ইঃ, কদর্য হইয়া আছে! দুদিন দাড়ি কামানো হয় নাই! ক্ষুরখানায় শান নাই। শান দিতে গেলে এখনি ব্যয় হইবে নগদ বারো আনা। সে বারো আনা পয়সায়…

খাটখানায় কবে সেই পালিশ পড়িয়াছে, বিবাহে যৌতুক-পাওয়া খাট! বালিশের ওয়াড়—ছেঁড়া কাপড় দিয়া সেলাই হইয়াছে। তোষকখানার যা শ্রী—!

কত দিন ভাবিয়াছে, কোনওমতে একবার আল-টপকা কিছু পয়সা পাওয়া গেলে—

সাধে সে রেসে যায়? এত লোক যাইতেছে! পয়সা না পাইলে সারা জীবন তারা লোকসান দিতেছে? কোনও দিন দুটা বাড়তি পয়সা তার পকেটে আসিল না!

জ্যোতিষীর কথা মনে পড়িল। সে প্রায় দশ-এগারো মাস পূর্বেকার কথা। জ্যোতিষী বলিয়াছিল, লটারির টিকিট কিনিয়ো— কে মারে! ভাগ্যে সে কথাটুকু মানিয়া আসিতেছে।

তাই আজ সুদিনের দেখা মিলিয়াছে!

জানালার ধারে দাঁড়াইয়া নীরদ হিসাব কষিতে প্রবৃত্ত হইল। তিন লক্ষ টাকা! অফিসের সকলকে ভোজ দিতে হইবে— ছাড়িবে না! সাহেবদের জন্য হোটেল! চাকরি করিবার প্রয়োজন থাকিবে না! আর্থিক অবস্থা বড় সাহেবের মতন হইবে! সাহেব তখন মনিব থাকিবে না— বন্ধু হইবে। স্টিফেন সাহেব লোক ভালো— রেসে টিপ্‌স বলিয়া দেয়। অফিসের বাহিরে ব্যবহার ঠিক বন্ধুর মত। তার মেম-সাহেবটি চমৎকার। যেমন মুখ, মুখে তেমনি হাসি, ভারি মিষ্ট! এখন সে কেরানি—আলাপ করা চলে না। তখন বন্ধুত্ব হইবে— মেম-সাহেবকেও নিমন্ত্রণ করিবে। প্রজ্ঞা একটু-আধটু ইংরেজি জানে,—একজন মেম রাখিয়া শিখাইয়া লইতে কতক্ষণ!

ছেলেমেয়েরা! তারা ছাড়িবে না। একখানা মোটরগাড়ি চাহিয়া বসিবে। দিব কিনিয়া। গাড়ি দুখানা চাই। ছেলে-মেয়েরা একটা ব্যবহার করিবে— আর একটায় চড়িবে সে আর প্রজ্ঞা। একখানা টু-সিটার হইলে…

কিন্তু না। এ বয়সে মোটর চালাইবার দায় ঘাড়ে লইয়া কাজ কি! কাহাকেও চাপা দিলে আসামী হইয়া পুলিশ-কোর্টে…

না!

এ বাড়ি ছাড়িতে হইবে। বাড়ি পৈতৃক। বেচিয়া দিব। যা পাওয়া যায়! কেন ছাড়িব? তার পর লেকের দিকে অনেকখানি জায়গা কিনিয়া সেই জমির উপর মস্ত বাড়ি…লন…টেনিসকোর্ট। স্টিফেন সাহেব আর তার মেম— দুজনে টেনিস খেলিতে ভালোবাসে। নিত্য আসিবে!

একটা বাবুর্চি! ইংরেজি-খানার ব্যবস্থা রাখা চাই। তখন একটা পোজিশান হইবে। বাবুর্চি না রাখিলে পদে পদে অপ্রতিভ হওয়া!

কল্পনার পাখায় চড়িয়া মন উধাও ছুটিয়া চলিল ভবিষ্যতের পথে।

আহারাদি চুকিলে প্রজ্ঞা দেবী দোতলায় আসিলেন।

নীরদ কহিল— তোমার চিরদিনের সখ, এক ঝাঁক পাখি পুষবে। বাড়িতে থাকবে

অন্ততঃ একটি মুলতানি গরু। একখানি বাগান থাকবে কলকাতার বাইরে। যত শাক-সবজি, ফল-মূল, তরি-তরকারি, মায় মাছ-ভরা পুকুর— এবারে তোমার সে সাধ মিটবে!

বিস্ময়-ভরা দৃষ্টিতে প্রজ্ঞা দেবী স্বামীর পানে চাহিলেন।

নীরদ কহিল— নেলি বড় হয়েছে। বিয়ের কথা তুলে অস্থির করচো—সাধে আমি গা দিই না! আমার বরাবর বিশ্বাস, ওর অমন বুদ্ধিশুদ্ধি— তোমার পেটে হলেও গরীব কেরানীর স্ত্রী হবার জন্য ওর জন্ম হয়নি! কত নেবে ব্যারিস্টার কি ম্যাজিস্ট্রেট পাত্র? মানে, বেশ বড় লোকের ঘর? দশ হাজার নিক! দেবো!

প্রজ্ঞা দেবী এবারে কথা কহিলেন, বলিলেন— আর তোমার বন্ধু বিপিনবাবুর সঙ্গে কথা দিয়ে আছ কবে থেকে তাঁর ছেলের সঙ্গে···

নীরদ কহিল— ক্ষেপেচো! পয়সা যখন হল, তখন আর ওখানে কেন? বিপিনের ছেলে তো মেকানিকাল এঞ্জিনিয়ার হয়ে পাচ্ছে মোটে পঁচাত্তর টাকা মাইনে! কত উন্নতি হবে? লেগে থাকলে বুড়ো বয়সে বড় জোর দেড়শো, কি একশো পঁচাত্তর! তাতে কি কুলোয়? দেখচো তো অ্যাদ্দিন তোমার নিজের সংসার! আমি তবু দুশো পঁচিশ পাই।

প্রজ্ঞা দেবী সত্যই অবাক হইয়া গেলেন! স্বামীর এ হইল কি? কোথায় টাকা, ঠিক নাই···একটা উড়ো খপর পাইয়া মেজাজ এমন বদলাইয়া গেল! লক্ষণ ভালো নয়!

নীরদ কহিল— তুমি যে গম্ভীর হয়ে রইলে! কি করা যাবে, একটা প্ল্যান ঠাওরাই, এসো।

প্রজ্ঞা দেবীর মনে করুণা হইল। আকাশ-সুকুমের স্বপ্ন দেখিয়া স্বামী যদি একটু তৃপ্তি বোধ করেন, কাজ কি তাঁর সে স্বপ্ন ভাঙিয়া! তাই অবিচল কণ্ঠে কহিলেন— আমি আর প্ল্যান কি বাতলাবো, বলো? তুমি যা করবে, তাই হবে, যেমন রাখবে, তেমনিতেই আরামে থাকব! কিন্তু এখন থেকে এ-সব ভাবচো কেন? যদি এর পরে কোনো কারণে টাকা না পাও, তাহলে মনস্তাপের সীমা থাকবে না!

অবজ্ঞার ভঙ্গিতে নীরদ বলিল— এর মধ্যে কারচুপি নেই গো। এ হলো বিলিতি কোম্পানির টিকিট, তালতলা বা কড়েয়া স্ট্রিটের লটারি নয়! তার উপর ঐ ঘোড়া! আমি একটু বেরুচ্ছি। একবার মোটরের দোকানগুলো ঘুরে দেখে আসি। একখানা গাড়ি বেছে না রাখলে শেষে যার-তার পাল্লায় পড়ে যা-তা গাড়ি হয়তো কিনে বসব! তাছাড়া এ সম্বন্ধে যারা জানে, তাদের মতামত নিয়ে রাখলে ভালো হয়। কেউ ঝাঁশা দিয়ে ঠকাতে পারবে না।

প্রজ্ঞা দেবী দাঁড়াইয়া রহিলেন। নিস্পন্দ!

ভাবিলেন, টাকা যদি পাওয়া যায়, ভালো! কিন্তু পাই কি না পাই, কে জানে! পাওয়ার আগে এমন চঞ্চলতা!

টাকার জন্য নীরদের মনে এক দণ্ড স্বস্তি নাই, তা কি তিনি জানেন না! টাকায় নিজের বিলাসিতা, সে-দিকেও নীরদের মন নাই। তাঁদের কি দিবে, কতখানি আরামে রাখিবে— তাহা লইয়া মত্ত!

ভগবান যদি সত্যই মুখ তুলিয়া চান, ছেলে-মেয়েগুলার আরাম। বড় ছেলে শ্রীশ বি-এ পড়া ছাড়িয়া কর্পোরেশনের চাকুরিতে ঢুকিয়াছে— না হয় বি-এ পড়ুক, পাশ করুক! মেজো ছেলে মেডিকেল কলেজে পড়িয়া ডাক্তার হইবে, সাধ; এখন আই-এস-সি পড়িতেছে। পাশ করিলে মেডিকেল কলেজ। কিন্তু সেখানে পড়ার যা খরচ···

প্রাণটা যেন ফাটিয়া যায়! সাধ আছে, কিন্তু সে সাধ মিটাইবার সামর্থ্য নাই!

অনেক রাত্রে নীরদ গৃহে ফিরিল। হাতে একগাদা মোট! প্রজ্ঞা দেবী ঘরের মেঝেয় মাদুর পাতিয়া সেই মাদুরে বসিয়া সেমিজ সেলাই করিতেছিলেন।

নীরদ কহিল— তোমার জন্যে একজোড়া স্কার্ট-শাড়ি কিনে আনলুম— নেলির জন্যেও এক-জোড়া...বুঝলে?

প্রজ্ঞা দেবী দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া রহিলেন।

নীরদ কহিল— বিশুর দোকান থেকে। নগদ দাম দিতে হয়নি। টাকাটা পেলে দেবো!

প্রজ্ঞা দেবী কহিলেন— ও-শাড়ি পরবো না। কোথায় টাকা— তুমি এখন থেকে ধার সুরু করলে! কালই ফেরত দিয়ে এসো। ও-শাড়ির এখন কোনো দরকার নেই! বুঝলে?

নীরদ যেন হতভম্ব! কাপড়ের মোট ফেলিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তার পর কহিল— ওদের বলেচো?

—ছেলেমেয়েদের?

—হ্যাঁ।

—না আমার মনে ছিল না।

মনে ছিল না! নীরদের বিস্ময়ের সীমা রহিল না। সে কহিল— অনেক জায়গায় গিয়েছিলুম। একজন ভালো পরামর্শ দিলে।

প্রজ্ঞা দেবী কহিলেন,—রাত বারোটা বাজে। মুখ-হাত ধুয়ে খেতে বসো। আমারও খুব খিদে পেয়েছে, সত্যি।

—আচ্ছা। খেতে খেতেই বলব।

খাইতে বসিয়া নীরদ বলিল— আমাদের সঙ্গে কাজ করে অচিন্ত্য। তার ভগ্নীপতি এখানে একজন পাকা 'রেটিয়ে'। সে বললে, ও-টিকিট যদি বেচে দিই এখন, তার হাতে মাড়োয়ারি খদ্দের আছে— পাঁচ-সাত হাজার টাকা চক্ষু মুদে এখনি পাওয়া যায়।

প্রজ্ঞা দেবী কহিলেন— সত্যি?

—হ্যাঁ। অচিন্ত্য আমায় তার কাছে নিয়ে গিয়েছিল। বাদুড়বাগানে সে ভদ্রলোকের বাড়ি। তিনি বললেন, দেখুন —যদি মত হয়, দু-এক দিনের মধ্যে আমায় জানাবেন। একেবারে করকরে টাকা নগদ গুণে নেবেন'খন!

কথাটুকু প্রজ্ঞা দেবী শুনিলেন, কোনো জবাব দিলেন না।

নীরদ কহিল,— কি বলো! বেচে দেবো? সাত হাজার বলচে। যদি দরাদরি করি, হয়তো দশ হাজারও দেয়।

প্রজ্ঞা দেবী কহিলেন— মন্দ কি! সদ্য সদ্য দশ হাজার যদি পাও, দাও ও টিকিট বেচে। শেষে বেশি আশা করে যদি কিছুই না পাও? এমন তো'হয়।

নীরদ কহিল— কিন্তু দশ হাজারে কি-দুঃখ ঘুচবে? না হবে গাড়ি, না হবে লেকের দিকে লন্-ওয়ালা বাড়ি। ব্যাঙ্কেও নগদ কিছু থাকা চাই— দায়-অদায় আছে। দুদিনের এদিক-ওদিকে একেবারে দু লক্ষ নব্বই হাজার টাকা লোকশান করব!...তিন লক্ষর জায়গায় মোটে দশ হাজার!

প্রজ্ঞা দেবী কহিলেন— যদি কিছু না পাও, তাই বলছিলুম।

নীরদ কহিল— আমার কি মত, জানো? পাই তো তিন লক্ষই পেতে চাই! যে, হ্যাঁ,

বুঝবে, দুঃখ ঘুচে সুখ হল ! না হলে দশ হাজার…তাতে এখনকার মত যে মূষিক, সেই মূষিকই থেকে যাব !

প্রজ্ঞা দেবী কহিলেন— তাহলে থাক টিকিট— বেচো না।

—হুঁ ! নীরদ চুপ করিয়া ভাবিতে লাগিল। খানিক ভাবিয়া দুধের বাটিতে ভাত ফেলিয়া কহিল— কিন্তু তুমি যা বললে, সে কথাও ভাবচি— কোনো কারণে যদি ও-ঘোড়া রেসে না দৌড়োয় ! জানো, ইংরেজিতে কথা আছে, a bird in hand is worth two in the bush.

সকালে ছেলেমেয়েদের আসরে নূতন করিয়া আলোচনা সুরু হইল। প্রজ্ঞা দেবী কথাটা পাড়িলেন, ডাকিলেন— হ্যাঁরে শ্রীশ, শুনচিস ?

শ্রীশ কহিল— কি মা ?

প্রজ্ঞা দেবী কহিলেন— আচ্ছা, ধর, আমরা যদি কোনোখান থেকে অনেক টাকা পাই—তাহলে তোরা কে কি করিস ?

শ্রীশ বলিল— কত টাকা, আগে বলো।

প্রজ্ঞা দেবী কহিলেন— ধর দু'তিন লক্ষ।

মেজো ছেলে অন্নদা ভ্রূ কুঞ্চিত করিল, কহিল— ওরে বাবা ! দুতিন লক্ষ !

প্রজ্ঞা দেবী কহিলেন— হ্যাঁ।

শ্রীশ কহিল— আমি তাহলে পঞ্চাশ হাজার টাকা নিয়ে একটা ফিল্ম কোম্পানি খুলি। খুলে তাতে ডাইরেক্টর হয়ে বসি।

অন্নদা কহিল— ডাইরেকশানের কি জানো তুমি ?

শ্রীশ কহিল— ওর মধ্যে জানাজানির কি আছে ? মাইনে-করা লোক থাকবে, তারাই সব করবে করাবে— শুধু ডাইরেক্টর বলে নাম হবে আমার। আচ্ছা, তুই কি করিস ?

অন্নদা কহিল— আমি বিলেত চলে যাব ! সেখানে থেকে কোনো একটা জুট কোম্পানির এজেন্সি নিয়ে ফিরি— মাসে মাসে মোটা মাইনে—আর গঙ্গার তীরে ঐ যে সব ফাস্ট-ক্লাশ কোয়ার্টার্স, তাতে বাস করি। ব্যস ! আর কিছু চাই না।

প্রজ্ঞা দেবী চাহিলেন মেয়ের মুখের পানে, কহিলেন— তুই কিছু বললিনে, নেলি ?

শ্রীশ কহিল— ও আবার বলবে কি ? কন্যা পরকীয়া। এ-টাকায় ওর অধিকার ? ওর একটা ভালো দেখে বিয়ে দিয়ে দিয়ো— চার-পাঁচ হাজার টাকা যৌতুক— ব্যস।

প্রজ্ঞা দেবী হাসিলেন, হাসিয়া কহিলেন— বেশ তোদের বিদ্যা-বুদ্ধি হয়েছে তো ! তোদের বেলায় পঞ্চাশ-ষাট হাজার— আর ওর বেলায় দৌড় পাঁচ হাজার ! কেন ?

শ্রীশ বলিল— বা, আমাদের যে তোমাদের টাকা ভিন্ন গতি নেই।

অন্নদা বলিল— ও তো পাবে ওর স্বামীর টাকায় অধিকার। সেদিক থেকে আমাদের তো পাই-পয়সা আসবে না !

প্রজ্ঞা দেবী কহিলেন,— তুই নিজে তো রোজগার করিস, শ্রীশ…

শ্রীশ বলিল,— নেহাৎ সে দায়ে পড়ে। তোমরা যদি দু'তিন লক্ষ টাকার মালিক হয়, তাহলে গাধার মত খেটে ও-ছোটলোকের চাকরি করবো কেন ?

মা বলিলেন— বটে !

ছেলে-মেয়েরা মাকে ধরিয়া বসিল, হঠাৎ দুতিন লাখ টাকার কথা মা কেন তুলিলেন ? কোথায় কোন অজানা মুল্লুকে মায়ের কোনো খুড়া-জ্যাঠা ছিল না কি— আফ্রিকায় কিম্বা ফিলিপাইনে…অগাধ টাকা রাখিয়া মারা গিয়াছেন ? এবং সে টাকা শেষ-উইল-পত্রযোগে

তাদের জননী শ্রীমতী প্রজ্ঞা দেবীকে...

মা বলিলেন— এ বয়সে তোমাদের মনে এ সব কথা বেশ জাগে তো !

শ্রীশ কহিল— বা, টাকায় দুনিয়া চলছে, এ জ্ঞান আমাদের হবে না কেন ?

অন্নদা বলিল— বিলিতি গল্পে পড়ি, গরীব ভিখিরি, দিন চলে না— হঠাৎ কোত্থেকে এটর্নির চিঠি এল, বাপু হে, তোমার কি রকম এক কাকা মারা গেছে কামশকাটকায় ত্রিশ লক্ষ পাউন্ড সম্পত্তি রেখে, আর সে সম্পত্তি তিনি দিয়ে গেছেন তোমাকে !

শ্রীশ বলিল— সত্যি, বলো না মা, টাকা কোথা থেকে পাচ্ছ ?

মা তখন কথাটা খুলিয়া বলিলেন। ছেলেরা আনন্দে নাচিয়া উঠিল।

অন্নদা কহিল— তাহলে আমি বিলেত যাবোই।

শ্রীশ কহিল— তা যদি যাস তো তোর বিলিতী লেখাপড়ায় যত টাকা খরচ হবে, সে টাকাটা আমারো চাই আমার অ্যাকাউন্টে।

অন্নদা কহিল— আর তুমি যে পঞ্চাশ হাজার টাকা নিচ্ছ ফিল্ম কোম্পানি খুলতে !

শ্রীশ কহিল— সে তো ব্যবসা করতে নিচ্ছি ! আমার লেখাপড়ায় যে টাকা খরচ হয়েচে, তোমার লেখাপড়াতেও সেই টাকা খরচ হবে। তার বেশি তুমি পাবে কেন ?

অন্নদা ফোঁশ করিয়া উঠিল, বলিল, বা রে, নিজের পাওনাগণ্ডা নিজে বেশ বুঝে নেবে !

শ্রীশ ছাড়িয়া কথা কহিবার ছেলে নয়। সে বলিল— কেন নেবো না ? পৈতৃক সম্পত্তিতে তোর যা অধিকার, আমারও তাই ! তুমিও তাহলে পরে এস না যেন এই ফিল্ম-ব্যবসায়ে ভাগ চাইতে !

অন্নদা কহিল— তুমিও এস না, বিলেত থেকে আমি আই-এম-এস হয়ে এলে আমার রোজগারের কড়িতে চপ-কাটলেট খেতে !

শ্রীশ রাগিয়া গেল, কহিল— তরে রে ইস্টুপিড, আমি তোর বড় ভাই— আমায় এমন insulting কথা বলিস !

অন্নদা কহিল— বড় ভাই বলে বিষয়-সম্পত্তিতে আমার যা share, তা তুমি লুঠ করতে পার না ! এদেশের আইনে পৈতৃক-সম্পত্তিতে সব ছেলের সমান অধিকার, তা জানো ?

ভ্যাংচাইয়া শ্রীশ জবাব দিল— জানি, জানি। আমাকে আর আইন শেখাতে আসিস নে !

দুই চোখ কপালে তুলিয়া মা বলিলেন—ওরে ও শ্রীশ, ও অন্ন— এমন বিদ্যে তোদের হয়েছে ! কোথায় টাকা— ঠিক নেই ! টাকার নামে দু ভাইয়ে কুরুক্ষেত্র পর্ব বাধিয়ে তুললি ! টাকা যা পাবেন, ওঁকে বলব, ঘরে এনে কাজ নেই— গঙ্গার জলে যেন বিসর্জন দিয়ে আসেন।

শ্রীশ বলিল— ইস্, টাকা খোলাম-কুচি নয়, সত্যি। বাবা পুরুষ-মানুষ— টাকার দাম কি, তা তুমি মেয়েমানুষ না বুঝতে পার, বাবা বোঝে।

প্রজ্ঞা দেবী কহিলেন— আর কিছু না বুঝি, এটুকু আজ বুঝলুম, তোমরা দু ভাইয়ে যে নিরীহ হয়ে আছ, সে শুধু পয়সা-কড়ি নেই বলে। থাকলে যে লোভ, আমাদের গলা কেটে সর্বস্ব নিয়ে সরে পড়তে পার ! ছেলে বটে ! আমার অহঙ্কার হচ্ছে নিজেকে এমন রত্নগর্ভা বুঝে !

সকালে উঠিয়া নীরদ কোথায় কি ধান্দায় বাহির হইয়াছিল, ফিরিল বেলা প্রায় দশটায়। দুই ছেলে দশটার আগে বাহির হইয়া গিয়াছে।

নীরদ আসিলে প্রজ্ঞা দেবী কহিলেন— তোমার ব্যাপার কি ! আপিস যাবে না ? না,

ডার্বির নেশায় আপিস চুকে গেছে ?

হাসিয়া নীরদ কহিল— যাবো বৈ কি। দেরি হয়ে গেল। শ্রীপতি একখানা গাড়ি দেখাতে নিয়ে গেল কি না— সেকেন্ডহ্যান্ড···তা হোক, দেখতে বেশ আছে— নতুনের মত। দাম পড়বে বারো শো। এইখানেই তোমার আড়াই হাজার বাঁচল !

প্রজ্ঞা দেবীর দেহ-মন রাগে তাতিয়া উঠিল। তিনি কহিলেন— তুমি যে সত্যি সত্যি পাগল হয়ে উঠলে ! দাঁড়াও, আগে টাকা পাও, লোকে গায়ে থুথু দেবে তোমার এ পাগলামি দেখে !

নীরদ কহিল— আমি তো শ্রীপতিকে সে কথা বলিনি যে, আমি গাড়ি নেব। বলেছি, আমার অফিসের এক সাহেব কিনতে চায় একখানা ভালো সেকেণ্ড-হ্যান্ড কার।

প্রজ্ঞা দেবী কহিলেন— দশটা বেজে গেছে, হুঁশ আছে ? দেখো, টিকিটের মায়ায় অজ্ঞান হয়ে যেন অফিসের চাকরিটুকুকে গয়ায় দিয়ে এস না।

—পাগল হয়েছ ! বলিয়া নীরদ ছুটিল স্নান করিতে।

প্রজ্ঞা দেবী গিয়া রান্নাঘরে ঢুকিলেন, মেয়েকে ডাকিলেন— এদিকে একবার আয়, নেলি। তোর পান সাজা হয়েছে ?

গৃহকোণ হইতে নেলি কহিল— খিলি কটা মুড়তে বাকি ! মুড়েই আমি আসছি।

যেন বিপ্লব বাধিয়া গেল।

গৃহে এখন আর কোনো কথা নাই। বর্তমান কি হইয়া আছে, সেদিকে নীরদের দৃষ্টি নাই— ছেলেদুটিরও নাই। ভবিষ্যতে কি হইবে, তাহারই ছবি আঁকিতে তিন জনে মত্ত মশগুল হইয়া আছে।

শ্রীশ সেদিন অফিস হইতে ফিরিল অনেক রাত্রে। মা ভাবিয়া আকুল। নীরদও ফেরে নাই।

শ্রীশ ফিরিলে মা বলিলেন— এত দেরি কিসের ? আপিস তো রাত্তিরে খোলা থাকে না।

শ্রীশ বলিল— গ্যাঞ্জেটিক ফিল্মের স্টুডিওয় গিয়েছিলুম ছবি তোলা দেখতে ! খুব সোজা কাজ, বুঝলে মা ! কাকে কি বলতে হবে, শুধু তাদের দাঁড় করিয়ে কাটা-কাটা কথা বলানো। আসল যা খাটুনি— তা দেখলুম ঐ ক্যামেরাম্যানের !

মা চাহিলেন ছেলের পানে। শ্রীশ বলিল— একটা স্যুটের অর্ডার দিয়ে এলুম মা। বড্ড সাধ। বাইশ টাকা দাম পড়বে।

মা মুখে কোনো জবাব দিলেন না। ছেলের ভাব দেখিয়া শিহরিয়া সরিয়া গেলেন।

নীরদ ফিরিল আরও গভীর রাত্রে। প্রজ্ঞা দেবী কহিলেন— টিকিট বেচতে গিয়েছিলে ?

নীরদ কহিল— আর একটু হলেই বেচেছিলুম ! ভাগ্যে কপিল বারন করলে। বললে, তিন লাখের জায়গায় মাত্র দশ হাজার ! তুমি পাগল হয়েছ !

প্রজ্ঞা দেবী কহিলেন— হিতোপদেশের সে পদ্য বুঝি ভুলে গেছ— ছাড়িয়া মুখের গ্রাস যে অবোধ-জন···

নীরদ কহিল— তুমি ভুল করছ, প্রজ্ঞা— এখানে মুখের গ্রাস ওই তিন লক্ষ টাকা। তা তো ছাড়িনি নগদ দশ হাজারের লোভে !

প্রজ্ঞা দেবী কহিলেন— খাবার আনি। তুমি মুখ-হাত ধুয়ে নাও।

প্রজ্ঞা দেবী গেলেন খাবার আনিতে। নীরদ চুপ করিয়া বিছানায় বসিয়া রহিল। সে ভাবিতে লাগিল— ভবিষ্যতের কথা।

আর কটা দিন বা! স্টিফেন-সাহেবের বাড়ি গিয়া সন্ধ্যার সময় একরাশ ফুল দিয়া আসিয়াছে। সাহেব সে উপহার আজ লইয়াছে ভৃত্যের দেওয়া সেলামি হিসাবে। কিন্তু কদিন পরে…

চাকরিতে ইস্তফা দিয়া যেদিন তাকে আর তার মেমসাহেবকে ডিনারের নিমন্ত্রণ করিবে…

কত কথাই মনে জাগিতে লাগিল! স্টোভার সাহেব সেদিন রিপোর্টের হিসাবে কাটকুট দেখিয়া চোখ রাঙাইয়াছিল। জানে না, নীরদের মূল্য আজ কতখানি। দয়া করিয়া সে অফিসে পড়িয়া আছে। এ মাসের টাকাটা কেন মিছা লোকসান করে! তার পর…

নিমন্ত্রণ করিবে অফিসের সকলকে— শুধু ঐ স্টোভার সাহেবকে বাদ দিয়া। এ অপমানের শোধ সাহেব সেদিন হাড়ে হাড়ে বুঝিবে!

প্রজ্ঞা দেবী ফিরিলেন, কহিলেন— ও মা! এখনো শুম হয়ে বসে আছ! মুখ-হাত ধোওনি! না বাবু, ভালো টিকিট কিনেছিলে বটে! বাড়িতে যে শান্তি ছিল, তা কোথায় উবে গেছে! তার চিহ্ন অবধি নেই! দুই ছেলে যেন মনোয়ারী গোরা…গটমট করে বেড়াচ্ছে! কি ঝাঁজ! মোটে গ্রাহ্য করে না! তবু টাকার মুখ দেখেনি এখনও! তুমিও তার উপর…বলি, কি এত ভাবচো?

নীরদ হাসিল, হাসিয়া বলিল— আজ যতীশ একটা জমির কথা বলছিল, মাণিকতলার পুলের ওদিকে মস্ত বাগান, ঝিল, বাড়ি— বে-মেরামতে আছে! বলে, জলের দরে পাওয়া যাবে। মোট বিশ হাজার টাকা! বুঝলে! যাবে এই রবিবারে দেখতে?

প্রজ্ঞা দেবীর বুক ভরিয়া নিশ্বাস বহিল। যেন প্রলয়ের ঝড়! চোখে নিশ্বাসের বাষ্প আসিয়া জমিল।

রুদ্ধ স্বরে প্রজ্ঞা দেবী কহিলেন— দুদিন সবুর করে থাকো গো! লোকে এ-নাচ দেখে হাসে— তা যে তুমি কেন বুঝচো না! টাকার সব আনন্দ টাকা পাবার আগে যদি ভোগ করে ফ্যালো, টাকা পেলে সেদিন তাহলে করবে কি?

প্রজ্ঞা দেবীর চোখে সত্যই জল আসিল। নীরদ চুপ করিয়া রহিল। প্রজ্ঞা দেবী বলিলেন— এর চেয়ে টাকা না-থাকায় স্বস্তি ছিল! তোমার পায়ে পড়ি! কদিনে তুমি কি হয়ে গেছ, চেহারাখানা একবার আয়নায় দ্যাখো দিকিনি! সত্যি আমার কান্না পায়!

নীরদ কহিল— তুমি বুঝচো না।

প্রজ্ঞা দেবী কহিলেন— আমি কিছু বুঝতে চাই না। এ যে পাগল হবার লক্ষণ! পাগল করবার জো। এ তো টাকা নয়, জঞ্জাল! মনে সারাক্ষণ ঝড় বইচে! এক দণ্ডকেই সুস্থির নও। কোথায় টাকা, তার ঠিক নেই, দুই ছেলে এখন থেকে কোমর বেঁধে বিষে জ্বলছে। কে বেশি টাকা নিয়ে ফ্যালে! তোমার ছোট ছেলে পাঁচ টাকা ধার করে বন্ধুদের হোটেলে খাইয়েছে। বড় ছেলে বাইশ টাকার পোশাকের অর্ডার দিয়ে এসেছে!

নীরদের দুই চোখের দৃষ্টি স্থির। চোখ দুটা যেন ঠিকরিয়া বাহির হইয়া আসিবে!

প্রজ্ঞা দেবী নিশ্বাস ফেলিলেন।

রাত্রে শুইতে আসিবার পূর্বে প্রজ্ঞা দেবী দেওয়ালে ঝুলানো লক্ষ্মী-নারায়ণের ছবিখানিকে প্রত্যহ প্রণাম করেন। আজও করিলেন।

প্রণাম সারিয়া শয্যায় আসিলে নীরদ কহিল— অতক্ষণ ধরে নমস্কার করছিলে, কি

প্রার্থনা জানালে ?

প্রজ্ঞা দেবী কহিলেন— তুমি স্বামী, পরম গুরু, মাপ করো, আমি প্রার্থনা জানালুম, এ ঘোড়া মেরে ফ্যালো ঠাকুর— এ কড়ি যেন ঘরে না আসে !

নীরদ অবিচল দৃষ্টিতে প্রজ্ঞা দেবীর পানে চাহিয়াছিল— নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল— সত্যি প্রজ্ঞা, এক দণ্ড মাথার দপদপানি ঘুচছে না ! কম অস্বস্তি ! এর চেয়ে আগে ছিলুম ভালো ! ঠাকুর করুন, তোমার প্রার্থনা যেন পূর্ণ হয় ! সত্যি !

তার পর···

দুজনে প্রথম যৌবনের মতই পরস্পরকে বাহুপাশে আশ্রয় করিয়া মনে মনে বলিল, এ অস্বস্তির অবসান করো ঠাকুর !

নীরদ ক'দিন প্রাণপণে যুদ্ধ করিল— মন হইতে টিকিটের ঘোড়াটাকে দূর করিয়া দিবার বাসনায়। যাহা আছে, তাহা লইয়া দিন এক রকম কাটিয়া যাইতেছিল। যা নাই, তার জন্য মন একটু খারাপ হয় সত্য, কিন্তু সে ক্ষণেকের জন্য ! তাহা পাইবার জন্য বাসনা দুর্বার হইয়া ওঠে না।

কিন্তু এ কি ! পাইব ভাবিয়া মন যে নেশায় মাতিয়া উঠিয়াছে, সে মাতনে···যা আছে, তাও যে যাইতে বসিয়াছে !

অফিসে বন্ধুরা বলে— যে টিকিট তোমার হাতে, আমরা ও টিকিটের মালিক হলে ঐ টিকিট বন্ধক রেখে আজ বিশ পঁচিশ হাজার টাকা ধার নিয়ে যে কাণ্ড করতুম···ওঃ !

নীরদ কোনো জবাব দেয় না— শুধু হাসে।

সেদিন অফিসে আসিবার একটু পরে স্টিফেন সাহেবের কাছে ডাক পড়িল— নেরোড বাবু।

নীরদ গিয়া সাহেবকে সেলাম করিয়া সামনে দাঁড়াইল।

সাহেব বলিলেন— বড় দুঃসংবাদ নেরোড। আজকের কাগজে 'ফরেন্' টেলিগ্রাম দেখিয়াছ ?

—না সাহেব।

—ব্ল্যাক প্রিন্স ট্রায়াল-গ্যালপে পড়িয়া পা ভাঙিয়াছে। কাল তাকে গুলি করিয়া মারা হইয়াছে।

নীরদের বুকখানা ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল ! সে কহিল— তার মানে, I will get nothing?

সাহেব বলিলেন— তা নয়। ড্রয়িং-এর জন্য হাজার টাকা আন্দাজ পাইতে পার।

নীরদ কহিল— এক হাজার টাকা কি আর টাকা, সাহেব ! যাক, দুঃখ নাই। ও টাকা পাইলে আমি বোধ হয় পাগল হইয়া যাইতাম। না পাইতে যা হইয়াছিল, আমিই জানি।

অফিসে সেদিন···

এতদিন যে-সব বন্ধু মুখে তোষামোদের বাণী ভরিয়া নীরদকে আপ্যায়িত করিত, পান-সিগারেট খাইত নীরদের পয়সায় নীরদকে কৃতার্থ করিয়া কোনোমতে মনের আগুন পা দিয়া চাপিয়া, আজ তারা আরামের নিশ্বাস ফেলিল। নীরদের অন্তরালে হাসিয়া বলাবলি করিল— তাই ভাবছিলুম, জাত-কেরানি— সে হবে আমীর-ওমরাহ্ ! আর আমরা মরবো কলম পিষে ! হুঁঃ ! আবু-হোসেনী স্বপ্ন রে, দাদা !

গৃহে ফিরিয়া প্রজ্ঞা দেবীকে নীরদ এ সংবাদ জানাইল। প্রজ্ঞা দেবী কহিলেন— সত্যি, বেঁচেছ ! ঠাকুর দয়া করেচেন। ও হাজার টাকাও ঘরে তুলো না।

নীরদ কহিল— ধার-দেনাগুলো শুধে ফ্যালো। তার পর যা থাকে, দিও পাঠিয়ে কোনো অনাথ-আশ্রমে !

পি চৌধুরীর শেষ খেলা

শঙ্করীপ্রসাদ বসু

ডিসেম্বরের শীতস্নিগ্ধ প্রভাতে দুজন আম্পায়ার যখন উইকেটের মাথায় বেলের কিরীট পরিয়ে সরে দাঁড়ালেন, তখন, তার মধ্যেই, পাত্র-একাদশ তুমুল করতালিধ্বনির মধ্যে মাঠে নামতে শুরু করেছে। সামনে বহু যুদ্ধের প্রবীণ যোদ্ধা—বিরল কেশ, অক্ষৌরিত আনন সুবিখ্যাত র'বে পাত্র— পাত্র একাদশের ট্রাডিশন্যাল অধিনায়ক।

প্রাচীন হাওড়ার মধ্যাঞ্চলের দীর্ঘ দিনের পুরাতন একটি বাৎসরিক খেলা— শীতের শ্রেষ্ঠ খেলা এবং শ্রেষ্ঠ উৎসব এই পাত্র ও মিত্র একাদশের ক্রিকেট প্রতিযোগিতা। ডিসেম্বরের শেষ দিনটিকে রমণীয় করে তোলে খেলাটি। প্রবীণ নবীনের সমান আগ্রহ ও উৎসাহের বস্তু। প্রবীণ আসে বয়সকে ঝেড়ে ফেলে, নবীন আসে বয়সকে জাগিয়ে তুলে।

ডিসেম্বরের সুন্দর মধ্যাহ্নে আজ যেন কেমন একটা বিষণ্ন মধুরতা। পূর্ণ আনন্দের মধ্যে বিষাদের স্মৃতি থাকে, ভরা মন কেবলই ছলছল করে, তাই কি বিষাদের সুর ? কে জানে ! একটি কথা কিন্তু সকলের মনে পড়ছে, আজকের এই দুপুরে, বিশেষভাবে। কেউ ভুলতে পারছে না।

কাতারে কাতারে লোক জমেছে মাঠের চারপাশে, যেমন প্রতি বছর এসে থাকে। তারা বাদাম চিবুচ্ছে, মুড়ি-মসলার সঙ্গে দরাদরি করছে, ঝগড়া করছে, রগড় করছে, চেঁচাচ্ছে— কিন্তু মনের একটি জায়গায় নীরব হয়ে আছে— তার পূর্ণ চিত্তের মাঝখানটিতে। তারা বিদায় দেবে।

বিদায় দেবে মাঠের প্রবীণতম খেলোয়াড়টিকে। বিদায় দেবে এই বাৎসরিক ক্রীড়াসম্মেলনের যিনি স্রষ্টা— তাঁকে। খেলার জগৎ থেকে সাধারণভাবে তিনি বিদায় নিয়েছেন অনেকদিন, কিন্তু নিজের সৃষ্টিকরা এই বিশেষ খেলাটির লোভ ছাড়তে পারেননি এতদিন। গত বছরও মাঠে তাঁর উৎসাহই ছিল সবচেয়ে বেশি। এ বছরও নিশ্চয় থাকবে। কিন্তু শরীর সায় দিচ্ছে না, সায় দিচ্ছে না ডাক্তারে। স্কুলের গাড়ি বারান্দার প্যাভিলিয়নে একটি স্থায়ী আসনের অধিকার গ্রহণ করবেন তিনি। খেলার মাঠ বঞ্চিত থাকবে তাঁর দৃঢ়প্রসন্ন ব্যক্তিত্বের মহনীয়তা থেকে।

পি চৌধুরীর আজ শেষ খেলা।

খেলার শেষ নেই, আমাদের বুঝিয়েছিলেন প্রৌঢ় চৌধুরী। যেখানে আছ, সেইখানে থেকে খেল ; যে বয়সে আছ, সেই বয়সে থেকে খেল ; খেল— খেলে যাও। ভারতের চিরন্তন জীবনদর্শনে বিশ্বাসী চৌধুরী আমাদের সেদিন কোন্ খেলার কথা বোঝাতে

চেয়েছিলেন ?

জানি না কেন খাঁটি ভারতীয় চৌধুরী খাঁটি বিলেতী এই খেলাটিকে এত ভালবেসেছিলেন ? 'কেন ?— আমিও জানি না',— আমাদের প্রশ্নের উত্তরে অন্যমনস্ক হয়ে যান। তখন শরৎকাল। সকালের তপ্ত রৌদ্র খানিকটা চৌধুরীর নীল-কালো মুখে, বাকিটা সামনের পুকুরের কালো জলে ঝলমল করছে। জলে স্থলে আগমনীর আদরের সুর। স্থির চোখে ঝলমলে জলের দিকে তাকিয়ে চৌধুরী গুনগুন করে সুর ধরলেন,— 'তোর রঙ্গ দেখে রঙ্গময়ী অবাক হয়েছি।' ফিরে ফিরে কয়েকবার ঐ কলিটি গাইলেন। তারপর একেবারে চুপ করে গেলেন। আমরা আবার প্রশ্ন করলুম। চৌধুরী উত্তর না দিয়ে ছেড়েদেওয়া গানের পরের পংক্তি ধরলেন,— 'আমি হাসিব কি কাঁদিব তাই বসে ভাবতেছি।' কিছুক্ষণ পরে সুরেলা আচ্ছন্ন গলাতে যেন গানের জের টেনে বলতে লাগলেন,— 'কি জানিস, ছোট বেলা থেকে ক্রিকেট দেখলে আমার একটা অদ্ভুত স্বপ্নের মত দর্শন ঘটে। ঠিক যেন দেখি, কি বলি, দেখি যেন আকাশের নীল মাঠের পাশে আমি দাঁড়িয়ে আছি, আর দিব্যোজ্জ্বল কারা সব সেই অপার্থিব নীল মাঠে খেলছে— ক্রিকেট।' বলেই হা হা করে প্রৌঢ় মানুষটি হেসে ওঠেন। হাসিটা ঝনঝন করে বেজে ওঠে আস্তে আস্তে থেমে আসে। আমরা হাসি না। চৌধুরী কুণ্ঠিত লজ্জিত সুরে বললেন, 'আমি তাদের সঙ্গে খেলেছি।'

চৌধুরী তাঁর মহৎ জীবনকে উৎসর্গ করেছেন লোককল্যাণে। সমস্ত পল্লীর ভালবাসা আর ভক্তির পাত্র তিনি। ছোটদের মানুষ করব— এই কথাটি বাংলাদেশের এক গৌরবময় যুগে তাঁর মধ্যে প্রবেশ করে গিয়েছিল। ছোটদের সঙ্গে বড়রাও তাঁর উদার হৃদয়ের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে— মানুষ হবার জন্য যতখানি না, সুযোগ নেবার জন্য আরও বেশি করে। চৌধুরী ছোটদের মানুষ করার চেষ্টা করেছেন, সাধ্যমত চেয়েছেন বড়দের উপকার করতে।

আর চৌধুরী প্রবর্তন করেছেন এই বাৎসরিক ক্রিকেট-উৎসবটির। অনেক বছর আগে।

অ—নে—ক—ব—ছ—র। তখন তোদের স্কুলের বাড়ি কোথায়! কত বছর আগে জানিস— আমার বয়স তখন বছর কুড়ি। এখন হোল পঁয়ষট্টি। তার মানে পঁয়তাল্লিশ বছর আগে। আমরা এই মাঠেই খেলতুম, তোরা যেখানে খেলছিস। তবে সে মাঠের চেহারা ছিল আলাদা। দুধারে তখন পানা পুকুর আর পচা নর্দমা। চারদিক ঘন জঙ্গলে ঢাকা। আগে নাকি ডাকাত থাকত। আমরা জঙ্গল পরিষ্কার করে মাঠ তৈরি করলুম। সেখানে ব্যাটবল খেলা শুরু হোল আমাদের। তখন বাপু এত নিয়মের হাঙ্গামা ছিল না। আমরা ব্যাট চালাতে জানতুম, জানতুম বল ছুঁড়তে। বল হয় উইকেটে, নয় ব্যাটে লাগত। ব্যাটসম্যান জানত না ঠেকাতে, বোলারের নিন্দে হোত যদি ফস্কে যাওয়া বল উইকেটে না লাগত।

চৌধুরী শুধু নিজের দলবলের সঙ্গেই সেখানে 'ব্যাটবল' খেলা শুরু করেননি, পাড়ার ছেলেবুড়ো সকলকে জুটিয়ে আনতেন সেই পানা পুকুরের ধারে, জঙ্গল ও নর্দমার পাশে, একটি শীতের দুপুরের জন্য। ৩১শে ডিসেম্বর কারও অব্যাহতি ছিল না— ছেলেটিকে সবাই ভালবাসত— ছেলে বুড়ো সকলে।

আমরা হেসে গড়িয়ে পড়ি যখন শুনি সান্যালদের বুড়ো-কর্তা এক হাতে হুঁকো ধরে টান

দিতে দিতে মাঠে নেমে আম্পায়ারের হাতে হুঁকো জমা দিয়ে ব্যাট ধরলেন। কিংবা ঘোষ-খুড়ো নিজের নাতির হাত ধরে আলগা গায়ে মাঠে নামছেন ব্যাট করতে। সকলে ঐ সঙ্গে খুড়ীকেও আনবার কথা বলতে রেগে উঠছেন বেমক্কা রসিকতায়। বিদ্যাসাগরী চটি পায়ে কিংবা নামাবলী গায়ে ক্রিকেট খেলা হয়েছে, একথা বাংলাদেশের ক্রিকেট-ইতিহাসে লিখে রাখার মতো। মজার শেষ থাকত না যখন চক্রবর্তী মশাই ফতুয়া ও ফুলপ্যান্ট পরে বল করতেন।

সেই থেকে চলে আসছে। অনেক বদলেছে— মানুষ, পোষাক, নিয়ম। ঠিক আছেন একমাত্র চৌধুরী। এবার তিনিও বদলাবেন। চলে যাবেন তাঁর নিজের রচনাকরা খেলার পৃথিবী থেকে।

মাঠের হৈ হৈ বেড়ে উঠেই কমে গেল— ব্যাটসম্যান দুজন প্রচুর আড়ম্বর করে গার্ড নিচ্ছে ভুল স্ট্যান্সে। আমাদের এই ভুল করার স্বাধীনতায় ইংরেজ ক্রিকেট-সমালোচক মুগ্ধ। আহা! ক্রিকেটের প্রাচ্যদেশীয় অরক্ষণশীলতা। মিত্র-একাদশের প্রথম জুটির খেলোয়াড়েরা দেখবার মত পদার্থ। একজনের বয়স চল্লিশের উপর, অন্য জন পনেরোর নীচে। চল্লিশোর্ধ্বে যিনি, তাঁর মালকোঁচা বাঁধা, ভাল করে বাঁধাও হয়নি, রুমাল-বাধা প্যাড উপচে পড়ছে ধুতি। মাথায় তৈলসিক্ত সোলার হ্যাট।

একটি বিষয়ে তিনি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম ক্রিকেটারের সমতুল— উদরে ও ওজনে গ্রেট ডবলিউ জি গ্রেস ছিলেন তিন মণ, ইনি তার আধ মণ কম— আড়াই।

ফ্রি হিটার বলে এঁর খ্যাতি।

এঁর সহযোগী খেলোয়াড়টি ‘হাতে কালি, মুখে কালি, বাছা’— অর্থাৎ ক্লাস এইট-এ পড়ে। খাটো কালো টাইট চেহারা, পরনে খাকি হাফ-প্যান্ট। পায়ের প্যাড পৌঁছেচে বুকে এবং হাতের গ্লাভস কনুই পর্যন্ত। ব্যাটখানি নাবালকটির কাছে বিপুল পৈতৃক সম্পত্তির মত, থাকলে মন্দ, না থাকলেও তাই,—ভাল করে ধরতেও পারছে না।

পাড়ায় এবং স্কুলে বিশ্বপাজি ছেলে, খেলার মাঠে শিবস্বরূপ, ধীর-স্থির-ধ্যানস্থ; যেভাবেই বল দাওনা কেন সে আটকাবেই তাকে। মারধর কিছু নয়, শুধু আটকে রাখা। আউট করার পক্ষে সবচেয়ে বিরক্তির খেলোয়াড়। এমনিতে স্নেহ করতে ইচ্ছা যায়— খেলার মাঠে বিপক্ষ দলে থাকলে— থাক। দেড় ঘণ্টায় শূন্য রান— তার মোটামুটি অ্যাভারেজ।

যাঁরা পাড়া-ক্রিকেট খেলেন, তাঁরাই এই রকম ওপেনিং জুটির কার্যকরিতা বুঝবেন। একদিকে নিরেট ডিফেন্স, অন্যদিকে উন্মাদ আক্রমণ।

একটা চিৎকার ফেটে পড়ল। ফ্রি-হিটার একটি ফ্রি হিট দেখিয়েছেন। প্রথম বলেই ওভার বাউন্ডারি। দ্বিতীয় বলেও অফে ওভার বাউন্ডারি (মাঠটি ছোট এবং ব্যাটসম্যান স্বাধীন)। তৃতীয় বলে ক্যাচ, যদিও ফসকালো। চতুর্থ বল ব্যাটসম্যান ফসকালেন। পঞ্চম বলও ফসকালো, যেটা ব্যাটে লাগলে রাস্তায় গিয়ে পড়ত। এই সময় উইকেটের কাছ ঘেঁষে দাঁড়িয়েছিল উইকেটকিপার, ঘোরানো গদাঘাত থেকে কোনোক্রমে মাথা বাঁচালো। ষষ্ঠ বল পড়ল নিখুঁত লেংথে, ফ্রি-হিটার মনস্থির করতে পারলেন না কি করবেন। কিন্তু পাবলিক এন্টারটেনমেন্টের দায়িত্ব নিয়ে পেছিয়ে যাওয়া যায় না। অতএব ওয়েস্ট ইন্ডিজ খেলোয়াড়দের মত ব্যাকফুটে ওভার বাউন্ডারি। তাঁর ব্যাটিংয়ের শব্দব্রহ্ম,— ওভার বাউন্ডারি।

অট্টহাসি এবং হট্টগোল মিলিয়ে এমন একটা শব্দ উঠল, যা অনেক কিছু সহ্য করতে হয় বলে মানুষের কান সহ্য করতে পারল।

বল নয়, উইকেট প্রায় ওভার বাউন্ডারি হয়ে যাচ্ছিল।

এক উইকেটে ১২ রান। হিট উইকেট ও বোল্ড একসঙ্গে। দলের ভীমসেনের বিদায়।

জি মিত্র নামলেন। মিত্র দলের তারকা। এঁর স্টাইলই আলাদা। রান করুন বা না করুন, যে কোনো অবস্থাতেই সমান মর্যাদাপূর্ণ। খেলার ফলাফলের দায়িত্ব অবশ্য এঁর নিজেরই, কিন্তু ক্রীড়াভঙ্গির দায়িত্ব নিয়েছেন সারা পৃথিবীর খেলোয়াড়েরা, গ্রেস থেকে গ্রেভনি, ব্রাডম্যান থেকে হার্ভে, রণজি থেকে নির্মল চ্যাটার্জি। ইনি ক্রিকেট খেলেন, ক্রিকেট পড়েন, ক্রিকেট দেখেন— চাক্ষুষ ও স্বপ্নে। এবং সবচেয়ে ঘৃণা করেন অক্রিকেটোচিত কোনো কিছুকে। হাল্কা হলুদ সিল্কের প্যান্ট-সার্টে, নিজস্ব ক্রিকেট-গীয়ারে ইনি একজন ক্ষুদে হ্যামন্ড— ক্রিকেটীয় গরিমা এবং রাজকীয় মহিমায় সর্বাত্মক খেলোয়াড়।

দর্শকেরা এতক্ষণে একটু নিঃশ্বাস ফেলার অবকাশ পেয়েছে। তারা জানে কিছুক্ষণ উইকেট পড়বে না।

মাঠের চারিদিকে তাকিয়ে নেবার অবসর পাওয়া গেছে। একদিকে স্কুলের প্রকাণ্ড চারতলা বাড়ি। একতলার ঝোলানো গাড়ি-বারান্দার নীচে 'প্যাভিলিয়ান'। প্রত্যেক তলার লম্বা বারান্দা নেড়ামাথা রণজি স্টেডিয়ামকে লজ্জা দিতে পারে,— ছেলে-বুড়োয় ঠাসাঠাসি। স্কুলের উপরে একেবারে খোলা ঘন নীল আকাশ, সেখানে দুলছে ত্রিবর্ণের ইন্দ্রধনু। মাঠের চারপাশ দড়ি দিয়ে ঘেরা,— ছাপিয়ে পড়া যৌবনের মত দর্শকের চাপ মাঠে ছড়িয়ে পড়তে চাইছে। তাদের সামলাবার জন্য রুমাল হাতে দুজন ক্রিকেটের লাইনসম্যান। এক কোণে আমগাছের তলায় একটি ব্ল্যাকবোর্ড, তার উপর লাল কালিতে সংখ্যা-লেখা পিচবোর্ড টাঙিয়ে সেটাকে স্কোরবোর্ড করা হয়েছে। বোর্ডে রান ঝোলাবার সঙ্গে সঙ্গে পাছে কোনো সন্দেহ থাকে, চেঁচিয়ে রানসংখ্যা বলে দেওয়া হচ্ছে। টেবিল নিয়ে 'প্যাভিলিয়ানে' বসে আছে স্কোরার, তাকে উপদেশ দিচ্ছে গুটি পনেরো ছোকরা ; দূরে দেখা যাচ্ছে শিবমন্দিরের চুড়ো, নারকেল গাছের মাথায় সূর্য, আকাশ পরিষ্কার— ।

একটা ছোট হালকা মেঘ সূর্যের উপর দিয়ে সরে গেল,— একটা ছায়া পড়ল মাঠে— জি মিত্র নিপুণ হাতে স্কোয়ারকাট মারলেন— সম্ভ্রান্ত প্রশংসার হাততালি চারিদিকে—

মাঠের উপরকার ছায়াটা কিন্তু অন্যমনস্ক করে দিল আবার। পি চৌধুরী স্কোয়ারকাট মার ভালবাসেন না। লেগ গ্লান্স তাঁর সর্বাপেক্ষা প্রিয়, উল্লাস বোধ করেন লেগে পুল করে। তিনি একবার আমাদের বুঝিয়েছিলেন,— তোরা কি সব কাঠের পুতুলের মত খেলিস বুঝি না ; তোদের খেলার ধরন— দেড় ঘণ্টা পরে অফে খুট্‌। রামঃ ! ওকি খেলা নাকি ? আমাদের কালে খেলার প্রাণ ছিল। সব কিছু লেগের ব্যাপার। বোলার লেগ তাক করে বল দেয়, আমরা লেগের দিকে পিষে দিই।

—দেখ, যদি অফ থেকে বল আসে, লেগে ঘোরাবি, স্বচ্ছন্দে, কোনো বিপদ নেই তাতে। যদি সোজা উইকেটের উপর বল আসে, লেগে পেটাবি, তবে একটু দেখে। যদি লেগ থেকে বল ঢুকে আসে, তবে পারলে তোলা মারে বেড়ার বাইরে পাঠাবি, কিংবা

মাটিতে ঠুকে স্কোয়ার-লেগে চালিয়ে দিবি— কিন্তু খু-উ-ব সাবধানে।

অর্থাৎ যেন-তেন-প্রকারেণ লেগে পাঠাতে হবে। চৌধুরীর কথার ভঙ্গিতে ক্রিকেটের জার-নিকোলাস ডাঃ গ্রেসের নির্দেশের প্রকৃতি : 'যদি টসে জেত এবং উইকেট ভাল থাকে',— ডাঃ গ্রেস বলবেন, 'ব্যাট করতে নামবে। যদি উইকেটের অবস্থা সন্দেহজনক হয়,— ব্যাট করতে নামবে। এবং,—' ডাঃ গ্রেস চোখ কুঁচকে একটি ভঙ্গি করে যোগ করে দেবেন,—'যদি দেখ উইকেটের অবস্থা খারাপ, খুব বেশি করে চিন্তা করবে…এবং তারপর ব্যাট করতেই নামবে।'

আমরা জানি, চৌধুরী কি মারাত্মক কেতাবিরুদ্ধ শিক্ষা দিয়েছিলেন আমাদের। বলের গতির বিপরীত দিকে পেটানো মানে উইকেট ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া। চৌধুরী তা জানতেন, নিজস্বভাবে। তাই লেগ থেকে ছুটে আসা বলকে লেগে পাঠানোর ব্যাপারে সাবধান হতে বলেছিলেন। বলেছিলেন, প্রথম সুযোগে তাকে মাটিতে ঠুকে দাও, কিংবা পাঠিয়ে দাও সকলের নাগালের উপর দিয়ে বেড়ার ওপারে।

পঞ্চাশ বছরেও হাতের কি জোর ছিল চৌধুরীর! তাঁর পঞ্চাশে পৌঁছবার পর থেকে তাঁর সঙ্গে খেলার বয়সে উঠেছি। বেশীক্ষণ খেলতে পারতেন না, চাইতেনও না। দরকারও ছিল না। অল্প সময়েই যে রান তুলে দিয়ে যেতেন, আমরা বহুক্ষণ 'নিখুঁতভাবে' খেলেও তাকে অতিক্রম করতে বেগ পেতুম। আর যে খেলা দেখাতেন! শুনেছি বৃদ্ধ দ্রোণাচার্যের কৌশল দেখে অর্জুনকে পর্যন্ত মাঝে মাঝে চমকে উঠতে হয়েছিল কুরুক্ষেত্রে।

বিবশ মনের উপর দিয়ে পুরনো স্মৃতিগুলো চলচ্চিত্রের মত সরে যাচ্ছে। যে চমৎকার মারটি জি মিত্র মারলেন, সে রকম মার মেরে বছর কয়েক আগেও অন্ততঃ চার আনার জিভে-গজা খেয়েছেন চৌধুরীর অ্যাকাউন্টে। তার পরেই, ঠিক এখনি, যেভাবে বোকার মত আউট হলেন মিত্র, তাতে কানমলা, কয়েক বছর আগে হলে, নির্ঘাৎ তোলা ছিল। এই আরো দুজন পর পর আউট হবার পরে ষষ্ঠ ব্যক্তি নামছে, তাকে চৌধুরী যা বলবেন, তা আমাদের সকলের জানা আছে, —'দেখো ভাই, তোমার উপর দলের ভরসা।' এ অঞ্চলে কে আছে, চৌধুরীর কথায় মূল্য না দেয়!

প্রচুর হাততালি পড়ল। মিত্র-একাদশের প্রধান আর মিত্র নামছেন। নার্ভাস এলোমেলো হাসি, উস্কোখুস্কো চুল, মুখে পানের ছোপ, এবং খেলায় সাহসী সৌন্দর্য— আর মিত্র এই মাঠের একজন প্রিয় খেলোয়াড়। অধিনায়করূপে তিনি সব সময় তাঁর খেলোয়াড়দের কাছ থেকে সাধ্যমত সহযোগিতা পান। তাঁকে সবাই ভালবাসে।

চৌধুরী কিন্তু কোনো কথা বললেন না। পরিচিত উপদেশ দিলেন না। সকলে চিরকাল তাঁর কাছ থেকে প্রেরণা নিয়ে খেলতে নামে, অধিনায়ক পর্যন্ত। কয়েকদিন আগেও নেমেছে। টেবিলের উপর দুটো কনুই ভর করে, হাতের দুই চেটোর উপর মুখ রেখে, তিনি বসে রইলেন সুদূর চোখে স্থির হয়ে। মুখে মৃদু হাসি ফুটল। দুই চোখে স্নেহ ঝরতে লাগল আশীর্বাদের মত। আর মিত্র তাঁর হাতে তৈরি খেলোয়াড়।

নিজেকে সরিয়ে নিচ্ছেন চৌধুরী। কোন নির্দেশ দেবেন না আজ।

হাততালির আর বাহবার ঝড় বয়ে গেল,—মুস্তাক আলীর রীতিতে মুস্তাক-ভক্ত অধিনায়ক মিত্র প্রথম বলে সুইপ করে লেগে বাউন্ডারি করেছেন। চৌধুরীর চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বিড়বিড় করে কি বললেন। বোধ হয় বললেন…

…ওর বাবা ঐ রকমই খেলত!

আর মিত্র লেগে কোনো সুন্দর মার মারলেই চৌধুরীর ঐ ধরনের একটা মন্তব্য অবধারিত, তা আমরা জানি। অত্যন্ত চিরপেক্ষ চৌধুরীর এই এক দুর্বলতা। এ নিয়ে আমরা চিরকাল হাসিঠাট্টা করেছি। আর মিত্রের মার দেখলেই তার বাবার কথা চৌধুরীর মনে পড়ে। এবং সেই 'আদি' মিত্রের কোন একটি মার ভাবনেত্রে তিনি দর্শন করবেনই। আমাদের একজন তামাশা করে বলত, আর মিত্রের অন্নপ্রাশনের সময় 'খোকা' মিত্র একটি লাল পশমের বল চুষবার চেষ্টার পর বিরক্ত হয়ে বাঁ পাশে ছুঁড়ে দিয়েছিল। নিমন্ত্রণ খেতে উপস্থিত চৌধুরী সেই ছুঁড়ে দেওয়ার মধ্যেও নাকি একটি অপূর্ব লেগ সুইপ আবিষ্কার করে 'পিতা' মিত্রের সত্যযুগীয় মারকে স্মরণ করেছিলেন।

মুখুজ্জে দাদু বললেন, অনাদি মিত্তির, বদন পাত্র, এবং ফেলু চৌধুরীকে আমরা বলতুম ত্রিমূর্তি, ছেলেবেলায়। অমন ভাব দেখা যায় না। পাড়ার সবচেয়ে ভাল আর সবচেয়ে পাজি তিনটি ছেলে।

একটু থেমে মুখুজ্জে দাদু বললেন, অনাদি মিত্তির প্রথম ছেলে হবার বছরখানেক পরে মারা যায় উড়িষ্যার জঙ্গলে শিকার করার সময়ে।

চৌধুরীকে জিজ্ঞাসা করেছিলুম, বাৎসরিক খেলার দল দুটির নাম পাত্র ও মিত্র-একাদশ হবার কারণ কি ? চৌধুরী ঐ কথাই বলেছিলেন— বর্তমান পাত্র ও মিত্রের পিতারা তাঁর বন্ধু ছিলেন। এ পাড়ায় তাঁরাই ক্রিকেটের সূচনা করেন। তাঁদের থেকে নাম দুটি হয়েছে। তাছাড়া, হেসে বললেন,— রাজা হচ্ছে একজন, একাদশ তৈরি হয় পাত্র মিত্রকে নিয়ে।

আমাদের একজন টপ করে বলল, রাজাটি কে, আপনি ?

আরে ছি ছি! রাজা আমি হব কেন— এই খেলাই হচ্ছে রাজা। রাজার খেলা, আর খেলার রাজা ক্রিকেট।

তারপর গুন্ গুন করে 'আবৃত্তি' করলেন, 'আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে।'

অথচ রাজবিদ্রোহী দলে প্রথম বয়সে নাম লিখিয়েছিলেন চৌধুরী। পরে রাজনীতি ছেড়ে দিলেও তাঁর রাজনৈতিক মত পাল্টায় নি। কেবল এই একটি ক্ষেত্রে তিনি রীতিমত মোটা কালিতে আনুগত্যের দস্তখত করেছিলেন।

খেলা জমে উঠেছে। এদিকে আক্রমণাত্মক ব্যাটিং-এর অগ্নিবাণ, অন্যদিকে বোলিং-এর বরুণাস্ত্র। কখনো জ্বলে কখনো নেভে। দর্শকেরা চমকিত, উল্লসিত, উৎকণ্ঠিত। এবং উচ্ছ্বসিত। শীতের সুখাবিষ্ট দুপুরে নিরাপদ উত্তেজনার মধুর আস্বাদ। একই বোলার ছটি বল ছয় রকম ছাড়ছে, ছাড়ার পরে মাঠের গুণে সেগুলি আবার নতুন ছয় হয়ে উঠছে। যেমন গমনে দমনে প্রথম শ্রেণীর ব্যাটসম্যান, তেমনি বেগে ও বঙ্কিমে উচ্চস্তরের বোলার। তেমনি সহৃদয় সামাজিক দর্শক। তারা বেঁটে বি মণ্ডলের ফিল্ডিং-এ বাহবা দেয়, এস দত্তের দেড়গজী ব্রেক দেখে চমকে ওঠে, এস বোসের ঠুকঠাক দেখে বিরক্ত হয় এবং এন ঘোষের ড্যাস-এর প্রশংসা করে। তারা উপভোগ করে স্লিক বাউন্ডারিকে, স্নেহ করে বৃদ্ধের আনাড়িপনাকে, চটে যায় ছোটর ছেলেমিতে। তবে সবচেয়ে আনন্দ করে স্থূলের অধঃপতনে। সমস্ত মাঠে পাগলা হাসির একটা সাইক্লোন বয়ে গেল যখন বর্তুলাকার হারান ঘোষ উদর-নির্গত দুই হস্ত 'পর্বতোপরি শ্রীভগবান্ মুসার' ভঙ্গিতে উপরে তুলে ক্যাচ ধরতে অগ্রসর হলেন এবং সেই সদভিপ্রায়ে ব্যর্থ হলেন কোনো এক বিশ্রী

ভারসাম্যনীতির প্রতিবন্ধকতায়।

এলোমেলো কান-ফাটানো চিৎকার হঠাৎ থেমে গিয়ে আবার উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। এবার কলরোল উত্তাল কিন্তু ছন্দোময়। তালে তালে দুন্দুভি বাজতে লাগল করতলে। এল মহাবিদায়ের লগ্ন।

চৌধুরী নামছেন। বগলে ব্যাট। গ্লাভস পরতে গররাজি। বাঁ-পায়ে শুধু প্যাড। টান করে মালকোঁচা বাঁধা ৬৫ বছরের নিটোল কালো পাথরে গড়া চৌধুরী মাঠের মধ্যে এগিয়ে যাচ্ছেন— পায়ের তলায় শেষ বারের মত রোমাঞ্চিত হয়ে নিচ্ছে শ্যামল তৃণগুলি, তারো তলায়— রক্তমাংসের মাটি।

চৌধুরী কি স্বপ্নের মধ্যে হাঁটছেন!

ধীর গতি। এত ধীর যে মনে হয় পা টিপে টিপে যাচ্ছেন। তিনি কি পথের শেষ চাইছেন না? অসীম অশেষ হোক এই যাত্রা। 'ঘরে যাইতে পথ মোর হৈল অফুরান।' লীলায় বিশ্বাসী চৌধুরী চাইছেন না তাঁর খেলা শেষ হোক। স্বপ্ন, বাঁচুক স্বপ্ন! মুছে যাক বাস্তব। প্যাভিলিয়ান থেকে উইকেট পর্যন্ত অব্যাহত থাক চৌধুরীর অভিযাত্রা।

উইকেটে পৌঁছে গেছেন চৌধুরী। দাঁড়িয়েছেন স্ট্যান্স নিয়ে উইকেটে, পুরনো দিনের মতই সিংহের অবহেলা আর মহিমায়। আমি কিছুতে সহজ হতে পারছি না। সব জিনিস দেখছি ঠিকই, কিন্তু দৃশ্য বস্তুর সঙ্গে মনের কেমন একটা ব্যবধান। মনের সমাচ্ছন্ন দূরত্বের বোধটি এড়াতে পারছি না, সবই তন্দ্রাচ্ছন্ন অপূর্ব অলীকতায় ভরে আছে। খেলার মাঠ, খেলোয়াড়, দর্শক, চৌধুরী— সব কিছু। চৌধুরী কি খেলছেন! খেলছেনই তো। সেই পুরনো লেগ গ্লান্স। লেগ পুল। অন ড্রাইভ। সব কিছু। কিন্তু সব কিছু যেন আমার কাছে তার পরিচিত গতি হারিয়ে ফেলেছে। বোলার, ব্যাটসম্যান, ফিল্ডসম্যান, দর্শক,—সকলেই ছন্দোময় তরঙ্গে ওঠাপড়া করছে। অতি ধীর মধুরতায় ভরা ওঠানামা— যেমন স্লো মোশন ছবিতে হয়ে থাকে। আবেশে দেখছি,— চৌধুরীর মারাত্মক প্রিয় অফের বল লেগে ঘোরানোর চেষ্টা,— তার ব্যর্থতা— ব্যাটের কানায় লেগে স্লিপে ক্যাচ ওঠা— তর্পণের অঞ্জলিভরা জলের মত বলটিকে ফিল্ডসম্যানের নম্র ভঙ্গিতে ছেড়ে দেওয়া— তাতে চৌধুরীর ক্ষুব্ধ চাহনি,— কয়েকটি বলের পরে চৌধুরীর আবার সেই একই মারের চেষ্টা— একইভাবে স্লিপে ক্যাচ ওঠা, —এবার একটি পবিত্র দানের মত তাকে করপুটে গ্রহণ করা— আম্পায়ারের দিকে ফিরে বোলারের নিবেদনের ভঙ্গিতে মাথা নামানো— অদৃশ্য নক্ষত্রলোকের দিকে শান্ত সঙ্কেতের মতো আম্পায়ারের তর্জনী তোলা— সমস্ত দর্শকের অভিনন্দনের মন্ত্রোচ্চারণ,—নত মস্তকে তা স্বীকার করে আকাশের দিকে হাতের ব্যাটটি শেষ বারের জন্য তুলে ধরা— তাঁর কাছে সমস্ত খেলোয়াড়ের ছুটে আসা— আলিঙ্গন করা, প্রণাম করা— গলায় মালা পরিয়ে চৌধুরীর নিষেধ না শুনে কাঁধে তুলে প্যাভিলিয়ানে ফিরিয়ে আনা,—আমার চোখের সামনে এ সকলই ঘটে যাচ্ছে। চৌধুরীর যেন ঘোর কাটেনি। আমারও ঘোর কাটছে না। চৌধুরী কি তাঁর শেষ খেলার শেষে দেখতে পেয়েছিলেন আকাশের সেই ক্রিকেট খেলাটি, যার একজন খেলোয়াড় তিনি? যদি না দেখতে পান, তাহলে যিনি চিরকাল ঘাড় সোজা রেখে মাঠে হেঁটেছেন, তিনি নিজেকে ফেরার পথে বাহিত হতে দিলেন কেন?

যা দেখলুম, তা কি ক্রিকেট?

জানি না।

ব্রাজিল

দিব্যেন্দু পালিত

সকালে বেড়িয়ে ফেরার সময় সপ্তাহে চারদিন বাজারে যায় কিঙ্কর দত্ত। সোম, বুধ, শুক্র, রবি— মোটামুটি এইটেই হিসেব। যেদিন যায় না সেদিন আমিষ অবশিষ্ট থাকলে ভালো, না হলে নিরামিষই চলে। এই শনিবার তবু ব্যতিক্রম ঘটল।

দেড় কে-জি ওজনের একটা ইলিশ কিনে খবরের কাগজে মুড়ে বাড়িতে ফিরে কিঙ্কর দেখল রোদ্দুরে পিঠ দিয়ে তরকারি কুটছে গৌরী। গলির মুখে বারোটা দেড়হাতি সিঁড়ি পেরোলে দোতলা, মাঝখানে দেয়াল, ওদিকে প্লাইউডের কারখানা। ওখান থেকে ওঠা নিমগাছের আড়াল ভেঙে এইমাত্র এগিয়ে এসেছে রোদ। এইরকম রোদে ইলিশ আর বঁটির ধার একই রকম ঝকঝকে দেখায়। আস্ত ইলিশটা লেজে ধরে তুলে স্ত্রীর সামনে এনে কিঙ্কর বলল, 'নাও। ইলিশ!'

'হঠাৎ!'

'আনলাম। অর্ধেকটা পাতুরি রেঁধে পরিমল বোসের বাড়িতে পাঠিয়ে দিও সমুর হাতে। বলেছিল ইলিশ ভালোবাসে—'

কিঙ্কর দত্তর বয়স সাতান্ন। রোগা নয়, মোটাও নয়; কেমন এক ক্ষয়া চেহারা। মাথার চুল পাতলা, সেইজন্যেই চওড়া লাগে কপাল, ময়লা ছোপ ধরেছে ত্বকে। মোটা ভুরুর নিচে চোখ দুটো ঈষৎ বড়ো এবং স্বপ্নময়, কিন্তু যখন তখন পাতা পড়ে। নাক ছোট কিন্তু তীক্ষ্ণ। মুখে দু দিন না-কামানো দাড়ি। কিছুদিন আগে অফিসে শেষ প্রোমোশন ফস্‌কে হঠাৎ সে আবিষ্কার করে রিটায়ারমেন্টের বয়স আসন্ন, দায় অনেক, কিন্তু সঞ্চয় সামান্য। যদি বেশিদিন বাঁচে তাহলে দারিদ্র্য কুরে খাবে। এই ভাবনা থেকেই বাড়িতে আতঙ্ক ছড়ায় সে, ব্যয়সঙ্কোচে মন দেয় এবং দৃষ্টান্ত হিসেবে একদিন অন্তর দাড়ি কামাতে শুরু করে। আজ তার দাড়ি কামানোর দিন।

গৌরী দেখল রোদ পড়ে চিকচিক করছে কিঙ্করের দাড়ির খোঁচগুলো। যদিও জুন মাস এবং গরমকাল, তবু রোদের আভা শীতের কান্তি এনেছে ওর মুখে। কান্তি, না বিষণ্ণতা? প্রশ্নটা উঠেই হারিয়ে গেল। মনে পড়ল কাল রাতে ভালো ঘুমোয়নি লোকটা, চার পাঁচবার বাথরুমে যায় এবং ঠিকঠাক ভোর হবার আগেই উঠে পড়ে বিছানা ছেড়ে। গৌরী এগুলোকে দুশ্চিন্তার ফল বলেই চিনত। সকালে মর্নিং ওয়াকে বেরুবার তাড়া দেখেও বোঝেনি কিছু। ইলিশটা তাকে বিমূঢ় করে দিল।

'অনেক দাম তো!'

'ঘাট করে। পঞ্চাশেই দিল। ছোকরা ইস্টবেঙ্গলের সাপোর্টার। আজ কিন্তু

ব্রাজিলকেই সাপোর্ট করছে। বলল জিতবেই। নিয়ে নিলাম।'

গৌরীর মুখে তারতম্য ফুটল না। হতবাক দৃষ্টি কিঙ্করের মুখের ওপরেই নিবদ্ধ রেখে অন্যমনস্ক হাতে বন্ধ করল বঁটিটা। ইলিশবাবদ কতো টাকা গচ্চা গেল এবং এরপর কোন কোন খরচে টান পড়বে ভাবতে ভাবতে বলল, 'শুধু খেলার মোহে ?'

'মোহ বলছ কেন ! ধরে নাও শ—', কথাটা শেষ করার আগেই থেমে গেল কিঙ্কর। নিঃশ্বাস নেবার জন্যে হাঁ করল। এটা তার সাম্প্রতিক রোগ। তারপর রোদের দিকে তাকিয়ে দম নিয়ে নিয়ে বলল, 'পুষিয়ে যাবে—'

কিঙ্কর-গৌরীর কথাবার্তার মধ্যেই দু ঘরের একটি থেকে বেরিয়ে এলো তাদের ছোট মেয়ে রত্না। ছেলে সমুও। মাধ্যমিক দিয়ে সে এখন রেজাল্টের অপেক্ষা করছে। মেঝেয় নামানো ইলিশটার দিকে তাকিয়ে বলল, 'তুমি কিন্তু একটু বেশি বেট নিচ্ছ, বাবা !'

'কেন !'

'কাগজে লিখেছে জেতার চান্স ফিফটি-ফিফটি। ফ্রান্সের মিডফিল্ড ভীষণ স্ট্রং। প্লাতিনি, টিগিনারা জ্বলে উঠলে—'

'জ্বলতে দিলে তো ! কাগজে ওমনি লেখে। ব্রাজিলের জাত আলাদা— সক্রেটিস, কারেকা—। দেখেছিস তো আগের দিন, জোসিমার নামের ওই নতুন ছেলেটা—'

'ওরা ইউরোপীয়ান কাপ জিতেছে। ভেরি স্ট্রং—'

'রাখ, রাখ। ইউরোপীয়ান কাপ ! জুনিয়র, সিজাররা পেছনে লাগলে প্লাতিনির বাবাও কিছু করতে পারবে না।' সামান্য উদ্ধত হয়েও চকিতে নেমে এলো কিঙ্কর। অনিশ্চিত গলায় বলল, 'শুধু জিকোটাই যদি ফর্মে থাকত !'

কিঙ্করের বলার মধ্যে কিছু ছিল যা সবাইকেই চুপ করিয়ে রাখল। সেই মুহূর্তের নৈঃশব্দ্য জুড়ে হঠাৎই ছড়িয়ে পড়ল অ্যাডহেসিভের গন্ধ মেশানো কাঠ চেরাইয়ের শব্দ।

কিঙ্কর এগিয়ে গেছে সিঁড়ির লাগোয়া এক চিলতে বারান্দায়। ঘাড়টা কারখানার দিকে নোয়ানো।

সমু দেখল ঘাড়ের চুল সাদা হয়ে গেছে বাবার। তার মানে বুড়ো ! এই বয়সে খেলা নিয়ে কেউ এমন খেপে ওঠে কি না জানা নেই। বাড়িতে টি-ভি নেই বলে খেলা দেখছে পরিমল বোসের বাড়িতে। মুখে সারাক্ষণ ব্রাজিল, ব্রাজিল। সেদিন জোসিমারের শটটা গোলে ঢোকার মুখে উত্তেজনায় 'গোল—' বলে চেঁচিয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে পা ছুঁড়েছিল আচমকা। লাথির ধাক্কায় পরিমল বোসের সোফার সামনে রাখা টেবিলের কাঁচ সরে যায়। সেটা জায়গায় আনতে আনতে পরিমল জিজ্ঞেস করে, 'নিজেও খেলতেন নাকি ?' কিঙ্কর জবাব দিতে পারেনি। নিজের ব্যবহারে নিজেই অপ্রতিভ, টি-ভি'র আলোয় বাবাকে অসম্ভব হেরে-যাওয়া লাগছিল তখন। এখনো লাগছে। চার বছর আগে সে ছিল ছোট। ব্রাজিলকে নিয়ে বাবার এই লাফালাফি তখন চোখে পড়েনি।

গৌরী উঠে গেছে রান্নাঘরে। উবু হয়ে বসে ইলিশ দেখছে রত্না। সমু কিঙ্করকে।

'ফর্মে থাকলে কি তেলে সাস্তানা বসিয়ে রাখত ওকে !'

কিঙ্কর দত্ত জবাব দিল না। দৃষ্টি দূরে। ছেলের কথাটা কানে তুলল কি না বোঝা গেল না। শুধু যেখানে ছিল সেখান থেকে সরে এসে দেয়ালের গায়ে রাখা মোড়াটা টেনে বসে ক্ষিপ্র হাতে পেট চুলকোতে লাগল।

গৌরী ফিরে এলো। কিঙ্করের হাতে চায়ের কাপ এগিয়ে দিয়ে মাছ ও বঁটিটা তুলতে তুলতে বলল, 'ক' পিস পাঠাবে ওদের ?'

'দ্যাখো না ক'পিস হয়। খান দশ বারো— পার হেড দুটো করে হলেই হলো—'

'আমাদেরও দু'পিস করে হওয়া উচিত।' রত্না বললে, 'বাবা, পুঁইশাক এনেছ নাকি ? মুড়োটা তো বাড়িতেই থাকবে !'

চায়ে চুমুক দিতে দিতে আবার অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল কিঙ্কর। মেয়ের প্রশ্নটা ধর্তব্য নয়, সুতরাং এড়িয়ে গেল। কিছু একটা হিসেব করে স্ত্রীকে বলল, 'দশ পিস পাঠালেই চলবে। গাদা, পেটি মিলিয়ে দিও। দেড় কে-জিতে পিস কুড়ি ঠিকই বেরুবে—।' বলতে বলতে থামল এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই কিছু প্রশ্ন কিছু বা স্বগতোক্তি মিশিয়ে বলল, 'শনিবার কি কালিঘাটে ভিড় হয় খুব ?'

কেউই জবাব দিল না। সমবেত দৃষ্টিগুলি কিঙ্করের মুখের ওপর থেকে ফিরে এলো শুধু।

সেজন্য সামান্যতম বিচলিত হলো না কিঙ্কর। রোদের দিকে তাকিয়ে নিজের মনেই চা-টা শেষ করল। পেটে ও ধুতিতোলা পায়ের গুলিতে হাত বুলিয়ে, পাঞ্জাবিটা খুলে রেখে বাথরুমে ঢোকার আগে খুশির গলায় ছেলেকে বলল, 'সম্রাটবাবু, মাছটা হয়ে গেলে ঝটপট পৌঁছে দিও পরিমলের বাড়িতে। বলেছে এগারোটা সাড়ে এগারোটার মধ্যেই টি-ভি ফিট করে দিয়ে যাবে ওর দোকানের লোক। কালার সেট। ঠিকঠাক চলছে কি না দেখে নিও।'

কিঙ্কর যতোক্ষণ না সম্পূর্ণ আড়াল হয় ততোক্ষণ পর্যন্ত ওকে লক্ষ করে রত্না বলল, 'আজ তো তাহলে বাংলা সিনেমাটাও দেখা যাবে !'

'থাম তো !' আঁশ তোলা হয়ে গিয়েছিল। বঁটির ধারে ইলিশের ধড়মুড়ো আলাদা করে গৌরী বলল, 'ভিক্ষে করে চেয়ে আনা টি-ভি— কাল সকালে আবার খুলে নিয়ে যাবে। নিজেদের সেট হলে এসব আদিখ্যেতা মানাতো !'

গৌরী সাহস খুঁজছে। এরপর হয়তো আরও কিছু বলবে। স্বভাবটা জানা।

কিঙ্কর দত্ত কথাগুলো শুনল এবং হজম করে নিল। তবু আয়নায় প্রতিফলিত মুখের দৈন্য এড়াতে পারল না। বুকের সামান্য আলোড়নও। সাবান মাখা গালে ক্ষুর টানতে টানতে লক্ষ করল সাদার ওপর দিয়ে অল্প জ্বালা নিয়ে নেমে আসছে ঘোলা লালের আভা— সেদিন ছেলেকে নিয়ে পরিমল বোসের টি-ভিতে ব্রাজিলের শেষ খেলাটা দেখার আগে টুথপেস্টের বিজ্ঞাপনে যেমন দেখেছিল। ফেরার সময় লোডশেডিংয়ে হোঁচট খেয়েছিল সিঁড়িতে। ছেলে ততোক্ষণে নেমে গেছে নিচে, পরিমল না ধরলে গড়িয়ে পড়ত। দরজা বন্ধ করার আগে পরিমল বলল, 'খেলা দেখার এতো শখ বললেই পারতেন ! দোকানে অনেক সেট পড়ে আছে, একটা লাগিয়ে দিতাম।'

'দেবে ?'

'কেন দেবো না ! এরকম কতো সেটই তো এর ওর বাড়িতে যাচ্ছে। খেলা শেষ হলে খুলে নিয়ে আসবে।'

'থ্যাঙ্ক ইউ, ভাই।' কিঙ্কর তখনই একটা মিথ্যে কথা বলে ফেলে, 'শুধু ছেলেমেয়েই নয়, তোমার বৌদিও খেলা-পাগল। ওই ফুটবল আর কি ! তুমি ঠিকই ধরেছে— এককালে আমিও খেলতাম। ওই আর কি— স্কুলে—'

মাঝখানে ছ'টা বাড়ি পেরোলে তাদের বাড়ির গলি। লোডশেডিংয়ের রাস্তায় ছেলের কাঁধে হাত রেখে হাঁটতে হাঁটতে কিঙ্কর বলেছিল, 'খেলার ক'দিন বাড়িতে বসে টি-ভি দেখলে কেমন হয় ?'

'কিনবে ?'

'না। যদি ধারে পাই। পরিমল বলছিল—'

সমু জবাব দেয়নি। এরপর কথা এগোয়নি আর। কিন্তু ভাবনাটা থেকেই যায়।

কিঙ্কর দত্ত জানে কিছু সত্য এবং কিছু মিথ্যা মিশিয়েই জীবন ; সে বানিয়ে বললেও পরিমল বোস যে সত্যিই দয়া দেখাতে চাইছে তাকে তা নাও হতে পারে। হয়তো টি-ভি ধার দিতে চায় তাকে এড়ানোর জন্যেই। কথাটা বলবার পরেও যদি না দেয় তাহলে আবার উপযাচক হয়ে খেলা দেখতে যাওয়া যাবে না। এই সন্দেহ থেকেই কাল অফিস-ফেরত গিয়েছিল ওর দোকানে। আড়ালে পেয়ে বলেছিল, 'যদি অসুবিধে হয় তাহলে পাঠানোর দরকার নেই। একটা খেলা না হয় না-ই দেখলাম—'

'আরে না-না।' পরিমল বলল, 'খেলা তো কাল। আমি বলে দিচ্ছি—'

ইলিশ খাওয়ানোর আইডিয়াটা তার পরেই ঢুকে পড়ে মাথায়। একবার বলার পর আরও একবার বলা যাবে না, তবে সময়মতো সরষে-পাতুরি পৌঁছুলে রিমাইন্ডারের কাজ হবে। সারা রাত ভাবল। খেলাটা একদিনেরই নয়। কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে ফাইনালে পৌঁছুতে সাত-আট দিনের ধাক্কা। দয়ার জিনিস ওমনি-ওমনি ধরে রাখা যায় না, ভেবেছিল ইলিশের ঘুষ পরিমলেরও চক্ষুলজ্জা বাড়াবে, সহজে ফেরত চাইতে পারবে না। তবে ব্রাজিল খেলছে বলেই এইসব।

গালের কাটা জায়গায় ফিটকিরি ঘষতে ঘষতে কিঙ্কর দেখল, সামনে ফ্রান্সের গোল, উৎকণ্ঠায় ছটফট করছে ওদের গোলকীপার জোয়েল বাত্স, আর গোটা এরিয়া জুড়ে নিপুণ ছন্দে ঘোরাফেরা করছে কয়েকটা সবুজ শর্টস, হলুদ জার্সি। ডানদিক থেকে লব করা বলটা কোণাকুনি ছুটে যাচ্ছে পেনাল্টি বক্সের দিকে। ওখানে সক্রেটিস, অ্যালমাও, এডিন্‌হো, কারেকা। সম্ভবত মাথা ছোঁয়াবে। গোল হবেই। ভাবতে ভাবতে জ্বরে-জাগা অনুভূতি নিয়ে কাঁপতে লাগল সে।

অনুভূতিটা ক্রমশ ছেয়ে ফেলল তাকে। সামান্য গম্ভীরও করে তুলল। চারদিকে ইলিশের গন্ধ ছড়িয়ে পড়তে মনে পড়ল গৌরী কী বলেছিল, ইলিশটার দিকে তাকিয়ে কীরকম হতাশায় ভরে উঠেছিল ওর মুখ। প্রশ্নটা তখনই করে। শুধু খেলার মোহে! এমনও হতে পারে, অনেকদিন ইলিশের স্বাদে বঞ্চিত এই বাড়িতে ইলিশের আবির্ভাবের উপলক্ষটা মেনে নিতে পারেনি গৌরী ; অর্ধেকটা পরিমল বোসের বাড়িতে চলে যাবে, সেজন্যেও হতে পারে। হিসেবী মন এর বেশি বোঝে না। ওই ঝাঁঝ থেকেই সম্ভবত ভিক্ষে করে টি-ভি আনার কথাটা বলেছিল। ভিক্ষাই কি ? নিজের মনেই প্রশ্নটা বাজিয়ে নিতে নিতে কিঙ্কর ভাবল, প্রস্তাবটা নিজেই দিয়েছিল পরিমল, সে শুধু মেনে নেয়। ইলিশ না দিলেও মেনে নেওয়ার ব্যাপারটা থেকে যেত। তাহলে ভিক্ষা কেন!

গরম ভাতের সঙ্গে ইলিশের তেল মেখে খেতে খেতে কথাটা তুলল কিঙ্কর।

'কিছু করার জন্যে উপলক্ষের দরকার হয়। ব্রাজিল সেদিন হেরে গেলে খেলা দেখার বাতিক চাপত না। তাহলে টি-ভি'রও দরকার হতো না—'

গৌরী জবাব দিল না। চামচ দিয়ে বাটি থেকে আরও খানিকটা তেল তুলে পাতে দিতে হা-হা করে উঠল কিঙ্কর। তারপর বলল, 'খালি হাতে কিছু নিতে সম্মানে লাগে। পরিমল কাছের লোক, ভাড়া তো আর দেওয়া যায় না, তাই—'

'ব্রাজিল কোথায় ?'

'দক্ষিণ আমেরিকায়। সে এক আশ্চর্য দেশ!' কিঙ্করের চোখ দুটো আরও বড়ো হয়ে

দেয়াল পর্যন্ত ছুটে গেল। টি-ভি রাখার জন্যে এখন থেকেই ওখানে জায়গা করে রাখছে সমু। পর্দায় হলুদ জার্সি ভেসে উঠল পর পর। ওরা মাঠে নামছে। এরপর সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়াবে। দৃঢ়বদ্ধ মুখের সঙ্গে একে একে ফুটে উঠবে নামগুলো। সেদিকে তাকিয়ে কিঙ্কর বলল, 'পেলে, গ্যারিঞ্চা, টোস্টাও, জেয়ারজিনহোর দেশ— ওরা হারতে জানে না—'

'হেরেছে।' সমু হঠাৎ বলল, 'লাস্ট দুটো ওয়ার্ল্ড কাপে কিছুই করতে পারেনি—'

'তুই কি ফ্রান্সের সাপোর্টার!'

কিঙ্করকে উত্তেজিত হয়ে থেমে যেতে দেখে গৌরী বলল, 'তোর অতো ফোড়ন কাটার দরকার কী, সমু!'

'ফোড়ন কেন কাটব! যা সত্যি তাই বললাম। তুমি শুধু শুধুই রেগে যাচ্ছ, বাবা!'

'রাগিনি।' নিজেকে সামলে নিয়ে কিঙ্কর বলল, 'দু'বার পারেনি বলে কি এবারেও পারবে না! রাত্রেই দেখবি।'

রাস্তায় নেমে নতুন দ্বিধায় জড়িয়ে পড়ল কিঙ্কর। সোজা অফিসে যাবে, নাকি কালিঘাট হয়ে যাবে? অফিসে এখন অ্যাটেনডেন্সের কড়াকড়ি হয়েছে। নতুন ম্যানেজার দীপেন সেন লোকটা খুব স্ট্রিক্ট, পনেরো মিনিট গ্রেস দেবার পর অ্যাটেনডেন্স রেজিস্টার তুলে নিয়ে যায় নিজের ঘরে। সই করতে হয় ওখানে ঢুকে। না তাকিয়েও টের পাওয়া যায় দুটি ধারালো চোখ ঠাণ্ডা করে দিচ্ছে পিঠের কুঁজদুটো। তখন এমনভাবে বেরুতে হয় যাতে চোখাচোখি এড়ানো যায়। লোকটা হারামি। এই অফিসে জুনিয়র অফিসার হয়ে এসেছিল সতেরো-আঠারো বছর আগে, তখন থেকেই বিষদাঁত দেখাচ্ছে। লেজারের এনট্রিতে ভুল হওয়ায় একবার ঘরে ডেকে দুরমুশ করেছিল তাকে। চিনতও না ঠিকঠাক। হঠাৎই জিজ্ঞেস করে, 'কিঙ্কর মানে কি?'

আকস্মিক প্রশ্নে হতচকিত, পিতৃদত্ত নামটা বুকে আঁকড়ে ধরে কিঙ্কর বলেছিল, 'শিবের অনুচর—'

'তাহলে তো মিলেই যাচ্ছে! যে ধরনের ভুল করেছেন তা মানুষ গাঁজা-ভাঙ খেয়েই করে।'

ঘটনাটায় সে এমনই বিপর্যস্ত বোধ করেছিল যে তাল সামলাতে না পেরে বাড়ি চলে যায়। পরের দিন আবার ডেকে পাঠায় লোকটি এবং বলে, 'ডিক্‌শনারী দেখলাম। কিঙ্কর মানে ভৃত্য বা চাকর—'

কিঙ্কর জবাব দিতে পারেনি। ওর হতভম্ব মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে দীপেন সেন বলে, 'না বলে চলে যাওয়াটা পানিশেব্‌ল্ অফেন্স। কাল আপনাকে অ্যাবসেন্ট করা হয়েছে। এরপর এমন করলে শো-কজ দিতে হবে—'

লোকটা যে পিছনে লেগেছে সেদিনই বুঝতে পেরেছিল তা। তখনো ইউনিয়ন জোরালো হয়নি অফিসে, কমপ্লেন করলে পাছে আর কোনো ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ে সেজন্যে অপমানটা নিজের মধ্যেই চেপে রেখেছিল সে। কিন্তু ভুলতে পারেনি। গৌরী তখন তৃতীয়বারের পোয়াতি। দুই মেয়ের পর ছেলে হলে কোনো বিড়ম্বনায় না গিয়ে ছেলের নাম রাখে সম্রাট। ভয়টা যায় না তবু। এর কিছুদিন পরে লোকটি বম্বেতে বদলি হওয়ায় নিঃশ্বাস ফেলেছিল। সতেরো বছর পরে প্রোমোশন পেয়ে যখন আবার ফিরে এলো নতুন ম্যানেজার হয়ে, কিঙ্কর তখন বুড়ো। প্রাপ্য গ্রেড প্রোমোশন আটকে দিল এফিসিয়েন্সির অভাবজনিত অজুহাতে। ডিপার্টমেন্টাল হেড দ্বিজেন বক্সী দীপেন সেনের

কাছের লোক, তাকে ধরেও কিছু না হওয়ায় কিঙ্কর ধরে নেয়, রিটায়ারমেন্টের পরেও যে কোম্পানীর ইচ্ছেয় কেউ কেউ এক্সটেনসেন পায় এই অফিসে, তার বেলায় সেটা জুটবে না।

এই ঘটনার কিছুদিন পরে অদ্ভুত একটা ব্যাপার ঘটল। মেক্সিকোয় ওয়ার্ল্ড কাপ শুরু হয়েছে, সেই নিয়ে আলোচনাও, গভীর রাত পর্যন্ত টি-ভি দেখে অনেকেই অফিসে এসে ঝিমোয় ; ডিপার্টমেন্টের দিলীপ ব্যানার্জি একদিন সামনে এসে দাঁড়াল।

'কিঙ্করদা, আপনার তো ফুটবলে দারুণ ইন্টারেস্ট। ওয়ার্ল্ড কাপ কে জিতবে বলুন তো ?'

দিলীপ পাকা খেলোয়াড়, ফার্স্ট ডিভিসনে রাজস্থান না কোথায় খেলেছিল এক বছর। সেই সুবাদে চাকরি। এখন বয়স হয়ে গেলেও অফিস টিমে খেলে। সল্ট লেক স্টেডিয়ামে মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গলের খেলায় তাকে টিকিট জোগাড় করে দিয়েছিল দুটো, তাই নিয়ে সে ও সমু জীবনে প্রথম যুবভারতীতে ঢোকে। ছেলেটি ভালো, বেশ মিশুকে, স্পোর্টিং টেম্পারামেন্ট। প্রশ্নটা তাকেই করছে দেখে খুশি হয়ে কিঙ্কর বলল, 'কেন ! ব্রাজিল ! ব্রাজিলই জিতবে—'

'আস্তে আস্তে।' আশপাশে তাকিয়ে সামনের চেয়ারটা টেনে বসে পড়ল দিলীপ ; মাথা ঝুঁকিয়ে বলল, 'এতো উত্তেজিত হয়ে পড়ছেন কেন !'

'কী ব্যাপার বলবে তো !'

'সেদিন বলছিলেন না সেনসাহেব আপনার ওপর খাপ্পা, এক্সটেনসন দেবে না ?'

কিঙ্কর তাকিয়েই থাকল।

'আজ ডেকেছিল।' দিলীপ বলল, 'ফোরকাস্ট করতে বলল। আমিও বলেছিলাম ব্রাজিল। শুনে বলল, 'বাজি রাখুন। ফ্রান্স কিংবা আর্জেন্টিনা—'

'শালা কিছুই বোঝে না।'

'না বুঝুক। শুনলাম, যে ঘরে ঢুকছে তাকেই জিজ্ঞেস করছে। আপনিও চান্স নিয়ে একটু তোল্লাই দিন না ! খেয়েও যেতে পারে—'

কিঙ্কর একটু ভাবল, তারপর সংশয়ের গলায় বলল, 'যদি না খায় !'

'খাবে, খাবে। এভাবেই খায়। বলেন তো আমি গিয়ে বলছি আপনিও সায় দিয়েছেন—'

'না, না। সেটা ঠিক হবে না।' কিঙ্কর পিঠ খাড়া করে বসল, 'ব্রাজিলকে হারাবো !'

'আপনি অবুঝ। ব্রাজিল জিতল কি হারল তাতে আপনার আমার কী !'

খানিক থমকে থাকল কিঙ্কর। চোখের পাতা ফেলতে ফেলতে দিলীপকে দেখল। তারপর বলল, 'মাফ করো। আমি ওর চাকর হতে পারি, ব্রাজিল নয়। ব্রাজিলই জিতছে। জেতার পর যাবো।'

দিলীপ উঠল না। খানিক অপলকে কিঙ্করের মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, 'আপনি অদ্ভুত লোক ! ব্রাজিলকে এমন ফ্যানাটিক্যালি সাপোর্ট করার কারণ কি ?'

'কারণ— ?' আর এগোতে না পেরে কিঙ্করের মুখে সেই ছায়া ফুটল যা তাকে প্রায়ই দিশেহারা করে দেয়। সময় নিয়ে বলল, 'কেন বলো তো ! কেন মনে হয় ব্রাজিল আমারই দল, যারা আমাদের মতো—'

'আশ্চর্য !'

এসব মনে পড়ায় তার পক্ষে অস্বাভাবিকভাবে চোয়াল শক্ত হয়ে উঠল কিঙ্কর দত্তের।

অফিসে যাবার জন্যে বাসে উঠেও নেমে গেল মধ্যপথে। প্রায় ঘোরের মাথায় কালিঘাটে গিয়ে পুজো দিল এবং আবার বাসে উঠে কপালের চ্যাটচেটে সিঁদুরে হাত বুলিয়ে রঙিন আঙুলটা চোখের সামনে এনে ভাবল, প্রায় দেড়ঘন্টা দেরির জন্যে সম্ভবত আজও সে অ্যাবসেন্ট হবে। বাসে কয়েকজন আজকের খেলার সম্ভাব্য ফল নিয়ে আলোচনা করছিল। খুব মনোযোগ দিয়ে তাদের কথা শুনতে শুনতে কিঙ্কর অনুমান করল ব্রাজিলই ফেভারিট। জিতছেই। একটা সীট খালি হতে বসতে বসতে সিদ্ধান্ত নিল, যে মার খাবার জন্যেই এসছে, একটা দিন অ্যাবসেন্ট হওয়া না-হওয়ায় তার কী যায় আসে! বরং ব্রাজিল জেতার পর লোকটার সামনে গিয়ে চোখ তুলে তাকাতে পারবে। এসব ভেবে বাইরে তাকিয়ে উদাসীন হয়ে গেল কিঙ্কর দত্ত। ভাবল, ব্রাজিলকে ভালোবাসি কেন? জবাব পেল না। তখন ভাবল, সমুকে ভালোবাসি কেন! এইভাবে তার চোখদুটো জলে ভরে এলো।

সন্ত্রস্ত ভঙ্গিতে অফিসে ঢুকে কিছুক্ষণের মধ্যেই হাঁফ ছেড়ে বাঁচল কিঙ্কর। দীপেন সেন আজ অফিসে আসেনি, সুতরাং লেট হবারও সম্ভাবনা নেই। ধীরেসুস্থে টেবিলে বসার পর সামনের টেবিলের তপন ঘোষ জিজ্ঞেস করল, 'কেন আসেনি জানেন তো?'

'কেন?'

'লিভারের পেন।'

কিঙ্কর জবাব দিল না।

'অফিসের অ্যাকাউন্টে যে-রেটে মাল খায়, লিভারের পেন তো হবেই—'

আকণ্ঠ জল গিলে জলের গ্লাসটা নামাতে নামাতে কিঙ্কর বলল, 'লিভারের পেন, না ভয়? খোঁজ নিয়ে দ্যাখো। কাল সকালে হাগতে শুরু করবে। ওসব অজুহাত—'

কথাটা শেষ করার আগেই চোখ গেল দ্বিজেন বক্সীর দিকে। ঠোঁটে কলম ঠেকিয়ে তার দিয়েই তাকিয়ে আছে লোকটা। সম্ভবত টিপ্পনী কাটা উচিত হয়নি তার। দ্বিজেন লাগাতে পারে।

অস্বস্তি কাটানোর জন্যে হাঁ করে নিঃশ্বাস নিল কিঙ্কর। লেজারের ওপরেই চোখ রেখে নিচু গলায় জিজ্ঞেস করল, 'খেলা দেখছ না?'

'দেখছি না আবার!' তপন বলল, 'পাড়ার ছেলেরা পট্‌কা রেডি করে রেখেছে। আজ আমাদের বৈঠকখানায় টি-ভি ফিট করিয়েছি। ওখানেই দেখবে। ব্রাজিল জিতলেই ফাটাবে—'

একটা তেজী ভাব ফুটে উঠেছে তপনের মুখে। নিজের বাড়িতে টি-ভি আনার কথাটা বলতে গিয়েও চেপে গেল কিঙ্কর দত্ত। চোখ সরিয়ে নিল দূরে। বড়ো কাঁচের জানলার ওদিকে আকাশ। নীলে চমৎকৃত শূন্যতা ঝাঁ ঝাঁ করছে রোদে। ওই দৃশ্য কিছুই বোঝায় না, কিন্তু টেনে নিয়ে যায় অনেক দূরে। তাকিয়ে থাকতে থাকতেই বলল, 'আর তো মাত্র কয়েক ঘণ্টা!'

'হ্যাঁ। দশ, এগারো।' তপন একটা সিগারেট ধরালো। ধোঁয়া ছেড়ে বলল, 'ওঃ! আজ যদি ওই গুয়াদালাজারায়, জালিসকো স্টেডিয়ামে থাকতে পারতাম!'

কথাটা শুনেই বুকের মধ্যে কিছু একটা পাশ কাটিয়ে গেল কিঙ্করের। নিঃশ্বাস নিল এবং ছাড়ল। তারপর গভীর গলায় বলল, 'সব স্বপ্ন কি সফল হয়! তবে কিছু কিছু স্বপ্ন নিশ্চয়ই হয়। এখন শুধুই রাতের অপেক্ষা—'

সেদিন গভীর রাতে টাইব্রেকারের শেষ গোলটিতে ব্রাজিল হেরে যাবার পর পরিমল বোসের দেওয়া টি-ভির সামনে বসে কিঙ্কর দত্তের পরিবারের হতচকিত তিনটি মানুষ দেখল, নিঃশ্বাস নেবার জন্যে হাঁ করেছে কিঙ্কর, কিছু বলার জন্যেও হয়তো, অস্পষ্ট গোঙানির মতো একটা শব্দ ভেঙেচুরে দিচ্ছে ওর সাতান্ন বছরের মুখের রেখাগুলো। মাঠে তখন শুধুই ফ্রান্স, জয়োল্লাসে দৃপ্ত তাদের হাঁটাচলা ও আলিঙ্গন পর্দায় কাঁপন তুলে আলো ফেলছে কিঙ্করেরও মুখে। কিঙ্কর দত্তের ছেলে ব্যস্তভাবে এগিয়ে গিয়ে সুইচ্‌টা অফ করে দিতেই সেখানে একই সঙ্গে নেমে এলো অন্ধকার ও স্তব্ধতা।

আমাদের বড়মামা আসবেন

অবন বসু

সব মানুষের কাছেই দু-একটা ব্যাপার বড় বাজে ঠেকে। দু একটা ব্যাপারে তাই আপত্তি থাকে। কেউ কুকুর সইতে পারে না। কেউ ভিখিরি দেখলে রাগে তোতলায়। আগে আমাদের বাসাটা যেখানে ছিল, সেখানে নিরঞ্জনবাবু না চরঞ্জিতবাবু নামে এক ভদ্রলোক জুতো পালিশ করার সময় পালিশওয়ালাদের বাঁ হাত নাড়াটা সইতে পারতেন না। পালিশ তোলার ঝোঁকে ওরা বাঁ হাতটা নাড়বেই, আর উনিও বিদঘুটে রকম রেগে যেতেন ব্যাপারটাতে। আরও অনেকে নিশ্চয়ই এমন সব কারণে রেগে যায়, আমার যা ধারণার বাইরে। দু একটা ব্যাপার আমারও একটু খারাপ লাগে। যেমন, কারো ফরমায়েশে যদি ভরদুপুরে রাস্তায় বেরুতে হয়। কিংবা খুব পয়সাওলা কারো বাড়িতে একটা ফোন করার অনুমতি চাইতে হয়।

আমাদের পাড়ার দু বাড়িতেই শুধু টেলিফোন আছে। বসাকদের আর দিগেনবাবুর। বসাকদের মেলা পয়সা। কতরকম ব্যবসা। ওদের গেট খুললে ভেতরটা কেমন অন্ধকারমতো। অনেকটা বড় একটা বারান্দা। সেখানে রাতদিন বিড়ি-পাতার গন্ধ। বস্তা বস্তা বিড়িপাতা লাট খেয়ে থাকে ঢাউস হয়ে। ওদের বাড়ির কাজের লোকদের হিসেব রাখা যায় না। তারা বস্তা পাড়ে, তোলে, হিসেব মেলায়, খাতা লেখে।

অনেকদিন আগে বাবার হাত ধরে গেছিলাম সিমেন্টের বকেয়া শোধ দিতে। ওদের সিমেন্টের গুদামও আছে। আটাকল আছে। ছাতির বাটের কারখানা। কত টাকা! আর দুটো টেলিফোন আছে। নিচের তলায় যে ফোনটা থাকে, সে ঘরে একটা মস্ত কুকুর। দু-চোখে পিচুটি নিয়ে শুয়ে থাকে। কী বিরাট, বাপ্‌স্! তবে চেন বাঁধা বলে গোলমাল করে না। কিন্তু ওই ফোনটায় খুব গোলমাল আছে। বাবা বলে, ওদের সরকার নাকি ইচ্ছে করলেই ওটাকে বিকল করে দিতে পারে। বাইরের লোক ফোন করতে এলে তাই বেশি ঝামেলা হয় না। আর একটা ফোন আছে ওদের। সেটা তিনতলায়। সরু সরু সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে হয়। চারপাশে সারি সারি ঘর। দাব্‌লা দাব্‌লা দেয়াল।

সেসব ঘরে মোটা কাপড়ের পর্দা টাঙানো। ভেতরে কি আছে বোঝা যায় না। বেশি তাকাতে লজ্জা করে। হাভাতে ভাববে। হঠাৎ পর্দা সরিয়ে কী মোটা মোটা বউয়েরা বেরিয়ে আসে। ফরসা কোমরের কাছটা থলথল করছে, আর ঝনঝন করে গয়নাগাটি। ওদের ভয়েই আমি তিনতলায় উঠতে চাই না। তার চেয়ে একতলার ফোন-ই ভাল। কুকুর থাকুক আর যাই থাকুক। তাছাড়া, বাবা বলে, 'ফোন না বাজলে সরকার মশায়কে সিগারেটটা-আশ্‌টা দিবি। ব্যস ঠিক হয়ে যাবে।' কয়েকটা সিগারেটও তাই নিয়ে

এসেছি।

বসাক বাড়িতে ঢোকার মুখেই বলাইয়ের সঙ্গে দেখা। আমাকে দেখেই সাইকেল থেকে নেমে পড়ল।

'বিকেলে মাঠে যাচ্ছিস তো ?'

'না'

'যাবি না কিরে ? তোর—'

'না'

'হিন্দি ফিল্মের যা সব গান এনেছে না ?'

'না'

'না কিরে। রতন মল্লিক রেকর্ডগুলো সব দিল যে'

'তুই কোথায় যাচ্ছিস, যা'

'বিকেলে মাঠে থাকছিস তো ?'

'না'

'তুই যা মানে ? তোরই তো—'

'তুই যা এখন'

'ইয়াব্বড় কাপ এনেছে মাইরী'

'আমি চললাম'

'কোথায় যাবি ?'

'বসাক বাড়ি'

'চাঁপার ব্যাপারটা আমায় দে না ?'

'না'

'বিকেলে যাস কিন্তু। পাড়ার কাপ বাইরে যেতে দেব না'

'দিস না।'

বিকেলে আমাদের পাড়ায় আজ ফুটবল ফাইনাল। প্রতি বছর হয়। কেউ না কেউ অর্গানাইজ করে। চাঁদা তোলে। ট্রফি কেনে। বাড়ির লোকেদের সঙ্গে খাতির থাকলে মাঠের সামনে এনে বসায়। বড় একটা যাই না আমি। বলাই একসঙ্গে অনেক কথা বলে। দাঁতের ফাঁক থেকে থুতু আর কথা যেন গলা ধরাধরি করে বেরোয়। বলাইকে ঠিক শিম্পাঞ্জীর মতো লাগে। একগাদা হেসে বলাই ঠিক ঐ প্রাণীর মতো সাইকেলে ঝুঁকে চলে গেল।

বসাক-বাড়িতে ঢুকে বিড়ি-পাতার গন্ধে কেমন পাগল পাগল লাগে। নিঃঝুম সুখের গন্ধ। বলাইয়ের মতো করে বললে 'ক্লাস গন্ধটা।' ভেতরে কেমন একটা ছায়া পড়ে আছে। বড় বারান্দায় বিড়িপাতা পড়ছে, উঠছে। বাঁদিক দিয়ে একটা প্যাসেজ চলে গেছে কলঘরের দিকে। সেখানে ফর্সামিতো একটা ঝি বসে, একবার বাসন ধুচ্ছে, একবার হাঁটু রগড়াচ্ছে। কোনো ঝি-য়ের অত ফর্সা হাঁটু দেখিনি আগে। বেশ লাগল। তক্তপোশে হেলান দিয়ে ওদের সরকারবাবুও গদিঘর থেকে দৃশ্যটা দেখছিলেন। যেন থতমত খেয়ে চোখ ফিরিয়ে বললেন, 'কৃকী চাই ?'— 'একটা ফোন করব'— 'লাইন খারাপ'। আমার হাতে সিগারেটের প্যাকেট ঠেকেছে। বার করব কি করব না করতে করতে টেনে আনলাম। ফর্সা হাঁটুরও অনেক উপরে কাপড়। বাসনে হাত ছোঁয় কি ছোঁয় না। চোখ এদিকে। মওকা পেয়ে প্যাকেটটা তক্তপোশে নামিয়ে 'ইয়ে, একটা চেষ্টা করে দেখি না ?'

কাজ হল।

আসলে উনি দৃশ্যটাকে চোখে-হারা হচ্ছেন। আপদ-বিপদের গলায় বললেন 'দেখ তবে', আপনিও দেখুন। মনে মনে বললাম। গদিঘরে কুকুরটা ঘুমাচ্ছে। ঘুমা। চোখে আরো পিচুটি জমুক। উঠিস না বাপ। বড় মামার ফোন নম্বর খুঁজতে গিয়ে চণ্ডেশ্বরীর মন্ত্রলেখা একটা কাগজ হাতে এল। কিছুদিন আগে সেজ পিসীমা এসেছিলেন। সওয়া ইঞ্চি প্রমাণ একটা মাদুলি আর এই মন্ত্রটা দিয়ে গেছেন। সঙ্গে থাকলে গা ভার হবে না। রাতবিরেতে কেউ ঘর থেকে ডেকে নেবে না। আর চরিত্র কুপথে পিছলাবে না। আমার নাকি মন্ত্রটা রাখা ভীষণ জরুরি। আপাতত এই মন্ত্রটার জন্যই ফোন করা হয় না। মামার নম্বর আনতে কি ভুলে এটা এনেছি। মাঝখান থেকে কুকুরটাও জেগে গেছে। নিঃশব্দে উঠে পড়ি। তিনতলার মোটাসোটা মহিলারা এতক্ষণে হয়ত টেলিফোন মাথায় দিয়ে ঘুমোচ্ছেন। কে জানে ওরা কি করে? একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সরকারবাবুর পাশ থেকে আমার সিগারেটের প্যাকেটটা তুলে বেরিয়ে আসি। ওনার তখন থালা, বাটি, ছাই, সাবান, হাঁটু দেখতে দেখতে বেদম ঘোর লেগে গেছে। কোনোটাকেই যেন আলাদা করতে পারছেন না।

বাড়ি ফেরার পথে দুটো লরি দেখতে পাই। এ পাড়ায় বড় একটা লরি ঢোকে না। লরি দুটোয় ঢাউস ডাঁই করা ছাই মাটি। সনৎদের বাসা থেকে লরি দুটো ডান হাতি রাস্তা ধরল। এই তবে সেই বিল-ভরাটের মাটি? ক'দিন ধরে শুনি, বিল ভরাট হচ্ছে। মস্ত মস্ত অনেক বাড়ি হবে। দড়ি টেনে জমি ভাগ করা হয়েছে। স্কুটার, মোটর সাইকেল ঢুকছে পাড়ায়। নতুন নতুন মুখ। দালালরা আসছে। সব কেমন বদলে যাচ্ছে।

লোকে বলাবলি করে, বসাকরা আর পাত্তা পাবে না। দিগেনবাবুদের একই অবস্থা হবে। যারা বাড়ি করছে, সব নাকি ডাকাবুকো বড়লোক। হতে পারে। আমার ছোটবেলা থেকেই বসাকদের বড়লোক দেখছি। বসাকদের কুকুরটা ঘুমায়। চোখে সবুজ পিচুটি জমে। ওদের সরকারবাবুও নাকি টাকা মেরে দেশে দোতলা বাড়ি হাঁকিয়েছে। আমরাই শুধু গরীব রয়ে গেলাম। কমবেশি সকলেই পয়সা বানাবার চেষ্টা করছে। আমাদের কিছু হল না।

বসাকরা ছাড়া এ পাড়ায় যা কিছু পয়সাওলা ঐ দিগেনবাবুরা। ব্যাবসাপাতি কিছু নেই। তবে যুদ্ধের আগে তিন-চারটে কোম্পানির নাকি অনেক শেয়ার কেনা ছিল। এখন চড় চড় করে বাজার চড়ছে। এক টাকার আলু তিন টাকা। বাজার বলতেই কেন যে যে শুধু আলুর কথা মনে হয় আমার। আসলে, এক আলু দিয়েই আমাদের বেশির ভাগ রান্না হয়। ভাজাভুজি থেকে ঝোল, ঘ্যাঁট। টক-ও বাদ থাকে না। আমাদের বাড়ি রোগী দেখতে এলে রামডাক্তার গুঁড়ো ওষুধে ফোঁটা কেটে পুরিয়া করেন। তারপর ব্যাজার মুখে বলেন: 'শর্করা বাহুল্যয় অনিবার্য মূত্রদোষ'। রোজ আলু খাওয়ার চেয়েও আমার বাজে লাগে ওনার মুখ থেকে ঐ একই কথা শুনতে। হ্যাঁ, এই আমার আরেকটা বাজেলাগা ব্যাপার।

যাকগে, বাজার তো শুধু আলু নিয়েই চড়ে না। আরও কত কী থাকে। সেসব মিলিয়েই বোধহয়, দিগেনবাবুদের শেয়ারগুলোরও দাম বেড়ে গেছে। ওরা মোটর কিনেছে। খেলানো বাড়ি। ওদের টেলিফোনটার রঙ সাদা। কথা বলার জায়গায় সেন্টের গন্ধ। জ্যোৎস্নায় ওদের বাড়িটাকে সাদা জাহাজের মতো লাগে। একটা জাহাজের গল্প পড়েছিলাম। তার মাস্তুলে এক মেম-ভূত বসে ইনিয়ে, বিনিয়ে ক্যাপ্টেনের

নাম ধরে কাঁদত। দিগেনবাবুর বাড়ির ছাদেও ভর-সন্ধ্যায় ওদের মেয়ে চাঁপা বসে কাঁদে।

রোদ্দুরটা যেন একটু পড়ে গেল। বাঁকের মুখ থেকে বিল দেখা যায়। কিছুটা দেখি হাঁটা থামিয়ে। লরি দুটো এখন কালো বিড়ালের থেকেও ছোট হয়ে গেছে। ঘোরানো রাস্তা ধরে ওরা বিলে নেমে যাচ্ছে। আর কত ভিতরে যাবে? কত দূরে থাকবে মানুষজন? ওখানে বাড়ি বানালে একা একা লাগবে না? আমার তো ভাবলেই কেমন লাগে।

এইসব দুপুরে মনটা কেমন হয়ে যায়। আমাদের পাড়াটা ভারি অদ্ভুত। দুপুরবেলা এত চুপ করে থাকে। মাঝে মাঝে দু-একটা বউ পুকুর ধারে বসে ঘস ঘস করে বাসন মাজে। পোষা কুকুর এঁটো খায়। কিন্তু বসাকদের ঝিয়ের মতো ওদের হাঁটু সাদা না। চাঁপার মতো তো নয়ই। কেমন মাজা মাজা আর ডিগডিগে। একটা ছেলে একা একা এক্কা দোক্কা খেলে মরছে। সাইকেলের পেছনে বসিয়ে কোথায় যেন চালের বস্তা পাচার করছে একটা শুঁটকো মতো লোক। এই রাস্তা দিয়েই শহরে চোরাই চাল ঢোকে। শুঁটকো লোকটা সাইকেল টেনে হিঁচড়ে হেঁট মাথায় চলে যায়। বোঝা বাড়লে মাথা তোলা যায় না। নাছোড়বান্দা ফিকে ধুলো উড়ছে হাওয়ায়। সাপের মতো এঁকেবেঁকে সাইকেল-চাকার দাগ চলে যাচ্ছে। চালের বস্তাদুটো ফুলে ট্যাম হয়ে আছে। লোকটার মুখটাও ট্যাম-পানা। যখন তখন মদ চলে বোঝা যায়। এইসব মুখ রোদে বাজে-মার্কা লালচে দেখায়। সাইকেলের পুরনো টিউব দিয়ে বস্তাগুলো বাঁধা। মাল টানতে গিয়ে পরিশ্রমে গলার শিরাও উঠে গেছে। যেন সেগুলোও সরু সরু সাইকেল-টিউব। সাইকেলের ক্যারিয়ার থেকে মাপমতো একটা বাঁশের টুকরো ঝুলছে। ওটা ঠেকিয়েই সাইকেল দাঁড় করানো হয়। তার পাশপাশি উঠছে নামছে লোকটার অবিকল একই রকম সরু পা দু'খানা।

দুপুর শেষের রোদ্দুরে সব মিলিয়ে দৃশ্যটা এমন দেখায় : দুটো ফুলো বস্তা। একটা ফুলো মুখ। দুটো বস্তা বাঁধা টিউব। আটটা গলা বাঁধা টিউব। পিছনে একটা বাঁশের টুকরো। পাশে দুটো বাঁশের টুকরো। সব চলছে। দৃশ্যটা চলছে। পুরো দৃশ্যটা চলে গেল।

আমাদের বাড়ির সামনে একটা রিক্সা দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে চমকে উঠি। কে এল আবার? ছোট পিসীমা এসেছেন। আমাকে যিনি চণ্ডেশ্বরীর মাদুলিমন্ত্র দিয়েছেন, ইনি তাঁরই ছোটজন।

'কোথায় গেছিলি বাবা অবু?'

'বড় মামাকে ফোন করতে'

'তোর মামা আসে?'

'আসবে বলেছিল।'

'আর এয়েছে!'

'তুমি তো এসেছ।'

'আমার কি আর অতবড় হ্যাক্কার আছে বাবা?'

'বাচ্চু এসেছে? নাকি একা?'

'আমার আবার একা না দোকা। তোদের পাড়ায় টিলিফোন আছে বুঝি?'

'দুটো। বসাকদের আর দিগিনবাবুর। ঐ জাহাজী বাড়িটা।'

জাহাজের সঙ্গেই চাঁপার কথা মনে আসে। সেই মেম-ভূতের গল্প। চাঁপাই আমার জীবনে একমাত্র গোপন ব্যাপার। চাঁপার জন্যই ওদের বাড়িতে ক'দিন যাই না।

টেলিফোন করতেও যাইনি। দিগেনবাবুদের ছাদে চাঁপা বসে কাঁদে। কারো সঙ্গে কথা বলে না, সবাই জানে মাথায় ছিট আছে। শুধু আমি জানি, লক্ষ্ণৌতে ওর একটা বিয়ে হয়েছিল। সেই বরের কথা মনে পড়লে তখনই ও পাগলামো করে। ওর থেকেও সুন্দর কাকে বিয়ে করে বরটা ভেগে গেছে। আমাদের পাড়ায় এ কথার প্রকাশ নেই। শুধু আমিই জানি, তবে প্রকাশ দিই না। চাঁপাও অবশ্য আমার অনেক কথা গোপন রাখে।

পিসীমা ঘরে ঢুকে যায়। পাড়ার দু-তিন মহিলা ঘরের মধ্যে 'তুই ভাল কাঁদিস, না আমি ভাল কাঁদি' গলায় কাঁদছে। পিসীমাও এবার যোগ দেবে। বাইরের ঠাণ্ডা হাওয়া খেয়ে, গলা পরিষ্কার করে গেল। অল্প পরেই রুনু দুটো রুটি এনে দেয়। গরম রুটিতে কেমন আটা আটা গন্ধ। বমি আসে। তার মধ্যে আলুভাজা। এ বাড়ি আলুর বাড়ি। শর্করা বাহুল্যয় অনিবার্য মূত্রদোষ।

রুনু আমার বোন। আধময়লা শাড়ি পরে। মেয়ে-রোগের গণ্ডগোল দেখাতে ফি মাসে রাম ডাক্তারের কাছে যায়। । ছেঁড়া মাদুর ঝোলানো বারান্দার ওপাশে কাপড় বদলায়। শরীরে লোহা কমে যাচ্ছে বলে মুখ খসখস করে। লুকিয়ে সাবান ঘষে। ওর বুকগুলো এত ছোট, রাস্তায় বেরোলে কেউ চেয়েও দেখে না। মা তাই খুব নিশ্চিন্ত।

'দাদা, বড়মামা আসবেন ?'

'তোর কী দরকার ?'

'না, মা বলছিল...'

'মাকেই নিয়ে আসতে বল তবে। ফোনের লাইন পাইনি'

'দাদা, মাঠে যাবি না ?'

'তোর ইচ্ছে হচ্ছে খুব ?'

'ন্‌না। দিগেনবাবু এসেছিলেন তো—'

'কে ?'

'দিগেনবাবু। তোর খোঁজ করছিলেন'

'কি বললেন ?'

'ওদের বাড়ি যেতে বললেন। ক'দিন যাসনি নাকি ? চাঁপাদির অসুখ বেড়েছে !'

'এইজন্য এসেছিলেন ?'

'ঠিক তা না। বাবাকে বিকেলে মাঠে নিয়ে যাবে তো—'

'ও।'

দিগেনবাবু দেবতা। দিগেনবাবু মা-বাপ। আমার না হোক চাঁপার বাপ। আহা, চাঁপা ওনাকে আমার কথাটা বলেনি। আবার যাব ওদের বাড়ি। মাছিধরার মতো চাঁপাকে চাদর চাপা দেব। মাসে দুশো টাকা। রুনুকে লোহার টনিক কিনে দেব। পিসীমার মন্ত্রটা দুবেলা পড়ব। ভয় না করে। ভাগ্যও ফিরতে পারে। বড়মামা আসতে পারেন। রুনুকে আগে ভাগাই 'যা, ঐ কুকুর কান্না চলছে। থামাগে।'

'তুই কী রে দাদা ? ওকথা বলতে মায়া হয় না ? ওরা কাঁদছে—' রুনু চলে যায়। হয়। খুব হয়। সমস্ত জীবনটার জন্য মায়া হয়। তোর লোহা টনিকের জন্য। মা'র ছেঁড়া ব্লাউজের জন্য। বাবার প্যাঁকাঠি চেহারার জন্য। বাবা মারা গেলে প্যাঁকাঠিতে পোড়াব না। আলুতে পোড়াব। বাবাই এ বাড়িতে আলুময় জীবন চালু করেছেন।

বাবার স্মরণ সভায় তাই রাম ডাক্তারকে দিয়ে রক্তৃতা দেওয়াব। রামবাবু গমগমে গলায় বলবেন 'শর্করা বাহুল্যয় অনিবার্য মূত্রদোষ'।

বিকেল ঠিক চারটেয় ভ্যাঁক ভ্যাঁক করে ফকিরের রিক্সা থামল আমাদের বাড়ির সামনে। তার পেছনে পেছনে চারটে সাইকেল। একটা সাইকেলে শিম্পাঞ্জী বলাই। বাবাকে মাঠে নিতে এসেছে। এই প্রথম বাবাকে এভাবে কেউ ডাকতে এল। প্রতিবার কারো না কারো সঙ্গে বাবা মাঠের ধারে বসে। অথচ বাবার কেমন গোমড়া মুখ। আমার তো ব্যাপারখানা ভালই লাগছে। দিগেনবাবু রিক্সা থেকে নামলেন না। এর-তার হাত ধরে বাবা ওঁর পাশে উঠে বসলেন। দিগেনবাবু সামান্য হাসেন। ঠোঁট ফাঁক হয় না। বাবা কী ভাবছেন ? ঠোঁটদুটো হাঁ হয়েই আছে। রিক্সা ঘুরিয়ে পুরো দলটা রওনা দিল। বলাই দু একবার আমার খোঁজ করল। কেউ সাড়া দিল না দেখে শিম্পাঞ্জীর ঢঙে ফের সাইকেল ছুটিয়ে চলে গেল।

দিগেনবাবুকে ইচ্ছে করেই দেখা দিইনি। কোনো সামান্য কথা থাকলে যদি এখানেই সেরে ফেলেন। ওঁদের বাড়ি যাবার সুযোগটা হারাতে চাই না। মোটে বছরখানেক হল ওঁদের বাড়িতে যাতায়াত করি। ওঁদের জাহাজের মতো বাড়ি আমাদের পাড়ার তাজমহল। দিগেনবাবু শাজাহান। ওঁর মেয়ে তাহলে কে হয় ? কে জানে ? কেউ হবে। গল্পের সেই মেম ভূতের মতো কেউ। বরকে খুব ভালবাসত নিশ্চয়ই। সারারাত কাঁদে। ঘুমায় না। সেজন্যই বোধহয় মাথার থেকে কয়েক খামচা চুল উঠে গেছে। বিড়বিড় করে কি সব বলে। আমি ধমকালে চেপে যায়। আমাকে ধমকাতে হয়। মারতেও পারি। খুব একটা না ঠেকলে মারি না। একাজের জন্য দিগেনবাবু মাসে দুশো টাকা দেন। জলখাবার দেয়। ওদের বাড়িতে আর কেউ ওর সঙ্গে গায়ের জোরে পারে না। পাগলের যা গায়ের জোর। আমি পারি। মনে হয় পাগলের থেকে অভাবীর জোর বেশি। আমাদের খুব অভাব।

অভাবকে আমার একজন ফ্যামিলি-মেম্বার মনে হয়। বাবাকে কোনোদিন অভাব ছাড়া কিছুই বলতে শুনিনি। আর বাজার। ছোট বেলা থেকেই বাবার কাছে জেনেছিলাম, বাজার বলে একটা জিনিস আছে। সেটা ওঠে, নামে। খারাপ হয়, ভাল হয়। আমাদের বাজার কোনোদিন ভাল হয়নি। মা বলে 'বিশু আসলে ঠিক পাল্টে যাবে'। বিশু আমাদের বড় মামার ডাকনাম। মা ঐ নামেই মামার গল্প করে। 'দেখিস, সব ঠিক হয়ে যাবে। আর চিন্তা থাকবে না।' মা'র থেকে শুনে আমরাও গল্প করি। যেখানে সেখানে বলি, 'আর চিন্তা থাকবে না।' মার এই না-দেখা সম্পত্তিটা ভাঙিয়েই আমাদের ঝ্যান ত্যান করে দিন চলে যায়। আমাদের সব বন্ধুই বড়মামার গল্প জানে। মাঝে মাঝে আক্ষেপ করে : 'এলে বেশ হত'।

চাঁপার সঙ্গে প্রথম প্রথম আমিও এঁটে উঠতাম না। ভয় হত, কামড় দিলে বা আঁচড়ালে পাগল হয়ে যাব। ফলে ও বেশিরকম বাড়াবাড়ি করলে দিগেনবাবু বলতেন, 'নাঃ তোমাকে দিয়ে হবে না। বলাই সমানে বলছে। এবার ওকে এনে দেখি।' ওইটাতেই মনে জোর আসত। আমার টাকাটা শিম্পাঞ্জী বলাই নেবে ? কক্ষনো না ! আবার ঝাঁপিয়ে ঝাঁপিয়ে ধরতে যেতাম। আবার এক গুচ্ছের মার খেতাম। শেষে নিজের ওপর ঘেন্নায় একদিন শাড়ি চেপে ধরলাম। ও তখন বইয়ের টেবিলে উঠে নাচছিল। শাড়ি ধরতেই কেমন ফস করে নেমে এল। এক চোখে রাগ ; আরেক চোখের অবস্থা হতবুদ্ধি। ওদের ওপরতলায় কেউ ছিল না। ওর ভয়ে কেউ থাকেও না। আলমারির

সঙ্গে সাপ্টে ওকে ঠেসে একটা চুমো খেলাম। আর তিন-চারটে আঁচড়। জীবনের প্রথম চুমো। তাও পাগল মেয়েকে। ওর কী যে হয়ে গেল! পরে বুঝেছি, মাথায় ধাক্কা লেগেছিল। আর এটাই এখন আমার অস্ত্র। মাথায় ধাক্কা দাও। পাগলামো ছাপিয়ে মেয়ে-সত্তাটা চনমন করে উঠুক। দিগেনবাবুকে অবশ্য এসবের ছিটে ফোঁটাও বলা যায় না। আশ্চর্য ব্যাপার, চাঁপাও বলে না। কদিন আগে একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলেছিলাম। চাঁপার খুব জ্বর এল। জ্বরের মধ্যে আর ওসবের দরকার হবে না বলে যাইনি। যেমন আজ ফোন করতেও গেলাম না। ও শুয়ে থাকলে ভাল লাগে না। বরং যা খুশি পাগলামি করুক। আরো পাগল হোক। তখনই চাঁপার সঙ্গে খেলা। ও আমায় পাগল করবে, না আমি ওকে পাগল করব।

'চলি বাবা অবু' কখন পিসী ঢুকে এসেছে।

'এস'

'তোরা ভালভাবে থাকিস্'

'থাকব'

'অমন কাণ্ড আর কেউ করিস না যেন। কত দুঃখু পেলাম।'

'বাচ্চু বরাবর ফেল করে। তাতে দুঃখ পাওনা?'

'কী বলিস বাবা? কানেও যে বড় শুনিনা একটা'

'তাড়াতাড়ি যাও। পিসে চিন্তা করবে'

'হ্যাঁ, আসি। ফুলি যে মন্ত্রটা দিয়েছে, একটু নাম নিস্'

'নেব'

মাঠটা বেড়ে সাজিয়েছে। চাঁপার চিন্তায় মনটা বড় হাঁসফাঁস করছিল বলে মাঠে এসেছি। কী অদ্ভুত দেখাচ্ছে মাঠটা। চারধারে রঙ-বেরঙের পতাকা উড়ছে। বাঁশের খাঁচায় চারদিক ঘেরা। তার পিছনে থৈ থৈ করছে লোক। দমদাম কতকগুলো পটকা ফাটল। ভিড় বাড়ছে। বলাইয়ের মতোই অনেকে বলছে 'কাপ বাইরে যেতে দেওয়া হবে না', হবে না মানে? এটাতো খেলা। হারজিত হবে পায়ে-বলে। যে কোনো দলই জিততে পারে। তাহলে? এরা কি গায়ের জোরে কাপ কেড়ে নেবে? কে জানে? বলাই বলতে পারে।

'বলাই কোথায় জানেন দাদা?'

'ও তো আজ খেলছে'

'শিম্পাঞ্জী বলাই?'

'কী বলাই?'

'ইয়ে, আমাদের বলাই?'

'কাদের বলাই জানি না। মণ্ডলপাড়ার বলাই খেলছে।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, সে-ই তো আমাদের বলাই।'

'বুঝেছি, আপনি তবে স্যাণ্ডার্সনের লোক না, নবযুবকের! ওপাশে যান।'

'ওপাশে কেন— আমি খেলা দেখতে এসেছি'

'এটা কে রে? ঝামেলা করতে এসেছে নাকি? বলছি যে নবযুবকের জায়গা বেড়ার ওধারে। ওখানে যান।'

এসব ব্যাপার আমি কিসসু বুঝি না। কোনটা কাদের দল। আলাদা দল হলে লোকের এত রাগ হয় কেন ? যাকগে, যেখানেই বসি— বলাইয়ের খেলাটা দেখতে পেলেই হয়। অত ঝুঁকে দৌড়লে ওকে কেমন লাগে, লাফঝাঁপ দিলে কেমন লাগে, সব আজ দেখতে হবে। তবে দিগেনবাবুর চোখে না পড়ে যাই।

ঐ বাঁশি বাজল যে। খেলা শুরু হচ্ছে। না, খেলা না। খেলোয়াড়েরা দু' দলে সারি দিয়ে দাঁড়িয়েছে। একপাশে ওই বলাই। তেমনই দু-হাত বাড়িয়ে দাঁড়িয়েছে। ওর দলের সবাই ওর মতো কালো। রোগা। আধপেটা-খাওয়া চেহারা। সবার একরঙা জার্সি নেই বলে এই দলটা খালি গায়ে মাঠে নেমেছে। সে এক দৃশ্য। ওদের মধ্যে বলাইকেই তবু একটু চোখে পড়ে। আর এক সারিতে যারা আছে, বেশ লাগছে তাদের। পরিষ্কার চোখমুখ। পরিষ্কার খেলার পোশাকে ঘাড় উঁচু করে দাঁড়িয়ে। যেন মানুষ-দলের সঙ্গে বলাইয়ের শিম্পাঞ্জী দল লড়বে আজকে। দারুণ রোমাঞ্চ হচ্ছে আমার।

খেলোয়াড়েরা অনেকটা সময় ধরে চুপচাপ দাঁড়িয়ে। মাঠের পাশে চণ্ডীমণ্ডপের থান। সেখানেই কাপ রাখা। সভাপতি, প্রধান অতিথির চেয়ার। বাবাকেও আজ ওখানে বসিয়েছে। দিগেনবাবুর উঁচু চেহারা চোখে পড়ে। চুপ করে দাঁড়িয়ে। রাম ডাক্তার দাঁড়িয়ে। হাফপ্যান্ট পরা রেফারী মাঠে দাঁড়িয়ে হাতের ঘড়ি দেখছে। আবার বাঁশি বাজল। সবাই নড়ে চড়ে দাঁড়াল। তারপরই মাইকে দিগেনবাবুর গলা ভেসে আসে। সভাপতির ভাষণ। দূর থেকে শুনেও আমি বুঝতে পারি উনি মদ খেয়ে এসেছেন। টানা, জড়ানো আওয়াজ। উঁচু পর্দায় বাঁধা। মানুষ দুঃখ পেলে যা খুশি করে। চাঁপার দুঃখে দিগেনবাবু মদ খান। বাড়িতে পায়চারি করেন। আচমকা চেঁচিয়ে ওঠেন। 'পাগলামো হচ্ছে অ্যাঁ ? স্যান্‌তামো, পাগলামো ?'

'স্যান্‌তামো' মানে কী আমি জানি না। তবে এটা বুঝি, 'পাগলামো'-টা চাঁপার উদ্দেশেই বলা। মাইকে অনেক কিছু বলেন দিগেনবাবু। ভুলে 'পাগলামো' কথাটাও দু' একবার চলে আসে। সবটা কানে ঢোকে না। শেষে 'স্মৃতি কাপ ফাইনাল' কথাটা হতে বিকট হাততালির মধ্যে চাপা পড়ে যান উনি।

খেলোয়াড়েরা ছড়িয়ে পড়ছে। রেফারি ছুটোছুটি করছে। আমার চারপাশে কম করে ষোল সতের জন বিড়ি ধরাল। বাবাকে দেখা যাচ্ছে না। বাবাও কি সভাপতির পাশে বসে বিড়ি ধরাচ্ছে ? বাবাও ঘন ঘন বিড়ি খায়। হাত কাঁপে, আর দু'গজ দূরের বেশি চোখে দেখে না। বাবাকে কেন যে এরা আনল ! ভাল লাগে না। দিগেনবাবুটাবু যেন অভিসন্ধি করেই বাবাকে এনেছে। ভাবখানা হচ্ছে : আমাদের নামী-দামী চেহারার পাশে এনাকে দেখ। ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে ব্যবধান দেখ। এই ব্যবধান ও ফুটবল মাঠটি প্রায় সমান।

ফুটবলটা লাফিয়ে উঠে দৌড়তে শুরু করে। অবিকল চাঁপার মতো। কিছুতেই ধরা যায় না। আমি কত চেষ্টা করেছি। ওরা এবার টের পাবে। বলাই পড়ে গেছে। আমি লাফিয়ে উঠি 'কীরে বলাই ? চাঁপাকে ধরবি না ? আমার দুশো টাকা নিবি যে বড় ?'

কোত্থেকে আসা স্যান্ডার্সনের কাছে দাঁড়াতে পারে না আমাদের সেকেলে নবযুবক। একবার বলও পায় না। সারাটা মাঠ জুড়ে ওরা খেলে। বল নিয়ে যা খুশি করে। বলাইয়ের জন্তু-বাহিনী বারে বারে আছাড় খায়। ওঠে। ছোটে। ঘামে। আবার পড়ে। এবং প্রথম হাফ-এর আগেই দু-দুটো গোল খায়। কেন এর বেশি গোল হয় না, সেটাই রহস্য। স্বপ্নের খেলায় উড়ে বেড়ায় স্যান্ডার্সন। বাবা দেখতে পান না চোখে।

দিগেনবাবু তো দেখছেন। ওঁর মেয়েকে সামলাতে বলাই কত অপদার্থ ক্যান্ডিডেট হ্ত। বুকের মধ্যেটা বেশ হাল্কা লাগে। হাফটাইমে বলাই খোঁড়াতে খোঁড়াতে আমার কাছে এল। ওর পাটা গেছে। যাক, এবার নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। চাঁপার সঙ্গে আর দৌড়তে হচ্ছে না। বাঁ চোখটাও ফুলেছে। এরপর আর একটা চোখ ফুললেই হল। চাঁপাকে দেখাও তোর শেষ। ও হাঁউমাঁউ করে কেমন সত্যিকারের শিম্পাঞ্জীর মতো আমার পাশে শুয়ে পড়ে। 'শেষ হয়ে গেছি মাইরী'। 'না, না আবার খেলবি।' চাঁপার ব্যাপারে আমি কোনো সুযোগই হারাতে চাই না। ও প্রায় কেঁদে দেয়, 'পারছি নারে। পাড়ার কাপ কেউ বাইরে যেতে দিতে চায় ? কিন্তু আমরা পারছি না…ওরা অনেক ভাল।' আমি আর কোনো জবাব দিই না। ভিড়ের মধ্যে কে এসে বলে 'তোর বাবার শরীর খারাপ লাগছিল। বাড়ি নিয়ে গেছে।' আনমনে বলি 'হুঁ'। আবার খেলা শুরু হয়। বলাই কিছুতে নামবে না। ওকে আমিই প্রায় ঠেলে নামাই। হাফ টাইমে স্যান্ডার্সনের দলের লোকেরা ওদের খেলোয়াড়দের পায়ে বরফ ঘষেছে, হাওয়া দিয়েছে, ঘাম মুছিয়ে আইস ক্রিম-লেবু খাইয়েছে।

বলাইদের কে একজন তিন টুকরো বরফ দিয়েছিল। ওরা তাই-ই ভাগাভাগি করে চুষেছে। এ ওর চোট সারাতে চেয়েছে। তাতে ব্যথা আরো জাঁকিয়ে বসেছে। স্যান্ডার্সনের কাছে টিকবে না জেনে পাড়ার দর্শকেরাও ওদের ধার ঘেঁষেনি। খেলা প্রায় হয়েই গেছে। সবাই জানে।

দিগেনবাবু এক ফাঁকে বোধহয় আবার কিছু খেয়ে এসেছেন। বারবার রামবাবুর চেয়ারে কাত হয়ে নিজেকে সোজা রাখছেন। রামবাবু কি বলেন, শোনার ইচ্ছা ছিল। 'শর্করা'-টা বলবেন না নিশ্চয়ই। দিগেনবাবু মোটে আলু খান না।

বলাই আবার পড়ল। আবার। তারপর আবার। বলাইকে আর চেনা যাচ্ছে না। ঘামে, রক্তে আর কাদায় মাখামাখি হয়ে আরো ঝুঁকে পড়েছে। হাতদুটো আরো সামনে। যেন নিজেকে বাঁচাবার জন্যই বারবার ও-দুটো বাড়িয়ে দিচ্ছে ও। হুবহু চিড়িয়াখানার সেই জীব।

আমি আর ভাবতে পারছি না। সব কেমন নড়বড়ে হয়ে যাচ্ছে। একটা ভাবনার ওপর আর একটা ভাবনা যেন নবযুবকের ঘাড়ে স্যান্ডার্সনের মতো চেপে বসেছে। আমার কি মন খারাপ হচ্ছে ? বলাইরা মার খেলে আমার মন খারাপ হবে কেন ? ওরা দু-গোলই খাক, আর দশ গোল। আমার কি ? তাছাড়া দিগেনবাবু আর কখনো চাঁপার তদারকির জন্য বলাইয়ের কথা ভাববেন না। সেটা কি কম লাভ ?

কিন্তু মন বড় বেপরোয়া বস্তু। স্যান্ডার্সনের খেলোয়াড়দের চেয়েও তার বেপরোয়া গতি। কে আমার মনকে বলে 'ঠিক হচ্ছে না'। বলাইদের আবার চেয়ে দেখি। নাঃ রাগ হচ্ছে না তো। মায়া হচ্ছে। কে আমাকে বলে 'ভাল করে ওদের দেখ।' ভাল করেই দেখি। সবাইকে ঠিক চিনি না। সেন্টারে খেলছে দুলাল-ধোপার ছেলে। ওকে চিনি। ইস্তিরি করতে গিয়ে বুকের দশ ইঞ্চি জমি পুড়িয়ে ফেলেছে। চামড়াটা ওখানে চকচক করে। ডিগ ডিগে চেহারা। স্টপার যে বলাই, তা কাউকে বলে দিতে হয় না। ওর চেহারা সে কথা জানান দেয়। গোলে খেলছে যে, তার দিদি আমাদের বাড়িতে ঠিকে-ঝির কাজ করত। ইদানিং আমাদের অভাব বাড়াতে সটকে গেছে।

নবযুবক যেন বৃদ্ধ অপুষ্টি-রোগীর মতো হাঁফাচ্ছে। আমার মাথার মধ্যে কে যেন ফুটবলের কিক অফ করে। চাঁপা। হ্যাঁ, চাঁপাই তো। এঁকেবেঁকে বল নিয়ে ছুটছে।

ওকে ধরতে না পারলে দুশো টাকা বন্ধ। চাঁপাকে ধরতেই ওর জেদের গলায় লাগাম দিতে হবে।

'বলাই!' আমি কখন চেঁচিয়ে ফেলেছি। চোখের কোণে রক্ত। বলাই মাঠের সমস্ত কোণে তাকায়। 'আমি এখানে' আবার চেঁচাই। এবার আমাকে দেখে। খেলা চলছে। ওর এখন আসার মানে হয় না। তবু ও আসে। বুড়ো শিম্পাঞ্জীর মতো টলতে টলতে আসে। 'আর পারছি না মাইরী। আমায় ফেরত নে।'

'তবে ওদের কি হবে ? যাদের নামিয়েছিস ?'

'কী করব বল ?'

'লড় শালা শিম্পাঞ্জী। জান দিয়ে দে।'

'কি হবে তাতে ?'

'মেমোরিয়াল কাপে এভাবে লড়তে এসেছিস ?'

'কোনোভাবেই পারবনারে'

'পারবিই।' আমার চিৎকারটা কেঁপে ওঠে। কষ গড়িয়ে থুতু বেরোয়। কিছু বুঝতে না পেরে বলাই ঝুঁকতে ঝুঁকতে নিজের জায়গায় ফিরে যায়।

আমি কি বসে আছি ? কী করছি, নিজেই জানি না। চাঁপা ছুটছে। বলাই পারছে না। আমিই বোধহয় বলাই হয়ে গেছি। সারা মাঠে আমি আর চাঁপা। কত ছুটবে ও ? ধরবই। একবার হাঁফাবে। তখুনি আমার পালা। একবার চাঁপাকে সেভাবে ধরেছিলাম। যেদিন ও খাট থেকে পড়ে গেল। ভীষণ পাগলামি করছিল। পাখা ছুঁড়ে আমার চোখে লাগিয়েছে। বাড়িতেও রাগ করে খাইনি সেদিন। শরীর দুর্বল। চাঁপাকে ধরে ফেললাম কিভাবে । ওর গায়ে ভীষণ জোর। আমি সারাদিন খাইনি। তবু আমার সঙ্গে পারল না। ওকে জানতে ইচ্ছে হল। কি আছে এই পাগলামোর মধ্যে ? কেন এমন করে ? ও একটা মেয়ে না ? ও মেয়ে কিনা, খুঁজে দেখাটাই যেন সে মুহূর্তে আমার দায়িত্ব হয়ে গেল। খুঁজে পেয়েছিলামও প্রায়। চাঁপা কেমন শব্দ না করে কেঁদে ফেলল। ব্যস, আর পারলাম না। ওকে ছেড়ে দিলাম। সেই থেকেই চাঁপার জ্বর এল। বুঝলি শিম্পাঞ্জী, চাঁপা কেঁদেছিল রে, হেউ হেউ করে কেঁদেছিল। সব কিছু জয় করা যায়। চোখের জল পর্যন্ত। মনে কর চাঁপা ছুটছে তুইও ছুটছিস। ধরতে হবে। বিট করতে হবে। তবে বাঁচবি।

বলাই সত্যিই একটা বল পেল। বলাই ছুটছে। পেছন থেকে সামনে। দুলাল ধোপার ছেলেকে দিয়েছে। ওর থেকে ময়রার জামাই। এত বয়স। টাক পড়েছে। খেলার শখ হয়েছিল। এসেছিস যখন মর। শ্বশুরের দোকানে ঘরজামাই হয়ে আর ফিরিস না। না, জামাই বোধহয় ফিরবেই না। সটান লাথি খেয়েছে। ফাউল নেই, অফসাইড নেই, পেনাল্টি নেই। শুধু খেলা। তুই আর চাঁপা। চাঁপা তোর বউ।

সাবাস জামাই। পড়ে গিয়েও বল ছাড়েনি। চাঁপার কথাটা শুনেছে বোধ হয়। কেতরে কোনোভাবে ধোপার ছেলেকে ঠেলেছে। ওর থেকে কে নিল ? মুখটা চেনা। মুখচেনা দিয়েছে হায়ার সেকেন্ডারি পাশ সাহাকে। বা, বা! বক্সে ঢুকেছে। 'ছাড়িসনারে!' চেঁচাতে গিয়ে ঠোঁটের দুপাশ চিরে গেল। যাকগে। থুতু উঠছে। আমি বলাই হয়ে গেছি। বলাই আমি।

বক্স থেকে আবার বল এদিকে। বলাইয়ের সামনে কেউ টিকছে না। কোপ খাওয়া ষাঁড়ের মতো বলাই উঠছে। সাঁ করে বল ঠেলল একজনকে। তাকে চিনিই না। এবার

বাঁদিকের পোস্টে গেছে। চাঁপা মেয়ে কিনা, খুঁজে দেখার সময় যেমন বুক কাঁপছিল, তেমনই কাঁপছে। চিনিইনা ডানদিকে বলা ঠেলার ভান করল। ঠেলল না। গোলকিপার তখন মাটিতে। চিনিইনা বল সমেত জালে ঢুকে গেল।

'বলাই, বলাই !'

'তাড়াতাড়ি বল।'

'দেখলি বলাই ?'

'কী ?'

'জেতা যায় ?'

'হুঁ'

বলাই এখন আমার মতো কম কথা বলছে। আমি ঠিক ওর মতো হাত-পা নাড়ছি। দাঁতের ফাঁক দিয়ে আপনিই থুতু বেরিয়ে আসছে। আমরা পাল্টাপাল্টি হয়ে গেছি। চাঁপাকে ছাড়া কোনো মেয়েকে খুঁজিনি আমি। ও সুস্থ হলে আমার চাকরি যাবে। ওর স্মৃতি ফিরে আসবে। আমায় চিনতে পারবে। আমি বলতে পারব না, 'চাঁপা, আমি তোমার টানে পড়ে গেছি।' ওরা আমায় তাড়িয়ে দেবে। যেভাবে বলাই অন্যদলের লাথি খেয়েছে, আমিও খাব। বরং চাঁপা পাগলই থাক্। ওকে ধরার জন্য আমার চাকরি থাকবে।

কারা চিৎকার করছে। মাঠ কাঁপছে। খালিগায়ের একজন আবার গোল দিল। দর্শকেরা রক্তের গন্ধ পেয়েছে। তারা এবার বলাইদের বরফ দেবে। ঘাম মুছিয়ে দেবে। রক্ত মোছাবে না। তারা রক্তের গন্ধ পেয়েছে।

'বলাই ! শুনতে পাচ্ছিস ?'

'হুঁ ?'

'চাঁপার কাজটা তোকে দেব'

'সত্যি ?'

'আলবাৎ'

'কিন্তু জিততে হলে আরো একটা গোল'

'তুই দে।'

'আমি যে নিচে খেলি।'

'তুই সব জায়গায় খেলিস।'

ঠিকে ঝি-র ভাই গোলকিপার এক্ষুনি গোল খেত। বলাই দিল না। ঈগলের মতো কেড়ে নিল। বলাইয়ের থেকে ময়রার জামাই। শ্বশুরের কব্জা থেকে জামাই ছুটছে···বল দিল···আহা, হায়ার সেকেন্ডারি সাহা যেন এম· এ· পাশ-করা বুদ্ধিতে ব্যাক পাস করল···ইস্তিরী চিহ্ন বল পেয়েছে। সেখান থেকে মুখচেনা। পেনাল্টি এরিয়ায় বল। ভাড়া-রিক্সার পায়ে গেছে। সোনার চাঁদ রে আমার ! রিক্সার চেন পড়ে গেলে এজন্যই তুই উল্টো প্যাডেল মারতিস ! আর একে বলে কিনা বাইসাইকেল কিক। তোর কাছে কিসসু না ঝপ।

স্যান্ডার্সন ইঁদুরের মতো পালাচ্ছে। বলাই ছুটছে। জামাই ছুটছে। আমি ছুটছি। জ্যোৎস্না রঙের ছাদে জ্যোৎস্না রঙের শরীর। পা থেকে কোমর। ইস্তিরী থেকে রিক্সা। বুক থেকে গলা। হায়ার সেকেন্ডারি থেকে ময়রার জামাই।

সবার আগে বলাই। সব জায়গায় বলাই। ওর মধ্যে আমি চাঁপার নেশা দিয়েছি।

বলাই আজ অবধ্য। কাদা রঙের রক্ত ফুটছে। রক্ত রঙের ঘাম ছুটছে। দর্শকেরা উত্তেজনায় উঠে দাঁড়িয়েছে। রেফারির চোখ ঘড়ির দিকে। খেলা শেষ হয়ে যাচ্ছে। আবার একদিন ফাইনাল হবে। নবযুবক সেদিন চাঁপার মন্ত্র পাবে না। ছুটতে গেলে হুমড়ি খেয়ে পড়বে। স্যান্ডার্সন ওদের পাড়িয়ে যাবে।

দিগেনবাবুকে রামবাবুর চেয়ার থেকে তোলা যাচ্ছে না। রামবাবু রাগে মাইক টেনে নিয়ে বলছেন: 'শর্করা-পরীক্ষাবিহীন এই খেলা পরিত্যক্ত হোক। শর্করা-বাহুল্যয় অনিবার্য মূত্রদোষ!' আমার আবার কেমন হয়ে যাচ্ছে।

'বলাই?'

বলাই নেই। স্যান্ডার্সন ওয়ান। স্যান্ডার্সন টু। স্যান্ডার্সন সেভেন। বলাই সবাইকে কাটিয়ে নিচ্ছে। একা। কাউকে দিচ্ছে না। ও চাঁপাকে দেখতে পাচ্ছে। বাঁ-হাতের তেলোয় ঝেড়ে ঝেড়ে রেফারি বাঁশি থেকে অনভ্যস্ত থুতু বার করছে। এবার একটানা আওয়াজ হবে। দিগেনবাবু তাই দেখে মাঠের ধারে এসে ডাকছেন 'চলে এস বলছি। চাঁপাকে ধরতে হবে না। ও ভাল হয়ে গেছে। আবার ওর বিয়ে দেব আমি। ওর বরের শর্করা-দোষ থাকবে না।'

সবাইকে কাটিয়েছে বলাই। স্টপার সুদ্ধ দৌড়ে পালিয়েছে। এবার চাঁপা আর বলাই। গোলকিপার দেখছে বলাই আসছে মেল ট্রেনের মতো। আদিম মানুষের মতো অত জোরে ছুটলে থামা যায় না। বলাই ঠিক থামল। প্রথমবার চাঁপাকে ছুঁচ্ছে। একটু সঙ্কোচ তো করবেই। আমারও হয়েছে এমন। কিন্তু বলাই দাঁড়িয়ে গেল। সব গতির বিরুদ্ধে চাঁপাকে ও দেখছে তো দেখছেই। রেফারি বাঁশি পরিষ্কার করে নিচ্ছে।

'বলাআআ-আই!'

চার পাশের প্রত্যেকটি চোখ আমার দিকে ঘুরে তাকায়। শুধু ওদিকের গোলমাউথ থেকে বলাই টের পায় না। আমি আরো জোরে চেঁচাই। আমি যেন চাঁপা হয়ে চাঁপার মতোই পাগলের ধারা রাগ হচ্ছে আমার।

'ব-লা-ই, তুই ভুলে গেলি, এই চ্যালেঞ্জ কাপ আমার ভাইয়ের স্মৃতিতে? জীবনের খেলায় হারতে হারতে ও সেম সাইড করেছে। লোকে সুইসাইড বলে। ক্ষ্যাপায়। আমি মুখ দেখাতে পারি না। বোকার মতো বিশ্বাস করি, বড়মামা আসলেই আমাদের দিন ফিরবে। তুই ওর কাপটা রেখে দে বলাই। একবার পা চালা। তোকে আমি চাঁপার পাগলামো দেব। দেহ দেব। মার বলাই।'

বাণ

প্রেমাঙ্কুর আতর্থী

রোহিলখণ্ডের রেলপথ দিয়ে আমাদের ট্রেনখানা ছুটে চলেছিল। কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি তখন প্রায় দ্বিপ্রহর। সন্ধের কিছু পর থেকে সেই যে ঝড়বৃষ্টি শুরু হয়েছে, তার আর বিরাম নেই। অন্ধকার দু-দিক থেকে যেন গাড়িখানাকে ঠেসে ধরেছে। দূরে কষ্টিপাথরের মতো কালো আকাশের গায়ে থেকে থেকে বিদ্যুতের কষ উঠছে আর মিলিয়ে যাচ্ছে। বাজের আওয়াজ আর বর্ষার অবিশ্রাম ঝরঝর ধ্বনির অন্ত নেই। দুর্যোগ— ভীষণ দুর্যোগ !

তৃতীয় শ্রেণীর ভাঙা গাড়ির সওয়ারি আমরা। জানালার ঝিলিমিলিগুলো নেই বললেই চলে। মাথার ওপরে যে আচ্ছাদন তারই অদৃশ্য অবকাশ বয়ে অবিরল জলধারা যাত্রীদের ভিজিয়ে দিচ্ছে। যাত্রীর দল এতেই সুখী। তাদের চারপাশের ভিজে পোঁটলাপুঁটলির মতো তারাও নেতিয়ে পড়ে সুখে নিদ্রা দিচ্ছে।

গাড়ি চলতে চলতে শেষরাত্রির দিকে জঙ্গলের মাঝে এক জায়গায় থেমে গেল। তারপর প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরে ভোঁ ভোঁ আওয়াজ করে সেও ঝিমিয়ে পড়ল। আর কোনো সাড়াশব্দ নেই। একমাত্র বৃষ্টির শব্দে বন মুখরিত, বজ্রধ্বনিও তখন থেমে গিয়েছিল।

সকালবেলা জানতে পারা গেল, বর্ষায় রেলের রাস্তা ভেঙে যাওয়ায় একটা ট্রেন উলটে গিয়েছে। যতক্ষণ না রাস্তা পরিষ্কার হচ্ছে, ততক্ষণ আমাদের গাড়িখানা নড়বার আর কোনো সম্ভাবনা নেই।

সংবাদটা শুনে যাত্রীরা হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। বিপদ যতই গুরুতর হোক না কেন, না-জানার অন্ধকারে পড়ে যাত্রীরা এতক্ষণ হাঁপিয়ে মরছিল, সংবাদটা এসে যেন তাদের মুক্তি দিলে। এবার তারা বেশ নিশ্চিন্ত হয়ে কবে কোন সালে কিরকম রেল দুর্ঘটনা হয়েছিল, তারই আলোচনা করতে লাগল।

ব্যাপারটা মন্দ লাগছিল না। রেলপথে চলতে চলতে দু-পাশের এইসব গাছপালা যারা চোখের সামনে দিয়ে শুধু পালিয়েই বেড়িয়েছে, আজ তাদের সঙ্গে নিবিড় পরিচয়ের সুযোগ মিলে গেল। আমি গাড়ি থেকে নেমে ওরই মধ্যে কাছাকাছি ঘুরে বেড়াতে লাগলুম।

বৃষ্টি তখন থেমে গিয়েছিল। বর্ষণধৌত নানান আভার সবুজের সমারোহ দেখে আমার রাতজাগা ক্লান্ত চোখ জুড়িয়ে গেল। দূরে একটা গাছে টকটকে লালফুল ধরেছিল, কি সে ফুল তা জানিনে, তবে তার মাথা অন্য সব গাছকে ছাড়িয়ে উঠেছে। মনে হতে লাগল, যে

সদ্যস্নাতা বনলক্ষ্মী সীমন্তে সিঁদুর পরে রোদে চুল শুকোচ্ছেন।

বনের মধ্যে কিছুক্ষণ ঘুরে গাড়িতে ফিরে এসে দেখি যে, যাত্রীদের মধ্যে বেশ একটু চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে। কে একজন সাহেব নাকি তাদের বলে দিয়েছে—এখুনি গাড়ি ছাড়বে।

আশায় আশায় বোধহয় দু-ঘণ্টা কেটে গেল। ক্ষুধা-তৃষ্ণায় যাত্রীরা কাতর হয়ে পড়তে লাগল। খাবার অথবা এক ফোঁটা জল কোথাও নেই। অনেক লোক গাড়ি থেকে নেমে হেঁটেই রওনা হতে শুরু করলে। দু-একজনকে জিজ্ঞাসা করে জানলুম— কাছাকাছি তাদের বাড়ি— এই দশ থেকে বিশ ক্রোশের মধ্যে। কাজের লোক তারা।

আমার কোনো কাজ নেই, কোথাও যাবার তাড়াও নেই। বসে বসে ভাবতে লাগলুম— কি করা যায়!

ক্রমে আমাদের কামরাও খালি হতে আরম্ভ করলে। একটি দুটি করে অধিকাংশ লোকই নেমে গেল। শেষকালে আমিও গাড়ি থেকে নেমে একটা দলের পেছন পেছন চলতে শুরু করে দিলুম। দেখাই যাক না— এরকম অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করবার সুযোগ হয়তো আর মিলবে না।

যাত্রীদের সঙ্গে ভিড়ে গেছি। রেলের রাস্তা থেকে নেমে গঙ্গার রাস্তা ধরা হয়েছে। হেঁটে হেঁটে সন্ধ্যার সময় আমরা একটা শহরের মতন জায়গায় এসে পৌঁছলুম।

সেটা একটা পুরনো শহর, নাম মনে নেই। বাড়িগুলো নিচু, দেখলেই মনে হয় যেন অনেক দিন আগেকার তৈরি। যাত্রীরা ঠিক করলে রাত্রিটা এখানকার সরাইয়ে কাটিয়ে সকালে আবার যাত্রা শুরু করা যাবে।

সরাইয়ে এসে যখন পৌঁছলুম, তখন অন্ধকার বেশ ঘোরালো হয়ে এসেছে। সরাইয়ের অবস্থা দেখে মনে হয় সেও যেন অনেক দিনের পুরনো। অনেকখানি জায়গা চওড়া দেওয়াল দিয়ে ঘেরা। সেই দেওয়ালের গায়েই ছোট ছোট ঘর। মাঝখানটা ফাঁকা— এই জমির স্থানে স্থানে আর ছাতের ওপরে বেশ ঘন জঙ্গল হয়ে আছে। ঘরগুলো অপরিচ্ছন্ন, কখনো সেখানে লোক বাস করেছে বলে মনে হয় না। বাজারে গিয়ে কিছু খেয়ে ওরি মধ্যে একখানা ঘর দেখে কম্বল বিছিয়ে শুয়ে পড়া গেল। পথশ্রমে শ্রান্ত দেহ কখন ঘুমের কোলে ঢলে পড়ল জানতেও পারলুম না।

ঘুম ভাঙতে বেলা হয়ে গিয়েছিল। উঠে দেখি যাদের সঙ্গে গিয়েছিলুম তারা যে যার গন্তব্যস্থানে চলে গিয়েছে। আমি ঘুরে ফিরে সরাইটার সঙ্গে ভালো করে পরিচয় করতে লাগলুম।

সরাইয়ের প্রকাণ্ড রাজবাড়ির মতন ফটক। কিন্তু তার রাজসিক ভাব আর নেই। রাজ্যহীন দরোয়ানের মতন শুধু সে দাঁত খিঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে মাত্র। অসংখ্য ঘর, অনেক ঘর ভেঙে পড়েছে। এই ভাঙা বেওয়ারিশ ঘরগুলোর বেরিয়ে-পড়া বরগার ওপরে কোনো রকমে একটু ছাউনি করে অনেক অনেক পরিবার স্থায়ীভাবে বাস করে। এদেরই অসংখ্য ছেলেপিলে মাকড়শার বাচ্চার মতো সরাইয়ে কিলবিল করে বেড়াচ্ছে। অসংখ্য কুকুর এখানে সেখানে বসে আছে। এদের হালচাল দেখে মনে হয় যেন এরাই এখানকার আসল মালিক। এক-একটা ঘরে কুক্কুরী চিৎকার করে বিরক্তি জানায়। তাদের ঘরও ভাঙা নয়, আস্ত। বলতে কি, এই মানুষ বাচ্চাগুলোর চেয়ে কুকুরের বাচ্চাগুলো সেখানে অনেক যত্নে আছে।

সরাই দেখা শেষ করে শহর দেখতে বেরুলুম। শহরের অবস্থা সরাইয়ের চেয়ে খুব

বেশি উন্নত নয়। ছোট ছোট ভাঙা নিচু বাড়ি, মাঝে মাঝে একটা আস্ত নতুন বাড়ি। এরাই এযুগের বড়োলোক অর্থাৎ রহিস্।

সে সময়ে সেখানে কিসের একটা মেলা বসবার আয়োজন হচ্ছিল। সন্ধান নিয়ে জানা গেল যে এ মেলা এখানে অনেক দিন থেকেই হচ্ছে, সেই সত্যযুগের কাছাকাছি সময় থেকে।

অনেক দিনের কথা। একবার পার্বতী ভোলানাথের সঙ্গে ঝগড়া করে মনের দুঃখে চলে এসে এইখানে এক গৃহস্থের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিলেন। গৃহস্থের মেয়ে ছিল না, তারা সেই সুন্দরী মেয়েটিকে দেখে নিজের সন্তানের মতন পালন করতে লাগল। ওদিকে কিছুদিন যেতে না যেতেই মহাদেব মহা মুশকিলে পড়লেন। খিদের সময় খাবার, মৌতাতের সময় কলকে, এসব দেয় কে! তিনি যোগাসনে বসে পার্বতীর খবরাখবর সব জেনে নিয়ে একদিন সেই কুটিরে এসে হাজির। পার্বতীর অভিমান তখনো ভাঙেনি। তিনি কিছুতেই যাবেন না, মহাদেবও ছাড়বেন না। শেষকালে সেই গৃহস্থ ও তার স্ত্রী পার্বতীকে বুঝিয়ে স্বামীর সঙ্গে যেতে রাজী করালে। ভোলানাথ তখন খুশি হয়ে গৃহস্থকে বললেন, তোমার কি চাই বলো?

গৃহস্থ এতক্ষণ কিছুই টের পায়নি। লোকটা বর দিতে চায় দেখে তার মনে খটকা লাগল। যা থাকে কপালে ভেবে সে বলে ফেলল, দেবতা যখন খুশি হয়েছ তখন তোমরা চিরকাল স্বামী-স্ত্রীতে আমার ঘরে এসে বাস করো। আমি প্রাণপণে তোমাদের সেবা করব।

মহাদেব তখন মহাপ্যাঁচে পড়ে গেলেন। কিন্তু তখন আর উপায় নেই, তাঁরা নিজেদের পরিচয় দিয়ে গৃহস্থের ঘরে রয়ে গেলেন। সেই থেকে আজ পর্যন্ত তাঁরা সেইখানে আছেন। যেদিন তাঁরা আত্মপরিচয় দিয়ে সেখানে বাস করতে প্রতিশ্রুত হয়েছিলেন, প্রতি বৎসর সেই তিথিতে সেখানে মেলা বসে ও প্রায় পনেরো দিন ধরে মেলা চলে। আশেপাশের প্রায় বিশ-পঁচিশ মাইল দূর থেকে লোকে এই মেলায় যোগ দিতে আসে। ক-দিন খুব ধুমধাম, নাচগান হয়।

দেবতাদের দেখতে গেলুম। পার্বতীর সেই সোনার বর্ণ কালি হয়ে গিয়েছে। মহাকালের স্পর্শে তাঁর সেই নবনীত দেহ পাথর হয়ে গিয়েছে।

মেলা আরম্ভ হতে তখনও দু-তিন দিন দেরি ছিল। মেলাস্থানে তখুনি দোকানপাট বসে গিয়েছে, চারদিক থেকে লোক আসছে। অনেক লোক মাঠে তাঁবু ফেলেছে। যাদের অবস্থায় কুলোয়নি তারা আকাশের তলাতেই বাস করছে।

সরাইয়ে ফিরে এসে দেখি সেখানেও মেলার সাড়া পড়ে গিয়েছে। এই কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সেখানেও অনেক লোক এসে জমেছে। সেদিনটা কোনোরকমে সেইখানেই কাটিয়ে দেওয়া গেল। পরদিন উঠে দেখি যে, সরাই একেবারে লোকে লোকারণ্য। শুধু ঘরগুলো নয়, মাঝখানে সেই ফাঁকা জমিতেও দলে দলে নর-নারী বসে দাঁড়িয়ে জটলা করছে। সকালবেলা আর কোথাও না গিয়ে আমি সেইখানেই ঘুরে-ফিরে দেখে বেড়ালুম।

দুপুর বেলা খেয়ে-দেয়ে দিবানিদ্রার আয়োজন করছি, এমন সময় আমার ঘরের কাছেই তুবড়ি বাঁশির শব্দ শুনে বেরিয়ে দেখি এক সাপুড়ে সাপ খেলাচ্ছে। প্রকাণ্ড একটা গোখরো সাপ বাঁশির সঙ্গে সঙ্গে দুলছে আর ফুলছে। আর একদিকে একটা লোক ভোজবাজি দেখাচ্ছে। খেলা দেখানোর চেয়ে লোকটার বক্তৃতা করবার শক্তি অদ্ভুত।

দুটো বন্ধ হয়ে গেল। চারদিকের লোকেরা কোলাহল করে উঠল— ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও, মরে যাবে। আমি আবার এগিয়ে গিয়ে তার একখানা হাত টেনে বললুম— এই ওঠো।

কিন্তু সে নিস্পন্দ হয়ে পড়ে রইল। ইতিমধ্যে ভিড় ভেঙে দু-চারজন লোক সাপুড়ের কাছে এসে দাঁড়াল। একজন তার চোখ টেনে পরীক্ষা করে বললে— মরে গেছে যে দেখছি।

কী সর্বনাশ! মরে গেছে! আমার দুই কানে যেন জাহাজের ভোঁ বাজতে লাগল।

ইতিমধ্যে সাপুড়ের চারদিকে রাজ্যের লোক এসে দাঁড়িয়েছে। মেয়েরা যারা ছিল তারা হায় হায় করতে আরম্ভ করে দিলে।

একবার মনে হল এই অবসরে লম্বা দিই। কিন্তু পা দুটো এত কাঁপতে লাগল যে নড়তে পারলুম না।

ইতিমধ্যে সেই মুরুব্বীগোছের লোকটা ভিড় সরিয়ে দিয়ে আমাকে বললে— পাজী, বদমাশ, এখুনি এ মার ছাড়িয়ে দে। নইলে আমরা তোকে মেরে খুন করব। দে ছাড়িয়ে।

আমি ধীরে ধীরে সাপুড়ের কাছে গিয়ে যেন মন্ত্র আওড়াচ্ছি এই রকম ভাব দেখিয়ে তার কানে কানে বললুম— বন্ধু হে, আর কেন? এইবার উঠে পড়ো। নইলে এরা আমায় প্রহার দেবে বলছে।

সাপুড়ে নির্বাক, নিস্পন্দ।

নিশ্বাস পড়ছে কিনা জানবার জন্য তার নাকের গোড়ায় হাত দিলুম, কিন্তু সেই দাড়ি-গোঁফের জঙ্গলের কোন্ ফাঁক দিয়ে নিশ্বাস বেরিয়ে যাচ্ছিল কিছুই বুঝতে পারলুম না।

ওদিকে সেই মুরুব্বী লোকটা মহা আস্ফালন শুরু করেছে— ওঠাও ওকে, নইলে কোতোয়ালিতে দেব।

অবস্থা ক্রমেই সঙ্কটাপন্ন হয়ে উঠতে লাগল। কেউ কেউ প্রস্তাব করলে— কোতোয়ালিতে দেবার আগে বেশ করে প্রহার দেওয়া যাক। আমি সেই মুরুব্বীটিকে একটু আড়ালে টেনে নিয়ে গিয়ে বললুম— এদের থামাও, নয়তো তোমারও বিপদ। মনে থাকে যেন, তুমিই টাকা দিয়ে খেলা শুরু করিয়েছিলে।

কথাটা বোধহয় তার মনে লাগল। সে তখনকার মতো সকলকে নিরস্ত করে আমায় বললে— কিন্তু এখনি ওর মার ছাড়াও।

আমি এবার সাপুড়ের বুকে কান দিয়ে পরীক্ষা করলুম। মনে হল যেন অতি ক্ষীণ নিশ্বাস পড়ছে। একজনকে বললুম— জল নিয়ে এসো।

তখুনি জল এসে হাজির, আমি মন্ত্র পড়ে তার চোখে জলের ঝাপটা দিতে লাগলুম। প্রায় দশ মিনিট চেষ্টা করার পর সাপুড়ে চোখ চাইল। চারদিকের লোকেরা জয়ধ্বনি করে উঠল। তাদের বললুম— একে তুলে আমার ঘরে নিয়ে চলো।

কয়েকজন এগিয়ে এসে তাকে তুলে নিয়ে আমার কম্বলে শুইয়ে দিলে। একজন তার বাঁক নিয়ে এসে ঘরের এক কোণে রেখে দিলে। আমি তখন ঘর থেকে সবাইকে তাড়িয়ে দিয়ে তার শুশ্রূষা করতে লেগে গেলুম।

কিছুক্ষণ বাতাস করবার পর সে যেন একটু সুস্থ বোধ করতে লাগল। আমি একজন লোককে ডেকে তার জন্য খানিকটা গরম দুধ আনতে পয়সা দিলুম। দুধ খেয়ে সে উঠে

বসল। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলুম, ব্যাপার কি বলো দিকিন। ওরকম করলে কেন? বলা নেই কওয়া নেই, আচ্ছা লোক তো তুমি!

সাপুড়ে গোঙাতে গোঙাতে বলল— কি করি বলো? ওরা বলতে লাগল— মিলে খেলছে, এ না করলে কি উপায় ছিল?

—আর একটু হলেই যে হাতে দড়ি দিয়েছিলে বাপু! উঃ, কী রক্ত!

সাপুড়ে বললে, লোক দেখাবার জন্য আমরা টাকরায় ঘা করে রাখি। খেলবার সময় বাঁশি দিয়ে তাতে খোঁচা দিলেই রক্ত বেরোয়। কি রকম বেমক্কা লেগে যাওয়ায় একেবারে বেহুঁশ হয়ে পড়েছিলুম।

আহা-হা কি কাজই করেছিলে। ইচ্ছে হল লোকটার গালে ঠাস করে একটা চড় কষিয়ে দিই। কিন্তু কি জানি বাবা, আবার যদি দাঁত খিঁচিয়ে পড়ে, এই ভয়ে সেই অভিলাষ সংবরণ করে তাকে বললুম— শুয়ে পড়ো।

সাপুড়ে শুয়ে পড়ল। রক্তপাতে তার শরীর খুব অবসন্ন হয়ে পড়েছিল। শুতে না শুতেই সে ঘুমিয়ে পড়ল। সমস্ত দিন ঘুরে ফিরে বিকেলে এসে দেখি তখনো ঘুমুচ্ছে। তাকে তুলে জিজ্ঞাসা করলুম— কিছু খাবে?

সে বললে, একটু খিচুড়ি খাওয়াতে পারো?

মনে হল, খিচুড়ি ছেড়ে তুমি এখন পোলাও খেতে চাইলে আমায় তাই খাওয়াতে হবে। উঃ, আজ কী ফাঁড়াই না কেটেছে।

তাকে বসিয়ে আবার বাজারে চললুম খিচুড়ির ব্যবস্থা করতে। রাত্রি আটটা কি নটার মধ্যে খিচুড়ি তৈরি করে তাকে খেতে দিলুম। তৃপ্তির সঙ্গে খেয়ে সে বললে— বেশ হয়েছে।

আমিও খেয়ে তার পাশে শুয়ে পড়লুম। সকালবেলা সাপুড়ে বললে— এবার আমি যাই।

কালকের টাকাপয়সাগুলো তার হাতে দিয়ে বললুম— হ্যাঁ যাও, আর কখনো এমন খেলা খেলো না।

সাপুড়ে বসে বসে পয়সাগুলো গুণে দুটো টাকা আর এক মুঠো পয়সা আমার দিকে এগিয়ে বললে— এই নাও তোমার বখরা।

কিন্তু তার সেই মুখ দিয়ে রক্ত ওঠা পয়সা ছুঁতে আমার প্রবৃত্তি হল না। আমি বললুম— ও আমি নেব না, তুমি নিয়ে যাও।

সাপুড়ে আশ্চর্য হয়ে বললে— কেন নেবে না?

আমি বললুম— ও তুমি নিয়ে যাও, তোমায় আমি দিচ্ছি।

সাপুড়ে এবার অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে বললে— আমার উপর নারাজ হয়ো না বাবু।

—না, না, আমি খুশি হয়ে তোমায় দিচ্ছি।

সে আর কথা না বলে পয়সাগুলো তুলে নিয়ে রাখলে। তারপর কোণ থেকে বাঁক তুলে কাঁধে ফেলে বললে— চললুম।

সাপুড়ে চলে গেল। বসে বসে ভাবতে লাগলুম— ওঃ, কী বাঁচনটাই বেঁচে গেছি। লোকটা মরে গেলে এরা তো আমায় ঠেঙিয়েই মেরে ফেলত। এদের হাত থেকে উদ্ধার পেলেও পুলিসের হাতে গিয়ে মরতে হত।

বিপদ একেই বলে—!

—গোড় লাগে বাবু!

মুখ তুলে দেখি এক বৃদ্ধ সস্মিত নেত্রে আমার সামনে দাঁড়িয়ে।

—তুমি কে বাবা?

আমি মুসাফির! তোমার পাশের ঘরেই থাকি।

বৃদ্ধ আমার কম্বলে বেশ জাঁকিয়ে বসলে। আমি তাকে বিশেষ আমল না দিয়ে এদিক ওদিক চাইতে আরম্ভ করে দিলুম। কিছুক্ষণ পরে সে বললে— বাবু সাহেবের বাড়ি বাংলা দেশে?

—হ্যাঁ।

—ঠিক হয়েছে, বেশ হয়েছে। তোমার সঙ্গে এসেছিল ব্যাটা চালাকি করতে।

—কার কথা বলছো?

—ঐ ব্যাটা দাগাবাজ, চোর, ঐ সাপুড়েটার কথা।

চুপ করে রইলুম। এ কথার আর কি উত্তর দেব। বৃদ্ধ আবার শুরু করলে— বাবু, এ বিদ্যে আপনি কতদিন শিখেছেন?

আমার হাসি পেল। বললুম— বেশি দিন নয়। এই পরশু সন্ধেবেলা।

আমার কথা শুনে বৃদ্ধ হেসে ফেললে। সে আবার কি প্রশ্ন করতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আগেই আমি জিজ্ঞাসা করলুম— তুমি বুঝি মেলা দেখতে এসেছ?

সে বললে— না বাবা, আমরা শহরে চলেছি। এখানে মেলা দেখতে এয়েছি।

সে বললে— আমরা গায়ক। শহরে ও মেলায় গান গেয়ে পয়সা রোজগার করি। ছ-মাস ঘরে থাকি ও চাষবাস করি আর ছ-মাস ঘুরে বেড়াই গান গেয়ে গেয়ে।

এ শ্রেণীর লোক এর আগেও আমি অনেক দেখেছি। জিজ্ঞাসা করলুম— তোমার স্ত্রী সঙ্গে আছে তো?

সে বললে— হ্যাঁ আছে।

আগের দিন সন্ধেবেলায় পাশের ঘরে একটি যুবতীকে দেখেছিলুম। বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা করলুম, ঐ বুঝি তোমার স্ত্রী?

সে বলে যেতে লাগল— দুই বিয়ে। বড়ো স্ত্রী ছেলেপিলে নিয়ে বাড়িতেই থাকে, আর তার বয়স হয়েছে ঘুরতেও পারে না। কাজেই তাকে আবার বিয়ে করতে হয়েছে।

সে আরও অনেক দুঃখের কাহিনী জানিয়ে বললে, তোমার মতো যদি কোনো গুণ জানা থাকত, তাহলে এত কষ্ট পেতুম না।

মনে হল বলি, বৃদ্ধ বয়সে ফাঁসি হত।

বৃদ্ধ কিছুক্ষণ কোনো কথা বললে না। বিমর্ষ হয়ে বসে রইল। আমি তাকে বললুম— দেখো, ভগবান তোমায় যা গুণ দিয়েছেন, তাতে বনের পশু বশ হয়। তুমি দুঃখ কোরো না, তুমিও গুণী।

বৃদ্ধ বললে— কিন্তু এ গুণে আমার পেট ভরে না। তুমি সাধু লোক, তুমি যদি দয়া করো।

আমার কি আছে বাবা! আমি গরিব— তোমার চেয়েও গরিব!

বৃদ্ধ এবার একটু হেসে বলে— তোমার কাছে যা আছে তার একটি কণাও যদি আমায় দাও, তাহলে—

অবাক করলে! কি চায় এ বৃদ্ধ আমার কাছে? আমি জিজ্ঞাসা করলুম— কি চাই তোমার বলো, আমার সাধ্য থাকলে দেব।

এবার সে একটু প্রফুল্ল হয়ে বললে— তোমার গুণ আমায় শিখিয়ে দাও। বেশি না,

একটুখানি।

বৃদ্ধ আমার হাত চেপে কাতরস্বরে বলে যেতে লাগল— তোমার ভালো হবে— আমি বলছি তোমার ভালো হবে। ঘরে আমার বাচ্চারা রয়েছে, তাদের পেট ভরে খেতে দিতে পারি না।

তার চোখ দিয়ে টসটস করে জল পড়তে লাগল।

আচ্ছা বিপদে পড়া গেল। এখন এ থেকে উদ্ধার পাই কি করে তাই ভাবতে লাগলুম। এদিকে বৃদ্ধের কান্নার বেগ বেড়েই চলেছে। শেষকালে তার হেঁচকি উঠতে আরম্ভ করলে। তার মুখ দেখে আমার ভয় হতে লাগল— এও কি সাপুড়ের মতন দাঁত খিঁচিয়ে পড়বে নাকি!

তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললুম— দেখো, এ বিদ্যে গৃহস্থকে শেখাতে মানা আছে। তুমি যাও, আমি এখন বেরুচ্ছি।

বৃদ্ধ ওঠে না। শেষকালে ওর হাত ধরে বের করে দিয়ে তখনকার মতন আত্মরক্ষা করলুম।

মেলায় ঘুরে ঘুরে সন্ধে অবধি কাটিয়ে ঘরে এসে রান্না চড়িয়েছি, এমন সময় মিঠে সুরে ডাক এল— বাবু সাহেব!

—কে!

মুখ তুলে দেখি সেই বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্যা চৌকাঠের কাছে দরজাটি ধরে দাঁড়িয়ে আছে।

আমি বললুম, ওখানে কেন? ভেতরে এসো।

তরুণী যেমন অবস্থায় ছিল ঠিক তেমনি অবস্থাতেই দাঁড়িয়ে রইল। সঙ্কোচে তার পা উঠছিল না। আবার বললুম, এসো এসো, দাঁড়িয়ে কেন? বসো।

এবার সে ভয়ভঙ্গুর ভঙ্গিতে এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করলে— কি রান্না হচ্ছে?

মনে মনে বললুম— তোমাদের মুণ্ডু। প্রকাশ্যে বললুম— খিচুড়ি, খাবে?

না, বলে সে কম্বলের উপর ধপাস করে বসে পড়ল।

বললুম— খাও না, বেশ রান্না হয়েছে।

সে বললে— না, তোমরা মাছ খাও।

—কে বলেছে?

—আমার স্বামী।

বোঝা গেল যে আমার সম্বন্ধে ইতিপূর্বে তাদের আলোচনা হয়েছে। এটাও বুঝতে পারলুম, রাত্রে আমার ঘরে এসে যে ভাব জমাবার চেষ্টা, এর মধ্যে অনেকখানি সেই বুড়োর কারসাজি।

মনে মনে সমস্ত ব্যাপারটার একটা হিসাব-নিকাশ করছি, এমন সময় তরুণী বলে উঠল— খুব জব্দ করে দিয়েছিলে তুমি সেই সাপুড়েটাকে।

এই কথা বলে সে হাসতে লাগল। হাসি আর থামে না। হাসতে হাসতে সে কম্বলের ওপর লুটিয়ে পড়ল।

আমি উনুনের ধারে বসে মজা দেখতে লাগলুম। তরুণী কোনোরকমে নিজেকে সামলে নিয়ে উঠে বসল, তখনও তার মুখে হাসি লেগে রয়েছে। সকালবেলা স্বামী এসে কাঁদতে শুরু করেছিল, রাত্রিবেলা স্ত্রী হাসতে শুরু করলে, ব্যাপার কি! আমি উনুনের কাছ থেকে উঠে তার কাছে গিয়ে দাঁড়ালুম। কাছে আসতেই সে মুখ তুলে আমার দিকে

চাইলে। সুন্দর তার মুখ, কিন্তু তার চেয়ে সুন্দর তার চোখ দুটি। অমন কালো আর অমন পরিষ্কার চোখ আমি আগে দেখিনি। সেই স্বচ্ছ চোখ দুটোর ভিতর দিয়ে তার অন্তরটা স্পষ্ট দেখা যেতে লাগল। আমি বললুম— জব্দ যে যার নিজের দোষেই হয়, কে কাকে জব্দ করতে পারে।

এবার সে আর কোনো ভনিতা না করে একেবারে বলে ফেললে— বাবু তোমার বিদ্যে আমায় একটু শিখিয়ে দাও না।

এইটেই আমি আশা করছিলুম। বললুম— মেয়েমানুষে এ বিদ্যে শিখতে পারে না।

সে বললে— তবে আমার স্বামীকে শিখিয়ে দাও।

—না, তাকেও শেখাব না।

তরুণী কোনো কথা না বলে আমার মুখের দিকে চেয়ে বসে রইল।

আমি বললুম— এবারে তুমি যাও। আমি খাব।

—তা খাও না।

—না, কারুর সামনে আমি খাই না।

অত্যন্ত অনিচ্ছায় সে উঠে চলে গেল।

তরুণীকে যে তার স্বামীই পাঠিয়ে দিয়েছিলে সে বিষয়ে আমার আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না। ওদের স্বামী স্ত্রীর মধ্যে এ সম্বন্ধে কি কথা হয় শোনবার জন্যে আমি আস্তে আস্তে তাদের দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়ালুম। আমি আসবার আগে বোধহয় দু-একটা কথা হয়ে গিয়েছিল। শুনলুম তরুণী বলছে, মেয়েমানুষের এ বিদ্যে হয় না।

বুড়ো জিজ্ঞাসা করলে— আমাকে শেখাবে না ?

তরুণী বললে— সে কথাও জিজ্ঞাসা করেছিলুম, কিছুতেই শেখাতে চায় না।

বুড়ো বললে— আবার যাবি, কিছুতেই ছাড়িসনি। দেখব তুই কেমন বাহাদুর।

তরুণী কিছু না বলে গুন গুন স্বরে গান শুরু করলে।

বুড়ো বললে— গান থামা। আমার কথা বুঝতে পারলি ? কাল সকালে যেমন করে হোক রাজী করাবি।

তরুণী বললে— আচ্ছা, আমি ঠিক করে নেব।

ঘরে ফিরে এসে মতলব আঁটতে লাগলুম। কালই এস্থান হতে লম্বা দিতে হবে। বেশি দিন থাকলে এখান থেকে প্রাণ নিয়ে ফিরে যাওয়া মুশকিল হবে।

পরদিন সকালে আসন তুলে সরাই থেকে সরে পড়বার মতলব করছি, এমন সময় একমুখ হাসি নিয়ে তরুণী আমার ঘরে এসে ঢুকল।

জিজ্ঞাসা করলুম— কি, অত হাসি কিসের ?

সে বললে— আমার স্বামী মেলাতে গেছে, তোমার সঙ্গে একটু দেখা করতে এলুম।

—বটে। এসো, ভেতরে এসে বসো।

কম্বলটা আবার বিছিয়ে দিলুম। তরুণী তার ওপরে বসে বললে— কোথাও বেরুবে নাকি ?

বললুম— হ্যাঁ, অনেক দিন হয়ে গেল এবার যেতে হবে।

তরুণী বললে— এরিমধ্যে কোথায় যাবে ? মেলা আগে শেষ হয়ে যাক, আমরাও চলে যাব, তুমিও চলে যেও।

—সে তো অনেক দিন। অতদিন থাকা আমার চলবে না।

তরুণী এবার একটা চোরা কটাক্ষ হেনে বললে— তবে যাবার আগে তোমার বিদ্যা

আমায় শিখিয়ে দিয়ে যাও।

ভাগ্যে আমার কোনো বিদ্যাই ছিল না, তা না হলে সমস্ত বিদ্যার বোঝা তখুনি সেই অতল কালো আঁখিসমুদ্রের কূলে নামিয়ে দিতে হত। বিদ্যা নাই বলে একবার আপসোসও হল, কিন্তু তখুনি মগজটাকে ঠিক করে তরুণীকে বললুম—দেখো, তোমার স্বামী তোমার উপর অত্যাচার করে ?

একটি চালেই তরুণী মাত ! তার ছলছল চোখ দুটো মুহূর্তের মধ্যে সজল হয়ে উঠল। সে বললে— মারে বাবু, বড্ড মারে।

—তুমি আবার তোমার স্বামীকে এই বিদ্যে শেখাবার কথা বলছ ! একবার শিখলে আগে সে তোমার ওপরে প্রয়োগ করবে। দেখেছো তো সেই সাপুড়ের অবস্থা।

আমার কথা শুনে ভয়ে তার মুখ শুকিয়ে গেল। সে বললে— ঠিক বলেছো তুমি, তা না হলে তার এ বিদ্যে শেখবার কি দরকার।

আমি বললুম— আমরা সন্ন্যাসী মানুষ, জঙ্গলে বাঘ, ভাল্লুক, সাপ কত রকমের জানোয়ারের সঙ্গে দেখা হয়, এ বিদ্যা জানা থাকলে আমার অনেক সুবিধা হয়।

তরুণী এবার সরে বসে মিনতির সুরে বললে— বাবু সাহেব, কখখনো তুমি ওকে শিখিও না। তা হলে আমার রক্ষে থাকবে না।

তাকে আশ্বাস দিয়ে বললুম— ক্ষেপেছ তুমি ? নিশ্চিন্ত থাকো, আমি ওকে কিছু শেখাব না। তরুণী তার ডান হাত থেকে আঁচলটা তুলে একটা দাগ দেখিয়ে আমায় বললে— এই দেখো মারের দাগ।

বললুম— আহা, বুড়োটা ভারি পাজী তো। সহানুভূতির কথা শুনে তার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল। সে একটু চুপ করে থেকে বললে— বাবু, তুমি আমায় নিয়ে চলো। আমাকে যেখানে নিয়ে যাবে, সেখানে যাব। যা করতে বলবে তাই করব— শুধু আমায় মেরো না।

আমি কোনো জবাব না দিয়ে তার মুখের দিকে চেয়ে রইলুম। সে আবার বললে— চলো বাবু, বুড়ো নেই এইবেলা চলো।

প্রমাদ গণতে লাগলুম ! এ যাত্রায় দেখছি কিছু না ঘটে আর যায় না। যেদিকে তাকাই সেদিক থেকেই একটা না একটা বিপদ এসে হাজির হয়।

সে আবার বললে— নিয়ে যাবে আমায় ?

তার মন ভোলাবার জন্য বললুম— গাইতে পারো ? সে বললে— পারি।

—একটা গান শোনাও না।

বলামাত্র একবার গলা খাঁকারি দিয়ে গান শুরু করলে।

সুন্দর তার গলা। আর কী অবলীলায় সে গাইতে লাগল ! সে গানের ভাষা এখন আর মনে নেই, তবে তার ভাব হচ্ছে— যমুনার দু-কূল ভরে মেঘের গায়ে ছায়া নেমেছে। দেবকীর কালো ছেলে সেই অন্ধকারে আত্মগোপন করে বাঁশি বাজাচ্ছে। রাধার কানে সে আকুল আহ্বান গিয়ে পৌঁছচ্ছে, বাইরে যাবার জন্য তার মন উতলা হয়ে উঠেছে। চারদিকে নিবিড় অন্ধকার, পৃথিবীতে কেউ কোথাও নেই, মিলনের এমন অবসর আর হবে না। কিন্তু রাধা যে পথ দিয়ে বাড়ি থেকে বেরুবে সেই পথেই তার গুরুজন বসে রয়েছে। কেমন করে সে অগ্রসর হবে ?

গানের প্রতি কথায় সে কী দরদ, সে কী আকুলতা !

গান চলেছে, এমন সময়ে তার স্বামী এসে উপস্থিত হল। স্বামীকে দেখে তরুণী গান

থামিয়ে ফেললে।

আমি বললুম— থামলে কেন ?

তরুণী যেমন হঠাৎ গান ছেড়ে দিয়েছিল, তেমনি হঠাৎ গান শুরু করলে। কিন্তু স্পষ্ট বুঝতে পারা যেতে লাগল, এ যেন সে গান নয়। গানের মধ্যে সে দরদ আর সে আকুলতা নেই। একটা দম-দেওয়া মানুষ-পুতুল যেন গেয়ে চলেছে।

গান থেমে গেলে একটা সিকি তাকে দিয়ে বললুম— এই নাও, তোমার গান শুনে আমি বড়ো খুশি হয়েছি।

সিকিটা তখুনি ফিরিয়ে দিয়ে বললে— আমি পয়সা চাই না, তোমাকে খুশি করতে পেরেছি, তাই আমার যথেষ্ট পুরস্কার।

এই বলে সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। আমি বৃদ্ধকে বললুম— তোমার স্ত্রীর গলা ভারী মিষ্টি, বেশ গান গায়।

বৃদ্ধ বললে— মন দিয়ে তো শেখে না, তাহলে ও এর চেয়ে ঢের ভালো গাইতে পারত। আমার বড়ো স্ত্রীর বয়স ওর চেয়ে দশ বছর বেশি হবে, কিন্তু ওর চেয়ে ঢের ভালো গায়।

আমি বললুম— ও!

বুড়ো উঠতে উঠতে বললে— বাবু, আমার ওপর দয়া হল না ?

তার কথার কোন উত্তর দিলাম না দেখে সে আস্তে আস্তে চলে গেল।

কম্বলটা গুটিয়ে রাখছিলুম, এমন সময় পাশের ঘর থেকে বুড়োর চিৎকার শুনতে পেলুম। তাড়াতাড়ি উঠে দরজার পাশে দাঁড়িয়ে শুনি, সে তার স্ত্রীকে বলছে— যা, পয়সা নিয়ে আয়। তরুণী কিছু বললে না।

বুড়ো বলতে লাগল, ভারি বদমাশ! এত করে বললুম কিছুতেই শেখালে না। ওর সঙ্গে আবার খাতির কিসের! যা এখ্খুনি যা।

সেখান থেকে সরে এলুম। একটু বাদেই তরুণী আমার ঘরে এসে ঢুকল।

প্রথমে আমি কিছু বললুম না। সে এসে দরজাটি ধরে চুপটি করে দাঁড়িয়ে রইল। একবার তার মুখের দিকে চেয়ে দেখলুম— সঙ্কোচে সে লাল হয়ে উঠেছে। কিন্তু কিছু বলতে পারছে না।

অবস্থাটা সরল করবার জন্য বললুম— কি ?

সে বললে, কিছু না! আজ রান্না করবে না ?

—না, আজ আর রাঁধব না।

আরও কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে সে চলে যাবার উপক্রম করছে দেখে আমি বললুম— তোমার পয়সা নিয়ে যাও।

—পয়সা! তোমার কাছ কাছ থেকে আমি পয়সা নেব না।

এরপরে আর কিছু বলতে পারলুম না। সে বললে— দেখো, তুমি যে চলে যাবে বলেছিলে, তা এখ্খুনি যাও না।

—কেন ?

এ কেন-র জবাব সে দিল না বটে, কিন্তু তার মনের কথা বুঝতে আমার দেরি হল না। কম্বলটা গুটোনোই ছিল। তখুনি সেটা বগলে নিয়ে উঠে পড়লুম। যাবার সময় আস্তে আস্তে আমার কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে বললে— আমায় মনে রেখো।

সরাই থেকে বেরিয়ে একটা চওড়া রাস্তা ধরে উত্তরমুখে পা চালিয়ে দেওয়া গেল।

লোকে বললে— এই পথ একেবারে দিল্লী অবধি গিয়েছে। জনহীন ধূসর পথ। দু-পাশে জঙ্গল, কোথাও নিবিড়, কোথাও ফাঁকা। এরই ভেতর দিয়ে আমার মন ক্লান্ত পা দুটোকে টেনে নিয়ে চলেছে মনেরই কোনো অজানা স্থানে। চলতে চলতে বেলা পড়ে এল। দূরের আবছায়াগুলো অন্ধকারে পা ফেলে ফেলে নিঃশব্দে আমার চারপাশে এসে জমতে লাগল। হঠাৎ এক ফোঁটা বৃষ্টির জল আমার রৌদ্রদগ্ধ তপ্ত দেহের ওপর পড়ায় চমকে উঠলুম। ওপর দিকে চেয়ে দেখি চিরবিরহী আকাশের নয়ন অশ্রুসজল হয়ে উঠেছে। আমার মনে পড়ল পেছনে ফেলে আসা সেই তরুণীর কথা, তার সেই অশ্রুসজল কালো চোখের কথা— যার সঙ্গে জীবনে আর কখনো দেখা হবার সম্ভাবনা নেই, অথচ এই চিরবিরহের ছলে যার সঙ্গে চিরমিলন হয়ে রইল, তার কথা।

চারদিকস্কার এই আলো-আঁধারের আবছায়া ভেদ করে তারই মৃদু কণ্ঠ আমার কানে এসে বাজতে লাগল— আমায় মনে রেখো।

ফুটবল মাঠে পণ্ডিতমশাই

হিতেন্দ্রমোহন বসু

ছেলেদের ফুটবল মরসুমের সেরা খেলা আজ— বয়েজ চ্যালেঞ্জ শিল্ডের ফাইনাল খেলা। ফাইনালে উঠেছে দক্ষিণপাড়া হাইস্কুল আর লালবাগ হাইস্কুল। গত বছরের ফাইনালে ভালো খেলেও দক্ষিণপাড়া প্রায় জেতা গেমটা হেরে যায়। বরাবর এক গোলে জিতে এসে শেষ মুহূর্তে কিনা তাদের গোলকিপার দু-দুটো গোল দিলে গলিয়ে— তার, ওর নাম কি,জোড়াঠ্যাঙের মাঝখান দিয়ে!

খেলার পর দক্ষিণপাড়ার ক্যাপ্টেন রমেন তাদের গোলকিপার নটবরকে লক্ষ্য করে বলেছিল— "ঢের-বহুত গোলকি দেখেছি বাবা— অমন থার্ডক্লাস একটা খুঁজেও দেখাতে পারবিনি! বলের সঙ্গে সম্পর্ক নেই, বাবু অজন্তা স্টাইলে পোজ মারছেন!" ছেলেদের মধ্যে কেউ কেউ বলেছিল— "আহা! অমন করে বলছিস কেন? ও ত' আর ইচ্ছে করে গোল ছাড়েনি।" উত্তরে রমেন বলেছিল— "যা যা! আমাকে আর শেখাতে আসিসনি। বলি ওই যে শিব-তাণ্ডব পোজখানা, সেটাও অনিচ্ছা করে নাকি? আর সত্যি কথা বলতে গেলে, তোদের জন্যেই ত' এমন হল। টিম বাছবার সময়ে গোলকিপার বাছা হবে— তোরা সবাই চ্যাঁচাতে লাগলি— নটবরের স্টাইলের কাছে আর কাউকে দাঁড়াতে হয় না। নটবর unanimous। বলেই সবাই দিলি হাত তুলে। এখন নে— স্টাইলের সঙ্গে দুটো গোল গুলে ধুয়ে খা!"

রমেনকে খুব বেশি দোষ দেওয়া যায় না। বেচারা জান কবুল করে খেলেছিল। যে গোলটা দক্ষিণপাড়া দিয়েছিল, সেটা রমেনেরই বিশেষ চেষ্টায় সম্ভব হয়েছিল। গোল দেবার পর বল যখনই রমেনদের গোলের দিকে গেছে, রমেন তার রাইট-ইন পোজিসন থেকে পেছনে হটে গিয়ে তাদের রাইট হাফব্যাক না হয় সেন্টার হাফব্যাককে সাহায্য করেছে। এত করে, আর একটা গোলে বরাবর এগিয়ে থেকে এসে, খেলা শেষ হবার ঠিক আগেই দু-দুটো বাজে গোল খেলে কার না রাগ হয়? সেই রাগের বশেই রমেন ওই রকম বলেছিল, নইলে নটবরের সঙ্গে রমেনের কোনও ঝগড়া ছিল না। কিন্তু এই ব্যাপারের পর দুজনের মধ্যে আগেকার মতন আর ভাব রইল না।

এ বছরের খেলোয়াড় নির্বাচন হয়ে গেলে পর টীমে নটবরের নাম না দেখতে পেয়ে, নটবরের বন্ধুদের মধ্যে কেউ কেউ তাকে জিজ্ঞাসা করেছিল— "কিরে নটু! টীমে তোর নাম দেখতে পেলাম না যে?" নটু একটু হেসে বলেছিল— "তা জানিস না বুঝি? এবারে আমাদের একজন ইন্টারন্যাশনাল গোলকিপার এসেছে যে! এ গোল থেকে বল মারবে ও গোল যাবে ফুটো হয়ে— ফরোয়ার্ডদের আর খেলতেই হবে না। হেঁ হেঁ, আশ্চর্য হয়ে

গেলি, নাকি ?" বন্ধুরা বললে— "তাই নাকি ! আমরা তবে রামবাগকেই চিয়ার আপ (cheer up) করব। রমেনের বড্ড বাড় বেড়েছে দেখছি ! ভারি ত ক্যাপ্টেন হয়েছেন, তাই বলে মাথা কিনে নিয়েছেন নাকি ! দেখে নেব আমরা !"

খেলার মাঠে খুবই ভিড় হয়েছে। অন্যান্য বছর হেড মাস্টার, সেকেণ্ড মাস্টার আর ড্রিল মাস্টার ছাড়া, মাস্টারদের মধ্যে আর কেউ বড় একটা খেলার মাঠে আসেনি। এবারে হেড মাস্টারমশায়ের বিশেষ অনুরোধে প্রায় সব মাস্টারই এসেছেন খেলা দেখতে। এমন কি, পণ্ডিতমশাই, যিনি ফুটবল খেলাটাকে ষণ্ডামি-গুণ্ডামিরই সামিল ধরে থাকেন, তিনিও হেড মাস্টারমশায়ের অনুরোধ এড়াতে পারেননি। মাঠে এসেই তিনি রমেনকে ডেকে একটু আড়ালে নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন— "বাবা রমেন্দ্র, আমাকে একটু বলে দাও তো বাবা—খেলার হার-জিতটা কেমন করে টের পাব।" যে ফুটবল খেলার কিছুই জানে না, এমন লোককে রমেন দুকথায় কি বোঝাবে ? সে বললে— "মাঠের দুদিকে দুটো করে খুঁটি পোঁতা আছে দেখছেন ? দুটো খাড়া, আর একটা কড়িকাঠের মতন— খুঁটি দুটোর মাথা ছুঁয়ে ? ওই ঘরটার ভেতর দিয়ে বল ঢুকলেই যারা ঘরটাকে সামলাচ্ছে তারা গোল খেলে। এই রকম করে যারা বেশি গোল খাবে তাদের হার হবে।" পণ্ডিতমশাই চোখ দুটো বড় বড় করে বললেন— "তাই নাকি ? তবে তো তোমাদের বিশেষ দৃষ্টি রাখতে হবে, যাতে করে তোমাদের খুঁটি দুটোর ভেতর দিয়ে বলটা কিছুতেই না গলতে পায়। আর তাহলে তোমার বিপক্ষদল তোমাদেরকে আর পরাজিত করতে পারবে না।— কি বল বাবা রমেন্দ্র ?" রমেন বললে— "আজ্ঞে, শুধু তাই নয়, বিপক্ষ দলের খুঁটির ভেতর দিয়ে বল চালিয়ে দিতে হবে আমাদের—নইলে খেলা জিতব কি করে ?" পণ্ডিতমশাই বললেন— "তা তো বটেই। ঠিক বলেছ বাবা রমেন্দ্র ; সুন্দর বলেছ। এই আমাকে যেমন বললে, তোমার অন্যান্য খেলোয়াড়দেরকে ঠিক তেমনি করে বুঝিয়ে বলে দাও বাবা। খেলা আমাদের জিততেই হবে, বুঝলে ?" "যে আজ্ঞা" বলে রমেন পাশ কাটিয়ে গেল।

তখনও খেলা আরম্ভ হতে কিছু বাকি। পণ্ডিতমশাই তাঁর লাঠিগাছটি নিয়ে সারা মাঠটা একবার ঘুরে দেখতে লাগলেন। একটা গোলের পেছনে দেখলেন, তাঁর স্কুলের সব ছাত্রেরা জড়ো হয়ে আছে। তাদের দেখেই বলে উঠলেন— "কি হে ! তোমরা সব এখানে একত্র হয়ে আছ ?" ছেলের দল বললে—"আজ্ঞে, আমাদের ইস্কুল যখন গোল দেবে এখান থেকে ভাল দেখতে পাব, আর তখন আমরা সবাই মিলে বাহ্বা দেব।" পণ্ডিতমশাই বললেন— "বেশ বেশ।" তারপর মাঠের অপর দিকটায় পৌঁছে দেখতে পেলেন, লালবাগ স্কুলের ছেলেরা সব জড়ো হয়ে আছে, আর তাদের মধ্যেই দেখতে পেলেন, নটু, হারু, দীপেন, নরেন আর মধুকে— যারা সব তাঁরই স্কুলের ছাত্র। তাদেরকে দেখে পণ্ডিতমশাই একটু আশ্চর্য হয়ে বললেন— "কি হে ! তোমরা সব এখানে ? তোমাদের দলকে তো দেখে এলাম, সবাই ওদিকটায় বসে আছে।" নরেন, মধু, এরা সব বলে উঠল— "আমরা ঘাঁটি আগলাচ্ছি। বল কাছাকাছি এসেছে কি আমরা আমাদের হরিচরণকে (দক্ষিণপাড়ার গোলকিপার) হুঁশিয়ার করে দেব— দেখি, কি করে রামবাগ গোল দেয়।" বলেই মুখ আড়াল করে হাসতে লাগল। "এ তো ভারি ভালো মতলব এঁটেছ তোমরা, দেখছি !— বেশ, বেশ।" বললেন পণ্ডিতমশাই।

এদিকে খেলা আরম্ভ হয়েছে। পণ্ডিতমশাই হঠাৎ দেখতে পেলেন, রামবাগের একজন

ফরোয়ার্ড বল নিয়ে এগিয়ে আসছে, আর তার পেছন পেছন দক্ষিণপাড়ার হাফব্যাক পন্টু ছুটছে। তারপর দেখলেন, রামবাগের ফরোয়ার্ডটা বলটাকে উঁচু করে দক্ষিণপাড়ার গোলের দিকে মারলে। বলটা উঁচু হয়ে গোলের দিকে আসছে, হরিচরণ সেটাকে ধরবে, এমন সময় নটুর দল 'টেক কেয়ার হরিচরণ টেক কেয়ার' বলে এক সঙ্গে ভীষণ চেঁচিয়ে উঠল। বলটা ধরা এমন কিছু শক্ত ব্যাপার ছিল না, কিন্তু ঠিক পেছন থেকেই আচমকা ওই রকম একটা চিৎকার শুনে হরিচরণ কেমন ঘাবড়ে গিয়ে বলটা একেবারেই ফস্কাল। নেহাৎ ভাগ্য ভালো বলতে হবে, সামান্যর জন্য গোল হল না। নটুর দল আবার চেঁচাল— "বা ভাই! well saved!" একে তো বলটা ফস্কেছে, তার ওপর নিজেদের দলের কাছে এই ব্যঙ্গোক্তি শুনে হরিচরণ মিনতির সুরে নটু-হারুদের বললে— "কেন অমন করে চেঁচাচ্ছিস?"

পণ্ডিতমশাই এই সব কথাবার্তা চলেছে দেখে এগিয়ে এসে নটুকে জিজ্ঞাসা করলেন— "কি হে, ব্যাপার কি?" নটু বললে— "এই দেখুন না স্যার! এখুনি তো একটা গোল খেয়েছিল আর কি! তাই বলতে গেলাম, একটু সাবধান হ'— তা বাবু রেগে কাঁই।" পণ্ডিতমশাই ফুটবলের কিছুই জানেন না, তবে এটা দেখেছিলেন যে, বলটা হরিচরণ ধরতে পারেনি। শুনতেও পেয়েছিলেন, অন্যেরা মন্তব্য করছে— যাঃ, খুব বেঁচে গেছে! তিনি ভাবলেন, হরিচরণের এই রকম অসাবধান হওয়া মোটেই উচিত হয়নি। আর নটু-হারু এরা হরিচরণের ভালোর জন্যই তাকে সাবধান করেছে। তিনি হরিকে বললেন— "কি হে? উচিত কথা বলছে, তাতে অত উষ্মা কেন? এখনি তো সর্বনাশ করেছিলে, আবার রাগ দেখাচ্ছ!" এর পর হরিচরণের মনের অবস্থা যা হল তা আর বলবার নয়। যে বলটা এগিয়ে ধরতে হবে, সেটার বেলায় হয় দাঁড়িয়ে থাকে নয়ত চার পা পেছিয়ে যায়। যেটা জায়গায় দাঁড়িয়ে পাওয়া যায়, সেটার বেলায় লাফিয়ে যায় এগিয়ে। ফলে বলটা আর ধরা হয় না। দক্ষিণপাড়ার ব্যাক, হাফব্যাক, ফরোয়ার্ড সবাই তো অবাক। এদিকে নটুর দল হরিচরণকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছে। সুবিধা বুঝে রামবাগের ফরোয়ার্ডরা দূর থেকেই উঁচু করে মারছে। একটা বল উঁচু হয়ে দক্ষিণপাড়ার একটা ব্যাকের পেছনে এসে পড়ব পড়ব হয়েছে; হরিচরণ যদি জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে তবে বলটা বুকের কাছে অনায়াসে ধরতে পারে। নটুর দল সমস্বরে চিৎকার করে উঠল— "Careful! Careful! save the goal!" সঙ্গে সঙ্গে লালবাগের ছাত্রেরা "গোল! গোল!" বলে চেঁচাতে লাগল। দক্ষিণপাড়ার রাইট ব্যাক পেছন ফিরে হরিচরণকে উদ্দেশ করে বললে— "take it!" হরিচরণ করলে কি, দিগবিদিক শূন্য হয়ে একটা লাফ মেরে এগিয়ে গেল। তার ফল হল এই— বলটি বিনা বাধায় হরিচরণের মাথার উপর দিয়ে গোলে গিয়ে ঢুকল!

ভয়ানক একটা গোলমাল শুরু হয়ে গেল। লালবাগের দল— 'গোল! গোল'! বলে চেঁচাচ্ছে— একটা রীতিমত হট্টগোল চলতে লাগল। তার উপর পণ্ডিতমশাই এসে বলতে লাগলেন— "ধিক্! বারংবার তোমাকে সাবধান করে দেওয়া সত্ত্বেও কর্তব্যে তোমার অবহেলা! এ অমার্জনীয়!" হরিচরণ তখন একটা ইঁদুরের গর্ত পেলে বেঁচে যায়, এমন অবস্থা। ভাগ্যে তখনি হাফ-টাইমের সিটি পড়ল! দক্ষিণপাড়ার খেলোয়াড়রা হরিচরণকে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলে যে, নটুর দল তাকে বিশেষভাবে উত্যক্ত করছে। পণ্ডিতমশাইয়ের উপদেশগুলিও তাকে বিশেষ সাহায্য করছে না। তখন রমেন, সমরেশ, বিল্টু, শিবু, এরা সবাই মিলে পরামর্শ করে ঠিক করলে যে, পণ্ডিতমশাইকে যেমন করেই হোক রামবাগের গোলের পেছনে আনতে হবে, নইলে হরিচরণের দফা রফা; সোজা বল

এসেছে কি গোল হয়েছে।

রমেন, সমরেশ, এরা কয়েকজন মিলে পণ্ডিতমশাইকে গিয়ে বলল— "পণ্ডিতমশাই, আপনি এবার রামবাগের গোলটার পেছন থেকে খেলাটা দেখুন। তার মানে, এতক্ষণ যে গোলটার পেছনে ছিলেন সেখানেই থেকে যান।" পণ্ডিতমশাই উৎকণ্ঠার সঙ্গে বললেন— "সে কি হে রমেন! তবেই হয়েছে আর কি! হরিচরণকে দেখেছ তো; এত সাবধান করছি— তাতেই কি করলে, দেখেছ তো! আমি অনন্যকর্মা হয়ে শুধু তাকে নিয়েই পড়ে আছি।" রমেনরা বললে— "আজ্ঞে, তা তো বটেই, কিন্তু এদিকে হয়েছে কি, একটা গোল তো খেয়ে বসে আছি। কমসে-কম দুটো গোল আমাদের দিতে হবে, তবে আমরা জিতব। আমরা যদি গোল দিতে না পারি, তা হলে ওই একটা গোলেই আমাদের হার হয়ে যাবে। আপনি যদি রামবাগের গোলটার পেছনে দাঁড়িয়ে আমাদের ফরোয়ার্ডদের উৎসাহ দিতে থাকেন, তবে যদি আমরা কিছু করতে পারি। এ ছাড়া আর ত উপায় দেখছি না; গেমটা হারই হয়ে গেল, যা দেখছি!" পণ্ডিতমশাই ব্যাকুল হয়ে বলে উঠলেন— "সে কি কথা! এ আর এমন কি! আমি তোমাদের কথামতো রামবাগের গোলের পেছনেই থাকব। কিন্তু ওই হরিচরণের ওপর দৃষ্টি রেখো তোমরা— আমি রইলাম তোমাদের ফরোয়ার্ডদের নিয়ে।"

নটুর দল চলেছে, হরিচরণের পেছনে থেকে গোলমাল করবে বলে। তাই না দেখে সমরেশ গিয়ে তাদেরকে বললে— "এই নটু! রামের বিভীষণ না হয়ে রামবাগের বিভীষণ হয়েছ! ভালো চাও তো যেখানে বসে এতক্ষণ খেলা দেখেছ, সেখানে যাও— নইলে খেলার পর তোমাদের একটিরও গায়ে হাড় আস্ত থাকবে না, বলে দিচ্ছি!" নটুর দল সুড় সুড় করে ফিরে গেল তাদের আগেকার জায়গায়।

সেকেন্ড হাফ আরম্ভ হতেই দক্ষিণপাড়ার ছেলেরা নতুন উৎসাহে খেলা শুরু করলে। রমেন বল পেলেই রামবাগের লেফ্‌ট হাফ-ব্যাককে তাপ্পি মেরে পাশ কাটিয়ে কে কোথায় আছে একবার দেখে নেয়। ওই অবস্থায় রামবাগের সেন্টার-হাফ-ব্যাক এসে রমেনের কাছ থেকে বলটা কেড়ে নেবার চেষ্টা করে। পেছন পেছন লেফ্‌ট ব্যাকও একটু এগিয়ে আসে। রমেনও তাই চায়। আর একটা তাপ্পি মেরে দ্বিতীয় হাফ-ব্যাককে পাশ কাটিয়ে সোজা লেফ্‌ট ব্যাকের দিকে এগুতে থাকে— ভাবটা এমন দেখায়, যেন ব্যাকের ডান পাশ দিয়ে সে বেরিয়ে যাবে। লেফট ব্যাক তাই না দেখে তার ডান দিক সামলাবার জন্য প্রস্তুত হতে থাকে— আর, সেই সুযোগে, রমেন বলটিকে সোজা ঠেলে দেয় তাদের রাইট-আউট হরেনের দিকে। খোলা ময়দানে বলটি পেয়ে হরেন দশ বারো পা এগিয়ে তাগ করে সেন্টার করে দেয়। ততক্ষণে রামবাগের গোলের সামনে দক্ষিণপাড়ার সমরেশ, শিবু, কেষ্ট এসে পৌঁছে গেছে— একটা তুমুল কাণ্ড বেধে যায় সেখানে।

এদিকে দক্ষিণপাড়ার কোনও ফরোয়ার্ডের কাছে বল এলেই পণ্ডিতমশাই চেঁচাতে থাকেন। শিবু একবার বলটা নিয়ে রামবাগের গোলের দিকে আসছে, তাই না দেখে পণ্ডিতমশাই ব্যাকুল হয়ে বলতে লাগলেন— "ও বাবা শিবু, নিয়ে এস বাবা বলটা!...এই যে আমি দাঁড়িয়ে আছি, ঠিক গোলের পেছনেই।...তুমি সোজা চলে এস আমার দিকে!...এই যে বাবা, লক্ষী বাবা—দাও, দাও, এবার দাও তো চালিয়ে এই খুঁটি দুটোর মধ্যিখান দিয়ে!...এঃ! একি করলে?...বলটা আবার ওদের দিকে দিলে কেন?...নাঃ, সব মাটি করে দিলে!"

খেলা এইরকম ভাবে চলতে চলতে হঠাৎ হরেনের একটা সেন্টার উঁচু হয়ে এসে পড়বি

তো পড় একেবারে রামবাগের লেফ্‌ট-ব্যাকের প্রায় মাথার উপর। লেফ্‌ট-ব্যাক চেষ্টা করলে বলটাকে কায়দায় আনতে— কিন্তু পারলে না ; বলটা তার মাথায় পড়ে উঁচু হয়ে বাঁক নিলে রামবাগের গোলের দিকে। ফাঁক বুঝে সমরেশ ছুটে গিয়ে মাথা ঘুরিয়ে একটা হেড দিলে ; বলটা গোলের এককোণ দিয়ে ঢুকে গেল। রামবাগের গোলকিপার কিছুই করতে পারলে না। দক্ষিণপাড়া হাই স্কুলের যত ছাত্র ছিল তারা সকলে মিলে মহা উল্লাসে চেঁচাতে লাগল। পণ্ডিতমশাই আনন্দে আটখানা হয়ে বলতে লাগলেন— "সাধু ! সাধু ! সোনার টুকরো ছেলে আমাদের সমরেশ ; আমার কথাটা রেখেছে !" কিন্তু তাঁর কথা তখন কে শোনে ? কোলাহলে তাঁর গলা চাপা পড়ে গেল।

গোল খেয়ে রামবাগ দক্ষিণপাড়াকে বেশ কিছুক্ষণ চেপে ধরলে। একটা কোণাচে শট হরিচরণ ঝাঁপিয়ে শুয়ে পড়ে কোনও রকমে দিলে করনার করে। মাঠসুদ্ধ লোক তারিফ করতে লাগল— 'Brilliant save! sure goal বাঁচিয়েছে !' হরিচরণের ওই রকম ঝাঁপিয়ে পড়ার বহর দেখে পণ্ডিতমশাই তো ভেবেই আকুল— "আহা ! গেল বুঝি ছোকরা মরেই। হাড়গোড় বোধকরি আর একটিও আস্ত নেই !" তারপর যখন দেখলেন, হরিচরণ উঠে দাঁড়িয়েছে তখন একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলে উঠলেন— "আঃ ! প্রাণপণ করে খেলছে আমাদের হরিচরণ— ভগবান তাকে রক্ষা করেছেন।" পণ্ডিতমশায়ের এতটা প্রশংসা নটু সহ্য করতে পারলে না। সে বললে— "ওটা কি আর হরে বাঁচিয়েছে ; ওটা স্যার আন্দাজে হয়ে গেছে !" পণ্ডিতমশাই ভয়ানক চটে গেলেন। বললেন— "বলো কি হে ? স্পষ্ট দেখলেম, সিংহবিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়ল আমাদের হরিচরণ, প্রাণ তুচ্ছ করে— আর তুমি বলছ আন্দাজে হয়ে গেছে !" দক্ষিণপাড়া হাই-স্কুলের যত ছাত্র ওইখানে বসে খেলা দেখছিলি, সবাই নটুকে বকতে লাগল— "যা যাঃ, আন্দাজওয়ালা ! গত বছর ইস্কুলটি তো ডুবিয়েছিলি ; এবারে টিমে পড়েননি বলে বাবু হিংসেয় ফেটে মরছেন ! ফের একটা কথা মুখ দিয়ে বেরিয়েছে কি দেব অ্যায়সা গাঁট্টাফাই করে !" নটু বেগতিক দেখে চুপ করে গেল।

রামবাগের সেন্টার ফরোয়ার্ড একটা বল নিয়ে দক্ষিণপাড়ার সেন্টার-হাফ তারাপদকে পাশ কাটিয়ে যাবার চেষ্টা করার সঙ্গে সঙ্গে তারাপদ হঠাৎ পাটা বাড়িয়ে দিয়ে বলটা কেড়ে নিলে। তারপর কে কোথায় আছে এক নজরে দেখবার জন্য যেমনি তাকিয়েছে, অমনি দেখতে পেলে, রমেন তাকে ইঙ্গিত করছে— বলটা রমেনের দিকে ঠেলে দেবার জন্য। তারাপদ বলটা রমেনকে দিয়েছে আর রমেন রামবাগের লেফ্‌ট হাফ-ব্যাককে পাশ কাটিয়েছে— এ ব্যাপারটা হয়ে গেল নিমেষেরই মধ্যে। এদিকে রামবাগের সেন্টার-হাফ এসে রমেনের পথরোধ করলে। রমেন তখন একটা নতুন চাল চাললে। করলে কি, পায়ের গোড়ালি দিয়ে বলটা দিলে পেছনের দিকে চালিয়ে। পেছনে একটু তফাতেই ছিল তারাপদ, সে একটা লাফ মেরে বলটা ধরলে—ততক্ষণে রমেন রামবাগের সেন্টার হাফ-ব্যাককে ছাড়িয়ে কিছু দূর গিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়েছে। ইঙ্গিত বুঝে তারাপদ একটা থ্রু-পাশ দিলে রমেনের দিকে। রমেন বলটা ধরে রামবাগের লেফ্‌ট ব্যাকের দিকে খানিকটা এগিয়ে গেল। তারপর দিলে সমরেশকে পাস করে। সমরেশ বলটা পেয়েই রামবাগের রাইট আর লেফ্‌ট ব্যাকের মাঝখান দিয়ে একটা থ্রু-পাস ঠেলে দিলে। ঝড়ের মতন ছুটে গিয়ে রমেন বলটাকে আবার ধরলে ; আর ধরেই সোজা চলল রামবাগের গোলের দিকে। এই অবস্থা দেখে দক্ষিণপাড়ার ছাত্ররা সমস্বরে চিৎকার করতে লাগল— "shoot! shoot!" গোল থেকে যখন পনের-ষোল হাত তফাত, তখন রমেন একবার রামবাগের

গোলকিপারকে দেখে নিলে। গোলকিপার তখনও ঠিক করে উঠতে পারেনি, চার্জ করবে কি না। গোলকিপারও চার্জ করতে যাবে এমন সময়ে রমেন বাঁ পায়ে বলটা মারলে গোলের বাঁদিকের কোণ টিপ করে। একবার হুমড়ি খেয়ে গোলকিপার চেষ্টা করলে বলটা ধরতে, কিন্তু বলটা তার নাগলে পেলে না। বাঁ-দিকের খুঁটি ঘেঁষে বলটা গোলে ঢুকছে, এমন সময়ে রামবাগের লেফ্‌ট ব্যাক পেছন থেকে ছুটতে ছুটতে এসে রমেনকে মারলে এক ভীষণ ধাক্কা! আমচকা ধাক্কা সামলাতে না পেরে রমেন মুখ থুবড়ে পড়ে গেল— বলটা কিন্তু তার আগেই গোলে ঢুকে গেছে।

"Foul! Foul! Penalty!" বলে চারদিকে সবাই চিৎকার করতে লাগল। রমেন মাটিতে পড়েই আছে, আর ওঠে না দেখে কয়েকজন ছেলে ছুটে চলে গেল তার কাছে— সঙ্গে সঙ্গে পণ্ডিতমশাইও গেলেন। একটা ভিড় জমে গেল। রেফারি খেলোয়াড় ছাড়া আর সবাইকে খেলার মাঠের বাইরে যাবার জন্য বলতে লাগলেন। কেউ বা গেল, কেউ বা গেল না। পণ্ডিতমশাই রমেনের গায়ে হাত দিয়ে কাঁদতে লাগলেন— "এ কি হল! এ কি হল!"

রমেনকে ধরাধরি করে খেলার মাঠের বাইরে আনা হল। পণ্ডিতমশাই রমেনের মাথাটি কোলে তুলে নিয়ে উৎকণ্ঠার সঙ্গে বলতে লাগলেন— "রমেন! বাবা রমেন! ওঃ! কি নিষ্ঠুরভাবে আঘাত করেছে·· পেছন থেকে কাপুরুষের মতন!···পশু! পশু!!"···এদিকে রেফারি 'পেনালটি' চিৎকারে কান না দিয়ে, হুইসল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন যে, গোলই হয়েছে। রামবাগের লেফ্‌ট ব্যাককে তিরস্কার করতেও ছাড়লেন না তিনি। দক্ষিণপাড়ার হেডমাস্টার এবং অন্যান্য মাস্টারেরা রমেনের কি হয়েছে দেখবার জন্য এসে পড়লেন। রমেন তখন উঠে বসেছে, আর সবাইয়ের প্রশ্নের জবাবে বলছে— "কিছু হয়নি আমার, মাথাটা একটু ঘুরে গিয়ে থাকবে— ও কিছু না।" হেডমাস্টার এসে জিজ্ঞাসা করলেন— "কি রমেন, এখন কেমন বোধ করছ?" "কিছু হয়নি স্যার" বলেই রমেন উঠে দাঁড়াল। ঠিক সেই সময়ে রেফারি একটা অফসাইডের জায়গা বাতলাবার জন্য রামবাগের গোলের কাছে এসেছিলেন। রমেন চেঁচিয়ে তাঁকে বললে— "আমি আবার খেলতে নাবছি।" রেফারি মাথা নেড়ে সম্মতি জানাতেই ছুটতে ছুটতে মাঠে গিয়ে ঢুকল রমেন। চারদিকে হাততালি পড়তে লাগল।

তারপর শুরু হ'ল এক নতুন কায়দায় খেলা! দক্ষিণপাড়ার খেলোয়াড়রা বল পেলেই লম্বা শট করে রামবাগের গোলের দিকে পাঠিয়ে দেয়, নয়ত বা সাইড লাইন দিয়ে আউট করে দেয়— উদ্দেশ্য, বাকি সময়টুকু আউট করে করেই কাটিয়ে দেওয়া; আর দিলেও তাই। কয়েক মিনিট পরেই 'খেলা-শেষ'-এর বাঁশি বেজে উঠল। আনন্দ-ধ্বনি আর হাততালির মধ্যে রমেন দক্ষিণপাড়ার হয়ে শিল্ড নিলে। তারপর বিজয়োল্লাসের পালা: Three cheers for দক্ষিণপাড়া হাইস্কুল hip, hip, hurrah! Three cheers for রামবাগ হাই স্কুল ইত্যাদি। দক্ষিণপাড়ার হেডমাস্টার একটু এগিয়ে এসে তাঁর খেলোয়াড় ছাত্রদের উপর এক নজর চোখ বুলিয়ে বললেন— এবার আমি একজনের জন্য cheer দিতে তোমাদের সকলকে অনুরোধ করব— "Three cheers for পণ্ডিতমশাই!" ছেলেরা আকাশ ফাটিয়ে "Hip hip, hurrah!" বলে তিনবার জয়ধ্বনি করলে। পণ্ডিতমশাই গদগদ স্বরে বারবার বলতে লাগলেন— "আমি তোমাদের সবাইকে আশীর্বাদ করছি বাবা। তোমাদের জয় হোক! তোমাদের জয় হোক!" তাঁর মুখে হাসি, চোখে জল।

সাইকেল রেস

মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়

শীতকালের বেলা। সেদিন শনিবার। ইস্কুলের তাড়াতাড়ি ছুটি হয়ে গেছে। মাণিক বাড়িতে এসেই একদৌড়ে মায়ের কাছে গেল।

দুপুরের খাওয়া শেষ করে মাণিকের মা রোদে পা রেখে কোলের উপর একগোছা পশম আর হাড়ের কাঠি দিয়ে মাণিকের জন্যে গেঞ্জি বুনছিলেন। সবুজ আর খয়েরি রঙের পশমের কারুকার্য— দেখতে ভারি সুন্দর হয়েছিল। হয়ত আর দুএক দিনের মধ্যেই বোনা শেষ হয়ে যাবে। গেল বছর শীতকালে এটা তিনি বুনতে আরম্ভ করেছিলেন ; কিন্তু মাণিক যখন ক্লাস প্রোমোশান পেল না, তখন রাগ করে বললেন, প্রোমোশান না পেলে মাণিক গেঞ্জিও পাবে না। সেই থেকে বোনা বন্ধ ছিল। এতদিন বাদে এটাকে আবার বোনবার একটা কারণ ছিল। গেল বছরের চেয়ে এ বছর মাণিক মাথায় লম্বা হয়েছে, গায়েও মোটা হয়েছে, আসছে বছর হয়ত আর গায়েই হবে না, তাই মা এটাকে তাড়াতাড়ি বুনে শেষ করে ফেলছেন। গায়ে যদিও একটু আঁট হবে, কিন্তু আজকালকার ছেলেদের আঁটসাঁট গেঞ্জি পরাই ফ্যাসান।

মাণিক তার খাতার ভিতর থেকে এক টুকরো ইংরেজিতে ছাপা কাগজ বার করে তার মায়ের হাতে দিলে, বললে—"এটাতে আমি নাম দিচ্ছি মা, তুমি বারণ করলে চলবে না।"

কলিকাতার রাস্তায় রবিবারে একটা সাইকেল-রেস হবে। যে প্রথম হবে, সে পাবে একটা রুপোর কাপ। মা কাগজটা পড়ে ভাঁজ করে টেবিলের উপর রাখলেন, তারপর বললেন— "দেখি তোর উইকলি রিপোর্ট।"

খাতার আর এক পাশ থেকে আর একটুকরো কাগজ বার করে মাণিক মায়ের হাতে দিলে। এ সপ্তাহের রিপোর্ট তার অত্যন্ত খারাপ, সারা সপ্তাহটা ব্যাট-বল খেলেই কেটে গেছে— পড়া হবে কোথা থেকে ?

মা রিপোর্টের তলায় সই করে দিয়ে গম্ভীর ভাবে বললেন— "ভালো রিপোর্ট দেখাতে না পারলে সাইকেল রেসে নাম দেওয়া হবে না।"

মাণিক তার মাকে খুব চিনত। কারণ গেল বছর পরীক্ষায় ফেল করবার পর যখন সে গোলদিঘিতে সাঁতার শিখতে চায়, তার মা কোন মতেই রাজি হননি। সকালে একঘণ্টা করে সাঁতার কাটা—মাণিক বলেছিল সে সময়টা সে রাত্রে বেশি করে পড়ে পুষিয়ে নেবে। তা ছাড়া সাঁতার শেখাটা তো কিছু খারাপ কাজ নয়। কিন্তু মা কিছুতেই মত দেননি। মাণিক আগেই অনেকটা এঁচে রেখেছিল মা কি বলবেন। মা তো বলে দিলেন রিপোর্ট ভালো না হলে নাম দেওয়া হবে না। সাইকেল রেস যেন তার রিপোর্টের

অপেক্ষায় বসে থাকবে। এই সব ভেবে সে ইস্কুল থেকে ফেরবার পথে সাইকেল ক্লাবে গিয়ে চার আনা পয়সা দিয়ে নাম লিখিয়ে এসেছিল। নিজের নাম বা ঠিকানা সে লেখায়নি, কারণ যারা রেস দেবে তাদের নাম কাল সকালে অমৃতবাজার পত্রিকায় ছাপা হবে। তাদের বাড়িতে যদিও অমৃতবাজার পত্রিকা আসে না, কিন্তু তবুও সাবধান হওয়া ভাল।

রবিবার দিন সকালে ভাত খেয়ে মাণিক চুপিচুপি বেরিয়ে গেল। তার বন্ধুর একটা সাইকেল সে জোগাড় করে রেখেছিল, সেইটা নিয়ে সে ক্লাবে গিয়ে উপস্থিত হল। বেলা তিনটের মধ্যে রেস খেলা প্রাইজ দেওয়া সমস্ত শেষ হয়ে যাবে। সেই সময় বাড়ি ফিরে গেলে মা কিছু জানতেও পারবেন না। যদি জিজ্ঞেস করেন কোথায় গিয়েছিলি, বললেই হবে অতুলদের বাড়ি 'ক্যারাম' খেলতে গিয়েছিলুম।

কিন্তু আজ যদি সে ফার্স্ট হয়? ফার্স্ট! সে কি হতে পারবে? মা তাহলে কখনই রাগ করবেন না। রুপোর কাপটা নিয়ে সে যখন মায়ের পায়ের কাছে রেখে দেবে, মা নিশ্চয়ই তাকে জড়িয়ে ধরে চুমু খাবেন।

সাইকেল রেস আরম্ভ হয়ে গেল। কলেজ স্ট্রিট, বৌবাজার, চৌরঙ্গি, ভবানীপুর, কালীঘাট। সেখান থেকে আবার ফেরা। রাস্তার মোড়ে মোড়ে ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে লোক দাঁড়িয়ে আছে। মাণিক সাইকেল নিয়ে চলেছে, বেশ আগে আগেই সে যাচ্ছে। শেষের দিকটা জোরে হাঁকিয়ে সে জেতবার চেষ্টা করবে, এই তার ইচ্ছে। এবারে ফিরতে হচ্ছে পার্ক স্ট্রিট দিয়ে। দিব্যি ফাঁকা রাস্তা— মাণিক গতি বাড়িয়ে দিলে। ওয়েলেসলি স্ট্রিট, ওয়েলিংটন স্ট্রিট, তারপর আবার বৌবাজারের মোড়! মোড়ে অনেক লোক দাঁড়িয়ে ছিল। ট্রামওয়ালা বাসওয়ালাদের তারা সাবধান করে দিচ্ছিল আস্তে হাঁকাবার জন্যে—যাতে সাইকেলের সঙ্গে ধাক্কা না লাগে।

শোঁ শোঁ করে দুটো সাইকেল বৌবাজারের মোড়ে এসে পড়ল। মাণিক ঠিক এরই পিছনে। অনেকক্ষণ থেকে এদের টপকে যাবার জন্যে সে প্রাণপণে চেষ্টা করছে কিন্তু পারছে না। মোড়ে এসে সামনের সাইকেল দুটো গতি কমিয়ে দিলে, কারণ একটা ট্রাম মোড় ঘুরছিল। ট্রামটা পেরিয়ে গেলেই তার ডান পাশ দিয়ে তারা বেরিয়ে যাবে। মাণিক কিন্তু তার সাইকেলের গতি কমালে না। সে বুঝলে এই একটা সুযোগ। সে বাঁ দিকে ঘুরে পড়ল। এইবার যদি সে চট করে ডান ধারে একটা মোড় ঘুরতে পারে, বাস্— তাহলেই সে সবার চেয়ে এগিয়ে যাবে। ট্রামের মুখের সামনে তার সাইকেল বিদ্যুৎগতিতে এসে পড়ল। তারপর পলকের মধ্যে সে ডানদিকে মোড় ঘুরল। কিন্তু এত জোরে আসছিল, যে সে আর সামলাতে পারলে না— পিছনের চাকাটা লাফিয়ে উঠল, সামনের চাকা পিছলে গেল। সাইকেল থেকে ছিটকে মাণিক গিয়ে পড়ল একেবারে ট্রামের লাইনের উপর! লোকজন চিৎকার করে উঠল। ট্রামগাড়িটা প্রায় ঘাড়ের উপর এসে পড়ল। মাণিক দেখলে ড্রাইভার প্রাণপণে গাড়ি বাঁধবার চেষ্টা করছে। একটা শক্ত কাঠের জালতির স্পর্শ সে তার গায়ের উপর অনুভব করলে। তারপর আর কিছুই সে জানে না!

মাণিকের মা রৌদ্রে পা রেখে পশম আর কাঠি নিয়ে তখনও সেই গেঞ্জি বুনছিলেন। বোনা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, হয়ত আর আধ ঘণ্টা লাগবে। এমন সময় মাণিকের এক মামা তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এলেন। ঘণ্টাখানেক আগে তিনি চৌরঙ্গির রাস্তায় দেখে এসেছেন পিঠে একটা নম্বরের টিকিট এঁটে মাণিক সাইকেল রেস দিচ্ছে। শুনেই মাণিকের মা ভয়ানক চটে উঠলেন।

গেঞ্জি বোনা তাঁর বন্ধ রইল। —"ছেলেটার আস্পর্দ্ধা দেখেছ ? লেখাপড়ার নামে খোঁজ নেই, কথা বললে কথা শোনে না, আবার মাকে ফাঁকি দিতে শিখেছে।"

চাকরকে তিনি একটা ট্যাক্সি ডাকতে বললেন। কাল মাণিক যে কাগজটা দিয়েছিল, তার থেকে সাইকেলের ক্লাবের ঠিকানা নিয়ে তিনি তাঁর ভাইকে সঙ্গে করে চললেন সাইকেল ক্লাবে। সেখানে পৌঁছেই শুনলেন মাণিক নামে যে ফার্স্ট হয়েছিল সে কাপ নিয়ে চলে গেছে! মা এতটা আশা করেননি। মাণিক ফার্স্ট হয়েছে! কাপ পেয়েছে! শুনেই তাঁর বুক আনন্দে ভরে উঠল। মাণিকের সব দোষ তিনি এক মুহূর্তে ক্ষমা করে ফেললেন। হয়ত মাণিক এতক্ষণে কাপ নিয়ে বাড়িতে তাঁকে খোঁজাখুঁজি করছে। ট্যাক্সি ঘুরিয়ে তখনই তিনি বাড়ি চলে গেলেন।

যে কাপ জিতেছিল তার নাম মাণিকলাল সেন, সে আমাদের মাণিক নয়! আমাদের মাণিক, যে বিজনবন্ধু ভট্টাচার্য বলে নাম লিখিয়েছিল আর ঠিকানা দিয়েছিল সাত নম্বর বাদুড়বাগান, সে মেডিকাল কলেজে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে। ট্রামের ধাক্কায় রাস্তার ঘর্ষণে তার দেহ ক্ষত বিক্ষত! বাদুড়বাগানে খবর দেওয়ায় এইমাত্র কয়েকজন লোক তাকে দেখতে এসেছিলেন কিন্তু তাঁরা তাকে চিনতে পারেনি।

মাণিকের মা বাড়ি গিয়ে দেখলেন মাণিক তখনো আসেনি! তিনি তাড়াতাড়ি আবার গেঞ্জিটা নিয়ে বসলেন। এটাকে শেষ করে আজই মাণিককে উপহার দিতে হবে। ক্রুসের কাঠি দ্রুত চলতে লাগল। পারেন তো মাণিক এসে পড়তে পড়তে এটাকে শেষ করে ফেলবেন।

একটু পরেই গেঞ্জি বোনা হয়ে গেল। সেটাকে ভাল করে ইস্ত্রি করে পাট করে মুড়ে রাখলেন। মাণিক তখনো এসে পৌঁছয়নি। তার বিকেল বেলাকার জলখাবার সময় হয়েছে। মা ভাবলেন, ছেলেটা এখনো এল না কেন ? নিশ্চয় বন্ধুদের দলে পড়ে দেরি করছে। মাণিক সুজির মোহনভোগ খেতে ভালবাসে। তার জন্যে গরম গরম মোহনভোগ করতে বসলেন।

মোহনভোগ করা শেষ হয়ে গেল! মামা বললেন— "আজকালকার ছেলেগুলো গুরুজনদের মান্য করতে জানে না। আমাদের সময়ে ছেলেরা প্রাইজ পেলে আগে বাপ-মার পায়ে প্রণাম করত।"

মা বললেন— "কি জানি। আমাকে লুকিয়ে নাম দিয়েছে তো ? ভাবছে বাড়ি এলে আমার কাছে বকুনি খাবে।"

শীতকালের সূর্য পশ্চিম দিকে হেলে পড়ল। মাণিকের মামা অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে করে শেষটা চলে গেলেন। মাণিকের মা গেঞ্জি কোলে নিয়ে মাণিকের পথ চেয়ে বসে রইলেন।

ক্রমে অন্ধকার ঘনিয়ে এল। গলিতে গ্যাসের আলো জ্বলে উঠল। মল্লিকদের ঠাকুর বাড়িতে শাঁক বাজল। মা ঘরের আলো জ্বেলে আবার বারান্দায় গিয়ে বসলেন! মাণিক তখনও ফেরেনি।

মা ভাবতে লাগলেন, ছেলেকে লেখাপড়ার জন্যে তো বকি, এত শাস্তি দিই, ওর কিন্তু কোন দোষ নেই। এক এক সময় ওর মুখ দেখলে সত্যি কষ্ট হয়। সকলকে তো আর ভগবান এক রকম করে গড়েননি। ওর খেলার দিকে ঝোঁকটা একটু বেশি। আচ্ছা, মানিক যদি চব্বিশ ঘণ্টা বই মুখে বসে থাকত মুখ গম্ভীর করে ? সে কেমন হত ? বিশ্রী! তার চেয়ে হাসি, খুশি, খেলাধুলো ঢের ভালো! নাঃ ওকে এবার থেকে আর একটু

খেলাধুলোর সুযোগ দিতে হবে। আর ও যদি চায়, সামনের গ্রীষ্মে সাঁতারটাও শিখে রাখতে পারে। লেখাপড়া করেই কি আর সকলে বড় হয় ? দৌড়-ঝাঁপ করেও তো কত লোকে জগৎজোড়া নাম করেছে। যার যেদিকে ঝোঁক। সুযোগ পেলে এই মাণিকই কি করবে কে বলতে পারে !

নিশ্চই বকুনি খাবার ভয়ে সে বাড়ি আসছে না। নাঃ, অনেক দিন ধরে কড়া হয়েছি, এইবার রাগ আলগা করতে হবে। বকুনি টকুনি কিছু দেব না, মাণিককে অবাক করে দেব একেবারে তাকে কোলে নিয়ে চুমু খেয়ে !

ঢং ঢং ঢং করে ঘড়িতে রাত্রি নটা বেজে গেল। আশ্চর্য ! এখনো মাণিক ফিরল না কেন ? কিসের তার এত ভয় ? তার মা যে নিজের হাতে পশমের গেঞ্জি বুনে, মোহনভোগ করে তার পথ চেয়ে বসে আছেন, তা তো সে জানে না— জানলে এতক্ষণ হয়ত ছুটে চলে আসত !

তালে তালে পা ফেলে রাত্রি এগিয়ে চলল। ঘড়িতে দশটা বেজে গেছে। এগারোটাও বাজে বাজে। সামনের গলিটা নির্জন হয়ে উঠছে। চারপাশের গোলমাল কমে আসছে। পাশের বাড়ির সমস্ত আলো একে একে নিভে গেল। কেবল গলির এক প্রান্তে ঘোষেদের বৈঠকখানা ঘরে সখের থিয়েটার পার্টির পুরো দমে তালিম দেওয়া চলছিল— তারই শব্দ মাঝে মাঝে কানে আসছে। মাণিকের শোবার ঘর থেকে ত্যারচা ভাবে একফালি ইলেকট্রিকের আলো এসে বারান্দায় পড়েছে। মাণিকের মা ক্যাম্বিশের চেয়ার হেলান দিয়ে গেঞ্জিটা কোলে নিয়ে চুপ করে তখনো বসে রয়েছেন।

ভৌতিক টুর্নামেন্ট

আবুল বাশার

ফুটবলের মরসুম এলেই নিবারণের খানাপিনা ঘুম লেখাপড়া সব মাথায় ওঠে। তখন তার ভর-লাগা রুগীর মতো আচ্ছন্নের দশা। গ্রামের টিমের ক্যাপ্টেন চিদাম্বরের কাছে ককিয়ে-ককিয়ে একখানা ফিক্সচার জোগাড় করে এনে পড়ার ঘরের দরজায় গঁদের আঠা দিয়ে সেঁটে নেয়। তারপর জুত মতন বসেছে কি না দেখবার জন্য দরজার পাল্লা লাগায় আর খোলে। ঘরের দুটি পাল্লাই দেখতে-দেখতে ছেয়ে যায়। সে বহরমপুর একাদশের ফিক্সচারও সাইকেল হাঁকিয়ে গিয়ে একা-একা আদায় করে আনে। গত বছর সকাল সাতটায় গিয়ে ক্লাবের মাঠে সিমেন্টের বেঞ্চে দুপুর নাগাদ কৃষ্ণচূড়ার ছায়ায় বসে থেকে সেই ফিক্সচার জোগাড় করেছে। বহরমপুরের ক্লাবের সম্পাদক ওকে দেখেই অবাক হয়। ছেলেটার আসা-যাওয়ার দম ভাল, নিষ্ঠাও যথেষ্ট, চারদিক ঘুরে গেছে খালি একখানা ফিক্সচারের আশায়। কিন্তু দমেনি। কোন ভোরে বেরিয়েছে কে জানে। বলতে-বলতে সম্পাদক তালা খোলেন। ফিক্সচার বার করেন।

এইভাবে নিবারণ প্রচুর ফিক্সচার জড়ো করে সাঁটে। আর সেঁটে রাখে কাগজ কেটে বসানো বিভিন্ন খেলোয়াড়ের ছবি। রঙিন বা কালো-সাদা। এইভাবে পাল্লা দুটি মরসুমের শুরুতেই ছয়লাপ হয়ে যায়। মা কেবলই বলেন, "দ্যাখো ছেলেব পাগলামো! ওইসব ফোটো সেঁটে কী হবে, নকশা সেঁটে কী হবে!"

"হবে। হবে। তুমি দেখে নিও।" নিবারণ বিড়বিড় করে বলতে থাকে।

বউদি বলেন, "তোমার কেবল মুখে। কেউ তো তোমায় নেয় না।"

"নেবে। নেবে। সময় হলেই নেবে।"

বুড়ো মানুষের মতো বয়স্ক গলায় নিবারণ কথা বলে। সে যে গ্রামের টিমেই যোগ্য একটা চান্স পাবে সে সম্পর্কে তার কোনও সংশয় নেই। তবে কিনা সে গঞ্জের টিমে জায়গা পায় কি না তারই তদ্বিরে তক্কে-তক্কে আছে। নিমাই-মাস্টারমশাই তাকে ডেকে দু দিন কথা বলেছেন। উনিই ওই গঞ্জের টিমের সেক্রেটারি। বলা যায় না, চান্স একটা পাওয়া গেলেও যেতে পারে।

মরসুমের শুরুতেই এ-বছর, তখনও খেলা শুরু হয়নি, হব-হব করছে, চিদাম্বর নিবারণকে ডাকল এক ভোরবেলা। চিদাম্বর ক্যাপ্টেন যেরকম, ক্লাবের সেক্রেটারিও বটে। খুব গুণী আর করিৎকর্মা। বলল, 'খেলা তো এসে গেল নিবারণ। ফিক্সচার ছাপা হয়ে গেছে। কাল একবার আসবি। কাজে নামতে হবে।" নিবারণ মুখ কাঁচুমাচু করে বললে, "আজ্ঞে, অম্বরদা, পায়ে ভয়ানক ব্যথা। সাইকেল চালাব কী করে?"

"কেন রে ! পায়ে কেন ব্যথা হল তোর ? তুই তো নস্করবাড়ির খড়কুটোটাও নড়াস না, একখানা কুটো দুখানা করিস না, পায়ের ওপর পা তুলে খাস, তোর কেন ব্যথা হবে। খানাখন্দে পা হড়কেছিল বুঝি ?" শুধাল চিদাম্বর মুখুজ্যে আর চোখ বড়-বড় করে নিবারণের দিকে চাইলে। ভারী ব্যক্তিত্বের লোকেরা প্রশ্ন করার পর ওইভাবে চোখ বিস্ফারিত করে।

নিবারণ চোখে লজ্জা ফুটিয়ে আধো-আধো সুরে বললে, "আজ্ঞে, অম্বরদা, কী বলব। ইয়ে···সে ভারি লজ্জার কথা···মানে একটা স্বপ্ন আর কি, তাইতেই পাখানা চমকাল।"

চিদাম্বর ভয়ানক আশ্চর্য হয়ে নিবারণের সলজ্জ মুখের দিকে চেয়ে থাকল কিছুক্ষণ। নিবারণ আরও লজ্জা পেয়ে বলল, "আজ্ঞে হ্যাঁ। ঘুমের মধ্যেই আমার পা গোলকিক করল, কী করব ? স্বপ্ন, তা কী করে বুঝব ? প্রচণ্ড খেলা চলছে, সেমিফাইনাল খেলা। আমি সেন্টার ফরোয়ার্ড দাঁড়িয়েছি, সারা মাঠ চষে খেলছি, বুঝলেন ?"

চিদাম্বর প্রশ্ন করল, "সে না হয় বুঝলাম চষে বেড়াচ্ছিস ! কিন্তু খেলাটা কার সঙ্গে ? কোন টিম ?"

"আজ্ঞে কেন ? হুড়সি। কালিকাপুর হুড়সি !" সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেয় নিবারণ।

চিদাম্বর উল্লসিতভাবে পায়ের দাবনায় আপন মনে থাবা মারল নিজের। বলল, "তাই বল ! টিমের নাম বলবি তো ! হ্যাঁ রে, হুড়সির গোলে কে দাঁড়িয়েছে ?"

"কেন, ওসমান খাঁ।"

"আহা ! ওসমান তো বুঝলাম। কিন্তু কোন ওসমান ? কালো ওসমান, নাকি সাদা ?"

"কেন, কুট্টি ওসমান।"

"হেঃ হেঃ ! তাই বল।"

আবার দাবনায় থাবা মেরে নেচে ওঠে চিদাম্বর। বলে, "কুট্টি ওসমান ! সে-কথা বলবি তো ? হ্যাঁ, তারপর ? ওই এক গোলকিপারের জোরে ওরা বরাবর উইন করে যাচ্ছে। নইলে সেমিফাইনালেও যায় না ওইরকম উইক টিম। কী আছে ওদের ? না একটা ভাল ফরোয়ার্ড, না কিছু। গোলে বল মারবে লোক কোথা ! হ্যাঁ বল, তারপর কী হল।"

নিবারণ বলল, "গত বচ্ছর ওই কুট্টিই বেড়ার মতো সব বল আগলেছে। নইলে ভাল-ভাল চান্স পেয়েছিলাম আমরা। একটা মানুষ যদি পাহাড়ের মতো দাঁড়িয়ে থাকে ! দু-দুটো কর্নার কিক পেলাম, কী হল ?"

"হবে কী করে ? আমাদের কারও মাথা আছে ? দর্শকরা কতবার 'হেড', 'হেড' করে চেল্লাল দেখেছিস, কিন্তু কোথায় হেড। খেলার সময় সব মাথা হেঁট করে কর্নার কিক রিসিভ করে, একেবারে আলকাপের মেয়ে, এক-একটা খেলছে না তো নাচতে নেমেছে ! লজ্জায় মাথা তোলে না। এভাবে চলবে না নিবারণ। আমি চাই স্পোর্টসম্যান স্পিরিট। সেটা কারও নেই।"

"খেলা তো ভাতজল নয়।"

"না। একমন না।"

এই অবধি বলে চিদাম্বর গম্ভীর হয়ে যায়। তার চোখ ছলছল করে ওঠে। তারপর ভারি গলায় বলে ওঠে, "বলছি বটে, কিন্তু ওই ভাতের জন্যই গ্রামের খেলা মরে যাচ্ছে। ছেলেরা চাষের জমি আগলাবে নাকি খেলার মাঠ আগলাবে বল তো নিবারণ। সব তো চাষিঘরের ছেলে।"

নিবারণ বলল, "আমাদের সিধের কথাই ধরুন, কত ভাল খেলে, ওর হত ! গত বচ্ছর হুড়সির খেলায় ও তো যেতেই পারল না।"

"পারবে কী করে ? কুট্টি ওসমান একমাত্র সিধেকেই ভয় পায়। সিধে যায়নি দেখে হুড়সির টিম একেবারে লাফিয়ে উঠল। হলও তাই। আমরা হেরে গেলাম। খেলার দিন সিধে কী করছিল শুনবি ? ও পটলের জমিতে নিড়ুনি দিচ্ছিল আর আমি খেত পর্যন্ত ধাওয়া করলাম দেখে সিধে কী বলল বল তো ? বলল, তুমি টিম নিয়ে চলে যাও, আমি আসছি। ব্যস। হয়ে গেল।"

চিদাম্বরের চোখ আরও বেশি ছলছল করে উঠল। সে বসে ছিল ক্লাবের মাঠে চেয়ার পেতে, ইজিচেয়ার। চিত হয়ে শুয়ে নিবারণের কথা শুনছিল। নিবারণ বসে ছিল ওর পায়ের কাছে। বাইরে চিদাম্বর কড়া হলেও ভিতরে নরম। গাঁয়ের টিমের জন্য ওর দরদের তুলনা হয় না। নিবারণ ভাবছিল চিদাম্বরের নরম মনের ভেতর দিয়ে একেবারে হৃদয়ে ঢুকে যাবে। একটা চান্স সে চায়।

নিবারণ বলল, "সিধে আর গেলই না।"

অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল চিদধম্বর। নিবারণের কথায় সংবিৎ ফিরে পেল। বলল, "যাবে কী রে ! আমিই তো রেগে গিয়ে বললাম, থাক তোকে আর খেলতে যেতে হবে না। ছেলেটার চোখের পাতা সঙ্গে-সঙ্গে ভিজে উঠল। আসলে ওর বাপের ভয়ে জমিতে এসে নিড়ুনি করছে, এমনিতেই মন খারাপ, তারপব আমার কথার আঘাতটা তো কম নয়, ক্যাপ্টেন বলছে। আর এমনিই তাচ্ছিল্য করে বলছে, কোনও সিমপ্যাথি নেই। স্বাভাবিক, চোখে জল তো আসবেই। কিন্তু তখন আমার মাথারও ঠিক ছিল না।"

"মাথার কী দোষ। তোমাকে তো কম কষ্ট করতে হয় না।"

"কী করব বল ? দেশের লোকের কাছে আমি খুব খারাপ হয়ে গেছি। কেউ কেউ আমার পেছনে কী বলে জানিস, আমি ছেলেধরা। আমার বাপ ছিল ছেলেধরা। অথচ আমার বাপ স্বর্গত নীলাম্বর মুখুজ্যে ছেলেধরা ছিল বলেই ইস্টবেঙ্গলের শ্রীনিবাস গত লিগে অত বড় টিমের উজ্জ্বত রেখেছে। শ্রীনিবাস কোথাকার ছেলে বল তো ? জানিস বইকী ! আমাদের এই তেঁতুলিয়া গাঁয়েরই ছেলে। তারপর ধরো বিদেশ ?"

"হ্যাঁ, এখানকারই।"

"তবে ? অথচ আমি ছেলেধরা। ঘরের মায়েরা আমাকে দেখলে ভর্ৎসনা করে, ঘোমটা টেনে অভিসম্পাত দেয়। আমি যেন শত্রু। আমার বাবা ওই শ্রীনিবাসকে গড়েছিল, নিজে হাতে। আর আজ ? নুরুলকে ওর সংসার পরিবার জবাই করে দিলে। ও কলকাতার বাটায় চান্স পেয়েছিল। গেল না। কত কষ্ট করে একটা চান্স আসে, কেউ তো জানে না। হয়তো আগামী দশ বছরে আর-একটা নুরুল তৈরি হবে না। বহরমপুর একাদশে গত দশকে একটা নুরুল গড়ে ওঠেনি। এই তেঁতুলিয়ার ছেলে নুরুল। যাকগে !"

চিদাম্বর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "বল নিবারণ ! তারপর কী হল ?"

নিবারণ বলল, "টস করে খেলা শুরু হয়েছে। কুট্টিদের টিম দাঁড়িয়েছে হরীতকীবাগানের দিকে। আমি বল নিয়ে ছুটছি, পাঁচ-পাঁচটা প্লেয়ারকে কাটালাম, একেবারে গোলের কাছে চলে গিয়ে যেই ধাঁ করে বল মারা, কুট্টি একেবারে কী বলব, বাঘের মতো লাফিয়ে পড়লে আমার পায়ের ওপর। বলসুদ্ধো সেই পা আর কিছুতে ছাড়ে না। আসলে হল কী জানলে চিদাম্বরদা, আমার তখন বোবায় ধরা অবস্থা— শুয়ে ছিলাম

দড়ির খাটে, পা আটকে গেল !”

চিদাম্বর খলখল করে হাসতে লাগল। বুঝতে পারল ঘুমের মধ্যে স্বপ্নে খেলা করেছে নিবারণ। গোলে বল মারল আর দড়ির খাটের ফাঁকে পা ঢুকে যাওয়ায় সে ঘুমের মধ্যে কুঁই-কুঁই করে কেঁদেছে, কারণ কুট্টি ওসমান ওকে ধরেছে, বোবায় না ধরে যায় কোথা। বোবায় ধরা আর কুট্টির ধরা সমান কথা। চিদাম্বর শুধাল, “তারপর ? বোবায় ধরল তোকে ? কোন পা ?”

“ডান পা।”

“পা তো তোর একখানাই। বাঁ পায়ে তো বল ছুঁতেই পারিস না। এগুলো দোষ। বুঝলি নিবারণ, এভাবে হয় না। আমি চাই চৌকস খেলোয়াড়। কারও ডান আছে তো বাঁ নেই। কারও বাঁ আছে তো ডান নেই। কারও ডান-বাঁ দুই-ই আছে বটে, কিন্তু মাথা নেই। এভাবে চলে না। গত বছর বসন্তপুরের খেলায় ড্র হল কেন। তোমার মাথার দোষে। মাথা চালানো পাকা মাথার কাজ। মাথা নড়ানো আর মাথা চালানো আলাদা জিনিস। তুই কী করলি ? কর্নার বাঁচাতে গিয়ে দর্শকদের ‘হেড’ ‘হেড’ চিৎকার শুনে বল দিয়েছিস গুঁতিয়ে, ব্যস হয়ে গেল। মাঠে চাষিরা মাথাল (টোকা) ওড়াতে লাগল। ফলে এক্সট্রা লিস্টে তোমার তেরো নম্বরে নাম ছিল, উঠে গেল চোদ্দয়।”

গত বছর নিবারণ এক্সট্রা লিস্ট থেকে খেলার শেষ পাঁচ মিনিট খেলতে সুযোগ পেয়েছিল, কিন্তু দলের মুখে কালি পড়েছে। হেড করে সে নিজেদের গোলে বল ঢুকিয়ে দিয়েছে। চাষিরা কাজ থেকে ফিরছিল। খেলার মোহে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে খেলা দেখতে শুরু করে। তারাই ব্যঙ্গ করে মাথাল উড়িয়ে দিলে। নিবারণের চোখের সামনে সেই দৃশ্য ভাসছে।

নিবারণ অধোমুখে বলল, “হয়ে গেল, কী আর করব বলো ? রিয়েলি, ওই নাম্বার থাট্রিন (থার্টিনকে নিবারণ থাট্রিন বলে) খুব আনলাকি। তুমি আমাকে টুয়েলভ অন্তত করে দাও অম্বরদা। এবার কুট্টি আমার পা ছোঁয় কী করে দেখে নিও। আমি বাঁ পায়েও প্র্যাকটিস করছি।”

“কর। তারপর দেখা যাবে। তুই তো নিমাই-মাস্টারের পিছু-পিছু ঘুরছিস শুনেছি। ও করে কিছু হয় না নিবারণ। মনে রাখবি ফেলিওর ইজ দ্য পিলার অব সাকসেস। খেটে যা। কাল একবার তোকে মধুরকুলের কুঠিতে যেতে হবে সনাতনের কাছে। একখানা চিঠি আর ফিক্সচার নিয়ে যাবি। সাইকেল মেরে যাবি আর আসবি। পায়ে ব্যথা হয়েছে এ-কথা কে বলে ? কোনও খেলোয়াড় বলে না। তারপর ?”

নিবারণ বলল, “বোবায় ধরেছে মনে করে বউদি এসে গা নাড়ালে। দড়ির ফোকর ছাড়িয়ে পা গিয়ে কিক করলে দেওয়ালে। তাই তো ব্যথা অম্বরদা, হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে।”

চিদাম্বর বলল, “কুট্টিটা একটা ত্রাস। বিভীষিকা।”

“ঠিক বলেছেন।”

“ঠিক মোটেই বলিনি। তোমরা বিভীষিকা মনে করো। এ করলে তো আর চোদ্দ থেকে বারো হওয়া যায় না নিবারণ।”

“আপনি করে দিন অম্বরদা। আপনারই তো হাতে।”

“সব ব্যাপার তোর পায়ে নিবারণ। কারও হাতে কিছু নয়। খেটে যা।”

কাঁদো-কাঁদো গলায় নিবারণ বলল, “খেটেই তো যাচ্ছি।”

খাটনি বলতে ফিক্সচার বওয়া, চিঠি বওয়া। নানারকম ফরমাশ খাটা। অথচ এক্সট্রা

লিস্টে চোদ্দয় নাম। তবে বসন্তপুরের চাষিরা যদি ওইভাবে মাথাল না ওড়ায় তো এই দশা হয় না। একজন ক্যাপ্টেন অমন করলে কী করে মাথার ঠিক রাখে।

চিদাম্বর আরও একবার দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "গরিব গাঁ-ঘর নিবু। যার পা আছে তার অন্ন নাই। যার অন্ন আছে তার পা নাই। এই বৈষম্য কেন ঘটে মাথায় ঢোকে না। সিধের বাপের অবস্থা যদি তোর বাপের মতো হত ? কুট্টিকে গণ্ডা-গণ্ডা গোল খেতে হত ! অথচ ভগবান তা হতে দেবেন না।"

নিবারণ পরের দিন ভোরে হাত-চিঠি আর ফিক্সচার নিয়ে সাইকেল হাঁকিয়ে দিলে। মধুরকুলের কুঠির কাছে এসে কুঠির গেটের গা-লাগা চায়ের দোকানদার এক বুড়োকে জিজ্ঞেস করল, "সনাতনদা কোথায় বলতে পারেন ?"

বুড়ো লোকটি অনেকক্ষণ কোনও উত্তরই দিল না। অবশেষে হাত নেড়ে কী বলল বোঝা গেল না। হঠাৎ গেটের মুখে একজন দরোয়ান মতো বৃদ্ধকে দেখে এগিয়ে গেল নিবারণ। দরোয়ান বলল, "আমার নাম ভিখু। সনাতনের কাজের লোক। আসেন।"

বলে নিবারণকে গেট পেরিয়ে ভেতরে নিয়ে চলল। ভাঙা পলস্তারা খসা সাহেবদের পুরনো বাড়ি। এখানে নীলকর সাহেবরা থাকত শোনা যায়, সেইজন্য জায়গাটার নাম মধুরকুলের কুঠি। কুঠিবাড়ির টিমের ক্যাপ্টেন সনাতন মণ্ডল। কুঠিবাড়ির ভেতরে একখানা ঘরে সনাতন থাকে। গত বছর, তার আগের বছর সেই ঘরটায় এসে নিবারণ সনাতনকে চিঠি আর ফিক্সচার দিয়ে গেছে। সেই প্রায় পোড়ো ঘরটির কাছে টেনে এনে ভিখু বলল, "সনাতন নাই। সন্নেসি হয়েছে। তবে মাঝে-মাঝে আসে। ওর শিল্ড কাপ মেডেল দেখে ফের চলে যায়। রাত কাটায়। আমি সেবা করি। ঘন-ঘন চা করে দিই। আপনি থাকেন, রেতে দেখা হবে। আজ আসবার কথা।"

দরোয়ানের কথা নিবারণ ঠিক বুঝতে পারছিল না। সনাতন সন্নেসি হল কবে ? কেনই বা হল ? কোথায় চলে গেছে ? আসেই বা কেন ? খুব আশ্চর্য লাগছিল। পকেট থেকে হাত-চিঠিটা বার করে একবার দেখে নিল নিবারণ। দেখতে গিয়ে কিঞ্চিৎ চমকে উঠল। চিঠির ওপরে লেখা আছে স্বপন মণ্ডলের নাম। স্বপন মণ্ডল তো সনাতনের ভাই।

নিবারণ শুধাল, "স্বপনদা আছে ?"

"আছে। ও-পাড়ায়। তবে সে আমি জানি না। কোথায় কে থাকে না-থাকে আমি বলব কেন ? আমি সনাতনের লোক। তার কথা বলতে পারি। টেলিগ্রাম পেয়েছি, সনাতন আসছে। রেতে থাকো, দেখতে পাবে। কথাও হবে। দাও, চিঠিটা দাও। ফিক্সচার দাও। আমি ওর টেবিলে পাথর চাপা দিয়ে রাখছি, ফিরে এসেই টেবিলে দেখতে পাবে। জবাবী পত্তর লিখবে, সব করবে। রেতে থাকো, সব হবে।"

বলেই ভিখু নিবারণের হাত থেকে চিঠি আর ফিক্সচার একপ্রকার ছিনিয়ে নেয়।

তেঁতুলিয়া থেকে মধুরকুল সুদীর্ঘ পথ। দেখতে-দেখতে সন্ধ্যাও হয়ে এসেছিল। এই রাস্তায় বাস যোগাযোগ কম। ফলে দূরপাল্লার পথে সাইকেলই ভরসা। নিবারণ গত বছরের আগের বছর এই মধুরকুলে এসে জ্যোৎস্না রাতে সাইকেল ঠেঙিয়ে ফিরে গিয়েছিল। আজ সেসব সম্ভব নয়। রাত্রি নটার পর চাঁদ উঠবে।

ভাবতে-ভাবতে ভিখুর পিছু-পিছু ঘরের ভেতর ঢুকে পড়ে নিবারণ। ঘরে ঢুকেই অবাক হয়ে যায়। তামাম ঘরে কাচের আলমারি ভর্তি কাপ মেডেল ঝলমল করছে। টেবিলে একটি রানার্স শিল্ড খাড়া করা। দেওয়ালে টাঙানো মস্ত বড় ফোটো। সনাতন মণ্ডল। ঝকঝকে উজ্জ্বল বড়-বড় চোখে চেয়ে আছে। সেই চোখের দিকে চেয়ে ভাবতেই পারা

যায় না লোকটি সন্নেসি হয়ে গেছে।

অস্ফুটে মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ে, সন্নেসি কেন হল ? কী দুঃখ ছিল ওর ? ভিখু সেই আস্তে বলা কথাও শুনতে পায়। বলে, "ছিল, অনেক দুঃখ ছিল। ফুটবলকে যে ভালবাসবে সেই বুঝবে, নইলে বুঝবে না। ওর বাপ ছিল ভয়ানক স্বার্থপর। চাষ ছাড়া কিছুই বুঝত না। মণ্ডলেরা ওইরকম। জমি জিরাত, দলিল দাগ খতিয়ান আর পড়চা। বলদ আর জলখাবার। ফাল আর জো। কথায় কথায় চাষ কত. দোহার তেহার। মানে দোহারা তেহারা। দিনমান বীজ বিছন আর টোকাকৈ, নিড়ুনির দাউলি খুরপি কোথা ! এই করলে কি জোয়ান ছেলের সয় ? সইল না। খেলা জিনিসটারও দোহার তেহার লাগে। তারও জো আছে। মানে মরসুম আছে। বয়েস আছে। তারপর ধরেন, খেলার ওপর রোখ না থাকলে নয়। পারবেন না। সাধ থাকলেই হবে না, সাধ্যও লাগবে। বাপ বললে চাষির ছেলের খেলা কিসের, চাষে মন দে। সাধ ভাল। সাধ্য থাকলে তবে ভাল। চাষির ছেলের সাধ্য কোথা ? পেটে নাগবে দানাপানি, তারপরে সব কিছু। রাতদিন বাপ এমনিই করে বকে চলে মেশিনের মতো। আমার সনাতনের মাথা বিগড়ে গেল। আমিই তো ওর 'গার্জেন' কিনা ! বোঝেন !"

বলেই ভিখু চোখে এক বিচিত্র ভঙ্গি করে ওঠে। লোকটার পরনে খাকি পোশাক দেখে দরোয়ান মনে হয়েছিল বটে, নিবারণের এখন আর সেই কথা মনে হচ্ছে না। ফের, এ যে সনাতনের গার্জেন হতে পারে সে-কথাও বিশ্বাস করা যায় না।

রাত্রে ভিখু কয়লা আঁচের চুল্লিতে ভাত তরকারি রান্না করে নিবারণকে খাওয়াল। কথা শুনতে-শুনতে নিবারণ কেমন আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল। ভিখু ভাত তরকারি পরিবেশন করে তালপাখার বাতাস দিতে-দিতে বলল, "খাও নিবারণ। তোমায় বলি, আমি সনাতনের প্রথম গোলকিপার। হাঁটুর মালাইচাকি নড়ে যায় সে-বছর সোনাডাঙায়। আমাকে ওসমান কুট্টি বধ করে দিলে। সেই থেকে আমি সনাতনের ভাত রাঁদি। কুট্টি আমার পায়ে কাঁচি মেরেছিল। সেটা বোঝো তো ? দুই পা বেড়ে কাঁচির পায়ের মতো হাঁটু দুমড়ে দিলে, চাকি ঘুরে গেছে ভাই। সেই থেকে জব্দ হয়ে গেছি। শুনেছি তোমাদের টিমে সিদ্ধার্থ খুব ভাল খেলে। কুট্টি যদি সুযোগ পায় সিধুকে নষ্ট করে দেবে। খুব সাবধান।"

নিবারণ বলল, "সিধে খুব চালাক। ওসমান ওর পা ধরতেই পারে না। কিন্তু ওর বাপ, সিধের বাপ কেবলই জমি জিরাত করে-করে ওর মাথার পোকা বার করে দেয়। সিধেও কি সন্নেসি হয়ে যাবে ? বাপ বলে, তোমার মাথায় ফুটবলের পোকা ঢুকেছে। সেটা বার না করলে আমার পরিবার খেতে পাবে না।"

ভিখু এখন নিবারণকে তুমি করে বলছে। বলল, "সিধুকে বাঁচাও, রক্ষা করো। নইলে টিম মরে যাবে। সনাতন চলে যাওয়ার পর কুঠির টিম মরতে বসেছে। কে বাঁচাবে ? স্বপন ? কোথায় স্বপন, কোথায় সনাতন। কিসে আর কিসে, তামা আর সীসে। তারপর সনাতন গিয়ে স্বপনই সংসারের হাল ধরল। ছোটভাই অনন্ত আছে। তোমার চেয়ে বয়েসে কত খাটো। সে একলা জ্যোৎস্না রাতে ওই মাঠে খেলতে আসে। আমি ওকে গোলকিপার করব। দাঁড়াও, চাঁদ উঠুক, তখন দেখবে। আমাদের সঙ্গে সাহেব-মেমরাও নামবে। একটা টুর্নামেন্টের এখনও মীমাংসা হয়নি। সনাতন আসবে। তারপর খেলা শুরু হবে। আমি হুইস্‌ল বাজাব। রাত হোক। আমি এখন রেফারি। বুঝলে ? মালাইচাকি ঘুরে গেছে। সনাতন চলে গেল। আমার আর কী সাধ্য। বাপ ওকে

তাড়িয়ে দিলে। আমি গোলকিপার থেকে রেফারি হয়ে গেলাম। বাধ্য হয়ে। বাঙালি বনাম সাহেব। টুর্নামেন্ট। এই নীলকুঠি-র সাদা-কালোর খেলা আজও শেষ হয়নি। রাত হোক দেখতে পাবে। আমি বাঁশি বাজাব। অনন্ত আসবে। সনাতন আসবে।"

ক্রমশ ভিখুর কথা কেমন অসংলগ্ন মনে হচ্ছিল। সাহেবরা এই দেশ ছেড়ে এই নীলকুঠি ছেড়ে কবেই চলে গেছে। যারা খেলত, তারা নেই। তারা বেঁচেও নেই। সনাতন সন্ন্যাসী। নিবারণ বুঝল সে একটা অদ্ভুত জায়গায় রাত্রে আশ্রয় নিয়েছে। একটা পাগলের পাল্লায় পড়ে গিয়েছে। ভিখু চলে যেতেই খাওয়া-দাওয়ার পর খাটে শুয়ে পড়ার কথা ভাবছিল, কারণ লোকটা আরও কত বকবক করবে কে জানে। চিদাম্বরদা চিঠি লিখেছে স্বপন মণ্ডলকে। সনাতনকে নয়। তা হলে সনাতন যে সন্নেসি হয়েছে অম্বরদা নিশ্চয়ই জানে। তবে মুখে তো বারবারই চিদাম্বরদা সনাতন-সনাতন করছিল। সনাতনকে বলবি, চিঠিটা সনাতনকে দিবি, কনসেন্ট লেটার চাইবি, বলবি সব অ্যারেঞ্জমেন্ট ও·কে·। তা ছাড়া আপ-টু-ডেট রুল রেগুলেশনে খেলা হবে। কোনওরকম পক্ষপাতিত্ব হবে না। আমরা ভাল রেফারি দেব। সব বলবি সনাতনকে। চিদাম্বরদা কোনও সময় স্বপনের কথা মুখে বলেনি। তা হলে স্বপনকে চিঠি লিখল কেন?

ভিখু কি সত্যিই ভিখু, নাকি অন্য কেউ? এটা কোনও ভৌতিক ব্যাপার নয় তো? সহসা কুঠির কোনও একটা দরজা আচমকা কেমন কড়কড় শব্দ করে ওঠে। একটা অদ্ভুতরকম হিম হাওয়া গায়ে এসে লাগে। বাইরে খুব জোরে খেলার বাঁশি বেজে ওঠে, পর পর তিনবার। দেওয়ালের পুরনো দেওয়াল-ঘড়িতে ঢং ঢং করে দশটা বেজে যায়। জানালা দিয়ে নিবারণ দেখতে পায় খেলার সবুজ মাঠে আকাশ থেকে জ্যোৎস্না খইয়ের মতো সাদা হয়ে নেমেছে। কারা যেন বাইরে চাপা গুঞ্জন করছে বলে মনে হয়। কী ব্যাপার, কারা কথা বলছে? মনে হল, নিবারণের সাইকেলের বেলটা ক্রমাগত কেউ দু মিনিট বাজিয়ে চলল। তারপর থেমে গেল।

নিবারণের ক্রমশ এক ধরনের ভয়-ভয় করতে লাগল। সে ঘন ঘন জানালা দিয়ে বাইরে দেখছিল, সবুজ মাঠে জ্যোৎস্না পড়েছে। হঠাৎ ভিখুকে দেখা গেল। খেলার বাঁশি বাজিয়ে একলা মাঠে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। নিবারণ এবার বুঝল লোকটা আসলে পাগল। সনাতন সন্নেসি হয়ে যাওয়ার পর এইধারা মাথাটা বিগড়ে গেছে।

খাকি হাফ-প্যান্ট পরা, গায়ে সাদা গেঞ্জি, গলায় ফিতেয় ঝোলানো বাঁশি, ভিখুকে অদ্ভুত দেখাচ্ছিল।

নিবারণ এত সত্ত্বেও বিশ্বাস করছিল ভিখু যা বলেছে সত্য হতেও পারে। মৃত সাহেব-মেমরা ওই মাঠে খেলতে নামবে। ছায়া-শরীরগুলো খেলা করবে। এইসব গুজব নীলকুঠি সম্বন্ধে আগেই শুনেছে নিবারণ। শুনেছে, বাঙালিদের কাছে বরাবব সাহেবরা হেরে যেত বলে তাদের মৃত আত্মা এখনও ক্ষুব্ধ। কালো মানুষের কাছে হেনস্থা সাহেবরা সইবে কেন? তাই মাঝে-মাঝে তারা খেলতে আসে। গুজব ছাড়া কিছু নয়। ভিখু নিশ্চয় সেইসব কথা বিশ্বাস করে। কারণ সে ফুটবলপ্রেমী লোক, সনাতনকে ভালবাসে।

হঠাৎ লক্ষ করল নিবারণ, মাঠের এক কর্নার দিয়ে সনাতন ঢুকছে। ওর খালি পা, ফুলপ্যান্ট গুটিয়ে তোলা হাঁটু পর্যন্ত, একটি পায়ে বেশি করে গুটনো। সিনেমার রাজকাপুরের মতো।

তা হলে তো ভিখু মিথ্যে বলেনি। সনাতন সত্যিই এসে গেল। এখন কি তা হলে খেলা শুরু হবে! ঘন-ঘন বাঁশি বাজাতে লাগল ভিখু। কী সব কথা বলতে-বলতে আর

বাঁশি বাজাতে-বাজাতে ঝুঁকে-ঝুঁকে সনাতনের পাশে-পাশে হাঁটছে, মাঝে-মাঝে পিছিয়ে পড়লে দৌড়ে ছুটে এসে পাশাপাশি হচ্ছে। যেন খানিকটা কানে-কানে বলার মতো করে বলে চলেছে ভিখু। জানালা দিয়ে সবই লক্ষ করছিল নিবারণ। তবে সনাতনকে মোটেও সন্নেসির মতো দেখাচ্ছিল না। বরং খেলোয়াড় মনে হচ্ছিল। সন্নেসি হলেও আসলে তো সনাতন খেলোয়াড়। এবং এখন সাহেবদের সঙ্গে খেলতে এসেছে। ফলে খেলোয়াড়ই তো মনে হবে, সন্নেসি মনে হবে না। নিবারণ ভাবতে-ভাবতে হতভম্ব হয়ে যাচ্ছিল।

বেশ ঠাণ্ডা হাওয়া ছুটে এসে গায়ে লাগল। ঠিক সেই হাওয়ার সঙ্গে ঘরে ঢুকে এল সনাতন। তারপর সোজা গম্ভীর মুখে টেবিলটার সামনে এসে দাঁড়িয়ে চিঠি আর ফিক্সচার পাথর সরিয়ে তুলে নিয়ে বলল, "চিদাম্বরদা পাঠিয়েছে? ঠিক আছে। আমি যাব।"

বসে চিঠিটা পড়তে লাগল নিঃশব্দে। তারপর সেটি জামার বুক-পকেটে ঢোকাল। ফিক্সচারটা দেখতে-দেখতে বেরিয়ে চলে গেল। যাওয়ার আগে কেবল বলল, "তুমি কি এখানেই থাকবে? তবে জায়গাটা ভাল নয়। খুব ভুতুড়ে। একলা থাকা কঠিন। ভিখু থাকে, ওর ভয়ডর কম। তবে তুমি আমার সঙ্গে যেতে পারো। যাবে?"

ভয়ে নিবারণ মাথা নাড়তে লাগল। তার কি শেষটার সন্ন্যাসীর দশা হবে? তাই বা কেন হতে যাবে। তার তো সমস্যা সনাতনের মতো নয়। তার বাবার অগাধ টাকাপয়সা। জমি-জিরাতে খাটতে হয় না। বাপ কখনও বকে না। খেলার জন্য বরং উৎসাহ দেয়। চাওয়া মাত্র জার্সি, বুট, মোজা সব পেয়ে যায়। মাথা নাড়া দেখে সনাতন হাসল। তারপর, বেশ, শুয়ে থাক। বলেই বেরিয়ে চলে গেল। আবার বাঁশি বাজতে লাগল। বেল বাজতে লাগল। সনাতনের পায়ে ছিল শিশির-মাখা কাদার চাপড়া। দেখতে অদ্ভুত লাগছিল। ওই কারণেই প্যাণ্টের পা গুটিয়ে তোলা।

নিবারণ দেওয়ালের দিকে সনাতনের ফোটো দেখছিল। মিলিয়ে নিচ্ছিল, ছেলেটি সত্যিই সনাতন কি না। হুবহু সনাতন। মাথার চুলগুলি অবধি এক। কোঁকড়ানো। থুতনিতে খাঁজ। চোখ ঈষৎ টেরা। চোখের মণির সাদা অংশে তিলের মতো দাগ, বাঁ চোখে। সবই একরকম। খাটের ওপর উঠে ভাল করে মেলাবার চেষ্টা করল, ফোটোতে তিলটা আসেনি বলে মনে হচ্ছে। হঠাৎ চোখে পড়ল, ফোটোর নীচে লেখা আছে, জন্মসন এত। মৃত্যু এত। পড়তে-পড়তে নিবারণের হাত-পা কাঁপতে লাগল। সে সশব্দে খাটের ওপর পড়ে গেল। ওদিকে বাঁশি বেজেই চলেছে। বেল থামছে না। হাওয়া বইছে শন-শন করে। গাছপালার শব্দ হচ্ছে। মাঠের ভেতর যেন সত্যিই খেলা শুরু হতে চলেছে। নিবারণ আর ঘরের ভেতর তিষ্ঠোতে পারল না। ছুটে বাইরে চলে এল। দেখল দেওয়ালের গায়ে হেলানো সাইকেলটা কাত হয়ে পড়ে আছে। সেখানে কেউ নেই। তা হলে বেল কে বাজাচ্ছিল! ওভাবে চাপা কথাবার্তা বলছিল কারা? ভিখুই বা কোথায়? ভয়ে নিবারণ আর মাঠের দিকে চেয়ে দেখতে পারল না। সিঁড়ি দিয়ে মাটিতে নেমে এল। কাঠের সিঁড়ি ভূমিকম্পের মতো দুলছিল যেন। মনে হচ্ছিল নিবারণ নেমে যেতে পারবে না। সত্যিই সব ভুতুড়ে ব্যাপার।

নিবারণ সাইকেল তুলে নিয়ে কুঠির বাইরে পালিয়ে আসে। আসতে-আসতে শুনতে পায় 'গোল' 'গোল' চিৎকার করছে কারা। যেন চাষি আর দিনমজুররা টোকা উড়িয়ে দিচ্ছে, সাহেবরা হেরে যাচ্ছে। সারারাত চাঁদের আলোয় নিবারণ সাইকেল ছুটিয়ে দেয়।

নিবারণের স্পষ্ট মনে পড়ছে, সিঁড়ির নীচে সাইকেলের কাছে একজন কিশোর দাঁড়িয়ে ছিল। তাকে নামতে দেখেই ছুটে পালিয়ে গেল। ছেলেটি কি তবে অনন্ত? অনন্তই কি

তবে বেল বাজাচ্ছিল ? এইসব ভৌতিক ব্যাপারের মীমাংসা বড় একটা হয় না। এসব যে সত্যিই দেখল, নাকি কল্পনা করল বুঝতে পারে না। ও যখন কুসুমঘাটায় পৌঁছয় তখন ভোরের সূর্য ওঠে। দোকানপাট ধীরে-ধীরে খোলে। এই এত ভোরে 'আপনজন পুস্তকালয়'-এর সামনে সিদ্ধার্থ অর্থাৎ সিধেকে সে দেখতে পায়। চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে।

কাছে এগিয়ে যায় নিবারণ। শুধায়, "কী রে, সিধে, এখানে দাঁড়িয়ে যে ? এত ভোরে কী করছিস ?"

"বই কিনব। ক্লাসের বই। বুক-লিস্ট এনেছি।"

"তা দাঁড়িয়ে আছিস কেন ? দোকান তো খুলে গেছে।"

সিদ্ধার্থ আর কোনও কথা বলে না। চুপচাপ দাঁড়িয়েই থাকে। কিছু একটা গোপন ব্যাপার রয়েছে বলে নিবারণের সন্দেহ হয়। বই কিনবে তো এভাবে দাঁড়িয়ে থাকবে কেন ?

এবার সিদ্ধার্থই প্রসঙ্গ বদলাবার জন্য বলে, "মধুরকুল গিয়েছিলি ? কুঠিতে ?" নিবারণ আর মুখ বুজে থাকতে পারল না। গত রাতের সব ঘটনা হড়হড় করে বলে ফেলে আতঙ্কগ্রস্তের মতো হাঁফাতে লাগল। সিদ্ধার্থ শুনতে-শুনতে হেসে ফেললে। বলল, "বাঙালি আর সাহেবদের টুর্নামেন্ট হয় শুনেছি। জায়গাটা খারাপ, তাও শুনেছি। কিন্তু তোর কাছে সনাতনদা আসেনি, এসেছিল স্বপনদা।"

"কী করে ?"

"কাছেই তো ওদের কুঠির ক্লাব। রাত করে বাড়ি ফেরার পথে ভিখুর কাছে এসেছিল। ক্লাবে আড্ডা দেয় স্বপনদা। তুই কী দেখতে কী দেখেছিস ! ভিখু তো পাগল। আমায় চেনে। ওর ধারণা সনাতনদা ফিরে আসবে। কিন্তু কী করে ফিরবে, সনাতনদা তো বেঁচে নেই। তুই জানিস না ?"

নিবারণ শুনেছিল সনাতন মণ্ডল বাবার ওপর রাগ করে বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছে, কিন্তু মারাও গিয়েছে, এ-কথা সে জানত না।

সিদ্ধার্থ বলল, 'অম্বরদা বরাবর ভুল করে। স্বপনদার কথা বলতে গেলেই সনাতন-সনাতন করে। কিছুতেই স্বপন নামটা মুখে আসে না। সনাতনকে ভীষণ পছন্দ করত কিনা। ভাবতেই পারে না সনাতন নেই। আমারও কি মনে হয় নিবু, আমিও চলে যাব।"

"কোথায় ?"

জিজ্ঞেস করতে গিয়েই নিবারণের গলা কেঁপে গেল। চোখ-মুখের অবস্থা দেখেই নিবারণ বুঝতে পারছিল সিদ্ধার্থর মনের অবস্থা ভাল নয়। সিদ্ধার্থ বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যাওয়ার কথা ভাবছে।

কিন্তু প্রশ্ন করে সব কথা শোনার আগেই নিমাই-মাস্টার এগিয়ে আসেন কোথা থেকে। সিদ্ধার্থকে দেখেই বলেন, "ও, তুমি এসে গিয়েছ, ভালই হল ! চলো, বুক-লিস্ট এনেছ তো ?"

"আজ্ঞে !" বলে মৃদু মাথা দোলায় সিদ্ধার্থ। নিমাই-মাস্টারমশাই পাশে দাঁড়িয়ে থাকা নিবারণকে চিনতেই পারেন না। সিদ্ধার্থকে সঙ্গে করে বইয়ের দোকানের দিকে চলে যান। বুক-লিস্টে মার্ক করে বই কিনে সিদ্ধার্থর হাতে তুলে দিতে থাকেন। নিবারণ পথের ওপর দাঁড়িয়ে লক্ষ করে। সে সাইকেল ধরে দাঁড়িয়েই থাকে। নড়তে পারে না।

বই কেনা হলে সিদ্ধার্থর চোখ-মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। ঘড়ি-পকেট থেকে টাকা বার করে নিমাই-সার দোকানদারকে দিচ্ছেন আর টাকার রসিদ নিচ্ছেন দেখা যায়। সবই চেয়ে-চেয়ে দেখতে থাকে নিবারণ। তারপর নিমাই-সার সিদ্ধার্থর পিঠ চাপড়ে হাসতে-হাসতে কথা বলেন। ওই হাসি আর পিঠ চাপড়ানো এবং বইয়ের দাম পকেট থেকে দেওয়ার ভঙ্গি দেখতে-দেখতে চকিতে নিবারণের মাথায় এইটুকু বুদ্ধি খেলে ওঠে যে, সিধেকে নিমাই-সার কিনে দিচ্ছেন।

ঠিক তাই। রাস্তায় নেমে এসে সিদ্ধার্থকে নিমাই-সার বললেন, "ছাত্রর তপস্যা অধ্যায়ন। তোমার বাপকে সে-কথা বলেছি। পড়াশোনায় মন দাও। খেলাধুলো তো রইলই। দরকার যেদিন হবে, আমিই ডাকব। এ-বছর কোথাও খেলবে না। অম্বর তোমাকে নষ্ট করে দেবে।"

সিদ্ধার্থ বললে, "আপনি আমাদের ভাগ-জমির মালিক। বাবা তো বলেন, আপনি ছিলেন বলে আমার পড়াশোনাটা হচ্ছে। অবশ্য আমার পড়াশুনোও হবে না, খেলাধুলোও হবে না। সেসব বেশ জানি। অম্বরদাকে মুখ দেখাতে পারব না।"

নিমাই-সার গর্জে উঠলেন, "অম্বর একটা কালপ্রিট। তোমায় নষ্ট করে দেবে।"

বলতে-বলতে আর দাঁড়ালেন না নিমাই-সার, গজগজ করতে-করতে চলে গেলেন।

দু' দিন থেকে সিদ্ধার্থ খেলার মাঠে আসছে না। গত পরশুর আগের দিন খেলা শেষে সন্ধের মুখে নতুন ভাল নরম চামড়ার রাশিয়ান বলটা সঙ্গে করে নিয়ে গেছে বাড়িতে প্র্যাকটিস করবে বলে। তারপর তিন-তিনটে বিকাল চলে গেল, খেলার মাঠে সিধের টিকিটি দেখা যাচ্ছে না। বল যখন নিয়ে যায় তখনই চিদাম্বরের সন্দেহ হয়েছিল। সিদ্ধার্থর বাবা তিরিক্ষে হয়ে আছেন, বল সহ্য করতে পারেন না, বলার নেই, হয়তো বলটাই গনগনে উনুনে ফেলে দিলেন। এমন একটা ভয় তো ছিলই, যদিও চিদাম্বর মুখে কিছু বলতে পারেনি। সিধে আঘাত পেতে পারে। কিন্তু আজও যে সিধে আসবে তেমন ভরসা করা যাচ্ছে না।

চিদাম্বর বলল, "চল নিবারণ, সিধেকে একবার দেখি, কী হল ছেলেটার ?"

নিবারণ ঘাড় চুলকে বলল, "আজ্ঞে অম্বরদা, একটা কথা আপনাকে কদিন ধরে বলব-বলব করছি, পারছিনে। মুখে বাধছে।"

চিদাম্বর নিবারণের আপাদমস্তক ঈষৎ তির্যক দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করে শান্ত গলায় বলল, "বল না কী বলবি !"

হঠাৎ দুম করে নিবারণ বলে ফেলে, "সিধে আর খেলবে না বলেছে। আমাকে মাঝে-মাঝেই বলে।"

"কবে বলল তোকে ?"

"এই তো পরশু, তার আগের আগের দিন শুক্কুরবার। আমার বাড়ি গিয়েছিল, আমি তখন চুনীর ফোটো সাঁটাচ্ছি কপাটে, ও বললে কি, হুবহু বলছি তোমাকে— বললে, আমি তো মুনিশ নিবু, আমার কি আর খেলাধুলো হয়। আমি আর খেলব না।"

"প্রখ্যাত শ্রীনিবাসও খেতখামারের কাজ করত নিবারণ ! মামার বাড়ি থেকে পড়াশোনা করত। একদিকে খেতের নিড়ুনি অন্যদিকে স্কুলের পড়া, মাঝে থাকত খেলার মাঠ। খেলার জন্যই ওর স্কুলের ফিজ লাগত না, তাই রক্ষে। নইলে কী হত বলা যায় না।

সিধের তো বাপের হোটেল। খেতের কাজ তো করবেই, করুক না। তাই বলে তিনদিন হয়ে গেল, সেই যে গেল, বলও গেল, সেও গেল। এটা অন্যায় নিবারণ। তুই না খেলবি, বেশ তো ! কিন্তু বলটা তো দিয়ে যাবি !"

অম্বরদার পিছু-পিছু হাঁটতে নিবারণের একধারা সঙ্কোচ হয়। কারণ গাঁয়ের কোনও-কোনও পরিবার তাকে ভাল চোখে দেখে না। চাষের জমি থেকে সে ছেলেদের হাঁকিয়ে নিয়ে খেলার মাঠে তেড়ে আনে। তাতে গরিব চাষির চাষের মরসুমে চাষবাসের ভয়ানক ব্যাঘাত হয়। সে কারণে ওকে দেখলেই ঘরের বউ-ঝিরা অবধি কলকল করে। সবাই কেমন রুষ্ট। ওর পিছু-পিছু হাঁটা মানে সংসারের অভিসম্পাত কুড়নো।

কথা কইতে-কইতে ওরা সিদ্ধার্থদের বাড়ির কাছাকাছি চলে এসেছিল। চিদাম্বর পথের ওপর দাঁড়িয়ে পড়ল। ক্ষণকাল সিদ্ধার্থদের চারচালার খড়ো বাড়ির মাথার মুকুটটার দিকে চেয়ে রইল নিষ্পলক। খড়ের মুকুটে একটা মেঘবর্ণ বুনো পায়রা বসে ডুকরোচ্ছে মাথা ঠোকার ভঙ্গিতে। নিবারণের চোখ পড়ল সেদিকে।

চিদাম্বর চাপা সুরে বলল, "যা, দেখে আয় !"

"কী বলব ?"

"বলবি, আমি পথের ওপর দাঁড়িয়ে আছি।"

নিবারণের কিন্তু পা বাড়াতে সাহস হচ্ছিল না। সে-কথা বুঝতে পেরে চিদাম্বর চোখ পাকিয়ে বলল, "দ্যাখ নিবু, আমরা কারও ঘরে সিঁদ কাটতে আসিনি। ঘরের ছেলে ঘরে থাকবে, আমাদের বলবার কিছু নেই। কিন্তু ফুটবলটা তো ক্লাবের সম্পত্তি, সেটা কারও ব্যক্তিগত নয়। সেই খেয়াল যে করে না, বুঝতে হবে, খেলার ওপর তার কোনওই ভালবাসা নেই। খেলব না, অথচ বল আটকে রাখব, একজন মানুষ খুব নির্লজ্জ না হলে এসব আদিখ্যেতা করতে পারে !"

নিবারণ সমর্থন করে বলল, "কখনওই পারে না।"

গলা সামান্য ওপরে তুলে চিদাম্বর বলল, "দু' কথা সিদ্ধার্থকে শুনিয়ে দিয়ে আসবি। বলবি, সে যেন আর কখনওই খেলার মাঠে না আসে। আমরা অমন প্লেয়ার চাই না। এ-বছর তুই খেলবি নিবারণ। লিস্টে তোর নাম যাবে বারো নম্বরে। অতিরিক্ত তালিকায় তুই আমাদের নাম্বার ওয়ান।"

মন্ত্রবশ মানুষের মতন অবস্থা হল নিবারণের। তার মাথার ভেতরটা আনন্দে ঝাঁ-ঝাঁ করতে লাগল। বুকের রক্ত দ্রুত বইতে লাগল। সামনে পা বাড়িয়ে বুঝতে পারল, পা কাঁপছে। আনলাকি থার্টিন' থেকে টুয়েলভে ওঠা ছিল তার স্বপ্নমাত্র, সে কল্পনা করত সে হবে— একদিন তার চান্স আসবে। বউদি সে-কথা আমলই দিত না। মা মনে করত, দেওয়ালে যে-ছেলে নামী খেলোয়াড়ের ছবি সেঁটে দিন কাবার করে, দরজায় ফিক্সচার সেঁটে আনন্দ পায়, স্বপ্নে গোলকিক করে পা ভেঙে পায়ে মলম লাগিয়ে বসে থাকে, তার বাস্তব বলে কিছু নেই, সবই কল্পনা।

পাটকাঠির বেড়াঘেরা বাড়ি। খুব শিথিল পায়ে ধাপে-ধাপে দুয়ারের মুখে এসে উঁকি দেয় নিবারণ। চৈতালি ফসলে বাড়ির বাতাস ম-ম করছে। চালার ছায়া পড়েছে মাটিতে, দুপুর গড়িয়ে গিয়েছে। সিদ্ধার্থের বাবা শিবচরণ চালের ক্রমশ কিন্তু অতি ধীর-বর্ধমান ছায়ার নীচে বসে পাটের দড়ি পাকানোর বড় তকলি নিয়ে পায়ের ত্বকে চালিয়ে দিয়ে দাবনা দলিত করে ঘোরাচ্ছেন ক্রমান্বয়ে আর তকলি দাঁড় করিয়ে পাটের নরি থেকে তৈরি হওয়া দড়ি তকলির গায়ে ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে জড়িয়ে নিচ্ছেন। এ দৃশ্য কতকাল ধরে চলছে

গ্রাম-বাংলার উঠোনে, দাওয়ায়, বৈঠকে, গৃহস্থের সংসারে। তবু নিবারণ এই দৃশ্য দেখলে কেমন তন্ময় হয়ে চেয়ে থাকে। এই দড়ি দিয়ে শিবচরণ তাঁর ঘর বাঁধেন, চাল, বেড়া, জোয়াল, টোকা, কঞ্চির পাত্র প্রভৃতি কত কী— সবই বাঁধেন। দাবনায় দলিত হয়ে তকলির শক্ত কাঠের দাড়া বা কাঠিটা পাক খায়, কাঠেরই নকশা-কাটা চক্রটা, যেন ঠিক সুদর্শন চক্রের মতো ঘোরে— এভাবে ভাবলে মনে তন্ময়তা আসবেই।

এই সময় চাষির মনে একটা কেমন প্রসন্নতা লক্ষ করা যায়। নিবারণ ভাল খেলোয়াড় না হতে পারে, কিন্তু ভয়ানক ভাবুক। খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে কত কিছু পর্যবেক্ষণ করা তার অভ্যাস। যেমন ওই চক্রটা যে সুদর্শন-চক্রের মতো অবিকল, সে-কথা নিবারণ ছাড়া কেউ জানে না। ভূগোলকের (গ্লোব) পেটের ভিতর একটা রড থাকে উত্তর মেরু দক্ষিণ মেরু বরাবর, ধরা যাক চক্রের ওই দাড়াটা সেইরকম। একটা দাড়া মানে দণ্ড এবং মাঝে একটা চক্র, এরই নাম তকলি অথবা টাকুর। চাষি যখন সেটা ঘোরাচ্ছে, যেন পৃথিবীই বনবন করে ঘুরছে। নিবারণ ভাবছিল, এই সময়ে চাষির মনে প্রসন্নতা থাকে। কেন থাকে স্পষ্ট করে বলা খুব মুশকিল। আসলে চাষির হাতে টাকুর, মানে তার এখন অবকাশ। কাজের চাপ কমে গিয়েছে, আঙিনায় ফসল এসেছে, ম-ম করা সুঘ্রাণে তার মন ভাল আছে। এখন দড়ি পাকিয়ে রাখলে সামনের বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠের কালবৈশাখী ঝড় ঠেকানো যাবে। বর্ষার আগে ঘরামি ঘর ছেয়ে দেবে, তার দড়ির জোগান তো চাই। জোয়াল বাঁধার দড়ি, বেড়া বাঁধার দড়ি— সব চাই।

নিবারণ ছাত্র। সে ভাবে, জীবনের এই শিক্ষাটাও কম কথা নয়! ক্রমশ সে দুয়ারে দাঁড়িয়ে মনে-মনে সাহস সঞ্চয় করতে থাকে। হঠাৎ শিবচরণ তাকে দেখতে পায়। টাকুরে নিবিষ্ট চোখ তুলে নিবারণকে ঝটিতি পলক ফেলে দেখে নেয়। তারপর দড়িতে নরিতে চক্রাবর্তে মন দেয়। মুখটা বোধ হয় কেমন গম্ভীর হয়ে গেল। মুখ থেকে প্রসন্নতা মুছে গেল। ভয় পেয়ে গেল নিবারণ।

হঠাৎই দাড়া ঘোরানো থামিয়ে শিবচরণ নিবারণকে হাতের ইশারা করলেন চকিতে। কাছে ডাকলেন। মন্থর পায়ে অগত্যা এগিয়ে যায় নিবারণ। ইশারাতেই এই আপাতমুখী চাষিটি তাকে পাশে বসতে বলেন। তারপর বলেন, "দ্যাখ বাপ, সব জিনিসের একটা নিয়ম আছে। টাইম আছে। বীজ বোনার টাইম। ফসল কাটার টাইম। সব টাইমে আর চাকায় বাঁধা। যাকে জীবনটা জোয়ালে বেঁধেছে তার রকম আলাদা। বলি কি, এখন আমার কাজ নাই। হাতে টাইম পেয়েছি, এই দড়ি পাকাচ্ছি! টাইম না থাকলে পারতাম? বোঝো নিবারণ, অঙ্কটা বোঝো!"

"আজ্ঞে!" বলে অস্ফুট শব্দ করল নিবারণ। ঢোক গিলল।

শিবচরণ তাঁর হিসেবটা বুঝিয়ে বললেন, "সিধ্যে খেলা করুক মানা নাই। তবে টাইম মেনে খেলবে। আমি ভাগ-জোতের চাষি। নিমাই-মাস্টার আমার রাজ-ভাগীদার। তার জমি। তারই পয়সায় সিধ্যে পড়াশোনা করছে, (শিবচরণের উচ্চারণ সিধ্যে)। এই 'সিজিনে' সিধ্যের খেলাধুলো বারণ আছে। ফাইনাল পরীক্ষা! সে-কারণে আমিই ক্লাবের বল আটকেছি। তোমার বাপের কাছে দু বিঘা জমিন চেয়েছিলাম, আ-চষা ভুঁই, দ্যায় নাই। নিমাই আমাকে দ্যাখে, রাজ-ভাগীদার গরিবের টাকুর, ঘেমন ঘোরে, তেমনই ঘুরি বাপ। পারবা, দু বিঘা ভাগ-জোত কব্বব! যাও, ফুটবল নিয়ে যাও। ওরে সিধ্যে দিই দে!"

"আপনি এর আগেও একবার বল আটকেছিলেন।" ফস্ করে বলে ফেলল নিবারণ।

"হ্যাঁ, আটকেছি ! ফুটবল ফিল্ডের চৌহদ্দির বাইরে নিমাইয়ের জমি। বল দাপিয়ে ফসল নষ্ট করো তোমরা। বল আউট হয়, আমার ফসলও আউট হয়, সরাইতে পাই না। খেলোয়াড়ের পায়ের দাপানি, বলের নাচন সহ্য হয় না। চাষি সহ্য করতে পারে না। আমার মুখে লাথি মারো সইব। লক্ষ্মীর মুখে বল মারবে, কেমন করে সই ! কচি চারা মরে যায়, শুকিয়ে যায় নিবারণ ! যাও, বল নিয়ে যাও !"

কথা শেষ করে শিবচরণ জোরে-জোরে টাকুর, অর্থাৎ পাটদড়ির তকলি ঘোরাতে শুরু করেন। নিবারণের মনটা অত্যন্ত দমে যায়। সে খুব ভার মুখে উঠে দাঁড়ায়। ধীরে-ধীরে বাড়ির বাইরে চলে আসার চেষ্টা করে। দুয়ারের কাছে এসে ঘাড় ঘুরিয়ে উঠোনের দিকে চাইতেই চমকে ওঠে। বুকের কাছে হাত বেড়ে ধরা ফুটবল। সিদ্ধার্থ দাঁড়িয়ে। ওর চোখ ছলছল করছে। থুতনি অবধি লজ্জায় অপমানে এবং এক ধরনের সীমাহীন গ্লানিতে ঝুলে পড়েছে যেন। ছলছল করা কান্না-অবরুদ্ধ চোখ সিদ্ধার্থ নিবারণের দিকে স্পষ্ট করে তুলতেও পারছে না।

সহসা কী হয়, সিদ্ধার্থ বলটা নিবারণের দিকে এগিয়ে ধরে। তারপর দু পা এগিয়ে এসে ধাঁই করে বলটাকে কেমন এক অচেনা ক্রোধে লাথি মেরে 'হাই' করে আকাশে তুলে দেয়। সে যেন তার শরীরের সমস্ত শক্তি বলটার ওপর প্রয়োগ করেছে। বলটা তখনও আকাশে। সিদ্ধার্থ ফুঁপিয়ে উঠে ঘরের মধ্যে ছুটে পালায়। নিবারণ আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না, তার কেমন কান্না পেয়ে যায়। বলটা লক্ষ করে বাইরে ছুটে আসে। বলটা বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা চিদাম্বর দু হাতে লুফে নেওয়ার চেষ্টা করে। পারে না। নিবারণের মনে হয়, সিদ্ধার্থ আর কখনওই খেলতে আসবে না। তার বিচ্ছেদ হয়ে গেল।

সিদ্ধার্থর চোখ ছলছল করছে, সে বলটাকে লাথি মেরে হাই করে আকাশে তুলে দিচ্ছে, ক্রমাগত এই দৃশ্য নিবারণকে ব্যথিত করে তোলে— দৃশ্যটা মনের ভেতর থেকে নড়তে চায় না। রাত্রে দৃশ্যটি স্বপ্নের ভেতর দেখতে পায় সে। একজন ভাল খেলোয়াড়, তাদের দলের সেরা খেলোয়াড় সিদ্ধার্থ এভাবে চিরকালের মতো বসে গেল !

অবশ্য সিদ্ধার্থ বসল বলেই নিবারণের উত্থান হয়েছে। সে 'তেরো' থেকে 'বারো'-য় উঠেছে। অতিরিক্ত তালিকায় তার নাম প্রথমেই জ্বলজ্বল করছে। নিবারণ স্বপ্নে যা ভাবতে পারেনি, তাই হল। সিদ্ধার্থ বসল, সে উঠল। এই ঘটনায় তার খুশি হওয়ার কথা। খুশি যে সে একেবারেই হয়নি তা নয়। তবে দুঃখও পেয়েছে। তার কেবলই মনে হচ্ছিল, শিবচরণ এতখানি কঠোর না হলেই পারতেন।

গত বছর শিবচরণ ভয়ানক কাণ্ড করেছিলেন। ফুটবলটা আউট হয়ে নিমাইচন্দ্র-সারের জমিতে গিয়ে পড়ল সন্ধের মুখে, তখনও পশ্চিম আকাশে গোধুলির রক্তিমা ছড়িয়ে রয়েছে। নিমাই-সারের পাটের ভুঁই। তখন গলাগলি পাটের চেহারা মাথা তুলেছে জমিতে। টিমের একজন জমিতে ঢুকে ফুটবল হাতড়াতে থাকল, খুঁজতে-খুঁজতে কত দূর ঢুকে গেল জমির মাঝ-বরাবর, কিন্তু কোথাও সে পেল না। আশ্চর্য ঘটনা ! বলটা তবে গেল কোথায় !

যে খুঁজছিল তার নাম নটে। নটের মাথা পাটের উচ্চতার আড়ালে ঢেকে গিয়েছে, কিন্তু তার গলা শোনা যাচ্ছে। "অম্বরদা ! পাচ্ছি না !"

"পাবি, পাবি, ভাল করে খোঁজ !"

দেখতে-দেখতে আরও দু-চারজন জমিতে ঢুকে গেল ফুটবল খুঁজতে।

চিদাম্বর সকলকে সাবধান করে বলল, "দেখো, যেন পাট নষ্ট না হয় ! সবাই ওভাবে

ঢুকছে কেন ! বরুণ আর শেতল যাক। তোমরা সবাই চলে এসো।”

সেই ফুটবল সেদিন আর পাওয়া গেল না। পরেরদিন সিদ্ধার্থ নিয়ে এল বাড়ি থেকে ! শিবচরণ পাটের ভুঁইয়ের ভেতর ‘ঘাপটি’ দিয়ে বসে থাকতেন। তবে এ-কথাও সত্যি, ফসল নষ্ট হত। প্রচুর পাট দাঁড়া ভেঙে কাত হয়ে শুকিয়ে যেত। নিমাই-সার শিবচরণকে নিশ্চয়ই উসকে রাখতেন হামেশা। ক্লাবের সঙ্গে একজন চাষির একটা হিমযুদ্ধ চলত মরসুম ভর। এভাবে তো পারা যায় না।

শুধু তাই নয়, গত মরসুমের একদিন প্রবল বৃষ্টিপাতের পর জমিতে ‘জো’ লাগল ধুন্ধুমার। সোঁদা গন্ধে খেলার মাঠ অবধি উতলা। ফুটবলের গায়ে লেগেছে গ্রাম-বাংলার মাটির দুরন্ত বীজ বোনার স্বপ্ন, খেতের মাটি লাঙলের ফলায় ঘা খেয়ে এলিয়ে আলগা হওয়ার সৌরভ। চাষির ছেলে সিদ্ধার্থ সেদিন এমনই ‘শট’ মারল ধাঁই করে গোলের দিকে যে, গোলকিপার ব্রিজেশের হাত ফসকে ‘নেট’ ছিঁড়ে বেরিয়ে গেল দুর্বার ফুটবল। খেলার স্বপ্নের রংও মাঠের সবুজ ফসলের মতো সুষমায় রঙিন। ঠিক সেদিনেরই ঘটনা।

শিবচরণ মাঠের কিনারে দাঁড়িয়ে হাঁক দিলেন, “ওরে সিধ্যে !”

সিদ্ধার্থ চমকে উঠে চাইল। বাবা মাথায় একটা মস্ত ধামা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। সিদ্ধার্থের পায়ের তলায় বলটা গড়িয়ে এসে থামল। কোনও কথা না বলে সে মাঠ থেকে ঘাড় নিচু করে বেরিয়ে গেল। বীজ ভর্তি ধামাটা বাপ তার মাথায় চাপিয়ে দিয়ে বললেন, “চ। নে, চ। শিশারডিহিতে জমি ডাকছে। আয় শিবচরণ, আয় সিধ্যেকুমার !”

সিদ্ধার্থ ঝাপসা চোখে শিশারডিহির দিকে হাঁটতে-হাঁটতে অর্ধস্ফুট গলায় আপন মনে বলল, “খেলার মাঠও যে অমনই ডাকে বাবা !”

রাত্রে নিবারণ মেঝেয় আসন পেতে বাবার সঙ্গে খেতে বসে বলল, “বাবা, এ-বছর আমি খেলছি। প্রত্যেকটা খেলায় আমি আছি। তুমি শুনলে অবাক হবে, একটা লিস্টে আমার এক নম্বরে নাম। যদি একটা গোল আমার পায়ে কুট্টি ওসমানকে কাত করতে পারে, জানবে সামনের বছর তেঁতুলিয়ার টিমে আমি পার্মানেন্ট হচ্ছি। আর তখন নিমাই-সারও আমায় কদর করে ডাকবেন। দেখে নিও !”

বউদি শ্বশুরমশাই নারায়ণ নস্করের খাবার থালার দিকে মাছের বাটি সামান্য এগিয়ে ঠেলে দিয়ে বলল, “এ-বছর সিধে কিন্তু খেলছে না বাবা !”

নস্করমশাই অবাক হয়ে বললেন, “পরশু তো সেমিফাইনাল খেলা। গঞ্জের টিম আর আমাদের তেঁতুলিয়া। নিমাই-মাস্টার গোলকিপার আর সেন্টার ফরোয়ার্ড ‘হায়ার’ করেছে শুনলাম। ছোকরা ভয়ানক বুদ্ধি ধরে ! লোকে বলছে, হুড়সি কলিকাপুর আর তোমার মধুরকুল কুঠির টিম খেলল না এই সন। কেননা গঞ্জের সঙ্গে কী সব কথাবার্তা হয়েছে নাকি। এখন বোঝা যাচ্ছে না পরশু মাঠে কী দৃশ্য দেখব ! সিধে খেলছে না, মানেটা কী ?”

বউদি বলল, “মানে কী করে বলব বাবা। সবই হল ইশারা ! রাজ-ভাগীদার ইশারা করতেই সিধে বসে গিয়েছে।”

“অ, সেইজন্যই নিবুর এত চাহিদা ! তবে তেঁতুলিয়ার ইজ্জত এবার যাবে। শিবচরণ জমি ছাড়া কিছুই বোঝে না। এমনিতে কোনও ইশারাই বোঝে না। জমি-জিরাতের তুচ্ছ ইঙ্গিতটাও কিন্তু বোঝে ! আমি তো দর্শক মাত্র। যাব। বসব। খেলা দেখব।”

খাওয়া বন্ধ করে কথা বলছিলেন নস্করমশাই। তারপর ফের খেতে শুরু করে দেখলেন নিবারণ খাওয়ার থালা ফেলে হঠাৎ মুখ ভার করে উঠে চলে গেল !

বাবা হেসে ফেলে বললেন, "আমার কথা নিবুর পছন্দ হল না বউমা।"

এই কথাটুকুও কানে এল নিবারণের। সে এখন দেওয়ালের নামী-দামি খেলোয়াড়দের সামনে দাঁড়িয়ে। তার জীবনের চরম স্বপ্ন পরশুর বিকেল। এরকম একটা দুর্দান্ত খেলায় সে খেলতে পাবে। অথচ বাবার কোনওই আগ্রহ নেই। কত কষ্ট করেছে নিবারণ। জ্যোৎস্না রাতে সাইকেল ঠেঙিয়ে ফেরা, চিঠি বওয়া, কুঠিতে রাত্রিবাস করা— কী ভয়ানক সব দৃশ্য। পরশু কী হবে কে জানে!

তামাম রাত্রি নিবারণের উত্তেজনায় কাটল বটে, কিন্তু খেলার আগের দিন ভোরে সহসা তার মন খারাপ হয়ে যেতে লাগল শুধু একটি দৃশ্যে!

সূর্য উঠেছে সবে। জানালায় ধাক্কা দিল কেউ। জানালা খুলেই ভোরের আলোয় সে দেখল ম্লান একটি মুখ। মাথায় মাথাল। পরনে ধুতি। খালি পা। গায়ে সাদা গেঞ্জি। সব কেমন খাটো-খাটো। এই কি সিধের চেহারা! সিধে বলল, "কাল সেমিফাইনাল খেলা! না রে নিবু? তুই তো খেলছিস শুনেছি! আমি দর্শক। তুই প্লেয়ার। আমি তোকে চিয়ার্স দেব। গুডলাক নিবু!"

বলেই মুখটা জানালার নীচে নেমে গেল। মানুষ কী অদ্ভুত হয়। নিমাই-সার কী মারাত্মকভাবে সিধেকে বসিয়ে দিয়েছেন! জানালার শিকে চোখ ঠেলে গাল ঠেকিয়ে রাস্তায় সিদ্ধার্থকে দেখবার চেষ্টা করল নিবারণ। বাপের পিছু-পিছু মাঠের দিকে চলে যাচ্ছে সিদ্ধার্থ, যেন ছুটে চলে যাচ্ছে বাপ আর ছেলে! জমি তাদের 'আয়, আয়' করে ডাকছে!

সারাটা দিন মন আর কিছুতেই ভাল করে তুলতে পারল না নিবু। কেবলই তার মনে হতে লাগল, সে যেন কী একটা অন্যায় করছে। অথচ স্বপ্ন দেখাটা তো কোনও অন্যায় নয়। দেওয়ালে ছবি সাঁটা, ফিক্সচার সাঁটা, স্বপ্নে গোলকিক করে পা ভেঙে ফেলা, সাইকেল ছুটিয়ে গিয়ে কুঠিতে সাহেব-মেমদের ভৌতিক খেলা দেখে আসা ছেলে সে। নস্করবাড়ির বোকা ছেলে। স্বপ্নের থই নেই, কিনারাও নেই। কিন্তু সিধের স্বপ্নটা যেন আরও দীর্ঘ, আরও উত্তাল! সে তবে কী করবে!

চিদাম্বরের কাছে এল নিবারণ। কী যেন বলতে চাইল। পারল না। "কিছু বলবি? শরীর ঠিক আছে তো? কাল তোর চান্স নিবু। খুব দম চাই।" বলল চিদাম্বর।

নিবারণ শুধাল, "কাদের হায়ার করছেন নিমাই-সার!"

"নানারকম শুনছি! গোলকিপার কুট্টি আর সেন্টার ফরোয়ার্ড সনাতন! ভেবে দ্যাখ, সিধেটা আমাদের কীরকম দুঃখ দিচ্ছে। একজন চাষি আসলে চাষ বোঝে, খেলাটা বুঝতেই চায় না। কেন রে নিবু?"

বলতে-বলতে চিদাম্বরের গলা যেন হাহাকার করে উঠল। বারবার নিবুর চোখের সামনে ভাসতে থাকল ছবি। ক্রমাগত ছবি। তকলি ঘোরাচ্ছেন শিবচরণ। ফুটবলে ধাঁই করে হাই করল চোখে জলভরা সিদ্ধার্থ। বাপের পিছু-পিছু ছুটে চলেছে মাথাল মাথায় সিদ্ধার্থ। 'গুডলাক নিবু।' কানের কাছে স্পষ্ট বেজে উঠল কথাটা।

আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না নিবারণ। পাগলের মতো বাড়ির দিকে ছুটে আসতে লাগল। তখন মধ্য আকাশে ক্রোধী সূর্যের তেজালো জিহ্বা মাটিকে শুষছে। ছোট উঁচু পিঁড়িতে বসে উঠোনের কোণে বাবা নাদা থেকে জল তুলে মাথায় ঢালছেন। সামনে এসে দাঁড়াল নিবারণ।

বলল, "শিবচরণকে ভাগচাষে দু' বিঘে জমি দেবে বাবা।"

বাবা জলভরা ঘটি মাথার ওপর তুলে ধরে বললেন, "চান করো। তোমার মাথার ঠিক নেই। জমি জিনিসটা খেলাধুলো নয়। চাইলেই পাওয়া যায় না। মাথায় জল ঢালো শিগগির!"

অদ্ভুত একটা ক্রোধ হতে থাকল নিবারণের শরীরে। তার কেমন একধারা কান্না পেতে লাগল। দুপুর গড়াল। রাত্রি হল। বাবা তাকে আর কোনও কথাই বললেন না।

পরের দিন খেলার মাঠে এসে ভয় পেয়ে গেল নিবারণ। সামনে কুট্টি ওসমান পাহাড়বৎ দাঁড়িয়ে আছে। চিদাম্বর ভুল করে স্বপনকে সনাতন বলে। কেমন একভাবে মাথাটা ভারী হয়ে আছে নিবুর। বুকে ভয়। যেন ত্রাস। ত্রাস কেবল তার নয়। মনে হল সমগ্র তেঁতুলিয়া কাঁপছে। হঠাৎ সে স্বপনকে দেখে আরও ভয় পেয়ে গেল। এ যে অবিকল সনাতন। সন্ন্যাসী নয়। মৃত একজন মানুষ। এবং হঠাৎ-ই চোখ পড়ল ভিখুর ওপর। মুহূর্তে এই মাঠ আর নিবারণের কাছে বাস্তব রইল না। প্রথমে হল স্বপ্নের মতো। তারপর একটা ভৌতিক হাওয়া উঠল আকাশে। সেটি মাঠের দিকে নামতে লাগল। বাতাস নামছে, তা যেন ঘাড় তুলে দেখতে পাচ্ছিল নিবারণ নস্কর।

অদ্ভুত ঘটনা আরও দেখা দিতে লাগল। ভিখুর পাশে বসে আছে সিদ্ধার্থ। নিবারণ মনে-মনে ডাকল, "আয়! আয়! সিধে!..." ব্যাকুল স্বর গলার ভেতর কেঁদে উঠল।

সহসা খেলা শুরু হল। দু মিনিটের মাথায় গোল খেয়ে গেল তেঁতুলিয়া। 'গোল', 'গোল' চিৎকারে যেন স্বপ্নের সমুদ্র নেচে চলেছে। সহসা নিবারণের মনে হল, পরাজয় নিশ্চিত। সামনে একটা সুযোগ যদি আসে সে কী করবে! ভাবতে-না-ভাবতে একটা চান্স সে পেয়ে গেল। তার পায়ে বল, সামনে কুট্টি। বাধা দেওয়ার কেউ নেই। কিন্তু সনাতনের ভূতটা কোথা থেকে দুর্বার আস্ফালনে ছুটে এসে নিবুকে আগলে দাঁড়াতেই মনে পড়ল, এই লোকটা একটা ফোটোমাত্র। জন্ম এত সন। মৃত্যু এত সালে। একটা চার্জ হয়ে গেল। অজ্ঞান হয়ে বিপক্ষ দলের গোলের কাছে লুটিয়ে পড়ল নিবু। হায়-হায় করে উঠল সমগ্র দর্শক।

অজ্ঞান নিবারণকে বাইরে টেনে আনা হল। মাঠের বাইরে! নস্করমশাইয়ের মনে হল, লজ্জায় তাঁর ছেলে সংজ্ঞা হারিয়েছে। এই অপমান সইবার লোক তিনি নহেন। ছেলের চোখেমুখে জল ছিটিয়ে তাজা করা হল! তিনি শিবচরণকে কাছে ডেকে বললেন, "সিধেকে নামিয়ে দাও শিবচরণ! নিবুকে ভূতে ধরেছে! দুই বিঘা দশ ডেসিমল তোমায় দিচ্ছি শিশারডিহি। নিমাইয়ের জমিতে বল যাতে না যায় সেইজন্য দামি 'নেট' দেব। তোমার নন্দন পড়বে, তজ্জনিত খরচাদি আমার। সাধু ভাষায় বলছি শিবচরণ। অমান্য কোরো না!"

সিদ্ধার্থ নামল মাঠে। নস্কর ছেলেকে শুধালেন, "তোর ভূতটা কি ঘাড় থেকে নেমেছে নিবু?"

"খেলার ভূত কি সহজে নামে বাবা! কত কষ্টে নামে!"

সনাতন এবার সিধের পিছু-পিছু ছুটছে, কুট্টি চিত। বল ঢুকে যাচ্ছে বিপক্ষের বুক ভেদ করে জাল অবধি গড়াতে-গড়াতে। নিবুর দুই চোখে জল। ময়দান ঝাপসা দেখায়। আয়, আয় করে ডাকে। নিবারণ বসে থাকে। নামতে পারে না। স্বপ্নের ময়দানে তখন লড়াই তুঙ্গে।

কবিগুরুর ক্রিকেট খেলা

ব্রহ্মণ্যভূষণ ও ক্ষমা বন্দ্যোপাধ্যায়

খেলোয়াড় হিসাবে,— Sportsman হিসাবে আমাদের কেউ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথকে চিনি কি ? তাঁর Sportsman careerটি তিনি সম্পূর্ণ ভাবে লোকচক্ষুর অন্তরালে রাখিয়াছেন। ভবিষ্যতের সাহিত্য-রসিকগণ রবীন্দ্রপ্রতিভা সম্বন্ধে নানাবিধ অনুসন্ধান (research) করিবেন। আমরা এখানে রবীন্দ্রনাথের এক দিনের খেলার কথা লিখিতেছি।

The Idea! কবি চঞ্চল হইয়াছেন। নূতনের ডাক তিনি কেমন করিয়া রুধিবেন ? অঘটন-ঘটন-পটীয়সীর কেরামতি বলিব, না হঠাতের লীলা বলিব জানি না। ঠিক যেমন নিউটন সাহেব আপেল ফলটি পড়িল কেন ভাবিতে বসেন, অথবা মহর্ষি জমিদারী পরিক্রমার পথে ছাতিমতলার স্নিগ্ধ ছায়ায় বসিয়া এক—

"প্রাণারামং মম আনন্দম্
শান্তি-সমৃদ্ধম্ ঔদার্য্যম্"—

স্থান খুঁজিয়া পান, কবিও সেইরূপ এক দিন রেলেতে পরিভ্রমণ কালে গোমো জংশন রেলওয়ে-স্টেশনে পাদচারণা করিতেছিলেন, হঠাৎ শুনিতে পাইলেন একজন যুবক নজরুলী সুরে গাহিতেছিল—

"ক্রিকেট, এসো এসো ডাকিছ্ মোরে ভাই
গেছি ত তোর বুকে আমি ত হেথা নাই
প্রভাত-আলো সাথে ছড়ায় প্রাণ মোর
আমার জ্ঞান দিয়া ভরিব জ্ঞান তোর।"

কবি গোমোতেই ক্রিকেট খেলিবার বাসনা প্রকাশ করিলেন। আশ্চর্য হইবার কিছু নাই। কবি কলিকাতার রঙ্গমঞ্চে ঋতুরঙ্গ দেখাইয়াছেন, নিদারুণ গ্রীষ্মেও হৈমন্তিক আবহাওয়া বহাইয়াছেন, বৈশাখের রুদ্র তেজের মধ্যেও সঙ্গীত ও নৃত্য দ্বারা শীতের নাচন লাগাইয়াছেন, তিনি যে সুকোমল তরুণ-তরুণীদের লইয়া Tagore Wonderers তৈরি করিবেন, কিংবা গোমোতেই ক্রীড়াক্ষেত্র করিবেন তাহাতে আশ্চর্য কি ? বিশেষ গোমো যখন B.N.R., E.I.R. ও C.I.C. রেলওয়ে লাইনের সংযোগস্থল, কি কলকাতা কি উত্তর-ভারত এবং ছোটনাগপুর উপত্যকা সমস্ত দেশ হইতে সংযোগ স্থাপনের সুবিধা আছে।

আজ প্রভাতে আনন্দ যায় চঞ্চলি। অনন্ত আনন্দে সকলে উদ্বেল। আনন্দের সঙ্গে

উন্মাদনাও আছে। কবি ক্রমাগত সুর সৃষ্টি করিয়া যাইতেছেন, শিষ্যগণ কথার চরণগুলি লিখিয়া লইতেছে, দিনু ঠাকুর সুর তুলিয়া লইতেছেন— গোমোতে এক "অভিনব স্বর্গ-লোক হইল সৃজন"।

সব আয়োজন হইয়াছে। মাঠ ঠিক হইয়াছে, স্টেশন হইতে অদূরে ছোট পাহাড়টি পার হইয়া গেলে যে উপত্যকা পড়ে, সেইখানে। উপত্যকার এক দিকে পাহাড়শ্রেণী, অপর দিকে পার্বত্য স্রোতস্বিনী জামুয়া। উপত্যকার এক প্রান্তে কবির শিবির, অপর প্রান্তে রাজন্যবর্গের তাঁবু।

বলা হয় নাই, খেলার সব বন্দোবস্ত হইয়াছে, অপর পক্ষ Princes' Eleven। পাতিয়ালা, পতৌদি, দলীপসিংহজী ও আরো অনেকে নিজ নিজ প্লেনে আসিলেন। কুচবিহারের মহারাজা আসিলেন মোটরে, মোটর-চালক স্বয়ং মহারাণী এক টানেই (One lap) আগে ভাগেই পৌঁছিয়াছেন। প্লেনে যাঁরা আসিলেন তাঁহাদের landing-এর কোন অসুবিধা হইল না, কারণ প্রান্তর বিস্তীর্ণ, হাজারিবাগ জেলা, রুক্ষ মালভূমি দিগন্ত-প্রসারিত। তাঁহাদের Camp সারি সারি পড়িয়াছে। অনেক বড় বড় রাজারা আসিয়াছেন— স্বয়ং কবিগুরুর Team-এর সহিত খেলা, কেহই miss করিতে চাহেন না। যাঁহারা Cricket খেলেন না, শুধু শিকার ও অন্যান্য মনোবিনোদন কার্যে সময় ব্যয় করেন তাঁহারাও আসিলেন।

কবিগুরু চঞ্চল হইয়াছেন— খেলার দিন সন্নিকট। কিন্তু তিনি কি শেষ পর্যন্ত বিদেশি জিনিস ব্যবহার করিবেন— ব্যাট, বল, স্ট্যাম্প প্রভৃতির জন্য তাঁহার চিরদিনের সংস্কার কলুষিত করিবেন? ইউবেরয়, এস রয় প্রভৃতি সমস্ত দেশী দোকানদার আসিলেন, কিন্তু কবির চক্ষে ধূলা দেওয়া অত সহজ নয়, তিনি বুঝিতে পারিলেন, ইহারা বিদেশী ব্যবসায়ীর এদেশী এজেন্ট মাত্র।

তাই কবি বাহিরিলেন দেশী ব্যাটের সন্ধানে। প্রথমে যে গ্রামে গেলেন তাহার নাম গুণঘুসসা। এবং যে কাষ্ঠের সন্ধান পাইলেন— যাহা দ্বারা ভাল ক্রিকেট-ব্যাট তৈয়ারি হইতে পারে তাহার নাম জানিলেন "আঁকো"। কাঠ খুব শক্ত সন্দেহ নাই, কিন্তু "আঁকো" নামটা যেমন শ্রীহীন তেমনই বীভৎস গ্রামের নাম "গুণঘুসসা"। কবি তৎক্ষণাৎ তাঁহার কয়েকজন শিষ্যের সহযোগিতায় ছোট্ট একটি শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠান দ্বারা ঐ কাঠ ও গ্রামের নূতন নামকরণ করিলেন অঙ্কন ও অঙ্কবর্তিকা। আঁকো চলতি নাম— আসল নাম অঙ্কন এবং অঙ্কন কাঠের দ্বারা সুসজ্জিত গ্রামের নাম হইল অঙ্কনবর্তিকা বা আঁকাবাট।

ব্যাট হইল, স্ট্যাম্প হইল কিন্তু ভাল ম্যাটিং চাই, না হলে বলের পিচ ঠিক বুঝা যাইবে না। সময়টা শীতকাল, মাঠে ঘাস ত নাই-ই, সুতরাং Turf কথাটা মনেই পড়ে না। কিন্তু দুঃখ কি— মেদিনীপুর হইতে শীলা মাইতি অনেক মছলন্দ আনিয়া দিলেন। রাজন্যবর্গ বিলাতের Turf, matting সবই দেখিয়াছেন, কিন্তু এমন চিত্র-বিচিত্র মছলন্দ কখনও দেখেন নাই।

খেলার দিন সমুপস্থিত। শুভ মুহূর্তও সমাগত। প্রভাত বেলা— অরুণ আলোর অঞ্জলি না থাকিলেও রোদটি খুব মিঠা। খেলা সকালে হইবে— মধ্যাহ্নে বিশ্রাম। আবার বৈকালে খেলা। তাঁহার বিদ্যায়তনেও এই নিয়ম। দ্বিপ্রাহরিক মুহূর্তগুলি বিশ্রামের জন্য। বৃথা পরিশ্রমে জর্জরিত হইবার জন্য নহে।

ব্রাহ্ম-মুহূর্তে তিনি শয্যাত্যাগ করিয়াছেন। বাদল বাবুর বাড়িতে তিনি অতিথি। সম্মুখের পাহাড়ের উপর যে প্রশস্ত স্থানটি আছে, সেইখানে তাঁহার প্রার্থনা-বেদী স্থাপিত

হইয়াছে। একতারাটি হাতে লইয়া সূর্যের প্রথম রশ্মিকে তিনি সামবেদের মন্ত্রে অভিনন্দন জানান। তাহার পর তিনি আত্মসমাহিত হইয়া ধ্যান করেন। তাঁহার দুই পার্শ্বে দুইটি Pet—বামে ময়ূর "কেকা", দক্ষিণে হরিণ "তৃষ্ণা"। সম্মুখে ক্ষুদ্র রৌপ্যাধারে আদা, ছোলা ও কফি। তৃষ্ণা ও কেকা আদা-ছোলার প্রসাদ পাইবার পর তবে নড়িবে। হঠাৎ কবি একটি নতুন সুরের সন্ধান পাইলেন। সুমিষ্ঠ কণ্ঠে ডাকিলেন, "দিনু" "দিনু"। তাঁর সে মধুর কণ্ঠস্বরের নিকট বীণা মুরজ-মুরলী লজ্জা পাইল। দীনেন্দ্র ঠাকুর ইদানীং অত্যন্ত মোটা হইয়া পড়িয়াছেন। বনিয়াদী জমিদারবংশের সন্তান, পেলব-তনু রাখা তাঁহার পক্ষে খুবই শক্ত। তবু তিনি আগেভাগেই কবির নিকটে নিজের আসন রাখেন— কারণ, কখন কি সুর তুলিয়া লইতে হইবে কে জানে? এবারও তিনি সুরটি তুলিয়া লইলেন, কিন্তু ক্রিকেট খেলার বিবরণের সঙ্গে সেটা অবান্তর বলিয়া লেখা হইল না।

ওদিকে রাজন্যবর্গের তাঁবুতে কর্মব্যস্ততা দেখা দিয়াছে। সাজ সাজ রব পড়িয়া গিয়াছে। মহারাজ বাহাদুরেরা ও তাঁহাদের সাঙ্গোপাঙ্গগণ আর চিত্তচাঞ্চল্য রোধ করিতে পারিতেছেন না। ইতিমধ্যেই নিজ নিজ শরীর সম্মার্জিত করিয়া Flannels চড়াইয়া লইইয়াছেন। তাঁহাদের Blazer-এ তাঁহাদের কৃতিত্ব-চিহ্ন আঁকা। কেহ বা Cambridge-এর Blue, কেহ বা M.C.C-র সভ্য, ইত্যাদি। তাঁহাদের তাঁবুতে স্কটিশ হাইল্যান্ডার দলের ব্যাগপাই (Pipe Band) বাজিতেছে। স্যর ভি জি ব্যাট-হাতে ছুটাছুটি করিতেছেন।

কিছু দিন কংগ্রেসী রাজনীতি অনুধাবন করার ফলে তাঁর ইচ্ছা সানাই বাজনোর ব্যবস্থা করেন। কাশীধামে তাঁর বন্ধু মহারাজা প্রদ্যোতকুমারের বাড়িতে সানাই-এব মৃদু মূর্চ্ছনা তাঁর প্রাণে অপরূপ পুলক জাগাইয়াছিল। তিনি সে কথা পাতিয়ালাকে জানাইবার পূর্বেই তাঁদের কোন বিলাতী বন্ধু এক জন বড় স্কটিশ পীয়র (Scottish Peer) তাঁর Pipe Band পাঠাইয়া দিয়াছেন— উড়োজাহাজে তাহারা আসিয়া গিয়াছে।

কবির Player-রা সব ready। অধ্যাপক ক্ষিতিমোহন সেন ও আচার্য বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিলেন— মাঠের পূজা ও দেবতার বন্দনা-গান হইল। এ কার্যে সক্রিয় সহযোগিতা দিলেন বালিগঞ্জের শীলা ও মীরা এবং বেহালার ঋতা গাঙ্গুলী।

কবির এ খেলার কথা (Reuter) রয়টার সারা পৃথিবীতে প্রচার করিয়া দিয়াছে। সভ্য জগতের sportsman-রা কবিকে নিজেদের দলে পাইলেন বলিয়া আনন্দে উৎফুল্ল এবং কবিকে জয়যুক্ত করিবার জন্য ইচ্ছা তাঁহারা প্রত্যেকে টেলিগ্রামে প্রকাশ করিলেন।

All India Radio কবির লেখা উৎসারিত করিবার জন্য গোমোতে হাজির। রয়টার, এ পি, ইউ-পির প্রতিনিধিরা আগেভাগেই পৌঁছিয়াছেন এবং কবির সেক্রেটারি অমিয় চক্রবর্তীকে প্রশ্নের পর প্রশ্নে জর্জরিত করিয়া তুলিলেন।

ক্ষুদ্র গোমো আজ লোকে লোকারণ্য। পাহাড় দুইটির কোলে একজোড়া তাঁবু দেখা যাইতেছে। কবির তাঁবু হইতে কী সুর ভাসিয়া আসিতেছে— বোধ হয় বেদগান গীত হইতেছে। কথা আছে, "আবৃত্তিঃ সর্ব্বশাস্ত্রানাং বোধাদপি গরীয়সী"। বেদ আমরা বুঝি না, কিন্তু সেই শব্দ-ব্রহ্মে বিলীন হইয়া আমাদের আত্মা তখন সীমার মধ্যেও অসীমের সুমধুরতার আস্বাদ পাইল। দেখা গেল, কবি তাঁবুর বাহিরে আসিতেছেন, কিছুটা পুলকিত, কিছুটা উদ্বেলিত। কিন্তু কই তাঁহার পরনে খেলার পোষাক নাই ত! অবশ্য ভিন্ন দেশে প্রস্তুত অথবা তাঁহাদের অনুকরণে তৈয়ারি কোন ফ্লানেল প্যান্ট বা ব্লেজার পরিতে আমরা কোন দিন আশা করি নাই, কিন্তু তাঁর হাতে ওটা কি? সেই "অঙ্কন" জাত, হাতে গড়া

খাঁটি নির্ভেজাল অনাবিষ্কৃতপূর্ব ব্যাট নামধারী সোঁটা। পরনে তাঁর সেই সর্বতনু-পরিব্যাপ্তকারী আগুলফবিলম্বিত আলখাল্লাটি। প্রভাত-সমীরণে তাঁর সুন্দর সুকোমল রেশমী চুলগুলি উড়িতেছে। যদি ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হইতে হইতে এক দমকা বাতাসে কয়েক গাছি চুল চোখে-মুখে আসিয়া পড়ে, এবং সেই মুহূর্তে বিপক্ষের একটা সরোজ-নিক্ষিপ্ত বল…ওঃ শান্তিনিকেতনের রেণুকা রায় আর ভাবিতে পারেন না। শীলাকে সঙ্গে লইয়া তৎক্ষণাৎ তিনি দৌড়াইয়া কবি-সন্নিধানে গেলেন এবং রুদ্ধকণ্ঠে ডাকিলেন—গুরুদেব।…কবি তাহাদের মুখের দিকে তাকাইয়াই তাহাদের মনোভাব বুঝিলেন— এবং বালিগঞ্জের জেদী মেয়ের কাছে হার মানা অবশ্যম্ভাবী জানিয়া মাথা নীচু করিয়া দিলেন। দুই বান্ধবীতে একটা হেলিয়োট্রোপ রঙের কাপড় বৃহত্তর ভারতীয় পদ্ধতিতে মাথায় জড়াইয়া দিলেন— খানিকটা বর্মী, খানিকটা যবদ্বীপীয় ফ্যাশনে।

ট্যাগোর ওয়ানডারার্স তাঁহাদের তাঁবু হইতে নির্গত হইলেন। পুরোভাগে চলেছেন কবি তাঁহার "অঙ্কনা" হাতে। তাঁহার পশ্চাতে আছেন মহামহোপাধ্যায় বিধুশেখর শাস্ত্রী ও ক্ষিতিমোহন সেন প্রভৃতি। ছেলে-ছোকরাদের মধ্যে ধীরেন সেন, অনিল চন্দও আছেন। তাহাদের পরনে ধুতি, মালকোঁচা বাঁধা। গায়ে হাফ-পাঞ্জাবি, চলতি ভাষায় যাহাকে নিমে বলা হয়। মাথায় তালপাতার হাল্কা টোকা। কৃষকেরা রৌদ্রে বৃষ্টিতে যেরূপ শিরশ্ছেদন ব্যবহার করিয়া রৌদ্র ও বৃষ্টি হইতে মাথা বাঁচায় সেইরূপ আর কি। মেয়েরা শাড়ী পরিয়াছেন মহারাষ্ট্রীয় প্রথায়— তাঁহাদের দেখিতে অনেকটা রাজা রবি বর্মার ছবির নায়িকাদের মত। মেয়েদের মধ্যে দেখা গেল, বাদল দেবের শিষ্যা শেলী (শেফালীর ফা বাদ) ও মণি বেন যিনি গরবী নৃত্যকে জীবনের নিত্য-নৈমিত্তিক ভঙ্গিমার মধ্যে মূর্ত করেন এবং বৈষ্ণব চূড়ামণি শ্রীশ্রীপঞ্চুল বিষণগড় রাজের রাজকুমারী শর্মিলা যিনি A.A.B. পরিচালিত মোটর-দৌড়ে প্রথম স্থান অধিকার করেন। এঁরা, ওঁরা এবং আরও অনেকে আছেন।

ওদিকে রাজাদের তাঁবুতে আছেন স্বাধীন ত্রিপুরার পঞ্চশ্রী সেনবর্মা, পাতিয়ালার রাজা, পতৌদির নবাব, বিজয়নগরম-এর স্যর ভি জি ও নিজাম-নন্দন প্রিন্স অব বেরার। ওদিককার তাঁবুতে দেখা যাইতেছে গায়কোয়াড়-দুহিতা, বারদোয়ানের মহারাজাধিরাজ-কুমারী এবং ফ্রান্সে সুশিক্ষিতা শামসের জঙ্গ বাহাদুর রানার কন্যাদ্বয়। তাঁদের নৃত্যদোদুল ছন্দে চলন-বলন দেখিলেই বোঝা যায়, রাজাদের খেল'তে ও সর্বকর্মে প্রাণসঞ্চার করার জন্য তাঁহাদের উপস্থিতির প্রয়োজনীয়তা।

কবিগুরু মাঠে নামিতেই শান্তিনিকেতনের স্পেশাল ফটোগ্রাফার শম্ভু সাহা একটি ছবি তুলিলেন। অরোরা ফিলম করপোরেশন ছবি তুলিবার জন্য set প্রস্তুত করিয়া সময় গুণিতেছেন। বিশ্ব-ভারতীকে অনেক টাকা দেওয়ায়, কবি অরোরার অনুরোধ মঞ্জুর করেন। সূর্যদেব তখন দিক্‌চক্রবাল ছাড়িয়া অনেকটা উপরে উঠিয়াছেন। শারদ-রবির সোনালি-আলোয় দিঙমণ্ডল উদ্ভাসিত। কবি ও মহারাজা পাতিয়ালা Toss-এর ফলাফল দেখিবার জন্য ঝুঁকিলেন। রাজন্যদলেরই জয়— তাঁহারাই খেলা আরম্ভ করিবেন। টস তাহারা জিতিয়াছেন তাঁদের খুসী তাঁহারা ব্যাট করেন বা বোল করেন। পাতিয়ালা বলিলেন— So poet, you lose the toss but I hope you will win the Game—কবি, আপনি হারিলেন বটে, কিন্তু খেলাতে আশা করি জিতিবেন। অপূর্ব সে কথনভঙ্গী, সেই আড়নয়নের দৃষ্টিপাত, কাঁধের পেশী সঙ্কোচন, নাসিকার উন্নত ভাব—সবই অনবদ্য ভাবে বিলাতী অ্যারিস্ট্রক্রেসির ছাপ মারা।

খেলা শুরু হইল। প্রথম ব্যাট ধরিলেন মহারাজা কুচবেহার। পরের কাহিনী পরে।

ওস্তাদের মার

গৌরাঙ্গপ্রসাদ বসু

ফুটবল খেলত বটে রাধাকান্ত ! হ্যাঁ, খেলার মত খেলা। এখন আর সে খেলে না, খেলা ছেড়ে দিয়েছে।

তোমরা বলবে, কে রাধাকান্ত ? ফুটবল সে খেললই বা কবে— আর তা ছাড়লই বা কখন ?

দর্জিপাড়া ফুটবল ক্লাবের ভেটের‍্যানরা কিন্তু বলবে, রাধাকান্তর খবর তোমার রাখবে কি ? খেলা একখানা খেলেছিল বটে গদাধর মেমোরিয়াল শীল্ডের ফাইনালে। ক্লাবের হয়ে সে ওই একদিনই খেলেছিল— ওই একদিনই তার খেলা দেখবার সুযোগ হয়েছিল সবার। কি খেলাই খেলল— সমস্ত'খন মাঠে ঠায়ে দাঁড়িয়ে— চুপচাপ— যেন খেলার মধ্যে সে কেউ নয়— কিন্তু তারপর যাকে বলে— ওস্তাদের মার শেষরাত্রে !

তোমরা এত প্রশংসা শুনে বোকা বনে হয়তো জানতে চাইবে রাধাকান্তবাবু খেলা ছেড়ে দিলেন কেন। এতই যখন ভাল খেলতেন তখন মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গলে খেললেই পারতেন।

এর উত্তর দর্জিপাড়া ক্লাবের কেউ দিতে পারবে না। দর্জিপাড়া ক্লাবের বাইরেও কেউ না— শুধু আমি ছাড়া। কেননা আমিই সেই রাধাকান্ত বটব্যাল !

আমি রাধাকান্ত বটব্যাল ছেলেবেলা থেকে ম্যালেরিয়া ও পিলেতে ভুগছি। মাথার একটা অসুখও ছিল। মোটকথা, মাঠে গিয়ে লাথি মারা দূরে থাক— ঘর থেকে বাইরে বেরিয়েছিই খুব কম।

সেবার বছরখানেক শরীর স্বাস্থ্য বেশ ভালই ছিল। রাস্তাঘাটে ফুর্তিসে ঘুরে বেড়াতে পারছিলাম। এই সময় বাড়ি বদল করে টালা থেকে দর্জিপাড়ায় উঠে এলাম আমরা। শরীর রুগ্ন— কাজেই এ পর্যন্ত কাজের চেয়ে কথার বহরই আমার ছিল বেশি। গল্পগুজব— চালচালিয়াতি আমার ভারি ভাল লাগতো। শরীর ভাল হবার পরও অভ্যেসটা ভাল হয়নি। দর্জিপাড়ায় এসেই পাড়ার ক'জনকে ধরে শুনিয়ে দিলাম— আমরা বাঙ্গালোর থেকে আসছি। বাঙ্গালোরে স্পোর্টসে বিশেষ করে ফুটবল আমার খুব নাম আছে। গত সীজনে আমি একাই গোল দিয়েছি বাহান্নটা।

একজন পাড়ার লোক জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি কি পোজিশনে খেলতেন ?'

ভেবে-না-ভেবেই বলতে যাচ্ছিলাম ব্যাকে— কিন্তু আর একজন পাড়াটে বলে উঠল, 'নিশ্চয়ই সেন্টার-ফরোয়ার্ডে—'

বললাম, 'ঠিক ধরেছেন—' কেননা চিন্তা করে দেখলাম বাহান্নখানা গোল দিতে হলে আমার সেন্টার-ফরোয়ার্ডেই খেলা উচিত।

বাহান্নখানা গোল তো অভ্যাসমত বলে দিলাম। হায়, তখন কি আর জানি এ চালেই বানচাল হব। পরদিন সকালেই হৃষ্টপুষ্ট জনছয়েক এসে আমাকে ডাকাডাকি, 'রাধাকান্তবাবু, রাধাকান্তবাবু !'

ডাকাডাকির কারণ শুনে তো আমার প্রাণ ভয়ে উড়ে গেল। শুকনো গলায় কোন মতে বললাম, 'আজ বিকেলে ?'

'হ্যাঁ, আজ গদাধর শীল্ডের ফাইনাল ফ্রেন্ডস ইউনাইটেডের সঙ্গে। আজ আমাদের হয়ে আপনাকে খেলতেই হবে—আমাদের সেন্টার-ফরোয়ার্ড ফ্রেন্ডস ইউনাইটেডের কাছে ঘুষ খেয়ে বজবজ পালিয়েছে— আজ আপনি আমাদের রক্ষা করুন— অমত করবেন না !'

অমত করলাম না। ঠিক করলাম দুপুরে বেরিয়ে যাব আর বাড়ি ফিরব রাত করে। তারপর বলে দেব জরুরি কাজ ছিল। গদাধর-শীল্ডের বিপদও কেটে যাবে— চালও বজায় থাকবে।

দুপুর বেলা খেয়েদেয়ে বাড়ি থেকে বেরুতেই দর্জিপাড়ার ক্লাবের এক জন এসে কাঁধে হাত দিয়ে বললে, 'কোথায় বেরুচ্ছেন ? আজ বিকেলে না খেলা— যান বাড়িতে বিশ্রাম করুন গে ! প্রায় বোতল-বন্দী করার মত সে আমায় বাড়িতে ঢুকিয়ে দিয়ে গেল।

মিনিট পনেরো বাদে আবার একবার পালাবার চেষ্টা করতে গিয়ে বুঝলাম— পালানো সম্ভব হবে না। পাছে ফ্রেন্ডস ইউনাইটেড এসে আমাকেও ঘুষ খাইয়ে যায় সেইজন্য পাড়ার ক্লাবের কয়েকজন মূর্তিমান আমার বাড়ি পাহারা দিচ্ছে। ব্যাপার দেখে আমার বুক ত দু-হাত বসে গেল। খেলার হাত থেকে কি করে রেহাই পাব— ভেবে আকুল হয়ে পড়লাম। আমার অবস্থা বলির আগে বলির ছাগলের মত। ভয়ে রীতিমত কাঁপতে থাকলাম। কেন যে মরতে গিয়েছিলাম চাল মারতে ! নিজের গাল নিজে চড়াতে ইচ্ছে হতে লাগল। ছাই, একটা অসুখও করে না এখন ?

বিকেল বেলা কাঁপতে কাঁপতে প্রহরী-বেষ্টিত হয়ে তো গিয়ে নামলাম ফুটবল মাঠে। প্যালপিটেশনে অজ্ঞান হয়ে যাব মনে হতে লাগল। খেলা তো শুরু হল। যদ্দুর সাধ্য সাবধানে গা-বাঁচিয়ে বল থেকে দূরে সরে রইলাম। আর তাই কি পারি ! হুস-হাস করে চারপাশ থেকে বল ঘোরা-ফেরা করতে লাগল। আমি নামকরা খেলোয়াড়— আমার টিমের সবাই বল পাস করে আমাকে। মহা মুস্কিল ! তারপর আবার সবাই আমার নাম করে 'বাক্-আপ' করে— আমায় উৎসাহ দেয়। আমার খালি মনে হয় এই বুঝি গেলাম। আমাদের গোলকিপার খেললে চমৎকার— দশ বারোটা নির্ঘাৎ গোল দিল বাঁচিয়ে। হাফ-টাইম পর্যন্ত গোললেস ড্র।

হাফ-টাইমের সময়— ক্লাবের সেক্রেটারি এল ছুটে। হাত-জোড় করে বললে, 'এরা সব জুনিয়র প্লেয়ার— আপনি মানিয়ে নেবেন। আপনার খেলা তো তেমন কই খুলছে না— অবিশ্যি আপনার পায়ে এখনও একবারও বল পড়েনি— পড়লে অবিশ্যি—' ক্লাব-সেক্রেটারি হাত কচলে চলে গেলেন। আমার তখন হাঁপ ধরেছে।

সেকেন্ড হাফেও বল এড়িয়ে থাকবার চেষ্টায় রইলাম। কোন মতে আজকের খেলা শেষ হলে বাঁচি।

খেলা থেকে বেশ আলগা আলগা ছিলাম, হঠাৎ রাইট আউট— আমাদের রাইট-আউট

হতভাগা একটা পাস করে বসলে আমাকে। বলটা আমার গায়ে এসে লাগে আর কি! শেষে সেই বলটা গিয়ে পড়ল লেফট-ইনের কাছে। পাছে আবার আমায় পাস করে— সেই ভয়ে আমি ছুটে অনেকটা এগিয়ে গেলাম। আর মাত্র কয়েক মিনিট আছে। এ পর্যন্ত বল ছুঁইনি, পরের এক মিনিট কেটে গেলেই হয়। বলেব আওতা ছাড়িয়ে অপর পক্ষের গোলের কয়েক হাতের মধ্যে তখন আমি দাঁড়িয়ে— হঠাৎ দেখি বাঁ দিক থেকে উল্কার মত বলটা ছুটে আসছে। আর আসছে আমারই মাথা লক্ষ্য করে। কি সর্বনাশ! বল লাগলে আমার এই মাথার আর কি কিছু থাকবে। অপর পক্ষের গোলের ভিতরে ঢোকবার জন্য দৌড় লাগালাম— কেননা চারদিক থেকে দুপক্ষের সব খেলোয়াড়রা ছুটে আসছে— আমার চারপাশে সব ধস্তাধস্তি শুরু হবে এখনই। দৌড় দিলাম— কিন্তু এক পা এগোবার আগেই হঠাৎ যেন মাথাটা ঘুরে গেল। টান হয়ে মাটিতে পড়লাম। সমস্ত মাথা ভোঁ ভোঁ করতে লাগল। চারদিকে চিৎকার—জয়ধ্বনি। একটু ধাতস্থ হয়ে দেখি— কি সর্বনাশ বল গোলের ভিতর। আর আমি মাটির অনেক উপরে— অনেকের কাঁধে। গোলটা তাহলে আমিই দিয়েছি খেলা শেষের মুখে।

দর্জিপাড়ায় সবার ধারণা অমন চমৎকার হেড পৃথিবীতে এর আগে কেউ দেয়নি। আমি নাকি ফুটবলের রাজা। তাদের এই ধারণা বজায় রাখবাব জন্য আমাব সর্বদাই চেষ্টা। তাদের শত অনুরোধেও আমি আর মাঠে নামিনি।

চাঁপাফুলের গন্ধ

সুপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়

বব গ্রেগরির বলটাকে স্কোয়ার কাট করে বাউন্ডারিতে পাঠাবার পরেই আমি বুঝতে পারলাম, গাওস্করের পঁয়ত্রিশ টেস্ট সেঞ্চুরির রেকর্ডটা আমি আজ ধরব। সঙ্গে সঙ্গে বাবার মুখটাও আমার মনে পড়ল। আমি টেস্ট টিমে ঢোকবার আগেই আমার বাবা মারা যান। আমার বয়স তখন সতের। এখন আমার ৩৩ বছর ৮ মাস ১৭ দিন। এগুলো খুব দরকারি তথ্য। আজ যদি সেঞ্চুরি করি, কাল কত ভাষ্যকার কত কী লিখবে। আগের সেঞ্চুরিটার পর থেকেই তো আরম্ভ হয়েছে, গাভাসকর আমার চেয়ে বড় কি ছোট। অদ্ভুত লোকগুলো। আমার গুরু গাভাসকর। আজ যদি পঁয়ত্রিশতম সেঞ্চুরিটা হয়, তা হলে কাউকে যা বলিনি, সেটা করব। আমি অবসর নেব। রেকর্ড-বুকে আমার আর গাভাসকরের নাম পাশাপাশি থাকবে। গুরু আর শিষ্য। একলব্য শিষ্য। গাভাসকরের এখন পঁচাত্তরের ওপর বয়স। তবুও একদম সটান মানুষ।

ইডেনের বিরাট স্কোরবোর্ডে জ্বলজ্বল করছে আমার নামের পাশে আমার রান, ৬০ নট আউট। অন্যদিকে ব্যাট করছে আন্দামানেব ছেলে রাকেশ পিটাব। একটু আগে ইনিংসের গোড়াপত্তন হয়েছিল খুব ভালো। জম্মু কাশ্মীরের গোলাম রসুল আর উত্তরপ্রদেশের বিনয় দুবে দারুণ খেলে ১০১ রান তোলে। তারপরই এই সাত ফুট লম্বা বব ইংল্যান্ডের হয়ে তৃতীয়বার বল করতে এসে দু ওভারে চারটে উইকেট নেয়। বিনয় প্রথম আউট হয়। আমি নামলাম। প্রথম বলেই একটা বাই রান পেলাম। গোলাম আউট হল। পরের ওভারে আমি চারটে রান পেলাম। দুবার দুই-দুই করে। আবার বব বল করতে এল। পর পর দু বলে আউট হল গোয়ার ফেলিক্স কারনিরেও আর কেরলের সি· এন· জন। দুজনেই দারুণ ফর্মে ছিল। কিন্তু আজ বব দারুণ বল করেছে। ছিলাম বিনা উইকেটে ১০১, হলাম চার উইকেটে ১০৬। রাকেশ পিটারের এটাই প্রথম টেস্ট ম্যাচ। বেচারি। আমি এগিয়ে গেলাম। বললাম, "তোমার খেলা আমি রনজি আর দলিপ ট্রফিতে দেখেছি, তুমি বড় খেলোয়াড় হবে। আজ তুমি মাথা ঠাণ্ডা রেখে সোজা ব্যাটে খেলবে। সাহস করে ববের সামনে দাঁড়াও কিচ্ছু ভয় নেই। আমি আর তুমি ভারতের ইনিংস দাঁড় করিয়ে দেব।" রাকেশ নিশ্চয় সাহস পেয়েছিল। ববের বাকি দুটি বল একদম ব্যাটের মধ্যিখানে নিয়ে খেলল। কিন্তু ইংল্যান্ডের আসল লক্ষ্য আমি। আমাকে সরাতে পারলেই ওদের মতলব হাসিল হবে।

জোর লড়াই হল। গ্রেগরি, গারুফি, স্মিথসন তিনজন ফাস্ট বোলার, আর ছোবলমারা বল-দেনেওয়ালা কিচিন তাদের প্রাণপণ চেষ্টা করল। আর সেইসঙ্গে ইংল্যান্ডের ফিল্ডাররা

কী ফিল্ডিংই না করল ! আমার নিশ্চিত চারগুলোতে হয় রান হল না, নয় দুটো করে রান হল। ওদিকে রাকেশও অভিজ্ঞ খেলোয়াড়ের মতো খেলছে, ওর রানও হয়েছে ৫০। কিছুক্ষণ আগে পর্যন্ত ও আর আমি সমান যাচ্ছিলাম। আমাদের রান এখন ২৩১। গারুফি অনেকগুলো নো-বল করেছে। গ্রেগরির এই ওভারে দশ রান নেবার পর আমি বুঝলাম, আজ আমার দিন।

আর সঙ্গে-সঙ্গে বাবার মুখ মনে পড়ল। আমাদের বংশ অধ্যাপকের বংশ। কত পুরুষ, তা জানি না। তবে সবাই বাঘা-বাঘা অধ্যাপক। তাদের নামে লোকে এখন মাথা নোয়ায়। সেই বাড়ির ছেলে হয়ে আমি পড়াশোনা ভালোবাসতাম না। রাজ্য সরকারের বাধ্যতামূলক শিক্ষাসূচি শেষ হতেই আমি পড়াশোনা ছাড়লাম। এখন আমি শুধু ক্রিকেট খেলব। বাবা আমাকে খুব ভালোবাসতেন। রোগা লম্বা মানুষটা দেখতে ভারি সুন্দর ছিলেন। চেহারার মধ্যে এমন একটা মাধুর্য ছিল যে, সকলের ভালো লাগত। অত শান্ত মানুষটিরও কিন্তু থুতনিতে একটা বিরাট কাটা দাগ ছিল। মজা এমনি যে, ওই কাটা দাগেও ওঁকে ভালো দেখাত। সেদিনটার কথা মনে আছে। বাবা তাঁর অঞ্জলি ভরে চাঁপাফুল এনে দাঁড়িয়ে ছিলেন। আমি চাঁপাফুল ভালোবাসি বলে বাবা প্রায় সারা বছর ধরেই আমার জন্যে চাঁপাফুল আনতেন। কোথায় একটা বারোমেসে গাছের সন্ধান পেয়েছিলেন। তখনই আমি হাতে ব্যাট নিয়ে বেরোচ্ছি। বাবা অবাক হয়ে বললেন, "তুই কলেজ যাবি না ?" বাবাকে আমি বললাম, "না। আমি পড়া ছেড়ে দিলাম। নিউ স্টার আমায় ভালো একটা শর্তে খেলতে দিচ্ছে। হাতখরচা পাব। তা ছাড়া ক্রিকেটে এখন অনেক পয়সা। ভালো খেলতে পারলে প্রফেসারির চেয়ে অনেক বেশি টাকা পাব।"

বাবার মুখটা ম্লান হয়ে গেল। বললেন, "খেলার মাঠেও একজন শিক্ষিত আর একজন অশিক্ষিত লোককে খুব সহজেই আলাদা করা যায়। কোনোও অশিক্ষিত লোককে দেশের নেতৃত্ব করার দায়িত্ব কেউ দেয় না।"

সেই আমার সঙ্গে বাবার শেষ কথা। শেষ দেখাও বটে। ডাক্তার ডাকার সময়ও বাবা দেননি। আমার ওপর অভিমান করে চলে গেলেন।

চায়ের সময় হয়ে এল আমি একটিবার ভাবলাম, আমি কি একটু আস্তে খেলব। বড় স্কোরবোর্ডে জ্বলজ্বল করছে— আমার রান ৭৮। আর ২২ রান, আর সঙ্গে সঙ্গে আমার আর গাভাসকরের নাম পাশাপাশি হবে।

রাকেশও দারুণ খেলছে। একবার ওভারের মধ্যে ও বললে, 'ক্যাপ্টেন, তুমি একটু জোরে খেলছ। একটু ধীরে খেললে তুমি সেঞ্চুরি পাবেই।"

আমি ওর পিঠের মধ্যে একটা থাবা মেরে বললাম, "আমি তো পাবই, তুমিও পাবে।"

রাকেশ ভীষণ খুশি হয়ে গেল। তার ফলে কি না জানি না, চায়ের ঠিক আগের ওভারটা কিচিনকে পেটাল দেখবার মতো। আগের ওভারে আমিই বরং চুপচাপ ছিলাম। ৮৪ থেকে ৮৮-তে উঠেছি। বাকি ১২ রান পরে হবে। রাকেশ তখন ৫৬। বেশ ঠাণ্ডা মাথায় খেলছে। গত বছর রনজি ট্রফিতে আমরা বোম্বাইয়ের অনেক দিনের রেকর্ড ভেঙেছি। ফাইনালে হারাই আন্দামানকে। এই রাকেশ দারুণ ব্যাট করেছিল। আমার বলকেই এগিয়ে এসে ছয় মেরেছিল। সারা পৃথিবীতে খুব বেশি ব্যাটসম্যান এ-কাজ করার সাহস দেখাবে না। সেই খেলা দেখাল। কিচিন বহু যুদ্ধের নায়ক। অনেক উইকেট পেয়েছে, অনেক মার খেয়েছে। কিন্তু প্রথম টেস্ট খেলছে এমন ছেলে ওর এক ওভারে ৬, ৬, ৪, ৪, ৬, ৪ মোট ৩০ রান নেবে, তাও চায়ের আগের ওভারে, কিচিন ভাবেনি।

চার উইকেটে ২৯৪। পঞ্চম উইকেটে আমরা জুড়েছি ১৮৮ রান, পিটার ৮৬ আমি ৮৮ রানে চা খেতে গেলাম। ইডেনের বিশ্বনাথ-ব্লক আমাদের প্রতিটি হাঁটার সঙ্গে সঙ্গে বিউগল বাজাল। আমি রাকেশকে বললাম, "তুগি এগোও। শেষ ওভারটা অনবদ্য।"

চা খেতে মন চাইছিল না। শুনলাম গাভাসকর, আজাহারউদ্দিন, বেদী, তিন বৃদ্ধই টেলিফোন করেছিলেন। আমি তখনও বাবার কথা ভাবছি। কী অন্যায়! যে মরে যায়, তার সঙ্গে কেন আর কথা বলা যায় না? নইলে বলতাম বাবাকে, আমি পড়াশোনা করেছি। খুব মন দিয়ে করেছি। আজ যদি আমায় দেখতে, তুমি খুশি হতে বাবা। তুমি সত্য বলেছিলে, প্রথম দিকে আমাকে লোকে ঠাট্টা করত। বলত, আমি ভালো খেলি, কিন্তু আসলে চাষা। তারপর সব বদলে গেল। আমি বদলে গেলাম। রাতের পর রাত জেগে পড়েছি। নিজেকে তৈরি করেছি। বাবা, তুমি কিছু দেখতে পাওনি। আজ আমি সারা ভারতে শুধু নয়, সারা বিশ্বে পরিচিত। শুধু ভালো ব্যাটসম্যান বলে নয়, ভালো বোলার বলে নয়, মার্জিত ভদ্রলোক বলেও। ভারতের টিম আদর্শ টিম। খেলার মাঠে, খেলার বাইরে। আমি টিমের ক্যাপ্টেন হবার পর ভারতের কোনোও খেলোয়াড় কোনও বাজে আবেদন করেননি। কোনও সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কখনও আম্পায়ারের সঙ্গে ঝগড়া করেনি। এখন বলো, আমি কি একজন ভালো অধ্যাপকের সমান হইনি?

আবার মাঠে খেলা। বিশ্বনাথ-ব্লক বোধহয় চায়ের বিরতির সময় একদম ওঠেনি। রক্ত-খাওয়া বাঘের মতো হয়ে আছে। আমার তখন মন খুব শান্ত। পিটারকে দেখতে হবে। প্রথম ওভারে একটা লেটকাট করলাম স্মিথসনকে। উইকেটকিপার হাঁ করে বলের চলে যাওয়া দেখল। ৯২। পরের ওভারে ইংল্যান্ডের ক্যাপ্টেন ডিক বার্ট নিজে বল করতে এল। ও এমনিতে বল করে না, কিন্তু চেঞ্জ বোলার হিসেবে ভালো। রাকেশকে আমি দেখেশুনে খেলতে বলেছিলাম। তাই তিনটে মাত্র চার নিল। সব কটা বোলারের পাশ দিয়ে। মাঠে কী হচ্ছে বোঝানো যাবে না। পিটার ৯৮। এর পরের ওভারেও আমি দুবার দুই-দুই রান নিলাম। আমি ৯৬। মাঠ ফেটে পড়ছে। রাকেশ কিন্তু আমাকে অবাক করে দিল। প্রথম বলে ডিপ থার্ড ম্যানে বল পাঠিয়ে দৌড় শুরু করল। ওর সেঞ্চুরি নিশ্চিত। কিন্তু একটা রান নিয়েই চেঁচাল, নো। তারপর আম্পায়ারের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে বলল, "ক্যাপ্টেন, সেঞ্চুরিটা আগে তুমি করো।" সারা পৃথিবী অপেক্ষা করে আছে।

আমি বললাম, "ঠিক আছে, কিন্তু রাকেশ, ক্রিকেটে আর কখনও পাওয়া রান ছাড়বে না। দলের ক্ষতি।"

রাকেশ বলল, "জানি, কিন্তু আজ রাগ কোরো না।"

সবাই বুঝেছে, রাকেশ কী করেছে। আমার চোখের সামনে একজন নতুন জনপ্রিয় তারকাকে জন্ম নিতে দেখলাম। পরের বলটা কী করে এল, কী করে খেললাম কিচ্ছু মনে নেই, শুধু চিৎকারই শুনলাম। আমি ৩৫ নম্বর সেঞ্চুরি করেছি। রাকেশ দৌড়ে এসে আমায় জড়িয়ে ধরে বলতে লাগল, "আই ওয়াজ দেয়ার হোয়েন ইউ স্কোরড ইয়োর থার্টিফিফ্‌থ সেঞ্চুরি!" ডিক আর তার দল একে একে এসে করমর্দন করল। আমার মাথাটা ভোঁ ভোঁ করছিল। তারপরই আবার বিস্ফোরণ। রাকেশ সেঞ্চুরি করেছে। প্রথম ইনিংসে ১০০ রানের এগিয়ে থাকার সুবাদে আমরা মোটমাট ৪২৪ রানে এগিয়ে গেলাম। এখন ইংল্যান্ডকে আউট করার পালা। রাকেশকে নিয়ে আমি ক্লাব হাউসের দিকে পা বাড়ালাম। আজ দুটো উইকেট চাই।

দিনের খেলার শেষে কী যে হল, আর কী যে হল না, বলতে পারব না। সারা কলকাতা ময়দানে এসে হাজির হয়েছে। চারদিকে মালা আর মালা। আর বাজি পুড়ছে। যেন কালীপুজোর রাত। বাড়ি ফিরতে অনেক রাত হল। দরজা খুলে দিল আমার ছেলে। ও ক্রিকেটে একদম মজা পায় না। কিন্তু তাও খুব খুশি। বাড়ির সামনেও তখন ছেলেরা নাচছে।

হঠাৎ মনে হল, চাঁপাফুলের গন্ধে ম'ম' করছে আমার ঘর। বাবার পরে আর কেউ আমার জন্যে চাঁপা আনেনি। প্রশ্ন করলাম, "চাঁপাফুল কোথা থেকে এল রে?"

ছেলে বলল, "একজন বুড়োমতো লোক এসে তোমাকে দিয়ে গেছেন। ভদ্রলোকের না থুতনিতে একটা বিরাট কাটা দাগ।"

ফুলগুলো আমি বুকে জড়িয়ে ধরলাম। এবারও বাবাকে দেখতে পেলাম না।

ঘুঁটেপাড়ার সেই ম্যাচ

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

চোরবাগান টাইগার ক্লাবের সঙ্গে পটলডাঙ্গা থান্ডার ক্লাবের ফুটবল ম্যাচ হয়ে গেল। প্রথমে টাইগার ক্লাব ঝাঁ-ঝাঁ করে আমাদের ছ'টা গোল ঢুকিয়ে দিলে, ওদের সেই ট্যারা ন্যাড়া মিত্তির একাই দিলে পাঁচখানা। আর বাকিটা দিলে আমাদের ব্যাক বলটুদা— সেমসাইডে।

তারপরেই পটলডাঙ্গা থান্ডার ক্লাব পর পর ছ'টা গোল দিয়ে দিলে। টেনিদা দুটো, ক্যাবলা তিনটে, দলের সবচেয়ে ছোট্ট আর বিচ্ছু ছেলে কম্বল দিলে একটা। তখন ভারি একটা গোলমাল বেধে গেল, আর খেলাই হল না— রেফারি ফুর্‌র্‌ করে হুইসিল বাজিয়ে খেলা শেষ করে দিলেন।

ব্যাপারটা এই :

আমাদের গোলকিপার পাঁচুগোপাল চশমা পরে। সেদিন ভুল করে ওর পিসিমার চশমা চোখে দিয়ে মাঠে নেমে পড়েছে। তারপরে আর কী— একসঙ্গে তিনদিকে তিনটে বল দেখতে পায়, ডাইনের বলটা ঠেকাতে যায় তো বাঁয়েরটা গোল হয়ে যায়। বলটুদা আবার বুদ্ধি করে একটা ব্যাক পাস করেছিল, তাতে করে একটা সেমসাইড!

এখন হল কী, ছ'টা গোল দিয়ে টাইগার ক্লাব কি রকম নার্ভাস হয়ে গেল। আনন্দের চোটে ওদের তিনজন খেলোয়াড় অজ্ঞান হয়ে পড়ল, বাকিরা কেবল লাফাতে লাগল, সেই ফাঁকে ছ'টা বল ফেরত গেল ওদের গোলে। তখন সেই ফুর্তির চোট লাগল থান্ডার ক্লাবে— আর কে যে কোন্ দলে খেলছে খেয়ালই রইল না। টেনিদা বেমক্কা হাবুল সেনকেই ফাউল করে দিলে, আর ন্যাড়া মিত্তির তখন নিজেদের গোলে বল ঢোকাবার জন্যে মরিয়া— থান্ডার ক্লাবের দু-জন তাকে জাপটে ধরে মাঠময় গড়াগড়ি খেতে লাগল। ব্যাপার দেখে রেফারি খেলা বন্ধ করে দিলেন, আর কোত্থেকে একটা চোঙা এনে সমানে ভাঙা গলায় চেঁচাতে লাগলেন : 'ড্র—ড্র—ড্রন গেম— এক্ষুনি সব মাঠ থেকে কেটে পড়ো, নইলে পুলিশ ডাকব— হুঁ!'

সেদিন সন্ধ্যের পর এই নিয়ে দারুণ আলোচনা চলছিল আমাদের ভেতরে। হঠাৎ টেনিদা বললে, ছোঃ, বারোটা গোল আবার গোল নাকি? একবার একাই আমি বত্রিশটা গোল দিয়েছিলুম একটা ম্যাচে।

অ্যাঁ!— চুয়িং গাম চিবুতে চিবুতে ক্যাবলা একটা বিষম খেলো।

হাবুল বললে, হ, ফাঁকা গোলপোস্ট পাইলে আমিও বায়ান্নখান গোল দিতে পারি।

—নো স্যার, নো ফাঁকা গোল বিজনেস! দু-দলে এ ডিভিসন বি ডিভিসনের কম্‌সে

কম বারোজন প্লেয়ার ছিল। যা-তা খেলা তো নয়— ঘুঁটেপাড়া ভার্সাস বিচালিগ্রাম।

—খেলাটি কোথায় হয়েছিল ?

—ঘুঁটেপাড়ায়। কী পেলে, ইউসেবিয়ো, মূলার নিয়ে লাফালাফি করিস! জীবনে একটা ম্যাচে কখনো বত্রিশটা গোল দিয়েছে তোদের রিভেরা, জেয়ারজিনহো ? ববি চার্লটন তো আমার কাছে বেবি রে!

—একটা মোক্ষম চাল মারতাছে— বিড় বিড় করে আওড়ালো হাবুল সেন।

হাবলার কপাল ভালো যে টেনিদা সেটা ভালো করে শুনতে পেলো না। বললে, কী বললি, মোক্ষদা মাসী ? কী করে জানলি রে ? ওই মোক্ষদা মাসীর বাড়িতেই তো আমি গিয়েছিলুম ঘুঁটেপাড়ায়। সেইখানেই তো সেই দারুণ ম্যাচ। কিন্তু মোক্ষদা মাসীর খবর তোকে বললে কে ?

আমি জানি— হাবুল পণ্ডিতের মতো হাসল।

ওর ওস্তাদী দেখে আমার রাগ হয়ে গেল। বললুম, বল্ দেখি ঘুঁটেপাড়া কোথায় ?

—ঘুইট্যাপাড়া আর কোথায় হইবো ? গোবরডাঙার কাছেই। গোবব দিয়াই তো ঘুইট্যা হয়।

ইয়াহ্! টেনিদা এত জোরে হাবুলের পিঠ চাপড়ে দিলে যে হাবুল চ্যাঁ করে উঠল। নাকটাকে জিভেগজার মতো উঁচু করে টেনিদা বললে, প্রায় ধরেছিস। তবে ঠিক গোবরডাঙার কাছে নয়, ওখান থেকে দশ মাইল হেঁটে, দুই মাইল দৌড়ে—

দৌড়তে হয় কেন ?— ক্যাবলা জানতে চাইল।

—হয়, তাই নিয়ম। অত কৈফিয়ৎ চাসনি বলে দিচ্ছি। ওখানে সবাই দৌড়য়। হল ?

ক্যাবলা বললে, হল। আর পথের বিবরণ দরকার নেই, গল্পটা বলো।

গল্প! —টেনিদা মুখটাকে গাজরের হালুয়ার মতো করে বললে, এমন একটা জলজ্যান্ত সত্যি ঘটনা, আর তুই বলছিস গল্প! শিগগির উইথড্র কর— নইলে এক চড়ে তোর নাক—

আমি বললুম নাগপুরে উড়ে যাবে।

ক্যাবলা বললে, বুঝেছি। আচ্ছা আমি উইথড্র করলুম। কিন্তু টেনিদা— ইংরিজিতে উচ্চারণ উইথড্র নয়।

আবার পণ্ডিতী — টেনিদা গর্জন করল : টেক কেয়ার ক্যাবলা, ফের যদি বিচ্ছিরি একটা কুরুবকের মতো বকবক করবি তো এক্ষুনি একটা পুঁদিচ্চেরি হয়ে যাবে— বলে দিচ্ছি তোকে। যা— শিগগীর আট আনার ঝাল-মুড়ি কিনে আন— তোর ফাইন!

আলুভাজা-আলুভাজা মুখ করে ক্যাবলা ফাইন আনতে গেল। ওব দুর্গতিতে আমরা কেউ দুঃখিত হলুম না— বলাই বাহুল্য। সব কথাতেই ক্যাবলা ওরকম টিকটিকিব মতো টিকটিক করে।

বুঝলি— ঝালমুড়ি চিবুতে চিবুতে টেনিদা বলতে লাগল : ছ' দিনের জন্যে তো বেড়াতে গেছি মোক্ষদা মাসীর বাড়িতে। মেসোমশাই ব্যবসা করেন আর মাসীমা যা রাঁধেন না, খেলে অজ্ঞান হয়ে যাবি। মাসীর রান্না বাটি-চচ্চড়ি একবার খেয়েছিস তো ওখান থেকে নড়তেই চাইবি না— ঘুঁটেপাড়াতেই ঘুঁটের মতো লেপটে থাকবি।

আমার খুব মনের জোর, তাই বাটি-চচ্চড়ি আর ক্ষীরপুলির লোভ কাটিয়েও কলকাতায় ফিরে আসি। সেবারেও গেছি— দুটো দিন একটু ভালোমন্দ খেয়ে আসতে। ভরা শ্রাবণ,

থেকে থেকেই ঝুপঝাপ বৃষ্টি। সেদিন সকালে মাসীমা তালের বড়া ভেজে ভেজে তুলছেন আর আমি একটার পর একটা খেয়ে যাচ্ছি, এমন সময় কটা ছেলে এসে হাজির।

অনেকবার তো ঘুঁটেপাড়ায় যাচ্ছি, ওরা সবাই আমায় চেনে। বললে, 'টেনিবাবু, বড়ো বিপদে পড়ে আপনার কাছে ছুটে এলুম। আজ বিকেলে শিবতলার মাঠে বিচালিগ্রমের সঙ্গে আমাদের ফুটবল ম্যাচ। ওরা ছজন প্লেয়ার কলকাতা থেকে হায়ার করেছে, আমরাও ছজন এনেছি। কিন্তু মুশকিল হল, আমাদের এখানকার একজন জাঁদরেল খেলোয়াড় হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছে। আপনাকেই আমাদের উদ্ধার করতে হচ্ছে দাদা।'

জানিস তো, লোকের বিপদে আমার হৃদয় কেমন গলে যায়। তবু একটু কায়দা করে বললুম, 'সব হায়ার করা ভালো ভালো প্লেয়ার, ওদের সঙ্গে কি আর আমি খেলতে পারব ? তা ছাড়া এ বছরে তেমন ফর্ম নেই আমার।' ওরা তো শুনে হেসেই অস্থির।

'কী যে বলেন স্যার, আপনি পটলডাঙ্গার টেনিরাম শর্মা— আপনার ফর্ম তো সব কাজে, সব সময়েই থাকে। প্রেমেন মিত্তিরের ঘনাদা, হেমেন্দ্রকুমারের জয়ন্ত, শিব্রামের হর্ষবর্ধন— এদের ফর্ম কখনো পড়তে দেখেছেন ?'

আমি হাতজোড় করে প্রণাম করে বললুম, 'ঘনাদা, জয়ন্ত, হর্ষবর্ধনের কথা বললেন না— ওঁরা দেবতা— আমি তো স্রেফ নস্যি। ওঁরা যদি গরুড় পাখি হন, আমি স্রেফ চড়ুই।'

ওরা বললে, 'অত বুঝিনে দাদা, আপনাকে ছাড়ছিনে। আমাদের ধারণা মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল তো তুচ্ছ— আপনি ইচ্ছা করলে বিশ্ব একাদশে খেলতে পারেন। আব আপনি যদি চড়ুই পাখি হন, আমরা তো তা হলে— কি বলে মশা !'

আমি বললুম, 'ঘুঁটেপাড়ার মশাকে তুচ্ছ করবেন না মশাই, এক-একটা প্রায় এক ইঞ্চি লম্বা।'

ওরা হেঁ-হেঁ করে চলে গেল, কিন্তু আমাকে রাজি করিয়েও গেল। আমার ভীষণ ভাবনা হল রে। থান্ডার ক্লাবে যা খেলি— তা খেলি, কিন্তু অতগুলো এ ডিভিসন বি-ডিভিসন খেলোয়াড়ের সামনে ! ওরা না হয় আপ করে গেল, কিন্তু আমি দাঁড়াব কী করে ?

কিন্তু ফিরিয়েও তো দেওয়া যায় না। আমার নিজের প্রেস্টিজ—পটলডাঙ্গার প্রেস্টিজ সব বিপন্ন ! কোন্ দেবতাকে ডাকি ভাবতে ভাবতে হঠাৎ মা নেংটীশ্বরীকে মনে পড়ে গেল। আরে সেই নেংটীশ্বরী— আরে সেই যে রে— "কম্বল নিরুদ্দেশে"র ব্যাপারে যে দেবতাটির সঙ্গে আমাদের দেখা হয়ে গিয়েছিল। মনে মনে বলতে লাগলুম, এ বিপদে তুমিই দয়া করো মা— গোটা কয়েক নেংটি ইঁদুর পাঠিয়ে দাও তোমার—খেলার সময় ওদের পায়ে কুটুর কুটুর করে কামড়ে দিক। নিদেন পক্ষে পাঠাও সে "অবকাশরঞ্জিনী" বাদুড়কে— সে ওদের সকলের চাঁদি ঠুকরে বেড়াক।

এ-সব প্রার্থনা-ট্রার্থনা করে— শ-দেড়েক তালের বড়া খেয়ে আবার বেশ একটা তেজ এসে গেল। কেবল মনে হতে লাগল, আজ একটা এসপার-ওসপার হয়ে যাবে। তখন কি জানি, গুনে গুনে বত্রিশটা গোল দিতে পারব, আমি একাই ?

বিকেলে আকাশ জুড়ে কালো কালো হাতির পালের মতো মেঘ। মনে হল, দুর্দান্ত বৃষ্টি নামবে। তবু মাঠে গিয়ে দেখি বিস্তর লোক জড়ো হয়ে গেছে। এক দল হাঁকছে : 'বিচালিগ্রাম— হিপ্ হিপ্ হুররে'— আর এক দল সমানে উত্তর চড়াচ্ছে : 'ঘুঁটেপাড়া— হ্যাপ্-হ্যাপ্-হ্যার্‌রে।'

ক্যাবলা হঠাৎ আঁৎকে উঠল— হ্যাপ্-হ্যাপ্-হ্যাররে মানে কী ? কখনো তো শুনিনি।

—ওটা ঘুঁটেপাড়ার নিজস্ব স্লোগান। ওরা হিপ্-হিপ্ বলছে কিনা, তাই পালটা জবাব। ওরাও যদি হিপ্-হিপ্ করে, তা হলে এরা বলবে না, এদের নকল করছে ? ওরা যদি বলত বিচালিগ্রাম জিন্দাবাদ—এরা সঙ্গে সঙ্গে বলত ঘুঁটেপাড়া মুর্দাবাদ।

—অ্যাঁ, মুর্দাবাদ ! নিজেদেরই ?

—হ্যাঁ, নিজেদেরই। পরের নকল করে অপমান হওয়ার চাইতে মরে যাওয়া ভালো—বুঝলি না ?

—বিলক্ষণ ! আচ্ছা— বলে যাও।

—এতেই বুঝতে পারছিস, দুটো গ্রামে রেষারেষি কি রকম। দারুণ চিৎকাবেব মধ্যে তো খেলা শুরু হল। দু-মিনিটের মধ্যেই বুঝতে পারলুম, বিচালিগ্রামকে এঁটে ওঠা অসম্ভব। এরা ছ'জনই এ ডিভিশনের প্লেয়ার এনেছে— খেলায় তাদের আগুন ছোটে। আর ওদের গোলকিপার ! সে একবারে ছ'হাত লাফিয়ে ওঠে, তার লম্বা লম্বা হাত বাড়িয়ে বল তো বল, বন্দুকের গুলি অব্দি পাকড়ে নিতে পারে।

ঘুঁটেপাড়ায় মাত্র দুজন এ-ডিভিশনের, বাকি চারজনই বি-ডিভিশনের। এ-মার্কা দুজনও ওদের তুলনায় নীরেস। খেলা শুরু হতে না হতেই বল এসে একেবাবে ঘুঁটেপাড়ার ব্যাক লাইনে চেপে পড়ল, মাঝ মাঠও আর পেরোয় না। আব ওদেব গোলকিপার শুনিয়ে শুনিয়ে বলতে লাগল : 'একটা বালিস আর সতরঞ্চি দাও হে— একটু ঘুমিয়ে নেব।'

আমি আর কী করব— মিড-ফিলডে দাঁড়িয়ে আছি, দাঁড়িয়ে আছি। নিতান্তই ঘুঁটেপাড়ার বাকী দশজনই ডিফেন্স লাইনে দাঁড়িয়ে আছে তাই গোল হচ্ছে না- কিন্তু দেখতে দেখতে ওরা গোটা পাঁচেক কর্নার কিক পেয়ে গেল। আর কতক্ষণ ঠেকাবে।

আমি তখনো মা নেংটিশ্বরীকে ডাকছি তো ডাকছিই। এমন সময় আকাশ ভেঙে ঝমঝম বৃষ্টি। এমন বৃষ্টি যে চারদিক অন্ধকার। কিন্তু পাড়াগেঁয়ে লোক, আব কলকাত্তাই খেলোয়াড়ের গোঁ— খেলা দাপটে চলতে লাগল। বল জলে ভাসছে— ধপাধপ আছাড়— এই ফাঁকেও পর-পর দুখানা গোল খেয়ে গেল ঘুঁটেপাড়া। — ভাবলুম— যাঃ, হয়ে গেল !

বিচালিগ্রাম তারস্বরে চিৎকার করছে, হঠাৎ এদিকের লাইন্সম্যান ফ্ল্যাগ ফেলে মাঠে ঝাঁপিয়ে পড়ল। বললে, শিবতলার পুকুর ভেসেছে রে— মাঠ ভর্তি মাছ।

অ্যাঁ— মাছ !

দেখতে দেখতে যেন ম্যাজিক। গাঁয়ের লোকে বর্ষায় পুকুর-ভাসা মাছ তো ধবেই, কলকাতার ছেলেগুলোও আনন্দে ফেঁপে গেল। রইল খেলা, রইল বিচালিগ্রাম আর ঘুঁটেপাড়ার কম্পিটিশন— তিন শো লোক আর একুশজন খেলোয়াড়, দুজন লাইন্সম্যান—সবাই কপাকপ মাছ ধরতে লেগে গেল। প্লেয়াররা জার্সি খুলে ফেলে তাতেই টকাটক মাছ তুলতে লাগল। খেলতে আর বয়ে গেছে তাদের।

'এই রে, মস্ত একটা শোল মাছ পাকড়েছি।'

'আরে— একটা বাটা মাছের ঝাঁক যাচ্ছে রে।'

'ঈস— কী বড়ো বড়ো কই মাইরি ! ধর্—ধর্—'

সে যে একখানা কী কাণ্ড, তোদের আর কী বলব ! খেলার মাঠ ছেড়ে ক্রমেই দূরে দূরে ছড়িয়ে পড়তে লাগল সবাই। শেষে দেখি, মাঠে আমরা দুজন। আমি আর রেফারি।

রেফারি ওখানকার স্কুলের ড্রিল-মাস্টার। বেজায় মারকুটে, ভীষণ রাগী। দাঁত খিঁচিয়ে বললেন, 'হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছো কী? ইয়ু গো অন প্লেয়িং!'

ঘাবড়ে গিয়ে বললুম, 'আমি একাই খেলব?'

'ইয়েস— একাই খেলবে। আমি তো খেলা বন্ধ করিনি।'—ধমক দিয়ে রেফারি বললেন, 'খেলো। প্লেয়াররা মাঠ ছেড়ে মাছ ধরতে দৌড়লে খেলা বন্ধ করে দিতে হবে, রেফারিগিরির বইতে এমন কোনো আইন নেই।'

তখন শুরু হল আমার গোল দেবার পালা। একবার করে বল নিয়ে গিয়ে গোল দিয়ে আসি, আর রেফারি ফুর্‌র্‌ করে বাঁশি বাজিয়ে আবার সেন্টারে নিয়ে আসে। এই-ই চলতে লাগল।

ওদের দু-একজন বোধ হয় টের পেয়ে ফেরবার কথা ভাবছিল, এমন সময় মা নেংটীশ্বরীর আর এক দয়া। মাঠের কাছেই ছিল সারে সারে তালগাছ। হঠাৎ হু-হু করে ঝোড়ো হাওয়া, আর ঝপাস-ঝপাস করে পাকা তাল পড়তে লাগল।

'তাল পড়ছে—তাল পড়ছে—'

যারা ফিরতে যাচ্ছিল, তারা প্রাণপণে ছুটল তাল কুড়োতে।

এর মধ্যে আমি যা গোল দেবার দিয়েছি— মানে গুনে-গুনে বত্রিশটি। আমি গুনছি না, গোল দিতে দিতে আমার মাথা বোঁ-বোঁ করছে, আর ওই ভারী ভেজা বল বার বার সেন্টার থেকে জলের ওপর দিয়ে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছি—চাড্ডিখানা কথা নাকি! একবার বলেছিলুম, 'অনেক তো গোল দিয়েছি স্যার, আর পারছি না—পা ব্যথা করছে!' রেফারি আমায় তেড়ে মারতে এলেন, বিকট মুখ ভেংচে বললেন, 'ইয়ু গো অন গোলিং—আই সে!'

গোলিং আবার ইংরেজি হয় নাকি—ক্যাবলা বলতে যাচ্ছিল, টেনিদা একটা বাঘা ধমক দিয়ে বললে, ইয়ু শাট্ আপ! যে মারকুটে মাস্টার, তার ইংরিজির ভুল ধরবে কে? আমি গোল দিচ্ছি আর উনি গুনেই যাচ্ছেন, 'থার্টি—থার্টিওয়ান— থার্টিটু—'

'ওরে গোল দিচ্ছে বুঝি—' বলে ওদের সেই গোলকিপারটা দৌড়ে এল। সে যে রকম জাঁদরেল, হয়তো একাই বত্রিশটা গোল ফেরত দিত, আমি আটকাতে পারতুম না— বেদম হয়ে গেছি তখন। কিন্তু রেফারি তক্ষুনি ফাইন্যাল হুইসেল বাজিয়ে দিলেন। দিয়ে বললেন, 'খেলা ফিনিস।' তারপর আমাকে বললেন, 'এখন যাও— কই মাছ ধরো গে, তাল কুড়োও গে।'

কিন্তু তখন কি আর মাছ, তাল কিছু আছে? খেলা ফিনিসের সঙ্গে তাও ফিনিস! অতগুলো লোক!

টেনিদা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল : 'তখন প্রাণের আনন্দে মাছ ধরে আর তাল কুড়িয়ে বিচালিগ্রাম চিল্লোতে লাগল : থ্রি চিয়ার্স ফর বিচালিগ্রাম, আর ঘুঁটেপাড়া চ্যাঁচাতে লাগল : থ্রি টীয়ার্স ফর ঘুঁটেপাড়া!

টীয়ার্স? মানে চোখের জল? —ক্যাবলা আবার বিস্মিত হল। হাঁ—হাঁ—টীয়ার্স। পালটা জবাব দিতে হবে না? সে যাক। কিন্তু একটা ম্যাচে একাই বত্রিশটা গোল দিলুম, পেলে-ইউসেবিয়ো-রিভেরা-চার্লটন সব কাৎ করে দিলুম, কিন্তু একটা কই মাছ, একটা তালও পেলুম না—এ দুঃখ মরলেও আমার যাবে না রে! —আবার বুক ভাঙা দীর্ঘশ্বাস ফেলল টেনিদা।

বাঁশবাজি

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

খোড়গাছির মাঠে গাজনের মেলা বসেছে।

এবার লোকজন বিশেষ জমেনি, মাল-পত্রও বিশেষ কিছুই নেই। তেলেভাজা দুর্গন্ধি পাঁপর, বিন্নে ধানের খই আর শিল-পড়া কতক কাঁচা আম। কাগজের এবার বড় অভাব, ঘুড়ি-ফুরফুরি নেই একখানাও। মাটির পুতুল— কুকুর-বেড়াল, হাতি-ঘোড়া— সক্কলের এক রঙ, শুধু চোখ বা নাকের ডগা বা লেজের শেষ বোঝাবার জন্যে কালোর দু-একটা ফোঁটা বা আঁচড় কাটা হয়েছে। আছে কিছু চাঁচের ও বাঁশের জিনিস, ঝুড়ি-চ্যাঙাড়ি, খরা-খালুই। আর আছে হাঁড়িকুড়ি সরা-মালসা, কলকে-ধুনুচি। নেই সেই গামছা, নেই বা কাঁচের চুড়ি।

যারা তবু এসেছে সব যেন কেমন কাহিল চেহারা, ঢলকো, ঝিম-মারা। যেন কি একটা আতঙ্কের অন্ধকূপ থেকে বেরিয়ে এসেছে মরতে মরতে। চলা-বলায় ফুর্তি নেই এক রতি। পরনের কাপড় কানি হয়ে আসছে দিনে দিনে।

পাকড়া গাছের তলায়ই বেশি ভিড়। আর বেশি গোলমাল। কাছেই কোথায় একটা ট্যামটেমি বাজছে।

এগিয়ে গেলাম। শুনতে পেলাম একটা ছোট ছেলের কান্না। "আমি পড়ে যাব, আমি মরে যাব।" আকুল আফুট চোখে কাঁদছে সেই ছেলেটা। ছ-সাত বছর বয়েস, পেঁকাটির মত হাত-পা, কোমরের নিচে ছেঁড়া টেনি আঁটা। বাসা থেকে খসে-পড়া না-ওড়া পাখির বাচ্চার মত অসহায়।

ব্যাপার কি ? কাঁদছে কেন ?

সবাই বললে, বাঁশবাজি হবে।

প্রথমটা বুঝতে পারিনি। ভেবেছিলাম বাঁশ দিয়ে পিটবে বুঝি ছেলেটাকে তাই কাঁদছে অমন অঝোরে। কিন্তু সবাই বললে, মার নয়, খেলা !

বাঁশগাড়ি করে আদালতে দখল নেয় শুনেছি, তখনও নাকি ঢোল বাজে। বাঁশ নিয়ে আর যে কোন খেলা হয় দেখিনি তখনো।

"মাটিতে পুঁতে নেবে তো বাঁশটা ?" কে একজন জিগ্‌গেস করলে।

না এ সে মামুলি খেলা নয়। ওয়াকিবহাল কে একজন বললে, ভারিক্কি গলায়, 'না, বাঁশটা বুড়ো পেটের ওপর বসাবে, আর সেই বাঁশ বেয়ে বেয়ে উপরে উঠে যাবে ছেলেটা, একেবারে ডগার ওপর। সেখানে ও বাঁশের মুখ পেটের ওপর চেপে ধরে মুখ নিচ করে ঝুঁকে পড়বে। আর, বুড়োর পেটের ওপর বাঁশ ঘুরবে বন বন করে আর ছেলেটা হাত

ছেড়ে দিয়ে চরকির মত ঘুরপাক খাবে। আমি আগে আরো দেখেছি ওর খেলা।'

'ঐ বুড়ো বুঝি ?'

'হ্যাঁ, ওই মস্তাজ।'

শনের দড়ির মত পাকিয়ে গেছে বুড়োর শরীর, থুতনির উপর হলদেটে ক'গাছা দাড়ি রয়েছে উঁচিয়ে। বুকটা টিপলে মতন, পেটটা দ পড়া, হাতে পায়ের মাংসগুলো হাড়ের থেকে অনেক দূরে সরে এসেছে। বিকেলের রোদে কোঁকচান চোখ দুটো তার চকচক করছে— সেইটুকুই তার যা কিছু সাহস আর অভিজ্ঞতার চিহ্ন।

গোল হয়ে দাঁড়িয়েছে সবাই। টিনের একটা ফুটো মগ নিয়ে মস্তাজ সবাইর কাছ থেকে পয়সা কুড়োচ্ছে।

'খেলা শুরু হল না, আগেই পয়সা ?' কে একজন ধমক দিয়ে উঠল।

খেলা হয় কি করে ? বাঁশে যে চড়বে সেই তো কেঁদে রসাতল করছে। 'পড়ে যাব, মরে যাব'— এ কেমনতর কান্না ? পড়েই যদি যাবি তবে কে আসতে বলেছিল তোদের খেলা দেখাতে ?

ছেলের কান্নাতে মস্তাজের ভ্রূক্ষেপ নেই। 'হবে, হবে, শুরু হচ্ছে এখুনি। সবাইকে আশ্বাস দিয়ে সে শূন্য মগ দেখিয়ে দেখিয়ে ঘুরে যায়।

'খেলা তো আর ওরা নতুন দেখাচ্ছে না, তবে কাঁদছে কেন ঐ ছেলেটা ?' জিগ্‌গেস করলাম পাটের লোককে।

'এতদিন ও ছিল না। ও নতুন।'

'তবে কে ছিল এতদিন ?'

'ওর দাদা—'

'না, না, ঐ ছেলেটাও দেখিয়েছে দু-একবার।' কে আর একজন উঠল প্রতিবাদ করে। 'সরস্বতী পূজার সময় তেঁতুলের ইস্কুলের মাঠে এই ছেলেটাই উঠেছিল বাঁশ বেয়ে। এখনো তত রপ্ত হয়নি— বেয়ে বেয়ে চুড়োয় উঠে আসাটাই সেদিনকে ওর খেলা ছিল। আসল খেলা দেখিয়েছিল অবিশ্যি ওর দাদাই। আর যাই বলুন আসল কসরৎ যে বাঁশ বেয়ে উঠে আসে তার নয়, যে বাঁশটা পেটের ওপর চেপে ধরে রাখে তার—মস্তাজের।'

'কই ওর দাদা ?'

'কে জানে !'

টুং করে একটিও আওয়াজ হল না মস্তাজের মগে। খেলা না দেখে কেউ পয়সা দিতে রাজি নয়।

অনন্যোপায় হয়ে মস্তাজ ছোট ছেলেটার কাছে এগিয়ে গেল। পিছনে দেয়াল, সামনে বুনো কুকুর তাড়া করেছে এমনি ভয়ে চেঁচিয়ে উঠেছে ছেলেটা। 'না, না, আমি না। আমি পড়ে যাব, আমি মরে যাব—'।

বাপ একবার তার হাতে ধরে টান মারল হেঁচকা। মারবার জন্যে হাত ওঁচাল একবার।

'হেঁঃ ভয় দেখ না ছেলের। তোর বাপ কত খেলা দেখিয়ে এল কত জোয়ান জোয়ান ছেলে নিয়ে, আর তোকে কিনা সামলাতে পারবে না, পুঁচকে একরত্তি ছেলে।' বাপের হয়ে ছেলেকে কেউ কেউ তিরস্কার করলে।

মস্তাজ একটু হাসল। অনেক অভিজ্ঞতায় মসৃণ, ধারালো সেই হাসি।

'পড়েই যদি যাস, বাপ তোকে দু হাত বাড়িয়ে লুফে নিতে পারবে না ? নে, উঠে

আয়।

যে লোকটা ট্যামটেমি বাজাচ্ছিল সে আরো জোরে কাঠির বাড়ি মারতে লাগল।

কিন্তু ছেলে কিছুতেই রাজি হয় না। সকল কোলাহল ছাপিয়ে তার কান্নাই প্রবল হয়ে ওঠে।

খেলা আর জমল না তাহলে। দু-একজন করে খসে পড়তে লাগল।

মস্তাজ অসহিষ্ণুর মত গলা উঁচিয়ে তাকালো একবার ভিড়ের বাইরে।

কতক্ষণ পরে কে আরেকটা ছেলে দুর্বল পায়ে হাঁটতে হাঁটতে কাছে এসে দাঁড়াল। হাতে একটা আধ-খাওয়া পাঁপড়।

'ওই ওর দাদা।' জানা লোকেরা হৈ-হৈ করে উঠল।

বছর দশেকের রোগা-পটকা ছেলে। লিকলিকে হাত-পা। গায়ে একটা ছেঁড়া পাতলা কাঁথা জড়ানো। ঠোঁটের চারপাশে, গালে ও থুতনির নীচে কাটা ঘা, একটা চনচনে মাছি বারে বারে উড়ে এসে বসছে তার নাকের ডগায়। দুটো ভাসা ভাসা চোখে কেমন একটা শূন্য অর্থহীন চাহনি।

ছোট ভাই'র কাছে এগিয়ে গেল। বললে, 'তোকে কাঁদতে হবে না আকু, আমিই খেলা দেখাব।'

আকু চুপ করল। চোখের জল শুকিয়ে গেল দেখতে দেখতে!

আরো ঘন হয়ে এল জনতা। ট্যামটেমির বাজনা আরো টাটিয়ে উঠল।

কোমর ও হাঁটুর মাঝে যেটুকু কাপড় ছিল ভুর করে তাই আরো খাটো ও আঁট করে নিল মস্তাজ। বাঁশটাকে বসাল পেটের উপর, নাই-কুণ্ডলের গর্তে। কি যেন বললে বিড়বিড় করে। বোধ হয় বিসমিল্লার নাম করলে। বাঁশটা একবার কপালে ঠেকাল। গায়ে হাত বুলিয়ে মুখের খুব কাছে টেনে এনে কি বললে তাকে।

এমন করতে কেউ তাকে দেখেনি কোনো দিন। এতটা চলবিচল হয়ে যাওয়া।

'চলে আয়, ইন্তাজ।' ডাক দিল সে বড় ছেলেকে।

ইন্তাজ মুহূর্তে গায়ের কাঁথাটা খুলে ফেলল।

কে যেন হঠাৎ পেটের মধ্যে টেটা ঢুকিয়ে দিল— এমনি আঁৎকে উঠলাম। ছেলেটার বুকে-পেটে টানা-টানা ঘা, কোথাও দগ দগ করছে, কোথাও খোসা পড়েছে, কোথাও বা পুঁজ উঠেছে দলা পাকিয়ে। সেই চনচনে মাছিটা হঠাৎ আর কটা গুয়ে মাছি ডেকে এনেছে। যখন ঘুরে দাঁড়াল ইন্তাজ, তখন খানিক স্বস্তি পেলাম। কেননা পিঠটা ওর মসৃণ, নিদাগ।

'কেমন করে হল এই ঘা? এতগুলি ঘা?' জিগ্‌গেস করলাম জনতাকে।

কেউ কেউ জানে দেখলাম। দোল পূর্ণিমার দিন চাঁপালির বাবুদের বাড়িতে খেলা দেখাবার সময় বাঁশের মাথা থেকে পড়ে যায় ইন্তাজ। বুড়ো তার কতদিন আগে ম্যালেরিয়া থেকে উঠেছে, আমানি পান্তাও নাকি জোটাতে পারেনি তারপর, তাই বাঁশটাকে বাগ মানিয়ে রাখতে পারেনি পেটের মধ্যে। যেখানে পড়ল ইন্তাজ সেখানে ছিল খোয়া আর খোলামকুচি, বুক পেট ছড়ে কেটে একাকার হয়ে গেল। সেই থেকেই ছেলেটা একটু কাবু হয়ে পড়েছে।

'ন্যাতাটা গায়ে জড়িয়ে নিবি না?' জিগগেস করল মস্তাজ।

'না।' দু' হাতে ধুলো মেখে ইন্তাজ লাফিয়ে উঠল বাপের পেটে, বাঁশ ধরে। দীর্ঘ অভ্যাসে মসৃণ, তরতর করে বেয়ে উঠতে লাগল। দু হাত দিয়ে পেটের উপর বাঁশটা শক্ত

করে চেপে ধরে ঠায় দাঁড়িয়ে রইল মস্তাজ।

'দেখুক, দেখুক এবার আক্কাছ। এত ঘায়ের যন্ত্রণা নিয়েও তার দাদা কেমন রাজি হল খেলতে।'

আক্কাছ বা আকু ঘাড় উঁচু করে চেয়ে আছে তার দাদার দিকে। এখন আর তার ভয় নেই। সে এখন ট্যামটেমি বাজাতে পারে। কিংবা মগ নিয়ে ঘুরতে পারে পর-পর।

বাঁশের চূড়ার কাছে এসে ইন্তাজ একবার স্থির হয়ে দাঁড়াল, পেটের কাছে কাপড় জড় করে বাঁশের মুখটা ঠিক করে বসাবার জন্যে। তখন তার ঘাগুলি আরেকবার স্পষ্ট করে দেখলাম। অসহ্য লাগল। ভাবলাম চলে যাই।

কে একজন বাধা দিল। বলল, তারপর যখন ব্যাঙের মত হাত-পা ছড়িয়ে ঘুরতে থাকবে শূন্যে, তখন ওসব ঘা-টা কিচ্ছু দেখা যাবে না।'

'বাঁশটা কি বাপ হাতে করে ঘোরাবে নাকি?'

'কতক্ষণ হাতে করে ঘুরিয়ে বাঁশটা পেটের উপর রাখবে, তারপর মোচড় খেয়ে-খেয়ে আপনিই বাঁশটা ঘুরবে পেটের গর্তের মধ্যে। সেই তো আসল খেলা।'

'নইলে বাঁশ পুঁতে তার ওপর ডিগবাজি খাওয়াটা তো সেকেলে। তাতে আর বাহাদুরি কি!' আরেকজন ফোড়ন দিল।

ততক্ষণে বাঁশ ঘুরতে শুরু করেছে মস্তাজের দু'হাতে। চোট খাবার পর ছেলেটা নিশ্চয়ই খুব হালকা হয়ে গেছে, ঘুরছে ফুরফুরির মত। হাত পা ছড়িয়ে। ঘা তো বোঝাই যাচ্ছে না, বোঝা যাচ্ছে না ওটা কোনো মানুষ না বাদুড় না চামচিকে!

এতক্ষণ আকাশের দিকে মুখ করে ছিলাম, এবার তাকালাম মস্তাজের দিকে যখন সে হঠাৎ ঘুরন্ত বাঁশের প্রান্তটা পেটের খাঁজের মধ্যে গুঁজে দিলে। তারপর হাত দিল ছেড়ে। ছেলের পেটের চেয়ে বাপের পেটটাই বেশি দেখবার মত। ছেলের পেটে ঘা, বাপের পেটে প্রকাণ্ড খোদল। বাঁশটা গ্রহণ করবার জন্যে মস্তাজের পেটে সাময়িক গর্ত তৈরি হয়নি, যেন অনেক দিন থেকেই এ গভীর গহ্বরটা সেখানে বাসা বেঁধে আছে। সেই গর্তটা ঘুঁটে ঘুঁটে ঘুরছে না জানি কোন জ্বলন্ত মন্থনদণ্ড।

বাঁশের শেষ প্রান্তটা কতদূর পর্যন্ত চেপে ঠেলে দিয়েছে পেটটাকে, নিজের চোখে দেখেও বিশ্বাস হচ্ছিল না। পেটে-পিঠে এক, এমনিতে দেখেছি অনেক। এখন দেখলাম পেট বলে কিছুই নেই আর মাঝখানে, বাঁশের মুখটা সটান পিঠের উপর বসানো, সামনের দিক থেকে। পেটের সব নাড়িভুঁড়ি শুকিয়ে কুঁকড়ে কোথায় সরে গেছে, মেরুদণ্ডের হাড়ের সঙ্গে ঠোক্কর খেতে খেতে খটাখট শব্দে চলেছে বাঁশের ঘুরুনি।

প্রতি মুহূর্তে যা ভয় করছিলাম! ইন্তাজ ফসকাল না, মস্তাজই টলে পড়ল। শেষ মুহূর্তে দু হাত বাড়িয়ে ছেলেটাকে লুফে নেবার চেষ্টা করেছিল মস্তাজ কিন্তু যতই ফুরফুরে পাতলা হোক, বাপের দুর্বল বাহু আশ্রয় দিতে পারল না ইন্তাজকে।

আজকাল বারেবারেই বুড়োর কেবল ফসকে যাচ্ছে, কে একজন আপত্তি করে উঠল।

মস্তাজ দুহাতে মাথাটা চেপে ধরে বসে আছে উবু হয়ে। তাড়ি-খাওয়া পাকতেড়ে ঘোড়ার মত ধুঁকছে, আর ড্যাবডেবে চোখে তাকিয়ে আছে শূন্য মগের দিকে।

তারি জন্যে হয়তো খেলা শুরু হবার আগেই মগটা সে তুলে ধরেছিল সবারই কাছে। কয়েকটা পয়সা আগে পেলে সে কিছুটা খেয়ে নিতে পারত, এক-আধখানা পাঁপড় কি চামদড়ির মত শুকনো দু-একটা ফুলুরি। পেটে কিছু পড়লে পেট হয়তো এর চোটেই পিঠ হয়ে পড়ত না, খুখুরে বাহু দুটোতেও একটু জোর আসত। অভ্যাসে সব কিছুই সওয়ানো

যায়, শুধু বুঝি ক্ষুধাকেই বাগ মানানো যায় না। বাঁশ, বাছু, ছেলে, ঘা— সব কিছুরই মুখোমুখি দাঁড়ানো যায় একমাত্র অভ্যাসের সাহসে— শুধু ক্ষুধাটাই দুর্বিনীত, ক্ষমাহীন।

বাঁশটা ছিটকে পড়েছে দূরে। ইন্তাজ আরো দূরে। উত্থিত গোলমালের মাঝে তার গোঙানিটা শুনতে পেলাম না। কেউ বললে হয়ে গেছে। কেউ বললে, বুকের কাছটাতে ধুকধুক করছে এখনো।

কাছেই দাতব্য চিকিৎসালয়। যতদূর সম্ভব ঘায়ের ছোঁয়া বাঁচিয়ে ইন্তাজকে ধরাধরি করে, কারা নিয়ে গেল ডাক্তারখানায়। ঘটনাটা সদ্য-সদ্য ঘটেছে বলে দাতব্য চিকিৎসালয় একেবারে ফিরিয়ে দিতে পারবে না হয়তো। নইলে এমনিতে ঘায়ের ওষুধ নিতে এলে ফিরিয়ে দিত নিশ্চয়ই। কেননা, প্রতিবারের ওষুধ নেবার সময় এক আনা করে পয়সা দিতে পারত না মন্তাজ। যদি এক-আধ আনা পয়সা তার হাতে আসে, সে কি তা দিয়ে পেটের উপরের ঘা শুকোবে, না, পেটের ভিতরের ঘা?

মন্তাজ বসে আছে চুপ করে, গোঁজ হয়ে, কিন্তু ছোট ছেলে আক্কাছ কাঁদছে একেবারে গলা ফাটিয়ে। ভাবলাম দাদার জন্যেই বুঝি তার কান্না।

কিন্তু মুখে তার সেই এক আর্তনাদ, এবার আরো নিঃসহায় কণ্ঠে, 'এবার আমার পালা। এবার আমার পালা। আমি নিঘ্‌ঘাত পড়ে যাব, মরে যাব আমি—'

মন্তাজ কিছুই বলল না। আকুর হাত ধরে চলল হাসপাতালের দিকে।

'পড়ে যাব, মরে যাব।' কোন অদৃশ্য আল্লার কাছে শিশুকণ্ঠের করুণ অথচ কোন প্রতিকারহীন কাকুতি।

মন্তাজ কিছুই বলছে না। পাথুরে মুখে নিষ্ঠুর নির্লিপ্ততা। ছেলের কান্নার উত্তরে রেখাহীন কাঠিন্য। উপায় কি, তাকে খেতে হবে তো।

নিলু, আমাদের নিলু

দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়

নিলুকে নিয়ে আর পারা গেল না। এমন সব প্রশ্ন করে মাঝেমধ্যে যে, কে বলবে ক্লাস এইটের ছাত্র! সে-সব প্রশ্নের উত্তর অবশ্য ওকেই দিতে হয়। যেমন প্রশ্ন, তেমনি তার উত্তর। চিন্তাভাবনা, বুদ্ধি, সব ব্যাপারেই যে নিলু আমাদের থেকে আলাদা, তা আর বুঝতে অসুবিধা হয় না।

সেদিন টিফিনে সে প্রশ্ন করল, "বিলিয়ার্ড বল দেখেছ?"

আমরা জানি, এটাই ওর মূল প্রশ্ন নয়। আসল প্রশ্নটা আসছে ঠিক এর পরেই।

"বলো তো, নিখুঁতভাবে পালিশ করা একটা বিলিয়ার্ড বল আর ভূপৃষ্ঠ, কোন্‌টা বেশি মসৃণ?"

এটা আবার প্রশ্ন নাকি! চকচকে বিলিয়ার্ড বলটাই যে ভূপৃষ্ঠের চেয়ে বেশি মসৃণ, এটা কি আর জোর গলায় বলতে হবে? নিলু কিন্তু জোর গলাতেই বলল, "তোমরা যা ভাবছ তা নয়। বিলিয়ার্ড বলটাকে যদি ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে পৃথিবীর মতো বড় করে নাও, তা হলে দেখবে সেটা ভূপৃষ্ঠের চেয়েও এবড়োখেবড়ো।"

প্রমাণ কী? বিলিয়ার্ড বলটাকে তো আর পৃথিবীর মতো ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে নেওয়া যাবে না। সুতরাং নিলু যা বলছে তার অকাট্য প্রমাণ কিছু নেই। কিন্তু এমন জোর-গলায় সে কথাগুলো বলে যে, বিশ্বাস না করে আর উপায় থাকে না। বলেছি না, নিলুর চিন্তাভাবনাই আলাদা। একমাত্র নিলুর পক্ষেই বিলিয়ার্ড বলের পৃথিবীর মতো বিশাল আকার চিন্তা করা সম্ভব!

হঠাৎ আমার দিকে সেদিন একটা খাতা এগিয়ে দিয়ে নিলু বলল, "নাও, সই করো।"

"কেন?"

"করোই না, পরে বুঝতে পারবে।"

"ইংরেজি, না বাংলায়?"

"ইংরেজিতেই করো।"

সই করতে না করতেই অব্যর্থ সেই প্রশ্নটা নিলু আমার দিকে ছুঁড়ে দিল।

"এই যে সই সরলে, এর ওজন কত জানো? দাঁড়িপাল্লায় মাপলে, তোমার সইয়ের ওজন কত দাঁড়াত?"

উত্তর তো দূরের কথা, এ-ধরনের প্রশ্নও যে হতে পারে, তা পর্যন্ত আমার মাথায় খেলেনি। নিলু কিন্তু শান্ত গলায় উত্তর দিল, "পেন্সিল দিয়ে এই যে তুমি তোমার নাম সই করলে, এর প্রতিটি অক্ষরের ওজন এক আউন্সের ·০০০০১২৫ ভাগ।"

অবাক না হয়ে উপায় আছে ! নিলু এবার হাসতে হাসতে বলল, "ভাবো, আলাদাভাবে ভাবতে শেখো। সবাই যদি একইভাবে চিন্তাভাবনা করবে, তা হলে নতুন রাস্তায় চলার লোকজনই তো দেখা যাবে না।"

সত্যিই, নিলুর মতো অদ্ভুত ব্যাপারস্যাপার আমাদের মাথায় খেলেনা। যদি মাথাটা ওর মতো খেলত, তা হলে হয়তো প্রশ্ন করতাম, ডট পেন দিয়ে সই করলেও কি একই ওজন দাঁড়াত ? কিংবা কালিকলম দিয়ে ? অবশ্য পাল্টা প্রশ্ন না করে ভালই হয়েছে। নিলু চটপট কিছু একটা উত্তর দিতই। আর তাতেই আমার ভোঁতা বুদ্ধিটা ধরা পড়ে যেত। ওর বুদ্ধির তারিফ করে আমি শুধু বললাম, "তুমি এত প্রশ্ন করো, অদ্ভুত অদ্ভুত উত্তর দাও, সেগুলো খাতায় কেন লিখে রাখো না ? একদিন অনেক লেখাপত্র জমে নতুন ধরনের একটা বই হত।"

নিলু নির্বিকার গলায় যা বলল, তাতেও বোঝা যায়, ও কতটা সপ্রতিভ।

"পৃথিবীর সর্বকালের দুজন সেরা লেখক কিন্তু জীবনে একটা লাইনও লেখেননি। তাঁরা ছিলেন স্মৃতিধর। নাম করতে পারো সেই মহান দুই লেখকের ?"

আচ্ছা প্যাঁচে পড়া গেল দেখছি। বারবার নিজের অজ্ঞতার বিজ্ঞাপন দেওয়া ঠিক নয়। জানি নিলু কিছু মনে করে না। কিন্তু হাজার হলেও নিজের তো খারাপ লাগে।

"বলতে পারলে না ? নাম দুটো কিন্তু সবারই খুব চেনা। হোমার ও সক্রেটিস। ওঁরা যে শুধু লিখতে জানতেন না তা নয়, পড়তেও পারতেন না।"

নিলুকে কে এসব খোঁজখবর দেয়, বলা মুশকিল। কোন্ বইয়ে যে এত কথা লেখা থাকে ! সত্যি না মিথ্যে, বোঝাও কঠিন। কিন্তু নিলু এমনভাবে উত্তর দেয় যে, ওর কথা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। আসলে, ওর প্রতিটি কথার মধ্যেই একটা বিশ্বাসযোগ্যতা আছে। তা ছাড়া, ওর আচার-আচরণ এমনই যে, এক মুহূর্তের জন্যেও ওকে অবিশ্বাস করা যায় না।

প্রশ্নের পর প্রশ্ন। অসংখ্য, অগণ্য। তার আর যেন শেষ নেই। নিলু যেদিন স্কুলে আসে না, কিংবা আমাদের ছুটিছাটা থাকে, সেই দিনগুলোই শুধু আমাদের ফাঁকা যায়। এখন এমন অবস্থা হয়েছে আমাদের যে, নিলুর প্রশ্ন ছাড়া দিনই কাটতে চায় না। প্রশ্ন শুনলে আগে ওকে আমরা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতাম। কিন্তু নিলু কখনও তা গায়ে মাখেনি। আর এখন ওর প্রতি আমাদের শ্রদ্ধাই বেড়ে গেছে। নিলু যেদিন কোনও কারণে স্কুলে আসে না, সেদিন একটা মুহূর্তও যেন কাটতে চায় না।

নিলুই একবার প্রশ্ন করেছিল, "এক মুহূর্ত মানে ঠিক কতটা সময় জানো ?"

না, আমরা কেউ বলতে পারিনি। কারণ, উত্তরটা জানতাম না। এলোপাথাড়ি চেষ্টা অবশ্য কেউ কেউ করেছিল। কিন্তু তারা কেউ যে সঠিক উত্তর দিতে পারেনি, তা নিলুব কথাতেই স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল।

"এক মুহূর্ত মানে দেড় মিনিট। ইংরেজরা যাকে বলে মোমেন্ট তাকেই আমরা বলি মুহূর্ত। ইংল্যান্ডে পুরনো আমলে মোমেন্ট বলতে দেড় মিনিট সময় বোঝাত। সেই দেড় মিনিট সময় এক-একটা মুহূর্তের খাতায় জমা করতে পারো।"

না, নিলুর জ্ঞানগম্যি প্রশংসা করতেই হয়। অথচ কোনওদিন কোনও কুইজ প্রতিযোগিতার ধারেকাছেও নিলুকে দেখা যায় না। আমরা জানি, কুইজ প্রতিযোগিতায় ওর জয় অনিবার্য। কিন্তু নিলু শুনলে তো ! হাজার পীড়াপীড়ি সত্ত্বেও সে কোনও প্রতিযোগিতায় নাম দেয় না। একগাল হেসে বলে, বেশ তো আছি। শিল্ড ট্রফির আর

দরকার কী !

নিলুকে যত দেখি, তত অবাক হই। ক্লাসের ফার্স্ট বয় হীরেন পর্যন্ত ওকে সমীহ করে চলে। অথচ নিলু এক থেকে দশ, কোনও পজিশনই পায় না। পাওয়ার জন্যে চেষ্টাও নেই। আমরা কিন্তু নিজেরা আড়ালে বলাবলি করি, নিলু যদি একটু চেষ্টা করত, তা হলে ফার্স্ট বয়ের জায়গাটা ছিল ওর বাঁধা ! নিলুর কানেও কয়েকবার কথাটা পৌঁছেছে। কিন্তু সে তেমন আমল দেয়নি। একবার আমাদের বলেছিল, 'বই তো সবাই পড়ে। আমিও পড়ি। তবে যে জায়গাগুলো আমার ভাল লাগে, যে-সব জায়গায় নতুন খবর থাকে, আমি সেগুলো মনে রেখে দিই। আর কোন্ বইয়ের কোন্ কোন্ জায়গা খুব মজার, তা খুব সহজেই আমার নজরে পড়ে। আমি সেই মজাগুলোই তোমাদের জানাতে চাই।'

'তা হলে বলতে চাও, আমরা যে-সব বই পড়ি , তুমি তার বেশি কিছু পড়ো না ?' আমি এবার তেড়েফুঁড়ে উঠে ওকে এই প্রশ্ন করেছিলাম।

'ঠিক তাই।' নিলু উত্তর দিয়েছিল।

'তুমি সেদিন প্রশ্ন করলে, কোন্ দুধের রঙ গোলাপি ? আমরা বলতে পারলাম না। বইয়ে পড়লে আমরা কেউ না কেউ নিশ্চয় বলতে পারতাম।'

'সব কথা কি বইয়ে লেখা থাকে ? মনে পড়ে দার্জিলিংয়ে বেড়াতে গিয়ে, চিড়িয়াখানার একটা ইয়াক দেখিয়ে প্রকৃতিবিজ্ঞানের স্যার কী বলেছিলেন ?'

আবার বোকা বনে গেলাম। সত্যিই তো, স্যার বলেছিলেন, ইয়াকের দুধের রঙ সাদা নয়, গোলাপি। আমরা যখন ক্লাস সিক্সে পড়ি, সেই সময় একবার স্কুল থেকে দার্জিলিংয়ে এক্সকারশনে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। তা, প্রায় বছর দুয়েক হল। ইয়াক নিয়ে সেবার স্যার যা বলেছিলেন, তা এখনও নিলুর মনে আছে ? অথচ আমরা সবাই কথাটা বেমালুম ভুলে গেছি। গোলাপি রঙের দুধের কথাটা নিলুর মনে সেই যে দাগ কেটে বসেছে, তা আজও ফিকে হয়নি। ওর সঙ্গে তফাতটা আমাদের এখানেই। একবার যা ওর মনে দাগ কেটে বসে, তা আর ওঠে না। অদ্ভুত কোনও বিষয় যদি ওর মাথায় ঢোকে, তা হলে তো কথাই নেই !

'লিং ওয়েনের নাম শুনেছ ?" নিলু আমাকে জিজ্ঞেস কল্ল।

প্রথমে ভাবলাম, অন্যান্য প্রশ্নের মতো ওর এও এক প্রশ্ন। বললাম, "না। কেন বলো তো ?"

'লিং ওয়েনের কথা বললে আরও একজনের কথাও বলতে হয়। চিনের সম্রাট উং লো'র কথা। উং লো বেঁচে ছিলেন ১৩৬০ থেকে ১৪২৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত।''

এই প্রথম নিলু কোনও প্রশ্ন করল না। ক্লাসে আমার সঙ্গেই ওর বেশি ভাব ! প্রশ্নও যেমন আমাকে বেশি করে, তেমনি আবার ওর মনের গভীর গোপন কথাও আমাকে শোনায়। কিন্তু নিলু এবার যা বলল, তাতে গা রীতিমত ছমছম করে ওঠে।

"লিং ওয়েন যা পেরেছিলেন, আমিও তা পারি।"

নিলুর মন এখন চলে গেছে চোদ্দ-পনেরো শতকের ধোঁয়াটে ইতিহাসের খাতায়। তার কতটা সত্যি, জানা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

"লিং ওয়েন কী করেছিলেন জানো ? সম্রাট উং লো'কে বলেছিলেন 'বিশ্বাসঘাতক'। সম্রাটের সভাসদ হয়ে মুখের ওপর তাঁকে বিশ্বাসঘাতক বলার ফল বুঝতে পারছ ? সম্রাট তাঁর প্রাণদণ্ড দিয়েছিলেন। জল্লাদ এসে মাথা কেটে ফেলল লিং ওয়েনের। কিন্তু আসল ঘটনা ঘটল এরপরেই। মাটিতে রক্ত গড়িয়ে গড়িয়ে চিনা ভাষায় যে-লেখা ফুটে উঠল,

তা শুনলে তোমার গা হিম হয়ে যাবে। 'বিশ্বাসঘাতক'। সম্রাট ভয় পেয়ে তাঁর রাজধানী নানকিং থেকে পিকিংয়ে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। একেই বলে আদর্শবাদ, তাই না? লিং ওয়েন মরে গিয়েও তা প্রমাণ করলেন। এরকম লোকই আমার জীবনের আদর্শ।"

"রহস্য-গল্পের মতো শোনাচ্ছে। সম্রাট হয়তো ভুল দেখেছিলেন।" আমি বললাম।

"আসলে ভুল-নির্ভুলের সীমানাটা তোমাদের এত ছোট যে, তার বেড়া টপকে কিছু ভাবতেই পারো না।"

এর পরেই এক অমোঘ প্রশ্ন করল নিলু, "বলো তো, কোন্ ঘড়ি দিনে মাত্র দুবার সঠিক সময় দেয়, আর অন্য সময় থাকে বেঠিক?"

যথারীতি আমি নিশ্চুপ। নিলুই বলল, "কেন, বন্ধ হয়ে-যাওয়া ঘড়ির কথা মনে পড়ল না? দিনে রাতে দুবার নিখুঁত সময় তো সে দেয়ই।"

সত্যি, মনে পড়া উচিত ছিল। কিন্তু মনে যে পড়ে না, এটাই সত্যি।

নিলুর সব কথাই মনে থাকে। আমরাই শুধু ভুলে যাই। লিং ওয়েনের কথাটাও ভুলে গিয়েছিলাম। কিন্তু মনে পড়ল অদ্ভুত এক পরিস্থিতিতে।

পাশের বিলসারা গ্রামের নবীনকিশোর হাইস্কুলের সঙ্গে আমাদের ফুটবল ম্যাচ। নিলু আমাদের সেরা স্ট্রাইকার। কিন্তু সমস্যা হল, সে কিছুতেই খেলতে চায় না। ক্লাসের ম্যাচগুলোও খেলে না। নেহাত আমাদের অনুরোধ পড়েই দু'একদিন খেলতে আসে। নবীনকিশোর হাইস্কুলের সঙ্গে ম্যাচেও আমাদের অনুরোধ ঠেলতে পারল না। তবে ওর বাড়িতে গিয়ে আমাকে অনেক সাধ্যসাধনা করতে হল।

মাঠে ভিড় উপছে পড়ছে। বিলসারা গ্রাম ভেঙে লোকজন এসেছে। নবীনকিশোর স্কুলের একজন ছাত্রও বোধহয় বাকি নেই। আমাদের নীলপুর গ্রামের লোকেরা তো আছেই। স্কুলের ছেলেরাও হাজির। আমাদের স্কুলের মাঠে ম্যাচ। তাই বাড়তি একটা সুবিধা আমাদের আছেই।

খেলা শুরুর আগে আমাদের খেলাধুলোর মাস্টারমশাই হাবুলবাবু বলে দিয়েছিলেন, 'ওদের ওই রাইট স্টপার সম্পর্কে একটু সাবধানে থেকো। দুমদাম পা চালায়। ফাউল না করলে, ছেলেটা স্টপার হিসেবে ভালই খেলে।'

খেলার সময় অবশ্য হাবুলবাবুর হুঁশিয়ারি আমাদের মনে থাকেনি। উত্তেজনার সময় কোনও কিছু মনে থাকবার কথাও নয়। হঠাৎ দেখলাম, নবীনকিশোর হাইস্কুলের ডিফেন্স চিরে নিলু এগিয়ে যাচ্ছে। লিঙ্কম্যান আর রাইট ব্যাককে কাটিয়ে নিতেই নিলু ওদের পেনাল্টি বক্সের মাথায় তিন-চারজন খেলোয়াড়ের সামনে পড়ল। তাদেরও সে প্রায় কাটিয়ে বেরিয়ে যাবে, ঠিক এমন সময়েই ঘটল এক সাঙ্ঘাতিক ঘটনা। ভিড়ের মধ্যে কে যেন নিলুর মাথা লক্ষ করে পা চালিয়েছে। বুটের আঘাতে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল নিলু। কপাল ফেটে ফিনকি দিয়ে রক্ত পড়ছে।

হইহই পড়ে গেল মাঠে। খেলা বন্ধ। নিলুকে ধরাধরি করে আমরা মাঠ থেকে বাইরে নিয়ে গেলাম। সেখান থেকে গ্রামের হেলথ সেন্টার। কিন্তু তার আগে, মাঠে চাপচাপ রক্তে অব্যর্থ একটি লেখা ফুটে উঠতে দেখে আমি চমকে উঠেছিলাম। সবুজ ঘাসের ওপর লাল রক্তের ধারায় ফুটে উঠেছিল একটি নাম—অমর। আর কেউ দেখেছিল কি না জানি না, কিন্তু আমি স্পষ্ট দেখেছিলাম।

নিলুর কপালে সেদিন তিনটি সেলাই দিতে হয়েছিল। আঘাত আরও গুরুতর হতে পারত। ভাগ্য ভাল, হয়নি।

কয়েকদিন পরে নিলু পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠল। তবে তখনও স্কুলে আসেনি। ওর বাড়িতে গিয়ে দেখলাম, শুয়ে শুয়ে একটা বই পড়ছে।

"ওদের রাইট স্টপারই এই কাণ্ডটা ঘটিয়েছে।"

"কী করে জানলে ?"

"ওর নাম তো অমর। হাবুলবাবু আগেই সাবধান করে দিয়েছিলেন। তা ছাড়া..."

"তুমি আমাকে লিং ওয়েনের গল্প শুনিয়েছিলে না ?"

"জানা-অজানার বেড়াটা তা হলে টপকাতে পারলে ?" নিলু আগের মতোই হাসতে হাসতে বলল।

পদকে নই পদানত

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

'পি এম আসছেন। পি· এম।' চার লক্ষ টাকা খরচ করে তৈরি কবা হয়েছে সুবিশাল এক তোরণ। সারা ভারতে যেখানে যত তোরণ আছে সেইসব তোরণের ডিজাইন জগাখিচুড়ি করে বিরাট এক ভাস্কর এটি নির্মাণ করেছেন দেশালই কাঠ আর কাগজ জুড়ে। টেম্পোরারি ব্যাপার তো। ঘণ্টা তিনেক পরে এই তোরণেব আব কোনও প্রয়োজন থাকবে না। তখন এইটাতে আগুন ধরিয়ে 'বনফায়ার' হবে। অলিম্পিক 'বনফায়ার'। সাতমণ ঘি ঢেলে একটা মহাযজ্ঞও হবে। চলবে তিনদিন। ভারতবর্ষের নামে সঙ্কল্প করে শুরু হবে 'হুমন'। প্রার্থনা করা হবে পরবর্তী অলিম্পিকে ভারতের খোলনলচে যেন একেবারে খুলে পড়ে। খুলে পড়ে মানে, টেংরি খুলে দৌড়তে হবে। গোল্ড, গোল্ড না হলে সিলভার, সিলভার না হলে ব্রোঞ্জ। তাতে যদি টেংরি কাঁধে করে দেশে ফিবতে হয় সেও ভি আচ্ছা। খালি হাতে ফিরলে পশ্চিমবাংলায় নির্বাসন।

প্রেস অ্যাডভাইসার বিনীত ভাবে প্রশ্ন কবেছিলেন, 'পি এম স্যাব পশ্চিমবাংলায় কেন স্যার!'

পি এম বলেছিলেন, 'সারা ভারতে ওইটাই একমাত্র রাজ্য যা কেন্দ্রের বাইবে। কেন্দ্রের বাইরে মানে ভারতের বাইরে। সেন্টারের স্টেপডটার। সৎমায়ের কন্যা। নরক বলা চলে। সারা দিন রাত ওখানে ধেই ধেই নৃত্য আর হরিনাম সংকীর্তন চলেছে। ওখানে রিভলভারধারী পুলিস মাস্তানের ভয়ে ছুটে পালান। সেখানে পুলিসে চোব ধরে না, চোর পুলিস ধরে। নেতায় নেতায় লেজ কামড়া কামড়ি হয়। সর্বোচ্চ অফিসাব ইউনিয়নের ক্লাস ফোর নেতাকে স্যার বলে সম্বোধন করেন। না করলে তাঁর চেয়ার চলে যায়। সেই রাজ্যের সমস্ত রাজপথ ঢেউ খেলানো। সাত হাত অন্তর পলিটিক্যাল হাম্প। আমাকে একবার নিয়ে গিয়েছিল কোন এক চেম্বারের জুবিলিতে। আমাদের গোয়েন্দা সংস্থা এসে খবর দিলে, যে পথে যেতে হবে সেই পথে মোট দেড়শোটা পলিটিক্যাল বাম্প আছে।'

'স্ট্রেঞ্জ, পলিটিক্যাল বাম্প, সেটা কি জিনিস?'

'উঃ, আপনাদের অজ্ঞতার কোনও সীমা পরিসীমা নেই। পশ্চিমবাংলায় একটা বামজোট দেশ শাসন করছে, জানেন কি তা?'

'ইয়ে স্যার।'

'জানেন কি ওয়েস্ট বেঙ্গলে কোনও গাড়িই ট্রাফিক রুল মানে না। মানানো যায় না। জানেন কি সেখানে গীতা, বেদান্ত, মার্কস, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, কালী, তারা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ছিন্নমস্তা, সব একসঙ্গে পরিপাক করে একটা হাঁড়িকাবাব তৈরি হয়েছে। লোক

না পোক ভেবে ড্রাইভাররা রোজ দু'দশটাকে জামা পাল্টে ছেড়ে দেয়।'

'জামা পালটানোটা কি স্যার।'

'অ, আপনি তো আবার ইংলিশ-মিডিয়াম। কাল থেকে দু'পাতা করে গীতা পড়ার অভ্যাস করুন। পড়া উচিত। কাজে লাগবে। কবে আছি মশাই কবে নেই। পশ্চিমবাংলার যুবকরা ভারি সুন্দর একটা কথা বলে, মায়ের ভোগে চলে যাওয়া। ব্যাপারটা কি জানেন, মরে যাওয়া। গীতা, বেদান্ত আর মার্কস তিনটেকে ওরা একেবারে গুলে খেয়েছে। গীতা বলছেন, মৃত্যু বলে কিছু নেই। শরীর হল একটা জামা। সেই জামা পরে আছে একটা আত্মা। এই আত্মা আবার কোন আত্মা। সেই অখণ্ড আত্মার অংশ। যাকে আমরা বলি পরমাত্মা। আপনি তো আবাব ইকনমিকসের লোক। আপনাকে আত্মা বোঝাতে হলে ইকনমিকসের উদাহরণ দিতে হবে। আত্মার ব্যাপারটা বোঝানোর সহজ উপায় হল, আমাদের মনিটারি সিসটেম। আমাদের কারেন্সি হল পরমাত্মা, আর এই ষাট কোটি আত্মা হল, টাকা, দশ পয়সা, পাঁচ পয়সা, পঁচিশ পয়সা। নানা মূল্যের রেজগি আর কি। সেই একের সঙ্গে যার সম্পর্ক। এক হইতেই বহু, বহু হইতেই এক। আত্মার সর্বাধুনিক মনিটারি ডেফিনিসান। শরীররূপ জামা পরা আত্মা চাকার তলায় পড়া মানে দুঃখের কিছু নয়। জামা পালটানো। কিন্তু সাধারণ মানুষ তো আবার নানা জাতে বিভক্ত, যেমন কংগ্রেস, সি পি এম, ফরোয়ার্ড ব্লক, আর এস পি অ্যান্ড সো অন। চাপা পড়লেই আন্দোলন। সঙ্গে সঙ্গে সহজ সমাধান, হাম্প। কংগ্রেস হাম্প, সি পি এম হাম্প, ফরোয়ার্ড ব্লক হাম্প। একে বলে বাম্পইজম বা হাম্পইজম।'

'তা আপনি স্যার সেই হাম্পের ওপর দিয়ে জাম্প খেতে খেতে গেলেন?'

'না হে না। আমাদের ক্ষৌরকার গিয়ে সব চেঁছে সাফ করে দিয়ে এল। যাক কাল থেকে গীতা পড়বেন। মনে রাখবেন আমাদের পিছনে শমন। পাঞ্জাব টেররিস্ট। যে কোনওদিন আমাদেরও মায়ের ভোগে পাঠিয়ে দিতে পারে। গীতাই আমাদের একমাত্র ভরসা। গোর্বাচেভও কিছু নয়, বোফর্সও কিছু নয়। আসল হল সেই, নৈনং ছিন্দন্তি··· পরের লাইন, নেকস্ট লাইন, কাম অন, কাম অন।'

'পরের লাইনটা স্যার, দাঁড়ান আমি লিটারারি অ্যাডভাইসারকে ফোন করে জেনে নিচ্ছি।'

'দেখেছেন, আপনারা আমাকে ঠিকমতো ব্রিফ করতে পারেন না। এটা আমার ফরেন প্রেস কনফারেন্স হলে, আমার ভাবমূর্তিটা কি দাঁড়াতো, একবার ভেবে দেখেছেন? ফাম্বলিং ফর লাইনস। আবার আমাকে একটা রিশাফলিং করতে হবে। আপনার জায়গায় আমাকে গজেন্দ্র গদাধরকে আনতে হবে। না, ছেলেরা হোপলেস। রোহিণী ক্যাটাপুল্টকেই নিয়ে আসি।'

পি এম একেবারে খাপ্পা হয়ে আছেন। সব ব্যাপারে তিতবিরক্তির একেবারে শেষ পর্যায়ে চলে গেছেন। স্বপ্নের ভারত, তাঁর দু হাজার এক অব্দের ভারত, গ্রাউন্ড কন্ট্রোলের নিয়ন্ত্রণ-হারা স্পেস ক্র্যাফটের মতো মহাকাশের গভীরে অদৃশ্য হয়ে যেতে বসেছে। অর্থনীতি ধেবড়ে গেছে। রাজনীতি জেবড়ে গেছে। সমাজনীতি থেবড়ে গেছে। ল অ্যান্ড অর্ডার বমকে গেছে। আদর্শ চটকে গেছে। জাতীয়তা হড়কে গেছে। সম্প্রীতি সড়কে গেছে। সংস্কৃতি ল্যাংটো হয়ে গেছে। আর স্পোর্টস পটকে গেছে। সব যেন মামার বাড়ি ভেবে বসে আছে। তাই তাই তাই মামারবাড়ি যাই। মামি দিল নীল পাখি গীত শুনি ভাই। আমার স্ত্রী কি হোল কান্ট্রির মামি। ভোট দিয়ে তক্তে বসিয়ে এখন

ভোট কম্বল চাপা দিয়ে কিলোবার চেষ্টা। 'ফায়ার'! প্রেস অ্যাডভাইসার চমকে উঠে বললেন, 'কোন কামানে স্যার! বোফর্স গান!' পি এম এমনি মিষ্টি মানুষ। জোর করে দেশ-শাসনে বসিয়ে না দিলে একনম্বর ফিল্মস্টার হতে পারতেন। তখন সাউথ-এর সি এম-দের জারিজুরি খাটত না। দেবতা সেজে ভোট কামড়ানো বেরিয়ে যেত। সন্ন্যাসী সেজে ত্যাগী ভোগী আর হতে হত না। কিন্তু পি এম একবার রেগে গেলে তখন আর তিনি কারো নন। তখন একমাত্র ফার্স্ট লেডিই তাঁকে সামলাতে পারেন। ক্লাসিক্যাল গান শুনিয়ে, ইতালিয়ান রাগিণীতে। পি এম পাথরের মতো মুখ করে প্রেস অ্যাডভাইসারকে বললেন, 'প্রথম গোটা দুয়েক লাইন ভুলে গেছি, মোদ্দা কথা হল, মূর্খরা যত কম কথা বলে ততই তাদের মানায়। আপনি দয়া করে আসুন। রাত হয়েছে। পারেন তো একটু হোম-ওয়ার্ক করুন। আপনাদের অজ্ঞতা মানে আমার অজ্ঞতা। ডোন্ট ফরগেট দ্যাট।'

রাত আড়াইটের সময় পি এম আরাম কেদারায় বসে একটা ডিকটেশন দিলেন, ভারতীয় অলিম্পিক কমিটির কাছে, 'আপনাদের অপদার্থতায় আমার পিত্তি চটে গেছে। গদি টানাটানি, আঁকড়াআঁকড়ি, কামড়াকামড়ি নিয়ে ব্যস্ত থাকি সত্য। বিরোধীদের সঙ্গে বক্সিং আমাকে এক মুহূর্তও রিং ছেড়ে বেরোতে দেয় না, ও ভি সত্য; কিন্তু জেনে রাখুন স্পোর্টস-ওয়ার্ল্ডের সব খবর আমি রাখি। আমি ভারতকে যত এগিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছি, আপনারা সদলবলে ততই তাকে পেছিয়ে দেবার তালে আছেন। যেদিকটা আমি না দেখবো, সেই দিকটাই হড়কে যাবে। আবার সব ব্যাপারে নাক গলাতে গেলে বিরোধীরা সমালোচনা করবেন— ব্যাটা ডিকটেটার। এখন, বোর্ডের মহামান্য সদস্যরা বলুন, সোলে আপনারা কি করে এলেন? বেশ বেড়িয়ে এলেন তাই না। ভাল ফুর্তি হল, কি বলুন। একটা ঘুঁটের মেডেলও বরাতে জুটল না! উত্তম। অতি উত্তম। রাশিয়া হলে আপনাদের কি করা হত জানেন। গুলাগে চালান দেওয়া হত। ভারত বলে বেঁচে গেলেন। কম্যুনিস্ট কান্ট্রি হলে কামড়ে ছিঁড়ে দিত। এই হল লাল আর সাদার পার্থক্য। এখন দেখছি সাদা দেশে আপনারা সব সফেদ হাতি। যাক, এই শেষ রাতে আমি সিদ্ধান্ত নিলুম খেলার ব্যাপারে আমি নাক গলাবো। ঘণ্টা দুয়েক ঘুমোতুম। সেই ঘুমও আমি বিসর্জন দিলুম দেশজননীর স্বার্থে। পুরো সিসটেমটাকে আমি ঢেলে সাজাবো। আপনাদের কোনও কথা শুনবো না। আপনাদের মুরোদ বোঝা গেছে। আমি এদিকে পলিটিক্স করছি, আপনারা করছেন ওদিকে। আমার পলিটিকসে দেশ এগোচ্ছে, আপনাদের পলিটিকসে দেশ পেছোচ্ছে। কি খেলাই খেলছেন। আমাদের খেলোয়াড়দের সঙ্গে আমি আরও ঘনিষ্ঠভাবে মিশবো। প্রয়োজন হলে আমি নিজেই ট্রেনিং দোবো। আমি সব পারি। প্রয়োজনে আমি ডিকটেটার হতে পারি, মাফিয়া হতে পারি, কম্যুনিস্ট হতে পারি। সোলে আপনারা আমার থোবনায় চুনকালি মাখিয়ে এসেছেন। আমি সব কর্মকর্তার টায়ার পাংচার করে দোবো। আমি আসছি।'

পি এম আসছেন।

কর্মকর্তাদের একমাত্র ভরসা এই তোরণ। আমাদের পি এম শো-বিজনেস পছন্দ করেন। তোরণটি একেবারে গ্রেটেস্ট শো অন আর্থ। এক ব্যাটেলিয়ান ব্ল্যাক-ক্যাট সিকিউরিটি চেক-আপের ঠেলায় তিন চার জায়গা ড্যামেজ করে দিয়েছে। সেই সব জায়গায় সোল অলিম্পিকের লোগো দিয়ে তালি মারা হয়েছে। পি এম-এর পিতৃপুরুষদের বড় বড় ছবি ঝোলানো হয়েছে। লাল গোলাপ দিয়ে চারপাশ লালে লাল করা হয়েছে।

গোলাপের প্রতি এই পরিবারের একটা দুর্বলতা আছে। মাতামহের বাটান হোলে শত দুঃখের দিনেও একটি লাল গোলাপ গোঁজা থাকত। গোলাপ সুন্দরী রমণী, হৃষ্টপুষ্ট, ট্যাঁপোর-টোপর শিশু, তিনটি দুর্বলতাই সাজানো হয়েছে। সুন্দরী চিত্রতারকা। বাদ সেধেছে এক ব্যাটেলিয়ান লম্বা লম্বা ব্ল্যাক-ক্যাট। কাঠখোট্টা চেহারা। মাথায় ঘাসকাটা চুল। ধূর্ত নেকড়ের মতো মুখ। কমনীয় আয়োজনে বাবলাকাঁটা। কে এক কর্মকর্তা পরামর্শ দিয়েছিলেন ইন্দিরাজীর কণ্ঠস্বর শুনলে রাজীবজী প্রসন্ন হবেন। তাঁর মন বেদনাবিধুর হয়ে উঠবে, তুচ্ছ জাগতিক ব্যাপার থেকে মন চলে যাবে স্বর্গীয় লোকে। সব গলতি মাপ করে দেবেন। আরে ইয়ার খেলমে তো হারজিৎ হায়ই হায়। গেম ইজ এ গেম ইজ এ গেম। এ তো চীন-জাপান যুদ্ধ নয়। এক্সপোর্ট ইমপোর্ট বিজনেস নয়। রেগনের স্টার-ওয়ার নয়। খেলকুদমে এইসি হোতাই হায়। স্পোর্টসম্যান-স্পিরিট কালটিভেট করো। পি এমকে একটা কথা স্মরণ করিয়ে দেবেন, যা সারা পৃথিবীর লোক ত্রেতাদ্বাপর থেকে বলে আসছে। রাম বলেছেন, রাবণ বলেছেন, কৃষ্ণ বলেছেন, কর্ণ বলেছেন, যীশু বলেছেন, জরথুস্ট বলেছেন। আমার বাবা বলেছেন, বাবার বাবা বলেছেন, তাঁর বাবা বলেছিলেন, বাপুনে ভি কহা।

'আরে ঘোড়ার ডিম কথাটা কি বলো না। ভ্যানতাড়া না করে।'

'কথাটা হল, ফেলিওর ইজ দি পিলার অফ সাকসেস। ফেল করতে করতে, ফেল করতে করতে সাকসেস-এর কুতুব মিনার।'

'কথাটা অবশ্য মন্দ বলোনি ইয়ার। আমার আর একটা ডায়ালগ মনে আসছে। লর্ড কৃষ্ণ বলেছিলেন— কর্মণ্যে ইয়য়ে, কর্মণ্যে অকর্মণ্যে···।'

'আর চেষ্টা কোরো না, পি এম স্যাংস্কৃটে ভেরি স্ট্রং। মনে হয় আদ্য, মধ্য পাশ করা। কথাটা হল, কর্মে তোমার অধিকার, কর্মফলে নয়। সেকেন্ড কথা হল, কর্ম হল যোগের কৌশল। কি যোগ সেটা লর্ড পরিষ্কার করে বলেননি। আমার যদ্দুর মনে হয় ব্যাঙ্ক-ব্যালেন্সে যোগ। ওদিকে যোগ না হলে শেষজীবনে চিবোবোটা কি? আখের ছিবড়ে!'

'গেট রেডি। পি এম আসছেন।'

ঘোষণা হল। সবাই তটস্থ। সকলেই স্পোর্টস স্যুট পরে এসেছেন। ব্লেজারের বুকে বিভিন্ন পণ্য-প্রস্তুতকারক সংস্থার এমব্লেম। এইটাই বর্তমানের রেওয়াজ। কেউ ব্লেড কোম্পানির। কেউ শেভিং-ক্রিম কোম্পানির। কেউ টিভি। কেউ জুতো। কেউ জাঙ্গিয়া, কেউ পানমশলা। পর পর একই রকম সাত-আটটা গাড়ি ঝড়ের বেগে তোরণ ফুঁড়ে চলে এল। সাতটা গাড়িতেই সাতজন পি এম। এর মধ্যে একজন আসল। বাকি ছজন নকল। এর নাম ধোঁকাবাজি। এই দেখে টেররিস্টরা ভড়কে যায়। তিনজন কর্মকর্তা তিনদিক থেকে পড়ি কি মরি করে ছুটে গিয়ে তিনজন নকল পি এমকে 'আইয়ে জাঁহাপনা, আইয়ে জাঁহাপনা' বলে গাড়ি থেকে নামাতে গেলেন, ওদিকে আসল পি এম পাঁচ নম্বর গাড়ি থেকে নেমে, সিকিউরিটিকে প্রশ্ন করলেন, 'ওরা কারা?'

'তিনজন কর্মকর্তা স্যার।'

'দৌড়টা লক্ষ্য করলে!'

'ইয়েস স্যার।'

'তিনটেকে আলাদা করে স্টেপলার দিয়ে পিঠে নম্বর সেঁটে একপাশে করে রাখো। নেকস্ট অলিম্পিকে একশো মিটার ইভেন্টের জন্যে তিনটেকেই পাঠাব। গোল্ড হয়তো

পাবে না ; তবে ব্রোঞ্জ একটা আনবেই।

'সন্দেহ আছে স্যার। এরা মন্ত্রী দেখে দৌড়য়। অলিম্পিক কোর্সে পারবে না স্যার।'

'মন্ত্রী দেখে দৌড়য় মানে ?'

'আজ্ঞে মন্ত্রী, বিশেষত প্রধানমন্ত্রী হল ভবিষ্যৎ। যে আগে ছুটে গিয়ে নামাতে পারবে তার ভবিষ্যৎ ফিরে যাবে। এই দৌড় দেখে আপনি বিচার করবেন না। এই দৌড়ে ভারতীয়রা অতুলনীয়। এর নাম আখেরের পেছনে দৌড়নো।'

পি এম তোরণের সামনে দাঁড়িয়ে পড়লেন। অবাক হয়ে তাকিয়ে থেকে বললেন, 'এই টাকার শ্রাদ্ধটা করলে কেন ? কোন ব্যবসাদার ! এ তো মনে হচ্ছে দু নম্বরী পয়সার খেল।'

পাশেই এক কর্মকর্তা দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি বিনীত ভঙ্গিতে বললেন, 'পি এম স্যার, এটা প্রোভাবিয়াল পিলার।'

'সেটা কি বস্তু।'

'আজ্ঞে, ফেলিওর থেকে সাকসেসের যে পিলার হয়। ফেলিওর ইজ দা পিলার অফ সাকসেস। এটা সেই পিলার।'

'তোমার মুণ্ডু।'

পি এম রাগে গনগন করতে করতে সভাকক্ষের দিকে এগিয়ে গেলেন। প্রায় শতিনেক কর্মকর্তা ছুঁচোবাজির মতো এদিক দিয়ে ওদিক দিয়ে ছোটাছুটি শুরু করলেন। সকলেই চাইছেন প্রধানমন্ত্রীর কাছাকাছি আসতে। পরেরবারের ব্যবস্থাটা তো এখনই করে রাখতে হবে। সেইটাই তো আসল স্পোর্টস। অ্যাথলিটদের চেয়ে অফিসিয়াল বড়। তার চেয়ে বড় গম্ভীরমুখো আমলারা। পি এম-এর সামনেই দুই কর্মকর্তায় ঘুসোঘুসি শুরু হয়ে গেল।

পি এম থমকে দাঁড়ালেন। প্রশ্ন করলেন, 'কি হচ্ছে বক্সিং ?'

সিকিউরিটি চিফ বললেন, 'দিশি বক্সিং স্যার।'

'দুজনকে আলাদা করে দেগে রাখো, পরেরবার পাঠানো যাবে।'

'এটা স্যার ইন্টারন্যাশনাল বক্সিং নয়, একে বলে খাবলাখাবলি, নিজেদের মধ্যে খেয়োখেয়ি, আপনার নজরে আসার জন্যে। এটা স্পোর্টস নয় পলিটিকস।'

'এনাফ অফ পলিটিকস। তুমি আমাকে পলিটিকসের কথা আর মনে করিয়ে দিও না। ঘেন্না ধরে গেছে। মা যে আমাকে কি মুকুট পরিয়ে গেলেন ! এ যেন সেই সাপের ছুঁচো গেলা।'

এর মাঝে একজন কোমর সামন উঁচু ডোডোনিয়া ভিসকোসার ঝোপ এক লাফে টপকে পি এমের সামনে এসে হ্যা হ্যা করে হেসে উঠলেন। পি এম থতমত খেয়ে বললেন, 'আপনি কী সোলে গিয়েছিলেন ?'

'ইয়েস স্যার।'

'কি নিয়ে এলেন ?'

'বেশি কিছু পারিনি স্যার। ডলারের টান পড়ে গিয়েছিল। গোটা তিনেক টেপরেকর্ডার, একটা ক্যামেরা, তিন বোতল পারফ্যুম, দশটা শার্ট, দুটো স্যুটকেস, ছটা প্যান্টপিস, একটা ইলেকট্রিক সেফটি-রেজার, ছ-টিউব শেভিং ফোম, এক ডজন মোজা, কিছু জুয়েলারি, আরও অনেক কিছু ছিল, পাগল করে দেবার মতো সব জিনিস। আপনার কাছে একটা অনুরোধ, সামনেরবার ওই দৈনিক দশ ডলার পকেট খরচটা অনুগ্রহ করে

দশগুণ বাড়িয়ে দেবেন স্যার। তাহলে আমাদের আর কোনও অভিযোগ থাকবে না।'

'আপনি কি হার্ডলসে অংশ নিয়েছিলেন।'

'না তো। আমি তো স্পোর্টসম্যান নই। আমি তো অফিসিয়াল।'

'আই সি।'

পি এম হন হন করে সামনে এগিয়ে গেলেন। এই ধরনের দ্রুত হাঁটায় তাঁর পরিবারের সকলেই অভ্যস্ত ছিলেন। তাঁর দাদু, তাঁর মা। জনৈক অফিসিয়াল তাঁর পেছনে ছুটতে ছুটতে আর একজনকে বললেন, 'কিছুতেই ধরতে পারছি না। আমাদের পি এমকেই তো পরের অলিম্পিকে পাঠিয়ে দিলে হয়।'

পি এম সোজা মঞ্চে গিয়ে উঠলেন। সঙ্গে সঙ্গে বিশ বাইশ কেজি ওজনের বিশাল একটা মালা তাঁর গলায় এসে পড়ল। মুখের নিচের দিক তলিয়ে গেল ফুলদলে। নাক পর্যন্ত ঢাকা পড়ে গেছে। একটু শ্বাস নেবার জন্যে তিনি ছটফট করে উঠলেন। একজন ব্ল্যাক-ক্যাট ছুটে এসে মালাটা খুলে নিলেন। সঙ্গে সঙ্গে সভাস্থ সকলে হাততালি দিতে লাগলেন আর কোরাসে বলতে লাগলেন, 'সেভড়, সেভড়।' পি এম তো ভীষণ স্মার্ট, তিনি সঙ্গে সঙ্গে বললেন, 'সেভ দি কান্ট্রি, নট মি।' বলেই তিনি মাইক্রোফোনের টুঁটিটা চেপে ধরে বললেন, 'কে দায়ী ! কারা দায়ী ! সোলে ভারতের ক্রীড়াপ্রদীপ কারা এক ফুঁয়ে নিবিয়ে দিয়ে এল ! কোন হতভাগারা !'

সভার দুধারে দুসার মানুষ বসে আছেন। মাঝে প্যাসেজ। পি এম-এর ডানধারে অফিসিয়াল। বাঁ ধারে অংশগ্রহণকারী অ্যাথলিটরা।

ডানধার একজোটে বলে উঠল, 'আমরা না স্যার।'

বাঁ ধার একযোগে বলে উঠল, 'আমরা না স্যার।'

পি এম বললেন, 'ঠিক এইটাই আমি আশা করেছিলুম। একটা দামী ফুলদানী ভেঙে গেলে বাড়ির সকলে এইরকমই বলে। আমি ভাঙিনি। তবে কি ভূতে ভেঙেছে !'

খেলোয়াড়রা বললেন, 'কর্মকর্তারা দায়ী। দায়ী আমলারা। বিদেশে নিয়ে গিয়ে ওরা আমাদের সঙ্গে ছাগলের মতো ব্যবহার করেছে।'

কর্মকর্তারা চিৎকার করে বললেন, 'মিথ্যেবাদী স্যার। ওদের কেউই আর ফর্মে নেই। সব জাঙ্ক।'

দুতরফে লেগে গেল ধুমধাড়াক্কা। এবা বলে তোমরা ওরা বলে তোমরা।

পি এম কিছুক্ষণ সহ্য করলেন। শেষে বললেন, 'স্পোর্টস আর পলিটিকস এক হয়ে গেছে। আর কোনও আশা নেই।' নিজের পি এ-র দিকে তাকিয়ে বললেন, 'স্ট্যাটিসটিকস প্লিজ। কত টাকার শ্রাদ্ধ আমরা করে এলুম সোলে !'

'অ্যাকচুয়াল ফিগারটা আপনাকে কাল দিতে পারব স্যার, তবে এবারের বাজেটে প্রচুর টাকা ছিল। আমরা কোনও অভাব রাখিনি। একেবারে ঢেলে দিয়েছিলুম।'

'সব তুলে নাও।'

'কি করে তুলবো স্যার। সব তো ফুঁকে দিয়ে এসেছে।'

'যে যার ভিটে-মাটি বিক্রি করে ইনস্টলমেন্টে টাকা শোধ করুক। পশ্চিমবঙ্গ সরকার আমার বারোটা বাজাচ্ছে। রক্ত দিয়ে বক্রেশ্বর বিদ্যুৎ করছে। আমার মান সম্মান। আমার ফ্যামিলির মান সম্মান নিয়ে টানাটানি। টাকা দিতে না পারে তো এক বালতি করে রক্ত দিয়ে আসুক। কোনও ক্ষমা নেই। কই টাইম ম্যাগাজিনটা দেখি।'

'এই যে স্যার।'

পি এম ম্যাগাজিন বাতাসে দুলিয়ে বললেন, 'আমাদের পারফরমেন্স সম্পর্কে আমেরিকার এই কাগজ কি লিখেছে আপনারা পড়েছেন ?'

'বিদেশী কাগজ যা-তা লেখেই স্যার। আমাদের পলিটিকস নিয়ে লিখছে, আমাদের স্পোর্টস নিয়ে লিখছে। কি স্বদেশ, কি বিদেশ, সাংবাদিকদের ওই কাজ। আপনি তো জানেনই স্যার। কেন উত্তেজিত হচ্ছেন ! আপনি রেগে গেলে আমাদের ভবিষ্যৎ যে অন্ধকার !'

'আমার রাগার আর দরকার নেই, ভবিষ্যৎ এমনিই অন্ধকার হয়ে গেছে। আমাদের পপুলেশন এখন কত ?'

'কয়েকদিন পরে বলব স্যার। ওই টিভির ক্যুইজ কনটেস্ট হবে, শুনে বলে দেবো। কোটির খবর আমরা তেমন রাখি না। মানুষের কি দাম স্যার। মানুষ তো আর টাকা নয়। আমার মাস্টারমশাই বলতেন, মাইন্ড ইওর ওন বিজনেস। মানে নিজের ব্যবসায় মন দাও। ব্যবসা মানে টাকা। যে ব্যবসায় কোনও টাকা নেই, তাকে আমার পিতাশ্রী বলতেন, ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো। আর আমার মাতাশ্রী বলতেন নিজের চরকায় তেল দাও।'

পি এম তাঁর উপদেষ্টাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'এ মালটা কে ?'

'এইরকম মাল আপনি কত চান স্যার ! মালের মালা হয়ে আছে। ছেড়ে দিন ওদের কথা।'

'বেশ ছেড়েই দি। ছাড়তে ছাড়তে তো সবই প্রায় ছেড়ে দিলুম, এইবার গদিটা ছেড়ে দিলেই হয়। কি জ্বালায় যে পড়েছি। আর আমার পলিটিক্যাল স্ট্রং হোল্ড উত্তরপ্রদেশটাই যেতে বসেছে। পাঞ্জাবের তো ওই কাডাভারাস অবস্থা। কোনও রকমে একটা মিলখা সিং ছেড়ে, মার্কেটে ছেড়ে দিলে জার্নাইল সিং। কোথায় ডিসকাস ছুঁড়বে, ছুঁড়বে লোহার বল তা না বোমা ছুঁড়ে আমার ফিউচারের বারোটা বাজাচ্ছে।'

'আপনার ফিউচার কেন বলছেন স্যার। এইটাই তো ভুল করেন ! বলুন দেশের ফিউচার। এই আমি, আমি করেন বলেই জনগণ আপনাকে ভুল বোঝে, ফিউডাল লর্ড বলে। পশ্চিমবঙ্গের এক বিশাল জনসভায় আপনাকে রাবণ বলেছে। আবার বলে কি, রাবণ সীতাকে স্পর্শ করেনি। রাবণ প্রাসাদে, সীতা অশোক কাননে ইনট্যাক্ট। কিন্তু আপনি রাবণের হাতে সীতা পড়লে, হিহি, হয়ে যেত।'

'কী অসভ্য। স্টপ ইট। স্টপ ইট। এখানে আমরা এসেছি অলিম্পিক আলোচনা করতে। পশ্চিমবঙ্গ আমাকে যা খুশি তাই বলতে পারে, আমার সে স্বাধীনতা দেওয়া আছে। সি এম ইজ মাই ফ্রেন্ড। এটা আমাদের কততম অলিম্পিক গেল ?'

'আমার ছেলে জানে !'

'সে কি ছেলের বাপ জানে না ?'

'আজকাল স্পোর্টসটা স্যার আর অ্যাডাল্ট-সাবজেক্ট নয়। অ্যাডাল্ট-সাবজেক্ট হল ফিল্ম, পলিটিকস। স্পোর্টস ছেলেদের একেবারে কণ্ঠস্থ। যতদূর মনে হচ্ছে এটা ছিল চব্বিশতম অলিম্পিক।'

পি এম সভার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আমরা আজ পর্যন্ত কটা পদক পেয়েছি ! কাম অন, কাম অন স্ট্যাটিসটিকস প্লিজ।'

'হকি। হকিতে আমরা পরপর কয়েকবার গোল্ড মেরে দিয়েছি। সোনা আমরা পাইনি এমন অপবাদ কেউ আমাদের দিতে পারবে না কোনও দিন। আওয়ার গ্রেট ধ্যানচাঁদ।

আওয়ার উইজার্ড অফ দি স্টিক। হিটলার পর্যন্ত যাঁর প্রেমে পড়ে গিয়েছিলেন।'

'হোয়্যার ইজ আওয়ার নেকস্ট ধ্যানচাঁদ ?'

'প্রতিভার কি ডুপ্লিকেট হয় স্যার ! দুটো রাজীবজী হয়, না দুটো ইন্দিরাজী।'

'ওসব তেল তেলে কথা ছাড়ুন। আমাদের সেই একটি মাত্র সোনা, ছাপ্পান্ন সালের পর থেকে নড়বড়ে হয়ে গেছে। আশিতে লাস্ট, তারপর কাঁচকলা। এবারে আপনাদের দল কি করে এল।'

'খেলেছে স্যার। হাড্ডাহাড্ডি লড়েছে। তবে জানেন তো, খেলায় হারজিত থাকবেই। আমাদের একটা হিট গানই আছে, কোই জিতা, কোই হারা। একেই বলে স্পোর্টসম্যান-স্পিরিট। খেলায় কোনও কিছু সিরিয়াসলি নিতে নেই। পলিটিকসেও তাই। এই ধরুন ইন্দিরাজী হেরে গেলেন। গেলেন গেলেন। পরেরবার জিতে ফিরে এলেন। নো প্রবলেম। আবার আমরা যাবো। আবার আমরা খেলবো। আবার আমরা যাবো। আবার আমরা খেলবো।'

'হোয়াটস অ্যাবাউট পদক।'

'আবার সেই পদক। আপনাকে দেখছি পদকে পেয়েছে। আমাদের গীতায় আমাদের কৃষ্ণজী বলেছেন, কর্মে তোমার অধিকার নট ইন কর্মফল। এই যে ধরুন সাত সাতটা পরিকল্পনা ভারতের ওপর দিয়ে চলে গেল, তা কি হল, ডিম হল। ফল না হলেও কর্মযোগ তো হল। সেইরকম পদক না হোক ক্রীড়াযোগ তো হল।'

পি এম-জী ভীষণ রেগে গিয়ে বললেন, 'গীতাটাকে বাইরে বের করে দিয়ে এসো।'

দুজন ব্ল্যাকক্যাট চ্যাংদোলা করে তাকে বাইরের ঝোপে ফেলে দিতে দিতে বলল, 'ব্যাটা বাঙালি হো গিয়া।'

পি এম ততক্ষণে দৌড়বীরদের চেপে ধরেছেন, 'কোথায়, কোথায় আমাদের সেই ফ্লাইং এঞ্জেল। টাইম কি রকম ঝেড়েছে। ভারতের স্বর্ণপদক ভবিষ্যৎ অলিম্পিক ট্র্যাকে সকলের শেষে ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে আসছে। বুক ওঠানামা করছে হাপরের মতো, চোখ দুটো বেরিয়ে এসেছে ঠেলে। কি খবর তার ?'

'সেই গোড়ালির ব্যথা। লন্ডন সারাতে পারলে না। ইন্ডিয়া ইনজেকশান দিয়ে দিয়ে ঝাঁঝরি করে দিল। এক গোড়ালিই তাকে শেষ করে দিলে স্যার।'

'গোড়ালি ফোড়ালি বাজে কথা, আসল কথা বেলুনে একটু বেশি হাওয়া ভরা হয়ে গেছে। একটু বেশি পাবলিসিটি হয়ে গেছে। তিনি এখন দেশে-বিদেশে সংবর্ধনা নিতেই ব্যস্ত। বই বেরিয়ে গেছে। নাম হয়েছে, ধাম হয়েছে, টাকা হয়েছে। আর কে দৌড়য়। তা তিনি এলেন না কেন ?'

'ওই যে স্যার গোড়ালির ব্যথা। গোড়ালিতে ননস্টপ কবিরাজি দাঁতের মাজন ঘষে চলেছে।'

'মাজন ?'

'ইয়েস্ স্যার। মাজনে ভয়ঙ্কর দাঁতের ব্যথা ভাল হয়, গোড়ালির ব্যথা ভালো হবে না ! এখন আর নেই, আগে বেদেনীরা নাকী সুরে হাঁকত, দাঁত ভাল করে, পুকা বের করে।'

'ভারতের হয়ে এখন দৌড়বে কে !'

'বলব স্যার। কথা দিন রাগ করবেন না !'

'বলো, বলো।'

'স্লাইট অশ্লীল।'

'শ্লীল, অশ্লীল রাখো। আমি পি এম। আমি মডার্ন ম্যানেজমেন্ট এনেছি। ভারতকে কম্পুটার এজে ঢুকিয়ে দিয়েছি। ভারতমাতার গলায়, আই মিন মাতাশ্রীর গলায় অলিম্পিক স্বর্ণপদক আমাকে দোলাতেই হবে।'

'এবার আমরা কিছু জিয়ার্ডিয়া রোগগ্রস্ত বাঙালিকে পাঠাবো। ইভেন্টের আগের দিন রাতে ঠেসে খাওয়াবো। ক্ষীর লুচি মেঠাইমণ্ডা। সকালে আর বড় বাইরে করতে দেওয়া হবে না। এইবার স্টার্ট পোজিশানে নিচু হয়ে দাঁড়াবে। পেটে চাপ। আর যায় কোথায়। ওদিকে গুড়ুম। এদিকে জিয়ার্ডিয়ার নিম্নবেগ। যাদের জিয়ার্ডিয়া আছে তারা আবার ভয় পেলে বেগ ধরে রাখতে পারে না। দেখবেন এইবার দৌড় কাকে বলে। কোথায় কার্ল লুইস, বেন জনসন। স্পিড কাকে বলে! কোনও ট্রেনিং-এর দরকার নেই। কিচ্ছু নেই। শুধু টাচ লাইনে আসা মাত্রই টান মেরে-- টু লেভেটারি। অ্যান্ড গোল্ড। সিওর সোনা।'

'তখন যদি না পায়।'

'ও পাবেই স্যার। পেতেই হবে। একেই বলে গোপালভাঁড় টেকনিক।'

'ওয়েট লিফটিং-এর কি হবে। সেখানেও তো আমরা গেছি তলিয়ে।'

'ও আড়াই হাজার ডিম আর আস্ত দুম্বা মারা পালোয়ান দিয়ে হবে না স্যার। আমাদের যেতে হবে কলকাতার বড়বাজারে। ধরে আনতে হবে একজন মুটে। তারা যা লোড তুলতে পারে, আপনার ওই বাহারি রিস্টব্যান্ড পরা, তেল চুকচুকে গালগোব্দা ওয়েট লিফটাররা পারবে না। আপনার কোনও ধারণা আছে স্যার একজন ঘি-চাপাটিখেকো মারোয়াড়ির ওজন কত? বড়বাজারের মুখে তাকে ঝাঁকায় বসিয়ে অক্লেশে মাথায় তুলে স্ট্র্যান্ড রোড থেকে সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ পর্যন্ত শুধু নিয়ে আসা নয়, সিঁড়ি বেয়ে পাঁচতলার খাটে শুইয়ে দিয়ে আসতে পারে।'

'যাক। সমস্যার সমাধান। কিন্তু এবার বক্সিং-এ কি হল?'

'আমাদের বক্সারদের কোনও দোষ নেই। ঘুসি তারা ঠিকই চালিয়েছিল। কনট্যাক্ট করাতে পারেনি। সে হল গিয়ে টার্গেটের দোষ। কাওয়ার্ড। কেবল সরে যায়। পিছলে পালায়। টার্গেট স্লিপ করলে ঘুসি কি করবে স্যার!'

'তাহলে?'

'নেকস্ট টাইম আমরা বোম্বের হিরোদের পাঠাবো। অমন লাগাতার ঘুসি পৃথিবীর কেউ চালাতে পারবে না। একুশটি রিল ধরে কেবল ঘুসি। যে আসছে তাকেই মেরে ফ্ল্যাট করে দিচ্ছে। এবার সেরা হিরোদের পাঠানো হবে। তিনখানা গোল্ড সিওর!'

'ফুটবলে কি করা যায়?'

'টিম আমাদের ঠিকই আছে স্যার, একটাই অভাব। সেটা হল সাপোর্টার। সাপোর্টাররা না মদত দিলে আমাদের টিম খেলতে পারে না, তাও আবার কলকাতার সাপোর্টার। পরেরবার টিমের সঙ্গে হাজার দশেক কলকাতার সাপোর্টার পাঠাবেন। এমনিই তো হাজার দুয়েক ফালতু লোক টিমে ঢুকেই পড়ে। আরও হাজার দশেক না হয় ঢুকবে, তবু তো একটা গোল্ড আসবে।'

'টেনিসে কি হবে!'

'নো প্রবলেম। আবার কলকাতা। দমদম আর বরানগর মিউনিসিপ্যালিটির কিছু লোক আর হাল্কা একটু ট্রেনিং। যারা সারা দিনরাত মশা মারতে পারে তারা টেনিসবলও

টেরিফিক মারতে পারবে। মশা মারায় যা ব্যাকহ্যান্ড আর ফোরহ্যান্ড ড্রাইভ লাগে, আপনার কোনও ধারণা নেই। শুধু সারভিসটা একটু শিখিয়ে দিতে হবে।'

'জিমন্যাস্টিকস ?'

'আবার কলকাতা। সিটি অফ জিমন্যাস্টস। ডেলিপ্যাসেঞ্জার আর বাসযাত্রীদের মতো জিমন্যাস্ট পৃথিবীর কোথাও নেই। ওখান থেকে আপনি ভাল রেস্টলারও পেয়ে যাবেন।'

'হাইজাম্প, লংজাম্প আর পোলভল্ট !'

'দিল্লি স্যার ! আপনার দলেই ট্যালেন্ট আছে। তারা তো অনবরতই লাফাচ্ছে। একস রাজা, মহারাজার দল।'

'তা হলে কটা গোল্ড হল ?'

'তা মন্দ হল না ! দশ বারোটা নিশ্চিত।'

'সাঁতারে কিছু করা যাবে না ?'

'কেন যাবে না স্যার ! মধ্যবিত্ত বাঙালি। একমাত্র সলিউশন। দুঃখ সাগরে অমন সাঁতার কোনও জাত কাটতে পারবে না।'

'তা হলে হকিটার একটা ব্যবস্থা করতে পারলেই হয়।'

'হয়ে যাবে, আমরা প্ল্যানচেট-এ ধ্যানচাঁদকে ডাকবো। স্টিকে তাঁর কি আঠা ছিল আমরা জেনে নেবো।'

পি এম-এর মুখ দেখে মনে হল বেশ সন্তুষ্ট হয়েছেন। তিনি মাইক্রোফোনের টুটি ছেড়ে দিয়ে সোজা হয়ে বসলেন। প্রেস অ্যাডভাইসারকে বললেন, 'একটা রিলিজ দিয়ে দিন, শতাব্দী শেষের ভারতীয় চমক। ফাঁকা বুলি নয়, বারিগর্ভ, বজ্রগর্ভ মেঘ। পঁচিশতম অলিম্পিক আমাদের। নতুন পরিকল্পনা। নতুন দৃষ্টিভঙ্গি। নতুন বাছাই। পুরনো ছাঁটাই। আপাতত আমাদের মুঠোয় ষোলটি গোল্ড। ব্রোঞ্জ বা সিলভারের হিসেব আমরা করছি না। মারি তো গণ্ডার, লুটি তো ভাণ্ডার।'

পি এম মাইক্রোফোনের কাছে মুখ এনে শেষ অভিলাষটি জানালেন, 'সর্বত্র এত শুটিং হচ্ছে আমরা একটা গোল্ড··· ।'

'হবে হবে স্যার, টি ভি সিরিয়াল যাঁরা করছেন, তাঁদের মতো শুটিং কেউ করতে পারবে না। ওঁরাই আমাদের গোল্ড এনে দেবেন। বোম্বে না পারুক, বাংলা পারবেই।'

গম্ভীর মুখ, উচ্চপদস্থ এক কর্মকর্তা বললেন, 'এ শুটিং কি সেই শুটিং ! আয় হ্যাভ ডাউটস।'

জল ও স্থল

মনোজ বসু

মানুষ স্থলচর জীব। একটি মানুষ তার মধ্যে নিশ্চয় বাদ— রথীকান্ত। তাকে জলচর বলা চলে। চৌধুরিদীঘি একবার পাড়ি দিতেই তা-বড় তা-বড় বীরপুরুষ হিমসিম খেয়ে যায়, রথীকান্ত সেই দীঘি বারবার এপার-ওপার করে। দীঘিতে প্রাকটিস করে দম বাড়াচ্ছে, কোন একদিন ইংলিশ-চ্যানেলের প্রতিযোগিতায় নামবার শখ। গেঁয়ো মানুষের এ হেন উচ্চাশায় হাসত আগে সকলে, অধ্যাবসায় দেখে এখন খানিকটা যেন প্রত্যয় পাচ্ছে। এ মানুষের অসাধ্য কিছু নেই। ভাগ্যটিও বড় অনুকূল— যত বাধা একের পর এক সরে গেছে। অতি-শৈশবে গর্ভধারিণী জননী গত হলেন, সেই তখন থেকেই।

মা গিয়েছেন, বাবা রবিকান্ত বর্তমান ছিলেন এই সেদিন অবধি। বিবেচক ব্যক্তি তিনি। চার-চারটে মেয়ের সবগুলোকেই পাত্রস্থ করে গেছেন, বোনদের জন্য রথীকান্তকে দায় ঠেকাতে না হয়। ফ্লাওয়ারমিল ছিল শহরে— মিল চালানো রথীকান্তকে দিয়ে হবে না। বুঝেসমঝে ভাল দামে বিক্রি করে ব্যাঙ্কে টাকা রেখে গেছেন। দশের কুমন্ত্রণায় গণ্ডগোল একটা পাকাতে যাচ্ছিলেন বটে— রথীর জন্য পাত্রী দেখাশুনা চলছিল, কিন্তু পাকাপাকি হবার আগে রবিকান্ত হঠাৎ দেহত্যাগ করলেন। নির্ঝঞ্ঝাট রথী দুনিয়ার উপর। মনের সুখে জলে জলে সাঁতার কাটে, এবং কিছুক্ষণের জন্য ডাঙায় উঠে খায়দায় ঘুমায়।

ভাতব্যঞ্জন রান্নাবান্না হয়ে পরিপাটিরূপে সাজানো থাকে। আসনে বসে গালে ফেললেই হল। ধবধবে নরম শয্যা পাতা আছে। আলস্যে গড়িয়ে পড়বার অপেক্ষা। এ দুটো কাজ মা আমোদিনী আর মেয়ে কেতকী মিলিত ভাবে করে। আর গণেশ বলে এক ছোকরার উপর বাইরের কাজকর্মের ভার— ক্ষেতের ধান হিসাবপত্র করে গোলায় তোলা, হাটবাজার করা ইত্যাদি। ঘড়ির কাঁটার মতন ঠিক ঠিক নিয়মে সংসার চালিয়ে যায় তিনজন। রথীকান্ত তাকিয়ে দেখে না— দেখবার শক্তি নেই, ফুরসতও নেই। আমোদিনীর স্বামী ছিলেন ফ্লাওয়ার-মিলের ম্যানেজার, আর গণেশ সেই মিলের বিশ্বস্ত কর্মচারী একটি। মিল বেহাত হল। ভিন্ন মনিবের এক্তিয়ারে গিয়ে আমোদিনীর স্বামী প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মারা গেলেন। নিঃসহায় মা-মেয়েকে রবিকান্ত সমাদরে বাড়ি এনে আশ্রয় দিলেন। চাকরি ছেড়ে গণেশও তাঁদের সঙ্গে চলে এল। এর মধ্যেও রবিকান্তর দূরদৃষ্টির পরিচয়। রথীকান্তর দুঃখের পার ছিল না এমনি ভাবে তিনজনে যদি তাকে আগলে না থাকত।

দিব্যি কাটছে। রথীকান্তর মাথায় নূতন মতলব এল। দীঘির সাঁতার যথেষ্ট হয়েছে, এবারে নদীতে। বাড়ি প্রায় নদীর উপরে। অন্য সময়ে যেমন-তেমন, বর্ষায় জল বেড়ে

গিয়ে নদী এখন বিশাল ও উদ্দাম। একটু বাতাস উঠলেই ঢেউয়ের উথাল-পাথাল। নদীতেই এবার থেকে সাঁতারের প্র্যাকটিস।

বলে, নদী দেখে ঘাবড়ালে চ্যানেলে গিয়ে কী করব ? চ্যানেল দীঘি নয়— ঢেউ ভাঙে সেখানে, স্রোত বয়।

চ্যানেল-প্রতিযোগিতার বিবরণ কাগজে খুব বেরোয় আজকাল, কারো কারো পড়া আছে। তারা বলে, কত রকম ব্যবস্থা চ্যানেলে। লঞ্চ-স্টিমার চক্কোর দিয়ে ঘোরে, মাথার উপরে হেলিকপ্টার। প্রাণহানির শঙ্কা নেই।

নেই এখানেও। অকুতোভয় রথীকান্ত বলছে, আমারও আগে পিছে ডিঙি থাকবে। চ্যানেলের কথা কাগজেই পড়েছে, আমার আয়োজনটা চোখে দেখ। দেখে তারপরে যা বলবার বলবে।

স্থির হয়ে গেল, বর্ষার দুর্দান্ত নদীতে রথীকান্ত সাঁতার দেবে। এপারে শীতলা-মন্দির, ওপারে অশ্বত্থগাছ। মন্দিরের ঘাট থেকে গা ভাসিয়ে অশ্বত্থতলায় গিয়ে উঠবে। স্রোত এমন ভয়ানক যে ইন্দ্রের ঐরাবতও বোধহয় ভেসে চলে যাবে তার মুখে পড়লে। রথীকান্ত ঘোষণা করেছে, স্রোত অগ্রাহ্য করে সোজাসুজি গিয়ে উঠবে সে। বাঁকচুর হলেই হার— ডাঙায় উঠে তা হলে নাককান মলবে নিজের।

লোকে লোকারণ্য। তিনটে ডিঙি রক্ষী হয়ে সঙ্গে চলল। মাঝিমাল্লা পাঁচজন প্রতি ডিঙিতে, পাঁচখানা করে বোঠে পড়ছে। ডিঙি তবু রুখতে পারে না, ভাঁটির সঙ্গে তরতর করে ভেসে চলে যায়। আর রথীকান্ত, দেখ, দুখানা মাত্র হাতের সম্বলে ঠিক সেই অশ্বত্থতলায় উঠে পড়ল। সার্থক সাঁতার শিখেছে বটে ! মাটিতে পা পড়তে না পড়তে মানুষজন ছুটে এসে কাঁধে তুলে নিল তাকে। কাঁধে তুলে নৃত্য করে। আকাশ ফাটায় উল্লাসের চিৎকারে।

এই চলল এখন প্রতিদিন— সাঁতরে নদীর এপার-ওপার করা। স্রোতে ভাসিয়ে নেবে লোক ভয় দেখিয়েছিল, অথচ প্রায় সরলরেখা ধরেই চলাচল— পনের-বিশ হাতের এদিক-ওদিক হয় না। তবু কিন্তু অঘটন ঘটল। একচক্ষু হরিণের মতো এ-দিকটা কারো ভাবনায় আসেনি। কুমির নেই এ নদীতে, তল্লাটের মানুষ কস্মিন কালে কুমিরের কথা শোনেনি। বর্ষার নদীতে কুমির দেখা দিল। স্ফূর্তিতে রথীকান্ত যথারীতি জল কেটে চলেছে— ডাইনে, বাঁয়ে ও পিছনে রক্ষী নৌকো। জলের নিচে দিয়ে এসে আমচকা কুমিরে ধরল তাকে। রীতিমত জোয়ানপুরুষ রথী, কুমিরে সহজে কায়দা করতে পারে না। আর ওদিকে মাঝিমাল্লারা ঘিরে ফেলে হৈ-হৈ করে বোঠের বাড়ি মারছে। কুমির শিকার ছেড়ে পালাল।

রক্তে জল রাঙা। ডিঙিতে নিয়ে তুলল রথীকে, তখন আর সম্বিত নেই। বাড়িতে নিয়ে এল। সম্পন্ন অবস্থার মানুষ, তার উপর এত বড় গুণী— অঞ্চলের যে ক'জন ডাক্তার, সবাই চলে এসেছে। চেতনা ফিরল অনেক রাত্রে। ইতিমধ্যে সাব্যস্ত হয়ে গেছে সদর হাসপাতালে নিয়ে ডানহাত অপারেশন করতে হবে। সদরে পাঠানোর তোড়জোড় হচ্ছে।

শয্যার পাশটিতে কেতকী। চোখ ছলছল করছে তার। জায়গা ছেড়ে নড়ে না। রথীকান্তও তাকিয়ে দেখল। এক বাড়িতে এতকাল রয়েছে— আজ যেন প্রথম চেয়ে দেখছে কেতকীকে।

কেতকী জিজ্ঞাসা করে, কষ্ট হচ্ছে রথী-দা ?

জিজ্ঞাসা বাহুল্য। কষ্টের কথা মুখ দেখেই বোঝা যায়। রথীকান্ত তবু উড়িয়ে দেয়। ক্লিষ্ট মুখে শীর্ণ হাসি ফুটিয়ে বলে, কিছু না কিছু না, কষ্ট আবার কিসের ?

হাতের ঐখানটা ধরেছেন—

এ নিয়েও হাসি-তামাসা। রথী বলে, খুলে না পড়ে যায় সেই জন্য এঁটে ধরে আছি।

হাসপাতাল থেকে ফেরত এল মাসখানেক পরে। প্রাণের হানি হয়নি, সেই ডানহাত কাটা পড়েছে কনুই থেকে। আমোদিনী হাহাকার করে ওঠেন : আমার সোনার কার্তিকের এমন দশা চোখে দেখি কেমন করে ?

রথীকান্তই প্রবোধ দিচ্ছে : কী এমন ক্ষতি মাসিমা, এক হাতেই দিব্যি চলে যায়। বিধাতা-পুরুষ বাড়তি হাত দিয়ে রেখেছেন, একটা যদি কোন গতিকে অকেজো হয়ে যায় অন্যটায় কাজকর্ম চলবে। মোটরগাড়িতে যেমন একটা অতিরিক্ত চাকা বয়ে বেড়ায়। ছাঁটকাট হয়ে ভালই তো হল মাসিমা, বাড়তি বোঝা বয়ে বেড়াতে হবে না।

কেতকী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শোনে। রথীকান্ত হাসছে— তার যে চোখের জল রাখা দায় ! কী চেহারা, কী কথাবার্তা, কী দুরন্ত চালচলন। সেই মানুষের একটা হাত চিরকালের মতো পঙ্গু, কামিজের হাতা ঝুলঝুল করছে।

হাসপাতাল থেকে ফিরেও কিছুকাল রথীকে বিছানায় থাকতে হল। কেতকী ধরে ধরে খাওয়ায়। ক্রমশ অল্পসল্প ঘুরে বেড়াচ্ছে। ছায়ার মতো কেতকী সর্বক্ষণ সঙ্গে আছে। একেবারে সুস্থ হল, তার পরেও রথীকান্ত প্রায় সারাক্ষণ বাড়ি থাকে। কেতকী কাজেকর্মে আছে— মুখ তুলে হয়তো-বা দেখল, রথী কখন নিঃশব্দে এসে দেখছে, চোখে তার পলক নেই। লজ্জায় রাঙা হয়ে কেতকী পালিয়ে যায়।

আমোদিনীর মুখ হাসিতে ডগমগ। কেতকী বলে, এত হাসি কেন মা ?

বেওয়া বিধবার মেয়ে, সহায়সম্বল নেই— তোর অদৃষ্টে যে এতখানি হবে, কে ভাবতে পেরেছে ?

শঙ্কিত হয়ে কেতকী বলে, কী হল আবার ?

রথী বাবাজির সঙ্গে অনেক কথাবার্তা আজকে। বলে, সাঁতারে ইতি পড়ল মাসিমা। এক-হাতে কি করে হবে ? তা ভালই হল। ডানপিটেমি অনেক করা গেছে, ঘরে থেকে ঘরবসত করি এবার।

ধরা-ছোঁয়া না দিয়ে কেতকী নিরীহ ভাবে বলে, তুমি হাসছ মা। আমি দেখছি, অন্ন উঠল আমাদের এ বাড়ি থেকে।

আমোদিনী কানেও নিলেন না, একভাবে বলে চলেছেন, সুমতি হয়েছে— বিয়েথাওয়া করবে সে এবার।

তাই তো বলছি মা। বউ এসে তার নিজের সংসার বুঝে নেবে। তোমার কর্তৃত্ব খাটবে না। তারপরেও যদি থাকতে চাও, ইজ্জত খুইয়ে ঝি-রাঁধুনি হয়ে থাকতে হবে।

দেখা যাক, কে আসে বউ হয়ে। এসে ঝি-রাঁধুনি করে, না মাথায় তুলে রাখে।

আর অধিক না বলে আমোদিনী মৃদু হেসে তখনকার মতো চলে গেলেন। বলার বাকিও বড় কিছু রইল না। এত বড় সুখবরে কেতকীর মুখ পাংশু। মা সুখস্বপ্ন দেখছেন, কিন্তু কেতকী ভাবছে, বাস উঠল এবার এ-বাড়ি থেকে। তা ছাড়া অন্য উপায় নেই।

পর পর্বে কেতকী আর রথীকান্তে কথা। রথীকান্ত বলে, হাত যাওয়া মানে আমায় বিধাতা জল থেকে স্থলে ছুঁড়ে দিলেন। স্থলে থাকা এখন। স্থলেই যখন, ঘরবাড়ির মধ্যে পুরোপুরি গৃহস্থ হয়ে থাকি। কি বল ?

শালিস মানল যখন, উৎসাহ দেওয়া ছাড়া কী আর বলা যায়? কেতকী বলে, বেশ তো, ভালই তো—

রথীকান্ত বলে, পঙ্গুমানুষ আমি তো একরকম। একটা হাতেই সব কিছু— তা-ও ডানহাত নয়, বাঁ-হাত। দেখাশুনোর মানুষ চাই একটি—সর্বক্ষণের সঙ্গী। এই তুমি যেমন করছ আমার জন্যে।

কেতকী চুপ করে আছে।

বাইরের লোকের উপর আস্থা করা যায় না। আজ আছে, কাল হয়তো থাকবে না। এই ঘরে তুমি যে এত করছ, কোনদিন হঠাৎ অন্য লোকের ঘরণী হয়ে বিদায় নিয়ে যাবে। সেইজন্যে ভাবছি, বিয়ে করে ফেলি শান্তশিষ্ট দরদ-ভরা একটা মেয়েকে।

হাসতে হাসতে রথীকান্ত কেতকীকেই প্রশ্ন করে, জানাশোনা আছে কোন মেয়ে, হাত-কাটা বর দেখে যে মুখ বাঁকাবে না?

কেতকী ভ্রূভঙ্গি করে বলে, খুব— খুব। কত গণ্ডা চাই বলুন। টাকাকড়ি আছে আপনার, নামডাক আছে। মেয়েরা এত বোকা নয় যে এর পরেও কটা হাত আছে আপনার, কটা পা আছে, খুঁটিয়ে দেখতে যাবে।

ঘুরিয়ে কথা কোনদিকে নিয়ে যাচ্ছে, কেতকীর বুঝতে বাকি থাকে না। ঝাঁজের সঙ্গে জবাব দিয়ে সামনে থেকে সরে পড়ল।

মা-মেয়ের এর পরে মুখোমুখি কলহ। কড়া কড়া শুনিয়ে কেতকী মা'কে রাগিয়ে দেয় : পাঁচ-দশটা নয়, একটা তো জামাই হবে তোমার। ঠাকুর-দেবতা একটা খুঁতো পাঁঠা নেন না, তুমি মা খুঁতো জামাই করবে?

আমোদিনী বলেন, হাত কাটা গেছে তোরই কপাল গুণে। সর্বঅঙ্গ ষোলআনা বজায় থাকলে তোকে সে বিয়ে করতে যাবে কেন? দাসীবৃত্তি চেড়ীবৃত্তি করছিস— চিরকাল তাই করে যেতে হত।

রথীকান্ত যাচ্ছিল বুঝি এই দিক দিয়ে। হঠাৎ দেখা যায়, থেমে দাঁড়িয়ে সে কলহের রস উপভোগ করছে। হাসছে টিপিটিপি। কেতকী না দেখার ভান করে বেপরোয়া কুচ্ছোকথা শোনায়। বিগড়ে যায় যদি এইসব শুনে।

ঠিক উল্টো। রথীকান্ত স্পষ্টাস্পষ্টি আমোদিনীর কাছে প্রস্তাব করে বসল। কেতকী বিহনে জীবন তার শুকনো মরুভূমি।

বৃত্তান্ত শুনে কেতকী বলে, ভেবেছিলাম ভাদ্দরমাসটা কাটিয়ে দিয়ে পুজোর সময় যেখানে হোক চলে যাব। হবার জো নেই, শনির দৃষ্টি পড়ে গেছে। গাঁটরি বাঁধ মা। আর তুমি যদি না যাবে তো আমি একাই বেরিয়ে পড়ব যেদিকে দুই চোখ যায়।

ক'দিন পরে রথীকান্তর বাড়ির নিচে নৌকোডুবি। বড়দলের গঞ্জ থেকে হাট করে ফিরছিল। বিকালবেলা। মানুষ ঠাসাঠাসি— হাটুরে-নৌকোর যা দস্তুর। পাল ফুলিয়ে তরতর করে আসছিল— আমচকা উল্টোপাল্টা বাতাস উঠে পালের জীর্ণ কাপড় ছিন্নভিন্ন করে দিল। কাত হয়ে পড়ল নৌকো। ডাঙা বেশি দূরে নয়। গেল গেল— রব তুলে ডাঙার মানুষ শীতলামন্দিরের ঘাটে ছুটল।

কেতকীও ছুটছে। গণেশও যে ঐ নৌকোয়! হাট করতে গিয়েছিল, ভাল সাঁতার জানে না। ঐ যে—গণেশই প্রাণপণ শক্তিতে পা দাপাচ্ছে জলে ভেসে থাকবার জন্য। কিন্তু পারবে না এই টান কাটিয়ে আসতে।

কেতকী আর্তনাদ করছে : বাঁচাও তোমরা ওকে, বাঁচাও। সাঁতার নিজেও জানে না, জোয়ারের প্রমত্ত স্রোতে তবুও সে ঝাঁপিয়ে পড়তে যায়।

পিছন থেকে কে ধরে ফেলল— কেতকী ফিরে দেখে রথীকান্ত। সে-ও এসে পড়েছে।

পাগলের মতো কেতকী তার পায়ের উপর পড়ে : বাঁচাও ওকে রথীদা, তোমার পায়ে পড়ি। প্রাণদান দাও। যা বলবে কিছুতে আমি আপত্তি করব না। তোমার দাসী-বাঁদী হয়ে থাকব।

কে-একজন কোনদিক দিয়ে মন্তব্য করে : দুটো হাত বজায় থাকলে সেটা কি বলতে হত রে ?

নামবার জন্য রথীকান্ত ইতস্তত করে। কেতকী মাথা কুটছে : বাঁচাও। একটি বাঁ-হাত সম্বলেই রথী ঝাঁপিয়ে পড়ল। গণেশ তলিয়ে গেছে ইতিমধ্যে। রথীকান্তরও নিশানা নেই।

ঘাট থেকে ডিঙি খুলে দিল। খুঁজে বেড়াচ্ছে। ক্ষণ পরে রথীকান্তকে দেখা যায়। বাঁ-হাতখানায় গণেশকে বেড় দিয়ে ধরে দু-পায়ের আলোড়নে কোন রকমে মাথা ভাসান দিয়েছে। ডিঙি ছুটে গিয়ে পড়ল। কী উল্লাস, কী উল্লাস!

আমোদিনী আনন্দ আর ধরে রাখতে পারেন না। কেতকীকে টানতে টানতে রথীকান্তর কাছে এনে হাজির করলেন : প্রণাম কর্—

একবারের বেশি দুবার বলতে হয় না। বাধ্য মেয়ে রথীর পায়ের উপর উপুড় হয়ে পড়ল।

আমোদিনী বলেন, এখন অকাল চলছে বাবা। পোড়া অকাল সেই কার্তিক অবধি। অঘ্রাণের আগে শুভকাজ হবে না। তা দিনক্ষণ এখনই ঠিক করে ফেলি না আমরা।

মুহূর্তের সবুর সইছে না— পাঁজির খোঁজে গেলেন। রথীকান্ত কেতকীকে দেখছে। সেই ঘরে ভিন্ন শয্যায় গণেশ— চলে ফিরে বেড়ানোর অবস্থা এখনো আসেনি। কেতকী ভুলেও তাকায় না গণেশের দিকে। অর্থাৎ কেতকী পুরোপুরি এখন রথীকান্তর— গণেশকে বাঁচিয়ে রথী মূল্য শোধ করেছে।

আমোদিনী ইতিমধ্যে পাঁজি এনে সামনে দিলেন। রথী তাকিয়েও দেখে না। বলে, ভেবে দেখছি মাসিমা, বিয়েথাওয়া আমার পোষাবে না। বাঁ-হাত দিয়েই সাঁতার দিতে পারি, আজকে তার পরখ হয়ে গেল। তবে আর ঝামেলায় যাওয়া কেন ? জলেরই মানুষ আমি, ডাঙায় চেয়ে জল ভাল আমার কাছে। দিব্যি ভেসে ভেসে বেড়াব।

বাজিকর

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

সে এক রৌদ্রতপ্ত মধ্যাহ্নবেলায় কলিকাতার একটা গলিরাস্তার মোড়ে বাজিকরের টুমটুমি বাজিয়া উঠিল,— টুম-টুম-টুম-টুম ! টুম-টুম-টুম-টুম !

মাসখানেক ধরিয়া এক ফোঁটা বৃষ্টি নাই। বৈশাখের দ্বিপ্রহরে রৌদ্র এত প্রখর হইয়া উঠিয়াছে যে, রাস্তায় লোক-চলাচল একপ্রকার অসম্ভব বলিলেই হয়। কর্ম-কোলাহলমুখর কলিকাতা নগরীটা, মনে হইতেছে যেন, গুমট গরমে একেবারে নেতাইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু পেটের দায়ে পথে-পথে ঘুরিয়া পরের করুণায় যাহারা আত্ম-সমর্পণ করে, রৌদ্র, ঝঞ্ঝা, বৃষ্টি-বাদল উপেক্ষা করিয়া উপার্জনের জন্য এমনি করিয়া পরিশ্রম তাহাদের করিতেই হয়।

সম্মুখে বড়-রাস্তার উপর ক্বচিৎ দুএকটা গাড়ি-ঘোড়া, মোটর ইত্যাদি যান-বাহন দেখা যাইতেছে। তাহাদের অলস-মন্থর গতিধ্বনি শুনিয়া মনে হয়, নিতান্ত দায়ে পড়িয়াই তাহারা চলিয়াছে।

দুইটা বৃদ্ধ গরু বোঝাই-দেওয়া একটা গাড়ি টানিয়া লইয়া যাইতেছিল। হিন্দুস্থানী গাড়োয়ানের চাবুকের ঘায়ে তাহাদের পৃষ্ঠে ঘা হইয়া গিয়াছে— মুখ দিয়া ফেনা ভাঙিতেছে।

একটা ছ্যাকড়া ঘোড়ার গাড়ি সশব্দে তাহাদের পার হইয়া গেল। ঘোড়ার গলার ঘুঙুরের শব্দ ছাপাইয়া কোচম্যানের চাবুকের শব্দ বড় তীব্রভাবে কানে আসিয়া বাজিতেছে। পঞ্জরাবশেষ ঘোড়া দুইটা লাফাইয়া লাফাইয়া কখনও জোরে কখনও ধীরে দৌড়িতেছিল !

পথপ্রান্তে হঠাৎ একজন রিকশাওয়ালার ঘণ্টাধ্বনি বাজিয়া উঠিল। দুইটা মোটা লোককে টানিয়া টানিয়া লোকটা একেবারে গলদঘর্ম হইয়া উঠিয়াছে। আরোহীদের মধ্যে একজন কহিল, আরে, টিমিক টিমিক কাহে.করতা হ্যায়—জোরসে চলো। ঘণ্টার শব্দ আর শুনিতে পাওয়া গেল না। লোকটা প্রাণপণে ছুটিতে আরম্ভ করিল।

একজন ফিরিওয়ালা কি একটা সস্তা জিনিষের দর হাঁকিতেছিল,— বোধ করি এখনও তাহার আহারের সংস্থান হয় নাই।

পরক্ষণেই একজন ক্ষুধার্ত ভিক্ষুক কাতরকণ্ঠে একমুষ্টি অন্নের জন্য বৃথাই কাঁদিয়া গেল।

বড় রাস্তার অনতিদূরে যে গলিটার ভিতর বাজিকর তাহাদের টুমটুমি বাজাইয়া ঘুরিতেছিল, তাহার দুই পার্শ্বে বারবনিতাদের বাড়ি।

বয়স তাহার পঞ্চাশ পার হইয়া গেছে। মুখের উপর খোঁচা খোঁচা দাড়ি-গোঁফ, পরিধানে এক ছিন্ন-মলিন বস্ত্র, কাঁধে একটা ঝুলি, বামহস্তে একটি ছোট মাটির ভাঁড় এবং সবুজ রঙের একটি কাঠের টিয়াপাখি, ডানহাতে ডমরুর মত একটি টুমটুমি!

রৌদ্রের তেজে রাস্তার তপ্ত ধূলার উপর সে হাঁটিতে পারিতেছিল না। দেয়ালের কোণ ঘেঁষিয়া যে-ছায়াটুকু পড়িয়াছে, তাহারই উপর দিয়া সে অতি কষ্টে চলিতেছিল।

কিয়দ্দূর আসিয়া আবার টুমটুমি বাজাইয়া সে তাহার পিপাসাদীর্ণ শুষ্ককণ্ঠে হাঁকিল,—বাজি আছে, খেলা আছে,—ভূত আছে, ওষুধ আ—ছে!

আজ যে রাস্তা ধরিয়া সে হাঁটিতেছিল, সেখানে পূর্বে কোন দিন সে আসিয়াছে বলিয়া তাহার স্মরণ হয় না। এই সব অপরিচিত স্থানেই তাহার উপার্জনের সম্ভাবনা কিছু বেশি। তাই সে তাহার বার্ধক্য-জীর্ণ শিথিল হস্তের মুষ্টি প্রাণপণ শক্তিতে দৃঢ় করিয়া তাহার টুমটুমি বাজাইয়া চিৎকার করিতেছিল, কিন্তু দেখিতে দেখিতে তাহার চোখের সুমুখে মধ্যাহ্নবেলা ক্রমশঃ অপরাহ্নের দিকে ঢলিয়া পড়িতে লাগিল,—রৌদ্রের প্রখর দীপ্তি ক্রমশঃ তেজহীন ম্লান হইয়া আসিল, তথাপি একটা লোকও তাহাকে ডাকিয়া কোন কথা জিজ্ঞাসা করিল না। বুড়া ভাবিল, আজ বুঝি বা তাহাকে উপবাস করিয়াই কাটাইতে হয়।

সেই রাস্তার অপর পার্শ্বে একটি লোক, কালোরঙের শতচ্ছিন্ন একটি জামা গায়ে দিয়া পৃষ্ঠে তাহার একটি ছোট বোঁচকা বাঁধিয়া চলিতেছিল। সহসা যে অতিশয় ক্ষীণ কণ্ঠে ডাকিয়া উঠিল, রিপুকর্ম আছে,— রিপু কর্ম!...লোকটি একবার বড় সকরুণভাবে বৃদ্ধ বাজিকরের দিকে তাকাইয়া তাহার জরাজীর্ণ চটি জুতার ফট ফট শব্দ করিতে করিতে চলিয়া গেল।

ক্ষুধায় তৃষ্ণায় বৃদ্ধ যতই কাতর হইয়া পড়িতেছিল, দুঃখ-দুর্ভাবনায় মন তাহার ততই পীড়িত হইয়া উঠিতে লাগিল।

তাহার বাজনা শুনিয়া পাশের ঘরের একটি মেয়ে দরজার নিকট ছুটিয়া আসিল। তাহার একটুখানি আশা হইল, কিন্তু পরক্ষণেই দরজাটা বন্ধ করিয়া দিয়া তাহাকে চলিয়া যাইতে দেখিয়া রাগে এবং দুঃখে তাহার দেহমন ভরিয়া উঠিল,— হাতের বাজনাটা কাঁপিয়া কাঁপিয়া থামিয়া গেল।

তিন-চারিটা ঘর পার হইয়া আসিতেই, পাশের একটা বাড়ির জানালা খুলিয়া এক তরুণী জিজ্ঞাসা করিল, ও কি গা?

বৃদ্ধ কহিল, বাজি আছে মা, কত রকমের খেলা আছে, কাঠের টিয়া জল খাবে,—টাকা পয়সা উড়ে যাবে,—আরও কত আছে মা!...দেখ্‌বি? বলিয়া আগ্রহাতিশয্যে বৃদ্ধ তাহার কোটরপ্রবিষ্ট দুইটা উজ্জ্বল চোখের দৃষ্টি দিয়া তরুণীর মুখের পানে এইবার তাকাইল।

মেয়েটি বলিল, বাইরের দরজা দিয়া উঠোনে পেরিয়ে এস,—দেখ্‌ব।

এই বলিয়া সে তাহার ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিতেছিল; উপরের রেলিং ধরিয়া আর একটি মেয়ে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, কাকে ডাক্‌চিস লা কিরণ?

কিরণ বলিল, নেবে আয়,— বাজি দেখবি।

আ মরি! বাজি দেখবার সময়টি বেশ! বলিয়া সে চলিয়া গেল।

কিন্তু সে চলিয়া গেলেও, বাজিকরের টুমটুমির শব্দ শুনিয়া আরও অনেক মেয়ে আসিয়া জড় হইল।

বুড়াকে তাহার দরজার নিকট বসাইয়া কিরণ বলিল, দেখাও এবার। কত নেবে?

একে-একে তাহার প্রত্যেকটি আসবাব সুমুখে নামাইয়া বৃদ্ধ বলিল, আগে এক গ্লাস জল

দে মা, একটু খাই। বাজি দেখে তার পর দাম দিস,—আগে থেকে দর কষাকষি কেন মা ?

বুড়ার মুখে দর-কষাকষির ইঙ্গিত শুনিয়া একটা মেয়ে ফিক ফিক করিয়া হাসিয়া উঠিল।

কিরণ তাড়াতাড়ি একগ্লাস জল আনিয়া তাহার মাটির পাত্রে ঢালিয়া দিতেই এক চুমুকে সেটুকু খাইয়া ফেলিয়া, বৃদ্ধ বলিল, এইবার দ্যাখ মা। আগে কিসের খেলা দেখবি ?—টাকার ?

এই বলিয়া বাজিকর তাহার থলি হইতে একটি টাকা ও কিসের একটা লম্বা হাড় বাহির করিল। টাকাটা বাঁ-হাতে রাখিয়া ডান হাত দিয়া হাড়টা হাতের উপর একবার ঠেকাইবামাত্র হাতের মুঠা খুলিয়া দেখাইল, টাকাটা অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে।

ছাই বাজি। এমন আমিও পারি। বলিয়া বোধ করি রাত্রির সাজসজ্জা করিবার জন্য একটা মেয়ে চলিয়া গেল। তাহার পশ্চাতে আর একটা গেল। কিরণ কিন্তু সেখান হইতে নড়িল না!

অনেক কষ্টে দর্শক মিলিয়াছে দেখিয়া বাজিকর দক্ষতার সহিত আজ তাহার সমস্ত কৌশল একটি একটি করিয়া দেখাইতে লাগিল। কাঠের টিয়া পাখী জল খাইল, টাকা উড়িল, পয়সা উড়িল, মার্বেল উড়িল! বুড়া বলিল, উপযুক্ত পারিশ্রমিক পাইলে সে নাকি মানুষও উড়াইতে পারে।

এইসব কৌশল দেখিতে দেখিতে বহু দিনের একটা পুরাতন কথা হঠাৎ কিরণের মনে পড়িয়া গেল। ভোজবিদ্যার মত কে যেন তাহার অন্তঃকরণের সম্মুখে একটা যবনিকা ফেলিয়া দিয়া তাহার বর্তমান দুর্বহ জীবনটাকে একেবারে আড়াল করিয়া দিল। কে যেন তাহার এই কলিকাতার আবর্জনাময় মলিন পল্লীর কদর্য জীবনপথ হইতে সে কোন দূর পশ্চাতের সৌন্দর্য সুষমাময় অমলিন পল্লীপথে তাহাকে হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া গেল। সে যে বারবনিতা, সে কথা সে আজ ভুলিয়া গেল,—রাত্রির জন্য তাহাকে যে এখনই প্রাণপণে সাজসজ্জা করিতে হইবে সে কথা তাহার মনে পড়িল না,— নিজের দেহ বিক্রয় করিয়া তাহাকে যে জীবিকা উপার্জন করিতে হয়, সে প্রাণান্তকর চিন্তা নিমেষের জন্য সে বিস্মৃত হইল! সে আজ অনেক দিনের কথা। তাহার বাবা, মা, ভাই, বোন, গৃহ, সংসারের মধ্যে সে ছিল তখন একটি দশ এগারো বৎসরের বালিকা! এক দিন এমনি একজন বিদেশী বাজিকর সাপ খেলাইয়া বাজি দেখাইবার জন্য তাহাদের গ্রামে গিয়া উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিয়া গ্রামের ছেলে-মেয়েদের সে কি উৎসাহ! সেই উৎসুক বালক-বালিকার মধ্যে সেও তো ছিল! তাহাদের আনন্দে যোগ দিয়া হৈ হৈ করিয়া সমস্ত দিন সাপ খেলা আর বাজি দেখিয়া বৈকালে যখন সে বাড়ি ঢুকিল, তাহার মা তাহাকে কত না তিরস্কার করিলেন! তাহার সেই ছোট ভাইটি তাহার সঙ্গে ছিল,—তাহার জন্য সেও মার খাইল। সেই তাহার ভাই,—যাহাকে সে এত ভালবাসিত,—সে কি এখনও বাঁচিয়া আছে! কত বড় হইয়াছে সে! তাহার মা, বাবা, বোন! তাহাদের সেই ঘর, সেই গ্রাম! সে তো ইচ্ছা করিলেই আজ আর তাহাদের কাছে যাইতে পারে না! যে জীবনকে সে একদিন হেলায় পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছে, যাহার সহিত তাহার সম্পর্ক চিরদিনের মত বিচ্ছিন্ন হইয়া গেছে,—যে গৃহের হাসি কান্না, আনন্দ নিরানন্দ, প্রতি দিনের প্রত্যেকটি অতি তুচ্ছ ঘটনার নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ এবং পবিত্র মাধুর্য আজ তাহার কাছে স্বপ্নের প্রহেলিকার মত হইয়া দাঁড়াইয়াছে, সে পথ কি আজ তাহার জন্য রুদ্ধ হইয়া গেল ? মাগো! সে যে তাহার

একটি মুহূর্তের ভুলের জন্য আজ মহাসমুদ্রের অতলতলে তলাইয়া গেছে। এই উঞ্ছবৃত্তি হইতে তাহার কি আর নিস্তার নাই মা !

কিরণের কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল !

বুড়া একটা নূতন খেলা দেখাইবার জন্য তাহার ঝুলি হইতে কি একটা বস্তু বাহির করিতে যাইবে, এমন সময় কিরণ কহিল, হ্যাঁগা, তোমার দেশ কোথায় ?

বাজিকর কিরণের মুখের পানে তাকাইয়া বলিল, আমার দেশ—মেদিনীপুর জেলায় মা।

কিরণের বাড়ি ছিল বর্ধমান জেলায়। সে একবার ভাবিল, বর্ধমান হইতে মেদিনীপুর কত দূরে এবং সে কোনও দিন বাজি দেখাইবার জন্য তাহাদের জিলায় গিয়াছে কি না, সে কথা তাহাকে জিজ্ঞাসা করে। কিন্তু কোন কথাই তাহার জিজ্ঞাসা করা হইল না। আরও যে দুইটা মেয়ে দাঁড়াইয়া বাজি দেখিতেছিল, কিরণ একবার তাহাদের মুখের পানে তাকাইয়া চুপ করিয়া রহিল।

এমন সময় জুতা মচমচ করিয়া আফিস ফেরত কিরণের এক বাবু হঠাৎ তাহাদের সুমুখে আসিয়া দাঁড়াইল। অস্থি এবং চর্ম ব্যতীত শরীরের তাহার মাংস আছে বলিয়া বোধ হয় না ; চোখ দুইটা বড় বড়,— সে যে কত বড় দুনিয়ার শক্তিতে নিজেকে ধ্বংস করিয়াছে, তাহা তাহার অঙ্গ-সৌষ্ঠব এবং তাহার বিবর্ণ মলিন ঠোঁট দুইটা দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়। একবার বুড়া বাজিকরের দিকে, একবার কিরণের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বাবু বলিল, কি হচ্ছে এ সব ?

কিরণ কিছু বলিবার পূর্বেই বুড়া কহিল, দুটা বাজি দেখাচ্ছি বাবু। এই দেখুন, এই তো একটা হাড়— বলিয়া বাবুকে কি একটা তারিফ সে দেখাইতে যাইতেছিল ; বাবু বলিল, হ্যাঁ, হ্যাঁ, খুব হয়েছে। ওসব ঢের দেখেছি বাবা, তুমি চুপ কর।

কিরণ তাহার বাবুকে উদ্দেশ করিয়া বলিল, ওগো, একটা টাকা দাও দেখি ?

বাবু ঘরের ভিতর প্রবেশ করিতে যাইতেছিল, মুখ ফিরাইয়া বলিল, টাকা ? কি হবে টাকা ?

ওকে দেব। বলিয়া সে বাজিকরকে দেখাইয়া দিল।

তা আবার টাকা কেন ? দু'গণ্ডা পয়সা দিয়ে দাও না ?

তুমি দাও না একটি টাকা ? আমি আবার দেব তোমায়।

বাবু বাধ্য হইয়া পকেট হইতে একটি টাকা বাহির করিয়া বাজিকরের থলির নিকট ছুঁড়িয়া দিয়া বলিল, যাও বাপু যাও। মেয়েদের ভুলিয়ে খুব রোজগার করতে শিখেছ যা হোক !...এসো কিরণ এসো। বলিয়া বাবু তাহার কাপড়ের আঁচল ধরিয়া টানিতে লাগিল।

আশাতিরিক্ত পুরস্কার পাইয়া বৃদ্ধ খুশি হইয়া বলিল, আরও গোটা দুই ভাল বাজি দেখবি মা ?

কিরণ সজোরে একটা হেঁচকা টান দিয়া বাবুর হাত হইতে তাহার কাপড়খানা টানিয়া লইল। বলিল, তুমি একটু বসো না বাপু, আমি যাচ্ছি। — নাও, দেখাও তো তুমি। বলিয়া কিরণ তাহার চৌকাঠের উপর বসিয়া পড়িল।

বাবু একা ঘরের ভিতর অধীর হইয়া উঠিতেছিল। কিয়ৎক্ষণ পরে রোষগম্ভীরকণ্ঠে ডাকিল, কিরণ !

এ সময় কিরণের কিছুই ভাল লাগিতেছিল না, সেও রাগিয়া উত্তর দিল, যাব না, যাও।

বাবু আর বসিয়া থাকিতে পারিল না, কিরণের পশ্চাতে উঠিয়া আসিয়া বলিল, আমার টাকা ফিরে দাও কিরণ, আমি চললুম।

ভয়ে শশব্যস্ত হইয়া বুড়া তাহার আসবাব পত্র গুটাইয়া লইতেছিল। বলিল, হয়ে গেছে বাবু, আমি উঠি।

না, তুমি যেও না। বলিয়া কিরণ তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকিয়া তাহার বালিশেব তলা হইতে একটা টাকা বাহির করিয়া বাবুর হাতে দিয়া বলিল, ভারি ত টাকা দেখাচ্ছেন,— এই নাও তোমার টাকা।

রাগে হন হন করিয়া বাবু বাহির হইয়া গেল।

বুড়াও উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল। বলিল, আমি তাহলে আসি মা।

যাও। বলিয়া কিরণ মুখ ভার করিয়া কবাট ধরিয়া নিতান্ত অন্যমনস্কেব মত দাঁড়াইয়া রহিল।

বুড়া বাজিকর চলিয়া গেল।

কিরণ একবার বাহিরের দরজা পর্যন্ত আসিয়া রাস্তাব উপর উঁকি মারিয়া দেখিল, তাহার বাবু সজোরে হাঁটিয়া গলিটার প্রায় শেষপ্রান্তে তাহারই কোন এক প্রতিবেশিনীর বাড়িতে প্রবেশ করিল।

কিরণ ধীরে ধীরে তাহার ঘরে ফিরিয়া আসিয়া ছোট জানালাটিব সুমুখে গিয়া দাঁড়াইল। আজ তাহার গা-ধোয়া, চুল বাঁধা কিছুই হয় নাই,— সে কথা তাহার মনেও ছিল না! কিসেব যেন একটা অশান্ত আক্ষেপ তাহার মনের ভিতর অব্যক্ত বেদনায় গুমরিয়া মরিতে লাগিল। কিরণ আপনাকে সংবরণ করিয়া লইবার জন্য জানালার বাহিরে তাকাইল। তাহার এই জানালার পথে দূরে, বড় রাস্তাটা পর্যন্ত নজর চলিতেছিল। রাস্তার গাড়ি ঘোড়া, পথিকের চলাচল, সবদিন যেমন চলে, আজিও তেমনি চলিতেছে। বেল-ফুলের মালা, ঘুগনিদানা, কুলফি বরফ, রোজ যেমন হাঁকিয়া যায়, আজিও তাহারা তেমনি হাঁকিয়া গেল।

দরজায় দাঁড়াইয়া ক্রেতা ডাকিবার জন্য একটি মেয়ে ডাকিল, আসবি না কিরণ?

তাহাদের প্রতিদিনের বীভৎস কর্ম-পদ্ধতি আজ কিরণের নিকট বিষের মতন মনে হইতেছিল, —সে ঘাড় নাড়িয়া কোন রকমে তাহাকে জানাইয়া দিল যে, সে যাইবে না।

এতগুলো চোখেব সুমুখে বাজিকর যেমন করিয়া জিনিসগুলা উড়াইয়া দিতেছিল,—আজ মনে হইল, তেমনি করিয়া কে যেন তাহার মনটাকেও কোথায় কোন দিক দিয়া উড়াইয়া লইয়া গিয়াছে!

ধীরে ধীরে দরজায় খিল আঁটিয়া দিয়া সে তাহার বিছানার একপার্শ্বে এলাইয়া পড়িল।

এমন সময় কালো কুচকুচে বিরাট এক মাংসস্তূপের মত একটা লোক হেলিয়া-দুলিয়া কিবণের দরজায় আসিয়া দাঁড়াইল। কাঁচা-পাকা দাড়ি-গোঁফের মধ্যে তাহার গোলাকার চোখ দুইটা রাঙা আলোর মতই জ্বলিতেছিল!

কিরণের রুদ্ধ দরজায় গুমগুম করিয়া বারকতক করাঘাত করিয়া পাশের একটি মেয়েকে সে জিজ্ঞাসা করিল, লোক আছে না কি?

মেয়েটা উত্তর দিল, আজ ওর ভাব লেগেছে বাবু, কাল এসো।

আর একটি মেয়ে যেন তাহার মুখের কথাটা লুফিয়া লইয়া বলিল, কাল কেন, আর খানিক পরেই এসো।

দুজনেই হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

পথের ধারে কতকগুলা খেঁকি কুকুর সেই সময় ঘেউ ঘেউ করিয়া চিৎকার করিতেছিল।

বাঘ

প্রফুল্ল রায়

কোথায় চান্দা জেলা, আর কোথায় এই রত্নগিরি।

রত্নগিরি বললে সঠিক বলা হয় না। বলা উচিত নোনপুরা। নোনপুরা কার্পাস চাষীদের দরিদ্র একখানা গ্রাম। ভূগোলের হৈ চৈ থেকে অনেক, অনেক দূরে রত্নগিরি জেলার শেষ প্রান্তে মানুষের এই বসতিটা প্রায় আত্মগোপন করে আছে। হঠাৎ দেখলে মনে হয়, এখানকার বাসিন্দারা অজ্ঞাতবাস করতেই ভালবাসে।

অন্য সব বছরের মত এবারও নোনপুরায় এল ঘুনুরাম। চান্দা জেলা থেকে বেরিয়ে প্রথমে লাইট মারহাট্টা রেলে কিছুটা পথ এসেছে সে। তারপর শুরু হয়েছে হাঁটা, উত্তরায়ণের সূর্য মাথায় নিয়ে অবিশ্রান্ত পথ-চলা। হাঁটতে হাঁটতে কোনাকুনি পশ্চিমঘাট পাড়ি দিয়ে অবশেষে এই নোনপুরায় পৌঁছুনো গেছে।

মাসটা মাঘ। অর্থাৎ পঞ্চম ঋতু শীত এখন মধ্যপ্রহরে। নিয়ম অনুযায়ী সমারোহ করে হিম এবং কুয়াশা নামার কথা। উত্তুরে বাতাসের সওয়ার হয়ে একটা উদ্দাম ক্ষ্যাপামির দিগ্বিদিকে দাপাদাপি করে বেড়ানোও উচিত ছিল।

কিন্তু জগতের আর যেখানে যা খুশি চলুক, মহারাষ্ট্রের এই প্রান্তে কিন্তু বিপরীত রীতি। এখানে হিম নেই, কুয়াশাও না। উত্তুরে বাতাসটাকেও কেউ বুঝি খাপে পুরে খাপটার মুখ বন্ধ করে দিয়েছে। আকাশময় এখনও, এই মাঘে টুকরো টুকরো ইতস্ততঃ মেঘ ছড়ানো। আষাঢ়-শ্রাবণের পর কত দিনই তো পার হয়ে গেছে, তবু রত্নগিরি জেলা বর্ষাকে বুঝি প্রাণ ধরে বিদায় দিতে পারেনি, আকাশ জুড়ে আষাঢ়-শ্রাবণের স্মৃতি সে সাজিয়ে রেখেছে।

পাঁচ বছর ধরে শীতের মাঝামাঝি এই সময়টার চান্দা থেকে নোনপুরায় আসছে ঘুনুরাম। এই সময়টা সারা মহারাষ্ট্র জুড়ে শুরু হয় গণপতি-উৎসব। গণেশপুজোর আয়োজন করেনি, এমন একটি বাড়িও এখানে খুঁজে পাওয়া যাবে না।

গণপতিপুজো মহারাষ্ট্রের জাতীয় উৎসব। উৎসবটা চলে দিন-দশেক ধরে কিন্তু সেটা ঘিরে যে উৎসাহ, যে উদ্দীপনা তার মেয়াদ মাসখানেক। সেই মাতামাতির ঢেউ রত্নগিরির সুদূর অভ্যন্তরে কার্পাস চাষীদের স্তিমিত নগণ্য গ্রামখানাতেও এসে লাগে। উচ্ছ্বসিত দুর্বার এক স্রোতে নোনপুরা তখন ভেসে যায়।

গণপতি উৎসবের সময় প্রতি বছর ঘুনুরাম যে নোনপুরায় আসে সেটা অকারণে নয়। নোনপুরায় এসে বাঘ সাজ সে। বাঘ সেজে মানুষকে আনন্দ দিয়ে তার কিছু রোজগার হয়।

বাঘের সাজ গায়ে নিয়ে আর প্রকাণ্ড ল্যাজ বাগিয়ে কার্পাস চাষীদের দুয়ারে দুয়ারে এ সময় ঘুনুরাম নেচে বেড়ায়। সে যেখানে যায় সেখানেই সাড়া পড়ে যায়। বাঘের সং দেখবার জন্য ঘরের বৌরা, বাচ্চারা, বয়স্করা; প্রাচীনেরা, কিশোরীরা, জোয়ানেরা, যুবতীরা— সবাই হুড়মুড় করে ছুটে আসে। মুহূর্তে তাকে ঘিরে সমস্বরে চারিদিক মুখর করে তোলে, 'ওয়াম আলো— ওয়াম আলো—' অর্থাৎ বাঘ এসেছে, বাঘ এসেছে।

এই পার্বণের দিনে ঘুনুরাম এসে বাঘ সেজে নেচে নেচে আনন্দের স্রোতে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে, সে জন্য নোনপুরা গ্রামখানা সারা বছর অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করতে থাকে।

ঘুনুরামও তাদের নিরাশ করে না, বাঘ-নাচের সঙ্গে গানও জুড়ে দেয় :

'গণপতি বাপ্পা মোরেয়া,
পুড়ছা বরষি লৌকর ত্র্যায়া।'

অর্থাৎ হে সিদ্ধিদাতা গণেশ, আগামী বছর আরও তাড়াতাড়ি এসো। ইত্যাদি ইত্যাদি।

নাচগানের ফল খুব একটা খারাপ হয় না, বরং তা বেশ লাভজনকই। নোনপুরার মানুষ গরীব হতে পারে কিন্তু হৃদয় তাদের দরিদ্র নয়। যার যা সাধ্য, অক্লেশে হাসিমুখে তাই তারা ঘুনুরামের ঝুলিতে ঢেলে দেয়। এক মাস এখানে কাটিয়ে ঘুনুরাম যখন আবার চান্দা জেলায় ফিরে যায় তখন তার প্রাপ্তির তালিকা খুব একটা ছোট মাপের হয় না। খানচারেক নতুন ধুতি, নগদ দশ-বারোটা টাকা, মণ দেড়েকের মত চাল, অজস্র চুট্টা (বিড়ির মত নেশার জিনিস), কিছু কার্পাস তুলো এবং আরো টুকিটাকি অনেক কিছুই তার ঝোলাটিকে ভরে তোলে।

জগতে ঘুনুরাম একা। চারখানা ধুতিতে সারা বছর বেশ ভালভাবেই কেটে যায়। চুট্টাও তার কিনতে হয় না। মণ দেড়েকের মতো যা চাল মেলে তাতে তিনটে মাস সে নিশ্চিন্ত। বাকি ন মাসের জীবন তার একেবারেই অনিশ্চিত। জীবিকার জন্য এই সময় চান্দা জেলায় ঘুনুরামকে নানা ভূমিকায় দেখা যায়। এ সময় কখনও সে ভূমিহীন কৃষাণ, কখনও মালটানা কুলী, কখনও তাকে পি ডব্লু ডি-র রাস্তা বানাতে দেখা যায়। কখনও সম্পন্ন গৃহস্থের মোষ চরায় সে, কখনও আগুনের হল্কার মতো বৈশাখের গনগনে দিনগুলোতে পাহাড়ী ঝরনা থেকে মহাজনদের জন্য বাঁক ভরে জল নিয়ে আসে। আবার কখনও পুরোপুরি বেকার সে।

এত করেও কারও মন পায় না ঘুনুরাম। খিস্তি, গালাগালি এবং মারও প্রায়ই ন্যায্য পাওনা হিসেবে জোটে। এত করেও বাকি ন'মাসের জন্য ঘুনুরাম নিশ্চিন্ত হতে পারে না। কাজেই সারা বছরে অন্তত তিনটে মাসেরও নিরাপত্তার জন্য সে যে গণপতি উৎসবের সময় নোনপুরায় ছুটে আসবে, এর মধ্যে বিস্ময়ের কিছু নেই।

তিন মাসের খোরাকি আর সারা বছরের জামাকাপড়—এর জন্য তো বটেই, অন্য আকর্ষণেও ছুটে আসে ঘুনুরাম। সেই আকর্ষণটার কেন্দ্রে বসে আছে রতি। পাঁচ বছর ধরে রতিদের বাড়িতেই উঠেছে সে। গণপতি উৎসবের একটা মাস ওখানেই কাটিয়ে যায় ঘুনুরাম।

সারাটা বছর রত্নগিরির এই অজ্ঞাতবাস থেকে যেন অবিরত হাতছানি দিতে থাকে মেয়েটা, আর হৃৎপিণ্ডের কোন অদৃশ্য শিকড়ে বুঝি টান পড়ে ঘুনুরামের। এগারোটা মাস কোনরকমে কাটিয়ে বছরের শেষে বিচিত্র এক ঘোরের মধ্যে নোনপুরায় চলে আসে সে।

এছাড়া আরো একটা কারণ আছে। নিজের দীপ্তিহীন, অর্ধাহার অনাহার এবং অগৌরবের জীবনে এই একটা মাসই যা কিছু মর্যাদা পায় ঘুনুরাম। নোনপুরায় মানুষ বাঘের সং দেখেই শুধু আনন্দ পায় না, তাকে দুর্লভ এক গৌরবের সিংহাসনেও বসিয়েছে। বাঘের সাজ গায়ে না থাকলেও সবাই, বিশেষতঃ যুবতী মেয়েরা তার দিকে আঙুল বাড়িয়ে ফিস্ ফিস্ গুঞ্জনে মেতে ওঠে। প্রাচীনেরা এক বছর উৎসব শেষ হতে না হতেই পরের বছর আসার জন্য অনুরোধ জানায়। যে মানুষকে জগতের কোথাও কেউ ডাকে না, খোঁজে না, চান্দা জেলার সেই ঘুনুরাম নোনপুরার মানুষদের কাছে পরম বিস্ময়ের মত।

এবার নোনপুরায় এসে ঘুনুরাম যখন পৌঁছুল সূর্যটা তখন আকাশের মধ্যবিন্দুতে। মাথায় একটা জীর্ণ টিনের বাক্স। সেটার ভেতর তার যাবতীয় পার্থিব সম্পত্তি। যেমন ভুসো কালি, পাটকিলে আর হলুদ রঙ, লোমশ টুপি, বাঘের মত দাঁত, নখ, গোঁফ, লেজ, কিছু খড়, প্রচুর ন্যাকড়া, বাখারি, আঠা, তার এবং অগুনতি লোহার ক্লিপ। এসব বাঘ সাজার সরঞ্জাম। তাছাড়া নিজের জামা কাপড় আছে, বিছানা আছে। একটা মাস থাকতে হবে। তাই চাল-ডাল-আটা-মরিচ-মশলা ইত্যাদি আনতে হয়েছে।

মাথার উপর দুপুরের সূর্য, পেটের ভেতর আগুন জ্বলছে। তাছাড়া কটা দিন সমানে পশ্চিমঘাটের চড়াই-উৎরাই ভেঙেছে। অতএব কোথাও দাঁড়াল না ঘুনুরাম। শ্রান্ত শরীর নিয়ে লম্বা লম্বা পা ফেলে যে রাস্তাটা সোজা দক্ষিণে গেছে সেটা ধরে এগিয়ে চলল। আপাতত তিনটে জিনিস তার ভীষণ প্রয়োজন। প্রথমে স্নান, তারপর কিছু খাদ্য, অবশেষে বিকলে পর্যন্ত টানা একখানা ঘুম।

গ্রামটা আধা-পাহাড়ী, আধা-সমতল। চারিদিকে ছড়ানো বাড়িগুলো জায়গাটার সঙ্গে তাল মিলিয়ে যেন মাথা তুলেছে। পশ্চিমঘাটের চাঁই-চাঁই পাথর কেটে সেগুলো তৈরি। সেগুলোর মাথার ওপর অবশ্য ভাঙাচোরা টিন অথবা বুনো ঘাসের ছাউনি। হঠাৎ দেখলে মনে হয়, অর্ধপশুগঠন আদিম মানুষদের সারি সারি দুর্গবিশেষ।

নোনপুরার দক্ষিণ প্রান্তে সর্বশেষ যে টিলাটি, তার মাথায় শিবল নায়েকের বাড়ি। শিবলেরই মেয়ে রতি। সরাসরি সেখানে চলে এল ঘুনুরাম।

শিবলকে বাড়িতেই পাওয়া গেল। সামনের দিকে যে বারান্দা, তার একটা খুঁটিতে ঠেসান দিয়ে চুট্টা ফুঁকছিল সে। বহুকালের প্রাচীন একখানা পাথর দিয়ে তার বিশাল দেহটির যেন সৃষ্টি। পৃথিবীতে অনেক কাল টিকে আছে শিবল। বহু বছরের ঝড়-বৃষ্টি-দুর্যোগ তার শরীরে অসংখ্য ক্ষয় ধরিয়েছে। মাথার চুল তার ধূসর, চোখের দৃষ্টি আচ্ছন্ন। শরীরময় এত যে ধ্বংস, তবু মনে হয় এই লোকটির ভেতর কোথায় যেন একটা অটুট কাঠিন্য আছে।

ঘুনুরামকে দেখামাত্র চুট্টা ফেলে শিবল ছুটে এল। রীতিমত সরবে এবং সাদরে অভ্যর্থনা জানাল সে, 'আরে এসো এসো, সং এসো—' বলে ধরাধরি করে ঘুনুরামের মাথা থেকে সেই প্রকাণ্ড টিনের বাক্সটা বারান্দায় এনে নামাল। তারপর দুজনে মুখোমুখি বসল।

শিবল আবার বলল, 'কেমন আছ সং ?'

বাঘের সং সাজে ঘুনুরাম। সেই কারণে এ গ্রামের সবাই তাকে 'সং' বলে ডাকে। এই 'সং' সম্ভাষণটা লঘু অথবা ব্যঙ্গার্থে নয়, রীতিমত গৌরবার্থেই।

ঘুনুরাম উত্তর দিল, 'ভালই আছি। তোমরা কেমন আছ ?'

তোমরা বলতে শিবল আর রতি। শিবলের সংসারে ঐ এক মেয়ে ছাড়া আর কেউ নেই। না একটা ছেলে, না আর একটা মেয়ে। বউটিও দশ-বারো বছর আগে তিনদিনের জ্বরে মারা গেছে।

শিবল বলল, 'একরকম কেটে যাচ্ছে আমাদের। তা এবার কিন্তু আসতে বেশ দেরি করে ফেলেছ সং।'

পুজোর এখনও দিনকয়েক দেরি। তবে গ্রামের ভেতর দিয়ে আসতে আসতে নিজের চোখেই ঘুনুরাম দেখেছে, ইতিমধ্যে উৎসবের কিছু ঘোর লেগে গেছে। শিবল তার সত্যিকারের হিতাকাঙ্ক্ষী। শিবলের ইচ্ছা, উৎসবের মাতামাতি আরম্ভ হবার আগেই ঘুনুরাম নোনপুরায় আসুক এবং যত বেশি পরিমাণে পারে এখানকার বাসিন্দাদের কাছ থেকে পার্বণী আদায় করে নিক। মাতামাতি যত দিন চলবে ততদিনই মানুষের মন থাকবে দরাজ আর বেহিসেবি। এক পয়সার জায়গায় তিন পয়সা ঢেলে দিতে তখন তাদের হাত কাঁপবে না। কিন্তু উচ্ছ্বাসে ভাটা পড়লেই বিপদ। দরিদ্র কার্পাস চাষীরা তখন হাত গুটিয়ে নেবে। দুটো পয়সা গেঁজে থেকে বার করতে পাচ বার ভাববে, দশ বার করবে হিসেব। সামনের দিকে এক পা এগিয়ে পিছু হটবে তিন যোজন। মোট কথা, লোহা গরম থাকতে থাকতে সেটা পিটিয়ে কাজ গুছিয়ে নাও। শিবলেব হিসেব সোজা। তার মতে সুযোগের সদ্ব্যবহার একবারে প্রথম থেকেই করা দরকার।

ঘুনুরাম বলল, 'হ্যাঁ, একটু দেরি হয়ে গেল।'

শিবলের সঙ্গে কথা বলছে বটে ঘুনুরাম, কিন্তু তা যেন খানিকটা দূরমনস্কেব মতো। নিজের অজ্ঞাতসারে তার চোখ দুটি চারিদিকে চনমন করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সামনের তকতকে উঠোনে, দূরে কুয়োর পারে, পিপুল গাছের তলায়, একচালা রান্নাঘরটায় কিংবা বারান্দার সংলগ্ন পাশাপাশি দুটো শোবার ঘরে— কোথাও, কোথাও রতিকে আবিষ্কার করা গেল না। অন্য বছর ঘুনুরাম বাড়িতে ঢুকতে না ঢুকতেই মেয়েটা ছুটে আসে। অপরিসীম খুশিতে তার চোখমুখ চকচক করতে থাকে। অকারণ হাসিতে, অবারিত উচ্ছ্বাসে, প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে আর অনর্গল অজস্র কথা বলে বলে ঘুনুরামের চারপাশে দুরন্ত ঢল নামিয়ে দেয় সে। আর সেই ঢলে একেবারে ভেসে যায় ঘুনুরাম।

অতর্কিতে ঘুনুরামের ভাবনার ওপর দিয়ে একটা সম্ভাবনা ছায়া ফেলল। এক বছব পর পর সে নোনপুরায় আসে। এর মধ্যে রতির বিয়ে হয়ে যায়নি তো ? শিবলের চোখের দিকে তাকিয়ে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল সে, তার আগে শিবলই বলে উঠল, 'চান করবে তো ?'

ঘুনুরাম বলল, 'করব বৈকি। চারদিন সমানে হেঁটে আসছি, রাতে ঘুম নেই। গা-হাত-পা জ্বালা করছে। চান না করতে পারলে মরে যাব।'

শিবল আর কিছু বলল না। ঘর থেকে তেল আর গামছা বার করে ঘুনুরামের সামনে রাখল।

কুয়োর জলে শরীরের জ্বালা এবং শ্রান্তি অনেকখানি জুড়িয়ে ঘুনুরাম আবার যখন ফিবে এল তখন দেখা গেল বারান্দায় সেই বাক্সটা নেই। শিবল সেটা ঘরে নিয়ে রেখেছে।

শিবলের বাড়িতে মোট দু-খানি ঘর। প্রতি বছর গণপতি উৎসবের সময়টা শিবল আর রতি এক ঘরে থাকে। দ্বিতীয় ঘরখানা ছেড়ে দেয় ঘুনুরামকে।

ভেজা কাপড় ছেড়ে বাক্স খুলে শুকনো ধুতি পরল ঘুনুরাম। আর সেই সময় শিবল

বলল, 'চল, তোমাকে ভাত দিই। এতখানি পথ হেঁটে এসেছ। খেয়েদেয়ে ভাল করে জিরোও।'

কুণ্ঠিত ভঙ্গিতে ঘুনুরিাম বলল, 'কিন্তু—' একটি মাত্র শব্দ উচ্চারণ করেই সে থামল।

'কী ?'

'চাল-ডাল কিছুই দিলাম না—'

প্রতি বছর এখানে থাকেই শুধু ঘুনুরাম। খোরাকি তার নিজের। অবশ্য রতি তার রান্নার দায়িত্ব নেয়। শিবল বলে উঠল, 'ওবেলা থেকে চাল-ডাল দিও। এখন এসো দিকি—'

যেতে গিয়েও ইতস্ততঃ করল ঘুনুরাম। আর সেই সময় রতির কথা আবার মনে পড়ল। একটু আগে পারেনি, এবার কিন্তু সে বলেই ফেলল, 'আচ্ছা, তোমার মেয়েকে তো দেখছি না—'

'ওর কথা আর বলো না সং। আজ পাঁচ-ছ'টা দিন ধরে ও কি আর বাড়িতে থাকে! ঘরের কাজটুকু কোনরকমে সেরে উত্তরে টিলায় ছোটে। সারাদিন তো সেখানেই পড়ে আছে। আর মেয়েটাকেই বা কি বলব, গোটা গ্রামটাই ওখানে গিয়ে জড়ো হয়েছে।'

একটা ব্যাপারে অন্তত আশ্বাস্ত হওয়া গেল। রতি নোনপুরাতেই আছে এবং তার বিয়ে হয়নি। উৎসুক সুরে ঘুনুরাম জিজ্ঞেস করল, 'কি ব্যাপার ; উত্তরের টিলায় সবাই ছুটছে কেন ?'

শিবল বলল, 'আরে তোমাকে বলতেই ভুলে গেছি। উত্তরের টিলায় একটা বাঘ এসেছে যে—'

কথাটা বুঝতে পারল না ঘুনুরাম। বিমূঢ়ের মতো শিবলের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলতে পারল, 'বাঘ !'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ বাঘ, জ্যান্ত চিতাবাঘ।' শিবল বলতে লাগল, 'শম্ভা বলে একটা ছোকরা সেই সাতারা জেলা থেকে পেল্লায় এক খাঁচায় পুরে ওটাকে নিয়ে এসেছে। দিন পাঁচ-ছয় শম্ভা আমাদের এখানে এসেছে। তার ভেতরই সারা গ্রামটাকে মাত করে ফেলেছে।'

ঘুনুরাম কি বলবে, ভেবে পেল না। একটা অজ্ঞাত আশঙ্কায় তার সমস্ত হৃৎপিণ্ড ঝড়ের দোলায় দুলতে লাগল যেন।

শিবল কি ভেবে আবার বলল, 'সে যাক গে, তুমি এখন খেতে এসো সং—'

বিচিত্র এক অস্থিরতার মধ্যে শিবলের পিছু পিছু রান্নাঘরে গিয়ে খেতে বসল ঘুনুরাম। খাওয়ার আয়োজন সামান্যই। ভাত, উচ্ছে আর বেগুন দিয়ে ভাজি, খানিকটা হলদে রঙের আমতি (টকের ডাল) এবং আগুনে স্যাঁকা পাঁপড়।

ঘুনুরাম লক্ষ্য করল, মাত্র একজনের মতো ভাত-তরকারি বেড়ে নিয়েছে শিবল। বলল, 'এ কি, আমি একাই খাব নাকি ?'

'হ্যাঁ।' শিবল মাথা নাড়ল, 'মেয়েটা না খেয়েই ছুটেছে। ও ফিরে আসুক, তখন খাব। ওকে ফেলে এখন খাই কি করে বল ?'

হঠাৎ একটা ব্যাপারে সচেতন হয়ে উঠল ঘুনুরাম। কুণ্ঠিত মুখে বলল, 'কিন্তু—'

'কী ?'

'তোমাদের দু জনের মতো তো রান্না হয়েছে। আমি খেলে—'

ঘুনুরামের মনোভাব যেন বুঝতে পারল শিবল। হেসে বলল, 'ভয় নেই। আমরা না খেয়ে থাকব না। আজকাল দু-বেলার রান্না সকালেই রেঁধে রাখছে রতি। তুমি খেলে

আর কি হবে ? ওবেলা আবার না হয় চাট্টি ফুটিয়ে নেবে।

এরপর আর কিছু বলল না ঘুনুরাম। ভাতের থালাটা টেনে নিয়ে অন্যমনস্কের মতো মুখে গ্রাস তুলতে লাগল। একটু আগেও পেটের ভেতর গনগনে খিদে ছিল, এখন সেটা একেবারে অনুভূতিশূন্য হয়ে গেছে। শুধু উত্তরের টিলা, একটা চিতাবাঘ আর শম্ভা নামে সাতারা জেলার অজানা-অচেনা আগন্তুক তার সমস্ত অস্তিত্ব ভারাক্রান্ত করে ফেলেছে।

খাওয়া প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। সেই সময় ছুটতে ছুটতে এবং হাঁপাতে হাঁপাতে উত্তরের টিলা থেকে রতি ফিরে এল। সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎ চমকের মত কি একটা যেন তীব্র গতিতে ঘুনুরামের রক্তের মধ্য দিয়ে বয়ে গেল।

আগের বছর, আগের বছর কেন, গত পাঁচ বছর ধরে ঘুনুরাম যেমন দেখছে হুবহু সেই একই রকম আছে রতি। কালো রং মেয়েটার। কালো বললে সব বলা হয় না। তার গা থেকে তীক্ষ্ণ এক দ্যুতি যেন ঠিকরে বেরুচ্ছে। মনে হয়, মেয়েটা সর্বাঙ্গে ঘামতেল মেখে আছে। আদিবাসিনী মেয়েদের মত উদ্দাম এবং অজস্র স্বাস্থ্য তার। নাকমুখ বেশ টানা-টানা, তীক্ষ্ণ। হাতে রুপোর কাঙনা, নিটোল গলাটি বেষ্টন করে রুপোর বিছে হার। কালো দেহে রুপোর ছটা রূপের হাট বসিয়ে দিয়েছে যেন।

মুঠোর ভেতর বেড় পাওয়া যায় রতির কোমরখানি এমনই সরু। কোমরের নিচের দিকে বিশাল অববাহিকা, ওপর দিকে সে উদ্ধত। হলুদ রঙের ওপর কালো কালো ফুলের ছাপওলা একটা শাড়ি তার দেহটিকে সাপটে ধরে রয়েছে।

মেয়েটা যেন কালো ময়ূরী। চোখের দৃষ্টিতে তার ঘোর-লাগা, তারা মধ্য থেকে কৌতুকের খানিকটা দীপ্তিও বিচ্ছুরিত হচ্ছে। ছুটতে ছুটতে রান্নাঘরে দরজায় এসে দাঁড়িয়েছিল রতি। চোখেমুখে এই মুহূর্তে উত্তেজনা জ্বলছে। বুকটা দ্রুত তালে ওঠানামা করছে। শিবলের দিকে তাকিয়ে সে বলতে লাগল, 'বাঘটা কি সুন্দর বাবা, পেঙলা পেঙলা রং। তার ওপর কালো কালো গোল গোল ছাপ। চোখ দুটো কাচের মতন। ল্যাজটা—'

শিবল সস্নেহে হাসল, 'বুঝেছি, বুঝেছি। বাঘ তো নয়, একেবারে রাজকন্যা।'

'আরে শোনোই না—' অসহিষ্ণু সুরে রতি বলতে লাগল, 'ল্যাজটা প্রকাণ্ড—'

বাধা দিয়ে শিবল বলল, 'শুনেছি বাপু, শুনেছি। এই পাঁচ ছ দিন ধরে কতবার তো এক কথা বললি। বাঘটার এমন চোখ, অমন নাক, তেমন ল্যাজ। শুনতে শুতে একেবারে ঝালাপালা হয়ে গেছি। ঐ বাঘ বাঘ করে তো খিদেতেষ্টা বিসর্জন দিয়ে বসে আছ। যাও, চান করে এসো—'

রতি ফিরে যাচ্ছিল। শিবল ডেকে থামাল, 'আরে শোন্ শোন্, এই রতি— দ্যাখ কে এসেছে—'

রতি ফিরে দাঁড়াল। উত্তেজনার ঝোঁকে আগে সে লক্ষ করেনি। এবার দেখল রান্নাঘরের এক কোণে খেতে বসেছে ঘুনুরাম। চোখ বড় বড় করে রতি বলল, 'ওমা সং যে—কখন এসেছ ?'

নির্জীব সুরে ঘুনুরাম বলল, 'এই খানিকটা আগে।'

'তুমি যে এখানে বসে বসে খাচ্ছ আমি খেয়ালই করিনি।'

'খেয়াল না করারই কথা। বাঘের গল্প নিয়ে তুমি মেতে ছিলে—'

নতুন উদ্যমে রতি বলল, 'তুমিই বল, অমন চমৎকার বাঘ—'

কথাটা আর শেষ করতে পারল না রতি। তার আগেই শিবল তাড়া দিয়ে উঠল,

'আবার বাঘের গল্প জুড়লি ! গেলি চান করতে, গেলি—'

রতি তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'পরে তোমাকে বাঘের কথা বলব সং।' বলেই ছুটে পালাল।

সর্বাঙ্গে অসীম শ্রান্তি, বিছানায় শরীর সঁপে দিলে ঘুমের আরকে ডুবে যাবার কথা। কিন্তু কিছুতেই ঘুম এল না। বুকের ভেতর একটা কাঁটা যেন বিঁধে আছে। কাঁটাটা যে কোথায়, হৃৎপিণ্ডের ঠিক মাঝখানে অথবা ধমনীর পাশে কিংবা অন্য কোথাও, ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। সেটা যে আছে, নিদারুণ এক অস্বস্তির মধ্যে তা টের পাওয়া যাচ্ছে। আচ্ছন্ন এবং অস্থির ঘুনুরাম ঘুম এবং না-ঘুমের মাঝামাঝি একটা জায়গায় পড়ে রইল।

শুয়ে শুয়ে একটা ব্যাপার সে লক্ষ্য করেছে, কোন রকমে চান-খাওয়া সেরেই আবার উত্তরের টিলায় ছুট লাগিয়েছে রতি। রতির এই পরিবর্তন ঘুনুরামের প্রাণের ভেতরটা দুমড়ে-মুচড়ে বাঁকিয়ে-চুরিয়ে কেমন যেন ডেলা পাকিয়ে দিতে লাগল।

অথচ— অন্য সব বছর ঘুনুরাম এখানে এলে তার সঙ্গ আর ছাড়তে চায় না রতি। কি এক নেশার ঘোরে সর্বক্ষণ তার পিছু পিছু ঘুরতে থাকে। আশ্চর্য, আজ তার সম্বন্ধে যেন বিন্দুমাত্র কৌতূহলও নেই মেয়েটার।

আদৌ না ঘুমিয়ে ঘুনুরাম যখন বিছানা থেকে উঠে বাইরের বারান্দায় এসে বসল তখন আকাশের কোথাও সূর্যটাকে খুঁজে পাওয়া গেল না।

ঘুনুরামের ইচ্ছা ছিল, আজই ঘুম থেকে উঠে বাঘ সেজে গ্রামে বেরুবে। কিন্তু এই মুহূর্তে বাঘ সাজার মতো সামান্য উৎসাহটুকুও নিজের প্রাণের কোন প্রান্তেই বুঝি অবশিষ্ট নেই। নিজেকে উদ্যমহীন নিরুৎসাহ এক জড়পিণ্ডের মতো মনে হচ্ছে। শিবল বাড়িতে নেই আর রতিও সেই উত্তরের টিলায়। বারান্দায় বসে প্রায় শূন্য চোখে আকশের দিকে তাকিয়ে রইল ঘুনুরাম।

বেশিক্ষণ অবশ্য বসে থাকতে হল না। সন্ধের কিছু আগে আগেই রতি ফিরে এল। ঘুনুরামকে বসে থাকতে দেখে বলল, 'আমি যখন বেরুই তখন তুমি ঘুমুচ্ছ। তা কখন উঠলে ?'

'এই একটু আগে।' ঘুনুরাম বলল।

'অন্য বছর যেদিন আসো সেদিনই তো বাঘ সেজে বেরিয়ে পড়। কই এবার তো বেরুলে না ?'

'কাল থেকে বেরুব ভাবছি।'

'কেন, শরীর খারাপ নাকি ?'

'না, তেমন কিছু নয়।

রতি আর কিছু জিজ্ঞেস করল না। এদিকে সন্ধের অন্ধকার নেমে আসতে শুরু করেছে। লম্বা পায়ে ঘরের ভেতর চলে গেল সে। তারপর কেরোসিনের লণ্ঠন জ্বালিয়ে আবার ঘুনুরামের কাছে এল। দু-একটা সাধারণ কথার পর আবার উত্তরের টিলার বাঘের প্রসঙ্গে চলে গেল সে। জ্বলজ্বলে চোখে শুরু করল, 'বাঘটা যেমন সুন্দর, তার খেলোয়াড়টাও তেমনি।'

ঘুনুরাম চকিত হয়ে উঠল, 'খেলোয়াড়টা আবার কে ?'

'ঐ বাঘ যার— সে। নাম শম্ভা। গায়ের রঙ টকটকে, লম্বা-চওড়া চেহারা, পাকানো গোঁফ, বাবরি চুল। বাঘের খাঁচায় ঢুকে সে যখন খেলা দেখায় বুকের রক্ত হিম হয়ে

যায়। সত্যিকারের একটা পুরুষ মানুষ। ব্যাটাছেলে এমন হলেই মানায়।' বলতে বলতে রতির গলার স্বর আবেগে কাঁপতে লাগল। চোখের তারা দুটো কেমন যেন আবিষ্ট।

শম্ভা নামে অপরিচিত বাঘের খেলোয়াড়টির রূপ গুণ এবং পৌরুষের স্তুতি শুনতে শুনতে আর রতির চোখমুখের চেহারা দেখতে দেখতে চোখ জ্বালা করতে লাগল ঘুনুরামের। জ্বরের রোগীর মত কপালের দু পাশে দুটো রগ সমানে লাফাচ্ছে। হঠাৎ উঠে দাঁড়াল সে।

রতি অবাক। বাঘ এবং শম্ভা সম্পর্কে উচ্ছ্বাস থামিয়ে বলল, 'কী হল সং! উঠেপড়লে যে?'

'মাথাটা ভীষণ ঘুরছে। যাই আরেকটু শুয়ে থাকি গে।' রতিকে আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে নিজের ঘরটিতে চলে গেল ঘুনুরাম।

শরীর আর মন যত নিরুদ্যম হয়েই পড়ুক, তবু পরের দিন সকালে ঘুনুরামকে বেরুতে হল। তিন তিনটে মাসের নিরাপত্তা। তার ওপর সমস্ত বছরের জামা কাপড়ের প্রশ্নও আছে।

একেবারে বাঘ সেজেই বেরুল ঘুনুরাম। প্রথমেই সে গেল দক্ষিণ পাড়ায়।

অন্য সব বছর সে আসামাত্র সাড়া পড়ে যেত। ঘর-সংসার ফেলে সবাই বেরিয়ে আসত বাইরে। তার পিছু পিছু একটা জমজমাট ভিড় আর মৌচাকের মতো ভনভনানি সর্বক্ষণ লেগে থাকত।

এবার কিন্তু ঘুনুরামকে নিয়ে কেউ মাতল না। তাকে ঘিরে অন্য বার উদ্দীপনার যে ঢল নামে, এ বছর তার ছিটে-ফোঁটাও নেই।

তবু দুয়ারে দুয়ারে ঘুরে গলার স্বর সপ্তমে তুলে সেই গান গাইতে লাগল ঘুনুরাম, 'গণপতি বাপ্পা মোরেয়া, পুড়ছা বরষি লৌকর ত্রায়া।' এত জোরে গাওয়ার উদ্দেশ্য : নিজের অস্তিত্ব ঘোষণা করা।

ঘুনুরামকে দেখে দু-চারজন যে বেরিয়ে না এল, তা নয়। কিন্তু তাদের চোখে-মুখে অভ্যর্থনা নেই, অন্তরঙ্গতার কোন উত্তাপই অনুভব করতে পারল না ঘুনুরাম।

অন্য বছর এ গ্রামের বাসিন্দারা নিজে থেকেই ছুটে আসে। তার সঙ্গে দুটো কথা বলতে পারলে ধন্য হয়, কৃতার্থ বোধ করে। এবার কেউ এল না দেখে উপযাচকের মতো ঘুনুরামই এগিয়ে এল। গান থামিয়ে মুখে বিগলিত হাসি ফুটিয়ে বলল, 'এবারও এলাম তোমাদের গাঁয়ে—'

লোকগুলো বলল, 'আসবে বৈকি—' বলল বটে কিন্তু তার মধ্যে আন্তরিকতার সুর বাজল না।

দু-চার বাড়ি ঘুরে ভাওজীদের উঠোনে এসে দাঁড়াতেই ভাওজীর জোয়ান ছেলেটা বলে উঠল, 'এবার আর নকল বাঘের নাচ আমরা দেখব না। আসল বাঘ এসেছে, তার খেলা দেখব।'

পাঁচ বছর ধরে নোনপুরায় আসছে ঘুনুরাম। এ গ্রামের সবাইকেই সে চেনে। নামও জানে। ভাওজীর ছেলের দিকে তাকিয়ে সে বলল, 'আসল বাঘ, নকল বাঘ— কী বলছ যশোবন্ত!'

যশোবন্ত বলল, 'তুমি হলে নকল বাঘ। ন্যাকড়া-খড়-কালি-ঝুলি দিয়ে বাঘ সাজো। আর আসল বাঘ আছে উত্তরের টিলায়—'

অর্থাৎ সেই শম্ভা আর তার চিতাবাঘ। ঘুনুরামের ধমনীতে রক্তস্রোত যেন থেমে যেতে লাগল।

যাই হোক, সূর্যকে পশ্চিম আকাশের দেউড়ি পার করিয়ে সারা দিন পর অবসন্ন পায়ে টলতে টলতে ঘুনুরাম যখন ফিরে এল তখন তার ঝুলিতে মোটে এক টাকা বিশ পয়সা আর সের দেড়েকের মত চাল।

পরের দিন ঘুনুরাম গেল পুব পাড়ায়, তার পরের দিন উত্তর পাড়ায়, অবশেষে পশ্চিম পাড়ায়। যেখানেই সে যায় সেখানে একই অবস্থা। এ বছর কেউ তাকে কাছে টানার জন্য একখানা হাতও বাড়িয়ে রাখেনি। উত্তাপহীন নিস্পৃহ অভ্যর্থনা ছাড়া কোথাও কিছু জোটে না। প্রত্যাশার ঝুলিটি প্রতিদিন শূন্যই থেকে যায় ঘুনুরামের।

এ গ্রামের বাসিন্দাদের অনেকেই প্রকাশ্যে জানিয়ে দিয়েছে, বাঘের সং দেখতে তারা আর উৎসাহী নয়। সত্যিকারের অরণ্যচারী জীবন্ত বাঘ যখন এসেই পড়েছে তখন তাকে দেখেই তারা পরিতৃপ্ত হবে। অনেকে আবার কিছুই বলেনি। তবে উত্তরের টিলার চিতাবাঘটার দিকেই যে তাদের প্রবল অনুরাগ সেটুকু অনায়াসেই টের পাওয়া গেছে।

কদিন ঘুরেই ঘুনুরাম বুঝতে পারল, এবার আর সুবিধে হবে না। একটা গাঢ় গহন শঙ্কার ছায়া তার সমস্ত সত্তার ওপর অনড় হয়ে বসেছে যেন। তিনটে মাস নিরাপত্তার জন্য নোনপুরায় আসে সে। কিন্তু কার্পাস চাষীদের মুঠি এবার তার প্রতি এত কৃপণ যে সপ্তাহখানেকের মত খোরাকিও উঠবে কি না সন্দেহ। এবার মত্ততার সব স্রোত, সব ঢল উত্তরের টিলার দিকে।

যে মানুষ ন'টা মাস অর্ধাহারে প্রায় পশুর জীবন কাটায় তার পক্ষে বাকি তিন মাস আয়েসী না হলেও চলে। দিন একরকম না একরকম করে কেটে যাবেই। কিন্তু নোনপুরায় এসে সে যে মর্যাদা পায় সেটা কোথায় মিলবে? ঘুনুরামের মনে হল, তার ন্যায়সঙ্গত আর চিরন্তন গৌরবে শম্ভা আর তার বাঘটা অত্যন্ত অন্যায়ভাবে হাত বাড়িয়েছে।

উত্তরের টিলার ঐ বাঘটা শুধু তিন মাসের নিরাপত্তা আর মর্যাদাই ছিনিয়ে নেয়নি, অন্য দিক থেকেও ঘুনুরামকে একেবারে পঙ্গু করে ফেলেছে।

সকাল হলেই নাকেমুখে চাট্টি গুঁজে বাঘ সেজে বেরিয়ে পড়ে ঘুনুরাম। সমস্ত দিন নেচে-গেয়ে নোনপুরা গ্রামের মনোহরণের চেষ্টা করে সন্ধ্যের মুখে শিবল নায়েকের বাড়ি ফিরে আসে। ফিরে কোনদিন রতির দেখা মেলে, তবে বেশির ভাগ দিনই সে থাকে উত্তরের টিলায়। অবশ্য সন্ধ্যের অন্ধকার নামার পর আর বাইরে থাকে না রতি, বাড়ি ফিরে আসে।

বাঘের সাজ খুলে কালিঝুলি ধুয়ে আসতে আসতে রাতের বয়স অনেকটাই বেড়ে যায়। সেই সময় রতি খেতে ডাকে। খেতে খেতে নানা কথা হয়। তবে সব নদী সমুদ্রে মেশার মত সব কথার শেষে বাঘের প্রসঙ্গ আনবেই মেয়েটা। প্রায় রোজই সে জিজ্ঞেস করে, 'চিতাবাঘটা তুমি দেখে এসেছ সং?'

খেতে খেতে ভাতের ডেলা গলায় আটকে যায়। বিস্বাদ রুদ্ধ স্বরে ঘুনুরাম জবাব দেয়, 'না।'

'কি আশ্চর্য, গ্রামের কোন লোকের বাঘটা দেখতে বাকি নেই। রোজ দু-চার বার করে সবাই গিয়ে দেখে আসছে, আর তুমিই শুধু যাচ্ছ না!' রতির মুখচোখ দেখে মনে হয়,

উত্তরের টিলার বাঘটা দেখতে না যাওয়া রীতিমত অপরাধ।

ঘুনুরাম এবার আর কিছু বলে না। নিঃশব্দে নতচোখে ভাতের থালায় আঁকিবুকি কেটে যায়।

রতি তাড়া লাগায়, 'কালই কিন্তু যাবে সং, নিশ্চয়ই যাবে। অমন চমৎকার বাঘ জীবনে আর কখনও দেখনি, আর দেখতেও পাবে না। তা ছাড়া ঐ খেলোয়াড় শম্ভা— কি মজাদার লোক যে সে, তোমায় কী বলব সং!'

অদ্ভুত ব্যাপার। অন্য বছর তাকে দেখাবার জন্য নোনপুরা গ্রামের সবাইকে টেনে টেনে বাড়িতে নিয়ে আসত রতি। সে কি খেতে ভালবাসে, কখন ঘুমোয়, কিভাবে বাঘ সাজে ইত্যাদি নানা রূপকথা ছড়িয়ে তাক লাগিয়ে দিত। সে জানে এই রতি— কালো ময়ূরীর মত শিবল নায়েকের এই মেয়েটা, একটু ইশারা পেলে একদিন তার পিছু পিছু চান্দা জেলা পর্যন্ত চলে যেতে পারত। কিন্তু প্রতিদিনের অসংখ্য অপমান, অর্ধাহার আর অনিশ্চয়তার জীবনে রতিকে ডেকে নিয়ে যেতে ভরসা হয়নি ঘুনুরামের। তা ছাড়া নোনপুরায় এই একটা মাস বাদ দিলে প্রাণ ধারণের জন্য প্রতি মুহূর্তে তার যে সংগ্রাম, যে অসম্মান— তা ঘুনুরামকে স্বভাবভীরু করে রেখেছে। রতিকে ডাক দেবার মত দুঃসাহস নিজের মধ্যে কোনদিনই সে খুঁজে পায়নি।

ঘুনুরাম নিজে যেমনই হোক, যতই তার ভীরুতা থাক, রতি কিন্তু এতকাল তাকে নিয়েই মেতে ছিল। তার গৌরবে সর্বক্ষণ উচ্ছল আর উচ্ছ্বসিত হয়ে থাকত সে। আশ্চর্য, সেই রতিই আজ উত্তরের টিলার চিতাবাঘ আর শম্ভাকে নিয়ে মেতে উঠেছে।

রতি আবার বলে, 'আমি জানি, তুমি নিজে থেকে যাবে না। আমিই তোমাকে বাঘ দেখাতে কাল নিয়ে যাব।'

ঘুনুরাম উত্তর দেয় না। শুধু অসহ্য অক্ষম আক্রোশে তার বুকের ভিতরটা তরঙ্গিত হতে থাকে। নাঃ, শম্ভা আর তার বাঘ সে দেখেনি, দেখার বিন্দুমাত্র সাধও নেই।

দেখতে দেখতে গণেশ পুজো এসে গেল। নোনপুরা গ্রামের উত্তেজনা, উদ্দীপনা এবং মাতামাতি এখন শীর্ষবিন্দুতে। উদ্যমহীন ভগ্নমন ঘুনুরাম শেষবারের মত আসরে নামল। মানুষ এখন উদ্দাম, হিসেবহীন, বেপরোয়া। এ-সময়টা যদি তাদের খুশি করে কিছু আদায় করা যায়। অতএব যতখানি সম্ভব নিখুঁত করে বাঘ সাজল ঘুনুরাম, শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে নাচল, কুঁদলে এবং মনপ্রাণ ঢেলে দিয়ে গাইল। কিন্তু এবার নোনপুরায় মানুষেরা যেন প্রতিজ্ঞাই করে বসেছে তার দিকে ফিরেও তাকাবে না, কঠিন উপেক্ষা দিয়ে শুধু দূরেই সরিয়ে রাখবে।

ঘুনুরামের কেমন যেন সংশয় হল, এতকাল নকল বাঘ সেজে আসল বাঘের মর্যাদা পেয়ে এসেছে সে। নোনপুরার মানুষ আসল-নকলের পার্থক্য বুঝতে না পেরেই বোধহয় সে মর্যাদা দিয়েছে। এখন সত্যিকারের বাঘটা এসে পড়ায় তফাতটা ধরা পড়ে গেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে গৌরবের সিংহাসন থেকে তারা তাকে একেবারে পথের ধুলোয় ছুঁড়ে দিয়েছে।

আরও কটা দিন কেটে গেল। ব্যর্থ, পরাভূত, হতাশ ঘুনুরাম আজকাল আর বাঘ সেজে গ্রামে বেরোয় না। কী-ই বা হবে বেরিয়ে! শুধু শিবল নায়কের বারান্দায়, দু হাঁটুর ফাঁকে মুখ রেখে শূন্য দৃষ্টিতে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে আর ভাবে উত্তরের টিলার যে বাঘটা তার সমস্ত মর্যাদা ছিনিয়ে নিয়েছে সেটা কেমন? একদিন সে পণ করেছিল বাঘটা দেখতে কোনদিনই যাবে না। নোনপুরা গ্রামের আর সব জায়গাতেই গেছে সে, শুধু ঐ

খেলা আর খেলা

বেশিক্ষণ শোনা গেল না। আহত রক্তাক্ত মূর্ছিত ঘুনুরাম মুহূর্তে লুটিয়ে পড়ল।

জীবনে চিরদিন বাঘের সংই সেজেছে ঘুনুরাম। এই একবারই বাঘ হয়ে উঠতে চেয়েছিল সে।

নুটি মন্তর

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

হাবু—নাপিতের ছেলে, সুতরাং রীতিমত তার বুদ্ধি।

পায়রাগাছির গুণীন রোজা এ অঞ্চলে প্রসিদ্ধ, সে নাকি মন্ত্রবলে সাপ হতে পারে, বাঘ হতে পারে, কী না হতে পারে! লোহার সিন্দুকে কিংবা বাড়িতে বড় বড় হব্‌সের চব্‌সের কুলুপ লাগানো আছে— পায়রাগাছির রোজা (ওঝা) এসে কি একটা মন্তর বিড়বিড় করে বলে দুবার তালা ঝম্‌ঝম্ করে নাড়লে, আর তালা সব গেল বেমালুম খুলে। এ কত লোকের স্বচক্ষে দেখা। রায়েদের কলম-আমবাগানে বিকেল বেলা কেউ কেউ নাকি দেখেছে রোজা কলমের আম পাড়ছে— হয়তো লোকে ধরতে গিয়ে দেখলে একটা খরগোস লাফাতে লাফাতে বাগানের উত্তরদিকের বেড়া ডিঙিয়ে পালিয়ে গেল।

পায়রাগাছির রোজা! মস্ত বড় নাম।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়— এত বড় নাম-করা রোজা যে, তাকে কেউ কখনও দেখেনি। কোথায় যে কখন কি ভাবে থাকে, তা কেউ বলতে পারে না।

হাবুর বড্ড ইচ্ছে সে কিছু মন্তর-তন্তর শেখে। এ তার অনেক দিনের ইচ্ছে। এখন তার বয়স আঠার-উনিশ। যখন তার বয়স চোদ্দ-পনের তখন থেকে সে যেখানেই শুনেছে রোজা গুণীন এসেছে অমনি তার পিছু পিছু ছুটে গিয়েছে। একবার তাদের পাশের গ্রামের হাইস্কুলে একজন বড় জাদুকর এসে নানারকম তাসের খেলা, টাকার খেলা দেখালে। একটা তাস বেমালুম গোলাপ ফুল হয়ে গেল, এর মুঠোবাঁধা হাতের টাকা ওর হাতে গেল, এক গ্লাস জল হয়ে গেল মিষ্টি শরবত।

তাদের গাঁয়ের দু-চারজন লোকের সঙ্গে হাবুও গিয়েছিল খেলা দেখতে। একখানা তাসকে তার চোখের সামনে গোলাপ ফুল হতে দেখে সত্যি সে কি আশ্চর্যই না হয়ে গিয়েছিল!

ফেরবার পথে সন্ধ্যে হয়ে এসেছে। ওর কি রকম গা ছম ছম করতে লাগল।

কালী স্যাকরা দলের মধ্যে প্রবীণ। হাবু বলল— আচ্ছা কালী জেঠা, ওসব কি করে করলে?

কালী স্যাকরা একটা তাচ্ছিল্যসূচক ভঙ্গি করে বললে— আহা, ওসব তো সোজা!

—সোজা, কালী জেঠা?

—খু-উব সোজা।

—কি রকম সোজা?

—ওসব মন্তর-তন্তরের কাণ্ড। আমিও ইচ্ছে করলে পারি।

—তুমিও পার ?

—কেন পারব না।

—একদিন করে দেখাবে জেঠা ?

—হুহুঁ, যা। সময় হলে দেখাব। ও কিছুই নয়।

কালী স্যাকরার কথায় কিন্তু হাবুর বিস্ময়বোধ দূর হল না। সে গিয়ে জাদুকরকে পরদিন সকালে পাকড়ালে। সোজাসুজি তাঁকে জানালে সে ঐসব খেলা শিখতে চায়। শাগরেদ হতে সে রাজী আছে। জাদুকর কলকাতার লোক, মাথায় নরম বুরুশ দিয়ে চুল আঁচড়ে থাকেন, হাতে ঘড়ি পরেন, চোখে থাকে চশমা। তিনি নাক উঁচু করে বললেন, না হে ছোকরা, হয় না। অনেক টাকার খেলা, অনেক টাকা প্রিমিয়াম দিলে তবে শাগরেদ করি।

হাবু বললে— প্রিমিয়াম কি ?

—প্রিমিয়াম টাকা হে, টাকা পারবে আমায় দিতে ?

মরীয়া হয়ে হাবু বললে— আজ্ঞে কত টাকা ?

—একশ। —পারবে দিতে ?

—আজ্ঞে না। অত টাকা কখনও একসঙ্গে দেখিনি।

—তবে ফিরে যাও। এসব অমনি হয় না।

—কিছু কম করে নিন—

—দু'শ করে প্রিমিয়াম নিই, তোমায় একশ বলেছি!

হাবু সেখান থেকে সরে পড়ল। অত টাকার সিকিও দেবার ক্ষমতা নেই তার। জাদুবিদ্যা শেখবার সৌভাগ্য কি সকলের ঘটে!

কেটে গেল বছর তিনেক। এই তিন বছরে তার জীবনে নতুন কিছু ঘটল না। এ অজ পাড়াগাঁয়ে জীবন এক-রঙা ছবির মত একঘেয়ে।

ঠিক এই সময়ে একদিন হাবু দুপুরে মাছ ধরতে গেছে নদীতে, এমন সময়ে দেখলে একটা লোক আমবাগানের ছায়ায় বসে আপন মনে কতকগুলো ঢিল নিয়ে খেলছে। হাবু একটু এগিয়ে গিয়ে দেখলে লোকটা একটা ঢিল হাতে নিয়ে ছুঁড়ে দিতেই সেটা মস্ত বড় একটা কোলা ব্যাং হয়ে গেল, লাফিয়ে লাফিয়ে পালাল। আর একটা ঢিল ছুঁড়তেই সেটা হয়ে গেল একটা ছেলেদের দু চাকার খেলনাগাড়ি, কিন্তু সে গাড়ি গড়গড় করে গড়িয়ে চোখের বাইরে অদৃশ্য হল, আর একটা ঢিল হিল হিল করতে করতে একটা সাপ হয়ে চলে গেল, একটা ঢিল একমুঠো আবীর হয়ে ছত্রাকারে ছড়িয়ে মাটি রাঙিয়ে দিলে। হাবু সেখানে গিয়ে দাঁড়াতেই লোকটা ওর মুখের দিকে চেয়ে ফিক্ করে হেসে বললে— কি ?

স্তম্ভিত ও ভীত হাবু কোন কথা না বলে একেবারে লোকটার পা জড়িয়ে ধরতে গিয়ে হোঁচট খেয়ে পড়ল।

গাছতলায় লোকটা নেই।

হাবু বিভ্রান্ত চোখে চারিদিকে চেয়ে দেখলে। অত বড় আমবাগানের কোথাও সে নেই! দু মিনিট হাবু দাঁড়িয়ে রইল আড়ষ্ট হয়ে। হঠাৎ সে দেখলে হাত দশেক দূরে সেই ব্যক্তি দাঁড়িয়ে মৃদু মৃদু হাসছে।

হাবু কাতর কণ্ঠে বললে— আমাকে দয়া করুন।

—কি দয়া ?

—পায়ে ঠেলবেন না এমন করে। আমাকে আপনার চাকর করে রেখে দিন। আমি অনেক ভাগ্যে আপনার দেখা পেয়েছি।

—আমি গরিব লোক, চাকরে আমার কি দরকার। তাছাড়া আমার হাতে অনেক চাকর। এই দেখ— বলেই লোকটা একটা ঢিল গাছের ওপরের ডালের দিকে অবহেলার সঙ্গে ছুঁড়ে মারতেই ঝর ঝর করে একরাশ আম পড়ল। হাবু একেবারে স্তম্ভিত। আম আসে কোথা থেকে এই কার্তিক মাসে ? পাড়াগাঁয়ে কোন গাছেই এ সময়ে আম তো দূরের কথা, আমের বউলও নেই। পাকা আম ঝুড়িখানেক তার সামনে !

লোকটা বললে— খাবার জল ? এই—

যেমন একটা ঢিল ছোঁড়া, অমনি গাছের গুঁড়ির এক জায়গা একেবারে ফুটো হয়ে কলের মুখে যেমন জল পড়ে, তেমনি জল পড়তে লাগল। লোকটা হাত নেড়ে ইঙ্গিত করে বললে— খাও— ভাল জল।

হাবু কাতর সুরে বললে— আমায় শাগরেদ করে রাখুন !

—কি সর্বনাশ ! শাগরেদ ? আমি ওস্তাদ নই।

—আমায় দয়া করুন।

লোকটা হি হি করে হেসে উঠল। ও কি ! মুখের ফাঁ থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে লাল নীল বেগুনি রঙের ডানাওয়ালা প্রজাপতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। ...লোকটা কে ?

এর উত্তর লোকটা দিলে। বললে— পায়রাগাছি জান ? উত্তর দিকে। আমার সঙ্গে সেখানে দেখা ক'রো।

হাবু হাঁ করে রইল। ইনি তবে পায়রাগাছির সেই গুণীন ! সবাই বলে উনি 'মন্তর' জানেন, অর্থাৎ মন্ত্রবলে অদৃশ্য হতে পারেন। আজ সে নিজে তার প্রমাণ পেয়েছে। হাবু হাত জোড় করে বললে— আমায় দয়া করুন।

পায়রাগাছির রোজা এবার নরম সুরে বললে— শেখাতে পারি নুটি মন্তর, কিন্তু ছোকরা, তুমি এ পথে কেন ? এ পথে কেবল তারাই আসতে পারে যাদের বাসনা কামনা ক্ষয় হয়ে গেছে। কত লোভের পথ খুলে যাবে— দেখ। আচ্ছা রোসো, দিচ্ছি তোমায় মন্তরটা শিখিয়ে।...

কিছুদিন কেটে গেল।

হাবু এখন নুটি মন্তর শিখে সম্পূর্ণ অদৃশ্য হতে শিখেছে। সঙ্গে সঙ্গে সে আবিষ্কার করলে সে একজন ভীষণ চোর। যে ঘরে যায়, ভাল ভাল জিনিস সব চুরি করতে ইচ্ছে হয়। খাবারের দোকানে গেলে ইচ্ছে হয় খাবারের হাঁড়ি ফাঁক করে। সে যে চোর, তা সে কখনও জানত না। একদিন এক বন্ধুর বাড়ি গিয়ে দেখলে, মস্ত বড় একটা ইলিশ মাছ এনেছে বন্ধুর বাবা। রোয়াকে সেটা পড়ে আছে, বন্ধুর মা ঘরে ঢুকেছেন বঁটি আনতে। ওর লোভ হল মাছটাকে নিয়ে দৌড় দেয় !

হাবু ভয়ে তখনই দৃশ্যমান হয়ে গেল !

বন্ধুর মা ওকে দেখে বললেন— ওমা, হাবু কোথা দিয়ে এলি ? তোকে তো দেখলাম না দরজা দিয়ে আসতে ? এই মাত্তর তো ঘরে বঁটি আনতে গিয়েছি।

হাবু হেসে চুপ করে রইল।

একদিন আরও গুরুতর ব্যাপার ঘটল। পাড়ার গাঙ্গুলিরা বড়লোক, তাদের বাড়ির ওপরের তলায় খাটে একছড়া দামী সোনার হার কে ফেলে রেখেছে। হাবু কৌতুহলবশত

গাঙ্গুলিদের তেতলায় অদৃশ্য অবস্থায় বেড়াতে গিয়ে লোভ সামলাতে না পেরে সেই হার হাতে নেমে এল। সেও অদৃশ্য, তার কাছে যে জিনিস থাকবে তাও অদৃশ্য।

কেউ কিছু টের পেলে না।

তার পর যখন জানা গেল হার চুরি গিয়েছে, তখন গাঙ্গুলিদের বাড়িতে হৈ চৈ পড়ে গেল। গাঙ্গুলিদের বড় মেয়ের হার সেটা, তার সে কি কান্না! সবাই মিলে তাকে অপমান উৎপীড়ন করতে লাগল, সে কেন এত অসাবধান, কেন সে হার খাটের ওপর ফেলে রেখেছিল। অবশেষে সন্দেহ গিয়ে পড়ল এক বৃদ্ধা দাসীর ওপর। তার ওপর শুরু হল নির্যাতন। পুলিশে খবর দিয়ে তাকে ধরিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থাও হতে লাগল।

কিন্তু হাবুর সবচেয়ে অসহ্য হল গাঙ্গুলিদের মেয়ের সেই হাপুস নয়নে কান্না। মেয়েটির সঙ্গে তার স্বামীর বনিবনাও নেই। বাপের বাড়ি পড়ে থাকে। এমন মেয়ের কোন মান থাকে না বাপের বাড়ি। বৌদিদিরা একেই তো তাকে দাঁতে পেষেন, তার ওপর সে বাপের দেওয়া হারছড়া খুইয়ে ঘোর অপরাধে অপরাধিনী।

হাবু অদৃশ্য হয়ে সব দেখছিল, হারও তার পকেটেই ছিল। আর সহ্য করতে না পেরে হারছড়াটা সে বালিসের তলায় রেখে দিলে। সেখান থেকে সেই মেয়েই প্রথম হার আবিষ্কার করলে। তখন কি হাসি তার মুখে!

তা তো হল, কিন্তু হাবু পড়ে গেল মহা বিপদে।

সে চোর হয়ে গেল শেষ পর্যন্ত? এ কি ভয়ানক প্রলোভনে সে পড়েছে। পদে পদে প্রলোভন, পদে পদে সচ্চরিত্রতার পরীক্ষা দিতে হচ্ছে তাকে। মনের বল ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে দিন দিন। লোভ সামলাতে সামলাতে গলদঘর্ম। অদৃশ্য না হয়েও থাকা যায় না, অদৃশ্য হলেও বিপদ। এ কি সর্বনাশা মন্ত্র!

মাসের পর মাস কাটে, এই ঘোর অগ্নিপরীক্ষার মধ্য দিয়ে।

হাবু ইতিমধ্যে এক বিয়েবাড়ির ভাঁড়ারে ঢুকে সের খানেক সন্দেশ মেরে দিল। পরক্ষণেই জাগল অনুতাপ— তীব্র অনুতাপ। সে কোথায় নেমে চলেছে দিন দিন! পায়রাগাছির রোজা এ কি সর্বনাশ তার করে গেল! কিছুতেই অদৃশ্য হবার প্রলোভন সামলানো যায় না। কিছুতেই ভোলা যায় না নুটি মন্তর। নুটি মন্তর তার জীবনের অভিশাপ।

বছরখানেক এভাবে কেটে গেল। কত খুঁজলে পায়রাগাছির রোজাকে— কেউ সন্ধান দিতে পারলে না।

একদিন হাবু সেই আমবাগান দিয়ে যেতে যেতে সেই একই গাছের তলায় দেখলে পায়রাগাছির রোজা সেই রকম ঢিল নিয়ে ছুঁড়ে খেলা করছে। ওর দেহে বিদ্যুতের স্রোত বয়ে গেল। সন্ধান মিলেছে এতদিন পরে। ও ছুটে এগিয়ে কাছে গেল। ঢিল একটা ব্যাঙ হয়ে লাফাতে লাফাতে পালাল। একটা ঢিল সদ্য-কাটা ধাড়ি ছাগলের মুণ্ড হয়ে গড়াগড়ি খেতে খেতে চলে গেল। এক ঝাঁক ছাতারে পাখী রোজার মুখের মধ্যে থেকে বের হয়ে উড়ে গেল।

হাবু ছুটতে ছুটতে (পাছে রোজা অদৃশ্য হয়ে যায়) গিয়ে ওর পায়ের ওপর পড়ল।

রোজা প্রশান্ত হাসির সঙ্গে বলল— কি হয়েছে?

—আমায় বাঁচান।

—কি ব্যাপার?

—আপনি সব জানেন। আপনি অন্তর্যামী.। ওস্তাদজি, নুটি মন্তরের কবল থেকে আমায় উদ্ধার করুন। আমার চরিত্র গেল, মনের শান্তি গেল,— সব গেল। এ আপনি ফিরিয়ে নিন।

রোজা মৃদু মৃদু হেসে বললে— একবার মন্তর দিলে আর ফেরত হয় ?—হয় না।

হাবু ভয়ে শিউরে উঠল। তবে কি জীবন-ভোর এই সর্বনেশে মন্তরের ভার বইতে হবে তাকে ? এই অশান্তি,—পদে পদে এই পরীক্ষা সারাজীবন চলবে ?

হাবু পা আঁকড়ে ধরে বললে— বাঁচান আমায়। আমি মরে যাব।

—তবে চাও না নুটি মন্তর ?

—আজ্ঞে না।

রোজা হেসে বললে— তবে যাও, দিলাম না। মোটেই তোমাকে মন্তর দিইনি। পরীক্ষা করছিলাম।

হাবু অবাক। সে কি কথা ! এক বছর ধরে তবে সে কিসের ভারবোঝা বয়ে মরল ?

সে কি বলতে যাচ্ছিল। রোজা হেসে বললে— মোটে সাত মিনিট কেটেছে। এই প্রথম দেখা তোমার সঙ্গে আমবাগানে। নুটি মন্তর তোমাকে দেওয়া যায় কি না পরীক্ষা করছিলাম। আমি আজ বিশ বছর এই মন্তরের ভার বয়ে আসছি, আর তুমি এর দায়িত্ব সাত মিনিটও নিতে পারলে না ?

হাবু বললে— তবে আমি গাঙ্গুলিদের বাড়ি হার চুরি করিনি ? ময়রাদোকানে খাবার খাইনি চুরি করে ? তবে আমি—

—না। মোটে সাত মিনিট কেটেছে। আমার সামনে ছাড়া তুমি কোথাও যাওনি। এই তো প্রথম তোমার সঙ্গে আমবাগানে···

বলে কি ! হাবু আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। পায়রাগাছির গুণীন হা হা করে হেসে উঠল।

সঙ্গে সঙ্গে এক ঝাঁক চামচিকে তার হাঁ-করা মুখের মধ্যে থেকে পট্‌পট্‌ শব্দে বের হয়ে ইতস্তত উড়ে গেল।

অঙ্ক না মারাদোনা

জ্যোতির্ময় গঙ্গোপাধ্যায়

এ অঙ্ক তো তা হলে হবার নয়। তারই জন্যে এসব অঙ্ক বই-তে রাখা হয়েছে। আর সে যে ক্লাসে আছে সেই ক্লাসেই দেওয়া হয়েছে বইখানা। সকালের মধ্যে বিল্টু দাসকে করে ফেলতে হবে এরকম পাঁচ সাতখানা অঙ্ক। একখানা এখনও হয়নি, সাতখানা কবে হবে। বিল্টু দাসের চোখে জল আসে না। তার দুঃখ হয় না। তার রাগ হয়। আর সেই রাগে বই-এর সমস্ত পাতা ক খানা—না না আর সে পাতা ছিঁড়বে না। একবার এরকম একখানা শক্ত বই-এর পাতা ছিঁড়ে ফেলতে গিয়েছিল। ছোট বোন পিঙ্কি কেড়ে নিয়েছিল। ঠাট্টা করে বলেছিল, তোর ওই ফুটবল আর ফুটবল বুট ছিঁড়ে ফেল দিকি। তবে অঙ্ক হবে।

বিল্টু দাস, মানে মেজর বিল্টু দাস নামে ছেলেরা যাকে ডাকে। হেডমাস্টার যাকে সমীহ্ করেন। গেম্স মাস্টার দ্রোণাচার্য চৌধুরি যাকে বলেন একদিন ভারতের ক্রীড়াচার্য হবে। সেই বিল্টু দাস রাগে ঘেন্নায় অঙ্কের বই-খাতা কলম-পেনসিল-ইরেজার সব ফেলে ওপরে ছাদে উঠে এল, মনটা একটু হালকা না হলে অঙ্কর কোন চানস্ নেই। মাথার ওপরে নীল আকাশ, পড়ন্ত শীতের রোদ্দুর, মস্ত বড় একজোড়া ডানা মেলেছে। আর সেই আকাশে উড়ছে রঙিন পাখির মতো চকচকে ছোট ছোট ঘুড়ি। চড়া হলুদ, চড়া লাল, গাঢ়-সবুজ, ঘন নীল আর উজ্জ্বল বেগ্নি রঙের। একরকম ঘুড়ি তো চট করে চোখে পড়ে না। আশ্চর্য পালিশ-করা চকচকে। আর ঘুড়ির মধ্যে ওগুলো কাদের মুখ। মুহূর্তে নিচে নেমে যায়। বাবার দামি বাইনোকুলারটা নিয়ে আসে। চোখে লাগিয়ে যা দেখে তাইতে এতক্ষণের রাগ দুঃখ জল হয়ে যায়। হলুদ ঘুড়িটার গায়ে আর কারও ছবি নয়। স্বয়ং পেলের। আরেকটার গায়ে মারাদোনার খোকা-খোকা মুখ, মাথায় ঝাঁকড়া চুল। ওদিকে নীল ঘুড়িটার গায়? ও আর কাউকে বলে দিতে হয় না। ক্রিকেটের রাজা গাভাসকার। তবে যা শুনছিল বিলটু দাস কথাটা কি সত্যি? ওদের পাড়ার খোকন সান্যালের সেজ মামা জাপানে গেছে নতুন ধরনের ঘুড়ি-লাটাই-সুতোর কাজকম্ম শিখতে। ইন্ডিয়ায় এসে তারই ব্যবসা করবে। একেবারে নতুন ধরনের বিজনেস। পলিথিনের ঘুড়ি, নাইলনের সুতো আর প্লাসটিকের লাটাই। পলিথিনের চড়া রঙের ঘুড়ির মাথায় মাথায় ঘুরছে আকাশের গায়ে দিগ্বিজয়ী খেলোয়াড়রা। ছাদের ওপর লাফ মেরে মারাদোনার মুখ-আঁকা ঘুড়িখানা ধরতে ইচ্ছে হলেই বারবার বলতে ইচ্ছে হল অঙ্ক না অঙ্ক না মারাদোনা মা-রা-দো-না। ওই তো ওদের বাড়ি থেকে প্রায় পঁচিশ খানা বাড়ি দূরে। সেই বাড়ির ছাদের ওপর থেকে আকাশে উড়ছে মারাদোনা। চিৎকার করে বলতে ইচ্ছে

করছে অঙ্ক আমি পারব না মারাদোনা মারাদোনা.। খোকন সান্যালের সেজমামা নিশ্চয় জাপান থেকে ফিরেছেন। না হলে সে এমন মজা করে এই সব ঘুড়ি শূন্যে ছাড়তে পারে। সমস্ত আকাশে আকাশে ওদের কথা। সারা দুনিয়া বুঝি তাকিয়ে আছে ওই ঘুড়িগুলোর দিকে। খোকন সান্যালের জয়। জয় সান্যালের সেজমামার জয়। খোকন সান্যালের সঙ্গে দেখা করে জিজ্ঞাসা করতে হবে মারাদোনামার্কা ঘুড়ির দাম কত। আর খোকন সান্যাল যদি বেশি চালাকি করে, সোজাসুজি চলে যাবে সেজোমামাব কাছে। পাড়ার নামজাদা ফুটবলার বলে বিল্টু দাসকে তিনি বিশেষ স্নেহ করেন।

ছাদ থেকে নিচে নেমে বিল্টু দাস দেখে এক কাণ্ড ঘটে গেছে ছোট বোন পিঙ্কি সব কটা অঙ্ক করে ফেলেছে। ছবির মতো পর পর সাতখানা অঙ্ক। অঙ্কর টিচার গৌতম বাবু, গৌতম ঘোষ একবার বলেছিলেন, তোকে সতরো নম্বর দিতে গিয়ে তোর খাতায় অঙ্ক খুঁজেছি সতরো বার। এত কাটাকুটি করেছিস যে অঙ্ক কোথায় খুঁজে পাই না। আমার সতরোখানা খাতার টাইম নিয়েছিস তুই। আর পিঙ্কি? পিঙ্কি কি শুধু অঙ্কগুলোই করে রেখেছে নাকি? তারকাচিহ্ন দিয়ে সুন্দর অক্ষরে ছোট ছোট করে লিখে রেখেছে—আগের বার অঙ্কে পেয়েছিলি তেইশ এবার কি আরও কম পাবি? যদি পাশ না করিস তো বাড়ির দরজা কোন দিকে জানিস তো? অঙ্ক করা আর গোল দেওয়া এক কাজ নয়। হাত পা ছুঁড়লে কি আর অঙ্ক হয়ে রে? পিঙ্কু।

এবারে রাগ আর চেপে রাখতে ইচ্ছে করে না। অঙ্কের বই না। পিঙ্কির মাথাব রেশমের মতো চুলের রাশি দিদিমার সেলাই-এর বড় কাঁচিখানা দিয়ে নিমেষে কুচি কুচি করে ফেলে। দেখুক পিঙ্কি আয়নায় নিজের মুখখানা। দেখতে কেমন লাগে। অঙ্ক জানে বলে এতো অহঙ্কার। সেও কাঁচি চালাতে জানে। কেন? যখন সে মজাব মজার স্টিকার জোগাড় করে তখন? তখন চাইতে আসিস কেন? একটা চার্লি চ্যাপলিনেব স্টিকার দিবি দাদা? এবার আনলে দেব কাঁচ কলা। বাড়িতে অঙ্ক বিজ্ঞান পড়াতে আসেন রতনতনু বাবু। অঙ্কে দারুণ ওস্তাদ পিঙ্কির মতো মেয়েকে চমক লাগিয়ে দিয়েছেন। পিঙ্কি বলে কমপিউটারের চেয়েও তাড়াতাড়ি চলে ওর মাথা। দুঃখ করে বললেন রতনতনু বাবু, সারাদিনে তুমি একখানাও পারলে না বিল্টু। এবার পাশ না করতে পারলে যে কি হবে আমার। এ যেন রতনতনুবাবুরই পরীক্ষা। মনটা তাঁর খুব নরম। বিল্টু দাসেব জন্যে বিশেষ চিন্তায় পড়ে গেছেন। পিঙ্কির অঙ্কে রীতিমত মাথা দেখে একটা বিলেতি পকেট ক্যালকুলেটর প্রেজেন্ট করেছেন। মেজর বিল্টু দাসকে নরম গলায় কতো বাব বলেছেন, বিল্টু লোডশেডিং হলেই তুমি বই বন্ধ করবে। বিদ্যাসাগরের কথা শুধু বইতেই পড়েছি। কাজে আর লাগাইনি। গ্যাসের আলোয় নাকি তিনি পড়াশুনো করেছেন শোনা যায়। পয়সার অভাবে। আর একটু লোডশেডিং হলেই আমাদের চোখে ঘুম। কেন হ্যারিকেন কি মোমবাতি জ্বালা যায় না? আর এ কথাটা মনে এলেই মনে পড়ে যায় দিদিমার সঙ্গে মা-র কথা আর তর্ক। দিদিমা তো মাস্টারমশায়ের কথা শুনে একেবারে বেগেমেগে টং। মা-কে ডেকে বললেন, রমা, ডাক তোদের মাস্টারকে। মার নাম মনোরমা। রেগে গেলে দিদিমা ডাকেন রমা বলে। না হলে অন্য সময় আদর করে ডাকেন মনো বলে। কেন কি হয়েছে? কেন কি হয়েছে তুই শুনিসনি তোর ছেলের মুখ থেকে? দিদিমা তেড়েফুঁড়ে উঠলে মা ভয় পায়। বলে, বলই না কি হয়েছে?

মাস্টার তোর ছেলেকে বিদ্যাসাগর বানাবে। তোর বাবা সারা জীবন কলেজে পড়িয়ে গেল। চশমা দেখেছিলি কোনওদিন চোখে? কেন জামাই? সে তো এম এস সি পাস।

চশমা চোখে বিল্টুর বাপ অফিস গেছে ? বিল্টুর চোখে ঠুলি না পরালে চলছে না ? দরকার নেই চোখ কানা করে বিদ্যাসাগর হওয়ার। চোখের ডাক্তাররা কাঁড়িকাঁড়ি টাকা গুনবে আর দেশ জুড়ে বিদ্যাসাগর তৈরি হবে। ওই এক বিদ্যাসাগর-ই যথেষ্ট। বিল্টুর মা মনোরমা একথার উত্তরে যুক্তি খুঁজে পাননি। রতনতনু বাবুকে ডেকে বলেছেন, মাস্টারমশাই বিল্টুর চোখে একটু গোলমাল দেখা দিয়েছে। লোডশেডিং-এর সময় ওকে বই খুলতে বারণ করেছি। এই বয়সে যদি চোখের গণ্ডগোল দেখা দেয়— রতনতনু বাবু একটু অপ্রতিভ বোধ করেন। বিল্টুর মাকে আর কথা শেষ করতে দেন না। বলেন, ঠিক আছে। মানে পড়াশুনোর চাপ ওদের দিনে দিনে এত বাড়ছে, মানে ওদের সিলেবাস এত ভারী হচ্ছে দিন দিন। বিল্টুর মা মাস্টার মশায়ের কথা সবটাই বুঝতে পারেন। পড়ার চাপ বাড়ছে আর বিল্টুকে পড়ার সময় বাড়াতে বললে অসুবিধে আছে। লোডশেডিং-এর সময় সে হ্যারিকেন জ্বেলে পড়তে পারবে না। তাকে চোখ বন্ধ করে রাখতে হবে। এদিকে বিল্টুর মা কি করেন। কথাটা তো তাঁর ইচ্ছে অনিচ্ছে নিয়ে নয়। তাঁর মা-র বিল্টু দাসের দিদিমার। মা-র ওপর কথা বলার সাহস মনোরমার নেই। তিনি কথাটা সোজাসুজি না বলতে পেরে মাস্টারকে তাই ঘুরিয়ে বললেন। আর পড়াশুনোর চাপের কথাই যদি ওঠে সেদিন বাসে যা ঘটেছিল ভাবলে বিল্টুর মজা পাবারই কথা। বই খাতা পেন্সিল বক্স এটা সেটায় স্কুল ব্যাগ এমন ফুলে উঠেছে যে রীতিমতো ভারী বোঁচকার মতো লাগছে পিঠের ওপর। সিট না-পেলে যে কি অবস্থা কে বোঝে। এদিকে একজন বলেন, খোকা ব্যাগটাকে সামলে নাও, হ্যাঁ এইবার একটু সোজা হয়ে দাঁড়াও। পর মুহূর্তেই আরেক পাশ থেকে একজন বলেন, কি হল খোকা, এ যে দেখছি ঠেলতে ঠেলতে দরজার কাছে আনলে। শেষকালে একজনের দয়া হল। বসেছিলেন, বললেন, দাও তোমার ব্যাগটা দাও। কাঁধের ওপর থেকে স্ট্রাপ আলগা করে বিল্টু ব্যাগ ভদ্রলোকের হাতে দেয়। পাশে বসেছিলেন এক বেশ বৃদ্ধ ভদ্রলোক বললেন, কি আছে খোকা এর ভেতরে ? বিল্টু দাস সোজাসুজি উত্তর দেয়, বইপত্তর। ভদ্রলোক শুনে বললেন, কত বছরের ? বিল্টু দাসকে চুপ করে থাকতে দেখে বলেছিলেন, আমি ভাবছিলাম লাগেজ নিয়ে হাওড়া কিম্বা শেয়ালদায় চলেছ।

পরে ভেবে দেখেছিল কথাটা নেহাত মিথ্যে নয়। পিঠে বাস্তবিকই ভারী বোঝার মতো লাগে। আর পড়ার চাপের কথাটা ভাবলে বাড়িতে তো প্রায় সকাল বিকেল আলাপ আলোচনা চলেছে। বাবার দুশ্চিন্তার শেষ নেই। আর মা ? এত বই পত্তর পড়ে বছরে বছরে ক্লাসে উঠে, শেষ কালে করবেটা কি ? বাবা বলেন, ভাল করে লেখাপড়া করলে ডাক্তারি-পড়তে পারত। মা শুনে বলে, পড়াশুনোয় একেবারে মন নেই। ডাক্তারি ইনজিনিয়ারিং কি এই ছেলেকে দিয়ে হবে ? বাবা বলেন, কোন টেকনিক্যাল লাইনেই যেতে হবে। জেনারেল লাইনে তো কিছুই হবে না। দুজনেরই সমান মাথা ব্যথা বিল্টু দাসকে নিয়ে। সে নিজের কথাটা কাকে বোঝায়। দিদিমা বোধ হয় খানিকটা বোঝে।

বাবা-মার কথায় বাধা দিয়ে দিদিমা বলেন, দৌড়ঝাঁপ করে বেড়াবার বয়স। এখুনি ডাক্তার হবে না ইঞ্জিনিয়ার হবে শুনি। মা উত্তর দেয়, এখন থেকে না ভাবলে পরে কি করবেটা শুনি ? কেন পিঙ্কি কি মেয়ে নয় ? ওর খেলতে ইচ্ছে করে না। দিদিমা এবার ঝাঁঝিয়ে ওঠে, কি খেলবে শুনি। বই নিয়ে পাঁচবার নিচে নামতে হাঁপিয়ে ওঠে। ওই বয়সে দশবার পুকুর সাঁতরেছি। মা থামে না। বলে, মেয়েরাই আজকাল লেখাপড়া করছে। এটা তো মান ? দিদিমা একই রকম চড়া গলায় বলেন, না মানি না। তোরা কি

একটা চোখে দিখিস ? কেন, ওর কাপ মেডেলগুলোর দিকে কি একবারও চোখ পড়ে না। মা বলে, তবে ওইগুলোই বিক্রি করে খাবে। বাবা আস্তে আস্তে উঠে চলে যান। যেন কোনটা ভাল কোনটা মন্দ তোমরাই বিচার কর।

বিল্টু দাস ভেবে দেখে আসলে তিনজনই তাকে সাপোর্ট করে। বাড়িতে দিদিমা আর স্কুলে গেম্‌স মাস্টার দ্রোণাচার্য চৌধুরী আর পতিতপাবন সিংহরায়। আগে দার্জিলিং-এ কোথায় পড়ত সাহেবি স্কুলে। তারপর সেখান থেকে সোজা তাদের স্কুলে। দারুণ গেম-মেকার। ওরই জন্যে সব গোল দেয় বিল্টু দাস, সুটার নাম্বার ওয়ান। আগে যে-স্কুলে পড়ত সেখানে ছেলেরা নাম দিয়েছিল পোটেটো প্যান সিং রে। সেই থেকে এখানেও পোটেটো প্যান। বিল্টু দাসই কায়দা করে এটা আবিষ্কার করেছিল। স্কুলে এসে বিল্টু পিঙ্কির সব কথা পোটেটো প্যান্‌কে বলল। পটেটো প্যান বলল, ঠিকই বলেছে পিঙ্কি। এবার অঙ্কে আরও কম পেতে হবে। তার মানে ? চমকে ওঠে বিল্টু। মানেটা খুব ইজি। তেইশ এর নিচে তের নয় একেবারে দশ। তোকে দশ পেতে হবে। অঙ্কে দশ নম্বর পেতে হবে। একনম্বরও বেশি কিম্বা কম নয়। দশ নম্বর জার্সি পরতে হবে। আর রোল নাম্বারটা করে নিতে হবে দশ। ওটা ক্লাস টিচার দেবীপ্রসাদ পাকড়াশিকে বললেই ঠিক হয়ে যাবে। তবে অঙ্কের টিচার শিশির বাবু খুব কড়া লোক। ব্যাগড়া দিতে পারে। ওকে চোখে চোখে রাখেন। ফেলকরাদের লিস্টে ওর নাম আছে। সন্দেহ করতে পারেন রোল নাম্বার চেঞ্জ করতে চায় কেন। কথার শেষে কাঁধে ঝাঁকুনি দিয়ে পোটেটো প্যান বলেছে, এবার ক্লিয়ার হয়েছে ? বিল্টু বুঝতে পারে ক্লিয়ার না হওয়ার কি আছে। দশ নম্বর মানেই তো পেলে কিম্বা মারাদোনা। পতিতপাবনের আইডিয়াটা তো ফাইন। গোলের সমস্ত আইডিয়া আসে পতিতপাবনের মাথায় ? শুধু বলটাকে গোলের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব তার। সে মাথা দিয়ে হোক, হাত দিয়ে কি পা দিয়ে। কি ভেবে পোটেটো প্যান বলল, পিঙ্কিকে জবাব একটা দিতে হবে। তবে এখন না। ম্যাচটা আগে হয়ে যাক।

ম্যাচের কথায় বিল্টুর মনে পড়ে যায় রানী স্বর্ণ স্যাকরানি মেমোরিয়াল কাপের কথা। তাদের ক্রাউচ লেনে চকোলেট সোলজারস খেলবে রিনি পার্কের প্ল্যাস্টিক বুলেট্‌স এর সঙ্গে। এর আগে প্ল্যাস্টিক বুলেট্‌স একবার ওয়াক ওভার পেয়েছিল। চকোলেট সোলজারস-এর তিন জন খেলোয়াড় ময়দানে খেলার জায়গা খুঁজে পায়নি। বিল্টু দাস আর পোটেটো প্যান সিংরে দুজনে গিয়ে দ্রোণাচার্য স্যারের সামনে দাঁড়াল। বিল্টুর মুখটা ভারিভারি লাগছিল। দ্রোণাচার্য জিজ্ঞাসা করলেন কি ব্যাপার বিল্টু ? অপমানের কথা চেপে রাখতে পারল না। সব কথা খুলে বলল। দিদিমার সাপোর্টের কথাটাও বলল।

শুনে দ্রোণাচার্য বলেন, কেউ তো তোমার মাথায় হাত রাখবেই। দিদিমা রেখেছেন। আমিও রাখি। এই আমার কথাই ধর না। কারও সাপোর্ট কি আমি পেয়েছি ? না তোদের বাড়ির না স্কুলের কেউ চায় না তোরা ফুটবলার হ। বাড়ির লোক চায় ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, অফিসার। আর স্কুলে পরীক্ষায় ফেল করলে শাস্তি আছে। কিন্তু স্কুল থেকে খেলোয়াড় হওয়ার জন্যে ?

পিঙ্কির অপমানে যেমন রাগে জ্বলেছিল, দ্রোণাচার্য স্যারের কথায় তার চোখে জল এসেছিল। চোখের জল দাঁত চেপে মুখ বেঁকিয়ে সামলে নিল।

পটেটো প্যান আর বিল্টু প্রায় একই সঙ্গে বলেছে, সামনের রবিবার খেলা স্যার। আমাদের পাড়ার সঙ্গে রিনি পার্কের। রানী স্বর্ণ স্যাকরানি মেমোরিয়াল কাপ জিততেই

হবে স্যার। আপনি আশীর্বাদ করুন স্যার। দ্রোণাচার্য বাবু সঙ্গে সঙ্গে বলেছেন, আমি তোকে মানে তোদের আশীর্বাদ করব না তো করব কাকে ? দুহাত রেখেছেন দুজনের মাথায়। পরে বিল্টু বলল, স্যার, পুরস্কার বিতরণের দিন আসতে হবে। সভাপতি হতে হবে। আচ্ছা আচ্ছা, এক কথায় রাজি হয়ে যান দ্রোণাচার্য। পিঙ্কির কথায় খোঁচাটাই যেন বেশি কাজ করল। আর বুদ্ধি বটে পতিতপাবনের। বিল্টুকে মাস্টার মশাইদের কায়দায় বলল, ধর তোকে সত্যি সত্যি মারল না। কেউ শুধু মুখে বলল গালে এমন একটি চড় মারব না। তুই গালে হাত দিয়ে দেখলি চড়ের দাগ আছে কিনা। তোকে যখন কেউ বলে, বাড়ি থেকে বেরিয়ে যা, এক্ষুনি যা। তুই কি সত্যি বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলি ? হয়তো সেদিনই সবচেয়ে ভাল খাবার বেশি বেশি করে খেলি। আসলে অপমান। তুই পিঙ্কিকে দেখিয়ে দে। দরজার বাইরে এই পা রাখলাম। স্বর্ণ স্যাকঁরানি মেমোরিয়াল কাপ না নিয়ে এ দরজা দিয়ে আর ঢুকব না।

পোটেটো প্যানের হাতে হাত রেখে বিল্টু দাস শপথ নিল।

রবিবারের বিকেল। ছেলে ছোকরার দল যেন মিছিল করে এসেছে। দু দলের সাপোর্টারের চিৎকারে মনে হচ্ছে ময়দানের সভাতেও বুঝি এত লোকের ভিড় হয় না। ওল্ড ব্যারাকপুরের কাছে নবকুরুক্ষেত্র গ্রাউন্ড বিখ্যাত ফুটবল মাঠ। চকোলেট সোলজার্স এক গোলে এগিয়েছিল। দুবার হেড মিস করে বিল্টু দাসের মেজাজ গেল খারাপ হয়ে। সে হ্যান্ডবল করে বসল বেপরোয়া হয়ে। ভুলে গেল দ্রোণাচার্যর কথা। মাথা ঠাণ্ডা রাখতে। ওই ভাবে মাথায় টোকা মেরে বল চলে গেলে কি মাথা ঠিক রাখা যায়। গোলকিপারও তেমনি। বল বাইরে চলে যেতে পারত। এমন বডি থ্রো করল যে নিজেই পা দিয়ে গোলে ঠেলে দিল বলটা। দর্শকদের কেউ কেউ বলল, বিল্টু দাসের মাথায় গণ্ডগোল। কেউ কেউ বলল গোলকিপার মৈনাকের পা কেটে দাও। যাই হোক শেষ পর্যন্ত পোটেটো প্যান রক্ষা করল। প্রমাণ করল আরেকবার। গেম-মেকার বটে। গোলের সামনে বল ফেলা নয়। বলের সামনে গোলপোস্ট তুলে এনে বসিয়ে দিল আর সে বল কি বিল্টু দাসের মতো সুটারের কাছে লেফ্‌ট ফুটার নয়। দু গোলে চকোলেট সোলজার্স জিতে গেল। কুরুক্ষেত্র থেকে মাথা নিচু করে প্ল্যাস্টিক বুলেটস পরাজিত হয়ে ফিরল। সবচেয়ে আশ্চর্য পরদিন খবর দেওয়ার আগেই দেখা গেল দ্রোণাচার্য আগেই খবর পেয়ে গেছেন। বিল্টু দাস বলে মাথা ঠেকাতে পারেনি। মৈনাক পেনালটি কিক্ থেকে গোল শোধ করেছে। শেষে মাথা দিয়েই দলের মাথা উঁচু রেখেছে বিল্টু। আর আসল মাথা পটেটো প্যানের। গোলের জন্যে যত মাথা ব্যথা তারই। অভিনন্দন জানালেন দুজনকে—বললেন অম্লান জ্যোতির কাছে থেকে সব খবরই পেয়েছেন। তাঁর বেণীমাধব দত্ত লেনের বাড়ির দু চারখানা বাড়ির আগেই থাকে সে। একেই বলে গেমস মাস্টার। শুনে সব মুখস্থ রেখেছেন। খেলার আগেই তিনি খেলার বিবরণ বুঝি খবরের কাগজের জন্যে তৈরি করে ফেলেছেন।

রতনতনু বাবু কামাই কি জানেন না। রবি ঠাকুরের গৃহশিক্ষকের মত কাঁটায় কাঁটায় ঘড়ি ধরে আসেন। সন্ধে হলেই নিয়মিত আলো চলে যাচ্ছে কদিন। সব ব্যবস্থাই বিল্টু দাসের সুবিধের জন্যে পাকাপাকি। সিঁড়ি দিয়ে উঠে বারান্দার মুখে দাঁড়িয়ে ডাকেন, বিল্টু তুমি কি পড়ার ঘরে ? দিদিমার কানে যায় ডাক। বলেন, এ হতচ্ছাড়া অন্ধকারে কোথায় রান্না ঘর কোথায় পড়ার ঘর, ঠাওর করা যায় কিছু ? রতনতনু বাবু ভাবলেন কথাটা মিথ্যে নয়। এই সেদিন কোন একটা ম্যাগাজিনে পড়ছিলেন। মজাই পেয়েছিলেন— হঠাৎ

কারও লাথির জোরে হ্যারিকেনের চিমনি ভাঙল এবং চেঁচিয়ে ওঠেন বাড়ির বড় গিন্নী—সব্বোনেশে লোডশেডিং-এর জন্য গেল প্রাণটা'।

ছোট্টু ওরে বিচ্চু তোরা আসিসনে এখানটায়।

বিল্টু দাস স্বয়ং হ্যারিকেন এনে রতনতনুকে পড়ার ঘরে নিয়ে গেল। চট করে কিছু বলার সাহস পাননা তিনি। দিদিমা কাছে পিঠেই কোথাও থাকতে পারেন। নিচু গলায় সভয়ে বললেন, অঙ্ক কিছু করলে বিল্টু? বিল্টু দাস আসলে অন্ধকারে সারাক্ষণই অন্য কথা ভাবছিল। ভাবছিল কি ভাবে দ্রোণাচার্য বাবুর হাত থেকে স্বর্ণ স্যাকরানি মেমোরিয়াল কাপটা নেবে। গোল দেবার সময় যে হাততালি সেই রকম আবার আরেকবার। বিশেষ প্রাইজ ডিক্লেয়ার করেছেন পাড়ার নামজাদা এ্যাডভোকেট সৌম্যকান্তি ব্যানার্জি। টিমকে দেবেন নগদ দুটি হাজার টাকা। ছেলেরা ভাগবাঁটোয়ারা করে নেবে নিজেদের মধ্যে। এই সব ভেবেই বিল্টু দাস রতনতনু বাবুকে অনুরোধ করেছিল। যদি তিনিও আসেন সেদিন পুরস্কার বিতরণী সভায়। রতনতনু বাবু দুঃখ করে বললেন তিনি নিরুপায়। তাঁর তো পরীক্ষায় পাসের জন্যে পড়া নয়, চাকরির জন্যে পরীক্ষার পড়া। চাকরি তাঁকে একটা পেতেই হবে। বাবা দেশ থেকে চিঠি দেন নি তো, নোটিশ কিম্বা টেলিগ্রাম পাঠিয়েছেন। শুনে বিল্টু দাস চুপসে যায়। যে ভাবেই হোক যেমন একখানা স্কোর করে, মাস্টার মশাইকেও মনে হয় সেই ভাবে একটা চাকরি দিয়ে দেয়। মাস্টার মশায়ের জন্যে একটু দুঃখ হয়। রাগ হয় দিদিমার ওপর। কি দরকার তার হয়ে লড়াই করার।

পাড়ার মস্তবড় লাইব্রেরি ম্যানসান অফ মডার্ন থট্স। সৌম্যকান্তি বাবুর বাবা ঠাকুর্দা একসময় অনেক টাকা দিয়েছিলেন লাইব্রেরি ঘরের জন্যে। বেশ জমজমাট মনে হচ্ছে। মেমোরিয়াল কাপ মেডেল সোনার গয়নার মতো সাজানো। দ্রোণাচার্য স্যার বসেছেন নিজের জায়গায়। পাশে সৌম্যকান্তি ব্যানার্জি। তাঁর পাশে পাড়ার এম এল এ হিমাদ্রি রায় চৌধুরী। পিঙ্কি ভাল রকম জানে এসব কিছুর কথা। হয় হিংসুটের মতো আসবে না। না হয় গা ঢাকা দিয়ে থাকবে ভিড়ে কোথায়। পরে বলবে সে কিছুই দেখেনি। কিছুই জানে না। প্রথমটা রাগ হল। এমনই হিংসে একবার দেখতে এল না, চ্যালেঞ্জ কাপটা কি ভাবে দুহাতে তুলছে। আবার দুঃখে চোখে জল এসে যায়। মনে হয় চেঁচিয়ে বলে, পিঙ্কি একটি বার দেখে যা রানি স্বর্ণ স্যাকরানি মেমোরিয়াল কাপের বহর খানা। পোটেটো প্যানকে ডেকে বলল, খোকন সান্যালকে ডেকে আন। সে বলল, থাকলে আমি খুঁজে বার করবই। তবে যদি ছদ্মবেশে থাকে। তা-ও অসম্ভব নয়। পিঙ্কি চালাকি করে তাও করতে পাবে। দুঃখ নয় রাগে ফুটতে থাকে গরম জলের মতো বিল্টু দাস ভেতরে ভেতরে। দ্রোণাচার্য বাবু সবাইকে ধন্যবাদ দিয়ে বললেন, মাঠ বলতেই মনে আসে যেখানে দশ বিশটা গরু ঘুরে বেড়াচ্ছে। কিংবা কটা ছাগলে ঘাস পাতা চিবুচ্ছে। কি করে মনে আসবে খেলার মাঠের কথা। খেলার কথাটা কি কারও একবার মাথায় আসে? দুনিয়ায় সবাই সব কিছু হবে। কিন্তু ভুলেও খেলোয়াড় হবে না। বাড়ির কেউ চায় না ছেলেটা পড়ার ফাঁকে খেলার মাঠের দিকে একবার উঁকি মারুক। এই আমার কথাই ধরা যাক। স্কুল থেকে বেরিয়ে ক-টা ছেলে আমাকে এসে বলেছে, খেলোয়াড় হতে চাই। তবে সুখের কথা, আজ পৃথিবীটার চারি পাশে তাকিয়ে দেখছি অন্য একটা ছবি। দ্রোণাচার্য স্যার লাইব্রেরি হলের চারিপাশটায় একবার ঘুরলেন। পরে থেমে বললেন, ছবিটা কি? তেমন জাতের একজন খেলোয়াড় হলে, একটা দেশ না হোক, একখানা গ্রাম গঞ্জ বা ছোট শহর কিনে নিতে পারে। সবাই এক চোট হাত তালি দিল কথাটা শুনে।

সৌম্যকান্তি ব্যানার্জি আর হিমাদ্রি বাবু মাথা উঁচু করে তাকালেন দ্রোণাচার্যের দিকে। মা বাবা পিঙ্কি সবাই কথাটা একবার নয় দশবার শুনুক। বিল্টু দাস এতদিনে সবাইকে হাতের মুঠোয় পেয়েছে। শেষকালে সৌম্যকান্তি ব্যানার্জি কাপ তুলে দিলেন বিল্টু দাসের হাতে। আর মেডেল ভাগ করে দিলেন দু-দলের খেলোয়াড়দের মধ্যে। নগদ দুটি হাজার টাকা তুলে দিলেন বিল্টুর হাতে। আবার হাততালির ধুম। কানফাটানো হাততালি। বিল্টুর মনে হল একটিবার, পিঙ্কি নিজেও হাততালি দিচ্ছে না তো ? কিন্তু কোথায় পিঙ্কি। আজ সন্ধে বেলাতেই তার অঙ্কের কথা বেশি করে মনে পড়েছে।

যাক বিছানায় হাত পা ছড়িয়ে বিল্টু আবাম বোধ করল একটু। গৌতমবাবুর খোঁচা, পিঙ্কির ঠাট্টা, বাড়ির লোকজনের তাড়া এ সব কিছু সে কিছুক্ষণ ভুলে থাকতে পারবে। রানি স্বর্ণ স্যাকরানি নাম হলেও আসলে কাপটা রুপোর। হোক না রুপোর। তাই বা কি কম। কাল রতনতনু বাবু এসে অবাক হয়ে যাবেন। চোখের সামনে কাপটার দিকে তাকিয়ে বিল্টু দাসের চোখে ঘুম এল।

রতনতনু বাবু আসার আগেই সে কাপটাকে ঘষে মেজে আরও উজ্জ্বল করল। পড়ার ঘরে টেবিলের ওপর রাখল। মাস্টার মশাই ঘরে ঢুকলেই তাঁর চোখে পড়বে। বড় টেবিলের দুপাশে দুজনের বই পত্তর। পিঙ্কি সাজিয়ে রাখবে অঙ্কের বই খাতা। আর সে ? আজ একখানাও বই রাখবে না। থাকবে শুধু রানি স্বর্ণস্যাকরানি মেমোরিয়াল কাপ। পিঙ্কির চোখ না পড়ে যাবে কোথায়।

ঘড়ি দেখছে বিল্টু দাস। এতো ঘড়ি দেখে রতনতনু বাবুর সময় ঠিক করা নয়।

রতনতনু হাতে ঘড়ি পরেন না। কামাই নেই। সময়ে নড়চড় নেই। বাংলা বন্ধ হলেও তিনি দরজা বন্ধ রাখেন না। বাইরে বেরিয়ে আসেন। আশ্চর্য আজ আর লোডশেডিং নেই। ঘরের অতি উজ্জ্বল আলোয় কাপের জৌলুস ঠিকরে পড়ছে। সেই সময় রতনতনু বাবুর গলা শোনা গেল সিঁড়ির ওপরে বারান্দার মুখে, বিল্টু পড়ার ঘরে ? লাফিয়ে বেরিয়ে আসে বিল্টু। কিন্তু অবাক কাণ্ড। সে ভেবেছিল মাস্টার মশাই ঘরে পা ফেলে অবাক হয়ে যাবেন। তিনিই অবাক করলেন বিল্টু দাসকে। বেশ কাপটা, বেশ। সিলভার কাপই বটে। কাল তো দেখলাম। তুমি তোমার টিচারের হাত থেকে নিলে। অনেকে দেখলাম ছবিও তুলে নিল।

আপনি লাইব্রেরিতে এসেছিলেন মাস্টার মশাই ? বিল্টু দাসের কথা প্রায় আটকে যায়।

রতনতনু বাবু বলেন, না না তোমাদের ওই ম্যান্‌স্যান অফ মডার্ন থট্‌সে যাইনি। ওর পাশের বাড়িটা থেকেই দেখছিলাম। সব স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। মাইক্রোফোনে সব কথাও স্পষ্ট কানে আসছিল। পিঙ্কিই বলল, চলুন মাস্টার মশাই।

বিল্টু দাস মুহূর্তে বুঝতে পারল রতনতনু বাবু সর্বমঙ্গল গার্লস স্কুলের হেড মিসট্রেস করুণাকণা ঘোষ জয়ার কথা বলছেন। পড়াশুনোয় মাথা আছে বলে পিঙ্কিকে নানান বই পত্তর দেন। পিঙ্কিকে বিশেষ স্নেহ করেন। রাগ করবে না খুশি হবে। বিল্টু দাসের মাথায় আসে না। রাগই হয়। ছদ্মবেশ না পরুক গোয়েন্দাগিরি তো করেছে বটেই। দ্রোণাচার্য স্যারের কথা তবে শুনেছে পিঙ্কি। না, পিঙ্কিকে হাতের মুঠোয় পেয়েছে। এবার যাবি কোথায়।

রাতে শুতে যাওয়ার আগে একটা কাণ্ড করল বিল্টু দাস। পিঙ্কির অঙ্কের খাতা খুলে একখানা পাতায় বড় অক্ষরে লিখল, দ্রোণাচার্য স্যারের কথা শুনলি তো ? সব অঙ্ক করতে পারলে একশোর মধ্যে একশো পাওয়া যায়। স্টেডিয়ামে মারাদোনা একখানা গোল

দিলে, হাজার হাজার দর্শক হাততালি দিলে কতো শব্দ হয় বলতে পারিস ? পারিস যদি বলব অঙ্ক জানিস। অঙ্ক না মারাদোনা। অক্ষর খাতায় রোজ দশবার করে লিখবি।

খাতাখানা পিঙ্কির বালিশের নিচে রেখে দিল।

বিল্টু দাসের চিঠিতে অনেক বানান ভুল ছিল। পিঙ্কি সাহস করে মুখ ফুটে কিছু বলতে পারল না। চিঠির অক্ষরগুলো তো কিছু নয়। শাদা পাতার ওপর চুপচাপ পড়ে আছে। কানে বিল্টুর কথাগুলো গমগম করছিল।

পিলকিন'স ইলেভেন

বিমল কর

পিলকিনসাহেবকে আমরা বলতুম পিলপিলসাহেব। কেন বলতুম জানি না। বোধহয় সাহেবের চেহারার জন্যে। মাথায় বেশ লম্বা, চেহারায় রোগা। ঢ্যাঙা চেহারার মানুষকে এমনিতেই দেখতে রোগা-রোগা লাগে ; তার ওপর যদি সে সত্যিই রোগাটে হয়— তাকে কেমন লাগবে দেখতে ? তালগাছ, না, সুপুরিগাছ ? তা যেমনই লাগুক পিলকিনসাহেবের পিলপিল নামটাই চালু হয়ে গিয়েছিল।

আমাদের কোলিয়ারিটা ছিল বড়। সাহেব কম্পানির কোলিয়ারি। সাহেবসুবোদের ম্যানেজার করে পাঠানোই রেওয়াজ হয়ে গিয়েছিল মালিকদের। পিলকিনসাহেব যখন এলেন তখন তাঁর বয়েস চল্লিশ হয়ে গিয়েছে। মানুষটি কাজের ছিলেন, ভাল ছিলেন। মজার ছিলেন। তাঁর যথেষ্ট নামডাক হয়েছিল কোলিয়ারি মহলে।

পিলপিলসাহেবের শখ বলতে ছিল তিনটে জিনিস। গাড়ি, বাগান আর ফুটবল। সাহেবের একটা টু-সিটার হিলম্যান গাড়ি ছিল। রঙ ছিল টকটকে লাল। সেই গাড়িতে একটা আঁচড় পড়লে সাহেবের সর্দি ধরে যেত মনের দুঃখে। আর ম্যানেজার পিলকিনের বিশাল বাংলো বাড়িতে গাছের অভাব ছিল না। মস্ত বাগানে দু-দুটো মালি সারাদিন কাজ করত। নানা জাতের নানা বাহারের ফুল ফুটত বাগানে। বাঙালিবাবুরা বলতেন, পিলপিলের নন্দনকানন।

গাড়ি আর বাগান নিয়ে পিলপিলসাহেবের যতই মায়া-মমতা থাক— তাঁর প্রাণ বলতে ছিল 'পিলকিন'স ইলেভেন'। পিলকিন'স ইলেভেন মানে সাহেবের কোলিয়ারির ফুটবল টিম।

ছোট সাহেবদের মধ্যে পিলকিন'স ইলেভেন নিয়ে হাসিঠাট্টা হত। কেউ বলতেন, পিলকিনের এগারোটি বাঁদর ; কেউ বলতেন, এগারোটা ধেড়ে বজ্জাত ; কেউ বা বলতেন, সাহেবের পোষ্যপুত্র সব।

এঞ্জিনিয়ার সেনগুপ্তকাকা বলতেন, "মেমসাহেব মারা গিয়েছেন, মেয়ে দেরাদুনে থেকে পড়াশোনা করে, সাহেব কী নিয়ে আর থাকবেন ! তাই ওই পিলকিন'স ইলেভেন। খ্যাপা মানুষ। তা ছাড়া পিলকিন নিজে একসময় খেলাধুলো করতেন তো ! তাই এত সব।"

আমাদের কোলিয়ারিতে ফুটবল খেলার রেওয়াজ তেমন ছিল না। বাচ্চাকাচ্চারা খেলতুম। বড়রা আর খেলবে কখন ? সারাদিন কোলিয়ারির কাজকর্ম সেরে সময় কোথায় খেলার ! তবু গরমে আর বর্ষায় হাটের পাশে ন্যাড়া মাঠে গদাইদা, রাখহরিদা, রামভরত, সাহানাবাবু— মাঝে-মাঝে ফুটবল নিয়ে নেমে পড়ত। সে ছিল মজার খেলা।

হাট-বাজার করতে এসে খানিকটা বল পেটাপেটি।

পিলকিনসাহেব কোলিয়ারিতে আসার পর নিজে উদ্যোগী হয়ে একটা দল করলেন। হাটের মাঠে ফুটবল নিয়ে দাপাদাপি করালেন জনা-বিশেক জোয়ান ছেলেকে—তার মধ্যে গদাইদারা থাকল। শেষমেষ আনাড়িদের বাদ দিয়ে সাহেবের দল গড়া হল। নাম হল্ পিলকিন'স ইলেভেন।

পিলকিন'স ইলেভেনের সবাই কোলিয়ারিতে কাজ করত। কেউ ইলেক্‌ট্রিশিয়ান, কেউ ফিটার, কেউ ওয়ার্কশপের মিস্ত্রি, কেউ অফিসের কেরানি, কেউ বা হাসপাতালের কম্পাউণ্ডার। দত্তসাহেব বলতেন, 'দামড়া ইলেভেন।'

পিলকিন'স ইলেভেন প্রথম খেলা খেলতে গেল বার্নপুরের মাঠে। ফ্রেন্ডলি ম্যাচ, সাত গোল খেয়ে ফিরে এল। সে-খেলা আমরা দেখিনি, শুনেছি বার্নপুর কারখানার দল শুয়ে বসে হেসে হেসে খেলে মাত্র সাত গোল দিয়ে ভদ্রতা করে ছেড়ে দিয়েছিল পিলকিন'স ইলেভেনকে।

পিলপিলসাহেব বড়ই দুঃখ পেয়েছিলেন সেদিন। সাত দিন আর জলস্পর্শ করেননি। তবে দমে যাননি মোটেই, টিমের ছেলেদের বলেছেন, "নেভার মাইন্ড, আচ্ছাসে খেলো।"

সেবারের মরসুমে পিলকিন'স ইলেভেন যাদের সঙ্গেই খেলেছে, সে যেমন খেলাই হোক পাঁচ সাত দশ গোলে হেরেছে।

পরের বছর পিলকিন'স সাহেব নিজের কোলিয়ারিতে চাকরি দিয়ে দু একজন নতুন খেলোয়াড় আনালেন। তার মধ্যে ফণিদা আর গণপতি ভাল খেলোয়াড়। দেখা গেল, উন্নতি হয়েছে। ধানবাদের রেল-মাঠে ভাওড়া কোলিয়ারির সঙ্গে খেলায় পিলকিন'স ইলেভেন পাঁচ গোলে হারল। তা খারাপ কী? ভাওড়া কোলিয়ারি নামকরা দল। শিল্ড চ্যাম্পিয়ন।

তার পরের বছর পিলপিলসাহেব নিজের কোলিয়ারিতেই এক টুর্নামেন্ট লাগিয়ে দিলেন। কোলিয়ারির সেটা পঁচিশ বছর। সিলভার জুবিলি। টুর্নামেন্টের নাম দেওয়া হল, জুবিলি কাপ। শুধু কোলিয়ারি দলরাই সেই টুর্নামেন্টে খেলতে পারবে।

সাহেবের প্রতিপত্তি কম ছিল না। নিজেই এখানে-ওখানে চিঠি লিখলেন, গাড়ি হাঁকিয়ে দেখা করতে গেলেন, অন্য কোলিয়ারির ম্যানেজারদের সঙ্গে। বারো চোদ্দটা দল রাজি হয়ে গেল খেলতে।

এরপর হই-হই করে মাঠ পরিষ্কারের কাজ হতে লাগল। পিলপিলসাহেব নিজে তদারক করতে লাগলেন। মাঠ পরিষ্কার হল, গোলপোস্ট পোঁতা হল, মাঠের পাশে একধারে টিনের শেড তৈরি হল ছোট করে, গণ্যমান্যরা বসবেন। খেলোয়াড়দের প্যাণ্টজামা বদলাবার জন্যে তাঁবু বসানো হল।

আমাদের কোলিয়ারিতে হৈ-চৈ করার মতন কাণ্ড-কারখানা দু-চারটে হত। কালীপুজো, যাত্রা, বেবি শো— এই সব আর কি! কিন্তু ফুটবল খেলার হৈ-চৈ ছিল না। আমরা, বাচ্চাকাচ্চার দল তো মহা খুশি। রোজ বিকেল বেলায় দল বেঁধে গিয়ে মাঠ পরিষ্কার, তাঁবু খাটানো দেখতাম।

শেষ পর্যন্ত একদিন ধুমধাম করে জুবিলি কাপের খেলা শুরু হল। আসানসোল থেকে ইব্রাহিমের ব্যান্ড-পার্টি এল বাজনা বাজাতে, কলকাতা থেকে বাজি এল দু-চার ঝুড়ি, দমাদ্দম বাজি ফাটল, তুবড়ি পুড়ল, হাওয়াই ছুটল।

আমাদেরই হল মজা। জুবিলি কাপের খেলা থাকত রোজই প্রায়। আমরাও বিকেল হল কি, মাঠের দিকে ছুটতাম। রোজই ভিড় হত মাঠে।

পিলকিন'স ইলেভেনকে সাহেব ততদিনে পাকা করে ফেলেছেন। টপাটপ বেড়া ডিঙিয়ে সেমি-ফাইনাল পর্যন্ত চলে গেল তাঁর দল। লোদনা কোলিয়ারি, শ্রীপুর, ভিক্টোরিয়া— তিন তিনটে কোলিয়ারিকে হারিয়ে একেবারে সেমি-ফাইনাল। আমরা বগল বাজাতে লাগলাম। মন্দ লোকে অবশ্য বলত, রেফারিগুলো চোট্টামি করছে। সে-কথায় কে কান দেয়। আমরাও দিতাম না।

সেমি-ফাইনালে খেলা পড়ল সেই ভাওড়া কোলিয়ারির সঙ্গে। বড় শক্ত টিম। পাকা টিম। তা ছাড়া ওদের দলে জন বলে একজন অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান প্লেয়ার আছে। বুট পরে খেলে। জবরদস্ত খেলোয়াড়। তার সঙ্গে আছে বানোয়ারিলাল, সে একেবারে পেছল শোলমাছ, সুড়ুত করে পিছলে একেবারে গোলের কাছে চলে যায় একটু ফাঁক-ফোকর পেলেই। তার সবই ভাল, শুধু একটা দোষ আছে। কোনও প্লেয়ার যদি তার গায়ে গায়ে এসে পড়ে ব্যস হয়ে গেল। বানোয়ারির কাতুকুতু লেগে যায়। বল ছেড়ে দিয়ে সে হাসতে শুরু করে।

খেলার দিন, সকাল থেকেই বৃষ্টি নেমেছিল। ভাদ্র মাস। ঘণ্টা-দুয়েক জোর বৃষ্টির পর মেঘ কাটল। আমাদের মনের মেঘ কিন্তু কাটল না। আজ পিলকিন'স ইলেভেনের হয়ে গেল। অবধারিত হার। কমপক্ষে তিনটে গোল হজম করতে হবে। কোলিয়ারিতে একটাও জাগ্রত ঠাকুর-দেবতা নেই যে আমরা মানত করে আসব। সন্তু দামড়া গাঁয়ের ধর্মরাজ ঠাকুরকেই মানত করে এল।

বিকেলে মাঠে গিয়ে দেখি পিলপিলসাহেব তখনও তাঁর দলবল নিয়ে আসেননি। কোলিয়ারির অর্ধেক লোক এসে মাঠের তিন পাশ দখল করে বসে পড়েছে। আমরা তাঁবুর দিকটায় জায়গা করে দাঁড়িয়ে পড়লাম। বেশ একটা যুদ্ধ-যুদ্ধ ভাব লাগছিল।

মাঠের অবস্থা মন্দ নয়। জলে কাদায় ভর্তি হয়নি মাঠ ; তবে জায়গায় জায়গায় জল জমে আছে, কোথাও-কোথাও সামান্য কাদা।

খেলা শুরুর খানিকটা আগে পিলপিলসাহেব তাঁর দল নিয়ে মাঠে এলেন। কোলিয়ারির ট্রাকে করে এসেছেন। প্লেয়াররা একেবারে তৈরি। আমরা হই-হই করে উঠলাম।

ভাওড়া কোলিয়ারি দল আগেই মাঠে নামল। হলুদ রঙের গেঞ্জি তাদের জার্সি। আমাদের হল নীল শার্ট।

ভাওড়ার দল মাঠে নামতেই আমাদের কোলিয়ারির লোকরা নানারকম শব্দ করতে লাগল মুখে। কেউ কুকুর ডাক ডাকল, কেউ ছাগল-ডাক ডাকল। শেয়ালের ডাকও ডাকতে লাগল। ভাওড়ার দল গ্রাহ্য করল না। তারা এমন ভাব করতে লাগল যেন ওরা সব হুলো বেড়াল ; এগারোটা নেংটি ইঁদুর তাদের কাছে কিছুই নয়।

পিলকিন'স ইলেভেন মাঠে নামার আগে পিলপিলসাহেব তাঁর দলকে কী যেন মন্তর দিয়ে দিলেন কানে কানে। আমরা দেখলুম সাহেব আমাদের হাফ্ ব্যাক বদুদাকে আলাদাভাবে একপাশে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে কিছু বলছেন।

বদুদা— মানে বদ্যিনাথ চট্টরাজকে লোকে জ্যান্ত মহিষাসুর বলত। বিশাল চেহারা, কুচকুচ করছে গায়ের রঙ, মাথার চুলগুলো ঝাঁকড়া। বদুদা নাকি একটা পুরো খাসির মাংস সাবাড় করতে পারে। কোলিয়ারির যাত্রা-পার্টিতে বদুদাকে কখনও যমরাজ, কখনও

কুম্ভকর্ণ, কখনও অসুর জলন্ধরের সেনাপতির পার্ট দেওয়া হয়। কথাবার্তায় পুরো মানভূমি টান। সেই টানেই পার্ট বলে যায়।

যাই হোক, খেলা শুরু হল। শুরুতেই সেই বানোয়ারিলাল আমাদের চমকে দিয়েছিল। একটা গোল হতে হতে হল না। কেমনভাবে যেন বলটা বাইরে বেরিয়ে গেল। নয়তো হয়ে যেত।

প্রথমটায় আমাদের পিলকিন'স ইলেভেন শুধুই নাচতে লাগল। আমাদের তখন বুক ধসে যাচ্ছে! তবু সারা মাঠ চেঁচাচ্ছে আর চেঁচাচ্ছে। ধরে ফেল, মেরে দে, পেনো ছোট, বাঁ দিকে পাস দে মির্জা…নানান ধরনের চিৎকার।

বেশ খানিকক্ষণ পিলকিন'স ইলেভেন নেংটি নাচা নেচে শেষে নিজেদের সামলে নিল। তারপর শুরু হল বদুদার খেলা। এমন খেলা কেউ দেখেছে কি না জানি না। ভাওড়ার কোনও প্লেয়ার বল নিয়ে এগুতে গেলেই বদুদা তেড়ে যাচ্ছে চেঁচাতে-চেঁচাতে, কী বলছে শোনা যাচ্ছে না, কখনও যাত্রার পার্ট মুখস্থ বলছে, কখনও হুঙ্কার ছাড়ছে, কখনও খেপিয়ে দিচ্ছে। এরপর শুরু করল বদুদার মার। সিংগল কাঁচি, জোড়া কাঁচি, ছররা, ল্যাং, কনুইবাজি, হাঁটু-চোট, গরদানা— কত রকম কী মার আছে বদুদার, চোরা মার, সোজা মার, সবই মারতে লাগল। ধন্য রেফারি! অত মার, তবু চক্ষু দুটি বুজে রইল।

কতক্ষণ আর সহ্য করে মানুষ। শেষে ভাওড়া কোলিয়ারির জন্ বদুদাকে এমন এক গুপ্তি মারল যে মহিষাসুর বদুদা ছিলে-কাটা ধনুকের মতন ছিটকে গিয়ে সাইড লাইনে পড়ল। পড়ে আর উঠতে পারল না। কাঁধের কাছে হাড় সরে গেছে। বদুদা ছটফট করতে লাগল। রেফারি জন্‌কে মাঠ থেকে তাড়িয়ে দিল।

হাফ-টাইমের পর আবার যখন খেলা শুরু হল তখন পিলকিন'স ইলেভেন মরি-বাঁচি করে লেগে পড়ল। ভাওড়াও কম যায় না। তারাও বারবার আছড়ে পড়তে লাগল পিলকিন'স ইলেভেনের গোলের ওপর।

চেঁচিয়ে-চেঁচিয়ে আমাদের গলা বসে গেল, বিশ-পঁচিশটা ভাঙা ছাতা হাটের দিকে উড়তে লাগল, আকাশে আবার কালো করে মেঘ জমে উঠল। তবু কিছু হল না। দু-পক্ষই লড়ে যেতে লাগল। ম্যাচ ড্র হল।

পরের দিন আবার খেলতে হবে। তাই নিয়ম ছিল।

পরের দিন যে আমরা হেরে যাব এ যেন সবাই বুঝে নিয়েছিল। শোনা গেল, ভাওড়া কোলিয়ারি বলে দিয়েছে, আসানসোলের বার্জ ছাড়া অন্য কোনও রেফারি মাঠে নামলে তারা খেলবে না, দল নিয়ে চলে যাবে।

পিলকিনসাহেব বললেন, "ঠিক আছে। বার্জকেই আনাব। তবে সে ফাইনালের খেলা খেলাবার জন্যে তৈরি ছিল। ঠিক আছে।"

পরের দিন অদ্ভুত এক কাণ্ড করলেন পিলকিনসাহেব। মাঠে টিম নামাবার সময় গোলকিপার হিসেবে নামিয়ে দিলেন অখিল সাহানাকে। অখিলদাকে দেখতে কোলাব্যাঙের মতন। বেঁটে, মোটা, গোল। মাথায় চুল নেই। মাসখানেক আগে তার বাবার শ্রাদ্ধ গিয়েছে।

অখিলদাকে নিয়ে কোলিয়ারসুদ্ধু সবাই মজা করত। নিজেও ভীষণ মজার মানুষ। হরদম মজা করে। ওই ব্যাঙের মতন চেহারা নিয়ে ডিগবাজি খায়, কখনও কখনও জোড়া

ডিগবাজি। অদ্ভুত এক মুখভঙ্গি করে ভেঙচায়, থপ্ থপ্ করে জোড়া পায়ে লাফায়। আর অনবরত খিলখিল খকখক করে হাসতে পারে। তার হাসির কোনও মাথামুণ্ডু নেই।

অখিলদাকে জোকার বলা যায়, কিন্তু সে তো ফুটবল প্লেয়ার নয়। মাঠে এসে মজা করে এই যা! সেই অখিলদাকে গোলকিপার হিসেবে খেলতে নামালেন কেন পিলকিনসাহেব? মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে নাকি! নাকি সাহেব ধরেই নিয়েছেন, হারতে যখন হবেই তখন বৃথা লড়ালড়ি না করে মাঠে একটু তামাশাই করা যাক! কী জানি কী মনে ছিল ওঁর।

খেলা শুরুর আগে দেখি, কোলিয়ারির জনা-পাঁচেক ষণ্ডা গোছের লোক ঢাক, ভেঁপু, কাঁসর-ঘণ্টা নিয়ে মাঠে এসে হাজির। সঙ্গে আরও চার পাঁচজন অতি বজ্জাত দামড়া গাঁয়ের লোক। ওদেরই শাগরেদ।

এবার পিলকিন'স ইলেভেনই মাঠে নামল প্রথমে। অখিলদার গায়ে লাল গেঞ্জি, মাথায় এক বাঁদুরে টুপি। নামল ডিগবাজি খেতে খেতে, জোকারদের মতন হাত-পা ছুঁড়ল, গড়াগড়ি দিল মাটিতে, আবার ডিগবাজি খেল। একে ওই ব্যাঙের মতন চেহারা, তার ওপর অমন বেশভূষা, আমরা তো হেসেই মরি। মাঠসুদ্ধু লোকের মজা লেগে গেল। হাসির ধুম।

তারপর দেখি, পিলকিন'স ইলেভেন যে দিকের গোল আগলাতে গেল, সেদিকে মাঠের ঠিক বাইরে গোল লাইন ঘেঁষে সেই ষণ্ডা গোছের লোকগুলো তাদের শাগরেদদের নিয়ে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে পড়ল। তাদের হাতে ভেঁপু, কাঁধে ঝোলানো ঢাক, হাতে কাঁসর-ঘণ্টা। অখিলদা বার-দুই ডিগবাজি খেল, সঙ্গে সঙ্গে ঢাক আর ভেঁপু বেজে উঠল। যেন নাচ প্র্যাকটিস হল বাজনার সঙ্গে।

ব্যাপারটা তখনও ভাল বুঝলাম না। মনে হল, একটা কিছু মতলব নিয়ে লোকগুলো এসেছে। কিন্তু কী যে মতলব বুঝতে পারলাম না।

খেলা শুরু হল।

ভাওড়া কোলিয়ারি যেন ঠিক করে নিয়েছিল আজ তারা প্রথম দিকে একটু গা আলগা করে খেলবে, খেলে পিলকিন'স ইলেভেনকে ধোঁকা দেবে, তারপর আচমকা লাফ মেরে টুঁটি চেপে ধরবে পিলকিনদের।

সেই ভাবেই খেলা শুরু হল। আমাদের কোলিয়ারি সাপের ফণা তোলার মতন করে ছুটে গেল তাদের পেনালটি এরিয়া পর্যন্ত। কিন্তু ছোবল বসাতে পারল না। হেলেসাপের মতন নেতিয়ে গেল।

কিছুক্ষণ এইভাবে কাটল। হঠাৎ দেখি সেই বানোয়ারিলাল বল নিয়ে পনপন করে ছুটে আসছে। কে তাকে আটকায়। দেখতে দেখতে আমাদের গোলের কাছে। এই বুঝি একটা দিল ঢুকিয়ে।

কিন্তু ও কী! আমাদের গোলকিপার অখিলদার কাণ্ড দেখেছ? বল নিয়ে বানোয়ারি ঝড়ের বেগে তেড়ে আসছে আর অখিলদা গোল লাইনের কাছাকাছি দাঁড়িয়ে সার্কাসের ক্লাউনদের মতন ডিগবাজি খাচ্ছে। থপ থপ করে নাচছে। মুখের নানা রকম ভঙ্গি করছে। এ আবার কী!

বানোয়ারি গোলের কাছে শট নিতে যাচ্ছে। আর সঙ্গে সঙ্গে অদ্ভুত শব্দ করে ভেঁপু

বেজে উঠল।

কেমন থমকে গেল বানোয়ারি, পায়ের বল পায়ের কাছেই পড়ে থাকল। সে চোখ তুলে অখিলদার ডিগবাজি খাওয়া আর নাচ দেখল। দেখে হেসে ফেলল। প্রথমে দমকা হাসি, তারপর হো-হো হাসি, শেষে পেট চেপে অট্টহাসি। আর একেবারে শেষে হাসতে হাসতে মাঠে গড়াগড়ি দিতে লাগল।

ষণ্ডার দল যেন তাক খুঁজছিল। তারা ভেঁপু ঢাক, কাঁসর-ঘণ্টা বাজাতে লাগল প্রাণপণে। সেই সঙ্গে নাচতে লাগল।

মাঠসুদ্ধু লোক খেলা দেখবে কী, তামাশা দেখে যেন হেসেই মরতে লাগল। হই-হই কাণ্ড লেগে গেল মাঠে।

রেফারি বার্জ খেলা বন্ধ করে দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন "এসব কী ? এটা খেলা না সার্কাস।"

পিলকিন বললেন, "আমার টিমের গোলকিপার যদি ডিগবাজি খায় তাতে হয়েছে কী ? কোন আইনে আছে গোলি মাঠের মধ্যে ডিগবাজি খেতে পারবে না ?"

বার্জ বললেন, "তোমার কোলিয়ারির লোকরা ওই সব বাজনা বাজাচ্ছে কেন ? অন্য টিমের প্লেয়াররা গোলে শট নিতে পারছে না, ভ্যাবাচাকা খেয়ে যাচ্ছে !"

পিলকিন বললেন, "মাঠের বাইরের লোক আমার টিম নয়। তারা পাবলিক। তারা বাজনা বাজাতে পারবে না, এমন কোনও আইন আছে ?"

রেফারি বার্জের কাছে কোনও আইনের বই ছিল না। তা ছাড়া সেকালে কোলিয়ারির ম্যাচ খেলাতে কে আর আইনের বই দেখে রেফারি হয়েছে !

বার্জ বললেন, "হয় তোমাদের বাঁদরামি বন্ধ করো, না-হয় আমি খেলা বন্ধ রেখে চলে যাচ্ছি।"

পিলকিন খানিকটা ভেবে বললেন, "ঠিক আছে। আমার টিম ফেয়ার গেম্ খেলবে। খেলা শুরু করো।"

আবার খেলা শুরু হল।

তোমার হয়তো বিশ্বাস করবে না, পিলকিন'স ইলেভেন হঠাৎ কেমন ভদ্রলোক হয়ে গেল। আর গোনা-গুনতি বারোটা গোল খেয়ে মাঠের মধ্যেই শুয়ে পড়ল। লেমনেড পর্যন্ত খেল না।

আইকম বাইকম

মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

[এই উপন্যাসিকার যাবতীয় চরিত্র ও ঘটনা কাল্পনিক, এমন কী ক্রিকেট খেলাব বিবরণটুকু সুদ্ধ, কেননা ক্রিকেট আজকাল মুমূর্ষু, ক্যারিবিয়ানের উজ্জ্বল নীল রোদ সত্ত্বেও ; সেকালে এইবকম মাবমুখী ক্রিকেট কেবল কল্পনায় ছাড়া অন্যত্র অসম্ভব। আর, যখন পাইকিবিভাবে মানুষ মাবা হচ্ছে খাবারে ওষুধে ভেজাল মিশিয়ে, কুচক্রীনির্মিত অভাব তৈবি করে যখন অনটন ও অনশন আমাদেব দেশে মারাত্মক পর্যায়ে পৌঁছেছে, তখন সামান্য কোনো-একটি মৃত্যু নিয়ে এমন হুলুস্থূল হবাব কথা নয়। এতৎসত্ত্বেও কোনো পাঠক যদি কোথাও কোনো জীবিত বা মৃত ব্যক্তিব ছাযা দ্যাখেন, তাহলে তাঁকে তিনবাব রামধুন গাইতে অনুবোধ কবি— দেখবেন তাহলেই ওই সমাপতিত মিলটুকু হুউশ করে মিলিয়ে যাবে।]

'হাউজ দ্যাট !'

ডক্টর বীরেন্দ্রনাথ রায় এম. এ., পি-এইচ. ডি. কোনো দিকে না তাকিয়ে, নির্বিকারভাবে, আবার নতুন করে স্ট্যান্স নিয়ে দাঁড়াল : ৭৭-এর মাথায় অফ-স্ট্যাম্পের বাইরের বল খোঁচা দিয়ে স্লিপের হাতে ক্যাচ তুলে দেবার কোনো মানে হয় না, এমনকী ক্যারিবিয়ান ক্রিকেটারদের শাস্ত্রে পর্যন্ত তা লেখে না। তবে বলটা হঠাৎ মাটিতে পড়ে অত জোরে ও অমনভাবে আরো বেঁকে বেরিয়ে যাবে, এটা সে ভাবতে পারেনি। তাকিয়ে দেখলো দুই হাত আলখাল্লার পিছনে দিয়ে আম্পায়ার ভাবলেশহীন মুখে দাঁড়িয়ে আছে-- কাঁধে বোলার কে. ভি. কুমারের সোয়েটার। কুমার দু-বছর টেস্ট খেলেছিলেন ; লেগব্রেক দেন, সেই সঙ্গে হঠাৎ-লুকোনো অফব্রেক, গুগলি আর টপ-স্পিন দিয়ে থাকেন। গত দু-ওভারে খুব একটা জুৎ করতে পারেনি বীরেন, বলগুলি চিনতে বড্ড দেরি হচ্ছিল। কুমার ঘুরে দাঁড়ালেন, আবার ছুটে এলেন ; বলটা আগাগোড়া খেয়াল করে বাঁ-পা বাড়িয়ে, ঝুঁকে বলের উপরকার শেলাইয়েব ফোঁড় লক্ষ করে বীরেন আস্তে ব্যাট পেতে দিল ; মিড-অফ একটু কাছে দাঁড়িয়ে—বল তার কাছে চলে গেল, এ-বলেও কোনো রান হলো না।

সাঁইত্রিশ বছর বয়েসে ক্ষিপ্রতা অনেকটাই কমে গেছে বীরেনের। দু-বছর পর— শান্তিনিকেতনে থাকতে ক্রিকেট বন্ধ ছিল বীরেনের— খেলতে নেমে ঠিক মতো পা চলতে চায় না। মারে আগের মতো জোর নেই, নেই সেই উদ্ধত অহংকার কিংবা সহজ লাবণ্য ; মনস্থির হতে চায় না সহজে ; খেলার ঝোঁক সম্ভবত সেইজন্যেই এখন আরো বেশি ; আউট হয়ে যেতে মন চায় না। প্রথম খেলায় ৮৩ করে আউট হয়েছিল ; তারপর দুটো ইনিংস বিশ্রী খেলল : ২৭-এ একবার একেবারে ইয়র্কড হয়ে গেল ; ১৯-এ লেগ বিফোর

উইকেট ; পরের ইনিংসে ৫৩ করেছিল ; এবার ৯০ মিনিটে নিজের ৭৭-এ পৌঁছল। আগেকার দিন হলে এতক্ষণে হয় আরো বেশি হতো, নয়তো প্যাভিলিয়নে ফিরে যেতে ; তবে আজ পা চলছে গত কয়েক দিনের চেয়ে তাড়াতাড়ি। এবং আজকের খেলাটা দলের পক্ষে জরুরিও বটে ; বিপক্ষে চারজন প্রাক্তন টেস্ট খেলোয়াড় আছে, আছে দুজন সম্ভাব্য তরুণ খেলোয়াড়— গতবার তারা ৩ পয়েন্ট বেশি থেকে লিগ জিতেছিল। এবং বীরেন নেমেছিল দলের যখন ৫-এর মাথায় এক উইকেট গেছে : এখন ১২৩-এ পাঁচ ; অবস্থা মোটেই ভালো নয় ; নতুন ব্যাটসম্যান অজয় সামন্ত এসে নেতার নির্দেশ শুনিয়ে দিলে : 'ভালো খেলছেন ; তবে একটু সাবধান : একটু কশাসলি খেলবেন, আপনিই ভরসা।' ফলে কি-রকম গুটিয়ে গেল বীরেন। এরকম নির্দেশ-মাফিক খেলতে অভ্যস্ত নয় সে ; তাছাড়া এটা তাদের বোঝা উচিত যে হঠাৎ আবার যখন কলেজ কামাই করে বীরেন খেলতে আসছে, তখন নিজে থেকেই সে সহজে আউট হতে চাইবে না।

কুমারের পরের বলটা লোপ্পা এল ; বীরেন জানে ক্রিজ ছেড়ে বেরিয়ে গেলে, ফ্লাইট বুঝতে দেরি হলে স্ট্যাম্পড হয়ে যাবে ; আগের উইকেটটা এমনি লোভ দেখিয়ে পেয়েছেন কুমার ; তবু তার নিজের অজান্তে পা চলে এল নাচেব ভঙ্গিতে, ব্যাক-লিফট হলো প্রচণ্ড, আর ততোধিক প্রচণ্ড হলো তার ড্রাইভ : তুলে না মারলে রান হয় ? কুমারের মাথার উপব দিয়ে বিদ্যুদ্‌বেগে বলটা চলে গেল সীমানার বাইরে। ৮৩ হলো : স্কোরবোর্ড দেখল বীরেন। এটা ওর চতুর্থ ছয় আজকের ইনিংসে, অথচ তিরাশি হতে সময় নিলে বিরেনব্বুই মিনিট : 'স্লো-ক্রিকেট, ডাল ক্রিকেট', নিজের মনেই বললে সে।

ওভার শেষ হলো : আম্পায়াররা জায়গা বদল করলেন ; উইকেটকীপার ওদিকে চলে গেল। কুমার লেগ-স্লিপে তৈরি হয়ে দাঁড়ালেন। স্লিপে দাঁড়াল তিনজন : অর্থাৎ শ্যামসুন্দর মুখুজ্যের পেস-বল চলবে।

বীরেন দেখল অজয় ব্যাট তোলার সঙ্গে-সঙ্গে শূন্যেই বলটা হাওয়া কেটে বেঁকে গেল। 'হাউজ দ্যাট !' কুমার বলটা শূন্যে লুফলেন দু-বার ; অজয় সামন্ত আধ মিনিট স্তব্ধ ও বিমূঢ় দাঁড়িয়ে রইল, নিজের উপর অসীম বিরক্তিভরে ; তারপর মাথা নিচু করে বেরিয়ে গেল ক্রিজ ছেড়ে। শ্যামল দস্তরায় আসবে এবার : বীরেন ভাবলে। ছোকরা খেলে ভালো ; এবার রনজি ট্রফিতে খেলবেই : গত কোনো ইনিংসে ৫০-এত নিচে করেনি, অথচ নামে ছ-উইকেটের পর।

লাঞ্চ হতে তখনো দশ মিনিট বাকি : কাটা গাছের মতো ধুপধাপ উইকেট পতনের হরির লুঠ পড়ে গেছে যেন। ১২৯-এ ছয় ! সর্বনেশে ব্যাপার !

শ্যামল দস্তরায়ই এল এবার ; মিডল্ আর লেগ স্ট্যাম্পে স্ট্যান্স নিলে। ঘাড় ফিরিয়ে চারপাশে ফিল্ড প্লেসিং দেখে নিলে, হেসে কী যেন বললে উইকেট-কিপারকে ; তারপর কুঁজো হয়ে ব্যাট পেতে দাঁড়ালে বলের জন্যে।

শ্যামসুন্দর ঠিক আগের বলটার পুনরাবৃত্তি করলেন, কিন্তু শ্যামল—বীরেন তাকে মনে-মনে তারিফ করলে—কোনো দৃকপাত না-করে সজোরে ড্রাইভ করলে। আসলে শ্যামসুন্দর বল করার আগেই তার ব্যাক-লিফট হয়ে গিয়েছিল।

বাউণ্ডারি থেকে বল এল। শ্যামসুন্দর প্যান্টে বল ঘষতে ঘষতে রান-আপ-এ গেলেন। ফিরে দাঁড়ালেন, বল করলেন ; ঠুকে দিলেন একটু, খাটো লেংথে ; শ্যামলের হুকটা ঔদ্ধত্যের জোরেই আবার বাউণ্ডারি পেরিয়ে গেল— কোনো ফিল্ডার তার হদিশ পাবার আগেই বীরেন বুঝলে অবশেষে এই খেলাটায় তারা জুটি হবে বলেই এতকাল সে

আগেভাগে খামকাই আউট হয়ে গেছে।

পরের বলটা গুড লেংথে। শ্যামল বাঁ পা বাড়িয়ে মাথা ঝুঁকে আস্তে ঠেকালে। পরের বলটা হঠাৎ যেন আরো জোরে গেল, কিন্তু শ্যামল নির্বিকারভাবে কভারে ঠেলে দিতেই বীরেন দৌড়ে চলে গেল। ও যখন খেলতে চাচ্ছে, খেলুক— আর দুই ওভারে আমার একশো হবে কিনা কে জানে।

বীরেনের উদ্দেশে আরেকটা খাটো বল এল, জোরে-ঠোকা একটা খাটো বল। বীরেন হাতের ঝাঁকুনি দেখে বুঝেছিল : হাঁটু গেড়ে বসে সুইপটা সম্পূর্ণ করে সে যখন ফলো থ্রু শেষ করেছে, তখন আম্পায়ার আরেকটা চারের সংকেত দিচ্ছে।

কুমারের প্রথম বলটা শ্যামল সাবধানে খেলল। দ্বিতীয় বলটা এমন আলগোছে ও অবলীলাক্রমে সে স্কোয়ারলেগে ঘুরিয়ে দিলে যে বাউন্ডারি বাঁচিয়ে কুড়িয়ে ফেরৎ দেবার আগেই আরেকটা রান হয়ে গেল। পরের বলটা অন ড্রাইভ করল বীরেন ; ওর বেলায় ফিল্ডাররা ছড়িয়ে যায় ; দড়ির কাছ থেকে বল যখন ফিরে এল, তখন আরো তিনটে রান হয়ে গেছে। নব্বুই নাকি নড়বোড়ে : বীরেন ভাবলে। আগেকার দিন হলে আশি পেরোলেই একশো তার বাঁধা থাকত। এখন এই নব্বুইয়ের ধাক্কা সামলাতে পারা যাবে কি ? আসলে বোলারের হাত থেকে বল বেরুবার সঙ্গে-সঙ্গে তার হাত-পা যেন স্বাধীন হয়ে যায়। কোন বল যে কী রকম   খায়, তা সে নিজেও জানে না, যতক্ষণ-না ফলো থ্রু শেষ হয়।

শ্যামল পরের বলটা ভালো করে দেখে ছেড়ে দিল, খেলার কোনো চেষ্টাই করলে না। পরের বলটা এল ঝোলানো ; তৎক্ষণাৎ শ্যামল ক্রিজের বাইরে ; কিন্তু না, উইকেট-কিপারের অত তৎপর হবার কিছু ছিল না : অমন ছয় বীরেনও মারেনি। পরের বলটা গুডলেংথে পড়ল, পড়ে হঠাৎ— সাপ যেমন করে ছোবল মারে বিদ্যুদ্বেগে তেমনি দ্রুত হলো ; কিন্তু শ্যামল ততোধিক দ্রুত ব্যাট চালালে, ঠিক সুইপ নয়, কিন্তু সুইপই তবু : রান অবশ্য দুটোর বেশি হ'লো না।

আম্পায়ার ঘড়ি দেখলেন। বোধহয় এটাই লাঞ্চের আগে শেষ ওভার। শ্যামসুন্দর বদলে গেলেন। অফ স্পিনার মৃণাল মিত্র এল : ফিল্ড সাজানো হলো নতুনভাবে। মৃণাল মিত্র উইকেট কম পায়, কিন্তু প্রত্যেকটা বল তার গুড লেংথ, ডিরেকশন নির্ভুল : রান-তোলা মুশকিল তার কাছে। পর-পর তিনটে বল একই জায়গায় পড়ল, একইভাবে খেলতে হলো বীরেনকে। বিরক্তিকর ! লাঞ্চের আগে শেষ ওভারটি এর হাতে বল দেয়ার মানেই হলো এরা বীরেনকে একশোর কাছে যেতে দেবে না। দেবে না ?

বীরেন ক্রিজ ছেড়ে এতটা এগুল যে মুস্তাক আলির কথা মনে পড়ে যায়। চমৎকার হলো মারটা, তাতে বিরক্তি আর ক্রোধ প্রকাশ পেল বলেই বোধ হয়। পয়েন্ট আর কভার দুজনের মধ্যখান দিয়ে বলটা সোজা বাউন্ডারিতে চলে গেল। পরের বলটা এক পা এগিয়ে ঘুরিয়ে দিয়েই সে ছুটল। কিন্তু ওটাই তার ভুল হলো। শ্যামলকে শেষ বলটা খেলতে না-দিলেই হতো। তার ওই দুঃসাহসী ও মারাত্মক এগিয়ে-যাওয়াটা শ্যামলকে কেমন যেন সম্মোহিত করে দিলে। ফলে শ্যামল এবারও ক্রিজ থেকে বেরিয়ে এল, কিন্তু ঝোলানো বল তাকে পাশ কাটিয়ে গেল। ক্রিজে ফিরে আসার আগেই উইকেটকীপার তার উইকেট ভেঙে ফেলেছে। আম্পায়ার আঙুল দেখালেন প্রথমে, তারপর বেলগুলি তুলে নিলেন। একশো উনষাট রান-এ সাত উইকেট : দলের অবস্থা মোটেই ভালো না, কোণঠাসা বলতে হয়, আর তার মধ্যে বীরেন একাই ৯৫।

প্যাভিলিয়নে ফিরে যেতেই অধিনায়ক অনিল গোস্বামী তাকে প্রায় জড়িয়ে ধরে আর-কি। কোনোক্রমে আত্মরক্ষা করে বীরেন ড্রেসিংরুমে চলে এল। এবং ড্রেসিং রুমে ঢুকেই তার মুখ গম্ভীর হয়ে গেল।

একটা চেয়ারে চোখ বুজে বসে আছে— আর কে ? —ডিটেকটিভ ইন্সপেক্টর সমীর সেনগুপ্ত। পায়ের আওয়াজ শুনে সমীর চোখ মেলে তাকালে।

'কী রে ? আউট হয়ে গিয়েছিস নাকি ?'

'তোকে দেখে হলাম।'

'অর্থাৎ হোসনি ?'

'কী চাই তোর এখানে ?'

'সেটা ক্রমশ প্রকাশ্য।'

'তাহলে ?' বীরেন ব্যাটটা রেখে গ্লাভস খুলতে-খুলতে বলল।

'তোকে আমার সঙ্গে যেতে হবে।'

'কোথায় ? কেন ?'

'একটা খুনের ব্যাপারে।'

'অসম্ভব।' বীরেন প্যাড খুলতে উদ্যোগী হলো।

'অসম্ভব মানে ? তোকে যেতেই হবে।'

'আমার খেলা আছে।'

'যেখানে জীবন-মরণের সমস্যা, সেখানে খেলা—'

'ওটা জীবনের দিকে তাকাবারই একটা ভঙ্গি। তুই বুঝবি না।'

'—সেখানে খেলার জন্যে—'

'আমি পুলিশে কাজ করি না।'

'—খেলার জন্যে আদেখলেপনা করার—'

'গোয়েন্দাগিরি আমার পেশা বা নেশা নয়।'

'—কোনো মানে হয় না,' সমীর এতক্ষণে তার কথা শেষ করলে।

'আমাদের দলের অবস্থা ভালো নয় ; ৭ উইকেটে ১৫৯। বিপক্ষে অনেক মাস্তান ক্রিকেটার আছে। এই সঙিন অবস্থায় আমি কোথাও যেতে পারি না— বিশেষ করে আমি যখন এখনও আউট হইনি। লাঞ্চের পরেই আমাকে আবার গিয়ে নামতে হবে।'

'একটা মানুষের প্রাণের চেয়ে তোর কাছে ক্রিকেট বড় হ'লো ?'

'হ'লো। কেননা ক্রিকেট কেবল খেলাই নয়, জীবনকে প্রত্যক্ষভাবে গ্রহণ করার একটা স্বীকৃতি।'

'পুরো ব্যাপারটা শুনলে তুই এ-কথা বলতিস না,' সমীর তাকে জানালে।

'মেলা বকবক করিসনি। আমি খেতে যাব এখন।'

'বীরেন, তোকে এতক্ষণ বলিনি— কষ্ট পাবি বলে। কাকে খুনের জন্যে ধরা হয়েছে, জানিস ?'

'জানতে চাই না। দোহাই তোর, আমাকে একটু জিরোতে দে।' দরজায় অনিল গোস্বামীর মুখ দেখা গেল। 'চলো অনিল, চলো।— তুই কী খাবি, সমীর ? ঠাণ্ডা কিছু ? শরবৎ, না কোকাকোলা, না কি নির্ভেজাল চা ?— আচ্ছা, অনিল, তুমি বরং আমাদের জন্যে এখানেই পাঠিয়ে দাও। একটা নেবুর শরবৎ আমার জন্যে, সমীরের জন্যে চা।'

'আপনি আর-কিছু খাবেন না, ডক্টর রায় ? অন্তত স্টু ?'

'খাব ? বড্ড ক্লান্ত লাগছে। আচ্ছা, একটু পাঠিয়ে দিয়ো— খুবই অল্প করে খানিকটা।'

অনিল চলে গেল।

'আমাকে এখন বিরক্ত করিস না, সমীর।' একটা আরাম-কেদারায় নিজেকে এলিয়ে দিলে বীরেন ; তারপর আয়েশ করে একটা চার্মিনার ধরালে। ক্রিকেট খেলার সব ভালো, কেবল সিগারেট খাওয়া যায় না অনেকক্ষণ।

'সুকুমার সরকারকে তোর মনে আছে, বীরেন ?'

বীরেন কোনো জবাব দিল না।

'নিখিল সরকারকে খুন করার জন্যে, তাকে আমরা গ্রেফতার করতে বাধ্য হয়েছি।'

'কাকে ? সুকুমারকে ?' বীরেন ধড়মড় করে উঠে বসল।

'সুকুমারকে।'

'তোর মাথায় পোকা ঢুকেছে, সমীর। কাজে যা। দুপুরবেলায় এসে তোকে ইয়ার্কি করতে হবে না। আমার খেলা আছে।'

'সুকুমারকে জামিন দেয়া যায়নি। সে তোর সঙ্গে দেখা করতে চায়, বীরেন।'

'প্যাভিলিয়নের মধ্যে তোকে ঢুকতে দিলে কে ?'

'আমিও সুকুমারকে চিনি— তোরই মতো। বিশ্বাস আমিও করতে চাইনি। কিন্তু সমস্ত প্রমাণ ওর বিরুদ্ধে—মোটিভও আছে— এবং কোনো অ্যালিবাই নেই। আইনের কাছে আমার হাত-পা বাঁধা। অথচ কিছুতেই আমার খটকা কাটছে না। সুকুমারকেও যদি খুনের জন্যে ধরতে হয়, তাহলে পৃথিবীতে অবাক হবার আর-কিছু থাকবে না।'

'তুই সত্যি বলছিস, সমীর ?'

'তুই কি ভেবেছিস আমি কাজে ফাঁকি দিয়ে ইয়ার্কি করে বেড়াই। পুরো ব্যাপারটা এমনি ডিপ্রেসিং যে এমনকী তোর ওই বেপরোয়া মারমূর্তি পর্যন্ত দেখতে ইচ্ছে হলো না। এখানে এসে আবোল-তাবোল সব ভাবছিলুম।'

বীরেন একটু চুপ করে রইল। 'নিখিল সরকার কে ?'

'সুকুমারের খুড়তুতো ভাই : সরকার অ্যান্ড সরকারের আরেক অংশিদার।'

উর্দি-পরা তকমা-আঁটা বেয়ারা এসে ঘরে ঢুকল ট্রে হাতে। বীরেন কোনো কথা না-বলে চার্মিনারে টান দিলে, সমীর কোনো উচ্চবাচ্য না-করে চায়ের পেয়ালা কাছে টেনে নিলে, বেয়ারা বীরেনের সামনে ছোট গোল টেবিলটায় তার স্টু আর নেবুজল সাজিয়ে চলে গেল, বীরেন চার্মিনারটা ছাইদানে পিষে ফেলে স্টু-এর বাটি কাছে টেনে নিলে।

'সমীর', বীরেন বললে, 'পুরো ব্যাপারটা আমাকে খুলে বল, অবশ্য যদি বেশিক্ষণ না-লাগে।'

'বলার মতো বেশি-কিছু নেই। তাছাড়া তুই বোধকরি সুকুমারের মুখ থেকেই সমস্ত শুনলে ভালো করবি।'

'তবু ব্যাপারটা অন্তত ঝাপসাভাবেও কথঞ্চিৎ জানা থাকলে ভাল। অবশ্য অনেক সময় লাগলে এখন থাক।' বীরেন নেবুজলের গেলাশ হাতে তুলে নিলে।

'বেশ, অত্যন্ত সংক্ষেপে তোকে বলছি।' সমীর একটা চার্মিনার ধরিয়ে বলতে শুরু করলে। 'সরকার অ্যান্ড সরকার কতগুলি বিদেশী যন্ত্রপাতি আনায়—ওদের কয়েক লাখ টাকার ফরেন এক্সচেঞ্জ-এর পারমিট আছে। কয়েকটি কম্পানিকে বিলিতি যন্ত্রপাতি

সরবরাহ করে, কোনো গুদোমভাড়া পর্যন্ত দিতে হয় না, কারণ জাহাজে করে মাল আসার আগেই সব বিক্রি হয়ে যায়, যারা কেনে তারাই জাহাজ থেকে মাল খালাশ করে নেয়। এক অর্থে বলা যায় এজেন্টের মতো। বৈদেশিক মুদ্রা সংক্রান্ত সংকট দেখা দেবার পর থেকেই ওদের লাভের অঙ্ক ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছিল। সুতরাং কোনো দিক থেকেই কোনো ভাবনা ছিল না। বরং চেনাশুনো কি ধর্নাধারী অনেক লোককেই তারা তাদের আপিশে চাকরি দিয়েছিল। কিন্তু গণ্ডগোল বাধল মাস ছয়েক আগেই।'

বীরেন শরবতের গেলাশ নামিয়ে রাখলে। 'কী হলো ?'

'নানা সরকারি রাজস্ব বিভাগ চ্যাঁচামেচি শুরু করলে।'

'অর্থাৎ ?'

'কাস্টমস যে-শুল্ক পেয়েছে, সেই অনুপাতে আয়কর দেয়া হয়নি, বিক্রয়করও নেই। এক হতে পারে, কিছু মাল বিক্রি হয়নি। কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্য, একটা নাট-বল্টুও কোনোদিন বলতে গেলে ওরা নিজেরা চোখে দ্যাখেনি।'

'তারপর ?'

'কাস্টমস-এর প্রতিবেদনের সঙ্গে বিক্রির হিসেবের অনুপাতে প্রচণ্ড তফাৎ। সুতরাং কর্তাদের টনক নড়ল। গোপনে তদন্ত হলো নানারকম। শেষকালে তারা সন্দেহ করলে যে এটা আয়কর ফাঁকি দেবার একটা সুপরিকল্পিত চেষ্টার ফল। সুতরাং তারা খাতাপত্র পরীক্ষা করতে চাইল।'

'ওরা তক্ষুনি পরীক্ষা করতে দিলে ?'

'না-দিলে কম্পানির দরজায় শীলমোহর পড়ে যেত, পারমিট বাজেয়াপ্ত হতো। সুতরাং পরীক্ষা করতে দিতেই হ'লো। তবে ওরা দু-তিন মাস সময় চাইলে। নিজেদের অডিটার দেখে যাতে পাশ করে দেয়— তাছাড়া খাতাপত্র তৈরি করতেও কিঞ্চিৎ সময় লাগবে। সর্বোপরি, ওরা হঠাৎ এই সরকারি হুমকিতে যুগপৎ বিস্মিত ও আতঙ্কিত হয়ে পড়ল। তবু সুকুমার তার ব্যক্তিগত প্রভাব খাটিয়ে ওই সময়টুকু নিলে—কেননা সাধারণত এ-রকম ক্ষেত্রে কোনো কম্পানিই কোনো সময় পায় না।'

'ততঃকিম্ ?'

'কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে সাপ বেরুল।'

'অস্যার্থ ?'

'তারা নিজেরাই ক্রমশ নিজেদের খাতাতেই প্রচুর গরমিল দেখতে পেলে।'

'মানে ? ওরা বছর-বছর চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্টকে দিয়ে হিসেব দেখাত না ? কোনো অডিটর ছিল না ?'

'অডিটর ছিল। হিসেবও দেখাত।'

'তাহলে ?'

'সি.এ. যিনি দেখতেন, তিনি এঁদেরই অ্যাকাউন্টেন্টের বন্ধু। এবং এই হিসেব সংক্রান্ত কারচুপি— সুকুমারের মতে— ওঁদের যুগ্ম কাজ।'

'সি. এ.টি কে ? তুই তাঁর সঙ্গে দেখা করেছিলি ?'

'তাঁর নাম ওঙ্কার গুপ্ত। দেখা আমি করেছিলুম, ভদ্রলোকের আপিশে গিয়ে। তিনি বললেন বন্ধু মানুষের হিসেব, তিনি একটু দেখেই পাশ করে দিয়েছেন।'

'অহো ! অতএব—'

'অতএব সুকুমাররা বুঝল এরা যুগ্মভাবে কয়েক লাখ টাকা কারচুপি করে সরিয়েছে।'

'এবং কম্পানির দরজায় তালা লাগল ?'

'না ; নতুন হিসেব তৈরি করে দেয়া হলো : নিখিল সরকার অনেক বলে-কয়ে হাতে-পায়ে ধরে সুকুমারকে দিয়ে সি. এ. ও অ্যাকাউন্টেন্টের বিরুদ্ধে মামলা করতে দিলে না। ওরা নিজেদের টাকা দিয়ে বাকি টাকাটা ভরে দিলে। অনেক ধরাধরি করে ইনকাম ট্যাক্সের বকেয়া টাকা শোধ করে দেয়া হলো। ফাইন হলো অবশ্য। উপরন্তু এই ছ-মাসের জন্য ফরেন এক্সচেঞ্জের যে-পারমিট পেল তার পরিমাণ অর্ধেক কমে গেল। কিছুই পেত না— শুধু সুকুমারের ব্যক্তিগত প্রভাব এত আপদ থেকে অল্পের উপর দিয়ে বাঁচিয়ে দিলে। না-হলে জেল তো নির্ঘাৎ ছিল।'

'সব অন্য দুটি লোকের জন্যে ?'

'হ্যাঁ।'

'আশ্চর্য ! তা এই পরোপকার-প্রবৃত্তির কারণ ?'

'সুকুমার কিছুই বলতে চায় না। শুধু বলে নিখিল ওদের কাছে ঋণী ছিল নানা ব্যাপারে।'

'হুঁ। কিন্তু কয়েক লাখ টাকার মামলা তো—'

'সে-টাকা ওরা তিন মাসের মধ্যে শোধ করে দেবে বলেছিল। এবং এই তিন মাস শেষ হয়েছে কাল। আর কাল বিকেলে নিখিল সরকার খুন হয়েছেন।'

'ওরা কি টাকা শোধ করেছে ?'

'না। কোনো টাকা বা চেক কিছুই পাওয়া যায়নি।'

'টাকা শোধ দেবে, এটা কী কেবল মুখের কথা ছিল ?'

'না, দলিল ছিল— সুকুমার বলে। নিখিলের শোবার ঘরে স্টিলের সিন্দুকে রীতিমতো রেজিস্ট্রি-করা পাকাপোক্ত দলিল— কিন্তু আমরা সর্বত্র তন্নতন্ন করে খুঁজেছি, কোথাও কোনো দলিল পাইনি।'

'খুনটা কী করে হল ?'

'বিকেলে সুকুমার আপিশ থেকে তেতলায় নিজের ঘরে চলে আসে।'

'তেতলায় নিজের ঘরে মানে ?"

'একটা তেতলা বাড়ির নিচের তলায় ওদের আপিশ— দোতলাটা নিখিল সরকারের, তেতলাটা সুকুমারের। আপিশের পরে— চারটের সময় ওদের ছুটি হয় রোজ— সুকুমার তেতলায় চলে আসে। ও বলে যে ডরোথি সেয়ার্সের 'নটি গির্জের ঘণ্টা' বইটা শুরু করেছিল আগের দিন, সেটা নিয়েই পড়তে বসে যায়। কতক্ষণ গেছে খেয়াল নেই, সম্ভবত পৌনে পাঁচটা কি পাঁচটা বাজতে পাঁচ-দশ মিনিট হবে— হঠাৎ ফোন বেজে ওঠে। ও ফোন ধরতেই শোনে ওধারে ওঙ্কার গুপ্ত কথা বলছে। কাল মেয়াদের তিন মাস উত্তীর্ণ হবে— কিন্তু তারা কিছু সময় চায়, কেননা সব টাকা জোগাড় করতে পারেনি। সুকুমার বলে যে এ বিষয়ে ও কিছু জানে না, ওরা যেন নিখিলের সঙ্গে কথা বলে। বেশ বিরক্তি ভরেই বলে। ওর মতে বিরক্তির কারণ দুটো : ও-ধরনের লোকের সঙ্গে সে সম্পর্ক রাখে না কোনোকালে, নিখিল মাঝখানে না-থাকলে নির্ঘাৎ পুলিশে দিত, দ্বিতীয়ত লর্ড পিটার ডেথ ব্রিডন উইমজি, ডেনভারের ডিউকের দ্বিতীয় ছেলে, শৌখিনতায় যে অদ্বিতীয়, সে নাকি তাকে মুগ্ধ করে রেখেছিল তখন। ওঙ্কার গুপ্ত বলে যে সে একটু বরেন দেব অর্থাৎ অ্যাকাউন্টেন্টের সঙ্গে অন্তত কথা বলুক— সুকুমার অবশ্য কথা বলে তার সঙ্গে, কিন্তু সাফ জানিয়ে দেয় যে টাকাকড়ি সংক্রান্ত বিষয়ে সে কিছু

শুনতে বা জানতে চায় না, ও-বিষয়ে কিছু বলতে হলে নিখিলের সঙ্গে আলাপ করতে হবে। পরে অবশ্য ওঙ্কার গুপ্ত তার সঙ্গে আরো-কিছুক্ষণ কথা বলে— আর কথা বলার সময়েই নিচে রিভলবারের শব্দ শোনা যায়। ছুটে গিয়ে কোত্থেকে আওয়াজ হল বের করতে গিয়ে দ্যাখে দোতলায় নিখিলের ঘর ভিতর থেকে বন্ধ। ধাক্কাধাক্কিতে সাড়া পাচ্ছে না দেখে সে চাবি দিয়ে দরজা খোলে— ডুপ্লিকেট চাবি ছিল নাকি তার কাছে— খুলে দ্যাখে নিখিল পড়ে আছে মেঝেয়, বুকের কাছে গোল দাগ, রক্ত পড়ছে, লোহার সিন্দুক খোলা ও তছনছ।'

'হুঁ! তা সুকুমারকে গ্রেপ্তার করার কারণ? তার মোটিভ কি?'

'পুরো ব্যাপারটা তো সুকুমারের বয়ান। মিথ্যে নয়, কী করে বলিস? দ্বিতীয়ত, খাতাপত্রের গণ্ডগোল পুলিশ কিছু জানে না, কারণ খাতাপত্র সব এক প্রস্থ করেই আছে। আর লাখ কয়েক টাকার দলিল ব্যাপারটির যখন কোনোই হদিশ নেই, তখন ওটাও স্বকপোলকল্পিত হতে পারে— কেননা অমন ভাবে কেউ কখনো চোর-জোচ্চোরকে ছেড়ে দেয় না। যদি কেউ বলে যে দেয়, তাহলে সেটা সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য ও আজগবি। তৃতীয়ত, কাল আপিশ ছুটি হবার আগে নিখিলের সঙ্গে সুকুমারের প্রচণ্ড ঝগড়া হয়েছিল। চতুর্থত, অন্য যাদের মোটিভ থাকতে পারত, সুকুমারের কথা অনুযায়ী, অর্থাৎ ওঙ্কার গুপ্ত ও বরেন দেব, তারা বড়োবাজার থেকে পাঁচটায় ফোন করেছিল— এবং ফোন চলাকালীনই গুলির আওয়াজ হয় বলে সুকুমারই বলেছে।'

প্যাড পরে, ব্যাট ও গ্লাভস হাতে নিয়ে অনিল গোস্বামী এসে ঘরে ঢুকলে। 'তৈরি হয়ে নিন।'

'এই যে, নিচ্ছি। কে নামবে এবার আমার সঙ্গে? তুমি?'

'তাই তো ঠিক ছিল।'

'আমি কিন্তু রেয়াৎ করব না আর, ওদের পিটিয়ে ছাতু করে দিতে চাই।'

অনিল একটু আমতা-আমতা করলে। 'আমাদের রান বড্ড কম—'

'সেই জন্যেই তো পিটিয়ে খেলতে হবে। ল্যাজের ঝাপট কত দেখুক। এমনি শিকড় গেড়ে খেলতে গেলে ঝটপট সব পড়ে যাবে, কতক্ষণই বা ঠেকাবে ওদের। তার চেয়ে যত রান উঠে থাকে, ততই ভালো।' বীরেন প্যাড পরে নিল। 'আর ক-মিনিট আছে?'

'মিনিট সাতেক।'

'আচ্ছা যাচ্ছি। তুমি বাকি সকলের ব্যাটিং অর্ডার ঠিক করে নাও—কে কার পরে নামবে। যদি কিছু অদলবদল করতে হয়,' বীরেন হাসল, 'এই শেষ মুহূর্তে তাও করতে পারো।'

অনিল হেসে ফেললে। 'না, সব ঠিক আছে।' অনিল বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল।

'ফোনটা তো ওঙ্কার গুপ্তরা এই পাড়ারই কোনো পাবলিক টেলিফোন থেকে করতে পারত?'

'পারত। কিন্তু করেনি। প্রথমত টেলিফোন এক্সচেঞ্জ থেকে কলটা ট্রেস করা গেছে— ওটা এসেছে ওঙ্কার গুপ্তর আপিশ থেকে, আর তার আপিশ বড়োবাজারে— যেকালে সরকার অ্যান্ড সরকারের আপিশ ওল্ড বালিগঞ্জ লেন-এ। সম্ভবত হেলিকপটারেও তিন-চার মিনিটের মধ্যে বড়োবাজারের ঘিঞ্জি থেকে পুরনো বালিগঞ্জের গলিতে ঢোকা যায় না। এই যানজটের আমলে গাড়িতে করে আসার কথাই ওঠে না। তাছাড়া—'

সমীরের কথা শেষ হবার আগেই হন্তদন্ত হয়ে ঘরে ঢুকল— আর কে ? —অশোক রুদ্র।

'জানি বীরেন, সুকুমার খুনের দায়ে গ্রেফতার হয়েছে ! আর তুই ব্যাট-বল খেলছিস—'

'জানি।' উঠে দাঁড়াতে-দাঁড়াতে বীরেন বললে, 'এবং আবারও ব্যাট নিয়ে মাঠে নামছি। তুই ভাবিস না, সমীর ; আমি তাড়াতাড়ি আউট হয়ে যাব, পিটিয়ে খেলার ছুতো করে। তারপর না-হয়— এই-যে অনিল, চলো, এগোই। অশোক, তুই বারান্দায় বসে ব্যাট-বল খেলা দ্যাখ না-হয় কিছুক্ষণ।'

২

অশোক রুদ্র কোন খেয়ালে সম্প্রতি উল্টোডাঙায় বাসা বেঁধেছে, কেউ জানে না। সব মুলুকের শেষ প্রান্ত, এই নাম সে দিয়েছে উল্টোডাঙার ; সেই জন্যেই—তার মতে— কেউ তার কাছে যায় না, এবং জ্বালাতন করে না। দিব্য আছে সে, নির্জনে, এই অধর দাশ লেনে, একলা।

কিন্তু সেদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে চা সহযোগে খবর-কাগজ গিলতে গিয়ে সে খাবি খেলে একেবারে প্রথম পাতাতেই। ভাই ও ব্যাবসার অংশিদার নিখিল সরকারকে খুন করার জন্য সুকুমার গ্রেফতার হয়েছে— এই তথ্য মস্ত কালো-কালো হরফে ভয়-দেখানো-ভয়ানক এক রাশি বিভীষিকার মতো তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। যেন তাকে কেউ কোমরবন্ধের তলায় প্রচণ্ড ঘুষি বসিয়েছে, এইরকম তার মনে হল খবরটা দেখে। সে বুঝল বীরেন কেন কোনোদিনই খবর-কাগজের খেলার পাতা আর ব্যক্তিগত বিজ্ঞাপন ছাড়া আর-কিছুই পড়ে না। তৃতীয় মহাযুদ্ধের আতঙ্ক, স্নায়ুযুদ্ধের প্রচণ্ডতা, চীন আর সোভিয়েতের ঠাণ্ডা লড়াই, কাশ্মীর সীমান্ত ও রাষ্ট্রসংঘ, ভারত-সীমান্তে চৈনিক অনুপ্রবেশ, উদ্বাস্তু সমস্যা ও দণ্ডকারণ্য, চাল-চিনি-তেল আর মাছের মনুষ্যনির্মিত অভাব ও নির্বিবেক কালোবাজারিদের হৈ-হুল্লোড়, কালো টাকার অনুসন্ধান, সাইপ্রাসের তুর্কিনাচন, ভিয়েৎনামের জলস্তম্ভ, ব্রহ্মদেশে ভারতীয় বিতাড়ন--এবংবিধ যাবতীয় মন-খারাপ-করা খবর পাড়ার চেয়ে না-পড়া সত্যি ঢের ভালো। তবু অভ্যেসবশত চায়ের কাপের সঙ্গে খবর-কাগজ না-পেলে রুটির টুকরো আর আধসেদ্ধ ডিম কোনোকালেই আশোকের মুখে রোচে না। আর সেইজন্যেই আজ সকালে এই বিকট খবরটি জ্বলজ্বল করে তার দিকে তাকিয়ে থাকার সুযোগ পেয়েছিল।

'বীরেন তো আর খবর-কাগজ পড়ে না— জানে তো খবরটা ?' অশোক ভেবেছিল সংবিৎ ফিরে পেলে— 'না কি এখনও জানতে পায়নি ?' ঘড়ির দিকে তাকিয়েছিল সে। 'নটা বেজে গেছে। ফোন করব বীরেনকে ? তাই ভালো।'

তিনবার চেষ্টা করে সে যখন লাইন পেয়েছিল, তখন সাড়ে নটা বাজে ; এবং ভৃত্য বলরাম জানিয়েছিল যে বীরেন কিছুক্ষণ আগে বেরিয়ে গেছে।

'কোথায় গেছেন, জানো ? ইউনিভার্সিটি ?'

'ঠিক বলতে পারব না তো, বাবু।'

'কখন ফিরবে, কিছু বলে যাননি ?'

'তা বলেননি তেমন করে, তবে সন্ধের আগে নয় এটা ঠিক।'

'কেউ এসেছিলেন, না একা বেরিয়েছেন ?'

'গাড়ি এসেছিল, দু-তিন জন বাবু ছিলেন গাড়িতে, তাঁদের সঙ্গেই বেরুলেন।'

এই কথায় কিছুই বোঝা যায়নি। ফলে উল্টোডাঙা থেকে সোজা তাকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় যেতে হল— গিয়ে শুনল আজ ওর অফ-ডে ; অফ-ডে না-হলেও আসত না অবশ্য, কারণ আজ খেলা আছে ওঁর। জানাতে গিয়ে ওর সহকর্মী অধ্যাপক বাঁকাভাবে একটু অর্থপূর্ণ মুচকি হাসলেন।

'খেলা ? কী খেলা ?'

'আপনি জানেন না বুঝি ? ডক্টর রায় আজকাল ফের খেলাধুলোয় বড্ড মন দিয়েছেন। ক্রিকেট খেলছেন প্রায়ই। কোনো-একটা প্রথম ডিভিশনের দলে খেলেন। মন্দ না অবশ্য— বিরক্তিকর টিউটোরিয়েল আর নিঃসাড় ও নির্বোধ ছেলেদের কাছে কবিতা সম্বন্ধে একঘেয়ে বক্তৃতা করার চেয়ে ভালো।' ডক্টর অমৃত দেবের সবচেয়ে বড় গর্ব এই যে দাবা ছাড়া আর-কিছু তিনি কোনোকালে খেলেননি—এবং দাবা খেলতেন এই জন্য যে তিনি বাল্য বয়েসে শুনেছিলেন তাতে নাকি বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ হয়। ফলে একটু তির্যক হেসে তিনি অমিয়বচন শোনালেন, 'তিন কাঠির সামনে ব্যাট নিয়ে দাঁড়িয়ে এই বিলিতি ডাংগুলি খেলা কলোনিয়াল হ্যাংওভার হলেও রোজ দু-তিন ঘণ্টা সাহিত্যের অধ্যাপনা করার চেয়ে অনেক ইন্টারেস্টিং। ঘণ্টার পর ঘণ্টা যারা পড়াতে পারে, তারা অনায়াসেই রাশি-রাশি লাফানে বল বুকে-পিঠে-কাঁধে সহ্য করতে পারে।'

মার্কিন-মুলুক ফেরৎ ডক্টরেট-পাওয়া অধ্যাপক অমৃত দেব এই বিষয়ে আরো কিছু বলতেন, কিন্তু অশোক অত্যন্ত বিনীতভাবে তাঁর কাছ থেকে নিজেকে ছিনিয়ে নিয়ে বেরিয়ে এল। তারপর কোন মাঠে খেলছে, এটা কাগজ দেখে আন্দাজ করে শেষকালে কালীঘাট মাঠে আসতে তার বেশি দেরি হল না।

আর আসতেই এই সম্ভাষণ। প্রায় বিনা বাক্যব্যয়েই বীরেন ধরাচুড়ো পরে মাঠে গিয়ে নামল। সমীর যেহেতু উপস্থিত, অতএব এটা ধরে নেয়া যায় যে সে ক্রিকেট খেলার পোকা নয় কিংবা তা হয়ে থাকলেও বীরেনের এই আকস্মিক ক্রীড়ানুরাগে তার নিশ্চয়ই মোটেই আস্থা নেই এবং বীরেন— আশা করা যায়—সুকুমার সরকার-ঘটিত ব্যাপারটা জানে। তৎসত্ত্বেও নির্বিকার চিত্তে খেলতে গেল। মুখে অবশ্যি বললে যে হুড়মুড় করে পিটিয়ে আউট হয়ে যাব ; কিন্তু সে তো হবেই— খেলা যারা জানে না, তারাই হুড়মুড় করে পেটাতে চেষ্টা করে, কেননা পেটাক বা না-পেটাক উইকেটে তাদের পরমায়ু হয় সাধারণত অতীব নগণ্য। ছ-সাত বছর যে ব্যাট-বল স্পর্শও করলে না, সে হঠাৎ খেলতে নেমেই আবার পুরনো ফর্ম ফিরে পাবে, এটা সহজ হয় না ! ক্রিকেট অসাধারণ মনোযোগ, চর্চা ও অভ্যেস দাবি করে। যথাযোগ্য মূল্য না-দিলে ক্রিকেটের দেবতা দয়া করেন না—অন্তত এটা অশোকের ধারণা। ছিল বটে একটা সময়, যখন বীরেন বেপরোয়া খেলত। ঝড়ের গতিতে রান করত সে, ঠোকা বলে হুক, পুল বা ব্যাক-কাট করায় কলকাতায় তখন তার জুড়ি ছিল না। স্পিন-বলের বিষ ঢেলেও কিছু করা যেত না তাকে ; পাভলোভার নাচের মতো লঘু ক্ষিপ্র পায়ে ক্রিজ ছেড়ে এগিয়ে যেত সে, লেংথ ভেঙে ছত্রখান করে দিত, স্পিনের বিষদাঁত ভেঙে বলগুলি অনায়াসে পাঠাত মাঠের বাইরে। ব্যাট করার ভঙ্গি তার ছিল উড়োপাখির ডানা-মেলার মতো ; তেমনি অনায়াস, সহজ, স্বাভাবিক, লাবণ্যময়, স্বতঃস্ফূর্ত, সুন্দর, লীলায়িত, বিচিত্র এবং কখনো-কখনো স্পর্ধিত। মুহূর্তে কেমন করে যেন ফাঁক বার করত মাঠের মধ্যে, আর সেখান দিয়ে গলিয়ে দিত বল ; কিংবা তুলে মারত ফিল্ডারের ব্যূহের উপর দিয়ে।

একদা কলেজে পড়ার সময় বেকার ল্যাবরেটরির মাঠে ব'লে-ব'লে দোতলার জানলা ভাঙতে পারত সে। আবার বল করার সময়েও তার নৈপুণ্য নানা সময়ে তাদের বিস্মিত করে দিত। বলের গতি ছিল মাঝারি, কিন্তু হঠাৎ আঙুলের ধাক্কায় তাদের এমন ঘুরিয়ে দিত যে মারাত্মক হতো বলগুলি। শুধু দুটি আঙুলের কারচুপিতে কখনও লেগ-ব্রেক, কখনো অফ-ব্রেক দিতো। আর ওরই মধ্যে যে বলগুলো তুলনায় আস্তে হত সেগুলি ছিল সবচেয়ে বিষাক্ত। রক্তিম আপেলের মতো ব্যাটসম্যানের আদিম রিপুর বোধশক্তিকে শুড়শুড়ি দিত যেন বলগুলি ; কতখানি ঝোলানো, তা আন্দাজ করতে ভুল হলেই গণ্ডির বাইবে এনে ভির্মি খাইয়ে দিত, নয়তো ব্যাট ছুঁইয়েই লাফিয়ে উঠত নানা রকম অদ্ভুত কোণ করে, দলের লোকের উদ্যত অঞ্জলির মধ্যে পড়ে তবে স্বস্তি। কিন্তু কোনোকিছুই সে কখনো সীরিয়াসভাবে নিলে না ; সবচেয়ে ভালো যখন খেলার ফর্ম, তখন সে একদিন ক্রিকেট ছেড়ে দিলে। ছেড়ে দিলে মানে তার চেয়েও আরো চিত্তাকর্ষক বলে যেটা তখন তাব সাময়িকভাবে মনে হল সেই বন্যহংসীর পশ্চাদ্ধাবনে মনোনিবেশ করলে। আর খেলোয়াড়রা যখনই লোকচক্ষুর অন্তরালে চলে যায়, তখনই তাদের সমাধি। নতুন নায়ক আসে, আসে নতুন ধারা, নতুন পদ্ধতি : ব্যাটে-বলে বীরেন যেকালে ছিল আক্রমণ এবং আবো জোরালো আক্রমণের পক্ষপাতী, সেখানে আদর্শ হয়ে উঠল কেন ম্যাকাই কি ট্রেভর বেইলি কি জ্যাকি ম্যাকগ্লু : যা ছিল জীবন্ত, উদ্দীপনাময় ও রোমাঞ্চকর, তা হয়ে উঠল বিরক্তিজনক, ব্যাবসাদারি, এবং অসাধু— এইজন্য অসাধু যে তা ব্যাট-বলের প্রধান শর্ত আক্রমণের পরিপন্থী হয়ে উঠল ! যা ছিল প্রাণবন্ত, তা গেল মরে। সেক্ষেত্রে বীরেনের আকস্মিক ক্রীড়ানুরাগ কাঙ্খিত হলেও কতটুকু ফলপ্রসূ হবে, তা কে জানে। আর সেই সদ্যোযৌবনেব ফর্ম নিশ্চয়ই আর নেই !

সিগারেট জ্বালিয়ে বারান্দায় এসে বসল অশোক, সমীরও এসে বসল তার পাশে। স্কোববোর্ডের দিকে তাকিয়েই অশোক হতবাক। বীরেন ৯৫ করেছিল লাঞ্চের আগে ? একজনের পরে নেমে ? আশ্চর্য !

তার অবাক হতে অবশ্য আরো-বাকি ছিল।

লাঞ্চের পরে প্রথম ওভার আরম্ভ হল। ল্যাজের বাড়ি যাতে না খেতে হয়, সেইজন্য বিপক্ষ প্রথম থেকেই আবার পেস-বল করাতে শুরু করলে। শ্যামসুন্দর মুখার্জি ২৪ পা দৌড়ে এলেন, বলটা জোরে এল, অফ-স্ট্যাম্পের বাইরে। বীরেন ব্যাকফুটে দেরি করে কাট করলে, বিদ্যুদ্বেগে বলটি তিনজন স্লিপের মধ্য দিয়ে সীমানা পেরিয়ে গেল। পরের বলটা এলে ফাস্ট ইয়র্কার। বীরেনের মারটা আশ্চর্য হল। পিছনেব পা তুলে, একটু কোণাকুণিভাবে সজোরে সে বলটিকে যেন থেঁৎলে দিলে ; স্কোয়ারলেগের পাশ ঘেঁষে, তৎক্ষণাৎ সেটা সীমানায় ছিটকে চলে গেল যেন।

সমীরই প্রথম হাততালি দিলে। পরে অশোকও যোগ দিলে। অনিল গোস্বামী গিয়ে তাকে অভিনন্দন জানিয়ে এল। মাঠের চারপাশে লোকসংখ্যা অত্যন্ত কম, শ-দুয়েক হবে ; প্রত্যেকেই হাততালি দিয়ে বীরেনের শতরানপূর্তিকে অভিনন্দন জানালে।

অশোক হেসে বললে, 'কুকুরে-মার দেখছি এটা !'

'কেন ? পিছনে পা তুলে মেরেছে বলে ?'

'ন্যাচারেলি।'

এই কুকুরে-মার অবশ্য পরে আরো ক-বার দেখা গেল ; ফাস্ট ইয়র্কার বলগুলির সব কটারই দশা হল এই : স্কোয়ারলেগকে পিছিয়ে দাঁড় করিয়েও কোনো লাভ হল না,

বাউন্ডারিগুলো বাঁচল না, কারণ কেবল ব্যাটটা কখনো একটু কাৎ হয়ে নামে— না, ক্রস ব্যাট নয়, —কখনো আরো কোণ কেটে বেঁকে যায়। সবচেয়ে অদ্ভুত হল তার অফ ড্রাইভ : পা, কাঁধ, মাথা, ব্যাট তোলা, বল মেরে ব্যাটটাকে টেনে তোলা, বলের গতি অনুযায়ী প্রত্যেকটা মারে ভারের ও চাপের তারতম্য আর সর্বোপরি ব্যাটের সেই ঢেউতোলা বাঁকা ছন্দ— সব আশ্চর্য নিখুঁত।

বীরেনের যখন একশো একত্রিশ, অনিলের তখন এগারো। ওদের জুটির সাতান্ন রান হয়েছে ২৪ মিনিটে, সাত ওভারে। বীরেনই অবশ্য বেশিক্ষণ খেলেছে, সবগুলি ওভারই মূলত ওই মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে, স্কোর এখন মোটামুটি ভদ্রোচিত, সাত উইকেটে ২১৬, আর এই রান তুলতে সময় লেগেছে সাকুল্যে ১৪৬ মিনিট।

২১৬-তে ওরা নতুন বল নিলে ; এই ওভার অনিল গোস্বামীকে খেলতে হবে, কেননা, বীরেন এতক্ষণ বেধড়ক পিটিয়ে বেশ ক্লান্ত। নতুন বল দেওয়া হল সুনীল চৌধুরীকে। সুনীল চৌধুরী ছ ফিটের উপর লম্বা ; অত্যন্ত জোরে বল করে, কিন্তু লেংথ ও নিশানা সব সময় ঠিক থাকে না, এত জোরে বল করে বলেই বোধ হয় ! একুশ পা দৌড়ে এসে বল করে। পাঁচ রানের মাথায় প্রথম উইকেটটা সে-ই নিয়েছিল : তারপর হঠাৎ লেংথ একেবারে এলোমেলো হয়ে যায় ; এবার আবার তার হাতে বল এল।

প্রথম বলটা অফ-স্ট্যাম্পের বাইরে দিয়ে চলে গেল, অনিল গোস্বামী খেলাব চেষ্টাই করলে না। দ্বিতীয় বলটা ঠুকে দিলে সে সজোরে, অনিল তৎক্ষণাৎ বসে পড়ে নিজেকে বাঁচালে। কিন্তু উইকেট-কিপার কিছু করার আগেই বলটা সোজা বাউণ্ডাবিতে চলে গেল। পরের বলটা কোনক্রমে সামনে পা বাড়িয়ে খেলে অনিল ঠেকালে। তার পবেব বলটা অনিল খেলেছিল, কিন্তু ভাগ্যিশ তার ব্যাটটা আগে চালান হয়ে গিয়েছিল তাই বাঁচোয়া, ব্যাটে লাগলেই প্রথম স্লিপ তক্ষুনি লুফে নিত। পঞ্চম বলটা আবার ঠুকে দিয়েছিল ; অনিল বসল বটে, তবে একটু দেরি হল, ডান হাতের কব্জিতে লাগলো দস্তানাব উপর, লেগে লাফিয়ে উঠতেই উইকেট কীপার লুফে নিল, অনিল যন্ত্রণায় নীল হয়ে বসে পড়ল। দাঁতে দাঁত চেপে যন্ত্রণা সহ্য করবার চেষ্টা করছে সে, মুখচোখ লাল হয়ে উঠেছে ; কোনো ক্রমে উঠে সে আস্তে-আস্তে চলে গেল, আট উইকেটে দুশো কুড়ি।

পরের ব্যাটসম্যান অত্যন্ত অল্পবয়সী ; কলেজের ফার্স্ট ইয়ারে পড়ে সুজয় মিত্র, মিডিয়াম পেস বল দেয়, তাই দলে আছে। সে আসতেই বীরেন তাকে নানা উপদেশ দিয়ে এল। সুনীল পরের বলটাও ঠুকে দিলে, কিন্তু সে কোনো ক্রমে ধপ করে বসে পড়ে আত্মরক্ষা করলে।

শ্যামসুন্দর মুখার্জির পরের ওভারে বীরেন এগারো রান নিলে ; দুটো চার, একটা দুই, ষষ্ঠ বলে সে খোঁচা দিয়েই অপর প্রান্তে চলে গেলো।

সুনীল চৌধুরীর বলটা এল ঝড়ের মতো ; তিনজন স্লিপ উদ্যত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, বীরেন অসীম উপেক্ষা ভরে তাদের মধ্য দিয়ে বলটাকে সীমানা পার করে দিলে। দিয়েই বুঝল পরের বলটা কেমন আসবে ; হাতের ঝাঁকুনি দেখেও তা আঁচ করতে পারলে সে ; এমন বিদ্যুৎময় হল তার হুক, আর এত সজোরে যে বলটা রাস্তায় গিয়ে পড়ল মুহূর্তে। 'দিনের সেরা ছয়', সমীর অশোককে জানাল। পরের বলটা বীরেন লেট-কাট করল, চার রান আটকান গেল না ; পরের বলটাও আবারও কাট করল, কিন্তু আরো সূক্ষ্মতর কোণ করে মাটি কামড়ে বলটা চলে গেল। পরের বলটা আস্তে পা বাড়িয়ে সে ঠেকালে, এবং পরের বলটা লেগে ঘুরিয়ে একটা রান যেন চকিতে নিয়ে নিলে সে।

প্রত্যেকটা মারের সময় তার পা এত দ্রুত চলে যে কল্পনাও করা যায় না। আর এই ক্ষিপ্রতাই যেন মারগুলির মধ্যে ওই উপভোগ্য স্বাচ্ছন্দ্য দিয়ে দিলে। ঠিক যেন নিক্তিমাপা সময়ে ব্যাট ছোঁয় বলটিকে, আর এত জোরে ছোঁয় যে কোনো ফিল্ডসম্যানই আটকাবার সময়টুকু পর্যন্ত পায় না।

শ্যামসুন্দর মুখার্জির ওভারে প্রথম বলটা কভারের ঘাস পুড়িয়ে ফেলে চার হয়ে গেল; দ্বিতীয় বলটা মারলে মিড-অফের মাথার উপর দিয়ে, তৃতীয় বলটা হুক করে মাঠ পার করে দিলে, চতুর্থ বল মাথায় নামিয়ে ছেড়ে দিলে, পঞ্চম বল পুল করে আবার চার করলে, ষষ্ঠ বলটা কভারে ঠেলে দিয়েই এক রান নিতে দেরি করলে না। পর-পর তিন ওভারে সাত-চল্লিশ রান। কোনদিক দিয়ে মারবে, কিচ্ছু বোঝা যাচ্ছে না। ঠেকানো দূরের কথা, নতুন বল যেন বাঁধ খুলে দিলে। ফলে তৎক্ষণাৎ মৃণাল মিত্রর হাতে বল চলে গেল। অন্তত বীরেনের দুশো যাতে আটকানো যায়।

কিন্তু আটকানো গেল না। সুজয় মিত্র যখন বারো করে কুমারের কাছে বোল্ড আউট হল, বীরেন তখন দুশো তেরো, অতিরিক্ত তদুপরি পাওয়া গেছে আরো-এক; ন-উইকেটে ওদের হল সাকুল্যে ৩০৫, আর তার জন্য সময় লাগল সব মিলিয়ে একশো আটষট্টি মিনিট। অনিল গোস্বামী তৎক্ষণাৎ দান শেষ ঘোষণা করে দিলে।

অশোক আর সমীরই কেবল নয়, প্যাভিলিয়নের প্রত্যেকে এসে ভিড় করে দাঁড়ালে, বীরেন যখন ফিরল।

কালীঘাট মাঠে লিগের ক্রিকেট খেলা দেখতে পয়সা লাগে না; তবু দর্শক-সংখ্যা দ্বিশতাধিক নয়— কিন্তু সেই স্বল্পসংখ্যক দর্শকই ভিড় করে এল প্যাভিলিয়নের কাছে। বিপক্ষের সবাই তাকে হাততালি দিয়ে সম্মান জানালে।

অশোক তাকে বললে, 'এখনও তোর হাত-পা দুই সজুৎ আছে দেখছি। আমার ধারণা ছিল খেলা একবার ছেড়ে দিলে সহজে আর পুরনো ফর্ম ফিরে পাওয়া যায় না।'

'ম্যাকার্টনির নাম শুনেছিস ?' বীরেন জিগ্যেস করলে।

'কোন্ ম্যাকার্টনি ? যিনি লাঞ্চের আগে সেঞ্চুরি করেছিলেন ? যিনি ট্রাম্পারের শিরোপা পেয়েছিলেন ?'

'হ্যাঁ, সেই ম্যাকার্টনি, যাকে সবাই ইয়োর এক্সেলেন্সি দি গভর্নর জেনারেল বলে ডাকত। লাঞ্চের আগে সেঞ্চুরি তিনি কবে করেছিলেন জানিস ? ৪১ বছর বয়েসে— যত বুড়ো হচ্ছিলেন, তত তাঁর ক্ষিপ্রতা তার স্বাচ্ছন্দ্য বেড়ে যাচ্ছিল।'

'ও, তুই বুঝি নিজেকে তাঁর সঙ্গে তুলনা করতে চাচ্ছিস ?'

'তা করলে মন্দ হয় না। খেয়াল করলে দেখতিস আমি আটচল্লিশ মিনিটে একশো আঠারো রান করেছি— শেষের দিকে অবশ্যি।'

'কোথায় টেস্ট ম্যাচ, কোথায় কলকতার লিগ খেলা ! এ-তো রনজি ট্রফিও না, দলিপ ট্রফিও নয় নিদেন।'

'তাই বলে খেলার জাত বিচার করে দেখতে হবে তো। কোনো স্ট্রোকে কোনো ভুল ছিল ? মিস-টাইমিং, বা মিস-হিট, বল বিচার করায় কোনো ভুল ?'

'তা না-হয় না-ই হল। হতো ট্রুম্যান কি গ্রিফিথ, দেখিয়ে দিত হুক করা কেমন সহজ। মস্ত সব বীরপুরুষরাও কাৎ হয়ে গেছেন।'

বীরেন প্যাড খুলে প্যাড, গ্লাভস আর ব্যাট একপাশে রাখল। 'অধিকাংশই ভয়ে।'

'ডক্টর রায় !' অনিল ডাকল, তর্কে বাধা দিয়ে।

'কী ?'

'আমার কব্জির হাড়টা বোধহয় সরে গেছে।. দেখুন কতটা ফুলে গেছে।'

'কী সর্বনাশ ! করেছ কী ? মালিশ-টালিশ বাদ দাও, এক্ষুনি ছোটো ডাক্তারের কাছে। দ্যাখো হাড়টাড় ভাঙল কিনা। এক্স-রে করে নেয়া ভালো। ব্যথা লাগছে না !'

অনিলের কাতর মুখে শুকনো হাসি ফুটে উঠল। 'আমি ট্যাক্সি ডাকতে পাঠিয়েছি। কিন্তু আপনি যদি মাঠে দল নামান— কে কী করবে না করবে সব আপনিই যদি ঠিক করে দেন— আমি থাকলে বোলিং-এর সুবিধে হতো হয়তো. কিন্তু খেলা তো ড্র হয়ে গেল। ওরা দেড়শো মিনিটে তিনশো ছ রান করার ঝুঁকি নেবে না।'

'বলো কী ! এতজন টেস্ট খেলোয়াড় আছেন !'

'তাহলেও খানিক দূর গিয়েই হয়তো শেষটায় মাটি কামড়ে পড়ে থাকবে। আর আমরা তো আর হারব না— অন্তত আপনি বাঁচিয়ে দিয়েছেন। তা সত্ত্বেও এর মধ্যে যদি ওরা আমাদের রান পেরিয়ে যায় তাহলে বুঝব ওরা যোগ্য দল বলেই জিতেছে। ...আমি যাই, ট্যাক্সি এসেছে বোধকরি। আপনি তো অনেক দিন বল করেননি, আজ না-হয় একটু প্র্যাকটিস করবেন।'

'আমার যে এক জায়গায় যাবার কথা ছিল—'

'আমিও থাকব না, আপনিও না, তাহলে—'

'আচ্ছা, আমি থাকব। তুমি আর দেরি কোরো না।'

অনিল ভাঙা হাতটা একটা ব্যান্ডেজ দিয়ে গলার সঙ্গে ঝুলিয়েছে। একটু কাৎরাতে-কাৎরাতে সে চলে গেল।

'দেখলি তো, কেমন আটকে গেলুম। মাঠে আমার নামতেই হবে। ...সুজয়, চলো, নেমে পড়ো সবাইকে নিয়ে। আম্পায়ার মাঠে চলে গেছেন।'

পরবর্তী আড়াই ঘণ্টা চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। সম্ভবত বীরেনের ওই অপরাজিত দুশো তেরো আশ্চর্য প্রেরণার কাজ করেছিল, তাই তড়িৎ গতিতে সবাই বিপক্ষকে আক্রমণ করলে। ছাতার মতো ব্যাটসম্যানের পিছনে ফিল্ডসম্যান দাঁড় করাল বীরেন,— উদ্যত, ও শিকারি বেড়ালের মতো গুঁড়ি-মারা। শুধু দুজনে থাকল— মিড অন আর মিড অফে, আর সবাই পিছনে অর্ধ-চাঁদের মতো গোল দাঁড়িয়ে। অন্তত যতক্ষণ জোরে বল হল, ততক্ষণ তাই। আর জোরে বল হল ঠিক চা পর্যন্ত, কাঁটায়-কাঁটায় এক ঘণ্টা। তার মধ্যেই চারটে উইকেট পড়ল, রান হলে তিরেনব্বুই। আসলে উইকেট চারটে পড়ল ঝপঝপ করে একাশি থেকে তিরেনব্বুই-এর মধ্যে। একটি রান-আউট, দুটি উইকেট পেলে শ্যামল দত্তরায়, একটি সুজয় মিত্র। চায়ের পর ফিল্ডিং সম্পূর্ণ অন্য ভাবে সাজানো হল, এবার স্পিন বল করে দেখবে বীরেন, কতটা পেটাতে চায় ওরা কিংবা পারে। বীরেন একেবারে সবেগে ঝাঁপিয়ে পড়লো নিজেই ; আগের জোর নেই তার বলে, কিন্তু বুদ্ধি খাটিয়ে করা। লুকনো আস্তে বল, ফুলটস, গুগলি, টপস্পিন— সব মিশনো। কোনো দুটো বল একরকম হয় না। প্রথম ওভারেই একটা কট অ্যান্ড বোল্ড, তিন রানের বিনিময়ে। অন্য প্রান্ত থেকে শামল দত্তরায় আরো জোরে বল করছে এবার। হয় পেস দিয়ে, নয় স্পিন দিয়ে— এক দিক দিয়ে মারবই— এই বীরেনের পরিকল্পনা। নিছক জোরে বল দেখে ভয় পেলে স্পিনে মারতে যাবে, আর তক্ষুনি পতন। আর নয়তো স্পিনকে রেয়াৎ করে জোর বলের বেলায় হাত খুললে দেখা যাবে কতক্ষণ ধোপে টেকে। যেই বলের জোর ও-প্রান্তে কমে যায়, অমনি বোলার বদলে যায়। ফলে খেলা শেষ হতে

যখন পনেরো মিনিট বাকি, তখন দেখা গেল ওদের রান দাঁড়িয়েছে মাত্র ১৩৭, উইকেট গেছে আটটা ; বীরেন পেয়েছে দুটো, সুজয় আরো-একটা, শ্যামলও আরো-একটা। নবম উইকেটে যখন কুমার এলেন বীরেন দু-ধার থেকে পেস বল দিলে। কুমার শ্যামলের তিন বল ঠেকালেন, চতুর্থ বলে অনিচ্ছাসত্ত্বেও আত্মরক্ষার্থে খোঁচা দিলেন, অজয় সামন্ত উইকেটের পিছনে লুফে নিল। মৃণাল মিত্র দু-বল ঠেকালেন ; সুজয় অন্য ধারে সুনীল চৌধুরীকে গুডলেংথ বল করে গেল ; বীরেন নিজে এল পরের ওভারে ; পঞ্চম বলে মৃণাল মিত্র স্পিনের আড়াআড়ি ব্যাট চালালেন ; ফাইন লেগে আদিত্য রায় লুফে নিল। খেলা শেষ হতে তখনো ৭ মিনিট বাকি ছিল। ১৩৭-এই বাকি দু উইকেট পড়ে গেল। অনিল গোস্বামী বলেছিল ড্র হবে, কিন্তু কেমন করে যেন একবার শিরদাঁড়া ভেঙে যাবার পরে ওরা আর সোজা হয়ে দাঁড়াতেই পারেনি।

৩

'ভগবান দয়া করলে অমন হয়।'

বীরেনকে অশোক রেয়াৎ করে না কখনো— ক্লান্ত পেলেও ছাড়ে না সুযোগ পেলে, কেননা সুযোগ তার হাতে কম আসে। 'না হলে ডক্টর রায় কী অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ! এই অল্প বয়েসে এত জ্ঞান অর্জন করেছেন— তাঁর গবেষণার খ্যাতি চতুর্দিকে। একাধিক রহস্যভেদ করার দরুন ফিলিপ ট্রেন্ট, লর্ড পিটার কি জন অ্যাপলবি্র সমপর্যায়ে উন্নীত। লর্ড পিটারই বোধহয়—কেননা ক্রিকেটে ব্যাটে-বলে অমন চৌকশ খেলা লর্ড পিটারই অক্সফোর্ডে পড়ার সময় দেখিয়েছিলেন। খোদা যখন দেন ছপ্পর ফুঁড়ে দেন। এবং যাকে দেন, তার সিন্দুকে আঁটে না। আমি কোথায় সামান্য একটা কবিতার মিল খুঁজে-খুঁজে হন্যে, আর উনি অনায়াসে নট-আউট থেকে ২১৩ করে এবং ২১ রানে তিন উইকেট নিয়ে নিজের কৃতিত্বে নিজেই…'

'তুই দয়া করে থামবি এবার !' বীরেন চোখ বুজেই ক্লান্ত স্বরে অনুরোধ করলে। তার হাঁটুর জোড়া খুলে আসতে চাচ্চে, ডান হাতের কাঁধে বেশ ব্যথা করছে এক্ষুনি, অনেকদিন পর বল করে। 'সমীর, আর কতক্ষণ লাগবে আমাদের ?'

'এই তো এসে পড়লুম।...বাঁয়ে ঘুরে যেয়ো', সমীর ড্রাইভারকে নির্দেশ দিলে। তারপর আবার বললে, 'তোকে আধমরা দেখাচ্ছে।'

'আর তোকে সহানুভূতি দেখাতে হবে না।' ফোঁস করে উঠল বীরেন। তারপর গদিতে হেলান দিয়ে পকেট থেকে বার করল চার্মিনারের প্যাকেট। 'লাকি সেভেন' লেখা সবুজ লাইটারটা বার করে একটি চার্মিনার ধবিয়ে পরম আয়েসের সঙ্গে দম দিলে।

'তুই লাইটার ব্যবহার করছিস নাকি আজকাল !' অশোক রুদ্র বিস্ময় প্রকাশ করল। 'দেখি, দেখি লাইটারটা।' হাতে নিয়ে টিপতেই শিখা জ্বলে উঠল। 'ভালো লাইটার নির্ঘাৎ— কোনো লাইটারকে একবারে কোনোদিন জ্বলতে দেখিনি। কত নিলে দাম ?'

'জানি না, কেননা এটা আমাকে ছাত্ররা উপহার দিয়েছে বোলপুর ছেড়ে আসার সময়।' বীরেন জ্ঞাপন করল তাকে, 'ওরা আমাকে অদ্ভুত কতগুলো জিনিস দিয়েছিল। মাস্টার মানুষ— কোথায় বই দেবে, না বেছে-বেছে কতগুলো আজব জিনিস দিলে বিদায়-সভায়। লক্ষ করেছিল, কোনো দিন নোটকেস ব্যবহার করি না, তাই শ্রীনিকেতনের চামড়ার কাজ-করা একটা নোটকেস উপহার দিলে। সিগারেট ফুঁকি

চিমনির মতো, দেশলাই কিনে-কিনে ফতুর হবার দশা ; তাই দিলে লাইটার। এমনি সব নানা টুকিটাকি।'

'ওই সবুজ রংটাই বিচ্ছিরি। প্ল্যাস্টিকের আবরণটা তুলে ফেললেই পারিস, তাহলে স্টেনলেস স্টিল চকচক করে উঠবে।'

'বিশ্রী বলেই তো ওটা তোলার কোনো চেষ্টা করিনি। দেখতে সুন্দর হলেই তো তোরা গাপ করে দিবি। তদুপরি আমি হাঁচি, টিকটিকি, রাজনৈতিক দল, হাংরি জেনারেশন, বীট-কবি, সংখ্যাতত্ত্ব, গঞ্জিকা-পঞ্জিকা—সব মানি। ওই ৭ সংখ্যাটা আমার পক্ষে বোধহয় ভালোই।'

গাড়িটা হঠাৎ ব্রেক কষে ঘ্যাচাং করে থেমে গেল, পরক্ষণেই গাড়লের মতো কেশে অস্থির পেট্রল ঝাড়লে খানিক।

'আমরা এসে গেছি, বীরেন।' সমীর দরজা খুলে নামতে-নামতে বললে।

'আরেকটা কারণে লাইটারটা আমি পছন্দ করি,' বীরেন বললে। 'দেশলাই থাকলে বড্ড খোয়া যায়— সিগারেট জ্বালাবার জন্যে চেয়ে নিয়ে কথা বলতে-বলতে কেউ যখন পকেটে পুরে ফ্যালে, তখন বিষম রাগ হলেও কেমন বাধো বাধো ঠেকে বলে কিছু বলতে পারি না। কিন্তু,' গাড়ি থেকে নেমে পড়ে বীরেন তার সংলাপ শেষ করলে, 'ওই লাইটারটা কেউ আত্মসাৎ করতে চাইলে তৎক্ষণাৎ তাকে বলা যায়। দাম বেশি বলেই বোধহয়। যেমন এখুনি তোকে বলব পকেট থেকে বের করে ওটা আমার হাতে দিতে— ছাত্ররা দিয়েছে বলে ওটা আমি হারাতে চাই না। ...সমীর, আমার ক্রিকেট-কিটটা গাড়িতেই থাকল। কেননা আমাকে এর পরে বাড়ি পৌঁছে দেবার দায়িত্ব তোর।'

'তুই একটা আস্ত জানোয়ার,' অশোক পকেট থেকে লাইটারটা বের করে দিতে-দিতে বললে।

'হুঁ', শান্তিনিকেতনে তোকে সমীরের হাত থেকে রক্ষা করেছিলুম বলেই তুই এ-কথাটা বলতে পারলি। আধুনিক কবির কৃতজ্ঞতাবোধ আর কতটা হবে! না-হলে এতকাল তোকে সাত বছরের জন্যে ঘানি টানতে হতো তেলের টিন চুরি করেছিস বলে। সমীর তোকে জেলে না-পুরে কি ছাড়ত কিছুতেই!'

পলায়মান পুতুলের দোকানের কথা মনে পড়ে যেতেই অশোক কেমন চমকে উঠল। কতগুলো ব্যাপার আছে, যা আমরা মেনে নিই— আমাদের রক্তে মিশে যায়, ফলে সচেতনভাবে তার কথা আর আমাদের মনে থাকে না। সকালবেলায় খবর-কাগজে সুকুমার সরকারের গ্রেফতারি খবর দেখে অত্যন্ত অনায়াসেই তার নির্জ্ঞান মনের প্ররোচনায় বীরেনের কথা মনে পড়ে গিয়েছিল— সেটা যে কোনো সচেতন সমাপতন কিংবা প্রভৃত ভাবনাসঞ্জাত, তা নয়, মনে হয়েছিল। যদি পুরো ব্যাপারটায় কোনো গোলমাল থেকে থাকে— এবং নিশ্চয়ই আছে, কেননা সুকুমারের মতো ছেলে কোনো পোকা পর্যন্ত মারার পাত্র নয়— তখন সমস্ত খটকা ভেঙে রহস্যের কুয়াশায় কেউ যদি আসল ব্যাপারের খেই ধরাতে পারে তো সে বীরেন। এটা তার মনে হয়েছিল তখন, এটুকুই মাত্র। পুতুলের দোকান হারিয়ে যাওয়ার ব্যাপারটার পর থেকে এটা যেন ভবিতব্য কর্তৃক নির্দিষ্ট হয়ে আছে বীরেন্দ্রনাথ রায় এম· এ·, পি-এইচ ডি· রহস্যভেদের ব্যাপারে অত্যন্ত চৌকশভাবে বেপরোয়া মহড়া নিতে পারে। অনন্তবাজার পত্রিকা আপিশের খুনের ব্যাপারটা তারই যেন সমর্থন করলে। না-হলে সুকুমারের নাম দেখেই তার মনে খটকা বাধবে কেন, আর সেইজন্যে বীরেনের কাছে সে তড়িঘড়ি ছুটে যাবে কেন!

সুকুমার সরকার কোনোকালেই ঠিক তাদের মতো ছিল না। তারা যেমন বেপরোয়া, নির্ভীক, নানা বিষয়ে কিছুটা নিঃসাড়—সুকুমার কোনোকালেই তেমন নয়। বড্ড স্পর্শাতুর সে চিরকাল, বড্ড সুকুমার— ; সব দিক বিবেচনা করে একটি মাত্র ছোট্ট ও সহজ কথায় ওর সম্বন্ধে যাবতীয় তথ্য পরিবেষণ করা যায়, এবং সেই কথাটি যুক্তাক্ষর-বর্জিত, এমনকি আ-কার উ-কারের জ্ঞান পর্যন্ত তাতে লাগে না। সেই কথাটি হ'ল : নরম।

সত্যি, বড্ড নরম সুকুমার। শৈশবের মতো সবুজ একটি স্নিগ্ধতা তাকে জড়িয়েছিল সর্বদা, কিন্তু শৈশবের নিষ্ঠুরতা নয়। শৈশবের চেয়ে এক অর্থে নিষ্ঠুর আর-কিছু নেই। তীক্ষ্ণ কৌতূহল আর রক্তের ভিতরে প্রকৃতির অবারিত ও অফুরান নিষ্ঠুরতা শৈশবের অন্যতম পরিচায়ক ; ফলে প্রজাপতির পাখা ছিঁড়ে দিতে পারে সে অনায়াসে ; ফড়িং-এর ঠ্যাং ছিঁড়ে দেয়াতেও তার তাই অপরিসীম উল্লাস, পাখির ছানা ধরে আনবার জন্য পাখির বাসা ভেঙে দিতে তার বুকের স্পন্দন একটুও তাই অনিয়মিত হয় না ; ঢিল ছুঁড়ে-ছুঁড়ে জন্তুজানোয়ার পোকামাকড়কে কষ্ট দিতে তার নিশ্বেসে উনিশ-বিশ হয় না কখনো—এমনকী বিবেক নামক জাগ্রত ও ক্ষুরধার বোধ শিশুর বুকের মধ্যে নিষ্ক্রিয় ও নিস্তেজ হয়ে পড়ে থাকে। তাছাড়া শিশুদের মতো ক্ষমাহীন ও রাগিও হয়তো কেউ নেই। ফলে সুকুমারকে পুরো-শিশু কিছুতেই বলা যায় না। বরং এই নিষ্ঠুরতার দিকটা বাদ দিলে শিশুর অস্তিত্বের মধ্যে প্রান্তরের মতো সবুজ যে-দিগন্তহীন আকাশ দেখা যায়, তারা-জ্বলা চাঁদ-ওঠা জ্যোৎস্নাময় সেই স্নিগ্ধ সবুজ রাত্রিবেলার আকাশের সঙ্গে সুকুমারের তুলনা দেওয়া চলে। সেই জন্যেই কলেজে যখন পড়ত কেউ অন্তত সুকুমারকে ঈর্ষা করত না। বড়োলোকের ছেলে, অধ্যয়নে তার বিভাগে সর্বোত্তম, প্রিয়দর্শন, প্রিয়ম্বদ এই সুকুমার সরকার তাই সকলেরই শ্রদ্ধা ও প্রীতি অর্জন করেছিল। কেউ তার সঙ্গে চেষ্টা করেও ঝগড়া করতে পারেনি। বরং কখনো-কখনো অপ্রীতিকর পরিস্থিতির উদ্ভব হলে সুকুমারই এমন করে সমস্ত ব্যাপারটা সহজ ও স্বাভাবিক পর্যায়ে নিয়ে এসেছে যে মনে-মনে সেইজন্যে তার প্রতি কৃতজ্ঞতা বোধ না-করে পারা যায়নি। অশোক চিরকালই ফাজিল ; বীরেন চিরকালই তুখোড় ও বাচাল ; সমীরও বৌবাজার ব্যায়ামসমিতি ভিন্ন তৎকালে অন্য-কিছু জানত না। কিন্তু কেন যেন সুকুমারের কাছে এলেই এই ভিন্ন প্রকৃতির মানুষগুলো একই অনুভূতি বোধ করত।

একটু আগে এইসব কথাই আলোচনা করছিল সমীর ও অশোক—বীরেনের তখন খেলার মাঠে যুযুধান মূর্তি।

'সেইজন্যেই অশোক,' সমীর বলেছিল, 'আমি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছি না যে সুকুমার খুন করতে পারে। কোথাও-একটা গণ্ডগোল আছে, যা আমি কিছুতেই ধরতে পারছি না। তাছাড়া, তুই তো জানিস, সুকুমার চিরকালই কী-রকম চাপা স্বভাবের। কিছুই ঠিক স্পষ্ট করে বলতে চাইল না।'

'কিন্তু তুই চট করে ওকে গ্রেফতার না-করলেই পারতিস,' অশোক জানাল। 'কোনো আদালতে ওর বিরুদ্ধে তুই কিছুই প্রমাণ করতে পারবি না, ভালো কোনো উকিল তোকে তছনছ করে দেবে।'

'ওর বিরুদ্ধে আমাকে কিছু প্রমাণ করতে হোক, এটা আমি চাই না। কিন্তু প্রমাণাভাবে খালাশ হলেও সন্দেহের কাঁটা সবসময়েই খচখচ করে বিঁধবে। আমি চাই ও বেকসুর খালাশ পাক। কিন্তু সমস্ত প্রমাণই ওর বিরুদ্ধে।' সমীর ক্লান্তভাবে বললে, 'তাছাড়া গ্রেফতার করার ব্যাপারে আমার হাত ততটা ছিল না। অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার স্বয়ং নির্দেশ

দিয়েছেন। ফরেন এক্সচেঞ্জ ও ইনকাম ট্যাক্সঘটিত কতগুলো ব্যাপার এর মধ্যে জড়িত আছে। জানিস তো এ-সব বিষয়ে গবর্মেন্ট আজকাল কেমন কড়াক্কড় করছে। সন্দেহের উদ্রেক হলেই জেলে পোরো। ওরা যদিও প্রভাব খাটিয়ে ট্যাক্সের ব্যাপারটা জোড়াতালি দিয়েছে, তবু সরকারের সন্দেহ যায়নি। বস্তুত ওদের দুজনেরই বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা কাল সকালেই বেরিয়েছিল। খুন না-হলে নিখিল সরকারকেও ধরা হত।'

'তাহলে খুনের অভিযোগে ওকে ধরা হয়নি ?' অশোক জিগেস করেছিল।

'সত্যি-বলতে এখন দুটো অভিযোগই ওর বিরুদ্ধে কাজ করছে— সেইজন্যেই জামিন মঞ্জুর হলো না।'

'তুই নিজে কেন জামিন হলি না ?'

'হতে চেয়েছিলুম, কিন্তু সুকুমার রাজি হল না। কিছুতেই না। তাছাড়া কোনো প্রশ্নের জবাবও ঠিক মতো দিতে চাইল না। আমি বুঝতে পারি আস্ত ব্যাপারটাই আমাদের দুজনের পক্ষে যথেষ্ট অস্বস্তিকর। কিন্তু সমস্ত জানলে-শুনলে আমি হয়তো তদন্ত চালাতে পারতুম। এখন যে কোন দিকে এগুবো, তাই জানি না।'

'কিন্তু খুনের ব্যাপারটায় তো ওর অপরাধ কোনোমতেই প্রমাণিত হয়নি ?'

'আর কেই বা নিখিল সরকারকে খুন করবে ? কার কী স্বার্থ আছে এতে ?' সমীর বলেছিল, 'বরং ভেবে দেখতে গেলে সুকুমারই নিখিলের মৃত্যুতে লাভবান হবে। নিখিলের কোনো ওয়ারিশান নেই বলে তার মৃত্যুতে সমস্ত সম্পত্তি পাবে সুকুমারই। দ্বিতীয়ত খাতাপত্রের গণ্ডগোলটার জন্যেই বা কে দায়ী ? সুকুমার, না নিখিল ? এটা তো ঠিক সুকুমার যে-কথা বলতে চাচ্ছে, সেটা সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য। ধর, তুই একটা কম্পানি করেছিস— যত ক্ষমতাই দেওয়া হোক না কেন, তোর অ্যাকাউন্টেন্ট কাম ম্যানেজার কী করে বছরের পর বছর লাখ-লাখ টাকা তছরূপ করে পার পেতে পারে ? তুই কি তার কোনো হদিশই রাখবি না ? না-হয় ধরেই নিলুম তুই যে সি·এ-কে অডিটর নিয়োগ করলি, সে তোর ম্যানেজার বা অ্যাকাউন্টেন্টেরই শাগরেদ। কিন্তু তা সত্ত্বেও এটা কি সম্ভব ?'

'সুকুমার কী বলে ?'

'তার বয়ান হল, এ-সব সে কিছুই দেখত না— সব নিখিলের দেখাশুনোর কথা। তাছাড়া সমস্ত ব্যাপারটা ধরে পড়ল যখন, তখনও কেন তারা পুলিশ ডেকে অ্যাকাউন্টেন্ট ও অডিটারকে ধরিয়ে দিল না ? সুকুমার বলে, নিখিল তাদের ছ-মাস সময় দিতে রাজি হয়েছিল। কিন্তু যেকালে কম্পানির বিত্ত, সম্মান, প্রতিপত্তি ও সুনাম দায়ী এবং তাদের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা আহত, সেকালে ককখনো কেউ এ-রকম করে ? নিশ্চয়ই এর পিছনে অন্য-কোনো গভীর বিষয় আছে। এমনও হতে পারে— যদি সুকুমারের কথা সর্বাংশে সত্য হয়— নিখিল কোনো কারণে তাদের হাতের মুঠোয় এসে গিয়েছিল—'

'তুই বলতে চাচ্ছিস বরেন দেব ও ওস্কার গুপ্ত ব্ল্যাকমেল করছিল নিখিলকে ?'

'এছাড়া আর কীই বা ভাবতে পারি। এই অবিশ্বাস্য ও অসাধারণ দয়ার পিছনে আর কী কারণ থাকতে পারে ?'

'কী জন্য ব্ল্যাকমেল করবে ? কী করেছিল নিখিল ? কী জানতো তারা তার সম্বন্ধে ?'

'সে কথাই জিগ্যেস করেছিলুম সুকুমারকে। কিন্তু ও তৎক্ষণাৎ মুখে কুলুপ এঁটে দিলে। বললে, "জানি না।" আমি নানা ইঙ্গিত করলুম : 'নারী ঘটিত কিছু ? এমন কোনো দুষ্ক্রিয়া যার খবর পুলিশে পেলে ধরবে ? বা অন্য-কিছু—" কিন্তু সুকুমার কিছুই বলে না। একটা-কোনো খেই পেলে আমি চেষ্টা করতে পারতুম— অথচ ও কোনো

কথাই বলবে না আমাকে। সম্ভবত আমি পুলিশের লোক বলেই সে কিছু বলতে চায়নি আমাকে। হয়তো— যদি তারা সত্যি ব্ল্যাকমেল করে থাকে তাহলে— নিখিল এমন-একটা কিছু করেছিল যা এমনকী সুকুমারের নিজের সম্মানের পক্ষেও হানিকর ; বা হয়তো সেটা এমনকিছু যা পুলিশের কর্ণগোচর হওয়া বিপজ্জনক। হয়তো আমাকে অস্বস্তিতে ফেলতে চায় না বলেই সে চুপ করে আছে। সেই জন্যেই আমি বীরেনের কাছে এলুম— ও শুধু বন্ধুমানুষ নয়, অপরাধতত্ত্বে কৌতূহলী অথচ পুলিশের সঙ্গে ওর কোনো সম্পর্ক বা সংস্রব নেই। আমার মনের খুঁতখুতে ভাবটা কিছুতেই যাচ্ছে না। খটকা বেধেছে বলেই বীরেনের সাহায্য চাচ্ছি।' সমীর শুষ্ক হেসেছিল একটু। 'পুলিশের চাকরি ছেড়েই দেব ভাবছি। বিবেকদংশন এড়াবার জন্যে কর্তব্য করলুম— কিন্তু তার জন্যে যদি বন্ধুত্বে অবসান ঘটাতে হয়, তবে সবচেয়ে ভালো হয় এই চাকরি ছেড়ে দেওয়া। এ-রকম অস্বস্তিকর অবস্থায় পড়তে হবে না।'

'ভুল করছিস তুই।' অশোক জানিয়েছিল, 'তুই না-হয় অন্য কোনো ইন্সপেক্টর হলেও এই একই কাজ করত— কিন্তু তার মনে কোনো খটকা বাধত না বা সে বীরেনের সাহায্য চাইতে আসত না। তুই আসাতেই আমি যথেষ্ট আশ্চর্য হয়েছি। যদ্দুর জানি তোর সঙ্গে বীরেনের একটা গোপন প্রতিদ্বন্দ্বিতা আছে। উপরন্তু বীরেন দু-একটি মামলা তোর আগেই নিষ্পত্তি করেছে বলে তোদের দুজনকার সম্পর্কও খুব সুস্থ নয়। এ তো একদিক থেকে শাপে বর হল— সুকুমার দুজনেরই বন্ধু না হলে তুই কক্‌খনো বীরেনের কাছে আসতিস না। কিন্তু সত্যি ব্যাপারটা ভারি আশ্চর্য। যে সুকুমার রক্ত দেখলে থরথর করে কেঁপে উঠত, স্নায়ুপীড়নে অস্থির হত, সে কিনা খুনের দায়ে গ্রেফতার হল। এইসব ঘটনা জীবনে ঘটে বলেই ভগবানে বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে।'

অশোকের মনে পড়ে গিয়েছিল একদিনের কথা। একদিন পার্কসার্কাসে কতগুলি কশাইখানার পাশ দিয়ে কোথায় যেন যাচ্ছিল অশোক আর সুকুমার। ছাল-ছাড়ানো লাল দগদগে মাংসখণ্ড ঝুলছে দড়িতে, রক্তে জায়গাটা মাখামাখি। সুকুমার সেই যে মুখ নিচু করেছিল, অনেকক্ষণ পর্যন্ত তারপর আর চোখ তুলে তাকাতে পারেনি। কিন্তু জীবনের চেয়ে অদ্ভুত আর কিছু তো নেই। এমনও দেখা যায় যে-লোক রক্ত দেখলে অস্থির হয়ে পড়ে, সেও স্বার্থে ঘা পড়লে— সাপের ল্যাজে পা পড়লে যেমন ফোঁস করে ওঠে— নির্বিবেক ও নিষ্ঠুর হয়ে যায়। তবু আমরা সবসময়েই স্বভাব দিয়ে বিচার করি ঘটনাকে ; ভুলে যাই সমস্ত ঘটনাই রিলেটিভ ; কোনো ঘটনাই স্বয়ম্ভূ নয় বলে সবসময় আমরা স্বভাবের মধ্যে তার বীজ খুঁজে বের করার চেষ্টা করি।

এটা-তো সত্যি সুকুমারের মধ্যে একটা দিক ছিল অত্যন্ত পিউরিটান ও রক্ষণশীল ; নিজের মধ্যে যে-সব গুণ ও প্রবণতা রয়েছে, স্বাভাবিকভাবেই তা সে দাবি করত অন্যের মধ্যে। অবশ্যই এটা ছেলেমানুষির লক্ষণ— কিন্তু এই ছেলেমানুষিটা আছে বলেই সুকুমারের সংস্রব রোমাঞ্চকর— এবং এইজন্যেই কখনো-কখনো মনে হত সে বুঝি বর্তমান শতক ও বর্তমান পৃথিবীর যোগ্য নয়। সেইজন্যেই এটাই সব চেয়ে বড় পরিহাস যে তার বিরুদ্ধে যে দুটি অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে, তার একটা হচ্ছে প্রচণ্ড অসাধুতা এবং আরেকটি নির্বিকার নরহত্যা।

গাড়ি থেকে নামতে-নামতে এইসমস্ত নানা কথা অশোকের মনে হুড়মুড় করে ভিড় করে এল।

৪

ওল্ড বালিগঞ্জ লেনের মস্ত তেতলা বাড়িটা থেকে যখন এই ত্রিমূর্তি বেরিয়ে এল, তখন রাত সাড়ে নটা। বীরেনই শেষ পর্যন্ত নিজে জামিন হলে সুকুমারের ; তাছাড়া যথারীতি বীরেন তার ভাঁড়ামো দিয়ে ব্যাপারটাকে হালকা করার চেষ্টা করল, কিন্তু তবু সুকুমারের ব্যবহার কেমন যেন আড়ষ্ট ঠেকল। স্পষ্ট করে কোনো কথা বলতে চায় না ; কোনো প্রশ্ন জিগেস করলে সহজে উত্তর দিতে চায় না, প্রশ্নটা দ্বিতীয়বার জিগেস করতে হয় ; এবং তার পরেও যা বলে তা মোটেই সন্তোষজনক উত্তর নয়। অত্যন্ত সংক্ষেপে হুঁ-হা করেই সব সেরে ফেলতে চায়। বীরেন একবার এ সম্বন্ধেও মন্তব্য করেছিল, 'জানি, ও-রকম প্রবচন আছে "ব্রেভিটি ইজ দ্য সোল অভ উইট"। ভারতচন্দ্র আরো বলেছেন "সে কহে বিস্তর মিছা যে কহে বিস্তর।" এবং এ বিষয়ে গ্যেটেরও প্রায় একই বক্তব্য, তবে এখন আমি খটমটে দাঁতভাঙা আলেমান ভাষা উচ্চারণ করতে চাই না। তুই একটু গুছিয়ে পরিষ্কার করে বিশদভাবে আমাকে বল, সুকুমার। একবার না-হয় পুঁথিপড়া আদর্শ না ই পালন করলি। একবার না হয় আমার মতো বাচাল হলি।' কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা ! সুকুমার যেমন গম্ভীর ও স্তব্ধ ছিল, তেমনি রইল। 'এ কীরে বাবা ! মৌনীবাবা হয়েছিস নাকি তুই ? সাধু-সন্নেসীর কাছে দীক্ষা নিয়েছিস ? শনিবারের বারবেলায় কিছুতেই মৌনব্রত ভাঙবি না !' কিন্তু সুকুমার তবুও কিছুতেই আবহাওয়াটা হালকা করতে দেযনি। আসলে ও যেন এই আচম্বিত ব্যাপারে একেবারে হতভম্ব হয়ে গেছে।

ফলে থানা থেকে এনে ওকে ওর বাড়িতে পৌঁছে দিলে তারা। বীরেন অকুস্থল পরিদর্শন করলে ; নিচের আপিশ-ঘরে গেল ; উপরে সুকুমারের বসার ঘরে গেল। মৃতদেহ কীভাবে পড়েছিল, ভিতরে স্টিলের সিন্দুকের পাল্লা কিরকম খোলা ছিল, ওই ঘরের জানালা খোলা ছিল কিনা, ইত্যাদি যাবতীয় তথ্য জিগ্যেস করলে বীরেন। যথারীতি ওর প্রশ্নগুলো কথঞ্চিৎ অদ্ভুত হল, একটার সঙ্গে আরেকটার কোনো সংযোগ নেই ; কোনো প্রশ্নের কোনো আগাপাশতলা বোঝা যায় না ; কতগুলো প্রশ্ন তো দস্তুরমতো বোকা-বোকা শোনাল।

খুনের ঘরে গিয়ে জিগ্যেস করেছিল, 'এ-ঘরে ঢোকার উপায় কি ওই এক দরজাই, নাকি জানলাগুলো এ-বিষয়ে আগন্তুকদের সাহায্য করতে পারে। জানলার ওপাশে কী-- অলিন্দ শুধু ? তা এই অলিন্দ থেকে ঘরে ঢুকতে বা ঘর থেকে পালিয়ে অলিন্দে যেতে তো কারুই কোনো অসুবিধে হবার কথা নয়। তার জন্য সার্কাসের কসরৎ জানতে হয় না, ট্রাপিজের খেলায় ওস্তাদ হতে হয় না—ইচ্ছে থাকলে যে কেউই পারে। তোর কী মনে হয়, সমীর ? সম্ভব নয় ? সুকুমার, তুই ঘরে ঢুকে কী দেখেছিলি ? জানলা খোলা ? তা জানলা খোলা থাকাই স্বাভাবিক। এটা যেহেতু উত্তর মেরু নয়, কিংবা ঠাণ্ডা কুমেরুবলয়, বরং বিষুবরেখার নিকট-আত্মীয়, এবং যেহেতু ডি-এল-রায় বলে গেছেন কী বিচিত্র এই দেশে দিনে প্রচণ্ড সূর্যের অভ্যুদয় ঘটে থাকে, তখন এটা স্বাভাবিক যে সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি কেউই ঘরের দরজা-জানলা এঁটে গরমে ঘামবে না। সন্ধে হলেও না-হয় আলাদা কথা ছিল। সুতরাং সুকুমার, তোকে আর চেষ্টা করে ভেবে দেখতে হবে না, আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছি জানলার পাল্লা আটকানো ছিল না।...কী বললি ? খোলা ছিল বলেই তোর মনে পড়ছে ? ঠিক তাই— খোলা থাকাটাই স্বভাবিক। অতএব সমীর, দেখতে পাচ্ছ নিশ্চয়ই যে কোনো বহিরাগতর পক্ষেই এই ঘরে ঢুকে নিখিল সরকারকে কোতল

করা সহজসাধ্য ছিল।'

'ছিল, কিন্তু স্বার্থ কী ? বাইরের লোকই যে এসেছিল তারই বা প্রমাণ কোথায় ? বিকেলবেলা ঘরের দরজা বন্ধ করে নিখিল কী করছিল ?'

'তুই পুলিশে কাজ করিস, ওসব রহস্যের ব্যাখ্যান ও সমাধান তোকেই করতে হবে। বিকেলবেলা দরজা বন্ধ করে নিখিল কী করছিল, আমি জানি না, তবে আন্দাজ করতে পারি।'

'কী ?'

'কারুর সঙ্গে নিশ্চয়ই কোনো গোপন বৈঠক বসিয়েছিল, সে ই পরে রিভলবার চালিয়ে অলিন্দ দিয়ে পালিয়েছে। নয়তো কোনো গোপন কর্মে মগ্ন ছিল একা, জানলা দিয়ে কেউ ঢুকে রিভলবার চালিয়ে পরে প্রস্থান করেছে।'

এই জাতীয় কথোপকথন আরো দীর্ঘকাল চলতো, কিন্তু সুকুমারের ক্লান্ত ও শুষ্ক মুখচোখ দেখে তাদের বেরিয়ে পড়তে হল। যাবার আগে বীরেন সুকুমারকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে ফিশফিশ করে কী যেন বললে এবং সুকুমার ঘাড় নেড়ে উত্তরে তার প্রস্তাবে সম্মতি জানালে।

গাড়িতে বসে অশোকই প্রথম তার কৌতূহল প্রকাশ করল। 'কী বললি তুই সুকমারকে, গোপনে ?'

'কাল সকালের জন্যে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করলুম। তাছাড়া ও যাতে একজন ভালো ব্যারিস্টারের সঙ্গে যোগাযোগ করে, সেই কথাও জানিয়ে দিলুম।'

'ভালো ব্যারিস্টার কেন ?' অশোক ঈষৎ আতঙ্কিত হল। 'তোর কি তবে সত্যিই বিশ্বাস সুকুমার খুন করেছে ?'

'আমার বিশ্বাসের কথা ওঠে না, কারণ তাতে কিছুই এসে-যায় না। তবে সমীরের তা বিশ্বাস— এবং সমীর যেহেতু পুলিশের লোক, সেইজন্যে তার ধারণাই আসল।'

সমীর কিঞ্চিৎ আহত হল। 'কিন্তু আমি কী করব ? সুকুমারের বিরুদ্ধেই তো সমস্ত প্রমাণ উঁচিয়ে আছে। আমাকে তো আইন বাঁচিয়ে চলতে হবে। বন্ধু বলে আমি তো আর কর্তব্যে অবহেলা করতে পারি না। সেইজন্যেই আজকেই আমি অশোককে বলছিলুম যে পুলিশের চাকরি আমি ছেড়ে দেব। দু-দিক বাঁচিয়ে চলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।'

'দু দিক বাঁচিয়ে চলার কথা তো উঠছে না— আমি তো সেকথা বলিনি।' বীরেন বলল, তবে আমি কিছু সুবুদ্ধি আর কাণ্ডজ্ঞান প্রার্থনা করি তোর কাছে। রিভলবারের গুলিতে নিখিল খুন হয়েছে ; সরকারি সন্দেহ সুকুমারই আততায়ী। কিন্তু রিভলবারটা তোরা পেয়েছিস, যে-রিভলবারের গুলিতে নিখিল মারা গেল ? খুঁজেছিলি সেটা ভালো করে ? কোনো তথ্য বেরুলো সেটার সম্বন্ধে ?'

'রিভলবারটা সত্যি পাইনি।' সমীর স্বীকার করলে। 'কিন্তু যদি কারু ইচ্ছে থাকে তবে একটা রিভলবার পাচার করা কি খুব দুষ্কর ? খুন হবার পর খবর পেয়ে আমরা যেতে-যেতে বিস্তর সময় চলে গিয়েছিল। তার মধ্যে একটা রিভলবার লুকিয়ে ফেলাটা মোটেই কঠিন নয়।' সমীর তার মতামত ব্যক্ত করলে। 'এ-কথা শুনে তোরা ভাবিস না যে আমার ধারণা সুকুমারই হত্যাকারী। আসলে কালকে আরো-একটা ঘটনা ঘটেছিল, যেটা তোদের বলিনি। কিন্তু সেই ঘটনাটা ঘটেছিল বলেই সুকুমারের উপর সন্দেহটা আরো জোরালো হয়ে পড়ে।'

'কী সেটা, শুনি।' অশোক জিগেস করলে।

'আমার কাছে কোনো খবর চেপে গিয়ে তো কোনো লাভ নেই, সমীর,' বীরেন তাকে বললে, 'তাতে আমার ভাবনার পক্ষে বরং অহেতুক বিষম অসুবিধার সৃষ্টি কবা হবে। কী এমন ভীষণ বিষয় ঘটে গেল যার জন্য সুকুমারের উপর জোরালো সন্দেহ হয়, শুনি!'

প্রচণ্ড শব্দ করে যেন কোনো ফানুশ ফাটল, এমনি ভঙ্গিতে সমীর চাপা গলায় বললে, 'কাল আপিশে সুকুমার আর নিখিলের মধ্যে প্রচণ্ড ঝগড়া হয়েছিল— তার অনেক সাক্ষী আছে।'

'ঝগড়া হয়েছিল ? নিখিলের সঙ্গে সুকুমারেব ? আর তুই এ-কথাটা আমাকে আগে বলিসনি!' বীরেন এতক্ষণ হেলান দিয়ে বসেছিল গাড়িতে, এবাব ধড়মড় করে উঠে বসল। আধপোড়া সিগারেটটা জানলা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললে, 'কী নিয়ে ঝগড়া বেধেছিল, তা তুই জিগেস করেছিলি ?'

'ও-তো বলে যে ওই হিশেবের গণ্ডগোলটা নিয়েই', সমীর জানালে, 'ও কক্‌খনো বরেন দেব আর ওঙ্কার গুপ্তকে ওভাবে ছেড়ে দেয়াটা সমর্থন করেনি— ফলে ওই নিয়ে প্রায়ই তাদের কথা-কাটাকাটি হত ; কাল সেই বিবাদ প্রায় চরমে গিয়ে পোঁছোয়।'

'এটা কি তোর কাছে খুন করার মতো জরুরি কোনো মোটিভ বলে মনে হয় ?' বীবেন পালটা প্রশ্ন করলে।

'কিন্তু এটা তো সুকুমারের কথা। এটা যে-নির্জলা সত্যি, এটা তুই ধবে নিলি কী করে ? সে-যে সব কথা খুলে বলেছে, এবং সব সত্যি বলেছে, তার তো কোনো প্রমাণ নেই। তাছাড়া ওই হিসেবের গণ্ডগোলের জন্যে সুকুমার সর্বদাই বরেন দেব এবং ওঙ্কার গুপ্তকে দায়ী করেছে— কিন্তু তার প্রমাণ কই ? পুরনো খাতাপত্র— ওই তো বলল এ-কথা— নাকি নষ্ট করে ফেলা হয়েছে। দলিলটাও দেখাতে পারল না, যেখানে গুপ্ত অ্যান্ড দেব কম্পানি টাকা চুকিয়ে দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। সব তো ওর মুখের কথা। ওঙ্কার গুপ্ত আর বরেন দেব যদি অস্বীকার করে ?'

'অস্বীকার কি করেছে ? তুই জিগেস করেছিলি ওদের ?'

'বরেন দেব-এর সঙ্গে অবশ্য আমার দেখা হয়নি।' সমীর স্বীকার করলে। 'কিন্তু ওঙ্কার গুপ্তর আপিশে আমি গিয়েছিলুম। সে তো শ্রেফ অট্টহাসি হাসল। বলল, "আপনি এসব প্রলাপ বিশ্বাস করেন, মিস্টার সেনগুপ্ত ? কোনো রেজিস্টার্ড সি. এ এ-সব ব্যাপারে লিপ্ত থাকতে পারে ?" সত্যি, পুরো ব্যাপারটা বিবেচনা করে আমাকে নিজের কাছেই মস্ত একটা উজবুক বলে মনে হল। সুকুমারের এসব কথা কি সম্পূর্ণ আজগবি ও অবিশ্বাস্য নয় ? তুই নিজেই বিবেচনা করে দ্যাখ।'

'স্বীকার করি, পুরো ব্যাপারটায় আঁশটে গন্ধ পাওয়া যায়— আমিষের গন্ধ, বীরেন আরেকটা সিগারেট ধরাল, 'তোরা যাকে fishy ব্যাপার বলিস। কিন্তু এর মধ্যে খানিকটা সত্য আছেই। উজবুক শোনাবে জেনেও সুকুমার যখন এ কথাটা বারে-বারে বলছে, তখন এর মধ্যে একটা-কিছু আছেই।'

'তা-ছাড়া সুকুমারের কথা অনুযায়ী যাদের সন্দেহ করা যেতে পাবে, তারা ওঙ্কার গুপ্ত ও বরেন দেব। কিন্তু সুকুমারই নিজে তাদের সবচেয়ে বড়ো অ্যালিবাই। সুকুমারই এটা বললে যে রিভলভারের শব্দ যখন হয়, তখন ওঙ্কার গুপ্তর সঙ্গে সে ফোনে কথা বলছিল— এবং বরেন দেবও ওঙ্কার গুপ্তর হাত থেকে রীসিভার নিয়ে সেই সময় একবার ওর সঙ্গে কথা বলে। একটা লোক তো আর যুগপৎ দু-জায়গায় থাকতে পারে না : একই সঙ্গে এই পঞ্চভূতে গড়া মনুষ্যদেহ বড়োবাজারে আর ওল্ড বালিগঞ্জে উপস্থিত থাকে কী

করে? দু-পাঁচ মিনিটেও বড়োবাজার থেকে পুরনো বালিগঞ্জে আসা যায় না: দামি হেলিকপ্টারেও যায় কিনা আমার সন্দেহ— তবে রোলস রয়েস থাকলেও যে যায় না, তার আরো একটা জোরাল কারণ কাল বিকেল পাঁচটা নাগাদ যথারীতি বড়োবাজারে ট্র্যাফিক জ্যাম হয়েছিল— রাত সাতটার আগে তা ক্লিয়ার হয়নি।'

'অর্থাৎ যেহেতু অন্য-কারুর উপর সন্দেহ হয় না, কিংবা সন্দেহ হলেও যাবতীয় ঘটনার বয়নে সেই সন্দেহ টেকে না, সেইজন্যেই তুই সুকুমারকে সন্দেহ করছিস?'

'সুকুমারের বিরুদ্ধে মামলা অত্যন্ত চমৎকার সাজানো যায়। কম্পানির পার্টনার, কম্পানিতে কয়েক লাখ টাকার গণ্ডগোল, এবং একজন অপসারিত হলে আরেকজনের উপর সমস্ত সম্পত্তি বর্তায়—'

'এই কথাগুলি তো নিখিল সম্বন্ধেও প্রযোজ্য।'

'প্রযোজ্য, কিন্তু খুন সুকুমার হয়নি, হয়েছে নিখিল।' সমীর ড্রাইভারকে নির্দেশ দিলে, 'বাঁয়ে বাঁধো।' তারপর বীরেনের দিকে ফিরে বললে, 'আমি আর নামছি না। আমাকে একবার থানায় গিয়ে রিপোর্ট লিখে আসতে হবে। কাল তোর সঙ্গে যোগাযোগ করব। অশোক কি আমার সঙ্গে যাবি নাকি? তোকে অনেক দূর অবধি লিফ্‌ট্‌ দিতে পারি।'

বীরেন নামতে-নামতে বললে, 'অশোক না হয় আমার সঙ্গেই থাক। কাল সকালে বাড়ি ফিরবে। তোর তো বাড়ি ফেরার তেমন তাড়া নেই, অশোক?'

'না। তেমন আর কী?'

'বেশ। তাহলে এখানেই খেয়ে-দেয়ে শুয়ে পড়বি। এত রাতে আর উল্টোডাঙার খালেবিলে ফিরে লাভ নেই। হ্যাঁ, আমার ক্রিকেট কিটটা নামিয়ে নে। উঃ, একটা দিন গেল বটে যা হোক! ধকলের পরে ধকল! তাহলে ওই কথাই রইলো, সমীর। কাল আমার সঙ্গে যোগাযোগ করবি! অ্যাঁ?'

৫

সেই যে ছোট হাজরি সেরে অশোক রুদ্র বীরেনের বাসস্থান থেকে বাড়ি ফিরল; তারপর সাত দিনের মধ্যে আর বীরেনের সঙ্গে দেখাই করতে পারলে না! নাঃ, নিজের কাজে আটকা পড়েছিল, এমন নয়। বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ হয়ে গেছে পুজো উপলক্ষে কাজেই যাদবপুরে ইউনিভার্সিটির আর্টস কলেজে ওর সঙ্গে দেখা করার প্রশ্নই ওঠে না। খেলার মাঠেও বীরেন অনুপস্থিত: এই সাতদিনে ওর দলের দুটি খেলা ছিল ছোটখাট: টেন্টে বা প্যাভিলিয়নে ফোন করেও কোনো পাত্তা পাওয়া গেল না। যতবারই তার বাড়িতে খবর নিলে, ভৃত্য জানালে, 'কর্তা তো বেরিয়ে গেছেন, কখন ফিরবেন কিছু বলে যাননি।' এমনকী দু-দিন রাত নটা অব্দি অপেক্ষা করেও কোনো ফল হলো না। তাছাড়া পুজো উপলক্ষে অশোকের বরাতে কিছু খুচরো গদ্য লেখার আমন্ত্রণ জুটেছিল, বায়না নেয়া আগে থেকে, ফলে সেগুলি সারতে হল বলে সে যে একরাত বীরেনের বাড়ি থেকে যাবে, তারও কোনো জো ছিল না। এর মধ্যে একদিন সমীরের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল, কিন্তু সমীরও বীরেনের কোনো হদিশ দিতে পারেনি। বরং সেও যে ওর সঙ্গে দেখা করার জন্য উৎসুক, এটাই বারংবার জানিয়ে দিয়েছিল। যদি অশোকের সঙ্গে বীরেনের এর মধ্যে দেখা হয়, তাহলে সে যেন সমীরের সঙ্গে যোগাযোগ করে। সুকুমারের মামলাটা রোগা রজ্জুতে ঝোঝুল্যমান: অচিরে সে বিষয়ের মীমাংসা না হলে সমীরের পক্ষে কাজ করা মুশকিল হয়ে পড়বে— কেননা ওপরওয়ালা বড্ড তাগাদা দিচ্ছেন। আর অশোক যে

সুকুমারের কাছে গিয়ে কোনো খবর নেবে, সে রকম সাহস বুকের মধ্যে সঞ্চয় করে উঠতে পারেনি। বড্ড অস্বস্তি হয় সুকুমারের কাছে গেলে। তাছাড়া কী করবে কী বলবে তাও ঠিক করে ওঠা যায় না। বিশেষ করে ও এত অভিমানী আর স্পর্শাতুর যে কীসে যে পান থেকে চুন খশবে বলা মুশকিল। তার চেয়ে বরং সার্কাসের হরবোলা ভাঁড় বোধকরি অনেক সহজে রোগা দড়ির উপর দিয়ে হেঁটে যেতে পারে। সুতরাং বীরেনের জন্যে হন্যে হয়ে বারংবার খবর নেওয়া ছাড়া এ-সাত দিন তার করার কিছু ছিল না। সপ্তম দিনে যখন লেখার পাট চুকিয়ে দিল, তখন সন্ধ্যেবেলায় বীরেনের বাড়ি গিয়ে সে জাঁকিয়ে বসল। দেখা যাক বীরেন কখন বাড়ি ফেরে। অশোক আজ রাতে আর উল্টোডাঙাই ফিরবে না— সারা রাতই না হয় বীরেনেব জন্যে অপেক্ষা কববে।

বীরেন কিন্তু ফিরল সন্ধে সাতটা নাগাদ। ক্লান্ত ও বিধ্বস্ত চেহাবা। ঘবে ঢুকেই অশোককে দেখে বলল, 'ও, তুই আছিস? ভালোই হল, কাল তোর সঙ্গে যোগাযোগ কবব ভেবেছিলুম।' তারপর চেঁচিয়ে ভৃত্যকে বললে, 'বাথরুমে গরম জল দাও তাড়াতাড়ি।' তারপর একটা চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে চোখবুজে পড়ে রইল। শুধু আস্তে অশোককে বলল, 'কোনো কথা নয় এখন। চান না-কবে একটা কথাও আমি বলতে পাবব না। কৌতূহল একটু সংবরণ করলে বাধিত হব। আর না হলে পাগলা দাশুব মতো আমাকেও একটা চিনে বাক্স নিয়ে এক মাস ঘুরে বেড়াতে হয় এবং অতঃপব পয়লা এপ্রিলে সেটা তোর হাতে সমর্পণ করে দিয়ে আড়ালে লুকিয়ে দেখতে হয়, অধিক কৌতূহল ভালো নয়, এই ফতোয়া দেখে তোর মুখভঙ্গি কেমন হল।'

'বড্ড কঠিন তোব বাগবিন্যাস; অন্বয় করতে গেলে প্রাণ বেরিয়ে যাবে।' অশোক বললে, 'এত কথা না বলে সোজা বললেই পারিস এ ক-দিন তুই সম্পূর্ণ ডুব মেবেছিলি কেন? এবং কোথায়?'

'আমি তো আর শিশুমার বা উদ্‌বেড়াল নই,' বীবেন তাকে জানালে, 'বা ক্যাপ্টেন নেমোর মতো কোনো নটিলাসও তৈরি করিনি যে ছ সাত দিন ডুব মেবে থাকতে পাবব। বয়া আঁকড়ে ভাসছিলুম যথারীতি। কিন্তু কোথায়, কী, কেন, কখন—এই যাবতীয় কদাকার প্রশ্নের উত্তর তোকে এখন আমি কিছুতেই দেব না।'

এবং, সত্যি, যতক্ষণ-না ও স্নান করে এল, ততক্ষণ ওর মুখ থেকে আব টুঁ শব্দটিও বাব করানো গেল না।

আধ ঘণ্টাটাক পরে চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিতে-দিতে সে-ই নিজে কথাটা পাড়লে, 'জীবনে নিজেকে এমন উজবুক আর-কখনো মনে হয়নি আমাব।'

'কেন? কী আবার হল?'

'নিখিলকে কিনি খুন করেছেন, সে বিষয়ে আমার কোনো সংশয়ই নেই। কিন্তু তিনি এত গভীর জলে বাস করেন যে তাঁকে ছোঁবার মতো ধীবরও কোথাও নেই।'

'অর্থাৎ?'

'পুরো ব্যাপারটা যে সত্যি ওঙ্কার গুপ্ত আর বরেন দেবের যুগ্ম কীর্তি, তাতে কোনো সন্দেহই থাকে না। সুকুমার প্রত্যেকটি কথা সত্য বলেছে— অবশ্য অনেক কথা চেপেও গেছে, যার ফলে পুরো ব্যাপারটা ঘোরালো হয়েছে আবো, কিন্তু তাহলেও মূলত ওকে আজগবি ও অবিশ্বাস্য শোনাবে জেনেও সত্যি কথা বলার জন্যে ধন্যবাদ দিতে হয়। কিন্তু অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে ওদের কারুর চুলের ডগাই স্পর্শ করা যাবে না।'

'কিন্তু ওঙ্কার গুপ্ত আর বরেন দেব খুন করবে কী করে? ওরা তো তখন সুকুমারকে

বড়োবাজার থেকে ফোন করেছিল। আর ওরা-যে সত্যি বড়বাজার থেকে ফোন করেছিল, তার প্রমাণ তো টেলিফোনভবনের এজাহার। ওরা-তো জানিয়েছে সত্যি সে-সময় সুকুমারের কাছে ওঙ্কার গুপ্তর আপিশ থেকে ফোন এসেছিল।'

'সেইটেই তো সমস্যা। একজন মহাপুরুষ যুগপৎ দু জায়গায় বিরাজ করেন কী করে ? যেহেতু তাঁর নশ্বর দেহ ক্ষিতি অপ্ মরুৎ তেজ ব্যোমের সমবায়, এবং যেহেতু এই সমবায় একবার প্রাণের স্ফুলিঙ্গ হারালে ফিরে পায় না কিংবা দু-খণ্ড হয়ে যুগপৎ দু-জায়গায় বিরাজ করে না, অতএব এটা কী করে সম্ভব যে ফোন এবং হত্যাকাণ্ড একজনের কীর্তি। অথচ খুন যে বরেন দেব করেছেন, এ বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ নেই।'

'বীরেন !' অশোক প্রায় লাফিয়ে উঠল, 'আচ্ছা, এমনও হতে পাবে যে ওঙ্কার গুপ্ত টেপ-রেকর্ডার ব্যবহার করেছিল ?'

'অর্থাৎ ?'

বীরেনের স্মিত বয়ানের দিকে তাকিয়ে অশোক ঈষৎ দমে গেল।

'কেন ? আগে থেকে বরেন দেব আর ওঙ্কার গুপ্ত খুনের পরিকল্পনা করে রেখেছিল।'

'তা তো আমিই বললুম। কিন্তু টেপ-রেকর্ডার কেন ?'

'ঠিক ছিল অতটার সময় বরেন যখন নিখিলের ঘরে থাকবে, তখন ওঙ্কার গুপ্ত সুকুমারকে ফোন করবে এবং টেপ চালিয়ে দিয়ে বরেনের গলা বাজিয়ে শোনাবে।'

'সত্যি !' বীরেন যেন অত্যন্ত উৎসাহিত হয়ে উঠল, এমনকি তার ভঙ্গি হল, 'আবে। এত বুদ্ধি তো আমার মাথায় কক্‌খনো খেলেনি ! সত্যি, আধুনিক কবিতা না-লিখলে বা চতুর্থ শ্রেণীর গোয়েন্দা কাহিনী না পড়লে এত বুদ্ধি হয় ! বাহবা ! শাবাশ ! চমৎকার !'

অত্যন্ত মিনমিনে গলায় অশোক জিগেস করলে, 'কেন ? আমার কথাটা কি বোকার মতো শোনাচ্ছে ?'

'মোটেই না ! এইজন্যই তো কবি গাহিয়াছেন, "যেখানে দেখিবে ছাই, উড়াইয়া দেখো তাই..." ইত্যাদি। অত্যন্ত বোকা লোকও যে অসীম বুদ্ধিমানের মতো এক-আধটা কথা বলতে পারে, এই সুভাষিতটা তারই নজির। তবে আমার বুদ্ধি তো অত্যন্ত কম কিনা—ছেলেবেলায় আবার একবার শজারু কামড়েছিল, তাই কোনো বিষয়ে চট করে বুদ্ধি খেলে না। সেইজন্যেই আমি একটা ছোট্ট বিষয় বুঝতে পারি না, কেমন করে একজন লোক আন্দাজ করবে ফোনে অপর প্রান্ত থেকে কী কথা বলা হবে ? ভবিষ্যতে একজন লোক কী কথা বলবে, এবং কোন কথার পিঠে সে কী কথা শোনাবে, এটা কোনো লোক আগে থেকে জেনে যায় কী করে, আমি তা অবশ্য ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে বুঝতে পাবি না। আমার বুদ্ধির অপরিবর্তনীয় অক্ষমতার জন্যই এটা আমার ধারণা যে লোকে যখন ফোনে কারুর সঙ্গে কথা বলে, তখন তাকে অপর পক্ষের কথা শুনে তারপর সেই কথার পিঠে আরো-কিছু বলতে হয়। কথার পিঠে কথা বলাকে বলে কথোপকথন। ফোন করা বলতে আমরা সংলাপের সেই আদান-প্রদানই বুঝে থাকি, ভাব ও চিন্তার বিনিময়, তথ্যের দেয়া-নেয়া। সেখানে কেউ তোতাপাখির মতো একশো বছরের পচা রাবিশ পদ্য আউড়ে তাকে আধুনিক কবিতা বলে চালাবার চেষ্টা করে না। যে সিম্বলিজম মরে-পচে-গলে গন্ধ ছড়ায়, তাকে কেউ নতুন বস্তু বলে ধাপ্পা দেয় না সেখানে। বরং একজন লোক কী বলল তা শুনে তার উত্তরে একটা সর্বজনগ্রাহ্য ভাষায় কোনো বাক্য আওড়াতে হয়। অতএব টেপ-রেকর্ডার করে বরেন দেবের পূত কণ্ঠস্বর ও পবিত্র বাণী শোনান যায় কী করে তা আমি জানি না। মানি, মহাপুরুষের বাণী চারিদিকে কোলাহল করে, কিন্তু টেলিফোন করে

সেই বাণী শোনালে...'

অশোক বাধা দিলে। 'না-হয় আমার কথাটা বোকার মতোই শোনাল। কিন্তু তাই বলে এটা তোর ক্লাশঘর নয় যে তোর অমন একটা দীর্ঘ বক্তৃতা এবং তাও বাজে রসিকতায় ভরা, আমাকে হজম করতে হবে।'

'আমার ক্লাশ করলে আখেরে তোর ভালোই হত। তাহলে এরকম আবোলতাবোল বলতিস না।'

'কিন্তু তাহলে তুই বলছিস এটা অশরীরী কাণ্ড? কিংবা বরেন দেবের দুটো শরীর আছে। একটা যখন বড়বাজার থেকে ফোন করে, আরেকটা তখন পুরনো বালিগঞ্জে রিভলবার চালায় ও সিন্দুক থেকে দলিল চুরি করে? অর্থাৎ এটা পাঞ্চভৌতিক কাণ্ড নয়, আধিদৈবিক কিছু? ভুতুড়ে গল্প হিশেবে মন্দ হবে না, কিন্তু আদালতে চলবে কী করে, ভেবেছিস কিছু?'

'ভুতুড়ে ব্যাপার এটা নয়, তবে অদ্ভুতুড়ে কিছু তাতে কোনো সন্দেহ নেই। নিশ্চয়ই বৈজ্ঞানিক একটা ব্যাখ্যা আছে, কিন্তু পুরো ব্যাপারটা আমাদের দৃষ্টি এড়িয়ে যাচ্ছে। আর সেটাই গুপ্ত অ্যান্ড দেব কম্পানির সমস্ত স্পর্ধার কারণ।'

'তুই কিছু ভেবেছিস এ-সম্বন্ধে?'

'তোকে তো বললুমই যে ছেলেবেলায় একটা শজারু আমাকে এমন আঁচড়ে-কামড়ে দিয়েছিল যে তারপর থেকে কিছুতেই আমার বুদ্ধি খোলে না সহজে।'

'তাহলে?' অশোক জিগেস করলে, 'তাহলে শেষকালে সুকুমারের ঘাড়েই সব দোষ চাপবে?'

'তা-ই তো দাঁড়াচ্ছে ব্যাপারটা। যতক্ষণ না এ-ব্যাপারটার মীমাংসা হচ্ছে কী করে একটা লোক একই সময়ে এক জায়গা থেকে ফোন করতে পারে এবং অন্য জায়গা থেকে রিভলবার চালাতে পারে, ততক্ষণ পর্যন্ত এ সমস্যার কোনো সমাধান হবে না।'

'তুই যদি নিশ্চিত জানিস ওরাই খুনের জন্যে দায়ী, তাহলে এটাও তো হতে পারে যে ওরা কোনো ভাড়াটে গুণ্ডা লাগিয়েছিল। বাইরের কোনো তৃতীয় ব্যক্তি।'

'খুনের ব্যাপারে গুণ্ডা লাগানোর ব্যাপারটা বড্ড ঝক্কির নয়? তাছাড়া বাইরের কোনো ভাড়াটে গুণ্ডা চট করে ওই দলিলটা সিন্দুক থেকে বার করবে কী করে? কেমন করে সে জানবে যে এতগুলো সিন্দুকের মধ্যে বেছে-বেছে ওইটেতেই দলিলটা আছে? আর তারপরে কয়েক লাখ টাকার দলিল হাতিয়ে নেবার পর সে-যে গুপ্ত অ্যান্ড দেবকে ব্ল্যাকমেল করবে না, তারও কি কোনো স্থিরতা আছে। ওটা তো তুরুপের তাস হয়ে রইল; সোনার খনি কিংবা স্বর্ণডিম্বপ্রসবিণী হংসী: যে-উপমাটা তোর পছন্দ ওটাই তুই গ্রহণ করতে পারিস। সুকুমারকে ওই দলিলটা ফেরৎ দেবার ভয় দেখিয়ে সে অজস্র অর্থ বরেন দেবের কাছ থেকে দাবি করতে পারে। নাঃ, অমন একটা কাঁচা কাজ তারা করবে না! কোনো গুণ্ডা ভাড়া করবে না ওরা কিছুতেই। তাছাড়া গুণ্ডা ভাড়া করলে ওরা এমন নিশ্চিন্ত, নির্বিকার ও বেপরোয়া থাকতে পারত না। উঁহু, ব্যাপারটা এ-রকম নয়। নির্ঘাৎ বরেন দেবই খুন করেছে। কিন্তু কী করে এই অসম্ভব ব্যাপার সম্ভব সেটাই বিবেচ্য।'

'বরেনই যে খুন করেছে, এটা তুই কী করে বুঝলি?'

'তুই কি ভেবেছিলি এ-ক-দিন আমি অশ্বতরদের খাদ্যসংগ্রহের জন্যে মাঠে-মাঠে বিচরণ করছিলুম? বহু কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে রীতিমতো।'

'যথা?'

'প্রথমে সুকুমারদের কম্পানি সম্বন্ধে নানাবিধ তথ্য সংগ্রহ করলুম, এবং তার ফলেই পুরো ব্যাপারটা স্পষ্ট হয়ে গেল। সুকুমারের কথায় যতটুকু অসংগতি বা কুয়াশা ছিল, সব তাতে দূর হয়ে গেল।'

'কী এমন মহাতথ্য আবিষ্কার করলি ?'

'আবিষ্কার করলুম নিখিল সরকারের চক্রান্ত।'

'তার মানে ?'

'নিতান্ত সরল অর্থ, অতি পরিষ্কার,
বহু পুরাতন ভাব, নব আবিষ্কার।
ত্র্যম্বকের ত্রিনয়ন ত্রিকাল ত্রিগুণ,
শক্তিভেদে ব্যক্তিভেদে দ্বিগুণ বিগুণ।
বিবর্তন আবর্তন সম্বর্তন আদি
জীবশক্তি শিবশক্তি কয়ে বিসম্বাদী।
আকর্ষণ বিকর্ষণ পুরুষ প্রকৃতি—'

অশোক বীরেনের মুখ থেকে কথা কেড়ে নিয়ে উদ্ধৃতিটা শেষ করে দিলে : 'আণব চৌম্বকবলে আকৃতি বিকৃতি।
কুশাগ্রে প্রবহমান জীবাত্ম বিদ্যুৎ
ধারণা পরমা শক্তি সেথায় উদ্ভূত।
ত্রয়ী শক্তি ত্রিস্বরূপে প্রপঞ্চে প্রকট—
সংক্ষেপে বলিতে গেলে হিংটিং ছট। — এসব কথা সবাই জানে, কিন্তু তাতে কী ?'

'তাতে কী ? তাতেই তো সব।'

'অর্থাৎ ?'

'গুড়গুড়গুড় গুড়িয়ে ধামা খাপ পেতেছেন গোষ্ঠমামা—'

'বীরেন, থামবি। না হয় কতগুলো কথা তুই জেনেই ফেলেছিস। কিন্তু তাই বলে এই ভাঁড়ামো কীসের জন্যে ? বলবি তো বল।'

'বললুমই তো বহুপুরাতন ভাব, নব আবিষ্কার। বাঙালির ব্যবসা লালবাতি জ্বালে কেন, লাটে ওঠে কেন, সে তথ্য কি নতুন কিছু ? নিখিল সরকার সুকুমারকে ঠকাবার মৎলব করেছিল। খাতাপত্রের কারচুপি, হিসেবের গোলকধাঁধা, গুপ্ত অ্যান্ড দেবের মহাধাপ্পা— সমস্তর উৎস হচ্ছে নিখিল সরকার। তারই পরামর্শে পুরো ব্যাপারটা সাধিত হয়েছিল। সুকুমার কোনোকালেই ব্যাবসার সাত-পাঁচে বিশেষ থাকত না, নিখিলই ছিল বলতে-গেলে সর্বেসর্বা ! টাকা সরিয়েছিল সেই। হঠাৎ সরকারি দপ্তরের টনক না-নড়লে একদিন আস্ত কম্পানি লাটে তুলে দিয়ে সে নিজেই নতুন আরেকটি কম্পানি খুলে বসত। এ বিষয়ে তার সাহায্যকারী ছিল বরেন দেব আর ওঙ্কার গুপ্ত। কিন্তু সরকারের টনক নড়তেই ওদের সব পরিকল্পনা ভেস্তে গেল। ব্যাপারটাকে ধামাচাপা দেবার জন্যে নিখিল তাড়াতাড়ি বরেনদের শিখণ্ডী দাঁড় করিয়ে তখনকার মতো সবকিছু ধামাচাপা দেবার চেষ্টা করলে। মনে আছে, আমরা সব শুনে খুব বিস্ময় প্রকাশ করেছিলুম ? বলেছিলুম যে ওরা যদি দায়ীই হবে, তাহলে ওদের পুলিশে দেওয়া হল না কেন ? দেওয়া হল না নিখিলের জন্যে। ব্ল্যাকমেল নয়, সে-ই চক্রান্তের নেতা ছিল। অবশ্য নারীঘটিত একটি ব্যাপারও আছে। ওঙ্কার গুপ্তর রূপসী স্ত্রী বাতাবরণে দণ্ডায়মানা ছিলেন। তার কাছে কতগুলি বিশ্রী চিঠি লিখেছিল নিখিল, সেগুলোই ছিলো ওঙ্কার গুপ্তদের রঙের টেক্কা সাহেব বিবি

গোলাম দশ— অর্থাৎ দেড়শো অনার্স। টাকাগুলো নিখিলকে বাধ্য হয়ে দেব, গুপ্ত অ্যান্ড সরকার বলে ইলেকট্রিক্যাল গুডসের একটা কম্পানিতে ঢালতে হয়। না হলে ব্যভিচারের মামলায় পড়তে হত। আর অত টাকা জোগাড় করতে গিয়েই সরকার অ্যান্ড সরকারের টাকায় হাত পড়ে।'

'তাহলে নিখিলই তো ছিল স্বর্ণডিম্বপ্রসবিণী হংসী। ওকে বরেনরা খুন করল কেন?'

'দেব, গুপ্ত অ্যান্ড সরকারের অংশিদার কমাবার জন্যে। তাছাড়া সাময়িকভাবে যে দলিলটা তারা তৈরি করেছিল সুকুমারকে ধোঁকা দেবার জন্যে, সেটা হাতাবার জন্যে। তারা তখনকার তাড়াহুড়োয় এই দলিলে দস্তখৎ করেছিল, কিন্তু পরে ভেবে দেখল যেহেতু নতুন হিসেবের খাতা তৈরি করে পুরোনো খাতা সম্পূর্ণ নষ্ট করা হয়েছে, তখন অ্যাকাউন্টেন্ট ও অডিটরকে ছোঁবার কোনো উপায়ই নেই— শুধু ওই দলিলটাই গোলমেলে বিষয়। ওটাকে যদি হাত করা যায় কোনোরকমে তাহলে তারা দুজনে দৃশ্যের বাইরে চলে আসে। অতএব—'

'অতএব নিখিলকে খুন করে দলিলটা হাতাল?'

'ঠিক তা-ই।'

'তা নিখিলও যে এ ব্যাপারে জড়িত, সুকুমার সেটা চেপে গেল কেন?'

'এটা মনস্তত্ত্বঘটিত ব্যাপার। এ-প্রশ্নের উত্তর আমার পক্ষে দেওয়া অসাধ্য। তবে নিখিল যে চক্রান্তের পাণ্ডা সুকুমার এটা জানতে পারে খুনের দিন দুপুরে। মনে আছে সেদিন নিখিলের সঙ্গে ওর প্রচণ্ড ঝগড়া হয়— তার কারণই হল সুকুমার তখন দৈবাৎ ব্যাপারটা জেনে ফেলেছে। আসলে আগে ও জানত যে ওঙ্কার গুপ্তর স্ত্রীর সঙ্গে নিখিল একটা কেলেঙ্কারি বাধিয়েছে বলে নিখিল ওদের হাতের মুঠোয় চলে গেছে - ফলে ওদের চটাবার সাহস নিখিলের নেই। ও একটা আপোষ করতে চায়। চিঠিগুলো পেলেই দলিলটা দিয়ে দেবে, নিজের লভ্যাংশ থেকে সরকার অ্যান্ড সরকারের বকেয়া মিটিয়ে দেবে। এই জন্যে ওর সঙ্গে সুকুমারের আগে কেবল কথা-কাটাকাটি হত। কিন্তু নিখিল যে পুরো কম্পানিটাই ডুবিয়ে দিয়ে নতুন কম্পানি খুলতে চায় ওদের সঙ্গে, এবং ওদের কম্পানির টাকা যে আসলে তার প্ররোচনাতেই সরানো হয়েছে, এটা জানবার পরেই ওর সঙ্গে আপিশে তুমুল বচসা হয়ে যায়।'

'সমস্তই বুঝলুম। কিন্তু এটা-তো মোটিভের দিকে গেল : না হয় অবস্থাগতিকও বোঝা গেল। কিন্তু বরেনই যে খুন করেছে, তার প্রমাণ কী?'

'যতক্ষণ পর্যন্ত না এটা প্রমাণ করছি, কেমন করে একটা জ্যান্ত মানুষ একই সঙ্গে দু-জায়গায় থাকতে পারে, ততক্ষণ এটা প্রমাণ করা যাবে না। তবে আমার সন্দেহের কারণ কী, তা বলতে পারি।'

'কী?'

'হঠাৎ বরেন দেব আর ওঙ্কার গুপ্ত সুকুমারকে ফোন করতে যাবে কেন? ওদের যাবতীয় সম্পর্ক তো নিখিলের সঙ্গে— বরেন দেবের চাকরি যাবার পর থেকে সে একবারও সুকুমারের সঙ্গে কথা বলেনি। যাবতীয় বাণী বিনিময় হত নিখিলেরই সঙ্গে। হঠাৎ খুনের দিনেই এবং খুনের সময়েই ফোন করার মানে হল ওরা একটা অ্যালিবাই প্রতিষ্ঠা করতে চায়। যেন বলতে চায় যে আমরা কী করে খুন করব, আমরা তো বড়োবাজার থেকে ফোন করেছিলুম। কিন্তু যেহেতু অ্যালিবাই প্রতিষ্ঠার জন্যে ওদের এই ব্যগ্র প্রচেষ্টা, সেইজন্যেই বোঝা যায় একটা লোক একই সঙ্গে যুগপৎ দু-জায়গায় থাকতে

পারে। কিন্তু কেমন করে, এটাই প্রশ্ন।'

'অর্থাৎ ?'

'অর্থাৎ ? সংক্ষেপে বলিতে গেলে হিংটিং ছট !'

৬

সাড়ে-আটটার সময় অশোক খাবার-ঘরে এসে দেখলে বীরেন ছোট-হাজরি প্রায় সেরে ফেলেছে। স্নান করে এসেছে সে একটু আগে ; ও ডি কোলনের মৃদু সুগন্ধ ভেসে আসছে হাওয়ায় ; পরনে শাদা শার্ট, শাদা ট্রাউজার আর ক্রিকেট-শু।

'এ-কী রে ? খেলতে বেরুবি না কি আজ ?'

'নিশ্চয়ই।' বীরেন চায়ে চুমুক দিলে। 'এমনিতেই পর-পর দুটো খেলা নষ্ট হল। আজকের খেলাটা কিছুতেই নষ্ট করা যায় না। তাছাড়া ; টেবিলের উপর থেকে চার্মিনারের প্যাকেট আর ক্যাটকেটে সবুজ রঙের লাইটারটা তুলে নিতে নিতে বললে, 'তুই হয়তো অবাক হয়ে যাবি শুনলে, আজ বিপক্ষে কে খেলবে ?'

'কে ?'

'বরেন দেব। সে নাকি মস্ত পেস-বোলার। বলে নাকি দস্তুর-মতো প্রবল বিষ আর আঘাত আছে এবং সে বল নাকি চোখে দেখা দুষ্কর।'

'তাহলে একজন চার্লি গ্রিফিথ বল—'

'গ্রিফিথ হয়তো নয়, তবে কোন না রঞ্জানে-দেশাই হবে।'

'কলকাতার মাঠে ফাস্ট বল হয় ? আমি তো শুনেছি এখানকার যা পিচ, তাতে মিডিয়াম পেস ছাড়া আর কিছুই সম্ভব নয়।'

'এখানেও যে ফাস্ট বল হয়, তা নাকি বরেন দেব প্রমাণ করেছে। এবার রনজি ট্রফি ও দলিপ প্রতিযোগিতায় সে খেলবে বলে জোর গুজব উঠেছে কলকাতায়।'

'সত্যি ভালো খেলে ? তোর কী মনে হয় ?'

'আমি তো এখনো ওর মুখোমুখি দাঁড়াইনি, ফলে আমার নিজের ধারণা বলতে পারব না। তাছাড়া ওর খেলা আমি দেখিওনি। তবে পর-পর কতগুলি খেলায় ও দস্তুরমতো বিভীষিকা ও আতঙ্ক সৃষ্টি করেছে : সাত-আটটা করে উইকেট পাচ্ছে রোজ !'

'কিন্তু তোর পক্ষে কি এখন খেলতে যাওয়া উচিত হবে ?'

'কেন নয় ? তাছাড়া ঘরে বসে দার্শনিক আলোচনা করলেই বা কোন বোধি লাভ হবে ?'

'কিন্তু নিখিল সরকারের হত্যারহস্য—'

'রহস্য তো কিছু নেই। সব তো দিবালোকের মতো স্পষ্ট—'

'আহা, না-হয় রহস্য না-ই হল। কিন্তু বরেন দেবকে গ্রেফতার করার কিছু একটা—'

'সে দায়িত্ব আমার নয়, কেননা আমার নাম সমীর সেনগুপ্ত নয় এবং আমি পুলিশে কাজ করি না।'

'কিন্তু সমস্যার সমাধানটা না করে দিলে সমীর কী করবে ?'

'অস্যার্থ ?'

'কোনো মহাপুরুষ কী করে একই সময়ে দু-জায়গায় বিরাজ করতে পারেন, সেটা বের করতে হবে তো।'

'ঘরে বসে ভাবলে সে প্রশ্নের কোনো মীমাংসা হবে বলে মনে হয় না। বরং ক্রিকেট মাঠের অন্যরকম আবহাওয়ায় মাথা খোলে কি না দেখতে হবে। এখন তো পুরো ব্যাপারটা প্রেরণার উপর নির্ভর করবে। ঠোকা বল দেখে কোনো ব্যাটসম্যান যেমন অনায়াসে মাথা নামিয়ে গা বাঁচায়, ঠিক তেমনি কোনো স্বয়ংক্রিয় মুহূর্ত ছাড়া এই রহস্য ভেদ করা যাবে বলে আমার মনে হয় না।' বীরেন ঘড়ি দেখে উঠে দাঁড়াল। 'ঈশ, নটা বেজে গেল! আর দেরি করা চলে না। অনিল গোস্বামীর হাতের ব্যথা এখনও কমেনি, ফলে আমাকেই আবার সব দেখাশুনো করতে হবে।' অশোকের দিকে তাকিয়ে জিগেস করল, 'যাবি নাকি তুই? বরেন দেব খুনী হতে পারে, কিন্তু ভালো ক্রিকেট খেলে কিনা দেখে আসতে পারবি।'

'যাবো? চান করে নিলে হত না তাহলে?'

'ঠাণ্ডার মধ্যে একদিন চান না করলেও চলবে। চল, দেখে আসবি একটা দীর্ঘ ঈকারের তফাতে লোক কতটা বদলে যায়।'

'তার মানে?' উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে অশোক বিস্মিত কণ্ঠে জিগেস করলে।

'তুই হয়তো লক্ষ করিসনি, কিন্তু বীরেন আর বরেন— এই দুটো নামে কেবল একটা দীর্ঘঈকারের তফাৎ। আর তাতেই সব চারিত্রিক ব্যবধান!'

'তোর নিশ্চয়ই ভেবে-ভেবে মস্তিষ্কবিকৃতি হয়েছে। দাঁড়া, তুই তোর খেলার সরঞ্জাম গুছোতে-গুছোতে আমি চট করে স্নানটা সেরেই নিই। ঠিক দশ মিনিট লাগবে।'

ডক্টর বীরেন্দ্রনাথ রায় এম এ, পি এইচ ডি, টস-এ জিতে প্রথমে ব্যাট করবে বলেই সিদ্ধান্ত নিলে। কিন্তু খেলার প্রথম কয়েক মিনিটের মধ্যেই তার সিদ্ধান্তটা ঠিক হল কিনা, এ বিষয়ে সন্দেহ করার যথেষ্ট অবকাশ ঘটল। ঘটল, কারণ দিনের প্রথম বলে প্রথম উইকেট পড়ে গেলে সেই সূচনাকে আর যা-ই বলা যাক, শুভ অন্তত বলা যায় না। বীরেন বলে দিয়েছিল মেরে খেলতে; উইকেটের পরোয়া কোরো না; কিন্তু তার মানে এই নয় যে দুমদাম অকারণে উইকেট খুইয়ে এসো।

বরেন দেব বল শুরু করলে। প্রথম বল ঠিক লেংথ-মতো পড়ল না, লেগ-স্ট্যাম্পের বাইরে দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল। খাটো লেংথের বলটাকে যদি মারতেই হয় তো আরো তাড়াতাড়ি ব্যাট-চালানো উচিত ছিল। আর না হলে ছেড়ে দিলেই বা ক্ষতি কী ছিল? কিন্তু বড্ড দেরিতে সে হাঁটু মুড়ে বসেছিল, ঘুরে ঝাঁটা চালাবার মতো ব্যাট ঘুরিয়েছিল প্রাণপণে! বলটা লাফিয়ে উঠেছিল: ফাইন লেগে যে দাঁড়িয়ে ছিল, বলটা দিব্য লুফে নিয়ে সে, উইকেট-কীপার ও স্লিপের তিনজন প্রচণ্ডভাবে চীৎকার করে উঠেছিল, 'হাউজ দ্যাট' এবং আম্পায়ার তৎক্ষণাৎ হাত তুলে দিয়েছিলেন। বীরেন কাঁদবে কি হাসবে কিছু বুঝে পেল না।

দুশো তেরো নট-আইটের পরে এটাই বীরেনের প্রথম খেলা। লেগ আর মিডল-স্ট্যাম্পের গার্ড নিয়ে সে দাঁড়াল, তারপর ফিল্ড প্লেসিং দেখে নিলে। লেগ-স্ট্যাম্পে তিনজন, স্লিপেও তিনজন, কভার একটু পয়েন্টের কাছ ঘেঁষে, মিড-অন একটু কাছিয়ে, সিলির ধারে, লং অনে একজন আছে ড্রাইভ আটকাবার জন্যে; মিড-অফ একটু পিছিয়ে। অর্থাৎ যুগপৎ আক্রমণাত্মক এবং কিছুটা রক্ষণমূলক। কুঁজো হয়ে দাঁড়িয়ে এক চোখে সে তাকিয়ে দেখলে বরেন দেব কতদূর থেকে দৌড়ে আসে।

খাটো লেংথে ঠোকা বল ; বীরেন অফে সরে এসে সজোরে হুক করলে ; মুহূর্তে লেগ-স্ট্যাম্পের মাথার উপর দিয়ে বলটা সীমানা পার হয়ে গেল।

পরের বলটাও খাটো লেংথে ঠুকে দিয়েছিল বরেন। কিন্তু বীরেন তৎক্ষণাৎ বসে পড়ে বলটা ছেড়ে দিলে। পরের বলটা হাতের ঝাঁকুনি দেখে মনে হল ঠুকে দিয়েছে, বীরেন এবারও বসে পড়ল ; কিন্তু বলটা এলো লেংথ-মাফিক, লাফাল না, সজোরে বীরেনের কপালে লাগল ; বীরেনের চোখের সামনে স্কোরবোর্ড, সবুজ মাঠ, প্যাভিলিয়নের বারান্দা, ফিল্ডাররা, অ্যাপ্রনপরা আম্পায়ার সমস্ত ঝাপসা হয়ে গেল : হলুদ চর্কিবাজি খেলে গেল চোখের সামনে ; তারপর যখন তার সংবিৎ ফিরল তখন ড্রেসিংরুমে সে শুয়ে আছে ; কপালে বড্ড ব্যথা ; মাথার ভিতরটা ভোঁ-ভোঁ করছে। ভাগ্যিস, মাথাটা ফাটেনি, শুধু একটা জায়গা বোলতার চাকের মতো ফুলে উঠেছে।

অশোক পাশেই ছিল।

'কেমন বোধ করছিস ?'

শুকনো হাসল বীরেন। 'বলটা বুঝতে পারিনি ; ভেবেছিলুম ঠুকে দিয়েছে। সত্যি জোরে বল করে বরেন। বল হাত থেকে ছাড়ার আগেই হাতের ঝাঁকুনি দেখে বলটা শনাক্ত করতে চেয়েছিলুম। সেই জন্যেই ভুল হল।'

'অভ্যেস নেই তো খেলতে যাস কেন ?'

'সে-কথা তো দুশো তেরো যে-দিন করলুম সেদিন বলিসনি ?' বীরেন উঠে বসার চেষ্টা করল, 'খেলার খবর কী ?'

'ভালো না। মিনিট পনেরো আগে তিন উইকেটে চব্বিশ ছিল।'

'চল, বারান্দায় গিয়ে খেলা দেখি।'

অশোক ধরে নিয়ে এল বীরেনকে ; কেননা ওঠবার চেষ্টা করতেই ঘূর্ণিরোগীদের মতো মাথাটা কেমন যেন করে উঠল। বারান্দায় এসে চেয়ারে বসেই বীরেন স্কোরবোর্ডের দিকে তাকাল। 'কী সর্বনাশ ! থার্টি থ্রি ফর ফাইভ ! তেত্রিশ রানে পাঁচ উইকেট ! এতো রীতিমতো বিপর্যয় !'

'তেত্রিশ রানে পাঁচ নয়, আসলে ওটা ছয় হবে, 'অশোক জানালে, 'তুই আহত এবং অবসৃত !'

খেলা দেখতে-দেখতে ঈষৎ সুস্থ বোধ করল বীরেন। কিন্তু কীইবা খেলা দেখল ! বরেন দেব যেন গোটা দলের উপর দিয়ে স্টীম রোলার চালিয়ে দিলে ! পরের উইকেটটা পড়ল পরের ওভারেই, কোনো রান না-যোগ করে : অফ স্ট্যাম্পটা ছিটকে পড়ে গেল। শ্যামল দত্তরায় গিয়ে যোগ দিলে তারপর। সে-ই খানিকটা প্রতিরোধ করলে। হুক পুল আর ড্রাইভ করে যে কোনো-রকমে পঞ্চাশে নিলে দলের রানসংখ্যা : শেষ বলে রান নিয়ে-নিয়ে সেই বরেনের বল খেলল এ-কয় ওভার। কিন্তু আধঘণ্টা পরে সামন্ত খোঁচা দিয়ে একটা বল স্লিপের হাতে তুলে দিয়ে মুখ নিচু করে বেরিয়ে এল। আসলে নার্ভাস বলেই আউট হল, না-হলে ওই বলটায় খোঁচা দেবার কোনো দরকার ছিল না : ছেড়ে দিলেই হত।

বীরেন গ্লাভস পরে উঠে দাঁড়াতেই অশোক বললে, 'কোথায় যাচ্ছিস ?'

'কেন ? মাঠে ?' ব্যাটটা হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়াল সে ; 'লাঞ্চ হতে আরো চল্লিশ মিনিট বাকি— অন্তত ততক্ষণ ঠেকিয়ে আসি। না-হলে শ্যামল ভালো খেলছে— ওকে না শেষ বলে রান নিতে-নিতে নিজের উইকেটটা খোয়াতে হয়।'

অশোক কোনো বাধা দেবার আগেই বীরেন মাঠে নেমে পড়েছে।

সামন্ত মাঠ যখন বেরিয়ে আসছে, বীরেন তাকে বাউণ্ডারির কাছেই আটকেছে। 'আরে, যাচ্ছো কোথায় ? ফেরো, ফেরো আমার যে রানার লাগবে, সেটা খেয়াল নেই বুঝি ?'

'আপনি কি এ-অবস্থাতেই খেলবেন নাকি ? বিশ্রাম করলে হত না ?'

'বিশ্রাম পরে হবে, এখন দত্তরায়কে মদৎ দিতে হবে না ? তুমি কিন্তু হুঁশিয়ার থেকো— রানারকে কী করে খেলতে হয়, জানো তো ? কোনো বিচ্ছিরি জট পাকিয়ে বোসো না কিন্তু—' বলে বীরেন গিয়ে আম্পায়ারকে রানারের কথা বলে স্ট্যানস নিয়েছে।

চল্লিশ মিনিট কিন্তু সত্যি ঠেকিয়েছে বীরেন— এবং সেই সঙ্গে বলা যায়, সামন্তও। কেননা দুজনে মিলে তারপর যে হুলস্থূল কাণ্ডটা করেছে, তাতে ঐ চল্লিশ মিনিটই হয়ে উঠেছে তাজ্জব এক রোমহর্ষক ব্যাপার। ব্যাটসম্যান, রানার আর নন-স্ট্রাইকার মিলে যে এ-রকম ধুমধাড়াক্কা কাণ্ড করা যায়, আর ফিল্ডিংও মুহূর্তে ছত্রভঙ্গ করে দেয়া যায়— যে ফিল্ডিং এতক্ষণ ধরে ছিল বেজায় আঁটো আর জবর দুর্ধর্ষ --- অশোক তা নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাসই করতে পারত না। আচ্ছা এক জটপাকানো কাণ্ড ঘটেছে মুহুর্মুহু, 'হ্যাঁ···না···ছুটুন···একরান···ছোটো,···আরে, ফিরে যাও!' ইত্যাদি চীৎকার তো ঘন-ঘন উঠেইছে, তার ওপর দু-দুবার শ্যামল, বীরেন আর সামন্ত একজায়গাতেই হুড়মুড় করে ছুটে গিয়ে তড়ি-ঘড়ি করে মরতে-মরতে ফের অবস্থার সামাল দিয়েছে, কোনোমতে রান-আউট হওয়া থেকে বেঁচেছে যখন হতভম্ব ফিল্ডার ভুল করেছে— ধরতে পারেনি ঠিক, কোন উইকেট তাগ করে বল ছুঁড়বে, আর বীরেন যখন নন-স্ট্রাইকার, একবার যখন দাঁড়িয়েছে স্কোয়ার লেগে আম্পায়ারের গা ঘেঁষে, সামন্ত দাঁড়িয়ে আছে উইকেটে, নন-স্ট্রাইকার এন্ডে, তখনই সেই যে মাথায় বল লেগেছিল তারই জের ধরে একবার মাথায় হাত দিয়ে চোখে সর্ষে ফুল দেখতে-দেখতে ধপ করে বসে পড়ে দু মিনিট খেলা থামিয়ে রেখেছে বীরেন, আর বলাই যায় যে নিজেই শুধু ভির্মি খায়নি, ফিল্ডিং দলেরও পুরো ছন্দটাকেই ভির্মি খাইয়ে দিয়েছে! বরেন দেবের বাউন্সারগুলোও সেই সময়টায় যেন ভ্যাবাচাকা খেয়ে গিয়েছিল, বীরেন আউট হয়েছে তারপরে লাঞ্চের আগে ঠিক শেষ বলটায়। হীরালাল বাজাজের বলে এল-বি-ডাবলিউ হয়ে গেল। কিন্তু ওই একটি বল ছাড়া আর কোনো বলেই সে পরাস্ত হল না ; শ্যামল তো এমনি খেলছে যে আজ সারাদিনে ওকে আউট করার ক্ষমতা কারুর আছে বলে মনেই হল না ; প্রত্যেকটা বল মারছে সে, যেন প্রেরণা পেয়েছে কোনোখান থেকে। এই চল্লিশ মিনিটে ওদের জুটি ৭১ করেছিল, বীরেনের তার মধ্যে ৩৭ ; আগে চার করেছিল আহত হবার আগে— অর্থাৎ সব সুদ্ধু ৪১। শ্যামল তখন ৫১। আট উইকেটে দলের ১২১। শেষ পর্যন্ত অবশ্য মিনিটে ১ রান করে হল, কিন্তু আট উইকেট চলে গেল।

ইনিংস শেষ হল ১৫২-তে ; শ্যামল সত্যি ৭৬ নট আউট থেকে গেল। এবং শুধু তাই নয়, লাঞ্চের পরে ওরা ৪১ রান করতে একঘণ্টা সময়ও নিলে। আর বরেনের বোলিং-এর হিসেবও শেষ অবধি দাঁড়াল ৬৭ রানে ৮ উইকেট ; যে-কোনো পরিবেশেই এই হিসেব স্মরণীয় বলে গণ্য হবে।

'আজকে নির্ঘাৎ হার হবে,' বীরেন বললে। '১৪০ মিনিটে ১৫৩ করার চেষ্টা ওরা করবেই। এবং তা আটকাবার মতো ক্ষমতা আমাদের নেই। তবু একটা শেষ চেষ্টা করতে হবে অবিশ্যি। সত্তর-আশি পর্যন্ত আক্রমণ চালাতে হবে আমাদের,' শ্যামলকে সে বললে, 'তারপর না-হয় বাউন্ডারি বাঁচাবার জন্যে সবাইকে দড়ির কাছে দাঁড় করিয়ে দেব।'

চায়ের বিরতির সময় বীরেন কিন্তু চল্লিশ মিনিটে খেলার মোড় অনেকটা ঘুরিয়ে ফেললে ; প্রথম বল থেকেই ওরা পিটিয়ে খেলতে লাগল ফলে চল্লিশ মিনিটে ওরা রান করলে ৬৯, উইকেট খোয়ালে চারটে। এখন যদি মিনিটে ১ রান করেও ওরা করে, পুরো রান তুলতে ওদের মোটেই অসুবিধে হবে না। চায়ের পরে বীরেন একদিক থেকে নিজে একটানা একঘণ্টা বল করে গেল। সুজয় আগে ২৯ রানে চারটে উইকেটই নিয়েছিল, কিন্তু এখন কোনো উইকেটই আর পেলে না। বীরেন তিনটে উইকেট নিলে ৩৭ রানে। এক ঘণ্টায় ওরা করলে ৭০। অর্থাৎ বাকি চল্লিশ মিনিটে ২৪ রান করলে ওরা জিতবে, হাতে ওদের আছে তিনটে উইকেট।

শেষের মুহূর্ত ক-টা অত্যন্ত রোমাঞ্চকর হল। আধঘণ্টায় ওরা উইকেট খোয়ালে দুটো— দুটোই রান-আউট— চমৎকার হল বীরেনদের ফিল্ডিং ; রান হলে ১৪৯। শেষ উইকেটে ওদের করতে হবে ৪ ; হাতে সময় দশ মিনিট— চার করলেই জিতবে। আরো তিন ওভার বল হবে কম করে। বীরেন সুজয়ের হাতে বল দিলে। হয়তো এটাই শেষ ওভার। একটা চার মারলেই ওরা জিতে যাবে ; আবার জোরে বল দিয়ে ভয় দেখিয়েও উইকেটটা পাওয়া যেতে পারে। ফিল্ডাররা ছড়িয়ে পড়েছিল ; বীরেন এবার আবার সবাইকে কাছে নিয়ে এল। চাঁদের টুকরোর মতো সবাই ঘিরে রইল বাজাজকে : বাজাজ ব্যাট জানেন বলে মনে হয় না ; যদি খোঁচা লাগে, তাহলে···

সুজয় গুডলেংথে বল ফেলল। বাজাজ এক পা বাড়িয়ে ঝুঁকে সেটা কোনো রকমে আটালেন। দ্বিতীয় বলটা লেগ-স্ট্যাম্পের দিকে সবেগে ছুটে এল ; বাজাজ ঝাঁটার মতো ব্যাট চালালেন ; ভাগ্য ভালো ব্যাটে লাগল না। সুজয় প্রায় লাফিয়ে উঠেছিল প্রত্যাশায়। তৃতীয় বলটা সেইজন্যেই আবার লেগ-স্ট্যাম্প লক্ষ্য করে এলো, ঝাঁটার মতো ব্যাট চালালেন বাজাজ আবারও, লেগ-ট্র্যাপ থেকে বলটা ফেরৎ আসার আগেই আরেকটা রান হয়ে গেল। এ-পাশে এবার যিনি এলেন তিনি ওদের উইকেট কীপাব দীনেশ বসু ; থ্রি-ডাউন নেমেছিলেন, এখনো আছেন ; রান তাঁর এখন ৭১। চমৎকাব হল তাঁর কভার-ড্রাইভ ; দুটো রান কিছুতেই আটকানো গেল না। এবার দু পক্ষেরই রান সমান-সমান। খেলা শেষ হতে ৭ মিনিট বাকি ; সুজয়ের ওভার শেষ হতে আরো দু বল রয়েছে। পঞ্চম বলটা গুডলেংথে পড়ল : রান নেবার কোনো চেষ্টাই করলেন না তাঁরা। ষষ্ঠ বলটা লেগে ঘোরাতে গেলেন দীনেশ বসু ; ঠিক মতো লাগল না ; লেগ স্লিপ লাফিয়ে উঠল ; সুজয় চেঁচিয়ে আবেদন করে উঠল। কিন্তু নিশীথ গুপ্ত বলটা হাত থেকে ফেলে দিলে।

অর্থাৎ আরো-একটা ওভার খেলতে হবে। মিনিট ছয়েক আছে। বীরেন নিজেই বল হাতে নিলে। ওর বলেই ওরা জিতুক। তবে বাজাজ খেলবে ওর বলে, এটাই যা ভরসা।

বাজাজ প্রথম বলটা পা বাড়িয়ে খেলতে গেলেন ; বলটা এত ভেঙে গেল যে ব্যাটে লাগল না ; বেঁকে বেরিয়ে গেল। দীনেশ বসু এগিয়ে এসে বাজাজের সঙ্গে কী যেন শলাপরামর্শ করে গেল। বীরেন পরের বলটা অনেকটা ঝুলিয়ে দিলে ; বাজাজ মারবেন বলে এগিয়ে এসেছিলেন, কিন্তু বলটা শূন্যে ধনুকের মতো বেঁকে নামছে দেখে পিছিয়ে এসে কোনোমতে ব্যাট পেতে দিয়ে শেষ মুহূর্তে বলটা আটকালেন। পরের বলটা বীরেন হঠাৎ অত্যন্ত জোরে করল ; বাজাজ কিছুই বুঝতে পারলেন না ; খেলবার চেষ্টা না করে হতভম্ব দাঁড়িয়ে রইলেন। বলটা বাইরে চলে গেল। চতুর্থ বলটা উলটো ভাবে ভাঙল ;

কোনো রকমে ব্যাট পেতে বলটা আটকে বাজ্ঞাজ বুঝতে পারলেন তিনিও এইভাবে গুগলি দিয়ে থাকেন। বাজ্ঞাজের মুখ দেখে মায়া হল বীরেনের। বেচারি কোনো বলই কিছু বুঝতে পারছেন না। কিন্তু আশ্চর্যভাবে শেষ মুহূর্তে বেঁচে যাচ্ছেন। বাকি বল দুটো যথেষ্ট লোপ্পা দিয়েও বাজ্ঞাজকে কিছুতেই ক্রিজ থেকে বের করে আনা গেল না। অর্থাৎ শেষ ওভার খেলা ছাড়া উপায় নেই।

সুজয় বল হাতে তার রান-আপে হেঁটে গেল আস্তে-আস্তে। ঈশ! আগের ওভারে ক্যাচটা যদি মিস না করত! নিশ্চয়ই এখন আর-কোনো অলৌকিককাণ্ড ঘটবে না। দীনেশ বসু চমৎকার খেলে ৭৩ করেছেন, শুধু আগের বলটাতেই পরাস্ত হয়েছিলেন। এক্ষুনি আবার তিনি ভুল করবেন, এটা আশা করাই অন্যায়! সুজয় দৌড়ে এল। ছাতার মতো ঘিরে আছে ফিল্ডাররা: প্রত্যাশায় উদ্‌গ্রীব! সুজয় বল করলেন; অফ-স্ট্যাম্পের বাইরে হাওয়ায় বলটা বেঁকে গেল। দীনেশ বসু ড্রাইভ করেছিলেন, কিন্তু কানায় লেগে বলটা লাফিয়ে উঠল। শ্যামল দত্তরায় বুকের কাছে দু-বারের চেষ্টায় বলটা লুফে নিলে। সুজয় এবার ভয়ে উত্তেজনায় চ্যাঁচাতেও ভুলে গিয়েছিল। ফিল্ডাররা যখন সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠল, তখন সংবিৎ ফিরে পেয়ে সে দেখলে আম্পায়ার হাত তুলে দিয়েছেন!

'সত্যি, তোর ক্ষমতা আছে!' অশোক পরে বলেছিল, 'এইসব ছোটখাট লিগের খেলাগুলিও এমন নাটকীয় ও উত্তেজক করে তুললি। আমি তো জানতুম নির্ঘাৎ হারবি।'

'আমিও তা-ই জানতুম। কিন্তু ওটা দৈবাৎ হল। রানে-রানে সমান হয়ে ড্র না ও হতে পারত। আসলে দীনেশ বসু জেতার জন্যে তাড়াহুড়ো না-করলে ড্র হত না। কিন্তু এতক্ষণ অমন চমৎকার খেলে উত্তেজনায় তারও ভুল হয়ে গেল!'

'তারপর এখন?'

'তোকে বলিনি। কিন্তু শেষ ওভারে সুজয় বল করার সময়ে আমি বের করে ফেলেছি একটা লোক একই সঙ্গে দু-জায়গায় কেমন করে থাকে।'

'তাই নাকি!'

'হ্যাঁ; শোন তোকে বলি!'

৭

'এর কোনো মানে হয়?' সমীর তার বিরাগ প্রকাশ করল। 'আধ ঘণ্টা ধরে বসে আছি, অথচ কোনো পাত্তা নেই। এইজন্যেই বাঙালিদের আমি পছন্দ করি না। সময়ের জ্ঞান তাদের যদি একফোঁটা থাকে? আমার আবার কাজ আছে; গড়িয়াহাটের মোড়ে একটা বাড়িতে গিয়ে একজনের এজাহার নিতে হবে।'

সুকুমার বললে, 'নিশ্চয়ই হঠাৎ কোনো কাজে আটকে পড়েছে। না-হলে আমাকেও তো বলেছিল সাড়ে-চারটে নাগাদ বাড়ি থাকতে— বিষম প্রাকৃতিক বিপর্যয় না হলে আমার এখানে নাকি আসবেই।'

'আমাকেও তো তা-ই বললে। "আজ সব মীমাংসা করে দেব", আমাকে বললে, "যদি সাড়ে-চারটেয় সুকুমারের বাড়ি হাজির থাকিস।" তা একটা ফোন করেও তো জানাতে পারতিস যে দেরি হবে।'

সমীরের কথা শেষ হবার আগেই সত্যি কিন্তু টেলিফোনের ঘণ্টা বেজে উঠল।

সুকুমার উঠে গিয়ে রীসিভার তুলল। 'হ্যালো !'

'কে ? সুকুমার ? আমি অশোক রুদ্র। উল্টোডাঙা থেকে বলছি।'

'কী ব্যাপার !'

'বীরেন তোদের বলেছিল তো আজ বিকেলে সব মীমাংসা করে দেবে— কেমন করে একজন লোক একই সময়ে বড়োবাজার থেকে ফোন করতে পারে আবার পুরোনো বালিগঞ্জে খুন করতে পারে—'

'হ্যাঁ। তা—'

'সে-বিষয়ে বীরেনের বক্তব্য বীরেনের মুখ থেকেই শোন।'

পরক্ষণেই ফোনে বীরেনের গলা ভেসে এলো। 'সমীর এসে হাজির হয়েছে তো ?'

'হ্যাঁ। গজগজ করছিলো তুই আসিসনি বলে।'

'তা ওকেই রীসিভার দে। ওর মাথার যে গোবর পোরা আছে, সেটা ওকে আমি ভালো করে বুঝিয়ে দিই।'

সুকুমার রীসিভারটা সমীরের দিকে বাড়িয়ে বললে, 'বীরেন তোর সঙ্গে কথা বলতে চায়।'

'ও ফোন করেছে বুঝি ?' কোত্থেকে ?' সমীর রিসিভারের কাছে এগিয়ে আসতে-আসতে বলল।

'উল্টোডাঙায় অশোকের বাড়ি থেকে।'

'তোর কোনো কাণ্ডজ্ঞান আছে, বীরেন ! সেই থেকে বসে আছি—'

সমীরকে থামিয়ে দিয়ে অপর প্রান্ত থেকে বীরেনের কণ্ঠস্বর ভেসে এলো :

'খিল্‌খিল্লির মুল্লুকেতে থাকতো নাকি দুই বেড়াল
একটা শুধোয় আরেকটাকে, "তুই বেড়াল না মুই বেড়াল ?"
তাই থেকে হয় তর্ক শুরু, চীৎকারে তার ভূত পালায়,
আঁচড়কামড় চর্কিবাজি ধাঁই-চটাপট চড় চালায়।
খামচাখাবল ডাইনে বাঁয়ে হুড়মুড়িয়ে হুলের মতো ;
উড়লো রোঁয়া চারদিকেতে রামধুনুরির তুলোর মতো।
তর্ক যখন শান্ত হলো, ক্ষান্ত হলো আঁচড় দাগা,
থাকতো দুটো আস্ত বেড়াল, রইলো দুটো ল্যাজের ডগা।

সমীর প্রায় ফেটে পড়ল : 'অর্থাৎ ?'

'অর্থাৎ ?—

নন্দ ঘোষের শ্যামলা গোরু, ভাগলো কোথায় লক্ষ্মীছাড়া ?
নন্দ ছোটে বনবাদাড়ে, সন্ধানে যায় বদ্যিপাড়া।
শেষকালেতে অর্ধরাতে হদ্দ হয়ে ফিরলে পরে—
বাসায় দ্যাখে, ঘুমোয় গোরু ল্যাজ গুটিয়ে গোয়ালঘরে।'

'সুকুমার রায় আমিও পড়েছি ! তুই এসব পদ্য শোনাবার জন্যে আমাকে আটকে রেখেছিস ?'

'না তো ! তোকে আমি সেই থেকে এই কথাটাই বলতে চাচ্ছি একসঙ্গে একই লোক দু-জায়গায় থাকে কী করে।'

'কী করে, সেটাই তো জানতে চাচ্ছি ?'

'এ তো অত্যন্ত সোজা। বুদ্ধি খাটালেই জানতে পারা যায়!'

'বীরেন! ইয়ার্কির একটা সীমা আছে!'

'তুই চটে যাচ্ছিস দেখছি। রেগে-যাওয়া লোকের কাছে আমি কিছু বলি না। তুই না-হয় অশোকের সঙ্গে কথা বল, মাথা ঠাণ্ডা হলে আমি তোকে বুঝিয়ে দেব।'

পরক্ষণেই অশোকের গলা ভেসে এল ফোনে: 'বীরেনটা ওই রকম! ভাঁড়ামো করতে পেলে আর কিছু চায় না। তুই অতটা চ'টে না গেলেই পারতিস।'

'চ'টে যাব না! সহ্যের একটা সীমা আছে। তোকে আর মদ্য ব্যবসায়ীর মত্ত সাক্ষী সাজতে হবে না।'

'নাঃ, সত্যি চটেছিস দেখছি। দোহাই তোর, এক্ষুনি সব জানতে পারবি। একটু মাথা ঠাণ্ডা করে ধৈর্য ধরে থাক।'

সমীর একটা কিছু বলতে যাচ্ছিল, এমন সময় দরজা দিয়ে সুকুমার রায় আওড়াতে-আওড়াতে বীরেন নির্বিকারভাবে ঢুকল:

'বাস্‌রে বাস্‌! শাবাশ বীর! ধনুকখানি ধ'রে,
পায়রা দেখে মারলে তীর— কাগটা গেলো ম'রে!'

'মানে?' প্রায় যেন ভূত দেখল সমীর। 'তুই না এইমাত্র উল্টোডাঙা থেকে আমার সঙ্গে ফোনে কথা বলছিলি!'

'বলছিলুম তো!'

'তাহলে এখানে এরই মধ্যে এলি কী করে?'

'যেমন করে বড়োবাজার থেকে ফোন করেও বরেন পর মুহূর্তে পুরোনো বালিগঞ্জে খুন করতে পারে।'

'নিশ্চয়ই তুই পাশের বাড়ি বা পাশের কোনো পাবলিক বুথ—'

'এখনো অশোক বোধহয় লাইন ছেড়ে দেয়নি।' বীরেন জানাল, 'তুই টেলিফোন আপিশে খবর নিলে জানতে পারবি যে সত্যি উল্টোডাঙা থেকেই এখন কল এসেছে।'

'তাহলে?'

'তাহলে আর কী? অত্যন্ত সহজ। একই নাম্বারে কি আর দুটো রীসিভার থাকতে নেই? সুকুমারের ফোনটারও তাই— তার একটা রীসিভার নিচে, ওর আপিশঘরে, আরেকটা এখানে। আপিশের সময় ও ওটা ব্যবহার করে, বাকি সময় এটা। তা কোনো কল এলে যে কোনো লোক নিচের রীসিভার তুলে সব কথাবার্তা শুনতে পারে, চাই কি মাঝে-মধ্যে নিজেও কথা জুড়ে দিতে পারে। কিন্তু সুকুমার যখন ওপর থেকে শুনবে, মনে হবে যেখান থেকে কল এল, সেখান থেকেই বুঝি সব কথা বলা হচ্ছে। যেমন আমি অশোককে বলেছিলুম। পাঁচটা নাগাদ সুকুমারকে ফোন করতে। অশোক ফোন করতেই নিচেও ঘণ্টা বাজল, উপরেও বাজল। উপরের রীসিভার তোরা ধরলি, নিচেরটা আমি তুললুম; তারপর অশোক যেই বললে বীরেন কথা বলতে চায় অমনি আমি নিচে থেকেই কথা বলতে লাগলুম। তোরা ভাবছিস আমি অশোকের বাড়ি থেকেই কথা বলছি। খুনের দিনও তাই হয়েছিলো। ওঙ্কার গুপ্ত বড়বাজার থেকে নির্দিষ্ট সময়ে ফোন করেছিল, সুকুমারের সঙ্গে নিচে বরেনও রীসিভার তুলেছিল। দু-একটা কথা বলেই নিজের অ্যালিবাই দাঁড় করিয়ে সে নিখিলকে খুন করতে চলে গেল—'

'ও-যে এল, কেউ দেখল না?'

'আমাকেই কি আজ কেউ দেখেছে? সুকুমারের আপিশ তো চারটেয় ছুটি হয়ে যায়—

তারপর তো সব ফাঁকা। তাছাড়া বরেনের কাছে হয়তো ডুপ্লিকেট চাবি ছিল— ও তো আগে কাজ করতো এখানে। ব্যাপারটা দুম করে আমার মাথায় খেলে যায় খেলার মাঠে— রানার নিয়ে খেলতে-খেলতে সেদিন যখন হুলুস্থূল হয়েছিল! আমি আছি নন-স্ট্রাইকার হিসেবে স্কোয়ার লেগ আম্পায়ারের কাছে, আবার আমিই দৌড়ে উর্ধ্বশ্বাসে রান নিচ্ছি— অর্থাৎ সামন্ত যখন আমি হয়ে গিয়ে আমার রানগুলো নিচ্ছিল, তখনই আমার মাথায় খেলে যায় একই সঙ্গে একজন দু-জায়গায় থাকতে পারে কিভাবে। একই নাম্বারে ফোনের দুটো রীসিভার থাকলে একজন ইচ্ছে করলেই যে একইসঙ্গে দু-জায়গায় থাকতে পারে সে-তো এক্ষুনি হাতে-নাতে দেখিয়ে দিলুম। বরেনকেই ধন্যবাদ দিতে হয়, তার বাউন্সার অমনভাবে মাথায় না-লাগলে রানার নিয়ে খেলতে হত না আমায়— আর আমারও অমন চট করে ভেলকি খেলে গিয়ে টেলিফোনরহস্য এভাবে সাফ হয়ে যেত না।

'কিন্তু বরেনই যে খুন করেছে, তার প্রমাণ—'

'হাতে-নাতে কোনো প্রমাণ নেই, অন্তত আমি জানি না ; তবে সেটা বের করার দায়িত্ব তোর। আমি শুধু বুঝিয়ে দিলুম একটা লোক একই সঙ্গে দু-জায়গায় কেমন করে থাকে। তাছাড়া তুই যদি চাস, তবে সুকুমারদের কম্পানিসংক্রান্ত যাবতীয় খবর তোকে দিতে পারি— নিখিলের সঙ্গে ওদের কী আঁতাৎ ছিল তাও বলতে পারি—'

'নিখিলের সঙ্গে আঁতাৎ ছিল—'

'হ্যাঁ। কিন্তু কী সর্বনাশ! অশোক বোধহয় এখনও ফোন ধরে আছে।' রীসিভারটা বীরেন কেড়ে নিল সমীরের হাত থেকে, 'অশোক!'

'এর কোনো মানে হয়?' ওপাশ থেকে অশোকের গর্জন এল!

'হয়। কেননা সমীরকে নাজেহাল করে দিয়েছি। মনে আছে বোলপুরে তোকে চুরির দায়ে ধরতে চাচ্ছিল? তার জন্যেই এটা করলুম।'

'তাই বলে এতক্ষণ ফোন ধরে দাঁড়িয়ে আছি—'

'রেখে দিয়ে তুই চলে আয় পার্ক স্ট্রিটে একটা ট্যাক্সি নিয়ে। আমরা সেদিনকার সেই রেস্তোরাঁটায় থাকব। সুকুমার খাওয়াবে।'

ফুটবল

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

আবার সেই ফুটবল আসিয়া পড়িল।

কদিনই বা বন্ধ ছিল ? এই তো সেদিনকার কথা,— গজাননের নাক থেতো হইয়া সেরখানেক রক্ত পড়িল, ষষ্ঠীচরণের পায়ের দফা রফা হইল। ষষ্ঠীব ল্যাংচানো এখনও পর্যন্ত ভাল করিয়া সারে নাই, গাঁটে ব্যথা, অমাবস্যা পূর্ণিমায় এখনও উপোস দিতেছে।

ফুটবল আসিল। এবার আবার কাহার হাত পা মাথা নাকের উপর কি বকম দৃষ্টি কে জানে। পাঁজিতে ফুটবলের বর্ষফল দেয় না কেন ? যেমন নিকল্‌স্ বাজা, গুপ্ত মন্ত্রী, ফল— অনাসৃষ্টি, আন্তর্জাতিক বিবাদ, অরাজকতা··· জ্যোতির্বিদরা কি বলিতেছেন ?— জিনিসটা তাঁহাদের গণনার বাহিবে ? কিন্তু তাঁহারা কি শপথ করিয়া বলিতে পাবেন যে ওটা নগণ্য ?

গণনার যে বাহিরে একথা আমিও স্বীকার কবি, কেননা কোথায় যে যাইবে গডাইতে গড়াইতে কিছুই ঠিকানা নাই— মাঠের ফুটবল হোক, কিংবা গলির টেনিস বলই হোক, কিংবা বৈঠকখানার আলোচনাই হোক— অর্থাৎ শরীরী ফুটবলই হোক, বা অশবীবী ফুটবলই হোক।

গজাননদের কথাটাই ধরা যাক।

সমস্ত দিনই ঝুপ ঝুপ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে। তাহার উপব প্রায় সাড়ে চাবটে হইতে যে রকম তোড়ে আরম্ভ হইল, কেহ আর বাহির হইতে পারিল না। অথচ আজ নিজেদেব পাড়ার দলের খেলা,— হাসি-ঠাট্টার খেলা নয়, আই-এফ-এর সেকেণ্ড রাউণ্ড! অনুপমদের বৈঠকখানায় জুটিয়াছে কয়েকজন। সবাই এখনও আসিতে পারে নাই, বৃষ্টি যে রকম জোর চলিয়াছে এখনও, আজ যে পুরা আড্ডা জমিবে না এটা ঠিক। সবাই ম্যাচের ফলাফলের জন্য উৎকণ্ঠিতভাবে অপেক্ষা করিয়া আছে। যাহারা আসে নাই তাহাদের মধ্যে আছে গজানন। নটু বলিল, "গজা এলেই খবর পাওয়া যাবে, বৃষ্টি হোক বাজ পড়ুক, সে তো যাবেই দেখতে।"

ষষ্ঠীচরণ বলিল, "কিন্তু, আমার যেন মন বলছে, খেলা বন্ধ করে দেবে আজ এ দুর্যোগে খেলা অসম্ভব ; মাঠে দাঁড়াতেই পারবে না, তা খেলা !"

আড্ডার নিয়মই হইতেছে প্রায় প্রত্যেকেরই অন্তত একজন করিয়া বিরুদ্ধবাদী থাকে ; ষষ্ঠীচরণ কথা কহিলে হৃষীকেশের গায়ে বিষ ছড়ায়। বলিল, "তোর মন বলছে তো ?— তাহলে নির্ঘাত খেলা হয়েছে আজ। তোর মনকে জিগ্যেস কর দিকিন কারা হারলে,—তাহলে বুঝতে পারব তারা জিতেছে।"

ষষ্ঠীচরণ হেলান দিয়া ছিল, সোজা হইয়া বসিল। মুখটা একটু বিকৃত করিয়া হৃষীকেশের দিকে বাড়াইয়া বলিল, "খেলিস তো ঘরের কোণে শালীদের সঙ্গে টেবিল টেনিস, বৃষ্টি হলে যে খেলা বন্ধ হয় তুই কি করে জানবি ? হয় বন্ধ, আমার আছে শুনে শেখ্— সেবারে মোহনবাগান-ডালহৌসির খেলা বন্ধ হল, তার আগের বারে এর চেয়েও কম বর্ষার জন্যে এরিয়ান্সদের অমন ম্যাচটা পোস্‌পোনড করে দিলে। কত শুনতে চাস ?"

নটু বলিল, "দেবেই যে বন্ধ করে তার কোনে মানে নেই। সেবারে ক্যালকাটা-মোহনবাগানের ফাইনালটা করলে বন্ধ ? আজকাল সে আগের মত কুড়ি-বাইশটি টিম নিয়ে খেলা নয় তো, হুট করে বন্ধ করে দিলেই হল..."

সমর্থন পাইয়া হৃষীকেশ শালী-শালাজ তুলিয়া বিদ্রূপের শোধ লইল। মুখ বিকৃতি করা চেঁচামেচি করা তাহার প্রথা নয়। একটু বিরক্তভাবে নটুর পানে চাহিয়া বলিল, "আপনি জানেন না নটুবাবু, কেন বকছেন মিছিমিছি। —বলে, ষষ্ঠীর হুকুম না নিয়ে আই-এফ-এ এক পা নড়তে পারে না। সে যখন বলছে খেলা বন্ধ আজ, তখন বন্ধ..."

ষষ্ঠীচরণ আরও রাগিয়া উঠিল ; বলিল, "আলবাৎ বন্ধ। যদি মরদ হ'স তো ফ্যাল বাজি রিযে— দশ টাকা। অমন মেয়েমানুষের মত চিপটেন কাটতে সবাই পারে। ...নে, এই আমি বলছি, যদি আজ খেলা বন্ধ না থাকে তো..."

এমন সময় নিতাই আসিয়া ছাতা মুড়িতে মুড়িতে ঘরে প্রবেশ করিল। হৃষীকেশ বলিল, "এই তো হাতে পাঁজি মঙ্গলবার,— নিতাই এসে গেছে,— কি রে নিতু, তোর মামা খেলতে গেছল, ফিরেছে ?"

খেলোয়াড় মামার গর্বে নিতাইয়ের কথাবার্তা খুব সংক্ষিপ্ত। বলিল, "খেলা শেষ না করেই ?"

অনুপম বলিল, "ষষ্ঠী, কি যেন বাজির কথা বলছিলি, থেমে গেলি কেন ?— আজ বর্ষার দিনটা দিব্যি হত দশটা টাকা হলে..."

"হ্যাঁ, বাজি চলুক, বাজি চলুক— কথা পালটালে চলবে না..." বলিয়া একটা তুমুল সমর্থনের কলরব উঠিল।

নটু বলিল, "হ্যাঁ, তোমরা দুজনে একটা রফা করে ফেল ; আমি ততক্ষণ একটা লিস্ট তোয়ের করে ফেলি— কি কি হবে। আর—রফাই বা কি-- ষষ্ঠীকেই তো দিতে হয় টাকাটা..."

ষষ্ঠীচরণ বলিয়া উঠিল, "যা-যা-যাঃ, ঐ বুদ্ধি নিয়ে টাকা নিবি সব !— নিতের মামা বাড়ি ফেরেনি— কাজেই বুঝে নিতে হবে মাঠে খেলা হচ্ছে ! বালিহারি লজিক মাইবি !...নিতের মামা যদি রাস্তায় মাতলামি করবার জন্যে সমস্ত রাত হাজতে কাটায় তো বুঝতে হবে সমস্ত রাত মাঠে খেলা হয়েছে,—বাঃ !"

নিতাই বলিল, "তুই মাতাল বললি কাকে রে ?"

"তোর মামাকে। তুই তো নিজেই সেদিন বললি— "'রিসেসে এক পেগ না টানলে মামার সেকেন্ড টাইমে পা-ই ওঠে না'..."

নিতাই ডান হাতের ঘুষি বাগাইয়া বলিল, "এক পেগ মানে মাতাল ?"

ষষ্ঠীচরণ প্রতিপ্রশ্ন করিল, "বাড়ি আসেনি মানে মাঠে খেলা হচ্ছে ?"

"আলবাৎ হচ্ছে।"

"আলবাৎ মাতাল।"

"তাহলে নে, এই মাতালের ভাগ্নের তাল সামলা..."

ঠিক নাক লক্ষ্য করিয়া ঘুষিটা ছুটিত,— সকলে উভয় পক্ষকে থামাইয়া দিল।

ঘরের এই গুলতানের মাঝখানে গজানন আসিয়া প্রবেশ করিল। খাঁটি ফুটবল-বাজের পোশাক,— মাথায় ওয়াটারপ্রুফ টুপি ও গায়ে ওয়াটারপ্রুফ কোট, পায়ে রবারের জুতা। ভিতরে প্রবেশ করিয়াই পকেট হইতে একটা চীনেবাদাম বাহির করিয়া ভাঙিয়া মুখে ফেলিয়া কোটটা খুলিতে লাগিল। ঘরের কলরবটা উহাদের দুজন হইতে সরিয়া গজাননকে কেন্দ্র করিয়া জমিয়া উঠিল।—"এই যে গজা এসেছে...বললাম না ?— আকাশ ভেঙে পড়লেও গজু ম্যাচ দেখতে যাবেই যাবে...ফুটবল গজার প্রাণ—বললাম না ?...কি খবর রে গজা— কারা হারল... এই দুর্যোগ, তুই গেলি কি বলে ?-- হ্যাঁ বুঝতাম— গিয়ে পড়েছিস, হঠাৎ বৃষ্টি আরম্ভ হল, তা নয়...খেলা না দেখলে গজাননবাবুর ভাত হজম হয় না...আচ্ছা ঝোঁক মাইরি !..."

ষষ্ঠীচরণ গজাননের অভ্যুদয়ে মোক্ষম হার খাইয়া গোঁজ হইয়া বসিয়া আছে। নিতাইও মামার অপমানের প্রতিশোধ লইতে না পারায় মনে মনে আপশাইতেছে এবং মাঝে মাঝে ষষ্ঠীচরণের পানে আড়চোখে চাহিতেছে। গজানন কোট টুপি ছাড়িয়া দুয়ারের কাছে একটা দেওয়াল-আলনায় টাঙাইয়া রাখিয়া বলিল, "চা হয়ে গেছে নাকি ?— আগে এক কাপ চায়েব বন্দোবস্ত কর অনুপম। মনে করলাম যাব না, কিন্তু না গিয়েও কেমন থাকতে পারি না। সেই এতটুকু থেকে অব্যেস।...ষষ্ঠী আর নিতে অমন করে বসে কেন রে ? - যেন রাম-লক্ষ্ণণ এইমাত্র বনবাসের খবর শুনেছিস..."

হৃষীকেশ বলিল, "ষষ্ঠী দশ টাকার বাজি রেখেছিল আজ খেলা হবে না..."

গজানন চেয়ারে বসিতে যাইতেছিল, আবার সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া কতকটা উদ্বেগের সঙ্গেই প্রশ্ন করিল, "তার পর ? জিতেছে নাকি ?"

হৃষীকেশ বলিল, "না, জিতবে আর কোথা থেকে ?— ওদিকে কারা জিতল ?.. আমাদের এরা খেললে কেমন বল্।"

গজানন চেয়ারে হেলান দিয়া পকেট হইতে সিগারেট বাহির করিয়া ঠোঁটে আটকাইয়া দিল ; দেশলাই জ্বালিতে জ্বালিতে বলিল, "কারা জিতল বলে দিতে হবে ?...খেলার কথা আর বলে কাজ নেই, হাঁটু পর্যন্ত জল মাঠে, এক গজ বল যায় না—তবে হ্যাঁ, তার মাঝেও ডাক্তার যা খেললে—মার্ভেলাস।"

নিতাই চৌকির মাঝখান থেকে কোণের দিকে সরিয়া আসিয়া প্রশ্ন করিল, "আর মামা ?"

গজানন মুখটা কুঞ্চিত করিয়া বলিল, "থার্ড ক্লাস। এবার যেদিন খেলা হবে তোর মামাকে ধামা চাপা দিয়ে রাখিস নিতে, যেন বেরুতে না পারে।"

ষষ্ঠীচরণের গলা হইতে 'খুক্' করিয়া একটা শব্দ হইল, নিতাই একবার রোষকষায়িত লোচনে তাহার পানে চাহিয়া গজাননকে বলিল, "তুই খেলার বুঝিস কি ? বলে দিলি ধামাচাপা দে, আগে তোকে কে ধামাচাপা দেয় তাই দেখ্। দুটো বুকনি শিখে..."

নটু অসহিষ্ণুভাবে বলিল, "আঃ, এই এক মামার ভাগ্নে জুটেছে !...ও বোঝে না তো ওকে জিগ্যেস করতে গিয়েছিলি কেন বাপু ?...এদের আজকে সব এগারো জোড়া বুট পরে নামবার কথা ছিল মহোমিডেন স্পোর্টিঙের মত, নেমেছিল রে গজা ?"

গজানন বলিল, "হাঁটু পর্যন্ত তো জলে ডোবা— কে বুট পরে কে খালি পায় বোঝবার জো আছে ? ফুটবল হয়েছে না ওয়াটার পোলো ?...তবে হ্যাঁ, খেলেছে জান্ দিয়ে।

ডাক্তারের খেলা দেখে আমার সেই খেলা মনে পড়ে যাচ্ছিল— কি ড্যাশ্ !—কি ড্রিবলিং— কি বল ডিস্ট্রিবিউশ্যান্…ছুটল তো যেন কামান থেকে একটা গোলা ছুটেছে। ঠিক ওই জিনিস দেখেছিলাম ক্যালকাটার হোসীর মধ্যে, বল যদি একবার পেলে…"

ষষ্ঠীচরণ হঠাৎ ঘুরিয়া মুখটা বিকৃত করিয়া বলিল, "তুই হোসীকে কবে দেখলি রে গজা ? হোসী যখন খেলে তখন তোর দুধের দাঁত ভাঙেনি।"

চা আসিল। কাপে একটা চুমুক দিয়া গজানন মুখটা আরও বিকৃত করিয়া বলিল, "আর তুই বুঝি হোসীর গলা ধরে ইয়ার্কি মারতিস !…ক'টা ফুটবলারকে দেখেছিস রে ষষ্ঠে ?— কাগজ পড়ে তোর যত দৌড়…"

হৃষীকেশ বলিল, "ওর কথা বাদ দে না।…একে বাজে কথা ভিন্ন বলে না, তায় বাজি হেরে মাথার ঠিক নেই।…তুই টাকাটা নিয়ে আয় না ষষ্ঠে, এখানে বসে বাজে গজর গজর করছিস কেন ?…আজ পাড়ার টিম জিতেছে, তোর টাকা দিয়েই একটা ফিস্ট হয়ে যাক।"

"যা-যাঃ, খাবি— গঙ্গার জলে মুখ ধুয়ে আয় ; ফিস্ট খাওয়ার ঐ মুখ ! তার চেয়ে হ্যাংলার মত যেমন হাঁ করে বসে আছিস সব বসে থাক, গজা তার মিথ্যে বড়াইগুলো ঠুসে ঠুসে দিক, পেট ভরিয়ে বাড়ি যা।"

গজানন সোজা হইয়া বলিল, "মিথ্যে বড়াই কে বলে রে ?"

"আমি বলি।"

গজাননের রাগে খানিকটা বাক্স্ফূর্তি হইল না। তাহার পর কাঁপিতে কাঁপিতে ষষ্ঠীচরণের চেয়ারের সামনে দাঁড়াইয়া বলিল, "কোনটে মিথ্যে বলেছি, বল যদি মরদ কা বাচ্চা হস তো… হোসী খেলত না ক্যালকাটায় ?"

ষষ্ঠীচরণ একটু তেরছা হইয়া বেঁকিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "তুই মরদ কা বাচ্চা বললি কাকে রে ?"

"যে আমায় মিথ্যেবাদী বলেছে তাকে।"

"আলবাৎ মিথ্যেবাদী, ডাক্তার ক্যালকাটার হোসীর পায়ের নখের কাছে লাগে না। সে একটা ছিল ইন্টার-ন্যাশনাল প্লেয়ার…"

"যে আমায় মিথ্যেবাদী বলে তার গুষ্টিসুদ্ধ মিথ্যেবাদী। আজ যে ডাক্তারের ড্যাশ আর ড্রিবলিং না দেখেছে…"

"খবরদার গজা। গুষ্টি তোলালে বত্রিশ পাটি দাঁত ঝেড়ে দেব। দুটো কথা শিখে রেখেছিস,— কি বুঝিস রে তুই ড্যাশ আর ড্রিবলিঙের ?…"

ব্যাপার অচিরেই ঘোরালো হইয়া দাঁড়াইল।

দুইজনেই ঘুষি বাগাইয়াছে,— দুইহাতেই। লড়াইয়ে মুর্গির মত ঘাড় দুইটা ধনুকাকার, ঠোঁটে তীব্র ব্যঙ্গ এবং চক্ষে ততোধিক তীব্র ঘৃণা। বাকি সবাই ঠাণ্ডা করিবার ভাষায় দুইজনকেই আগুন করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছে।

"ছেড়ে দে গজা, দরকার নেই, তা ভিন্ন তুই পারবিও না ও গোঁয়ারের সঙ্গে…থাম্ ; ষষ্ঠী, রাগের মাথায় তুলিয়ে ফেলেছে গুষ্ঠি, আর কি হবে ?…তুই মিথ্যে কথা বললে যে তোর গুষ্ঠিসুদ্ধু মিথ্যে বলে এসেছে তার প্রমাণ কি ?…যাক, যা হয়ে গেছে,…নে চা-টা খেয়ে ফেল গজু, ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে…মুঠো নামা ষষ্ঠী, রাগের মাথায় শেষকালে সত্যিই বসিয়ে দিবি দাঁতের ওপর…আবার এও মুশকিল— যদি মারব বলে ঘুষি বাগিয়ে না মারে, বলবে গুষ্ঠিসুদ্ধু মিথ্যেবাদী…"

গজানন সোজা ষষ্ঠীচরণকেই উত্তর দিল, "লে-লে ; দাঁত ঝেড়ে দেয় সব সম্বন্ধী, এই

চেয়ে দেখ্ শ্রীচরণখানির বহর, এসা একখানি কিক্ ঝাড়ব ! উঠে আয়...”

আর অগ্রসর হইতে হইল না— “তবে রে, সম্বন্ধী বললি যে বড় ?”— বলিয়া ষষ্ঠীচরণ তীব্র হুঙ্কারে গজাননের গায়ে ঝাঁপাইয়া পড়িল। তাহার পর লুটোপুটি, ঠেলাঠেলি, ঘুষি, চাপড়, চুলের মুঠি— কখনও উল্টানো চেয়ারের পায়ার উপর, কখনও টেবিলের নীচে...ভাষা যা বাহির হইতেছে তাহার সামনে “গুষ্ঠি” “সম্বন্ধী” এ সব তো শিষ্টাচার !...নিতাই গোটা কতক ঘুষি দিল— ষষ্ঠীচরণ গজানন, দুজনকেই—কেননা দুজনের উপরই চটিয়া ছিল ; বাকি সবাই ছাড়াইবার চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু অসম্ভব,— যেন দুজনে দুজনের জাঁতিকলে পড়িয়া গিয়াছে।

হঠাৎ অনুপম বলিয়া উঠিল, “ওরে, গজার নাক দিয়ে রক্ত বেরুচ্ছে মাইরি ! খুন !”

সবাই লাগিয়া পড়িয়া দুইখানা চেয়ার আর ষষ্ঠীচরণের নীচে হইতে গজাননকে টানিয়া বাহির করিল। সোজা হইয়া বসিতেই তাহার নাক দিয়া আরও জোরে গলগল করিয়া রক্ত বাহির হইতে লাগিল। ...“জল আন্,..টিংচার আইডিন, খানিকটা ন্যাকড়া...গ্যাঁদাপাতার রস...”—একটা গোলমেলে শঙ্কিত রব উঠিল।

হাজার করিয়াও রক্ত বন্ধ হয় না। নানারকম আন্দাজ আর অভিমতে ব্যাপার আরও জটিল হইয়া উঠিতে লাগিল। —কেহ বলিল— মাথার শিরা ছিঁড়িয়া গিয়াছে— কেহ বলিল নাকের এবং তাহার আশপাশের হাড় একখানিও আস্ত নাই। কেহ বলিল, “দেখ দিকিন দাঁতগুলো ঠিক আছে কিনা”...কেহ পরামর্শ দিল, “অ্যাম্বুলেন্সের জন্য ফোন করে দাও— একেবারে মেডিকেল কলেজে তোল।” কয়েকজন বলিল, “অতক্ষণ বাঁচবে না।”

সামনে দিয়া একটা ট্যাক্সি যাইতেছিল। অনুপম দাঁড় করাইল। বলিল, “ওসব কাজের কথা নয়, আমাদের ডাক্তারের ডিস্‌পেনসারিতে নিয়ে চল।”

নটু বলিল, “ডাক্তার তো ওদিকে খেলতে গেছে। খেলার পরে টেণ্টে অনেকক্ষণ কাটিয়ে ফেরে।”

অনুপম বলিল, “তা হোক, কম্পাউন্ডার ধনেশ বাবু ফার্স্ট-এডটা দিয়ে দিতে পারবে। তার পর না হয়...তোল গজাননকে...গজা ওঠ...ভয় নেই, কিছু হয়নি তো তোর— শুধু একটুখানি ছড়ে গেছে মাত্র।”

চোরা ঘুষি লাগাইবার জন্য নিতাইয়ের বোধ হয় মুমূর্ষুর প্রতি দয়ার উদ্রেক হইল। সহানুভূতির স্বরে বলিল, “কিছু ভয় নেই, তুই ইষ্টি দেবতার নাম কর গজু, ভাল হয়ে যাবি।...কি খেতে ইচ্ছে হচ্ছে বল্ তো ?...মাকে দেখবি ?...”

এতক্ষণ সকলে গজাননকে ঘেরিয়া ছিল। তাহাকে তোলা হইলে কয়েকজনের দৃষ্টি ষষ্ঠীচরণের দিকে গেল। সে মুখটা যন্ত্রণায় অতিমাত্রায় বিকৃত করিয়া পায়ের গোছটা দুইহাতে টিপিয়া বসিয়া আছে। জিজ্ঞাসা করিতে— পাছে কেহ ওটা গজাননের কীর্তি বলিয়া মনে করে সেইজন্য—ক্ষীণ কণ্ঠে বলিল, “চেয়ার পড়ে একেবারে...উফ্ ! বাপ রে !...”

অনুপম, নটু, হৃষীকেশ গজাননকে ট্যাক্সিতে তুলিতেছিল, নিতাই তাড়াতাড়ি কপাটের কাছে গিয়া বলিল, “দাঁড়া, যেন চলে যাসনি তোরা, ষষ্ঠীকেও সঙ্গে নিতে হবে, তারও ঠ্যাঙের দফা নিকেশ।”

ডিস্‌পেনসারিতে পৌঁছিতেই ডাক্তার ব্যস্তভাবে বাহির হইয়া আসিল।— “ব্যাপার

কি ? মোটর অ্যাকসিডেন্ট নাকি ?…নিয়ে এস শীগগির ওপরে…এঃ !…খুব সাবধানে…ষষ্ঠীচরণের কোথায় লেগেছে ?"

কম্পাউন্ডার আর ডাক্তার— দুইজনকে লইয়া পড়িল। ব্যাণ্ডেজ করিতে করিতে ডাক্তার প্রশ্ন করিল, "ফুটবলের তর্ক করতে করতে এই ব্যাপার ? তোমরা সব কোন দিন মরবে এই করে।"

অনুপম একটু মুরুব্বিয়ানি টোনে বলিল, "আজই মরেছিল ; ভাগ্যিস আপনি খেলেই তাড়াতাড়ি চলে এসেছেন…নৈলে অন্তত গজানন তো…"

ডাক্তার বিস্মিতভাবে বলিল, "খেলা !…খেলা তো বৃষ্টির জন্যে আজ বন্ধ ; ফোনে জানিয়ে দিলে ; আমি বেরুইনি তো…"

সকলে বিমূঢ়ভাবে পরস্পরের মুখের পানে চাহিল। ষষ্ঠীচরণ একটা কি বলিতে গিয়া যন্ত্রণায় চিৎকার করিয়া উঠিল। নটু বলিল, "তবে যে গজু তুই অত ফলাও করে গল্প করলি— নিজের চোখে খেলা দেখে এসেছিস ?— বললি…ওকি ডাক্তারবাবু, দেখুন দেখুন !— গজুর কি দাঁতকপাটি লাগল নাকি ?"

ডাক্তারের মুখে যেন একটু মৃদুহাস্য খেলিয়া গেল ; বলিল, "লাগেনি, তবে লাগতে পারে, তোমরা ওকে একেবারেই বকিও না এখন…।"

হরিরাম ছুটছে

অরূপ বসু

হরিরাম এখন চিত হয়ে আকাশ দেখছে। বুকের ওপর হাত দুটো আড়াআড়ি। ডান পা-টা ভাঁজ করা,— শুয়ে শুয়েও দৌড়চ্ছে হরিরাম।

সেঁতসেতে সকাল। একটু আগে পা রেখেছে নসিবপুরের মাঠে। আলতো পা এখনও তা নরম মাটিতে বসে যায়নি।

কয়েকটা ছেঁড়া ফাটা মেঘ হামাগুড়ি দিচ্ছে আকাশে। শেষ রাতের এক পশলা বৃষ্টি তলিয়ে গেছে মাঠে। শিশুদের গালে যেমন হঠাৎ কান্নার পর একটা চটচটে দুঃখ লেগে থাকে, নসিবপুরের মাঠ এখন তেমনি।

দূরে একটা মোরগ ডাকল। হাঁসপুকুর কিংবা ছোট ধানপোতার দিকে হবে বোধহয়। একটু বাদে আর একটা কিংবা ঐটাই বারবার···

কয়েকটা ঘাস ফড়িং আর একটা নিঃসঙ্গ বক ছাড়া কেউ নেই কোথাও। —না, আছে, নসিবপুরের মাঠে গামলার মত হুমড়ি খেয়ে আছে যে আকাশ, এইমাত্র সেখানে টহল দিতে এল একটা শকুন। বাতাস কেটে সে ওপরে উঠছে। আরও ওপরে ছেঁড়া মেঘের কাছ বরাবর।

সামনে গাজন। নসিবপুরেব মাঠে তখন বসবে জমজমাট মেলা। লাঠি, ছোরা, মধু, সাপের ছাল থেকে শুরু করে বাহারী শাড়ি, পুঁতির মালা, সবকিছুই পাওয়া যাবে। আর সেখানেই স্থির হয় এ তল্লাটের বনরাজা কে।

বনরাজার নাম শুনলে সুন্দর বনের বাঘও ডরায়। ডাকাত ত কোন ছার। সাহসে, শক্তিতে, ক্ষিপ্রতায় ও লক্ষ্যভেদে আট-দশটা গাঁয়েব সেবা পুরুষ বনরাজা।

লোকে বলে বাদা নসিবপুর। পশ্চিমে জংলী খাল, দক্ষিণে ভাগাড়, ভাগাড় ছাড়িয়ে পুরানাটুলি—মুচি, মেথর বাঁশফোড়দের বাস। উত্তর আর পূর্বে আট দশখানা গাঁ— ছোট ধানপোতা, বড় ধানপোতা, পরীর মাঠ, হাঁসপুকুর···সব গ্রাম মিলে একটা পাড়া। ওপরে যত ভাব, ভেতরে তত রেষারেষি। জংলী খাল বেয়ে সুন্দরবন একরাতের পথ। বাঘ আর ডাকাতের উৎপাত এখানে সমান। সব ছেলে ছোকরাই দু-বেলা লাঠি খেলা, ছোরা খেলা, সাঁতার, দৌড়, একটা না একটা নিয়ে ব্যস্ত থাকে। দু-বছর বাদে বাদে বনরাজা হতে যে সবাই চায়। বনরাজা হতে গেলে যে সব খেলাতেই সেরা হতে হয়, বিশেষ করে দৌড়ে— গতবার সেই কারণেই হরিরাম পারল না। শিবে ঘোরই···

না, যে যাই বলুক, শিবেকে সে ওস্তাদ বলে জানে। শিবে ত মানুষ নয়, সাক্ষাৎ দেওতা, বাপ্‌ বড় কাছারি।

গাঁয়ের মানুষ টিটকিরি কাটে,···হ্যাঁরে, হরিরাম গেলবার লাঠি খেলতে খেলতে তুই য্যাখন রেহাই চাইলি, ত্যাখন তোকে ঘা দিলে ক্যানে ! শিবে ? আশীর্বাদ করলে নাকি বাবা বড় কাছারি—

ধক করে আগুন ধরে যায়। দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে। মাথা ভরতি তাল তাল বারুদ।

পাক খেয়ে খেয়ে ধোঁয়ার কুণ্ডলী ওঠে যেন। কেমন আচ্ছন্ন হয়ে যায় চারপাশ।

আষাঢ়ের মেঘ যেমন একটার পর একটা এসে আকাশ ছেয়ে ফেলে, হরিরামেরও তেমনি একটার পর একটা ঘটনা মনে পড়ে···

সেবারও মেলায় খুব ধুমধাম। বাবা মার সঙ্গে হরিরামও গেছে মেলাতে। রামদাস ছেলেকে মিষ্টি ফুলুরি, বিলায়েতি গাড়ি কিনে দিয়েছে। চাবি দিলে খুদসে চলে বিলায়েতি গাড়ি···

দুরোজ বাদে সেদিনই ছিল বনরাজার লড়াই। নসিবপুরের মাঠে থিক থিক করছে লোক। আগের দুবারের বনরাজা শিবে ঘোরই-এর সঙ্গে পাল্লা দিতে নেমেছে ছোট ধানপোতার হারান মালো। জংলী খালে সাঁতার, আগুনের ওপর দিয়ে ঝাঁপ— শিবে, হারান সমান সমান গেল। কেউ কাউকে হারাতে পারল না।

সন্ধ্যায় আট দশটা ডে লাইট উঠল। মেলার মাঝখানে তখন চলছে লাঠি খেলার শেষ পর্যায়ের লড়াই। এখানেও সবাইকে হারিয়ে শেষ লড়াইয়ে মুখোমুখি হারান ও শিবে। দেখা যাক কার লাঠি কার মাথা ভাঙে।

মেলা প্রাঙ্গন ছাড়িয়ে নসিবপুরের মাঠের চারপাশে তখন ঘন নিঃশ্বাসের মত অন্ধকার থৈ থৈ করছে। অনেক দূরে একটা শেয়াল ডাকল, হুক্কা হুয়া— তারপর সার বেঁধে অনেকগুলো শেয়াল ডেকে উঠল। শেয়ালের ডাক একদম মেলার গা বেয়ে ভাগাড়ের দিকে চলে গেল। ভয়ে হরিরাম রামদাসকে জাপটে ধরল।

ঠিক তখন হারানের লাঠির ঘা অল্পের জন্য শিবে এড়াতেই লোকে হৈ হৈ করে উঠল। শিবে পাল্টা আঘাত হানার জন্য লাঠি ভাঁজতে লাগল। হৈ হৈ কিন্তু থামল না। বাড়তে বাড়তে বাড়তে বাড়তে···হঠাৎ সবাই খেয়াল করল মেলায় ডাকাত পড়েছে।

ডাকাত— ডাকাত— বলে যে যেদিকে পারল দৌড় দিল। আলোগুলো লাঠির ঘায়ে কারা যেন ভেঙে দিল। দু-চারটে ছাড়া সব আলোই নিভে গেল। সেই গা ছমছমে আলো অন্ধকারে রামদাস হেলা কিন্তু পালায়নি। হরিরামের মা আর হরিরামকে একটা তাঁবুর মধ্যে রেখে, রামদাস একা লাঠি হাতে দাঁড়িয়েছিল।

ডাকাতের দল একটু বাদেই রামদাসের সামনে এসে পড়ল। রামদাস রুখে দাঁড়াতেই, ডাকাত সর্দারের গলা শোনা গেল— ঘর যা রামদাস। রঙ্গনের সঙ্গে ছেলে খেলা করিস না—

রামদাসও হুঙ্কার দিয়ে উঠল। বাদা নসিবপুরে আমি থাকতে ঘর যা তু, রঙ্গন।

জয় বাবা বড় কাছারি বলে লাঠি চালাল রামদাস। রঙ্গনের লাঠিতে রামদাসের লাঠি ধাক্কা খেল। রঙ্গনকে সাহায্য করতে দু-একজন এগিয়ে এলেও শিরি ভাগই পেছিয়ে গেল।

তাঁবুর ভেতর হরিরামকে বুকে চেপে তার মা ঠক-ঠক করে কাঁপছে। কারুর কোন সাড়া নেই। ভাগাড়ের দিক থেকে কুকুরের ডাক ভেসে আসছে। দুজন ডাকাতের সঙ্গে একা যুঝে যাচ্ছে রামদাস। বাকিরা পালিয়েছে।

থেকে থেকে রঙ্গন আর রামদাসের বুক কাঁপান হুঙ্কার শোনা যাচ্ছে। কিছুক্ষণ এভাবে চলার পর হাঁকডাক থেমে এল। একে একে দু-একজন উঁকি ঝুঁকি দিল। খাঁ খাঁ করছে মেলা প্রাঙ্গনে।

কে রে ওখানে? কে শুয়ে মাঠের মাঝে? শিবের গলা শুনে হৈ হৈ করে সবাই বেরল। মাঠের মাঝে তিনটে রক্তাক্ত অচল শরীর দেখে আঁতকে উঠল সবাই। হরিরামের মা রামদাসের শরীরের ওপর আছড়ে পড়ল। চিৎকার করল। চুলের মুঠি ধরে ঝাঁকাল— রামদাসের থেমে থাকা শরীরটা এতটুকু নড়ল না।

মুমুর্ষু ডাকাত দুজনের একজন রঙ্গন। বলল থাম, আর চেঁচাসনি। বাদা নসিবপুরে রামদাস ছাড়া মরদ কোন বেটা। রামদাস আর এই রঙ্গন যদি বাঁচত পুরানাটুলি সগ্গ বনায়ে দিত। রঙ্গনও বাঁচেনি।

মেলা সেদিনই ভেঙে গেল। পরদিন আর নসিবপুরের মাঠে ছয় চক্করের দৌড় প্রতিযোগিতা হল না। ঠিক হল সেবারের বনরাজা শিবেই। কেননা সবার আগে তাঁবু ছেড়ে ডাকাতের খোঁজে বেরিয়েছে শিবে। বনরাজার নগদ পুরস্কার দুশ টাকাও তার ভাগ্যে জুটল।

রামদাসের সম্মানে ঠিক হল এর পর থেকে বনরাজার লড়াইয়ে হরিজনরাও নামতে পারবে। ছোট জাত বলে এতদিন যে সুযোগ তারা পায়নি, রামদাসের মৃত্যুতে তা পেল।

হাঁসপুকুরের মোড়ল মদন সাধুখাঁর অনেক পয়সা। তার চেয়ে ধনী এ তল্লাটে কেউ নেই। তেলকল, ধানকল, জেলে নৌকো, সারের কারবার, শুওরের খোঁয়াড়, ভাগাড়— তেনার কত কি কারবার। তেনাকে মান্যি—

না মান্যির দিক থেকে পরীর মাঠের রসিক চাটুয্যেকে কেউ টেক্কা দিতে পারেনি। আর পারবেও না। শিবে রসিকের গাঁয়ের লোক। একনাগাড়ে পাঁচবারের বনরাজা। শিবের আগের চারজন বনরাজাও পরীর মাঠের বাসিন্দা। ধন্য গাঁ পরীর মাঠ। গাঁয়ের মোড়ল রসিক চাটুজ্যের ডাঁটও তাই সবচেয়ে বেশি।

মদন সাধুখাঁ হরিরামকে শুওর চরানর কাজ দিলেন। হাঁসপুকুরে থাকার জন্য জমি দিলেন, ঘর বেঁধে দিলেন। হরিরামকে কাছে ডেকে আদর করতে করতে মদন সাধুখাঁ বলেছিলেন, তুই আর তোর মা এখানে থাক। বড় হ, শরীর বানা। লোকে বলবে রামদাস হেলার ছেলে হরিরাম হেলা—

অনেকেই বারণ করেছিল। বলেছিল, রামাইয়ার মা এ কী করলে? তোমরা হলে খাঁটি মেথর। শেষে কিনা শুওর চরানর কাজে দিলে ছেলেকে?

হরিরামের মা উত্তর দেয়নি। হরিরামও কথা শোনেনি।

মোরগ ডাকা ভোরে শুওরের পাল নিয়ে নসিবপুরের মাঠ পেরিয়ে ঢিবির কাছে চলে গেছে। সারাদিন জংলী খালে সাঁতার কেটে, গাছের ডালে দোল খেয়ে বেলা ফুরিয়ে গেছে। সন্ধ্যা বেলা ঘরে ফিরে মা-র তৈরি রোটি আর বিলায়েতি গুড় খেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে।

এইভাবে কিছুদিন চলার পর মদন সাধুখাঁ একদিন মাধব মাস্টারকে ডেকে হরিরামের দায়িত্ব নিতে বললেন। এর জন্য আলাদা মাইনে পাবে মাধব মাস্টার।

এক সময়কার নামকরা খেলোয়াড় মাধব সিমলাই। সব খেলায় পাকা। কলকাতার ক্লাবে একসময়ে বল খেলতেন মাধব। বছর পনের আগে জুনিয়র স্কুলের মাস্টারি নিয়ে তিনি ছোট ধানপোতায় এসেছিলেন। সেই থেকে রয়ে গেছেন, গাঁয়ের আর সব মানুষের

মত।

আট দশটা গাঁয়ের সবাই ভালবাসে মাধব মাস্টারকে। শোনা যায় শিবেকে তৈরি করেছিল মাধব মাস্টারই। এমনকি শিবে, একবার জাতীয় অ্যাথলেটিক্সে দৌড়ে ছিল মাধব মাস্টারের চেষ্টাতেই। শিবে কিন্তু এসব স্বীকার করে না। মাধব মাস্টার বলেন, যেদিন আর একটা শিবে তৈরি করতে পারব, সেদিন শিবে স্বীকার করবে, যে তাকে আমিই তৈরি করেছিলাম।

মদন মোড়লের প্রস্তাবে রাজি হয়ে গেল শিবে।

হরিরামের ফূর্তি আর ধরে না। নসিবপুরের মাঠে শুওর ছেড়ে দিয়ে চক্কর খায়।

এই মাঠের ধারে হঠাৎ একদিন শিবেকে দেখেছিল হরিরাম। টিব্বির ধার থেকে অস্পষ্ট একটা ছায়া উঠে এসেছিল। তারপর দ্রুত কাছ ছুঁয়ে আবার অস্পষ্ট হয়ে গেছিল। তারপর মাঝে মাঝেই শিবেকে দেখে, অবিরাম ছুটছে। মুগ্ধ হয়। কখনও প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে, শত্রু হিসাবে ভাবতে পারে না।

শত্রু, হ্যাঁ, শত্রুই বটে। মাধবদা বলেছেন,—যে আমার বাঁচার প্রয়োজনীয়তা, মাটি আঁকড়ে পড়ে থাকার সুখ কেড়ে নিতে চায় সে শত্রু বৈ কি ? খেলার মাঠে সে শত্রু। খেলার মাঠে কোন আপোস নেই। বাপ, ছেলে গুরু, শিষ্য কোন ভেদ নেই। যুদ্ধক্ষেত্রে যেমন হয়, মার নয় মর। খেলার মাঠেও তেমনি। হয় জেত, নয় মাথা হেঁট করে চলে যাও, যে হারে তাকে কে কবে মনে রেখেছে। কে, কবে তাকে মালা দিয়েছে। পুরস্কার দিয়েছে।

—এই ত তুই রামদাস হেলার ছেলে। রামদাস ডাকাত মেরে সবাইকে বাঁচাল। আর বনরাজা হল শিবে। কে মনে রেখেছে রামদাসকে। শিবেই বলতে পারত না, এবারের বনরাজা আমি নই, রাজা রামদাস হেলা।

—বুঝলি হরিরাম শিবে, শিবে তোর শত্রু। শিবেকে হারিয়ে বনরাজা তোকে হতেই হবে।...

আপন মনে নসিবপুরের মাঠ বেয়ে দৌড়তে থাকে হরিরাম। তার চেতান বুকে বাতাস ধাক্কা খায়। শুওর চরা মাঠে বক ওড়াউড়ি করে। দু-একটা বক শুওরের পিঠে চড়েই গম্ভীর চোখে এদিক ওদিকে তাকায়। কয়েক মাস আগেও লাঠি হাতে তেড়ে তেড়ে বক তাড়াত হরিরাম। এখন ওসব দিকে মন দেবার সময় নেই। আকাশ ফাটছে। রোদ ছড়াচ্ছে। লম্বা লম্বা ঠ্যাং ফেলে হরিরাম এগচ্ছে—

মাধবদা বলেন, ঠ্যাং যতটা পারবি, লম্বা করবি। তা বলে কি ঠ্যাংকে টেনে লম্বা করা যায় ? যায় না। আসলে লাফ।

লোকে বলে চিতার মত, হরিণের মত গতি। আচ্ছা চিতা, হরিণের ঠ্যাং কি জিরাফের চেয়েও লম্বা। তা ত নয়। তবে কেন অত জোরে ছোটে ? আসলে লাফ দেয়। যতটা পার লম্বা আর দ্রুত লাফ দাও। অনেকগুলো লম্বা আর দ্রুত লাফ মিলিয়েই ত একটা বড় দৌড়। যাদের চার পা তারা দু-পায়ে লাফায়। দৌড়নর সময়ে মানুষ লাফায় এক পায়ে।

লাফ দিতে গেলে প্রাণীদের সব কটা পা-ই সাধারণত মাটির ওপরে থাকে। দৌড়নর সময়ে দেখবি একটা পা সব সময়ে মাটিতে রয়ে যাচ্ছে। ওর জন্য চেষ্টা করতে হয় না। আপনা থেকেই হয়ে যায়।

হরিরাম হাঁপাতে হাঁপাতে যখন মাঠে বসে পড়ত, বিশ্রামের জন্য, তখনই দেখত শুওর

চরা মাঠের মাঝ থেকে মাধব মাস্টার চেঁচাচ্ছে। কিরে থামলি কেন, এখনও আটপাক বাকি।

হরিরাম আবার ছুটতে থাকে। অবসাদে দুই হাত ঝুলে আসে। পায়ের পাতা শুয়ে পড়ে মাটিতে। খেয়াল হতেই হরিরাম ঠিক করে নেয়···

···দৌড়বি সব সময়ে পায়ের ডগায় ভর দিয়ে। গোড়ালি আর বুড়ো আঙ্গুল একসঙ্গে মাটিতে ফেলবি না। ওতে গতি কমে যায়।

···গতিকে বাড়ানর জন্য হাতটাকেও কাজে লাগাবি হারিরাম।

পৃথিবীতে দুটো সাগর। একটা জলের আব একটা বাতাসের। জলে যখন নৌকো যায়, দাঁড় বায়, দেখবি মাঝির হাত যতটা এগোয় ; ততটাই পেছোয়। পাখি যখন বাতাসের সাগরে আকাশে ওড়ে, তখন দেখবি পাখি যতটা ডানা মেলে ততটাই ডানা গোটায়।

মাছ যেমন পাখনা দিয়ে জল, হাঁস যেমন পায়ের পাতায় জল, পাখি যেমন ডানার আঘাতে বাতাস কেটে এগয়, তেমনি মানুষকেও বাতাস কেটে এগতে হবে। কাটার জন্য পা ও হাত দুটোকেই সমানভাবে কাজে লাগাতে হবে। যেমন বাতাসে দাঁড় বাইছে, এভাবে সামনে পেছনে এগবে মুঠো করা হাত দুটো···

হরিরাম চিত হয়ে শুয়ে বুক ভর্তি বাতাস নেয়। বুকটা যদি আর একটু বড় হত, বাতাস ঠেসে আরও খানিকটা দৌড়তে পারতাম। আরও জোরে, আরও দূরে···

ডানা মেলে একটা শকুন মাঠের ওপর অনেকদূর ছুটে গেল। তারপর ডানা ঝাপটাতে ঝাপটাতে অনেক ওপরে উঠে গেল। হরিরাম ভাবছিল, ঐ রুগ্‌ণ,খেতে না পাওয়া ডানা দুটো এত বড় শরীরটাকে কত ওপরে টেনে তুলবে। সত্যি চেষ্টা করলে কী না হয়।

টিরির, টিটি, টিরিরর টিটি— দুটো হাত মুখের কোছে কোষ করে অদ্ভুত আওয়াজ করছিল হরিরাম। আর ঘোঁৎ ঘোঁৎ করতে করতে শুওরগুলো এক জায়গায় হচ্ছিল। হরিরামের এবার ঘরে ফেরার পালা। খেয়ে দেয়ে বিশ্রাম। বিকেলে আবার সাঁতার, লাঠিখেলা—

লাঠিখেলায় শিবে খুব ওস্তাদ। আর ছিল রামদাস হেলো। মাধবদা বলেন, রামদাসের চোখ শিবের চেয়েও ভাল ছিল।

লাঠিখেলায় চোখই আসল। শুধু লাঠি কেন, ছোরা, মুঠিখেলা (বক্সিং) যে কোন মারামারির খেলাতেই চোখ আসল। চোখ আয়নার মত। মানুষ কিভাবে আঘাত হানবে, তা চোখে ধরা পড়ে। চোখকে লুকান যায় না।

মাধবদার কথা শোনেনি বলেই বাঁ হাতটা চিরকালের জন্য জখম হয়ে গেল। গতবার বনরাজা হতে হতেও পারল না হরিরাম। দোষ আর কারুর নয়। দোষ তার নিজের।

গতবার গাজনে বড় কাছারির মেলায় সবাইকে হারিয়ে মেলার ভিড়কে চমকে দিল হরিরাম। শেষ লড়াই শিবের সঙ্গে। সাঁতারে কেউ কাউকে হারাতে পারল না। জংলী খালের জল তোলপাড় করেও দুজনে একই সময়ে তীরে পৌঁছল।

ছোরা খেলায় কেন জানি না, হঠাৎ পিছিয়ে গেল হরিরাম। ছোরাটা মাটিতে নামিয়ে রেখে নিজেই হার মানল হরিরাম। সবাই শিবের জয়ধ্বনি দিলেও মাধব মাস্টার জানত, এ খেলায় হরিরামকে হারাবে এমন মরদ নেই বাদা নসিবপুরে।

শিবের নাম শিবনাথ ঘোরই হয়েই যত গোলমাল। বাবা বড় কাছারির আর এক নাম শিব। শিবের চেহারাও আর দশটা গাঁয়ের মানুষের চেয়ে আলাদা। সাদা ধবধবে রঙ,

টানা টানা চোখ, অমন শক্তি, অমন গতি দেওতা ছাড়া আর কার হবে— শিবেদা সাক্ষাৎ দেওতা, মহাদেও— হরিরামের মাই একথা বলেছে। আর যাবে কোথা। হরিরামের মাথা থেকে সে ভূত ভাগানো মাধব মাস্টারের কাজ নয়।

মাধব মাস্টার জানে শিবের গায়ে পাছে ছোরার আঘাত লাগে তাই হরিরাম লড়াই থেকে সরে এসেছে। হার মেনেছে।

মাধব মাস্টার মেলার এক কোণে হাঁটুতে মাথা গুঁজে বসে আছে। খানিকটা দূরে মঞ্চের ওপর মদন সাধুখাঁ ঘন ঘন হুঁকো টানছে। রসিক চাটুয্যের এসব দিকে যেন নজর নেই। এর ওর ভাল মন্দ খবর নিচ্ছেন আর নোটবুকে টুকে রাখছেন। তারই ফাঁকে আড়চোখে মাধব আর মদনকে দেখে নিয়েছেন।

একঘণ্টা বিশ্রাম বা রেহাই। তারপর লাঠিখেলা আর পরদিন দৌড়— মেলা শেষ। দুটোতেই শিবে ভাল। সমান সমান করলেও, হারান প্রায় অসম্ভব।

ছোরা খেলায় জিতলে চিন্তা ছিল না। রাগে, দুঃখে চোখে জল এসে গেল মাধব মাস্টারের। ভিড়ের ভেতর কে যেন টিটকিরি কাটল, কিরে হরিজনের বেটাকে রাজা বানালি না। বেটা রঙ্গন সর্দারের বাপ—

পা টিপে টিপে হরিরাম কখন যে মাধবের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে কেউ টের পায়নি। সবার সব কথা হরিরামের কানে গেছে। হরিরাম পাথরের মত অসাড় হাত মাধবের পায়ে রাখল। মাধব মাথা তুলতেই হরিরামের চোখ ছলছল করে উঠল।

মাধব মাস্টার বললেন, 'জানি সব জানি। কিন্তু আমারটাও আমাকে ফিরিয়ে দিতে হবে। হ্যাঁ, লাঠি আর দৌড়েই ওকে হারাতে হবে।'

মাধবের হাত থেকে লাঠি নিল হরিরাম। চোখে চোখ রাখল। তারপর বাঁশি বাজতেই জায়গা মত গিয়ে দাঁড়াল। শুরু হল লাঠির ঠকাঠক, খটাখট। দুজনেই দুদিকে হেলে পড়ে সামাল দিতে লাগল। চোয়াল শক্ত। হাতের শিরাগুলো পাকান দড়ির মত—

গোটা লড়াইয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়লে যে কোন লেঠেল পাঁচ মিনিটের রেহাই চাইতে পাবে। তাও দুবারের বেশি নয়।

শিবে কিন্তু এর মধ্যেই দুবার রেহাই চেয়ে নিয়েছে। তার মানে দুবার সে ক্লান্ত বোধ করেছে। একবারও করেনি হরিরাম।

হরিরামের লাঠির চাপে বেঁকে যেতে লাগল শিবে। সবাই ড্যাবড্যাবে চোখে তাকিয়ে। রসিক চাটুয্যের চোখ ত ঠিকরে আসছে। হায় হায় একি হল। শেষে কিনা মেথরের হাতে—

শিবে বেঁকে পড়ে যাচ্ছে, এমন সময়ে হঠাৎ কী মনে করে হরিরাম হাত তুলল। হাত তোলা মানে রেহাই চাওয়া। আশ্চর্য! বিচারক রেহাই দিলেন না। শিবে ততক্ষণে ঠিক হয়ে নিয়ে আচমকা লাঠি চালাল। শিবের লাঠি সপাটে হরিরামের মাথা ও কাঁধ লক্ষ্য করে নেমে আসছে দেখে বাঁ হাত দিয়ে ঠেকাল হরিরাম। আর সঙ্গে সঙ্গে অসহ্য যন্ত্রণায় বসে পড়ল মাটিতে। ভিড়ের অধিকাংশ লোকই তখন হাসছে। মাধব চেঁচাল— এ কি রেহাইয়ের সময় আঘাত করল কেন?

বিচারক বললেন, রেহাই গ্রাহ্য হওয়ার আগেই মার এসেছে। ঠেকাতে পারেনি হরিরাম। এখন তাই পাঁচ মিনিটের রেহাই।

ভিড়ের ভেতর আবার আওয়াজ উঠল, কিরে মেধো, মেথরের ব্যাটাকে রাজা বানালি না?

আর একজন বলল, আগে ওকে প্রাণে বাঁচা।

মাধব জানে আবার হরিরাম শিবেকে বাঁচাতেই, রেহাই চেয়েছে। আর সেই সুযোগেই—

শিবেও এক অদ্ভুত আক্রোশে মাটিতে থুতু ফেলল। মেথরের বেটা আমার গায়ে—

শিবের কথা শেষ হল না। তবে লাঠি ধরো শিবে দা। আমি এক হাতেই লড়ব। আমিও রামদাসের বেটা—

দুবার শিবে হরিরামের আক্রোশকে সামাল দিল। তারপর শিবের লাঠি বহুদূর তাঁবুর চালে গিয়ে পড়ল। শিবের কপাল ফেটে ঝুঝিয়ে রক্ত পড়তে লাগল। একদল লোক হরিরামকে বেপরোয়া মারতে লাগল। আর হরিরামকে বাঁচাতে এই প্রথম হরিজনরাও দল বেঁধে লাঠি ধরল।

প্রাণ বাঁচাতে রসিক চাটুয্যের দল পরদিন আর এল না। দৌড় হল না।

সেবার বনরাজার পুরস্কার কাউকেই দেওয়া হল না। কিন্তু হরিরামকে অনেকে ব্যক্তিগতভাবে পুরস্কার দিল। মন ভরল না হরিরামের। মাধব মাস্টারেরও।

সেই থেকে যেন ভূতে ধরল হরিরামকে। সকালে সন্ধ্যায়, খাঁখাঁ দুপুরে, গহীন রাতে কখনও জলে ঝাঁপাচ্ছে, কখনও একলা মাঠে ছুটছে, বা এক হাতে লাঠি ঘোরাচ্ছে। কখনও সকলের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছোটে, কখনও নৌকার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সাঁতার কাটে। সব কিন্তু করে এক হাতে।

কেউ বলল ভূতে ধরেছে, কেউ বলল মাথা বিগড়েছে।

হরিরামের মা বড় কাছারিতে মানত করলেন। জল-পড়া ছিটিয়ে দিলেন হরিরামের গায়ে। মদন মোড়লও সিন্নি খাওয়ালেন হরিরামকে। রাতে বা সন্ধ্যায় ত নয়ই, এমন কি সকালে ও দুপুরেও কেউ আর নসিবপুরের মাঠের দিকে যায় না।

সামনে গাজন। এবার বনরাজা কে হবে কেউ বলতে পারছে না। শিবের আর সেদিন নেই। অভিজ্ঞতায় যেটুকু চালিয়ে যায়। পঙ্গু পাগল ভূতে পাওয়া হরিরামকে প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে কেউ পাত্তাই দিচ্ছে না। একমাত্র শিবে আর মাধব মাস্টার ছাড়া।

শিবে যখন সবচেয়ে জোরে দৌড়ত তখনও নসিবপুরের মাঠ দশ মিনিটে দুবার চক্কর দিত। সেটাই রেকর্ড। শিবে অনেকদিন দৌড় থামিয়ে লক্ষ করেছে হরিরাম দশ মিনিটে তিনবার চক্কর দিচ্ছে।

অন্ধকারে যখন নিজের হাত পা দেখা যায় না তখনও হরিরাম অনায়াসে মাধব মাস্টারের সঙ্গে লাঠি খেলায় জিতে যায়।

শিবেকে ইদানীং নসিবপুরের মাঠে— বড় একটা দেখা যায় না। নিজের গ্রাম পরীর মাঠ ছেড়ে সে বড় একটা পথে বেরয় না। রসিক চাটুয্যের বাড়িতেই থাকে।

নসিবপুরে এখন সাজ সাজ রব। ব্যাপারীরা তাঁবু খাটাতে শুরু করেছে। উদলো বাঁশের ম্যারাপ ফাঁকা মাঠে দাঁড়িয়ে···

হাঁসপুকুর, ধানপোতা, পরীর মাঠে খবর রটল···হরিরাম শুয়ে আছে নসিবপুরের মাঠ ছাড়িয়ে ঢিবির দিকে—

পিল পিল করে লোক ছুটছে নসিবপুরে। একটু একটু ভিড় জমছে। চিত হয়ে শুয়ে শুয়ে মজা দেখছে হরিরাম। দু-তিনটে শকুন চক্কর খাচ্ছে মাথার ওপর। হঠাৎ তীব্র করুণ চিৎকারে সবাই এদিক ওদিক তাকাল···এ রামাইয়া···রামাইয়া রে···এ···এ··

শিবের চেয়ে হরিরামের চেয়ে জোরে ছুটে আসছে হরিরামের মা। তাঁর ছেঁড়া ন্যাতার মত তেলচিটে শাড়ির আঁচল উদ্দাম বাতাসে নিশানের মত উড়ছে।

জয়-পরাজয়

প্রভাবতী দেবী সরস্বতী

ফুটবল ম্যাচ—

ওদিকে শিমূলতলা হাইস্কুলের বাছা বাছা ছেলে, এদিকে চকদিঘির হাইস্কুলের ছেলেরা।

ফটিক ভেবেই পায় না— শিমূলতলা স্কুলের ছেলেরা এত শক্তি পেলে কোথায় ?

আজ তারা ম্যাচ লড়তে এল— এ তো বড় কম কথা নয় ! এই তো গত বৎসরও খেলায় নাম দিয়ে খেলতে এসেছিল তোড়জোড় করে, প্রথম খেলাতেই গোলের পর গোল— সে কি ভীষণ পরাজয় ! দাঁতে কুটো করে শেষটায় পালাবার পথ পায় না,— নাক-কানও মলেছে নাকি,— আর নাকি তারা শিমূলতলার সঙ্গে কোনদিন খেলতে নামবে না।

সে তো এই সেদিনকার কথা,— এর মধ্যে তারা সে প্রতিজ্ঞা ভুলে গেল ? দু দিন না যেতেই তারা এতখানি শক্তিশালী হয়ে উঠেছে, আজ আবার সদর্পে খেলতে এসেছে !

শিমুলতলা আর চকদিঘি,— আসলে এদের দ্বন্দ্ব চিরদিনের—চিরকালের। শিমূলতলার লোক যদি যায় পুবদিকে, চকদিঘির লোক যাবে পশ্চিমে, এমনি ধারা চলে আসছে পুরুষানুক্রমে ! চকদিঘি যেখানে 'হাঁ' বলবে, শিমূলতলা নিশ্চয়ই সেখানে 'না' বলবে।

চকদিঘির বাবুরা একটা হাইস্কুল করবেন— মাইনর স্কুলটাকে হাইস্কুলে পরিবর্তিত করবার জন্য তাঁরা উঠে পড়ে লাগলেন, খাটলেনও বিস্তর, যাতে করে মাইনর স্কুল শীঘ্রই হাইস্কুলে পরিণত হল। এলেন বি-এ, বি-টি, হেডমাস্টার, তাঁর সঙ্গে আরও কতজন শিক্ষক।

দেখতে না দেখতে আশ্চর্য,— শিমূলতলাতেও এলো জাগরণ ! জমিদারবাবুরা কখনও কলকাতা ছেড়ে গ্রামে আসতেন না, তাঁরাও এলেন ফিরে, এবং অজস্র অর্থব্যয়ে শিমূলতলার পাঠশালাটাকে হাইস্কুলে পরিণত করে নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলেন। এঁদের স্কুলের হেডমাস্টার এলেন এম-এ, বি-টি ; শিমূলতলা চকদিঘির পানে তাকিয়ে বাঁকা হাসি হাসল।

চকদিঘি হাঁক দিলে— "শিমূলতলাকে যে কোন রকমে পরাজিত করতেই হবে।"

পথে-ঘাটে ছেলেদের সঙ্গে অন্য গাঁয়ের ছেলেদের সঙ্গে দেখা হলে উভয় পক্ষই পাশ কাটায়। সেদিন চকদিঘির ছেলে গোবিন্দকে শিমুলতলার বনমালী দাস মুখ ভেংচে বক দেখিয়ে গেছে, চকদিঘি একদিন সদলবলে গিয়ে শিমূলতলার চৌমাথায় লাফিয়ে গালাগালি করে শাসিয়ে এসেছে।

সেই শিমূলতলা!— সে এবার বুক ফুলিয়ে ম্যাচ খেলতে আসছে ?

ফটিক ফার্স্ট ক্লাসের ছেলে, দলের কাপ্তেন, ভাবনাটা তাই বেশি। চিন্তিত মুখে সে হাঁক দেয়— "ন'কড়ে—"

ফটিকের ডানহাত নকড়ি, প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর দেয়, "কি ?"

বিষণ্ণ কণ্ঠে ফটিক বলে, "ব্যাপারটা কি বল তো, বড্ড ভাবিয়ে তুললে যে !"

ভাববারই কথা। শিমূলতলা-টিমের কাপ্তেন হরু ঘোষকে কে না চেনে ? রোগা হাড় জিরজিরে ছেলেটা, দেখলে মায়া হয়। মা জমিদারবাবুর বাড়িতে রান্নাব কাজ করে, তাতে কোন রকমে মা-ছেলের দিন চলে। জমিদারের স্কুলে পড়ে, বই খাতা-পত্র স্কুল হতেই পায়। এই হরু ঘোষ হয়েছে দলের কাপ্তেন, কিন্তু পাববে সে চকদিঘিব সামনে দাঁড়াতে ?

বৃন্দাবন বললে, "শুনলুম ওরা নাকি বাইরে থেকে খেলোয়াড় আনছে, তাই ওদের এত জোর।"

"বাইরের খেলোয়াড় !—হুঁ !" ফটিকের মুখখানা বড় বেশি রকম বিপন্ন দেখায়।

বেচা বললে, "শুধু তাই নয়, ওরা দলকে দল রক্ষে-কবচ পরেছে,— মা কালীর ফুল-বেলপাতা তাতে ভরা। জমিদারবাবুর পুরুত সারাদিন উপোস করে থেকে অমাবস্যাব রাত্রে এই রক্ষে-কবচ তৈরি করেছেন।"

ফটিক ভ্রূকুটি করে।

খানিক চুপ করে থেকে বলে সে, "রক্ষে-কবচ পরে খেলতে আসা— তাও ভাড়া-করা খেলোয়াড় নিয়ে ! ছ্যাঃ, ছ্যাঃ ! চকদিঘির যেন এ দুর্মতি না হয়, ঠাকুবের নির্মাল্যি নিয়েও যেন খেলতে না যায় ! ভীরু কাপুরুষ শিমূলতলা—একেবারে কাপুরুষ, নইলে রক্ষে-কবচ নিয়ে খেলতে আসে ?"

শিমূলতলা গ্রামের একপাশে একটি কুঁড়ে ঘর, বেড়ার দেয়াল, খড়েব চালা ; এই ঘরেই থাকে হরু বা হরেন ঘোষ তার দুঃখিনী মাকে নিয়ে।

একমাত্র উদ্দেশ্য হরুর— সে বড় হবে, দুঃখিনী মাকে সে সুখী করবেই। এইবার ফটিকের সঙ্গেই সে দেবে ম্যাট্রিক।

এখানকার ফুটবল টিমের কাপ্তেন ছিল বলরাম, কিছুদিন আগে সে চকদিঘির দলে যোগ দিয়েছে। স্কুলে সে ফ্রিতে পড়তে চেয়েছিল ; কিন্তু অবস্থা ভালো, বেতন দেওয়াব সামর্থ্য আছে জেনে, মাস্টার নীলমণিবাবু তাকে ফ্রিতে নেননি। অত্যন্ত রাগ করেই সে শিমূলতলা ছেড়ে যোগ দিলে চকদিঘিতে, সেখানকার হেডমাস্টার জগন্নাথবাবু বিনা প্রতিবাদে তাকে গ্রহণ করলেন।

কি জানি কেন— ফটিক তাকে ঠিক বিশ্বাস করতে পারে না। ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি করে যে লোক নিজের দেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে, পরের দেশের সে উপকার করবে এ আশা করাই বাতুলতা। ইতিহাস এ রকম লোকদের ঘৃণিত ভাবে এঁকেছে, এসব লোকের কাছ থেকে তফাৎ থাকবার উপদেশই দিয়েছে।

কি করে সে বিশ্বাস করে বলরামকে ? চিরকাল যেখানে বাস, সেখান হতে যে লোক সামান্য একটু ত্রুটি দেখলেই সরে পড়ে, অক্লেশে অসঙ্কোচে বিপক্ষদলে যোগ দেয়, তাকে বিশ্বাস করা দুঃসাধ্য।

তার মনস্তুষ্টির জন্য বলরামের চেষ্টার অন্ত নাই— শিমূলতলার অতি গোপন কথা পর্যন্ত

সে ব্যক্ত করে দেয়, 'যেন তেন প্রকারেণ' এদের বিশ্বাসভাজন হওয়ার চেষ্টা করে।

বিশেষ করে এই জন্যই ফটিক দারুণ অসন্তুষ্ট হয়ে ওঠে,— তার মুখের পানে তাকিয়ে বলরাম তাকে যেন কতকটা বুঝতে পারে।

পথের ওপর হঠাৎ দেখা হরেন ঘোষের সঙ্গে। —দুই প্রতিদ্বন্দ্বী নিঃশব্দে দুজনের পানে কেবল তাকিয়ে থাকে।

দীর্ঘকায় ফটিক, আর শীর্ণদেহ হরেন।

দু-তিন মিনিট তাকিয়ে থেকে হরেন চোখ ফিরিয়ে পিছন ফেরে।

ফটিক ডাকে, "এই— শোন—"

ভদ্রতার অনুরোধেই হরেন তার দিকে ফিরল।

ফটিক আবার একবার দৃষ্টি বুলায় তার পা হতে মাথা পর্যন্ত,—তারপর বললে, "তোমাদের তো আস্পর্ধা কম নয়! চিরদিন পেছিয়ে থেকে আজ হঠাৎ ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খাওয়ার চেষ্টা কেন? বলি—আলাদীনের প্রদীপ-টদীপ কোথাও পেয়েছ নাকি?"

হরেনের মুখখানা কালো হয়ে ওঠে,— মুহূর্ত নীরব থেকে সে বললে, "আস্পর্ধা নয়— যা সত্যিকার প্রাপ্য তাই দখল করবার চেষ্টা হচ্ছে।"

"সত্যিকার প্রাপ্য?"

ফটিক খুব জোরে হেসে ওঠে, সে হাসি হরেনকে যেন চাবুক মারে!

ফটিক বিদ্রূপ করে, "এই যে— ঘুঁটেকুড়ুনির ছেলের নাম পদ্মলোচন! যে হরুর মুখে সাত চড়ে কথা বার হত না, আজকে সে খাসা জবাব করতে শিখেছে! জমিদার-বাড়ির ভাতের গুণ আছে দেখছি— ঘি-দুধও নির্ঘাৎ জোটে জমিদার-বাড়ি, ব্রেনের শার্পনেস দেখে তো তাই মনে হয়!"

হরেন মুখ তুলে তার দিকে তাকাল,—একটি কথাও সে বললে না, আস্তে আস্তে সরে যাওয়ার উদ্যোগ করে সে।

ফটিক ধমক দেয়— "ও হে যাওয়া হচ্ছে কোথায়? দাঁড়াও, আমার কথার উত্তর দিয়ে যাও।"

শান্ত সুরে হরেন বললে, "আমার এখন উত্তর দেওয়ার সময় নেই। আমার মায়ের অসুখ, ওষুধ আনতে যাচ্ছি। ঘি-দুধ খাই কি ফেনেভাত খাই, উত্তর দেব খেলার মাঠে,— আজ নয়।"

হন হন করে সে চলে গেল।

ফটিকের চোখ দুটি ধক ধক করে মুহূর্তের তরে জ্বলে উঠেই অসম্ভব কোমল হয়ে পড়ে।

পরাজয় হল তার, কিন্তু এ পরাজয়ে তার দুঃখ হচ্ছে না। হরেনকে তার ঈর্ষা করতে ইচ্ছা হয়। তার বাড়িতেও আজ কয়দিন মায়ের অসুখ, সে কানে শুনেছে কিন্তু মায়ের কাছে যাওয়ার এক মিনিট ছুটি তার নেই। আর হরেন,— তার মাথায় কত বড় দায়িত্ব, তবু সে নিজের কাজ ঠিকমত করে যাচ্ছে!

নিঃশব্দে হাঁটে ফটিক, তার পিছনে তেমনই নিঃশব্দে পা ফেলে হেঁটে আসে তার দক্ষিণ হস্ত, নকড়ি।

রাতের অন্ধকারে গা লুকিয়ে দুজনে চলে।

আকাশে তেমনি ঘন কালো মেঘ, কিন্তু তার চেয়ে ঘন মেঘ ফটিকের মনে— সে মোটেই শান্তি পাচ্ছে না।

নকড়িই এসে খবর দিয়েছে— তার ডান হাত নকড়ি। নিজে সে তার মর্যাদা নিয়ে যে সব জায়গায় যেতে পারে না, সে সব জায়গায় অক্লেশে যায় নকড়ি এবং সূঁচ হয়ে ঢুকে ফাল হয়ে বার হয়।

নকড়ি জানিয়েছে হরেনের অবস্থা। হরেন নাকি খেলায় নামতে চায়নি, কেবল স্কুলের হেডমাস্টার এবং জমিদার রাখহরি সেনের জিদেই সে নামতে বাধ্য হয়েছে।

অবশ্য, খেলতে সে খুব ভালোই পারে, স্কুলের মাঠে প্রতিপক্ষকে সে তাক লাগিয়ে দেয়, তবু রেষারেষির মধ্যে খেলতে তার মোটেই ইচ্ছা ছিল না।

কিন্তু উপায় তার নেই। জমিদার-বাড়িতে খায় সে, ফ্রিতে পড়ে জমিদারের স্কুলে,— তার মাও জমিদার-বাড়িতে কাজ করেন। জমিদার শাসিয়েছেন— এই খেলায় যদি শিমূলতলা হেরে যায়, সঙ্গে সঙ্গে হরেনের অন্ন উঠল, পড়াও সাঙ্গ হল, অতএব হরেন যেন বুঝেসুঝে চলে!

ফটিকের মুখখানা গম্ভীর হয়ে ওঠে, মন দিয়ে সে হরেনের অবস্থা বুঝবার চেষ্টা করে।

বেচারা— অনেক আশা করে আছে এবার ম্যাট্রিকটা দেবে, ভালোভাবে পাশ করতে পারলে সাহায্যও সে কিছু পেতে পারবে যা দিয়ে তার আই এ পড়ার খরচটা চলে যাবে। আসন্ন পরীক্ষার জন্যই প্রস্তুত হচ্ছিল সে, উপস্থিত সে সব বন্ধ রাখতে হয়েছে।

প্রতিপক্ষ হরেনের অবস্থাটা ফটিক বোঝে।

নকড়ি বলেছিল, "লুকিয়ে একদিন বরং আমার সঙ্গে ওর অবস্থাটা দেখে আসবে চল ফটিক! একবার দেখলে সত্যি তুমি চোখের জল রাখতে পারবে না— এ আমি নির্ঘাৎ বলে দিচ্ছি। এই খেলার ওপর তার ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে, সেইটা বুঝে তুমি কাজ করো।"

নকড়ির মুখে এ কথা—যেন ভূতের মুখে রামনাম! হেন লোক নাই নকড়ি যার সম্বন্ধে কোন কথা বলে না, কিন্তু ব্যতিক্রম ছিল শুধু হরেনের বেলায়।

সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল, রুগ্‌ণ প্রকৃতি, নিতান্ত ভালোমানুষ এই ছেলেটিকে সবাই যেমন স্নেহ করতো, বিশ্ব-নিন্দুক নকড়িও তার চেয়ে কম করেনি। ফটিককে লুকিয়ে সে বই, খাতা সব দিয়ে আসে তাকে যাতে কিছু সাহায্য হয়!

ফটিক চেয়েছিল তার অস্তিত্ব লোপ করতে, আর নকড়ি চেয়েছিল তাকে বাঁচাতে— দুজনের মধ্যে অতখানি বন্ধুত্ব থাকা সত্ত্বেও তফাত ছিল এতখানি।

খড়ের ঘর— বেড়ার দেয়াল। দেয়ালে কোনকালে মাটি দেওয়া হয়েছিল, সে মাটি এখন খসে পড়েছে অনেক জায়গায়, সেইজন্যই রাত্রের অন্ধকারে লুকিয়ে ফটিক ও নকড়ি ভিতরের সব কিছুই দেখতে পায়।

ম্লান প্রদীপের আলোর পড়ছে হরেন— ছিন্ন একখানা মাদুর বিছিয়ে বসেছে সে। ওধারে মেঝেয় ক্ষুদ্র একটি শয্যায় শুয়ে আছেন তার মা—রুগ্‌ণা মা। —

মা বলছেন, "এবার শুয়ে পড় হরু,— রাত অনেক হয়েছে।"

ম্লান হেসে হরেন বললে, "কে জানে— কাল আর পড়তে পাবো কি না মা! আজকের দিন তাই শেষ পড়া করে নিচ্ছি। কাল বিকেলে আমাদের ম্যাচখেলা, এর ওপর আমার

ভাগ্য নির্ভর করছে তা জানো না। হেডমাস্টার আর জমিদার-মশাই হুকুম করেছেন— কাল শিমূলতলার হারানো সম্মান আমায় ফিরাতেই হবে। না পারি যদি— পরশু হতে স্কুলের দরজা আমার কাছে বন্ধ হবে, আর তোমাকেও ওদেব ওখানে কাজ করতে দেবে না।"

মার দুটি চোখ সজল হয়ে ওঠে, শীর্ণ হাতখানা তিনি ছেলের মাথায় রাখেন— ক্ষীণ কণ্ঠে বললেন, "ভগবান আছেন হরু। কথাই আছে -

জীব দিয়েছিন যিনি
আহার দেবেন তিনি।

তোব ভাবনা করবার তো কিছু নেই। ফুটবল খেলায় হেরে গিয়ে যদি তোব পড়া বন্ধ হয়, আমার কাজ যায়— তা যাক, তুই যা শিখেছিস তার জোরেই কোথাও একটা কাজ করতে পারবি, আমিও আর কোথাও কাজ করতে পারব।"

হরেন মাথা নত করে বসে থাকে।

এতদিন অনেক আশার স্বপ্ন দেখেছিল সে! সে ম্যাট্রিক পাশ করে পড়বে আই এ, বি এ, এম-এ পর্যন্ত! যে করেই হোক, মানুষ সে হবে— মানুষ হতে চায় সে, কিন্তু তার কোন আশাই পূর্ণ হল না!

হরেনেব চোখ দিয়ে শুধু টস টস কবে জল পড়তে থাকে।

ম্যাচ আরম্ভ হয়— লোক ভেঙে আসে মাঠে— দুই পক্ষেব লোকই এসেছে। এমন প্রতিদ্বন্দ্বিতার খেলা কখনও হয়নি।

হ্যাঁ, চমৎকার খেলছে ছেলেরা। চকদিঘিব ছেলেবা যেন আগুনের ফুলকি! তীরবৎ ছুটছে, বল মাবছে। ওদিকে শিমূলতলার ছেলেবা কেবল আক্রমণ প্রতিহতই করছে, বল পাওয়ার সুযোগ তাদের হয়নি।

ফটিক নিজে গোল-কিপার— অলৌকিক শক্তি-সাহস নিয়ে সে গোল বাঁচিয়ে চলেছে। আশ্চর্য হয়ে দেখবার মত জিনিসই বটে।

ওদিকে মুখ শুকিয়ে যায় হরেনের! জীবন মরণ পণ করে খেলছে হবেন, আজকের খেলার ওপব তার ভাগ্য নির্ভব কবছে।

"গো—ও—ওল্!"

সঙ্গে সঙ্গে হাজার হাজার হাতে করতালি, চিৎকাব-শব্দ! শিমূলতলার ছেলে-বুড়ো সবাই মহোল্লাসে চিৎকার কবে— "গো ও ল্!"

আশ্চর্য, ফটিক কি অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল? বলটা আটকাতে পারলে না! একেবারে শেষ মুহূর্তে বলটা তাকে ডিঙিয়ে চলে গেল, সে চেষ্টা করলেই ঠেকাতে পারতো!

—"জয় শিমূলতলার জয়!"

মাঠের চিৎকার গ্রামের মধ্যেও শোনা যায়। হরেনের মা এতক্ষণ গলবস্ত্র অবস্থায় ঠাকুরের কাছে পড়ে ছিলেন— তাঁর কানেও এ কথা এসে পৌঁছল হরেন গোল দিয়েছে।

চকদিঘি মাথা তুলতে পারে না, শিমূলতলা ঢাক-ঢোল বাজিয়ে মন্দিবে পূজা দিতে যায়।

এই হারজিতের বার্তা জানে শুধু দুজন। ফটিক নিজে জানে— ইচ্ছা করেই সে পরাজয় স্বীকার করেছে, আটকাবার ইচ্ছা থাকলে সে বল আটক করতে পারত, পারল না হরেনের মলিন মুখের পানে তাকিয়ে, তার ভবিষ্যৎ ভেবে।

আর এ খবর জানে হরেন।

লোকে যতই জয়ধ্বনি করুক, মরমে মরে যায় হরেন! রুক্ষস্বভাব ফটিককে সে চিনেছে। তাই দূর হতেই সে তাকে মনে মনে প্রণাম জানায়।

মানিক পুরকায়স্থের সাক্ষাৎকার

সুপ্রিয় সেনগুপ্ত

না ; আমার মোটেই পছন্দ নয় এখনকার ভারতীয় খেলোয়াড়দের নিয়ে এই মাতামাতি করাটা। পাঁচশ দশটা খেলার পত্রিকা, খবরের কাগজ সর্বত্র যেন প্রতিযোগিতা চলছে ছোট্ট একটা বেলুনকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে বড় করে দেখাবার। অথচ এই বেলুনটা বারবার ছোটখাট আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় গেলেই সশব্দে ফেটে যাচ্ছে। তার রাবারের ছোট্ট টুকরোটা সেই বিস্ফোরণের পব উড়ে গিয়ে রাস্তার কোণায় পড়ে থাকছে। পায়ে মাড়িয়ে চলে যাচ্ছে সবাই।

এখন ফুটবলে দুটো লাথি মারতে শিখলেই সকলে বড় প্লেয়ার হয়ে যাচ্ছে। তারপর তার রঙিন ছবি, জীবনী, সে কী খেতে ভালবাসে, কার গান শোনে, এইসব হাজার রকম ফিরিস্তি দিয়ে বড় বড় লেখা। এই আগরতলাতে বসে আমার ছেলেটাও কলকাতার একটা খেলার সাপ্তাহিকের জন্য হাঁ করে বসে থাকে। এইসব গেলে। বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনা করে। কিন্তু তার মধ্যে গঠনমূলক কোন চিন্তা থাকে না। ভেবে দ্যাখে না, কেন আজ ভারতীয় ফুটবলের এই হাল।

কিছু মনে করবেন না, কী নাম বললেন আপনার? সমীরণ গুহ? পুরনো খেলোয়াড়দের নিয়ে আপনি লেখেন? ভাল কথা। আপনার লেখা আমি পড়িনি। বুঝতেই পারছেন আমি যে পদে রয়েছি তাতে আমার সময়ই জোটে না। হ্যাঁ, এই গোটা এরিয়ার বি এস এফ-এর ভার আমার উপর। জানেনই তো শহরের থেকে আখাউড়া রোড ধরে দুপা গেলেই বাংলাদেশ বর্ডার। নয়নপুর, গঙ্গাসাগর, শালদানদী বলে বাংলাদেশের রেলে ক'টা স্টেশন আছে, তার রেললাইনটা বাংলাদেশে, কিন্তু পুবদিকের জমিটা ভারতে। সোনামুড়া, গোমতী নদী পার হয়ে কয়েকগজ দূরেই বাংলাদেশ। চতুর্দিকে সীমান্ত মাইলের পর মাইল। স্মাগলিং, আরও নানারকমের ক্রাইম, বেআইনী যাতায়াত এসব তো জলভাত। এইসব নিয়ে প্রচণ্ড ব্যস্ত থাকতে হয় আমাকে।

তা আপনি হঠাৎ আগরতলায় এলেন কেন কলকাতা থেকে ওঃ, বীরচন্দ্র ক্লাবের প্লাটিনাম জুবিলিতে? কলকাতার খেলোয়াড়দের সঙ্গে আপনারা কিছু সাংবাদিকও এসেছেন? তা, আমি যে এককালে খেলতাম, এ খবর আপনাকে কে দিল? এস পি প্রমোদ রায়? প্রমোদ তো নিজেও খেলত। ত্রিপুরা একাদশের হয়ে বার দুই তিন আই এফ এ-তে খেলতে গেছে। লেফট হাফে খেলত। খুব যে একটা বুদ্ধিমান খেলোয়াড় ছিল তা নয়। কিন্তু অসম্ভব টাফ ছিল। অফুরন্ত দম। আর যেটা বড় গুণ ছিল, টিমের জন্য মাঠে জীবন দিয়ে দিতে পারত। চোট আঘাতের ভয় পেত না, ঝাঁপিয়ে পড়ত। যে

ব্যাপারটা আপনার একালের বড় ফুটবলাররা কোনমতেই পারবে না। তাদের এখন টাকার চিন্তা। সুস্থ থেকে খেলতে পারলেই লাখ লাখ টাকা। দলের জন্য যে কোন ঝুঁকি নেবে এই ব্যাপারটা প্রায় উঠে গেছে সমীরণবাবু। এখন দৃষ্টিভঙ্গিটাই অন্যরকম।

যাকগে ওসব কথা। আমার কথা শুনতে চাইছেন, তাই বলি। কিন্তু বলার মত তেমন কিছুই নেই। কলকাতায় গিয়েছিলাম ১৯৫০ সালে। একবছর এরিয়ান্সে খেলে ইস্টবেঙ্গলে গিয়েছিলাম। সেন্টার হাফ খেলতাম। কিন্তু তখন সেন্টার হাফ খেলে চন্দন সিং। একদিকে এস রায়, অন্যহাফে গোকুল। চান্স পাওয়াই প্রায় অসম্ভব ছিল। তবে নিয়মিত খেলার সুযোগ পেলে হয়ত খুব খারাপ খেলতাম না। তখনও পলিটিক্স ছিল। আমাদেরই শহরেরই নাম করা প্রখ্যাত খেলোয়াড়— নাম বলব না— তিনি চাইতেন না আমি খেলি।

তারপর ১৯৫৩ সালে মিলিটারিতে চলে গেলাম। সার্ভিসেসের হয়ে বছর দুই খেলেছি। তারপর চাকরি আর চাকরি। খেলাধুলো ছেড়ে দিলাম। ব্যস। আর তো কিছুই বলার নেই।

কী বললেন ? খেলোয়াড় জীবনে মধুর মুহূর্ত কিছু এসেছিল কিনা ? আপনি তো মশাই আচ্ছা নাছোড়বান্দা লোক! মধুর মুহূর্ত! তেমন কিছু! হ্যাঁ, মধুর মুহূর্ত একটা এসেছে, কিন্তু তা তো দিনকয়েক আগে। যদিও খেলার সঙ্গে তার একটা সম্পর্ক আছে বটে। সেটাই বলব ?

তাহলে আপনাকে ফিরে যেতে হবে ১৯৪৮/৪৯ সালে। এই আগরতলা থেকে মাত্র মাইল চল্লিশ দক্ষিণে পুব বাংলার ছোট্ট একটা শহরে আমার জন্ম। ওই শহরটা নিয়ে আমাদের খুব গর্ব ছিল। গান বাজনায়, খেলাধূলা, সাহিত্য সব বিষয়ে অনেক বিখ্যাত লোকেরা ঐ শহরেই বড় হয়েছেন। আলাউদ্দীন খাঁ সাহেব, শচীনদেব বর্মণ, হিমাংশু দত্ত সুরসাগর, অজয় ভট্টাচার্য তারপর সূর্য চক্রবর্তী, প্রমোদ দাশগুপ্ত, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, সঞ্জয় ভট্টাচার্য, অদ্বৈত মল্লবর্মণ ওঁরা সব ওই শহরেরই ছেলে। নজরুল অনেকদিন ওখানে ছিলেন, বিয়ে করেছেন ঐ শহরের মেয়েকে। খেলাধূলা, গানবাজনা, নাটক, সাহিত্য এসব নিয়ে শহরটা মেতে থাকত। বিপ্লবী আন্দোলনেও শহরটা ছিল অগ্রগামী। শান্তি সুনীতি ঐ শহরেই ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেটকে গুলি করে মেরেছিলেন। ওখানেই প্রথম পৃথিবীকে দেখেছি মুগ্ধ বিস্ময়ে, বড় ভালবাসতাম সেই শহরটাকে।

আর একটা বড় ব্যাপার ছিল। ওই শহরে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে ছিল অকৃত্রিম সদ্ভাব। স্বাধীনতার আগের সেই মারাত্মক দাঙ্গা-হাঙ্গামার সময়েও আমাদের শহরে একটাও অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি। আমার অসংখ্য প্রিয় বন্ধু ছিল, তাদের অনেকেই মুসলমান। ঘনিষ্ঠতম বন্ধু ছিল মমতাজ, মমতাজউদ্দীন সেও ছিল আমার মায়ের ছেলে, আমিও তার মার। হায় রে, কোথায় যে হারাল সে, হারিয়ে গেল সেই সব দিনগুলোর সঙ্গে।

সেই শহরে অন্যান্য স্কুলের মধ্যে বিখ্যাত ছিল দুটি। ঈশ্বর পাঠশালা আর জেলা স্কুল। নামে ঈশ্বর পাঠশালা হলেও বিরাট এরিয়া, খেলার মাঠ, নাটমন্দির, জিমনাসিয়াম, সাঁতার কাটার পুকুর, এমন কি ডাইভিং বোর্ড নিয়ে বিরাট হাইস্কুল ছিল ঈশ্বর পাঠশালা। জেলা স্কুলও খুব সুন্দর, পাশেই বিরাট দীর্ঘ, ধর্মসাগর। নিজেদের খেলার মাঠ। আর এক দিকে মিলিটারি মাঠ বলে পরিচিত শহরের ক্রীড়াচর্চার কেন্দ্রস্থল। এখন সেখানে স্টেডিয়াম হয়েছে। ফুটবল, হকি, ক্রিকেট বছরভর সব রকম খেলা চলত সে মাঠে।

ক্রিকেট টুর্নামেন্টের সময় পিচ করা হত না, খেলা হত ম্যাটিং উইকেটে। পূর্ব বাংলার সর্বত্র সেইটেই রেওয়াজ ছিল।

এই দুই স্কুলের মধ্যে খেলাধুলো নিয়ে যে রেষারেষি ছিল তাকে ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগানের সঙ্গে তুলনা করা যায়। ওদের মধ্যে খেলা পড়লেই গোটা শহরের লোক দুই শিবিরে ভাগ হয়ে যেত। জল্পনা-কল্পনা শুরু হয়ে যেত অনেক আগে থেকে।

আমি বলছি ১৯৪৯ সালের কথা। দেশ ভাগ হয়েছে বটে, তবু ঐ শহরের অধিকাংশ পরিবারই ভিটেমাটি ত্যাগ করে এদেশে চলে আসেনি। শহরে কোন অশান্তি নেই। আমরা সমান তালে হিন্দু-মুসলমানরা টাউনহলের সামনে বাদামগাছ তলায় আড্ডা দিই।

আমি পড়তাম ঈশ্বর পাঠশালায়। তখন ফুটবল, হকি, ক্রিকেট তিনটে টিমেরই আমি ক্যাপ্টেন। হ্যাঁ, ভালই খেলতাম। শহরের বড়দের টিম, যেমন ইয়ংম্যানস বা ইউনিয়ন ক্লাব থেকে খেলার জন্য ডাক আসত। কিন্তু আমাদের খেলার মাস্টারমশাই, প্রমোদেশ্বরবাবু দারুণ কড়া লোক ছিলেন। স্কুল ছাড়া অন্য কোথাও খেলতে দিতেন না।

কী বললেন ? ফ্যান ছিল কিনা ? তখন আর আমাদের কত বয়েস ! পনের ষোল ! তবে স্কুলের ছাত্ররা, বিশেষ করে নিচু ক্লাসের ছেলেবা খেলার দিন পেছন পেছন ঘুরত। মাস্টারমশায়রা একটু অতিরিক্ত স্নেহ করতেন। প্রায় সবাই, এমনকি হেডমাস্টারমশায়ের মত রাশভারী মানুষটিও বিশেষ বিশেষ খেলার দিনে মাঠে যেতেন। অন্যান্য বড়দের ক্লাবেব বড় খেলোয়াড়বা পাত্তা দিতেন, প্রশ্রয় দিতেন। শহরের সব লোকেরাই চিনতেন। স্নেহের দৃষ্টিতে তাকাতেন, ডেকে দুচার কথা বলতেন। ভালই লাগত, একটু গর্বও কি আর হত না !

আর জেলাস্কুলে আমার মত একই ক্লাসে পড়ত শাহ আলম। দুর্ধর্ষ খেলত। হ্যাঁ, তিনটে খেলাই। আমাদের সময়ে এখনকার মত বিজ্ঞানভিত্তিক ব্যাপাব-স্যাপার তো ছিল না। খেলার আনন্দেই আমরা সব খেলতাম। যে কোন একটা খেলাই যে ধবতে হয় এসব কথা আমাদের কেউ বলেওনি, ওসব আমরা জানতামও না। এখনকার মত ফিজিক্যাল ট্রেনিং, মেডিসিন বল ওসব কোথায় ? কোচিং টোচিং কিছুই ছিল না। প্রমোদেশ্বরবাবু প্র্যাকটিসের সময় হুইসিল নিয়ে মাঠে থাকতেন। বড়জোর বলতেন, পাস না করে নিজে এগিয়ে গোলে শট নিলে পারতিস। এইরকম আর কী। ভগবান যাকে যতটুকু ক্ষমতা দিয়েছেন তাই ভাঙিয়ে খেলা। তবে বড়দের খেলা দেখে শেখার চেষ্টা করতাম তো বটেই। খেলাটাকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসতাম। চেষ্টা করতাম কী করে আরও ভাল খেলা যায়, ঐ পর্যন্তই।

বলছিলাম শাহ আলমের কথা। ফুটবলে সেন্টার ফরোয়ার্ড খেলত। আহা, কী খেলত ! যেমন ফুটবল সেন্স, পায়ের কাজ,.হেডিং, তেমন ছিল স্পীড আর ড্যাশ। আমি খেলতাম সেন্টার হাফ, সে তো আগেই বলেছি। তখনকার খেলার ধরনে সেন্টার হাফের কাজ ছিল ফরোয়ার্ডকে আটকানো আর উঠে গিয়ে নিজের ইন বা আউটকে বল যোগানো। কিন্তু শাহ আলমকে আটকাতে আমার সর্বশক্তি প্রয়োগ করতে হত। ও ছিল ঠিক পাঁকাল মাছের মত। বাঁ পায়ের একটা আউটসাইড ডজ ছিল, আহা এরকম আর দেখিনি। অপূর্ব ! অব্যর্থ ছিল ওর নিশানা। ক্রিকেটটাও খুব ভাল খেলত। ব্যাট করত দুর্দান্ত, আর স্পিন বল শিখেছিল ওর চাচা ইব্রাহিম মিঞার কাছে। সাপের মত লেগস্পিন, অফস্পিন দুরকমের বল করত। হকিতেও ঐরকম।

জেলা স্কুলের সঙ্গে আমাদের যখন খেলা পড়ত, তখন লড়াইটা মূলত ছিল আমাদের দুজনের মধ্যেই। তখন তো মাইকের তেমন প্রচলন ছিল না। শহরে ছিল সনাতন ঢুলি, সে ঢোলে কাঠি দিয়ে বজ্রকণ্ঠে শহরের সব রাস্তায় বিশেষ কোন অনুষ্ঠান হলে প্রচার করে বেড়াত। দক্ষিণা নিত তার জন্য। আমাদের খেলা থাকলে সে বলত, বাঘে-মহিষে লড়াই, জেলা স্কুল আর ঈশ্বর পাঠশালা— শাহ্ আলম আর মানিক। বাঘ আর সিংহ। খেলার দিন মাঠ লোকে লোকারণ্য হয়ে যেত।

শাহ্ আলমের সঙ্গে মাঠের বাইরে আমার কীরকম সম্পর্ক ছিল ? ওটা একটু অদ্ভুত। দেখা হলেও খুব একটা কথা হত না। বরং একজন আর একজনকে একটু এড়িয়েই যেতাম বলা চলে ! নিতান্ত ভদ্রতারক্ষার জন্যে দুচারটে শব্দ বিনিময় হত। খেলার কথা বলতাম না কেউই। মাঝখানে একটা চ্যালেঞ্জের ব্যাপার খুব তীব্র ছিল বলেই কথায় সেটা প্রকাশ করতাম না। মাঠে উল্টো দিকে নামলেই রক্তগরম হয়ে যেত। সেটা কিন্তু ওকে আঘাত করার জন্যে নয়, ওর চেয়েও ভাল খেলার জন্য।

তবে ও কী দরের খেলোয়াড় সেটা আমি জানতাম, ওর জাতটাই ছিল আলাদা। অনেক সময় আমাকে খুশি করার জন্য আমাদের স্কুলের কেউ হয়ত আমার সামনেই ওর সঙ্গে আমার তুলনা করত। তুলনায় আমাকে বড় করার চেষ্টা করত। এইসব আলোচনা আমি ধমকে থামিয়ে দিতাম। শুনেছি শাহ্ আলমও তার ছেলেদের কাছে বলত, মানিকের মত একটা ছেলে যদি আমার পাশে থাকত, তবে পৃথিবীর কোন স্কুল টিমকে আমি ভয় পেতাম না।

সেটা ১৯৪৯ সাল, আমাদের ম্যাট্রিক পরীক্ষার বছর। ডিস্ট্রিক্ট চ্যাম্পিয়নশিপে আমরা দুটো স্কুলই ফাইনালে উঠেছি। মিলিটারি মাঠে খেলা। আমার লেফট হাফ সুকমার হঠাৎ খেলার আগের দিন জ্বরে পড়ল। জেলা স্কুলের রাইট-ইন ছিল সিরাজ, সেও খুব ভাল খেলোয়াড়। খুব বিপদে পড়লাম। প্রমোদেশ্বরবাবু বললেন ফণীকে খেলাতে। অসম্ভব স্লো আর বুদ্ধি কম। কিন্তু উপায় ছিল না। কানা টিম নিয়েই মাঠে নামলাম।

খেলার বিবরণটা সংক্ষেপে দিই। শাহ্ আলম প্রথম থেকেই জ্বলে উঠল। সাধারণত তখনকার দিনের সেন্টার ফরোয়ার্ডরা যেভাবে খেলত, বিপক্ষ গোল এরিয়ায় ঘুর ঘুর করা, ছোঁক ছোঁক করা, বল পেলে কিছুটা কৌশলে, কিছুটা গায়ের জোরে পেনাল্টি বক্সে ঢুকে শট নেওয়া, সেই চেষ্টাই ও করছিল। কিন্তু আমার শরীরেও সেদিন কিছু একটা ভর করেছিল। আমি ওর গায়ের সঙ্গে লেপ্টে ছিলাম। সহজে ওকে বলের অধিকার পেতে দিচ্ছিলাম না। ফলে ও আমার সঙ্গে ট্যাকলে না গিয়ে বল পেলেই পাস করে দিতে চাইছিল। আবার আমি যখন একটু উপরে উঠে ইন বা আউটকে বল দেব তখনি সেও আমায় চার্জ করছিল। খেলা চলছিল মোটামুটি সমানে সমানে। এরকম সময়ে জেলা স্কুল কর্নার পেল।

আজ পর্যন্ত যত বড় খেলোয়াড়কে হেড করতে দেখেছি তাদের সঙ্গে এক আসনে শাহ্ আলমকে বসাতে আমার কোন দ্বিধা নেই। বস্তুত জেলা স্কুলের প্রতিটি কর্নার কিক মানেই এক একটা গোলের দারুণ সম্ভাবনা। কিক নিত সচরাচর রমু, একদম মাপা শাহ্ আলমের মাথার কাছে ফেলত। আমি শাহ্ আলমের গা ঘেঁষে দাঁড়ালাম। শাহ্ আলম আমার চেয়ে একটু লম্বাই ছিল, স্পট জাম্পটাও আমার চেয়ে ভাল দেয়। বেশি উঁচু বল এলে ওর হেড নেওয়া আটকানো আমার সাধ্যের বাইরে এটা আমি জানতাম।

এবং ঠিক তাই হল। বলটার যা হাইট আন্দাজ করলাম তাতে শাহ্ আলম ঠিক মাথা

লাগাবে, আমি পাব না। ফলে একটু দুষ্টুমি করলাম। ও লাফাবার আগের মুহূর্তে ওর গায়ের সঙ্গে মিশে গিয়ে খুব নিরীহ মুখে ওর হাফপ্যান্টের ধারের দিকটা চেপে ধরে রাখলাম। ও লাফাতে পারল না। রেফারি কিছুই দ্যাখেনি। শাহ্ আলম হাসল। ঐ হাসির অর্থ কিন্তু মারাত্মক। বলল, 'ভাল করলি না মানিক।'

হাফ টাইম।

তারপরেই ও আরও ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল। নিচে নেমে প্রায় ওদের হাফব্যাকের সীমানা থেকে বল ধরে সারা মাঠে খেলতে লাগল। বারবার আক্রমণ গড়ে তুলছে, একের পর এক মুভ হচ্ছে। এবার রাইট ইনে সিরাজকে বেশি করে বল দিতে লাগল। ফণীর সাধ্য কি তাকে আটকায়! যে কোন মুহূর্তে ও গোল দিতে পারে। বাধ্য হয়ে আমাকে সরে যেতে হল সিরাজের দিকে। শাহ্ আলম এইটেই চাইছিল। হঠাৎ বিদ্যুৎ গতিতে একটা বল ধরে দুজনকে কাটিয়ে নিখুঁত একটি প্লেসিং করে বল জালে জড়িয়ে দিল।

খেলা শেষ হবার আগে সিরাজকে দিয়ে আর একটা গোল দেওয়াল শাহ্ আলম। শেষ পাঁচ মিনিট আমিও মরীয়া হয়ে খেললাম। সেন্টার থেকে বল ধরে নিয়ে প্রায় পাঁচজনকে পেছনে ফেলে গোলার মত শটে একটা গোল শোধ দিলাম। তারপর ওদের গোল সীমানাতেই আমরা প্রায় দশজন। কিন্তু সময় শেষ হয়ে গেল। উন্মত্ত সমর্থকরা শাহ্ আলমকে মাথায় তুলে নেবার আগে ও আমার হাতে হাত মিলিয়ে গেল। বলে গেল, 'ব্যাডলাক ক্যাপ্টেন।'

আমাদের সমর্থকরা মুখ কালো করে মাঠ ছাড়ছিল। প্রমোদেশ্বরবাবু বল্লেন, 'ক্রিকেটে এর শোধ তুলতে হবে মানিক।' ক্লান্ত শরীরে আমরা মাঠের মাঝখানেই বসে ছিলাম পরাজয়ের গ্লানি গায়ে মেখে। অনেকে ব্যক্তিগতভাবে আমার প্রশংসা করে যাচ্ছিলেন। কিন্তু সমীরণবাবু, এ ডিফিট ইজ এ ডিফিট। শেষ মুহূর্তে আমাদের সেন্টার ফরোয়ার্ড তিমিরকে যে বলটা বানিয়ে দিয়েছিলাম তাতে একটা কানাও গোল করতে পারে। সব বিস্বাদ লাগছিল।

মাস কয়েক বাদেই স্কুলে টেস্ট পরীক্ষা হল। তারপরেই ক্রিকেট ফাইনাল। ফুটবলে হেরেছি, হকিতে জিতেছি— এবার চূড়ান্ত প্রতিযোগিতা। সম্মান কাদের দিকে থাকে। স্বয়ং হেডমাস্টারমশাই একদিন মাঠে এলেন প্র্যাকটিসের সময়। বললেন, "স্কুল ছেড়ে যাচ্ছ, যাবার আগে স্কুলকে একটা উপহার দিয়ে যাও।"

আগেই আপনাকে বলেছি সমীরণবাবু, আমাদের শহরে তখনকার দিনে পিচ তৈরি হত না। মাঠের মাঝখানে খানিকটা জায়গা বেছে ম্যাট পাতা হত। এমনিতে প্র্যাকটিসের সময় আমরা সাধারণ ভাবে মাঠের কোণায় উইকেট পুঁতেই কাজ চালিয়ে নিতাম। তার ফলে হঠাৎ ম্যাটে খেলতে গিয়ে আমাদের একটু অসুবিধে হতই। ম্যাট তো আর সব সময় খুব টাইট করে লাগানো হত না। তাছাড়া নিচের মাটিও যে খুব মসৃণ থাকত তাও নয়। ফলে কোন বল কীভাবে আসবে তা ঠাহর করা একটা অসম্ভব ব্যাপার ছিল। প্রায় আন্দাজে ব্যাট চালানো হত বললেই হয়। কাজেই যে টিমটা ভাল সেই জিতবে এমন ভবিষ্যদ্বাণী করা যেত না।

তবু, আমাদের দুই স্কুলই যে ফাইনালে উঠবে এটা মোটামুটি বলা যেত এবং তাই ঘটল। ডিসেম্বরের সুন্দর একটি রৌদ্রস্নাত সকালে খেলা শুরু হল। এক ইনিংসের খেলা।

সমীরণবাবু, আপনি যদি আমাদের শহরের ঐ মাঠটায় সেদিন থাকতেন তবে অবশ্যই

আপনি এখনকার ওয়ান ডে ম্যাচের উত্তেজনাটা উপভোগ করতেন। মাঠ ভর্তি দর্শক, প্রচণ্ড টেনশন। মাঠটাও ছিল ভারি সুন্দর। চারদিকে বিরাট বিরাট সব মহীরুহ। তার ছায়ায় বসে দর্শকেরা খেলা দেখছেন।

টসে আমি জিতলাম এবং ফিল্ডিং নিলাম। সংক্ষেপে বলি, আমাদের আর একটি ভাল পেস বোলার ছিল। তার নাম সোমেশ রুদ্র। খুব ভাল বল করছিল সে। জেলা স্কুল প্রথম দিকে অল্প রানে তিনটি উইকেট হারাল। তারপর যথারীতি শাহ্ আলম আর বাচ্চু জুটি বাঁধল। রান এল আশির কাছাকাছি।

আমি বল নিলাম। প্রথম ওভারে কিছু হল না, মেডেন। উল্টো দিকে বল করছিল অমল। স্পিন টিন নেই, একটু জোরের উপরে ডায়াগোনাল বল, তবে লেংথটা ঠিক রাখত। তখন আর আমার হাতে বোলারও নেই। বেধড়ক মার খেল অমল। প্রায় ১০০ রানের কাছাকাছি পৌঁছে গেল ওরা।

দ্বিতীয় ওভারে আমি সফল হলাম। বাচ্চু আউট হল, আরও একটা উইকেট পড়ল সেই ওভারেই।

অমলকে সরিয়ে দিলাম। আবার আনলাম সোমেশকে। ওদের ১০০ রান হল শাহ্ আলমের একটি অনবদ্য কভার ড্রাইভে। ওভারের শেষ বলে এক রান নিয়ে শাহ্ আলম এইদিকে চলে এল।

সমস্ত মন প্রাণ দিয়ে বলটা হাতে তুলে নিলাম। ওকে না সরালে চলবে না। দুটো লেগ স্পিন দিলাম, শাহ্ আলম ফরোয়ার্ড খেলল। আমাকেও গুগলি শিখিয়ে ছিলেন ইব্রাহিত মিঞা। তৃতীয়টা দারুণ একটি মোক্ষম গুগলি। ভুল করল শাহ্ আলম। যখন বুঝল তখন আর ব্যাট সরাবার সময় নেই। মিড অফে ক্যাচ, ফিল্ডার, যতদূর মনে পড়ে ছিল অংশুমান। কোন রকম ভুলচুক না করে লুফে নিল। ৪৭ রানে আউট হল শাহ্ আলম।

তারপর শোভাযাত্রা। স্পিনের দেবতা ভর করল আমার উপর। ১২৭ রানে ওদের ইনিংস ফুরিয়ে দিয়ে আমরা লাঞ্চ খেতে গেলাম। কত রান মনে নেই তবে ৬টা উইকেট পেয়েছিলাম। মনে হল খেলাটা জিতে যাওয়া উচিত।

আরম্ভটাও ভালই হল। প্রথম উইকেট পড়ল তিরিশের কাছাকাছি। আমি ওয়ান ডাউন নামতাম, তাই নামলাম। সম্পূর্ণ আস্থা নিয়ে সহজভাবে খেলে রান নিয়ে গেলাম ষাটের কাছাকাছি। এবার হঠাৎ সংহার মূর্তি ধরল শাহ্ আলম। এক কথায় আনপ্লেয়েব্‌ল হয়ে দাঁড়াল সে। ছুঁচোবাজির মত মোচড় নিতে লাগল তার বল। রান করব কি, ফরোয়ার্ড ডিফেন্সিভ খেলে বল পিচ পড়ার সঙ্গে সঙ্গে কোন রকমে ঠেকিয়ে যেতে লাগলাম। উল্টো দিকে পরপর উইকেট পড়তে লাগল। পলক ফেলতে না ফেলতে রান দাঁড়াল আট উইকেটে একাশি। ব্যাট হাতে এল সোমেশ। কানে কানে বললাম, 'ওভারের শেষ বলে চোখ কান বুজে দৌড় লাগাবি।'

পুরো দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে মাথা একদম ঠাণ্ডা রেখে খেলতে লাগলাম। ওদের মসিউদ্দীন বল করছিল। এক ওভারে তিনটে বাউন্ডারি আর একটা দুই রান নিলাম। রান দাঁড়াল ৯৫। ওভারের শেষ বল। মসিউদ্দীন বল কবার আগেই তিন পা এগিয়ে গেলাম, আস্তে বলটাকে মিড অফে রেখে রান নিতে নিতে সোমেশ উল্টোদিকেব উইকেটে পৌঁছে গেছে। আমাদের সমর্থকরা নিশ্চিত হারের আশঙ্কায় এতক্ষণ নিঃশব্দ ছিল।

এমনকি যখন বাউন্ডারি মারি তখনো তারা ততটা সরব হয়নি। এবার মাঠের মাঝখান থেকেই দেখলাম তাদের মধ্যে যেন একটু জীবনের লক্ষণ ফিরে আসছে।

এই ওভারেই সেই ঘটনাটি ঘটল। প্রথম বলটা লোপ্পাই ছিল, চার রান নিলাম। নিখুঁত একটি স্ট্রেট ড্রাইভ, কারও কিছু করার ছিল না। পরের বলে দুই রান নিলাম কভারে ঠেলে। একশ হয়ে গেল মাঠে করতালি, আমার নামে চিৎকার করছে নিচু ক্লাসের ছেলেরা। শাহ আলমের তৃতীয় বলটা খেলতে গিয়ে দেখলাম যতটা মোচড় নেবে ভেবেছিলাম, তার চেয়ে বেশি ঘুরেছে। কানায় লেগে স্লিপ দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল, মাটিতে ঝাঁপিয়ে বলটা তুলে নিল সিরাজ, প্রচণ্ড চিৎকার হাউজ দ্যাট। 'আম্পায়ার গণেশদা আঙুল তুললেন। আমি তো আর পেছনের ক্যাচটা দেখতে পাইনি, ক্লান্ত পদক্ষেপে আমি ক্রিজ ছাড়লাম।

হঠাৎ সামনে এসে পথ আটকাল শাহ্ আলম। বললে, "দাঁড়া মানিক যাসনে।" গিয়ে সিরাজের সঙ্গে কী কথা বলে গণেশদার কাছে গেল। গণেশদা স্কোয়ার লেগ আম্পায়ারকে ডাকলেন। মাঠে নিঃশ্বাস ফেললে তার শব্দ শোনা যাবে এমন স্তব্ধতা। আমি চুপচাপ মাঠে দাঁড়িয়ে রয়েছি। সোমেশ এসে বললে, "ক্যাচটা আমি দেখেছি ; মনে হল মাটি থেকে তুলেছে সিরাজ।" গণেশদা ডাকলেন, বললেন, "ওদের ক্যাপ্টেন শাহ আলম বলছে ক্যাচটা মাটিতে পিচ পড়ার পর সিরাজ তুলেছে। আমার কিন্তু মনে হল ' যাকগে তুই আউট হোসনি। ব্যাট কর।"

তারপরের আর কী। ভাগ্যদেবী চাইছিলেন আমরা জিতি। সোমেশকে শাহ্ আলমের দুটি বল খেলতে হয়েছিল। ও আউট হয়ে গেল। লাস্ট উইকেটকে সঙ্গে নিয়ে তুমুল উত্তেজনার মধ্যে আমরাই জিতে গেলাম। আমার রান হল বোধহয় উনসত্তর।

তারপর তো ইন্ডিয়ায় চলে এলাম। সে সব কথা আগেই বলেছি। কলকাতায় বছর তিনেক ছিলাম। তারপর চাকরির খাতিরে বহুদিন শ্রীনগর কিছুকাল মীরাট, বছর কয়েক অমৃতসরে কাটিয়ে অবশেষে গত বছর এলাম আগরতলায়। আগরতলা আমার চেনা শহর। আমাদের পুব বাংলার সেই জন্মভূমির থেকে খুবই কাছে এতো আপনাকে আগেই বলেছি।

প্রথম প্রথম খুব ইচ্ছে করত একবার আমাদের সেই শহরে ঘুরে আসি। আবার সেইসব বন্ধুদের সঙ্গে একবার দেখা হয়। সেই সুযোগটাও জুটে গেল দিন কতক আগে।

আপনি জানেন তো সোনামুড়া বলে একটা জায়গা আছে মাইল চল্লিশেক দূরে, যেটা বাংলাদেশের বর্ডার। দিন কয়েক আগে বাংলাদেশের কিছু লোক বিনা পাসপোর্টে এদিকে এসেছিল, বি এস এফ থেকে তাদের ধরে ফেলা হয়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশ রাইফেলস থেকে হঠাৎ গুলি ছোঁড়া শুরু হয়, আমার জওয়ানরাও তার জবাব দেয়। কেউ হতাহত হয়নি। কিন্তু দুদিন ধরে বিক্ষিপ্ত ভাবে গোলাগুলি বিনিময় হয়। শেষটা উভয়পক্ষই রাজি হলাম ফ্ল্যাগ মিটিংয়ে। ওদের কমান্ডান্টের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎকার। সাক্ষাৎকার হবে আমাদের সেই ছোটবেলার শহরে।

নির্দিষ্ট দিনে আমাদের মেজর রাওয়াতকে নিয়ে আমি জিপে করে গেলাম সেই শহরে। রাওয়াত কট্টর জাতীয়তাবাদী, এমনকি একটু বেশিমাত্রায়ই সাম্প্রদায়িক বলা চলে। সে আমাকে পরিষ্কার বলে দিল ওই বাংলাদেশীরা স্মাগলার এবং সুযোগ পেলেই ছোটখাট ডাকাতিও করে। ওদের কোন মতেই ছাড়া যেতে পারে না।

আমি দুচোখে পথের দৃশ্য দেখছিলাম। আর নস্টালজিয়ায় ভোরের বাতাসে আমার

শরীর স্নিগ্ধ হয়ে আসছিল। গোমতী নদী পেরিয়ে, বাঁধের উপর দিয়ে, আমাদের দেশে বলে গাংগাইল, গাড়ি চলছিল। জগন্নাথ বাড়ি পেরিয়ে চকবাজারের পাশ দিয়ে, মোগলটুলি ছাড়িয়ে যাচ্ছিলাম আর আমার বয়েসটা কমে যাচ্ছিল আটত্রিশ বছর। শহরের কেন্দ্রস্থলে পৌঁছলাম। ঢুকলাম বাংলাদেশ রাইফেলস-এর অফিসে।

ওদের কমান্ডান্ট এলেন। পুরোপুরি সামরিক পোশাক পরা পুরোদস্তুর মিলিটারী। ও পক্ষের সবাই উত্তেজিত। নিরীহ কিছু গ্রামবাসীকে আমরা অকারণে আটকে রেখেছি। ওদের ছেড়ে দিতেই হবে। মেজর রাওয়াতও ততোধিক উত্তেজিত। ছাড়া হবে না, নেভার। দে আর স্মাগলারস অ্যান্ড ডেকয়েটস। আমি হাত তুললাম।

ওদের কমান্ডান্টের দিকে তাকিয়ে বললাম, ইংরেজীতেই বললাম, "কাল সকাল ন'টায় বর্ডারে লোক পাঠাবেন। আমার লোক ওদের নিয়ে আসবে, আপনারা এসকর্ট করে নিয়ে যাবেন।" প্রচণ্ড বিস্ময়ে রাওয়াত বলে উঠল, "বাট স্যর !" আমি হাতের ইঙ্গিতে তাকে থামালাম। বললাম, "কমান্ডান্টের সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে, আপনারা একটু বাইরে যান।"

স্তম্ভিত হয়ে সবাই চুপচাপ বেরিয়ে গেল। আমি বাংলাদেশের কমান্ডান্টের দিকে তাকিয়ে হাসলাম। বললাম, "রাওয়াত ক্যাচটা মাটিতে পড়ার পর তুলেছে, ওরা আউট নয়। রাওয়াত উত্তর প্রদেশের লোক, কোত্থেকে ওদের চিনবে, বুঝবে ? আমি ওদের সঙ্গে দেখা করেছি। সব সাধারণ গ্রামবাসী, লুকিয়ে সোনামুড়ায় সিনেমা দেখতে গিয়েছিল।"

দুজনে উঠে দাঁড়ালাম। টুপি খুললাম, তারপর পরস্পরকে জড়িয়ে ধরলাম। বললাম, "শাহ্ আলম, আর তোর কাছে আমার কোন ঋণ রইল না কিন্তু।"

বুঝলেন সমীরণবাবু, এই হল আমার মধুর মুহূর্তের ইতিহাস। খেলাধূলার মধ্য দিয়ে আমাদের সময়ে আমরা এটাই শিখেছিলাম। যার যা প্রাপ্য তা তাকে সঠিক ভাবে দিয়ে দাও। যেমন করে হক জিততে হবে এইটেই শেষ কথা নয়, এটা কোন কথাই নয়। এবং নয় বলেই একটি মধুর মুহূর্ত খুঁজে পেলাম যার বীজ আটত্রিশ বছর আগে পোঁতা হয়েছিল।

নাগিনী

নবেন্দু ঘোষ

ঠিক শেষরাতে, যখন রাতের অন্ধকারে আগামী দিনের আলোকিত প্রভাত এসে আক্রমণ করে, যখন জ্বলজ্বলে শুকতারাটা পশ্চিমাকাশের গায়ে পাণ্ডুর হয়ে মিলিয়ে যায়, ঠিক সেই সময়টাতেই ইন্দ্রকান্ত গিয়ে মহানন্দার জল ঘেঁষে দাঁড়িয়েছিল। একেবারে নদীর গায়েই ঘনশ্যাম দাসের কাঠের কারখানা। টেবিল, চেয়ার, খাট, পালঙ্ক থেকে শুরু করে একেবারে নৌকো পর্যন্ত তার ওখানে তৈরি হয়। বৈশাখ মাস থেকে নৌকোর কাজটাই বড় হয়ে ওঠে, কারণ তার চাহিদা তখন থেকেই আরম্ভ হয়। প্রায় পাঁচ-ছয় মাস আর ফুরসত থাকে না স্থূলকায় ঘনশ্যাম দাসের। আর একসঙ্গে যে জনদশেক ছুতোর মিস্ত্রী তার ওখানে খাটে তাদের মধ্যে শিল্পী শ্রেষ্ঠের আসন পেয়েছে ইন্দ্রকান্ত। একশ থেকে হাজার মনি মহাজনী নৌকো, জেলে ডিঙি, খেয়াপারের নৌকো, বজরা, ছিপ— কোনোটাই অজানা নয় ইন্দ্রের। তাই ঘনশ্যাম তার খদ্দেরদের নির্ভয়েই বলে যে তার ওস্তাদ কারিগরের নৌকোয় চড়ে ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ মহাসমুদ্রে পড়লেও ডুববার ভয় নেই।

ঠিক এমনি সময়ে ইন্দ্রকান্ত রোজ জাগে। তার যে বয়স তাতে তা অস্বাভাবিকই বটে তবু সে জাগে। পৃথিবীতে অনেক দিন ধরেই সে বেওয়াবিশ। মা-বাপের কথা তেমন মনে পড়ে না, যে মামার কাছে বড় হয়েছিল তিনিও গতায়ু। জগন্নাথপুর বলে ছোট্ট যে গ্রামটাতে তার পৈত্রিক ভিটেটা ছিল সেটা অনেক দিন ধরেই জঙ্গলাকীর্ণ পরিত্যক্ত। তাই ঘনশ্যাম দাসের কারখানাতেই সে থাকে। এখানে থাকার পর থেকেই এই অতি ভোরে জাগার অভ্যেসটা তার জন্মেছে।

কারখানার পেছনে, জলের ধারে, একটা কাঠের গুঁড়ির ওপর বসে ইন্দ্রকান্ত বিড়ি টানছিল। ঘনশ্যাম দাসের কারখানার জন্য বহু গুঁড়ি এসে জমা হয়েছে সেখানটায়। সেখানে বসে জলের দিকে তাকিয়ে সে বসেছিল। খুব ভালো লাগে তার এমনিভাবে বসে থাকা। অতি ক্ষীণ ধোঁয়ার মতো পাতলা কুয়াশা রয়েছে নদীর জলের ওপর। আষাঢ়ে নদী, জল খানিকটা বেড়েছে কয়েক দিন আগেকার বৃষ্টিতে। হাওয়ায় তরঙ্গ উঠেছে নদীর জলে, পেছনকার আম, জাম, আর দেবদারু গাছের পাতায় মর্মরধ্বনি উঠেছে, ঘন দুর্বা আর জংলী ঘাসে ভর্তি তীরের গায়ে এসে তরঙ্গায়িত মহানন্দা সশব্দে আছড়ে পড়ছে। অদ্ভুত লাগছিল ইন্দ্রকান্তের। রহস্যময় ও অতীন্দ্রিয় একটা জগৎ যেন আসন্ন প্রভাতের সংবাদে চঞ্চল হয়ে উঠেছে।

আর ঠিক এমনি সময়ে, দীর্ঘায়িত নদীপথের পূর্বদিকে, আধো-আলো আধো-অন্ধকারের পটভূমিতে, অস্পষ্ট ছায়ামূর্তির মতো কয়েকটা নৌকাকে সে দেখতে পেল। শেষ রাতের

রহস্যময় অনুভূতির মাঝে ওরা হঠাৎ সাড়া জাগাল। কিসের নৌকো তা ভালো ভাবে স্থির করার জন্য সে তাকাল।

ক্রমে সেই অন্ধকারটা একেবারে মিলিয়ে গেল, পুবদিকের আকাশে একটা লজ্জারুণ দীপ্তি দেখা গেল আর সেই সারিবদ্ধ নৌকোগুলো একেবারে সেখানে এসেই থামল যেখানে প্রখর ও কৌতূহলী দৃষ্টি মেলে ইন্দ্রকান্ত বসেছিল।

কটা নৌকো? ইন্দ্রকান্ত গুনল। এক, দুই, তিন— সবসুদ্ধ আটটা।

নৌকোর আরোহীদের দিকে তাকাল ইন্দ্রকান্ত। শিশু, যুবা, বৃদ্ধ, সব বয়সেরই নর-নারী আছে তাতে। দেখে বোঝা গেল না যে ওরা মুসলমান না হিন্দু, কেবল বোঝা গেল যে ওরা যাত্রী নয়। নৌকোর ভেতরকার হাঁড়িকুড়ি, উনুন, বাসন, জামা-কাপড়, বাকস-পেঁটরা ও আরো সব নানা খুঁটিনাটি দেখে বোঝা গেল যে নৌকোই ওদের ঘরবাড়ি এবং মাটির চেয়ে জলই ওদের বেশি আপন। আরো ভালো করে তাকাল ইন্দ্রকান্ত এবং চকিতে সে বুঝতে পারল যে এই নবাগতরা যাযাবর সাপুড়ের দল— বেদে। নদীপথ দিয়ে নিজেদের সংসার নিয়েই ওরা সবটা জীবন বেড়িয়ে বেড়ায়, মাঝে মাঝে গ্রাম আর শহরের ধারে নোঙর, ফেলে, সাপ ধরে, সাপের খেলা দেখায়, জিনিসপত্র কেনে, চুরি চামারিও করে এবং হঠাৎ একদিন নোঙর তুলে এগিয়ে যায় ওদের অন্তহীন যাত্রাপথে। প্রায় প্রতি বছরই ওদের আসতে দেখেছে ইন্দ্রকান্ত, দেখেছে নদীর ধারে ছোট ছেলে-মেয়েদের ভিড়, দেখেছে সবার মধ্যে চাঞ্চল্য ও ভয় ওদের বিষয়ে এবং নিজেও মনে মনে ক্রুদ্ধ হয়েছে ওদের ওপর। ওরা সব দেখতে কেমন যেন অস্বাভাবিক ও বন্য, সাধারণের জীবন আর রীতিনীতির সঙ্গে ওদের যেন কোনোখানেই কোনো মিল নেই। যে জলের ওপর বাস করে তারি মতো ভয়ংকর ও দুর্বোধ্য ওরা, আদিম জগতের অন্ধকার অরণ্যটা যেন এখনো ওদের মস্তিষ্কে কায়েমী হয়ে আছে।

সর্বপ্রথম নৌকোটা একেবারে ইন্দ্রকান্তের কাছে এসেই থামল। মাত্র চার পাঁচ হাত দূরে। তার গলুয়ের কাছে একজন বুড়ো মতো লোক বসে হুঁকো টানছিল। ঘ্যাঁচ করে নৌকোটা থামতেই পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরের একটা জোয়ান লোক তা থেকে লাফ দিয়ে নামল, তার হাতে পাকানো মোটা দড়িতে বাঁধা নোঙর, সে নোঙরটাকে সেই গুঁড়িতেই আটকে দিল যেটার ওপর ইন্দ্রকান্ত বসেছিল।

হঠাৎ কেমন যেন রাগ হল ইন্দ্রকান্তর। রাগ করার মতো বড়ো কোনো যুক্তি না থাকলেও তার মনে হল যেন যুক্তি আছে তার রাগে। অন্ততঃ এদের একটু ধমকে কথা বলার ঝোঁকটা সে সামলাতে পারল না। ঘনশ্যাম দাসের সেরা কারিগর সে, তার একটা অধিকার আছে কিছু বলার, যখন ঘনশ্যামের কাঠের গুঁড়ির মাঝে নোঙর ফেলছে এই হিংস্র কুখ্যাত লোকগুলো।

সেই লোকটিকে সে দাপটের সঙ্গে বলল, "এই—এখানে নোঙর ফেলা চলবে না—"

লোকটা শ্বাপদের হাসি হেসে বলল, "চলবে না বললেও চলবে না, কিন্তু তবু— চলবে না কেন তাই শুনি?"

লোকটার কথায় মনে হল যেন ওদের বাড়ি পূর্ববঙ্গের দিকে। তার পরনে লুঙ্গি, তৈলহীন রুক্ষ কেশ আর কালো চেহারা। অনেকটা দুশমনের মতো আর কি।

দাঁতে দাঁত চাপল ইন্দ্রকান্ত, তার শিরায় রক্ত চঞ্চল হয়ে উঠল, সে বলল, "চলবে না কারণ এটা আমাদের ঘাট, এ কাঠও আমাদের—"

"বটে!" সেই লোকটা শয়তানের মতো বিশ্রী হেসে বলল, "কিন্তু নোঙর তো আমি

তুলছি না—"

"না ?"

'হ্যাঁ।"

ইন্দ্রকান্তের চোখ ঝলসে উঠল, "তবে আমি জোর করে তুলে ফেলব—"

"বটে !"

"হ্যাঁ"—

লোকটা নিঃশব্দে তার ঝক্‌ঝকে দাঁতগুলো মেলে হাসতে লাগল তারপর নৌকোর ওপর একটা লাফ দিয়ে উঠে ছইয়ের ভেতর গেল।

"নোঙর তুলে ফেলো"— কর্কশকণ্ঠে বলল ইন্দ্রকান্ত।

অন্যান্য নৌকোগুলোও নোঙর ফেলবার উপক্রম করছে, তার বাসিন্দারা ছইয়ের বাইরে এসে নিঃশব্দে লক্ষ্য করছে ব্যাপারটা। এতগুলো চোখের সম্মিলিত দৃষ্টিতে উত্তেজনা বোধ করল ইন্দ্রকান্ত। তার রাগের স্বপক্ষে জোরালো কোনো কারণই নেই তবু সে যদি এখন পিছু হটে তাহলে এই সমস্ত লোকেরা হয়তো সম্মিলিতভাবে বিদ্রূপের হাসি হেসে উঠবে। কল্পনা করতেও তা অসহ্য মনে হল। সে এগিয়ে গেল, নোঙরটাতে হাত দিল টেনে তুলবার জন্য। আর ঠিক এমনি সময়ে একটা ব্যাপার ঘটল।

সেই দুশমনের মতো চেহারাব লোকটা নৌকোর ভেতর থেকে একটা দা হাতে ছুটে এল, নিচে নামল, তারপর বলল, "খবরদার— কেটেই ফেলব কুচি কুচি করে"—

আব ঠিক সেই মুহূর্তেই নারীকণ্ঠে ধ্বনিত হল, "খবরদার ট্যাংরা পাগলামো করিস না"- -

ইন্দ্রকান্ত দেখল যে, লোকটা হঠাৎ মন্ত্রমুগ্ধের মতো থেমে গেল, শান্ত হয়ে গেল, তাকাল পেছন দিকে। তারি দৃষ্টিকে অনুসরণ করে ইন্দ্রকান্ত দেখল যে গলুইয়ের কাছে বুড়োটার পাশে একটি কুড়ি-একুশ বছরের যুবতী এসে দাঁড়িয়েছে। সুশ্রী ছিপছিপে দেহ। তার পূর্ণায়িত দেহ থেকে যৌবনশ্রী যেন চারিদিকে বিকীর্ণ হয়ে পড়ছে— সেদিকে তাকাতেই যেন নেশা ধরল ইন্দ্রকান্তের। হঠাৎ যেন রাগটা তার জল হয়ে গেল।

মেয়েটি নেমে এল, ইন্দ্রকান্তের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ যেন তার চোখে আগুন জ্বলে উঠল, একটু নেমে সে কাছে এসে বলল, "আমরা এখানে নোঙর ফেললে কি ক্ষতি হবে তোমাদের ?"

ইন্দ্রকান্ত মাথা নাড়ল, "না"—

"তবে", মেয়েটি সপ্রশ্ন দৃষ্টি মেলে তাকাল, যেন ইন্দ্রকান্তের মর্মস্থল পর্যন্ত দেখে নিল সে।

ইন্দ্রকান্ত বুঝল যে সে নিজের মানটি খোয়াবে, তাড়াতাড়ি সে বলল, "তবে অনুমতিটা নিলেই তো হত।"

মেয়েটি হাসল, "ট্যাংরাটা একটা জানোয়ার— ও অতশত জানলে তো মানুষই হয়ে যেত। থাক যা হবার হয়েছে, আমি তো অনুমতি চাইলাম— এবার ?"

হাসিমুখে মেয়েটি তাকাল উত্তরের প্রত্যাশায়।

ইন্দ্রকান্ত মাথা নাড়ল, "এবার আর কি ফেলো নোঙর— থাকো— মিষ্টি মুখে মত চাইলে না বলার মতো চাঁড়াল আমি নই"—

মেয়েটি চোখ ঘুরিয়ে বলল, "আর সে মিষ্টি মুখ যদি আমার মতো মিষ্টি মুখ হয়, তাই না ?"

গলুইয়ের কাছে যে বুড়োটা হুঁকো টানছিল, সে এতক্ষণ নিঃশব্দ ও নির্বিকার হয়ে ছিল, এইবার সে মেয়েটির কথায় খনখনে গলায় হেসে উঠল।

ইন্দ্রকান্ত ব্যাঙ্গের সুরে বলল, "তোমার তো খুব অহংকার দেখছি!"

মেয়েটি মাথা নাড়ল, "ঠিক, তা কি করব বলো, অহংকার আমার সাজে। সত্যি করে বলো তো আমি ঠিক বলছি কিনা"—

"দুত্তোর"— হঠাৎ ইন্দ্রকান্ত ভয়ানক বিরক্ত হয়ে উঠল। একটা প্রগল্‌ভা, জংলী মেয়ের কথার চোটে সে কুপোকাত হতে চলেছে, দূর ছাই। আর কিছু না বলে সে হঠাৎ ঘুরে দাঁড়াল, হন হন করে ফিরে গেল নিজের কারখানায়।

মেয়েটি খিল খিল করে হেসে উঠল। তার সঙ্গে শোনা গেল সেই নিঃশব্দ ও নির্বিকার বুড়োটারও হাসি। বকের পালকের মতো সাদা দাঁড়ি গোঁফে ঢাকা বুড়োর মুখের ভেতর থেকে তীক্ষ্ণ ও খন্‌খন একটা হাসি বেরিয়ে এল। ওদের দুজনের হাসি শুনে ইন্দ্রকান্ত নিজের মনে বিড়বিড় করে বলল, "দুত্তোর ছাই— যত সব জংলী ইয়ে"— কিন্তু তবু মেয়েটি যে ভারী সুন্দরী এ কথাটা সে কিছুতেই অস্বীকার করতে পারল না।

ঘনশ্যাম দাসকে সব কথা বলতেই সে মাথা নাড়ল। তালপাতার পাখাটাকে দ্রুত নাড়তে নাড়তে সে বলল, "তোর মাথা খারাপ ইন্দির যে ওদের সঙ্গে ঝগড়া করতে গেছলি। আরে ওরা সাংঘাতিক লোক, চুরি ডাকাতি করে, সাপ ধরে, এর ওর ছাগলটা, মুরগীটার ওপর দিয়ে হাত সাফাই করে, কথায় কথায় ছোরা মারে আর সাপ লেলিয়ে দেয়— উহুঁ কিচ্ছুটি বলিসনি— ওদের আর ক্ষ্যাপাসনি। ওদের দেখে পুলিসেরা পর্যন্ত সন্ত্রস্ত হয়ে থাকে, তা জানিস?"

ইন্দ্রকান্ত অবশ্য প্রশ্নটার জবাব দিল না, শুধু বিরক্তির রেখাগুলো সুস্পষ্ট হয়ে উঠল তার ললাটদেশে। হুঁ— যত সব। ঘনশ্যাম দাস দেখতে যতটা মনের দিক থেকে ততটা ভারী নয়।

একটা নৌকো তৈরি করছিল সে। সাত-আট দিনের মধ্যেই সেটা খরিদ্দারকে দিতে হবে। খুব তাড়াতাড়ি হাত চালাচ্ছিল ইন্দ্রকান্ত, প্রায় বারো আনা কাজ শেষ করে ফেলেছে। কাজ করতে করতে মাঝে মাঝে শুনতে পাচ্ছিল ঘাটের বেদেদের কোলাহল। তাদের কাচ্চাবাচ্চাদের চেঁচামেচি।

তখন দুপুর পার হয়ে গেছে। মধ্যাহ্নের অলস মুহূর্তগুলো একের পর এক ঝির্‌ঝিরে বাতাসে উড়ে যাচ্ছিল। ঘুঘু আর শালিকের ডাক ভেসে আসছিল থেকে থেকে। এমনি মুহূর্তে হঠাৎ চমক ভাঙল ইন্দ্রকান্তের। পেছনকার ঘাটের রাস্তা দিয়ে কারা সব আসছে। সে ফিরে তাকাল। কারা?

ঝুলি আর ঝাঁপি নিয়ে সেই বেদের দল আসছে। সাত-আটজন পুরুষ, গোটা পাঁচেক বাচ্চা ছেলেমেয়ে আর চারজন স্ত্রীলোক। আর সবার আগে আছে সেই মেয়েটি।

ইন্দ্রকান্ত মুখ তুলল, মেয়েটিকে দেখে একটু রাগ হল সকালবেলার কথা ভেবে কিন্তু আবার আকর্ষণও বোধ করল তার চেহারার লালিত্য দেখে। মেয়েটির মধ্যে সহজাত এমন একটা কিছু আছে যা মানুষকে উদভ্রান্ত করে তোলে। তার চোখের কটাক্ষ, নাক, ঠোঁটের ভঙ্গি আর চলার ভঙ্গি দেখে ইন্দ্রকান্তের চেতনায় ঝড় উঠল।

হঠাৎ সে নিজেকে কথা বলতে শুনে অবাক হয়ে গেল। আরে, তার রাগ যে কর্পূরের

মতো উড়ে যাচ্ছে !

"শোনো"—

মেয়েটি থমকে দাঁড়াল, মৃদু হাসল ।

"কোথায় চললে তোমরা ?" ইন্দ্রকান্ত প্রশ্ন করল ।

"সাপ ধরতে— দেখতে যাবে ?"

"না"— মাথা নাড়ল ইন্দ্রকান্ত, "ইচ্ছে থাকলেও উপায় নেই ।"

"কেন ?"

"কাজ, দেখছো না নৌকো তৈরি করছি ।"

"ওঃ— তুমি তাহলে মালিক নও, কর্মচারী ?" হাসল মেয়েটি, "অথচ এমন মেজাজ দেখিয়েছিলে সকালে— বাপ !"

ইন্দ্রকান্ত নিঃশব্দে একটু মৃদু হাসল ।

মেয়েটি তাকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখে নিয়ে প্রশ্ন করল, "তুমি একা থাকো নাকি ?"

"হুঁ— আর কে আছে যে সঙ্গে থাকবে ?"

"কেন বাপ-মা, ভাই-বোন ?"

"সবাইকে খেয়ে হজম করেছি বহুদিন আগে ।"

ইন্দ্রকান্ত তাকাল মেয়েটির মুখের দিকে । বেশ ভালো লাগছে তার কথা বলতে । মেয়েটির মুখে চোখে, সারা দেহে কেমন যেন একটা বন্য, উগ্র সৌন্দর্য । ওপারের আকাশ, পেছনের নদী আর চারিদিকের গাছপালার মাঝে তাকে যেন আশ্চর্য মানিয়েছে, প্রাকৃতিক পটভূমির সঙ্গে যে যেন অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত ।

মেয়েটির সঙ্গীরা এগিয়ে গিয়েছিল, তারা হঠাৎ মাঝপথে দাঁড়িয়ে ডাক দিল, "ময়না— এই ময়না শিগগির আয়"—

"যাই"—মেয়েটি সাড়া দিল । ইন্দ্রকান্তের দিকে তাকিয়ে সে বলল, "একজনের নৌকো তৈরি করা দেখলে কি আমার পেট ভরবে নাকি ?"

ইন্দ্রকান্ত অপমান বোধ করল । কে বলছে মেয়েটাকে তার নৌকো বানানো দেখতে, সে কি হাতে পায়ে ধরে সেধেছে ! কি বলে এই অচেনা জংলী মেয়েটা !

সে কঠিনস্বরে বললে, "যা করলে পেট ভরে তাই করতে যাও না তবে, কে তোমায় দিব্যি দিয়ে আটকে রেখেছে ?"

মেয়েটির চোখের তারায় বাড়বানলের দীপ্তি দেখা দিল, তার দু-চোখের কালো অরণ্যে যেন একটা শ্বাপদের চোখকে ক্ষণকালের জন্য দেখা গেল । পরে সে হেসে বলল, "না, সত্যি যাই"—

দ্রুতপদে সে চলে গেল ।

সেদিকে তাকিয়ে ঘনশ্যাম পাখা চালাতে চালাতে হাঁক পাড়ল, "হ্যাঁরে ইন্দির— ব্যাপার কিরে হারামজাদা ?"

ইন্দ্রকান্ত গভীরভাবে জবাব দিল, "ব্যাপার সুবিধের নয় ।"

সমস্ত আকাশটাকে যেমন দেখা যায় না, যেমন বোঝা যায় না তার কোন প্রান্তে মেঘ সঞ্চিত হচ্ছে, ঝড় ঘনিয়ে আসছে, তেমনি ইন্দ্রকান্তও প্রথমে বুঝতে পারেনি তার হৃদয়টাকে ! তারপরে এক সময়ে আলো ম্লান হলে, দিগন্তে ধুলো ওড়ার সঙ্গে গোঁ গোঁ শব্দ শুনলে যেমন আসন্ন বিপর্যয়টাকে টের পাওয়া যায় তেমনিভাবে ইন্দ্রকান্ত একসময়ে টের

পেল যে তার রক্তমাংসের ভেতরে একটা বিপর্যয় ঘনিয়ে এসেছে। একটা বিচিত্র রস আর একটা অনুভূত পিপাসা তার সমগ্র চেতনাকে আচ্ছন্ন করে ফেলছে।

কাজ করতে করতে সে ভাবল যে সাপ ধরা দেখতে গেলে বেশ হত। কিন্তু—

অনেকক্ষণ পর। বেলা তখন পড়ে এসেছে, অন্ধকার ঘনিয়ে আসতে আর দেরি নেই।

ওদের পায়ের শব্দ শোনা গেল। ইন্দ্রকান্ত তাকাল।

একটা আম গাছের পাশে এসে আবার দাঁড়াল ময়না।

তাকে দেখে ইন্দ্রকান্তের মনে হল যে এর আগে তার রাগত ভাবের জন্য সাক্ষাৎটা তাড়াতাড়ি শেষ হয়েছিল। তাই একটু গম্ভীর হয়েই রইল সে।

"এখনো কাজ হচ্ছে ?"

"হুঁ—"

"অনেক সাপ ধরেছি আমরা—গোটা ছয়েক।" ময়না তাকে পর্যবেক্ষণ করতে করতে বলল।

"বেশ তো !" যেন কত নির্লিপ্ত ইন্দ্রকান্ত।

"এখনো নৌকো করছ ?" ময়না একটু মুচকি হাসল, "তোমার তৈরি নৌকোতে চড়তে আমার একটু লোভ হচ্ছে।"

"চড়ো— একটা ফুটো নৌকো তৈরি করে দেব মাঝদরিয়ায় ডুবে মরবে।"

"ইস্—তোমার তো খুব রাগ !"

"হুঁ"—

কি ভেবে ময়না হঠাৎ প্রশ্ন করল, "আচ্ছা তোমার নাম ?"

"ইন্দ্রকান্ত পাল।"

"ই-ন্দ্র-কা-ন্ত। উহুঁ—তোমার নামটা 'প্রাণকান্ত' হলে আরো ভালো হত।"

"মানে ?" চমকে মুখ তুলল ইন্দ্রকান্ত।

"মানে ঐ"— বলেই খিল খিল করে হেসে সেখান থেকে ছুটে চলে গেল ময়না।

মানে ? বিমূঢ়ের মতো হয়ে গেল ইন্দ্র। নিজের রক্তের মধ্যে যে তোলপাড় আরম্ভ হল তা টের পেল সে। তার হঠাৎ আপসোস হল কেন সে অমন আঁকাবাঁকা জবাব দিচ্ছিল। কিন্তু এ কি ব্যাপার ! বেদের মেয়ে— নীতিধর্মের বালাই নেই, সভ্যতার প্রলেপ নেই, জলচর যাযাবর জীব— তাকে দেখে তার এমন চিত্ত-দৌর্বল্য কেন হবে ? না, এ ভালো নয়। না, নিজেকে সংযত করতে হবে। দু-দিনের জন্য এই মেয়েটা এসেছে তাদের নদীর ঘাটে, তার জীবনে, আবার হয়তো কালই চলে যাবে কোথায়— তাকে নিয়ে এমন মাতামাতি করার চেয়ে তার গলায় দড়ি দেওয়াই ভালো ! ঠিক— ঘাড় নাড়ল ইন্দ্রকান্ত। দুত্তোর ছাই— যত সব ইয়ে—

কিন্তু ইন্দ্রকান্ত সচেতন ও সচেষ্ট থাকলে কি হবে ? ময়নাই আসে যখন তখন। মেয়েটার লজ্জা নেই।

যখন তখন আসে ময়না। কারণে অকারণে।

হয়তো বাজারে যাচ্ছে সে, থমকে দাঁড়ায় ইন্দ্রকান্তকে দেখে, হেসে বলে, "কেমন আছো গো প্রাণকান্ত পাল ? এ্যাঁ ?"

ইন্দ্রকান্ত রেগে বলে, "ইয়ার্কি হচ্ছে ? তোমার সাহস তো কম নয় !"

ময়না হেসে পালায় আর চিড় খায় ইন্দ্রকান্তের গাম্ভীর্যে, তার সংযমে।

সেদিন বিকেলে ইন্দ্রকান্ত একা কাজ করছিল। দু-একজন মিস্ত্রী ছাড়া আর কেউ আসেনি। হঠাৎ সে একটা বাঁশির আওয়াজ শুনতে পেল। ঠিক কারখানাটার পেছন দিকেই যেখানে নানা আগাছায় জায়গাটা নিবিড় হয়ে আছে।

সাপুড়েদের বাঁশি। বুঝতে পারল ইন্দ্রকান্ত। কেউ সাপ ধরছে। একটানা মাদকতাময় সুর, সাপের গমনভঙ্গির মতোই এঁকে-বেঁকে চলেছে, চেতনার ওপর যাদুর প্রলেপ বুলিয়ে দিচ্ছে। চোখের সামনে একটা কালো পর্দা এসে মাঝে মাঝে কাঁপে, কে যেন হাতছানি দিয়ে ডাকে, কানের কাছে কে যেন মুখ নিয়ে এসে ফিসফিস করে ডাকে।

ইন্দ্রকান্ত কারখানার পেছন দিকে গেল।

ময়না! এক জায়গায় উঁচু হয়ে বসে বাঁশি বাজাচ্ছে। তার পেছনে একটা বাঁশের ঝাঁপি।

ইন্দ্রকান্তকে দেখেই একটা হাত দিয়ে তাকে সরে যেতে ইঙ্গিত করল ময়না। তার চোখে সতর্কতাসূচক একটা দীপ্তি দেখা গেল। ইঙ্গিতটাকে বুঝে লাফ দিয়ে একটা পরিষ্কার মাটির ঢিপির ওপর উঠতেই ইন্দ্রকান্ত একটা হিস হিস শব্দ শুনল। সে তাকাল। যেখানটায় সে খানিক আগে দাঁড়িয়েছিল, সেখানটাতে একটা সাপ ফণা মেলে দুলছে বাঁশির সুরের তালে তালে। গোখরো সাপ। ময়নার চোখ এবার যেন সাপের মাথার মণিব মতো জ্বলতে লাগল। সে বাঁশি বাজাতে বাজাতে এগিয়ে এল। সাপটাও একটু এগোল, মাটিতে দু তিনবার একটা অদৃশ্য শত্রুকে ছোবল মারার চেষ্টা করে আবার ক্লান্তভাবে ফণা দোলাতে লাগল। হঠাৎ শেকড়ের মতো কোমর থেকে কি একটা বের করল ময়না, সেটা এগিয়ে ধরল সাপটার দিকে। সাপটা ফণা গুটিয়ে নিল, মাটিতে লুটিয়ে পড়ল, নির্জীবের মতো মাটিতে নড়তে লাগল। হঠাৎ ডান হাত দিয়ে আশ্চর্যভাবে সাপটার মাথা চেপে ধরল ময়না, আর অদ্ভুত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে সেটাকে ঝাঁপিতে পুরে ফেলল। বাঁশি থামল।

ইন্দ্রকান্তের মুখে কথা নেই, সে এগিয়ে এল ময়নার কাছে। বলল, "তুমি কি ?"

"আমি ? যাদুকরী গো"— হাসল ময়না।

"সাপ ধরতে ভয় লাগে না তোমার ?"

"না। এ আর কি কালকেউটে, শঙ্খচূড় পর্যন্ত ধরা পড়ে আমার হাতে— এ তো কিছুই নয়।"

"বটে! তুমি যাদুকরী!"

"হ্যাঁ", মাথা নাড়ল ময়না, "বনের সাপ কি, সবাইকেই এমনি বশ করতে পারি আমি"—

এই বলে অদ্ভুত দৃষ্টি মেলে ময়না চেয়ে রইল। অদ্ভুত ও অস্বাচ্ছন্দ্যকর সে দৃষ্টি। দেখে কেমন যেন অস্বস্তি বোধ হয় ইন্দ্রকান্তের, কেমন যেন ভয় করে।

"কি দেখছো অমন হাঁ করে ?" সে প্রশ্ন করল।

"তোমায়।"

"কেন ?"

"দেখতে বেশ লাগে।" হঠাৎ হাসতে লাগল ময়না।

তার হাসি দেখতে দেখতে কেমন যেন ভয় হল ইন্দ্রকান্তের। যে অবলীলাক্রমে বিষধর সাপকে বশ করে তাকে কেমন যেন সহজভাবে গ্রহণ করতে পারছে না সে।

"দুত্তোর ছাই— যত সব—"

সে পা বাড়াল।

"চললে ?" মৃদুকণ্ঠে প্রশ্ন করল ময়না।

"হ্যাঁ।" ঝাঁঝালো সুরে জবাবটা দিয়ে প্রায় দৌড়েই পালাল ইন্দ্রকান্ত।

কিন্তু ময়না যেন নাছোড়বান্দা। সে যেন ইন্দ্রকান্তের গুহাবাসী মনটাকে দেখতে পেয়েছে, সে যেন শুনতে পেয়েছে তার রক্তের ঘোষণা।

সন্ধ্যা হয়ে গেছে তখন।

অন্ধকারে হু হু হাওয়া বইছে। মহানন্দার জল আছড়ে পড়ছে ঘাটের গায়ে, নৌকোর গায়ে। গাছপালার মর্মরধ্বনি আর নিজের রক্তের গর্জনধ্বনি শুনতে পেল ইন্দ্রকান্ত। হঠাৎ একটা দুর্নিবার শখ হল তার—ময়নাকে দেখবে। একটা দুর্নিবার পিপাসা।

পেছন দিকের সংকীর্ণ পথ ধরে সে এগোল।

এগোতেই একজনের সঙ্গে মুখোমুখি দেখা।

"কে ? ময়না !"

"হাঁ"— ময়না হাসল, "তোমায় দেখতে যাচ্ছিলাম।"

"কেন ?"

"এমনি"—

হঠাৎ কি যেন হল, এগিয়ে ময়নার একটা হাত চেপে ধরল ইন্দ্রকান্ত, "কেন, কেন তুমি ক্ষেপাবার চেষ্টা করছ বলো তো ? আমি সাপ নই যে, আমায় বশ করবে তুমি, বুঝলে ?"

"বুঝলাম। কিন্তু যদি করি বশই—তবে ?" ময়নার গলা একটুও কাঁপল না।

"পাগল"— বিকৃতকণ্ঠে বলল ইন্দ্রকান্ত।

ইন্দ্রকান্তের হাতের মুঠোয় ময়নার উত্তপ্ত হাতটা, তার সর্প নির্মোকের মতো মসৃণ ও কোমল স্পর্শ তাকে যেন অসাড় করে ফেলল ধীরে ধীরে। হঠাৎ ময়না দাঁতে দাঁতে চেপে বলল, "আমাদের নৌকোয় আসবে ?"

"কেন ?"

"কত রকমের সাপ আছে দেখবে— দেখবে সাপের খেলা ? আসবে ?"

"এখুনি ?"

"না, আধঘণ্টা পর।"

"যাব।"

হাতটা টেনে নিল ময়না, লঘুকণ্ঠে বলল, "এসো কিন্তু, এমন খেলা তুমি জন্মেও দেখোনি— একেবারে অবাক হয়ে যাবে।"

"যাব।"

ময়না অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

সেখানেই দাঁড়িয়ে রইল ইন্দ্রকান্ত। অনুভব করল যে সে ঘেমে উঠেছে। আর ময়নার হাতের স্পর্শ স্মরণ করে হাতটা তার তখনো থরথর করে কাঁপছে। মুহূর্তের পর মুহূর্ত কেটে গেল।

অবশেষে ইন্দ্রকান্ত গিয়ে নৌকোর সামনে দাঁড়াল।

নৌকোর গলুইয়ের কাছে সেই বুড়োটা বসে সেদিনকার মতোই হুঁকো টানছে। অন্যান্য নৌকোর লোকেরা হঠাৎ উদগ্রীব হয়ে তাকাল তার দিকে। নৌকোর ছইয়ের

কাছে ময়না দাঁড়িয়ে। সে এখন শাড়ী বদলেছে। মাথার তৈলহীন চুলগুলোকে এলিয়ে দিয়েছে পিঠের ওপর, হাতের আর গলার রূপো আর পাথরের গয়নাগুলো ঝকমক করছে অস্পষ্টভাবে। একটা হ্যারিকেন জ্বলছে নৌকোর ভেতরে। তারি আলোতে অদ্ভুত দেখাল ময়নাকে, রোমাঞ্চকর মনে হল তার রূপকে।

"এসো" ময়না অভ্যর্থনা জানাল।

ভেতরে গেল ইন্দ্রকান্ত।

"বোসো"— একটা মাদুর বিছিয়ে দিল ময়না। ছইয়ের গায়ের সঙ্গে কতকগুলো হাঁড়ি আর ঝাঁপি ঠেস দিয়ে রাখা হয়েছে।

একটা গেলাস রাখল ময়না ইন্দ্রকান্তের সামনে, মিষ্টি হেসে বলল, "খাও"—

"কি ?" গলাটা শুকিয়ে যাচ্ছে ইন্দ্রকান্তের।

"সরবত—খাও। আমাদের এই নিয়ম, অতিথিকে কিছু খেতে দিতে হয়।"

"আচ্ছা" একটু হেসে গেলাসটা নিঃশেষ করল ইন্দ্রকান্ত। মিষ্টি অথচ কষায় একটা স্বাদ, খুব ভালো লাগল না।

হ্যারিকেনের আলোর সামনে বসল ময়না।

'খেলা দেখাও"— ইন্দ্রকান্ত বলল।

"দেখাচ্ছি— কিন্তু একটা কথা বলবে প্রাণকান্ত—"

"আমি প্রাণকান্ত নই, ইন্দ্রকান্ত।"

"আমাব কাছে প্রাণকান্তই ভালো লাগে" ময়না হাসল। হঠাৎ নিচের ঠোঁটটাকে একবার কামড়ে ধরে সে বলল, "আচ্ছা, আমায় দেখতে কেমন লাগে ?"

নৌকোটা কি দুলে উঠল ? মাথাটা একটু ঘুরে গেল ইন্দ্রকান্তের ময়নার এই কথায়। সে তাকাল। অদ্ভুত একটা বন্য সৌন্দর্য এই মেয়েটার। সহ্য কবা যায় না।

সে চাপা গলায় বলে, "ভালো— খুব ভালো লাগে।"

ময়না উঠে দাঁড়াল, "তবে খেলা দেখাচ্ছি। কিন্তু তার আগে সাপ দেখো।"

একটা হাঁড়ি নিয়ে এল সে। একপাশ থেকে বাঁশিটা তুলে ফুঁ দিল, তারপর হাঁড়ির মুখটা খুলে দিল।

হঠাৎ কি যেন হল ইন্দ্রকান্তের। তার চেতনা অবশ হয়ে এল, ঘুম পেল তার, চোখের পাতা বুজে এল। তবু জোর করে দেখবার চেষ্টা করতে লাগল সে। সাপ। একটা, দুটো, তিনটে, চারটে, ফণা, বাঁশির শব্দ, ময়নার দুটো কালো চোখ। বাইরের সেই বুড়ো সর্দার আদেশসূচক কি একটা কথা বলল। তারপর আর কিছু মনে রইল না, কিছুই দেখতে পেল না ইন্দ্রকান্ত— সব কিছুই অন্ধকার ও বিস্মৃতিতে মিলিয়ে গেল।

কতক্ষণ কাটল মনে নেই। অনেকক্ষণ, অনেকক্ষণ পর সে যেন কোনো মহাসমুদ্রের তলদেশ থেকে উঠে এল। চোখ মেলল সে, সব মনে পড়ল তার, তাকাল সে। দেখল তার মুখের কাছেই ময়নার মুখ, অদ্ভুত একটা শাণিত দীপ্তি তার চোখে। বাইরে তুমুল ঝড়-বৃষ্টির শব্দ, আর বোঝা গেল যে নৌকোটা দুলে দুলে চলেছে তারই মাঝে। সে জানে না কখন নৌকো চলতে শুরু করেছে, কখন ঝড় উঠেছে আর বৃষ্টি নেমেছে।

কঠিন কণ্ঠে সে প্রশ্ন কল, "এর মানে ? ব্যাপার কি ?"

ময়না মুখটা আরো এগিয়ে নিয়ে এল, দৃষ্টি দিয়ে ইন্দ্রকান্তের সর্বাঙ্গ আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করে সে বলল, "ব্যাপার কিছুই নয়, বেদেনীদের ভালবাসার এ একটা ধরন—"

"আমায় কি খাইয়েছিলে ?"

"সেঁকো— কিন্তু তাতে মরতে না।"

"আমি যাই"— ইন্দ্রকান্ত উঠে দাঁড়াল। নৌকোটা বেজায় দুলছে।

"যাবেই?" ম্লানভাবে হাসল ময়না, কিন্তু চোখ দুটো তার জ্বলে উঠল, সে বলল, "সেঁকো বিষ দিয়ে চিরকাল কেউ কাউকে আটকে রাখতে পারে না—তা আমি জানি-- তবু—। যাক সে কথা, যাও তো নৌকো থামাই। কিন্তু বাইরে যে খুব ঝড়বৃষ্টি হচ্ছে! যেতে পারবে?"

তাই বটে। বাইরে খুব ঝড়বৃষ্টি হচ্ছে। রূপকথার রাক্ষসীরা যেন রসাতলের কোনো অন্ধকার ভেঙে বেরিয়ে এসেছে। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, অতিকায় নাগিনীর মতো মহানন্দা গরজাচ্ছে, পাক খাচ্ছে! কোথায় যাবে ইন্দ্রকান্ত? কে আছে তার? জাতি, ধর্ম, সভ্যতা— কী তার দাম? তার চেয়ে এ মন্দ কি? ভালবাসার উষ্ণ আশ্রয়।

সে তাকাল ময়নার দিকে, বসল তার পাশে, হাসল। ময়নাকে হঠাৎ কাছে টেনে নিল, তারপর মৃদুকণ্ঠে বলল, "না, নৌকো থামানোর দরকার নেই— চলুক—ভেসে চলুক।"

সঙ্গে সঙ্গে নাগিনীদের মতো দুটো হাত হঠাৎ ইন্দ্রকান্তের কণ্ঠদেশকে সজোরে বেষ্টন করে ধরল, কামনা-জর্জর একটা উত্তপ্ত বুকের মধ্যে তাকে উন্মত্ত আবেগে পিষে মারতে চাইল।

পরাজয়

শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়

রাগে ফুঁসছিল রঞ্জন। একটু আগে ও সবকটা কাগজে বারপুজোর রিপোর্ট পড়েছে। ছবি দেখেছে। রিপোর্টগুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়েছে। ওদের ক্লাবের অনুষ্ঠানে কে কে ছিল সেইটাই ও দেখতে চেয়েছিল বেশি করে। এখন কাগজগুলো পড়ে আছে টেবিলের ওপর। আর রঞ্জন ঘরের মধ্যে চরকির মতো ঘুরছে।

এতো দুঃখ, এতো ব্যথা সে কখনও পায়নি। গত পনের বছর যে ক্লাবের জন্যে সে রক্ত ঝরাল আজ তারাই কি না তাকে এতো বড় অপমানটা করল। ওকে একবার ডাকার দবকার মনে করল না! প্রত্যেক বছর ফোনের পর ফোন আসে। প্রেসিডেন্ট ফোন করেন, সেক্রেটারি ফোন করেন, ফুটবল সেক্রেটারি ফোন করেন। ক্লাবের বারপুজোয় যাবার জন্যে বলতে বাড়িতেও আসেন কেউ কেউ। তারপর পয়লা বৈশাখ সাত সকালে মাঠে যাবার জন্যে গাড়ি এসে হাজির হয়। রঞ্জনও চান টান করে তৈরি থাকে। গাড়ি এলেই বেরিয়ে পড়ে। গত পনের বছর ধরে এই রেওয়াজ চলছিল। গত বছরই রঞ্জন অনুভব করেছিল, ওকে নিয়ে মাতামাতিটা ঠিক আগের মতো আর নেই। কেমন যেন একটু ছাড়া ছাড়া ভাব। গায় মাখেনি রঞ্জন। ভেবেছিল, ও তো পুরনো খেলোয়াড়, এত দিনে ক্লাবেরই একজন হয়ে গেছে। ওর দিকে আর কত খেয়াল রাখবে। ওর চেয়ে নতুন খেলোয়াড়দের দিকে, যারা ক্লাব ছেড়ে যাবার কথা ভাবছে তাদের দিকে বেশি নজর দেওয়া ভাল। তবু মনটা যে একটু খুঁত খুঁত করেনি তা নয়। একবার মনে হয়েছিল, তবে কি ক্লাবে ওর দব কমে গেছে? কথাটা মনে হওয়ায় ওর মনটাও একটু খারাপ হয়ে গিয়েছিল। তবে গুরুত্ব দেয়নি।

ফুটবল সেক্রেটারি আর কোচ এসে ওর সঙ্গে দল গড়া নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। কাকে কাকে এবার দলে আনা যায় তাই নিয়ে ওর পরামর্শ চেয়েছিলেন। ওঁদের সঙ্গে কথা বলার পর ওর মনের মধ্যে জমে ওঠা মেঘটা কেটে গিয়েছিল। ভেবেছিল, না! সবই ঠিক আছে। বছরের প্রথম দিনে রোদ ঝলমলে আকাশের দিকে তাকিয়ে ওর মনটা ভাল হয়ে গিয়েছিল। খুশি খুশি মনে সেদিন বাড়ি ফিরে গিয়েছিল। ঠিক এক বছর আগের ঘটনা।

আর এবার!

গাড়ি পাঠানো তো দূরের কথা, মাঠে যাবার জন্যে ওকে কেউ একবার বললোও না। একটা টেলিফোনও তো করতে পারত। ও ভেবেছিল, বলেনি তো কি হয়েছে। গাড়ি নিশ্চয়ই পাঠাবে। তাই সক্কাল বেলায় চান-টান করে ও রেডি হয়ে বসেছিল। কিন্তু

ঘড়ির কাঁটা ঘুরে গেল, সকাল গড়িয়ে গেল— গাড়ি এল না। কেউ টেলিফোন করেও বলল না, গাড়ি পাঠাতে পারলাম না— তুই চলে আয়।

সারাটা সকাল ও ছটফট করে বেড়িয়েছিল। দুঃখ আর অভিমান ওকে কুরে কুরে খাচ্ছিল। এই রকম কষ্ট কোনদিন সে পায়নি। পরে সে ভীষণ অপমানিত বোধ করেছিল। বুঝেছিল, ইচ্ছে করে ওকে অপমান করা হয়েছে। এইভাবে ওকে বুঝিয়ে দেওয়া হল, ওকে আর ক্লাবের দরকার নেই। গত পনের বছরে শত প্রলোভনে সে ভোলেনি, লক্ষ লক্ষ টাকার অফার, বিশাল চাকরির হাতছানি সে যে ক্লাবের কথা ভেবে হাসতে হাসতে ফিরিয়ে দিয়েছিল সেই ক্লাবই আজ তাকে এত বড় অপমান করল। ক্লাবের বারপুজোয় একবার ডাকার প্রয়োজন পর্যন্ত বোধ করল না!

রঞ্জন সারাটা দিন আর বাড়ি থেকে বেরোয়নি। হালখাতার কোন নেমন্তন্নেও যায়নি। নিজের মনের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিল। বুঝতে পারছিল না কি করবে। অব্যক্ত যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে ওর মনের মধ্যে জমে ওঠা দুঃখ আর অভিমান রূপান্তরিত হয়েছিল রাগে। যাদের জন্যে এত বছর ধরে সে নিজেকে নিঃশেস করে দিল আজ তার খেলোয়াড় জীবনের অন্তিম লগ্নে পৌঁছে তাদের কাছ থেকে এই রকম ব্যবহার পেল!

কথাটা মনে হতেই রাগে ফুঁসে উঠল রঞ্জন। ও কি ফুরিয়ে গেছে? ও কি শেষ হয়ে গেছে? ওরা কি তা হলে তাই ভাবছে? ঠিক আছে, ওদের চ্যালেঞ্জ সে গ্রহণ করল। খেলার মাঠেই সে প্রমাণ করে দেবে যে ও এখনও ফুরিয়ে যায়নি। কিন্তু কি ভাবে? ক্লাবের কর্তাদের হাবভাব দেখে সে পরিষ্কার বুঝতে পেরেছে, তাকে আর ওদের দরকার নেই। নতুন ছেলেদের নিয়ে যে মাতামাতি করা হচ্ছে তার সিকিভাগও যদি ওর মতো পুরনো খেলোয়াড়দের নিয়ে করা হত তাহলে অবস্থা অন্যরকম হত। তবে কি ওকে ক্লাব ছেড়ে দিতে হবে? আঁতকে উঠল রঞ্জন। এ সে কী ভাবছে? ক্লাব ছেড়ে দেবে— সে? অসম্ভব। এই ক্লাবের জার্সিকে সে মায়ের মতো ভালোবাসে। গত পনের বছর ধরে ঐ দশ নম্বর জামাটা ওকে শক্তি দিয়েছে, ওকে যশ, মান, অর্থ প্রতিপত্তি সবই দিয়েছে। রঞ্জন সরকার যে শুধু কলকাতা নয় ভারতীয় ফুটবলের ইতিহাসে লাল হরফে লিখে রাখার মতো একটি নাম সে তো ওই জার্সির কল্যাণেই। আজ এতদিন পরে, যখন বুট তুলে রাখার কথা ভাবছে তখন সে কি করে মায়ের মতো ওই জার্সি ত্যাগ করবে? না, সে কথা রঞ্জন কল্পনাও করতে পারে না। এ কথা ভাবাও যে পাপ। তা হলে সে কি করবে? ভেবে পায় না রঞ্জন। ছটফট করে নিজের মনে।

অফিসে গিয়েও নিস্তার নেই। অনেক খেলোয়াড়ই ওদের অফিসে কাজ করে। তা ছাড়া খবরের কাগজে ফলাও করে সব বেরিয়েছে। তাই জনে জনে এসে জিজ্ঞেস করতে শুরু করল, রঞ্জনদা তুমি কাল ক্লাবে যাওনি?

না রে! কাল সকালেই আমায় কলকাতার বাইরে যেতে হয়েছিল।

ও তাই বলো! আমরা তো ভীষণ অবাক হয়ে গিয়েছিলাম, নাণ্টুদাকে জিজ্ঞেস করলাম। নাণ্টুদা বলল, ঠিক জানে না তুমি কেন এলে না। আমরা ভেবে পাচ্ছিলাম না কি হল।

রঞ্জনের মনের মধ্যে সেই কষ্ট কষ্ট ভাবটা আবার জেগে উঠল। নাণ্টুদাও ঐ কথা বলল? অন্যবার তো নাণ্টুদা বাড়ি যায়, বারবার ফোন করে, গাড়ি পাঠায়— আর এবার জানেই না কেন সে ক্লাবের বারপুজোয় যায়নি। তবে কি ওরা ওকে ক্লাবে রাখতে চায় না? এইভাবে অপমান করে বুঝিয়ে দিচ্ছে, ও ক্লাবে অবাঞ্ছিত। রঞ্জনের মাথার মধ্যেটা

ঝিমঝিম করে উঠল। না, আজ আর ও অফিসে থাকতে পারবে না। উঠে পড়ল। বেরিয়ে পড়ল অফিস থেকে। কিন্তু যাবে কোথায় ? বাড়িও যাওয়া যায় না। বাড়ি গেলে মা আবার ভাবতে বসবে। অন্য সময় হলে ক্লাবে চলে যেত। একবার ভাবল, ক্লাবেই যাবে। পরমুহূর্তে ওর মনটা বিদ্রোহ করে উঠল। গতকাল ক্লাবে অমন হৈ চৈ হল, অত ঘটা করে বারপুজো হল সেখানে থাকার জন্যে যখন ওকে কেউ বলেনি তখন ও ে;জ সেই ক্লাবে কি ভাবে যাবে ? মনের মধ্যে দুঃখ আর কষ্টটা চেপে ও ওর ছোট্ট মারুতি গাড়িটা নিয়ে চলে গেল গঙ্গার ধারে। এখন অফিসের সময়, স্কুল-কলেজেও খোলা। এখন নিশ্চয় গঙ্গার ঘাটে কোন চেনা লোকের সামনে ওকে পড়তে হবে না।

গাড়িটা পার্ক করে রঞ্জন একটা বেঞ্চির ওপর গিয়ে বসল। গঙ্গার ধারে গাছের পাতায় পাতায় ঝিরঝিরে হাওয়া। কানে ভেসে আসে পাখির ডাক। গঙ্গার জলে ছোট ছোট ঢেউ। দূরে নোঙর করে দাঁড়িয়ে আছে কটা ছোট বড় জাহাজ। রঞ্জন নামগুলো পড়ার চেষ্টা করে। অনেকগুলো নৌকো দাঁড়িয়ে আছে যাত্রীর আশায়। ফেরি স্টিমারগুলোর জন্যে ওদের খুব অসুবিধে হয়ে গেছে। দূরে কোথায় কোন একটা গাছে পাতার আড়ালে বসে একটা কোকিল ডাকছে। কোকিলের ডাক আজকাল তো আর শোনাই যায় না। রঞ্জনের মন অনেকটা হালকা হয়ে যায়। ও ঠাণ্ডা মাথায় ভাবতে চেষ্টা করে, ওর এখন কি করা উচিত। ওদের ক্লাবের কর্তারা পরিষ্কার বুঝিয়ে দিয়েছেন, ওকে আর দরকার নেই। তাহলে কি ও ক্লাব ছেড়ে দেবে ? কথাটা মনে হতেই ওর বুকের মধ্যেটা কিরকম যেন করে উঠল। বুকের মধ্যে চেপে রাখা যন্ত্রণাটা ঠেলে ওপর দিকে উঠে এসে কণ্ঠার কাছে দলা পাকিয়ে আটকে গেল। রঞ্জন বুঝল, ওর চোখ দুটো ভারি হয়ে উঠেছে। শুধু ফোঁটায় ফোঁটায় গড়িয়ে পড়ার অপেক্ষা। রঞ্জন পকেট থেকে রুমালটা বের করল। চোখটা মুছে রঞ্জন উঠে দাঁড়াল। কি করবে ও ঠিক করে ফেলেছে। দুটো দিন ও অপেক্ষা করবে। এর মধ্যে ওর সঙ্গে যদি ক্লাবের কেউ যোগাযোগ করে ভালো, না করলে ও ক্লাব ছেড়ে দেবে। না, খেলা ও ছাড়বে না। দেখিয়ে দেবে, ও ফুরিয়ে যায়নি।

সিদ্ধান্তটা নেবার পর রঞ্জনের মন অনেকটা শান্ত হল। ও উঠে দাঁড়াল। এখন কোথায় যাওয়া যায় ভাবতে ভাবতে গাড়িতে উঠে বসল।

পরের দুটো দিন ছটফট করে বেড়াল রঞ্জন। অফিস ছাড়া আর কোথাও গেল না। কারও সঙ্গে ভালোভাবে কথা পর্যন্ত বলল না। অফিসের সহকর্মী খেলোয়াড়রা সকলেই ওর চেয়ে বয়সে ছোট। রঞ্জনদাকে অতো গম্ভীর দেখে তারা আর কাছে ঘেঁষলো না। দুদিন পুরো সময় অফিস করল রঞ্জন। দশটা থেকে পাঁচটা পর্যন্ত এই প্রথম বোধহয় রঞ্জন সরকার অফিসে কাটালো। রঞ্জন আশা করেছিল, যদি ক্লাবের কেউ আসে। বাকি সময় বাড়িতে টেলিফোনের কাছাকাছি। বাড়ির লোক অবাক, ছেলেটার হলো কি ! বাড়ি থেকে নড়ছে না মোটে। তবে ওর চোখ মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছিল, প্রচণ্ড টেনশানের মধ্যে আছে। তাই কেউ আর ঘাঁটায়নি ওকে। দুটো দিন কেটে গেল— ক্লাব থেকে কেউ আসা তো দূরের কথা কেউ একটা টেলিফোন পর্যন্ত করল না।

নিজের সঙ্গে লড়াই করতে করতে ক্লান্ত রঞ্জন তৃতীয় দিন রাত্তিরে টেলিফোন করল অন্য বড় ক্লাবের সেক্রেটারিকে।

স্বপনদা আমি রঞ্জন সরকার বলছি।

রঞ্জন— মাই গড। তুমি আমায় ফোন করবে কোনদিন ভাবতেও পারিনি। কেমন

আছ ভাই ?

ভালোই।

তোমদের ক্লাবের কি খবর ? খুব ধুম ধাম করে এবার বারপুজো হল। শুনলাম তুমি যাওনি।

রঞ্জন একটু ইতস্তত করে আস্তে আস্তে বললো, হ্যাঁ স্বপনদা…ওরা আমায় ডাকেনি।

কি বলছো রঞ্জন ! তোমায় ওরা ডাকেনি এ কখনও হতে পারে ? তুমি যে ওদেব জন্যে তোমার জীবন দিয়ে দিয়েছ !

তার পুরস্কার এতোদিনে পেলাম স্বপনদা। অবহেলা, অপমান।

ওরা তোমায় একবার ফোনও করেনি ?

না স্বপনদা…

রঞ্জনের গলা জড়িয়ে এল। স্বপন যা বোঝার মুহূর্তের মধ্যে বুঝে নিল।

রঞ্জন তুমি বাড়ি থেকে বলছো তো ? আমি আসছি। আধ ঘণ্টার মধ্যে পৌঁছে যাব।

ঠিক আছে।

রঞ্জন টেলিফোনটা রেখে দিল। এতদিন ঐ স্বপনরাই ওকে বার বার ফোন করেছে। দেখা করেছে। লক্ষ লক্ষ টাকার প্রলোভন দেখিয়েছে। রঞ্জন পাত্তাও দেয়নি। নিজের ক্লাবকে সে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসে। পনের বছর আগে সেই যে খিদিরপুর থেকে এসেছিল তারপর আর কোনদিন সে ক্লাব ছাড়েনি। বাংলার হয়ে খেলেছে, ভারতের হয়ে খেলেছে। একাধিকবার বাংলা আর ভারতীয় দলের অধিনায়ক হয়েছে। অর্জুন পুরস্কার পেয়েছে। ক্লাবপ্রীতির আদর্শ নমুনা হিসেবে এতদিন ওর নামই সকলে উল্লেখ করত। অন্য ক্লাব যখন ওকে তিন-চার লাখ টাকা দেবার কথা বলত ও তখন নিজের ক্লাব থেকে এক-দেড় লাখ টাকা নিয়েই খুশি থাকত বিনিময়ে সে শুধু চেয়েছিল একটু সম্মান, একটু ভালোবাসা, একটু আন্তরিকতা। তার এই আত্মত্যাগের বিনিময়ে এবার সে কি পেল ? অপমান আর অবহেলা। বারপুজোয় না ডাকা মানেই তো বুঝিয়ে দেওয়া তোমাকে আর আমাদের দরকার নেই। রঞ্জনের মনে পড়ল নান্টুদা একদিন বলেছিল, বারপুজোর দিন ক্লাবের সব থেকে নির্ভরযোগ্য খেলোয়াড়দের মাঠে আনতেই হয়। 'যাদের আনা হয় না— বুঝবি তাদের না হলেও ক্লাবের চলে যাবে।'

এতদিনে রঞ্জন তাহলে সেই দলে পড়ল। বারপুজোর দিন তাকে না ডেকে ক্লাব বুঝিয়ে দিল, রঞ্জন সরকার, তোমাকে আর আমাদের দরকার নেই। কথাটা মনে হতেই রঞ্জনের শরীরটা টানটান হয়ে উঠল। রাগে, দুঃখে, অভিমানে ফুঁসে উঠল। এই অপমান সে মুখ বুজে সহ্য করবে না।

সেই মুহূর্তে কলিং বেলটা বেজে উঠল। রঞ্জন বুঝল, স্বপন এসে গেছে।

স্বপন জানেন টোপ খাওয়া মাছ কি ভাবে খেলিয়ে ডাঙায় তুলতে হয়। তাই ঘরে ঢুকেই বললেন, সামান্য ব্যাপার নিয়ে এত মন খারাপ করছ কেন রঞ্জন ?

সামান্য ব্যাপার ? আপনি কি বলছেন স্বপনদা ! এতো বড় অপমান…

দেখো কোন কারণে ভুল বোঝাবুঝিও তো হয়ে থাকতে পারে !

তারপর দুদিন কেটে গেছে স্বপনদা— ওরা আসা তো দূরের কথা কেউ একটা ফোন পর্যন্ত করেনি।

সত্যি ওরা তোমার সঙ্গে উচিত কাজ করেনি !

আপনি বলুন স্বপনদা— এই ক্লাবের জন্য আমি আমার জীবন দিয়েছি। আপনারাই

তো বারবার লক্ষ লক্ষ টাকার অফার দিয়েছেন। আমি ফিরিয়ে দিয়েছি। ওরা যা দিয়েছে তাতেই সন্তুষ্ট ছিলাম। আমায় মাথায় তুলে সবাই নাচুক এ আমি কোনদিন চাইনি। চেয়েছিলাম একটু সম্মান, একটু মর্যাদা। ওরা এবার সেটাও দিল না। উল্টে বুঝিয়ে দিল— আমাকে আর ওদের দরকার নেই।

এখন তুমি কি করতে চাও ?

রঞ্জন ইতস্তত করে। মুখ ফুটে কথাটা বলতে পারে না। ওকে ইতস্তত করতে দেখে স্বপনবাবু বললেন, তুমি যদি আমাদের ক্লাবে আসতে চাও তাহলে তোমায় আমরা মাথায় তুলে নিয়ে যাব। তোমার প্রাপ্য সম্মান তুমি পাবে। আর টাকাকড়ির ব্যাপারে— গত বছর তোমার ক্লাব যা দিয়েছিল তার চেয়ে কম তো দেবই না। বেশি দেবার চেষ্টা করব···

রঞ্জন বাধা দিয়ে বলে উঠল, স্বপনদা টাকার কথা তুলবেন না। আমি টাকার জন্যে দল ছাড়ছি না। আমি··· আমি···

আমি জানি রঞ্জন ! মনে রেখো টাকারও দরকার আছে। ঠিক আছে··· ও ব্যাপারটা আমার ওপর ছেড়ে দাও। তোমায় শুধু একটা কথা জিজ্ঞেস করছি···

কি ?

তুমি মন স্থির করে ফেলেছ তো ? পরে পিছিয়ে আসবে না ? আর একটু ভেবে দেখো। আমি জানি, এ ক্লাব তোমার কাছে কি ! খেলোয়াড় জীবনের অন্তিম লগ্নে পৌঁছে তুমি সেই ক্লাব ছেড়ে দিতে চাইছ। আর একটু ভেবে দেখো। ওরা সত্যিই তোমার সঙ্গে খুব খারাপ ব্যবহার করেছে। এই ভাবে তোমায় অপমান করার কোন অধিকার ওদের নেই। এ অন্যায়···অন্যায়···

স্বপনদার কথা শুনে রঞ্জনের মনের মধ্যে চেপে রাখা রাগটা আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। মুখ চোখ লাল হয়ে উঠল। ও বুঝলো না, ওকে তাতাবার জন্যেই স্বপন ও কথা বলছেন। বলল, না না স্বপনদা আমি ডিসিসান নিয়ে ফেলেছি। এ অপমান আমি সহ্য করবো না। আপনি সব ব্যবস্থা করুন।

ঠিক আছে। আমি একবার ঘোষদার সঙ্গে কথা বলে নিচ্ছি। এবার দলবদলের সময় পিছিয়ে যাওয়ায় দেখছি ভালোই হয়েছে। তুমি প্রথম দিনেই সই কোর। দাঁড়াও ঘোষদার সঙ্গে তোমায় কথা বলিয়ে দিয়ে সব কিছু এখনই ফাইনাল করে ফেলি, কেমন ?

স্বপন উঠে গিয়ে টেলিফোনটা তুলে নিল। কলকাতায় একবারে কোন নম্বরই পাওয়া যায় না। চার পাঁচবার চেষ্টা করার পর স্বপন ঘোষদাকে পেল। স্বপন বলল,

ঘোষদা একটা বড় খবর আছে।

কি ?

রঞ্জন মানে রঞ্জন সরকার আমাদের ক্লাবে আসতে চাইছে।

সত্যি !

হ্যাঁ। ওর সঙ্গে আমার পাকা কথা হয়ে গেছে। আপনি একটু ওর সঙ্গে কথা বলুন।

হ্যাঁ— দাও দাও···

স্বপন রঞ্জনের হাতে টেলিফোনটা ধরিয়ে দিয়ে বলল, ঘোষদা কথা বলবেন।

হ্যালো— রঞ্জনের গলাটা একটু কেঁপে উঠল।

রঞ্জন ভাই কেমন আছ ! ওয়েলকাম টু আওয়ার ক্লাব। আমার স্বপ্ন ছিল তুমি অন্তত একবার আমাদের ক্লাবের জার্সি গায়ে দাও। এতো দিনে সে স্বপ্ন সফল হবে। তোমায় আমরা মাথায় করে রাখব।

রঞ্জনের মুখে খেলে গেল ম্লান হাসি। বলল, আমি কিন্তু টাকার জন্যে দল ছাড়ছি না।

জানি জানি— তুমি সেরকম ছেলে নও। তোমার প্রাপ্য সম্মান তুমি আমাদের ক্লাব থেকে পাবেই। তুমি ভাই স্বপনকে একটু ডেকে দাও।

স্বপনদা তোমায় ডাকছেন।

রঞ্জন টেলিফোনটা এগিয়ে দিল। স্বপন সাড়া দিতেই ওদিক থেকে ঘোষদার গলা ভেসে এল। গলায় চাপা উল্লাস।

স্বপন একদম ফাইনাল করে নাও। টাকার জন্যে ভেবো না। যতো লাগে লাগুক। রঞ্জনকে টেনে নিতে পারলে ওদের মুখে ঝামা ঘষে দেওয়া যাবে। আর শোন ব্যাপারটা একদম চেপে রাখবে। রঞ্জনকেও বলবে, সই করার আগে পর্যন্ত কেউ যেন জানতে না পারে।

ঠিক আছে।

স্বপন রিসিভারটা রেখে দিয়ে রঞ্জনের সামনে গিয়ে বসল। বলল, ঘোষদা বলছেন সই করার আগে পর্যন্ত তোমার দল ছাড়ার কথা কেউ যেন না জানে!

আমিও তাই চাই।

তুমি কবে সই করবে? প্রথম দিনেই···

হ্যাঁ, প্রথম দিনই···

তাই হল। বাংলার ফুটবল সমাজকে বিস্ময়ে হতবাক করে দিয়ে দলবদলের প্রথম দিনই রঞ্জন সরকার দল ছাড়ল। খেলোয়াড় হিসেবে নাম করার পর থেকে এতোদিন যে ক্লাবের সুখ-দুঃখের সঙ্গী ছিল রঞ্জন, তার জীবনের সোনালী দিনগুলো কেটেছে যে ক্লাবে, শত প্রলোভনেও যে কোনদিন দল বদল করার কথা ভাবেনি সেই রঞ্জন সরকার একরাশ অপমান মাথায় নিয়ে সরে এল তার ভালোবাসার ক্লাবটি থেকে।

সঙ্গে সঙ্গে শুরু হলো কাগজে লেখালিখি, রঞ্জন সরকারের দল ছাড়ার কারণ হিসেবে নানা গবেষণা। রঞ্জনের পুরনো ক্লাবের সমর্থকরা ক্ষোভে ফেটে পড়লেন। তাঁরা বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করলেন ক্লাব তাঁবুর সামনে। তাঁদের দাবী রঞ্জন সরকারকে ফিরিয়ে আনতে হবে। জবাব দিতে হবে কেন রঞ্জন সরকার দল ছেড়েছে। খবরের কাগজের রিপোর্টারদের কথা শুনতে হল ক্রীড়া সম্পাদকদের কাছে। কেন এতো বড় খবরটার কোন আঁচ তাঁরা পাননি।

রঞ্জন দলবদল করার খবর ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে টনক নড়েছিল ক্লাব কর্তাদের। তাঁরা রঞ্জনের বাড়ি ছুটোছুটি শুরু করলেন। জনে জনে ফোন করতে আরম্ভ করলেন। রঞ্জন যে সব খেলোয়াড়দের ছোট ভাইয়ের মতো দেখে, ভালোবাসে তাদের লাগানো হল তার মত বদল করানোর জন্যে। কিন্তু তখন বড্ড দেরি হয়ে গেছে। কোথায় রঞ্জন! তার চুলের টিকি পর্যন্ত কেউ দেখতে পেল না। দলবদল করার সঙ্গে সঙ্গেই স্বপন তাকে সরিয়ে দিয়েছে অনেক দূরে। রঞ্জনকে সকলে যখন হন্যে হয়ে খুঁজছে সে তখন সিকিমের পেলিংয়ে পান্ডিম আর কাঞ্চনজঙ্ঘার তুষার শৃঙ্গগুলোর দিকে তাকিয়ে বসে মাউন্ট পান্ডিম হোটেলে তার ঘরে।

স্বপনরা যা চেয়েছিল তাই হল। রঞ্জনকে হারানোর মোক্ষম ধাক্কা খেল তার পুরোনো ক্লাব। আর সে যে ফুরিয়ে যায়নি এ কথাটা প্রমাণ করার জন্যে মরসুমের শুরু থেকেই

দুর্দান্ত খেলতে লাগল রঞ্জন। গোলের পর গোল করতে লাগল।

দেখতে দেখতে এসে গেল রঞ্জনের অগ্নি পরীক্ষার দিন। সল্ট লেক স্টেডিয়ামে দুই বড় দলের প্রথম লড়াই। উত্তেজনায়, উৎসাহে শহর টানটান। দুই প্রধানের লড়াইকে কেন্দ্র করে অনেক বছর পরে কলকাতা আবার মেতে উঠেছে। সল্ট লেকের যুব ভারতী ক্রীড়াঙ্গনে এক লক্ষ কুড়ি হাজার দর্শকের খেলা দেখার ব্যবস্থা। তবু টিকিটের জন্যে হাহাকার পড়ে গেছে। সকলেরই ধারণা একটা দারুণ কিছু ঘটবে। অনেকদিন পরে সত্যিকারের একটা ভালো খেলা দেখা যাবে।

রেডিও, টি ভি, সংবাদপত্রের সাংবাদিকরা ভীষণ ব্যস্ত। এই খেলাটিকে কেন্দ্র করে সারা দেশে যে উৎসাহ আর উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়েছে তার সঙ্গে তাল দিতে তাঁরা হিমসিম খেয়ে যাচ্ছেন। সমস্ত প্রচার সমস্ত জল্পনা-কল্পনার মধ্যমণি কিন্তু রঞ্জন। অবস্থাটা এমন হয়ে দাঁড়িয়েছে— খেলাটা যেন রঞ্জনের সঙ্গে তার পুরোনো দলের লড়াই।

রঞ্জনের মধ্যেও প্রচণ্ড একটা জেদ তাকে টানটান করে তুলেছে। আজ সময় এসেছে সব অপমানের বদলা নেবার। সে যে সত্যিই ফুরিয়ে যায়নি তা প্রমাণ করে দেবার। তার জন্যে সে তৈরি। অপেক্ষা শুধু মাঠে নামার। তবু কোথায় যেন একটু দ্বিধা, একটু আড়ষ্টভাব, চেপে রাখা একটু কষ্ট রঞ্জনকে এক এক সময় বিব্রত করে তুলছে। রঞ্জন নিজেকে বোঝায়, ও তো এ চায়নি। আজকের এই পরিস্থিতি ওর ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। না, এসব দুর্বলতা রঞ্জন পাত্তা দেবে না। যে অবহেলা, যে অপমান ওকে করা হয়েছিল তার বদলা তাকে নিতেই হবে। আজই মাঠে প্রমাণ করে দিতে হবে, নাণ্টুদারা ভুল করেছিল। হ্যাঁ আজই। সময় সে আর পাবে না। যা করার আজই করতে হবে। ঐ এক লক্ষ লোককে সাক্ষী রেখে প্রমাণ করে দিতে হবে— রঞ্জন সরকার সত্যিই ফুরিয়ে যায়নি।

কথাটা মনে হতেই শরীরটা টানটান হয়ে উঠল রঞ্জনের। ও এগিয়ে গেল সল্ট লেকে যাবার জন্যে ক্লাব তাঁবুর সামনে দাঁড়িয়ে থাকা লাক্সারি বাসটার দিকে।

সল্ট লেকের যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে লক্ষ লোকের সামনে দুরন্ত গতিতে চলছে দুই প্রধানের খেলা। রঞ্জনকে সামলাতে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে তার পুরনো দলের রক্ষণভাগের খেলোয়াড়রা। মাত্র একজনকে সামনে রেখে বাকি দশজনকেই ওরা নিচে নামিয়ে এনেছে। দশ জনের সঙ্গে একা লড়ছে রঞ্জন। রঞ্জনের সহ খেলোয়াড়রা ঠিক ভাবে পাল্লা দিতে পারছে না। ওদের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা পাচ্ছে না রঞ্জন। এইভাবে শেষ হল প্রথম অর্ধের খেলা।

দ্বিতীয়ার্ধে খেলার চেহারা পুরোপুরি বদলে গেল। যারা এতক্ষণ দেওয়ালে পিঠ দিয়ে লড়ছিল তারাই এখন রুখে দাঁড়াল। রক্ষণাত্মক মনোভাব ছেড়ে তারা আক্রমণে ঝাঁপিয়ে পড়ল। তাতে সুবিধে অবশ্য রঞ্জনেরই হল। এতক্ষণ ওর পায়ে পায়ে খেলোয়াড় ঘুরছিল। এবার তারা খানিকটা সরে গেছে। তবে ওর পেছনে পুলিশম্যান ঠিকই লেগে রইল। তবু আক্রমণে প্রতি-আক্রমণে খেলাটা রীতিমতো জমে উঠল।

কিন্তু গোল কেউ করতে পারছে না। সময় কেটে যাচ্ছে দ্রুত। রঞ্জন ভাল খেলছে ঠিকই কিন্তু ও যেভাবে জ্বলে উঠতে চেয়েছিল তা এখনও পারেনি। অথচ এই সুযোগ সে নষ্ট করতে চায় না। সে জানে দু দলের সমর্থকদের নজর এখনও ওর ওপরেই আছে। তাই যা করার তা এখনই করতে হবে।

রঞ্জন নিচে নেমে এল। নিজেদের হাফলাইনেরও নিচে। ঠিক সেই সময় ওদের গোলরক্ষক একটা বল পেয়ে ওর দিকে ছুঁড়ে দিল। রঞ্জন যেন অপেক্ষাতেই ছিল। বলটা ধরে নিয়েই দুলকি চালে এগিয়ে চলল সে। ওকে বাধা দিতে তিনজন খেলোয়াড় আসছে দেখেই বলটা ঠেলে দিল সমরের দিকে। সঙ্গে সঙ্গে নিজে চলে এল অপেক্ষাকৃত ফাঁকা জায়গায়। সমর বলটা নিয়ে ক'পা গিয়েই সেই ফাঁকা জায়গার দিকে কোনাকুনি বাড়িয়ে দিয়েই গোলের দিকে এগোতে লাগল। রঞ্জন বলটা ধরে দুজনকে কাটিয়ে পেনাল্টি সীমানার কাছাকাছি এসেই সমরের মাথা লক্ষ্য করে লব করল। সমর হেড দিয়ে বলটা ভাসিয়ে দিল গোলের দিকে। চকিতে রঞ্জন ঘুরে গেল। ওর মুখ তখন নিজেদের গোলের দিকে। ওকে কেউ লক্ষ করেনি। সেই সুযোগটা নিল রঞ্জন। বলটা ওর কাছে ভেসে আসতেই ব্যাক ভলি করল। কেউ কিছু বোঝার আগে বলটা বুলেটের মতো ছুটে গিয়ে ঢুকে গেল গোলে।

ব্যাপারটা কি হল বুঝতে একটু সময় লাগল সমর্থকদের। তারপর সারা মাঠ ফেটে পড়ল উল্লাসে। দলের খেলোয়াড়রা তখন রঞ্জনকে নিতে মেতে উঠেছে। আর ওদিকে যুব ভারতীর গ্যালারি বাজি আর পটকার শব্দে গমগম করে উঠলো।

একটু পরেই খেলা শেষ হয়ে গেল। সে যে ফুরিয়ে যায়নি এ কথা প্রমাণ করে, সব অপমান অবহেলার বদলা নিয়ে রঞ্জন সরকার ফিরে এল সাজঘরে।

মাথা নিচু করে সাজঘরে ঢুকে এক কোণে একটা চেয়ারে বসে পড়ল। কই সে রকম আনন্দ তো হচ্ছে না তার? সাজঘরে তাকে নিয়েই হৈ চৈ চলছে। কেউ একজন এসে ওর হাতে কোল্ড ড্রিঙ্কসের একটা বোতল ধরিয়ে দিয়ে গেল। হাত বাড়িয়ে নিল রঞ্জন। মুখে তুলল না। কি রকম যেন একটা কষ্ট, একটা চাপা বেদনা ওকে ধীরে ধীরে আচ্ছন্ন করে ফেলছিল। এই হৈ চৈ, এই উল্লাস, এই অভিনন্দন ওর ভাল লাগছিল না। সাংবাদিকরা তখন কোচের সঙ্গে কথা বলছেন। ওর সঙ্গেও কথা বলতে চান ওঁরা। ওঁরা কি জিজ্ঞেস করবেন তাও জানা রঞ্জনের। কিন্তু ওঁদের সত্যি কথা তো বলতে পারবে না সে। স্বপনদাকে বলে ও পাশের ঘরে চলে এল। দু হাতে মুখ ঢেকে শুয়ে পড়ল একটা বেঞ্চিতে।

রঞ্জন অবাক হয়ে অনুভব করল— ওর দু চোখ দিয়ে অঝোরে জল ঝরছে। পনেরো বছরের সম্পর্ক ত্যাগ করে আজ সে এ ক্লাবে এলেও সব অপমান, সব অবহেলার বদলা নেবার মুহূর্তে রঞ্জন হেরে গেল। নিজের কাছে। কেঁদে উঠল রঞ্জন। দু হাতে মুখ ঢেকে কাঁদছে রঞ্জন সরকার। কাঁদছে, শুধু কাঁদছে। কিছুতেই সে নিজেকে সামলাতে পারছে না। পয়লা বৈশাখে বারপুজোয় তাকে না ডাকার অপমানে যে কষ্টটা দলা পাকিয়ে এতদিন ওর কণ্ঠার কাছে আটকে ছিল আজ সেই কষ্ট, সেই জ্বালা চোখের জল হয়ে ভাসিয়ে নিয়ে গেল স্ট্রাইকার রঞ্জন সরকারকে।

খেলার মাঠে

পরিমল গোস্বামী

সমস্ত সন্ধ্যাটা কলকাতার ময়দান বিপুল এক যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হল। দু-তিন লাখ লোকের চিৎকার, হাতাহাতি, ছোরা মারা, ঘোড়া-পুলিসের আক্রমণ, অশ্রুবোমা ফাটা এবং শেষ পর্যন্ত মিলিটারির আবির্ভাবে যুদ্ধবিরতি।

বাক্যযুদ্ধের জের তখনও চলছে।

ইস্টবেঙ্গলের সমর্থনকারীরা বলছে, আমরা অন্যায় সহ্য করব না। যদি দলে লোক ঘাটতি পড়ে তা হলে পূর্ববঙ্গের বাকি হিন্দুরাও আশ্রয়প্রার্থী হবে এসে এই শহরে।

পশ্চিমবঙ্গীরা বলল, আমরা অন্যায় সহ্য করব না। সংখ্যাধিক্যের দরকার হলে আমরা বিহারের বাংলাভাষী অংশ যেমন করে হোক পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে যুক্ত করব।

পুলিস বলল, আমরা অন্যায় সহ্য করব না। দরকার হলে মিলিটারির সাহায্য নেব।

ময়দানের খেলোয়াড়রা বলল, আমরা অন্যায় সহ্য করব না। দরকার হলে আমরা খেলা বন্ধ করব।

কলকাতা শহরের চল্লিশ লাখ অধিবাসী সমস্বরে বলল, সে অন্যায় আবার আমরা সহ্য করব না— খেলা বন্ধ হলে আমাদের জাতীয় অধঃপতনের আর বাকি থাকবে কি?

দার্শনিক বলল, তোমরা খেলার নামে বড্ড বাড়াবাড়ি করছ, দেশের দুর্দশার দিকে ফিরে চাইছ না— জীবনটাকে খেলা মনে করছ, কিন্তু জেনো জীবন খেলা নয়।

শহরবাসীরা বলল, আমরা কখনো মনে করি না যে "জীবন খেলা।" আমরা এর উলটোটা সত্য বলে জানি— অর্থাৎ আমাদের "খেলাই জীবন।"

পুলিস বলল, খেলায় বাধা নেই, কিন্তু খেলার মাঠে মারামারি হতে দেব না।

দর্শকেরা বলল, ঠেকাবে কি করে? জীবনের সকল দিকেই একটা রোমাঞ্চের স্বাদ পেয়ে গিয়েছি আমরা, সে স্বাদ থেকে আমাদের আর কেউ বঞ্চিত করতে পারে না। এ স্বাদ পেয়েছি আমরা চোরাবাজারে, পেয়েছি ঘুস নেওয়ায়, পেয়েছি পরীক্ষার হলে বই থেকে টোকায়, পেয়েছি বিনা টিকিটে ভ্রমণে, পেয়েছি মুনাফা শিকারে। তোমরাও পেয়েছ অশ্রুবোমা নিক্ষেপে, পেয়েছ গুলি ছোঁড়ায়— সুতরাং আমাদের মারামারি করতে দাও, আমরা অবাধে তোমাদের গুলি চালাতে দিচ্ছি।

সরকার পক্ষ থেকে খেলোয়াড়দের এ বিষয়ে মতামত চাওয়া হল। খেলোয়াড়রা ক্ষোভের সঙ্গে বলল, আমাদের কোনো মত নেই। আমরা কতকগুলো পশু, আমাদের বেঁধে এনে মাঠে ছেড়ে দেওয়া হয় লক্ষ লক্ষ লোকের স্ফূর্তির জন্যে। যেমন লোকে ষাঁড়ের লড়াই দেখে, মুরগীর লড়াই দেখে, আমাদের খেলাও লোকে সেইভাবে উপভোগ

করে আর আমাদের অবস্থাও ঠিক পশুর মতোই। খেলা শুরু হলে কয়েক মিনিটের মধ্যেই প্রতিপক্ষীয় দুইদল দর্শক আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে— আর সেজন্যে আমাদের ক্ষতি হয় দুভাবে। প্রথমত আমাদের মানুষের সম্মান দেওয়া হয় না, দ্বিতীয়ত খেলার মাঝখানে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে আমাদের অন্তরস্থিত খেলোয়াড়ি মনের অপমৃত্যু ঘটে। তাই আমরা দর্শকদের কথা না ভেবে এখন আমাদের কথাই ভাবছি এবং মনে করেছি আমরা খেলা বন্ধ করে দেব।

খেলোয়াড় দল সত্যই বেঁকে দাঁড়াল। তারা আর খেলবে না এই তাদের পণ। তারা নিজেরা মৃত্যুপণ করে লক্ষ লক্ষ লোকের স্ফূর্তি দিয়েছে, এখন আর তারা তা পারবে না।

এ অতি মারাত্মক কথা! খেলা বন্ধ হলে যে লোকেরা ক্ষেপে গিয়ে সমস্ত শহরটাই যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত করবে। দেশ অরাজক হয়ে উঠবে। দেশের দুঃখ দুর্দশা ভুলে থাকার যে এটাই একমাত্র পথ। খেলার মাঠ যে আমাদের ইহলৌকিক অস্তিত্বের সকল অভিশাপ হরণ করে নেয়! খেলার মাঠে দর্শকেরা ক্ষেপে যায়, কিন্তু সে ক্ষেপা কীর্তনের আসরের ক্ষেপার মতো— আধ্যাত্মিক ক্ষেপা। এই ক্ষিপ্ততা যদি সর্বত্র ব্যাপ্ত হয় তা হলে তার পরিণাম কি হবে কল্পনাই করা যায় না যে!

পুলিস বলল, (সরকারের নির্দেশে) আমরা তোমাদের রক্ষার ভাল বন্দোবস্ত করব। তাতে তোমরা নিরাপদে খেলতে পারবে।

দর্শকেরা দিল এ কথার উত্তর। তারা বলল, তোমরা তা পারবে না।

কেন?

কারণ আমাদের মধ্যে মারামারি নিয়ে যে একতা গড়ে উঠেছে তা ভাঙা তোমাদের সাধ্য নয়। আর মারামারি শুরু হলে তার উত্তাপ খেলোয়াড়দের গায়ে লাগবেই। তবে কামান দেগে কিংবা আকাশ থেকে বোমা ফেলে সব উড়িয়ে দিতে পার, কিন্তু তাতে তো খেলোয়াড় এবং দর্শক দুইই ধ্বংস হবে, তোমাদের মূল উদ্দেশ্য সফল হবে না।

খেলোয়াড়রা বলল, আমরাই খেলা ছাড়ব।

খেলোয়াড়দের এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞার কথা শহরের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সবার মুখে একটা আতঙ্কের ছায়াপাত হল। সরকারও অত্যন্ত বিব্রত বোধ করল। যারা দিন-রাত অভাবের দায়ে শহরকে নরকতুল্য করছে তাদের নিয়ে এখন কি হবে? সুতরাং এতবড় একটা তীর্থক্ষেত্র হঠাৎ নষ্ট হয়ে যাবে এ এক মহাদুশ্চিন্তার বিষয়। অথচ খেলোয়াড়দের অভিযোগও অস্বীকার করা যায় না। তারা এতকাল আত্মত্যাগ করে আসছে অপরের স্ফূর্তিবিধানের জন্যে, আজ যদি তারা বলে তারা চিরদিনের অভ্যাস ও ঐতিহ্য বজায় রেখে আত্মহত্যা করতে বরঞ্চ রাজি আছে, কিন্তু অন্যের হাতে মার খেতে রাজি নয়, তবে তাদের দোষ দেওয়া যায় না। যদি তারা বলে এখন তারা একটু আরাম চায়, তা-হলে সে সুযোগ তাদের দিতেই হবে। যদি তারা বলে খেলার মতো কঠিন কাজে তারা এতদিন অন্তত এই তৃপ্তি পেয়েছে যে, খেলা চলা অবস্থায় কোনো দর্শকের হস্তক্ষেপ তারা সহ্য করে নি—প্রাণপণে নিজ নিজ কৌশলে খেলে যেতে পেরেছে, তবে তারা সত্য কথাই বলেছে। খেলার শুরুতে মনের মধ্যে যে গতি জেগে ওঠে তা সার্থক হয় খেলা শেষের শেষ বাঁশির সঙ্গে। মাঝখানের বাঁশিতে মাঝে মাঝে খেলার গতি ফেরে কিন্তু তবু সেটা খেলারই অঙ্গ। কিন্তু খেলার মাঝখানে দর্শকের হস্তক্ষেপে মনের উপর ভয়ানক প্রতিক্রিয়া হয়। এ তারা কিছুতে সহ্য করবে না।

সুতরাং সরকার থেকে এর প্রতিকার হওয়া চাইই। কিন্তু কেমন করে?

পরামর্শ সভা বসেছে সরকারের তরফ থেকে। বে-সরকারি মাথাওয়ালাদের ডাকা হয়েছে সে সভায়। খেলোয়াড়দের কি করে রক্ষা করা যায় এই হল প্রশ্ন। খেলার সময় যে দাঙ্গা বাধে তা থামানো যাবে না, এটা ধরেই নেওয়া হয়েছে। থামানো উচিতও নয়। কারণ দাঙ্গার পক্ষে ওটা একটা নিরাপদ স্থান। সবকাব আশা করে এই যে দাঙ্গা নিয়মিত চললে দাঙ্গাক্ষেত্রের চতুর্দিকে খুব উঁচু করে একটি মঞ্চ গড়া চলবে এবং যারা খেলা দেখতে রাজি নয় কিন্তু দাঙ্গা দেখতে রাজি, তাদের কাছে বহু টাকার টিকিট বিক্রি করা যাবে। আর দাঙ্গা ক্ষেত্রের সমস্ত টিকিট বিক্রির টাকা সরকারের হাতে আসাতে স্বাধীন ভারতে এই হবে আমাদের প্রথম ন্যাশন্যালাইজেশন অব স্পোর্টস রায়টিং—ক্রীড়া দাঙ্গার জাতীয়করণ।

এরূপ অবস্থায় এখন যদি শুধু খেলোয়াড় এবং রেফারীদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা যায়, তা হলে দুটো উদ্দেশ্যই একযোগে সিদ্ধ হতে পারে। উপস্থিত বুদ্ধিমানদের মধ্যে কে এই ভাব নিতে পারেন তাঁকে সরকার তরফ থেকে আহ্বান করা হল।

অনেকে অনেক রকম কৌশলের কথা বললেন। তার মধ্যে একজন বললেন খেলার মাঠ কাঁটা তারের জাল দিয়ে ঘেরা হোক, কিন্তু আলোচনাব পর দেখা গেল তা সম্ভব নয়, কাবণ ক্ষিপ্ত দর্শকেরা জাল বেয়ে উঠে ভিতরে লাফিয়ে পড়বে।

তখন ঠিক হল উপরের দিকেও জাল দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। কিন্তু এখানেও বাধা আছে। কাবণ অনেক খেলোয়াড়ের হাই শট আধ মাইল পর্যন্ত উঁচুতে ওঠে। এতটা উঁচু ফ্রেম তৈরি করতে কয়েক বছর লেগে যাবে, খরচও হবে বেশি। তা ছাড়া অত ইস্পাত।

একজন বললেন, পাবমিট পেলে—

কিন্তু সবাই একযোগে বলে উঠলেন, এদেশে ওরকম জাল তৈরি হওয়া অসম্ভব এবং বিদেশে অর্ডাব দিলে স্টার্লিং ব্যালান্সের যেটুকু পাওনা তা ওতেই শেষ হবে যাবে। একমাত্র মার্শাল প্ল্যানে যদি কেন্দ্রীয় সরকারকে রাজি করানো যায়…।

কিন্তু তা আদৌ সম্ভব কিনা সে বিষয়ে ষণ্মুখম চেট্টির পরামর্শ চাওয়া হল এবং কয়েক দিনেব মধ্যেই এর সম্ভাবনার আভাসও তিনি দিলেন, কিন্তু একজন মন্তব্য করলেন, যে ব্যক্তির ছটি মুখ তাঁর এক মুখের কথার কোনো দাম নেই, এবং কদিন পরে তাঁর পদত্যাগে এ কথার সত্যতা আরও প্রমাণিত হল।

অতএব বিদেশের অপেক্ষায় না থেকে এবং বহু ব্যয়সাপেক্ষ দীর্ঘ-বিলম্বিত পরিকল্পনার আশ্রয় না নিয়ে অবিলম্বে কিছু করার জন্যে সরকার তরফ থেকে চাপ দেওয়া হল, এবং এই চাপে বেরিয়ে এলেন এক বিখ্যাত ওস্তাদ। সমস্ত জটিল ও দুরূহ কাজকে সরল পন্থায় সমাধা করায় ইনি অতি নিপুণ। ইনি তাঁরই শিষ্য যিনি মৃত্যুর পর বাহকদের ঘাড়ে শ্মশানঘাটে যাবার সময় হঠাৎ খাটিয়া থেকে মাথা তুলে বলেছিলেন, খাটিয়াতে একটি চাকা লাগিয়ে নিলে দুজন লোকের পরিশ্রম বাঁচতে পারত।

তিনি এসে বললেন, পথ পেয়েছি। এর জন্যে লাগবে মাত্র হাজার তিনেক টাকা আর দিন পনেরো সময়। ইতিমধ্যে আপনারা দাঙ্গা দেখার জন্যে টিকিট বিক্রির ব্যবস্থা করতে পারেন।

মাত্র তিন হাজার টাকায় এবং মাত্র পনেরো দিনে এতবড় সঙ্কট পার হওয়া যাবে শুনে সবাই উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। ওস্তাদকে তৎক্ষণাৎ তিন হাজার টাকা দেওয়া হল, তিনি বললেন, পনেরো দিন পরে ক্যালকাটা গ্রাউন্ডে যে খেলা আছে সেই খেলায় এর পরীক্ষা হবে।

পনেরো দিন পরে ক্যালকাটা গ্রাউন্ডে বিরাট ভিড়। মোহনবাগান ইস্টবেঙ্গলের খেলা। কিন্তু খেলা চলেছিল মাত্র পাঁচ মিনিট। এই সময় মোহনবাগানের পক্ষে ফাউল হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে ক্রীড়াক্ষেত্র যথারীতি যুদ্ধক্ষেত্র পরিণত হয়। পুরো একঘণ্টা দাঙ্গার পর যখন দাঙ্গাকারীদের শক্তি অনেকটা কমে এসেছে তখন আবিষ্কার করা গেল উভয়পক্ষের বাইশজন খেলোয়াড় এবং রেফারি গ্যালারির সঙ্গে নব-নির্মিত একটি ছোট্ট ইস্পাতের জালের খাঁচার মধ্যে নিরাপদে দাঁড়িয়ে দাঙ্গা উপভোগ করছে। তারা চিৎকার করে সবাইকে উৎসাহ দিচ্ছে— স্ফূর্তিতে তারা উন্মাদ হয়ে উঠেছে। এতকাল পরে তারা খেলতে গিয়ে দর্শকের স্থান গ্রহণ করে আনন্দে অভিভূত হয়ে পড়েছে। ভোগ্য স্বয়ং ভোক্তা হয়েছে এ এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা। দাঙ্গার উৎসাহ নিবে এসেছে, কিন্তু খেলোয়াড়দের উৎসাহ তখনও নেবেনি। তারা বলছে, এই খাঁচা এক অদ্ভুত আবিষ্কার। আবিষ্কর্তা নোবেল প্রাইজ পাবার যোগ্য।

কৌশলটি খুব সহজ মনে হলেও মূল পরিকল্পনাটা সহজ নয়। আবিষ্কারের পর সব জিনিসকেই এই রকম সহজ মনে হয়! এই আবিষ্কারের মূল্য এইখানে যে এতে খেলা বন্ধ হবে না, দুচার মিনিট বা আরও বেশি সময় অথবা কখনো পুরো সময় ধরেই খেলা হতে পারবে এবং বাইরে থেকে বাধা না থাকাতে দাঙ্গা বাধবে আরও সহজে। তা ছাড়া সরকারপক্ষে এর থেকে আয়ের অংশটাই সর্বাপেক্ষা লোভনীয়। লক্ষ লক্ষ লোকের দাঙ্গা নিরাপদে দেখার ব্যবস্থা করে দিলে টিকিট বিক্রির টাকা থেকে বাংলা দেশের চেহারা ফিরিয়ে দেওয়া যাবে— অবশ্য যদি টাকা ঠিকমতো সরকারের তহবিল পর্যন্ত পৌঁছায়।

এই অতি মূল্যবান আবিষ্কারের জন্যে ওস্তাদকে অভিনন্দন জানাবার ব্যবস্থা হয়েছিল এবং কথা হয়েছিল নোবেল কমিটিতে এঁর নাম প্রস্তাব করে পাঠানো হবে। কিন্তু ওস্তাদ দুটোতেই আপত্তি জানিয়ে বলেছেন, তিনি নিজে এজন্যে পুরো কৃতিত্ব দাবি করেন না। কারণ বাংলা ভাষায় একমাত্র বৈজ্ঞানিক কবিতা "জুতা আবিষ্কার" থেকে তিনি এই পরিকল্পনাটি পেয়েছেন, এবং ঐ বৈজ্ঞানিক কবিতার লেখক ইতিপূর্বে নোবেল প্রাইজ পেয়ে গেছেন।

বেদেনী

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

শম্ভু বাজিকর এ মেলায় প্রতি বৎসর আসে। তাহার বসিবার স্থানটা মা কঙ্কালীর এস্টেটের খাতায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মত কায়েমী হইয়া গিয়াছে। লোকে বলে, বাজি ; কিন্তু শম্ভু বলে, 'ভোজবাজি—ছারকাছ'। ছোট তাঁবুটার প্রবেশপথের মাথার উপরেই কাপড়ে আঁকা একটা সাইনবোর্ডেও লেখা আছে 'ভোজবাজি—সার্কাস'। লেখাটার এক পাশে একটা বাঘেব ছবি, অন্যপাশে একটা মানুষ, তাহার এক হাতে রক্তাক্ত তলোয়ার, অপর হাতে একটা ছিন্নমুণ্ড। প্রবেশমূল্য মাত্র দুই পয়সা। ভোজবাজি অর্থে 'গোলকধামে'র খেলা। ভিতরে পট টাঙাইয়া কাপড়ের পর্দায় শম্ভু মোটা লেন্স লাগাইয়া দেয়, পল্লীবাসীরা বিমুগ্ধ বিস্ময়ে সেই লেন্সের মধ্য দিয়া দেখে 'আংরেজ লোকের যুদ্ধ', 'দিল্লীকা বাদশা', 'কাবুলকে পাহাড়', 'তাজবিবিকা কবর', তারপর শম্ভু লোহার রিং লইয়া খেলা দেখায়, সর্বশেষে একটা পর্দা ঠেলিয়া দেখায় খাঁচায় বন্দী একটা চিতাবাঘ। বাঘটাকে বাহিরে আনিয়া তাহার উপর শম্ভুর স্ত্রী রাধিকা বেদেনী চাপিয়া বসে, বাঘের সম্মুখের থাবা দুইটা ধরিয়া টানিয়া তুলিয়া আপন ঘাড়ের উপর চাপাইয়া মুখোমুখি দাঁড়াইয়া বাঘটা চুমা খায়, সর্বশেষে বাঘটার মুখের ভিতর আপনার প্রকাণ্ড চুলের খোঁপাটা পুরিয়া দেয়, মনে হয়, বাথাটাই বাঘের মুখের মধ্যে পুরিয়া দিল। সরল পল্লীবাসীরা স্তম্ভিত বিস্ময়ে নিশ্বাস রুদ্ধ করিয়া দেখিতে দেখিতে করতালি দিয়া উঠে। তাহার পরই খেলা শেষ হয়, দর্শকের দল বাহির হইয়া যায়, সর্বশেষ দর্শকটির সঙ্গে শম্ভুও বাহির হইয়া আসিয়া আবার তাঁবুর দুয়ারে জয়ঢাকটা পিটিতে থাকে—দুম, দুম, দুম। জয়ঢাকের সঙ্গে স্ত্রী বাধিকা বেদেনী প্রকাণ্ড একজোড়া করতাল বাজায়, ঝন-ঝন-ঝন।

মধ্যে মধ্যে শম্ভু হাঁকে, বড় বাঘ ? ওই বড় বা—ঘ।

বেদেনী প্রশ্ন করে, বড় বাঘ কি করে ?

—পক্ষীরাজ ঘোড়া হয়, মানুষের চুমা খায়, জ্যান্ত মানুষের মাথা মুখের মধ্যে পোরে, কিন্তু খায় না।

কথাগুলো শেষ করিয়াই সে ভিতরে গিয়া বাঘটাকে একটা তীক্ষ্ণাগ্র অঙ্কুশ দিয়া খোঁচা মারে, সঙ্গে সঙ্গে বাঘটা বার বার গর্জন করিতে থাকে। তাঁবুর দুয়ারের সম্মুখে সমবেত জনতা ভীতিপূর্ণ কৌতূহল স্পন্দিত বক্ষে তাঁবুর দিকে অগ্রসর হয়।

দুয়ারের পাশে দাঁড়াইয়া বেদেনী দুইটি করিয়া পয়সা লইয়া প্রবেশ করিতে দেয়।

এ ছাড়া বেদেনীর নিজের খেলা আছে। তাহার আছে একটা ছাগল, দুইটা বাঁদর আর

গোটাকয়েক সাপ। সকাল হইতেই সে আপনার ঝুলি ঝাঁপি লইয়া গ্রামে বাহির হয়, গৃহস্থের বাড়ি বাড়ি খেলা দেখাইয়া, গান গাহিয়া উপার্জন করিয়া আনে।

এবার শম্ভু কঙ্কালীর মেলায় আসিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল। কোথা হইতে আর একটা বাজির তাঁবু আসিয়া বসিয়া গিয়াছে। তাহার জন্য নির্দিষ্ট জায়গাটা অবশ্য খালিই পড়িয়া আছে, কিন্তু এ বাজির তাঁবুটা অনেক বড় এবং কায়দাকরণেও অনেক অভিনবত্ব আছে। বাহিরে দুইটা ঘোড়া, একটা গরুর গাড়ির উপর প্রকাণ্ড একটা খাঁচা রহিয়াছে, নিশ্চয় উহাতে বাঘ আছে!

গরুর গাড়ি তিনখানা নামাইয়া শম্ভু নূতন তাঁবুর দিকে মর্মান্তিক ঘৃণায় হিংস্র দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিল, তারপর আক্রোশভরা নিম্নকণ্ঠে বলিল, শালা!

তাহার মুখ ভীষণ হইয়া উঠিল। শম্ভুর সমগ্র আকৃতির মধ্যে একটা নিষ্ঠুর হিংস্র ছাপ যেন মাখানো আছে। ক্রুর নিষ্ঠুরতা-পরিব্যঞ্জক একধারার উগ্র তামাটে রং আছে—শম্ভুর দেহবর্ণ সেই উগ্র তামাটে ; আকৃতি দীর্ঘ, সর্বাঙ্গে একটা শ্রীহীন কঠোরতা, মুখে কপালের নীচেই নাকে একটা খাঁজ, সাপের মত ছোট গোল চোখ, তাহার উপর সম্মুখের দুইটা দাঁত কেমন বাঁকা হিংস্র ভঙ্গিতে অহরহ বাহিরে জাগিয়া থাকে। হিংসায় ক্রোধে সে আরও ভয়াবহ হইয়া উঠিল।

রাধিকাও হিংসায় ক্রোধে, ধারালো ছুরি যেমন আলোকের স্পর্শে চকমক করিয়া উঠে তেমনই ঝকমক করিয়া উঠিল ; সে বলিল, দাঁড়া বাঘের খাঁচায় দিব গোক্ষুরাব ডেঁকা ছেড়্যা!

রাধার উত্তেজনার স্পর্শে শম্ভু আরও উত্তেজিত হইয়া উঠিল, সে ক্রুদ্ধ দীর্ঘ পদক্ষেপে অগ্রসর হইয়া নূতন তাঁবুটার ভিতর ঢুকিয়া বলিল, কে বেটে, মালিক কে বেটে?

কি চাই? তাঁবুর ভিতরের আর একটা ঘরের পর্দা ঠেলিয়া বাহির হইয়া আসিল একটি জোয়ান পুরুষ, ছয় ফিটেরও অধিক লম্বা, শরীরের প্রতি অবয়বটি সবল ও দৃঢ়, কিন্তু তবুও দেখিলে চোখ জুড়াইয়া যায় ; লম্বা হাল্কা দেহ, 'তাজী' ঘোড়ায় যেমন একটি মনোরম লাবণ্য ঝকমক করে—লোকটির হাল্কা অথচ সবল দৃঢ় শরীরে তেমনই একটি লাবণ্য আছে। রং কালোই, নাকটি লম্বা, টিকালো চোখ দুইটি সাধারণ, পাতলা ঠোঁট দুইটির উপর তুলি আঁকা গোঁফের মত এক জোড়া গোঁফ সূচ্যগ্র করিয়া পাক দেওয়া, মাথায় বাবরি চুল, ঝুলানো একটি সোনার ছোট চৌকো তক্তি ;—সে আসিয়া শম্ভুর সম্মুখে দাঁড়াইল! দুজনেই দুজনকে দেখিতেছিল।

কি চাই?—নূতন বাজিকর আবার প্রশ্ন করিল, কথার সঙ্গে সঙ্গে মদের গন্ধে শম্ভুর নাকের নীচের বায়ুস্তর ভুরভুর করিয়া উঠিল।

শম্ভু খপ করিয়া ডান হাত দিয়া তাহার বাঁ হাতটা চাপিয়া ধরিল, বলিল, এ জায়গা আমার। আমি আজ পাঁচ বৎসর এইখানে বসছি।

ছোকরাটিও খপ করিয়া আপন ডান হাতে শম্ভুর বাঁ হাত চাপিয়া ধরিয়া মাতালের হাসি হাসিল, বলিল, সে হবে, আগে মদ খাও টুক্‌চা।

শম্ভুর পিছনে জলতরঙ্গ বাদ্যযন্ত্রে দ্রুততম গতিতে যেন গৎ বাজিয়া উঠিল, রাধিকা কখন আসিয়া শম্ভুর পিছনে দাঁড়াইয়াছিল, সে খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল, বলিল, কটি বোতল আছে তুমার নাগর—মদ খাওয়াইসা?

ছোকরাটি শম্ভুর মুখ হইতে পিছনের দিকে চাহিয়া রাধিকাকে দেখিয়া বিস্ময়ে মোহে

কথা হারাইয়া নির্বাক হইয়া গেল। কালো সাপিনীর মত ক্ষীণতনু দীর্ঘাঙ্গিনী বেদেনীর সর্বাঙ্গে যেন মাদকতা মাখা ; তাহার ঘন কুঞ্চিত কালো চুলে, চুলের মাঝখানে সাদা সূতার মত সিঁথিতে তাহার ঈষৎ বঙ্কিম নাকে, টানা অর্দ্ধনিমীলিত ভঙ্গির মদিরদৃষ্টি দুটি চোখে, সূচালো চিবুকটিতে—সর্বাঙ্গে মাদকতা। সে যেন মদিরার সমুদ্রে সদ্য স্নান করিয়া উঠিল ; মাদকতা তাহার সর্বাঙ্গ বাহিয়া ঝরিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে। মহুয়াফুলের গন্ধ যেমন নিশ্বাসে ভরিয়া দেয় মাদকতা, বেদেনীর কালো রূপও তেমনই চোখে ধরাইয়া দেয় নেশা। শুধু রাধিকারই নয়, এই বেদে জাতের মেয়েদের এটা একটা জাতিগত রূপ বৈশিষ্ট্য। রাধিকার রূপের মধ্যে একটা প্রতীকের সৃষ্টি করিয়াছে ; কিন্তু মোহময় মাদকতার মধ্যে আছে ক্ষুরের মত ধারের ইঙ্গিত, চারিত্রিক হিংস্র তীক্ষ্ণ উগ্রতার আভাস, মোহমত্ত পুরুষকেও থমকিয়া দাঁড়াইতে হয় : ভয়ের চেতনা জাগাইয়া তোলে, বুকে ধরিলে হৃৎপিণ্ড পর্যন্ত ছিন্নভিন্ন হইয়া যাইবে।

রাধিকার খিল খিল হাসি থামে নাই, সে নূতন বাজিকরের বিস্ময়বিহ্বল নীরব অবস্থা দেখিয়া আবাব বলিল,—ব্যাক হর‍্যা গেল যে নাগরের ?

বাজিকর এবার হাসিয়া বলিল. বেদের বাচ্চা গো আমি। বেদের ঘরে মদের অভাব ! এস।

কথা সত্য, এই অদ্ভুত জাতটি মদ কখনও কিনিয়া খায় না। উহারা লুকাইয়া চোলাই করে, ধরাও পড়ে, জেলেও যায়, কিন্তু তা বলিয়া স্বভাব কখন ছাড়ে না। শাসন-বিভাগের নিকট পর্যন্ত ইহাদের এ অপরাধটা অতি সাধারণ হিসাবে লঘু হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

শম্ভুর বুকখানা নিঃশ্বাসে ভবিয়া এতখানি হইয়া উঠিল। আহ্বানকারীও তাহার স্বজাতি ; নতুবা—। সে রাধিকাব দিকে ফিরিয়া কঠিন দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল, তুই আইলি কেনে এখেনে ?

বাধিকা এবারও খিল খিল করিয়া হাসিয়া বলিল, মরণ তুমার ! আমি মদ খাব নাই ?

তাঁবুর ভিতরে ছোট একটা প্রকোষ্ঠের মধ্যে মদের আড্ডা বসিল। চারিদিকে পাখির মাংসের টুকবা টুকবা হাড়ের কুচি ও একরাশি মুড়ি ছড়ইয়া পড়িয়া আছে ; একটা পাতায় এখনও খানিকটা মাংস, আর একটায় কতকগুলা মুড়ি, পেঁয়াজ, লঙ্কা, খানিকটা নুন ; দুইটি খালি বোতল গড়াইতেছে, একটা বোতল অর্ধসমাপ্ত। বিস্রস্তবাসা একটি বেদের মেয়ে পাশেই নেশায় অচেতন হইয়া পড়িয়া আছে, মাথাব চুল ধূলায় রুক্ষ, হাত দুইটি মাথার উপর দিয়া উর্ধ্ববাহুর ভঙ্গিতে মাটির উপর লুণ্ঠিত, মুখে তখনও মদের ফেনা বুদ্বুদের মত লাগিয়া রহিয়াছে। হৃষ্টপুষ্ট শান্তশিষ্ট চেহারার মেয়েটি।

রাধিকা তাহাকে দেখিয়া আবার খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল ! বলিল, তুমার বেদেনী ? ই যি কাটা কলাগাছের পারা পড়েছে গো !

নূতন বাজিকর হাসিল, তারপর সে স্খলিতপদে খানিকটা অগ্রসর হইয়া একটা স্থানের আলগা মাটি সরাইয়া দুইটা বোতল বাহির করিয়া আনিল।

মদ খাইতে খাইতে কথা যাহা বলিবার বলিতেছিল নূতন বাজিকর আর রাধিকা।

শম্ভু মত্ততার মধ্যেও গম্ভীর হইয়া বসিয়া ছিল। প্রথম পাত্র পান করিয়াই রাধিকা বলিল, কি নাম গো তুমার বাজিকর ?

নূতন বাজিকর কাঁচা লঙ্কা খানিকটা দাঁতে কাটিয়া বলিল, নাম শুনলি গালি দিবা আমাকে বেদেনী।

কেনে ?

নাম বটে কিষ্টো বেদে।

তা গালি দিব কেনে ?

তুমার নাম যে রাধিকা বেদেনী, তাই বুলছি।

রাধিকা খিল খিল করিয়া হাসিয়া গড়াইয়া পড়িল, পরক্ষণেই সে আপনার কাপড়ের ভিতর হইতে ক্ষিপ্র হস্তে কি বাহির করিয়া নূতন বাজিকরের গায়ে ছুঁড়িয়া দিয়া বলিল, কই কালিয়াদমন কর দেখি কিষ্টো, দেখি !

শম্ভু চঞ্চল হইয়া পড়িল ; কিষ্টো বেদে ক্ষিপ্র হাতে আঘাত করিয়া সেটাকে মাটিতে ফেলিয়া দিল। একটা কালো কেউটের বাচ্চা ! আহত সর্পশিশু হিস্ গর্জনে মুহূর্তে ফণা তুলিয়া দংশনোদ্যত হইয়া উঠিল ; শম্ভু চিৎকার করিয়া উঠিল, আ-কামা ! অর্থাৎ বিষদাঁত এখনও ভাঙা হয় নাই। কিষ্টো কিন্তু ততক্ষণে তাহার মাথাটা বাঁ হাতে চাপিয়া ধরিয়া হাসিতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। হাসিতে হাসিতে সে ডান হাতে ট্যাঁক হইতে ছোট একটা ছুরি বাহির করিয়া দাঁত খুলিয়া ফেলিল এবং সাপটার বিষদাঁত ও বিষের থলি দুই কাটিয়া ফেলিয়া রাধিকার গায়ে আবার ছুঁড়িয়া দিল। রাধিকাও বাঁ হাতে সাপটাকে ধরিয়া ফেলিল ; কিন্তু রাগে সে মুহূর্ত পূর্বের ওই সাপটার মতই ফুলিয়া উঠিল, বলিল, আমার সাপ তুমি কামাইলা কেনে ?

কিষ্টো বলিল, তুমি যে বল্ল্যা গো দমন করতে।—বলিয়া সে এবার হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিল।

রাধিকা মুহূর্তে আসন ছাড়িয়া উঠিয়া তাঁবু হইতে বাহির হইয়া গেল।

সন্ধ্যার পূর্বেই।

নূতন তাঁবুতে আজ হইতেই খেলা দেখানো হইবে, সেখানে খুব সমারোহ পড়িয়া গিয়াছে। বাহিরে মাচা বাঁধিয়া সেটার উপর বাজনা বাজিতে আরম্ভ করিয়াছে, একটা পেট্রোম্যাক্স আলো জ্বালিবার উদ্যোগ হইতেছে। রাধিকা আপনাদের ছোট তাঁবুটির বাহিবে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহাদের খেলার তাঁবু এখনও খাটানো হয় নাই। রাধিকাব চোখ দুইটি হিংস্রভাবে যেন জ্বলিতেছিল।

শম্ভু নিকটেই একটা গাছতলায় নামাজ পড়িতেছিল ; আবও একটু দূবে আর একটা গাছের পাশে নামাজ পড়িতেছে কিষ্টো। বিচিত্র জাত বেদেরা। জাতি জিজ্ঞাসা করিলে বলে, বেদে। তবে ধর্মে ইসলাম। আচারে পুরা হিন্দু, মনসা-পূজা করে, মঙ্গলচণ্ডী ষষ্ঠীর ব্রত করে, কালী-দুর্গাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করে, নাম রাখে শম্ভু শিব কৃষ্ণ হরি, কালী দুর্গা রাধা লক্ষ্মী। হিন্দু পুরাণ-কথা ইহাদের কণ্ঠস্থ। এমনই আর একটি সম্প্রদায় পট দেখাইয়া হিন্দু পুরাণ-গান করে, তাহারা নিজেদেব বলে পটুয়া, বিপুল চিত্রকরের জাতি ! বিবাহ আদান-প্রদান সমগ্রভাবে ইসলামধর্মসম্প্রদায়ের সঙ্গে হয় না, নিজেদের এই বিশিষ্ট সম্প্রদায়ের মধ্যেই আবদ্ধ। বিবাহ হয় মোল্লার নিকট ইসলামীয় পদ্ধতিতে, মরিলে পোড়ায় না, কবর দেয়। জীবিকায় বাজিকরেরা, সাপ ধরে, সাপ নাচাইয়া গান করে, বাঁদর ছাগল লইয়া খেলা দেখায়, অতি সাহসী কেহ কেহ এমনই তাঁবু খাটাইয়া বাঘ লইয়া খেলা দেখায়। কিন্তু এই নূতন তাঁবুর মত সমারোহ করিয়া তাহাদের সম্প্রদায়ের কেহ কখনও খেলা দেখায় নাই। রাধিকার চোখ ফাটিয়া জল আসিতেছিল। তাহার মনশ্চক্ষে কেবল ভাসিয়া উঠিতেছিল উহাদের সবল তরুণ বাঘটির কথা। ইহারই মধ্যে লুকাইয়া সে

বাঘটাকে কাঠের ফাঁক দিয়া দেখিয়া আসিয়াছে। সবল দৃঢ় ক্ষিপ্রতাব্যঞ্জক অঙ্গপ্রতঙ্গ, চকচকে চিকণ লোম, মুখে হিংস্র হাসির মত ভঙ্গি যেন অহরহই লাগিয়া আছে! আর তাহাদের বাঘটা স্থবির শিথিলদেহ,—অতি কর্কশ, খসখসে লোকগুলো দেখিলে রাধিকার শরীর ঘিনঘিন করিয়া উঠে। কতবার সে শম্ভুকে বলিয়াছে একটা নূতন বাঘ কিনিবার জন্য, কিন্তু শম্ভুর কি যে মমতা ঐ বাঘটার প্রতি, যাহার হেতু সে কিছুতেই খুঁজিয়া পায় না।

নামাজ সারিয়া শম্ভু ফিরিয়া আসিতেই সে গভীর ঘৃণা ও বিরক্তির সহিত বলিয়া উঠিল, তুর ওই বুড়া বাঘের খেলা কেউ আর দেখতে আসবে নাই।

ক্রুদ্ধস্বরে শম্ভু বলিল, তু জানছিস সব!

রাধিকা নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া কহিল, না জেনে না আমি! তু-ই জানছিস সব!

শম্ভু চুপ করিয়া রহিল, কিন্তু রাধিকা থামিল না, কয়েক মুহূর্ত চুপ করিয়া থাকিয়া সে বলিয়া উঠিল, ওরে মড়া, বুড়ার নাচন দেখতে কার কবে ভাল লাগে রে? আমারে বলে, তু জানছিস সব!

শম্ভু মুহূর্তে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল, পরিপূর্ণভাবে তাহার হিংস্র দুই পাটি দাঁত ওই বাঘের মত ভঙ্গিতেই বাহির করিয়া সে বলিল, ছোকরার উপর বড় যে টান দেখি তুর!

রাধিকা সর্পিণীর মত গর্জন করিয়া উঠিল, কি বুললি বেইমান?

শম্ভু আর কোন কথা বলিল না, অঙ্কুশভীত বাঘের মত ভঙ্গিতেই সেখান হইতে চলিয়া গেল।

ক্রোধে অভিমানে রাধিকার চোখ ফাটিয়া জল আসিল। বেইমান তাহাকে এতবড় কথাটা বলিয়া গেল? সব ভুলিয়া গিয়াছে সে? নিজের বয়সটাও তাহার মনে নাই? চল্লিশ বৎসরের পুরুষ, তুই তো বুড়া! রাধিকার বয়সের তুলনায় তুই বুড়া ছাড়া আর কি? রাধিকা এই সবে বাইশে পা দিয়াছে। সে কি দায়ে পড়িয়া শম্ভুকে বরণ করিয়াছে? রাধিকা তাড়াতাড়ি আপনাদের তাঁবুর ভিতর ঢুকিয়া গেল।

সত্য কথা। সে আজ পাঁচ বৎসর আগের ঘটনা। রাধিকার বয়স তখন সতেরো। তাহারও তিন বৎসর পূর্বে শিবপদ বেদের সহিত তাহার বিবাহ হইয়াছিল। শিবপদ ছিল রাধিকার চেয়ে বৎসর তিনেকের বড়। আজও তাহার কথা মনে করিয়া রাধিকার দুঃখ হয়। শান্ত প্রকৃতির মানুষ, কোমল মুখশ্রী, বড় বড় চোখ, সে চোখের দৃষ্টি যেন মায়াবীর দৃষ্টি! সাপ, বাঁদর, ছাগল এসবে তাহার আসক্তি ছিল না। সে করিত বেতের কাজ, —ধামা বুনিত, চেয়ার পাল্কির ছাউনি করিত, ফুলের সৌখিন সাজি তৈয়ারি করিত; তাহাতে তাহার উপার্জন ছিল গ্রামের সকলের চেয়ে বেশি। তাহারা স্বামী-স্ত্রীতে বাহির হইত; সে কাঁধে ভার বহিয়া লইয়া যাইত তাহার বেতের জিনিস; রাধিকা লইয়া যাইত তাহার সাপের ঝাঁপি, বাঁদর, ছাগল। শিবপদর সঙ্গে আরও একটি যন্ত্র থাকিত, তাহার কোমরে গোঁজা থাকিত বাঁশের বাঁশি। রাধিকা যখন সাপ নাচাইয়া গান গাহিত, শিবপদ রাধিকার স্বরের সহিত মিলাইয়া বাঁশি বাজাইত।

ইহা ছাড়াও শিবপদর আরও কতবড় গুণ ছিল! তাহাদের সামাজিক মজলিসে বৃদ্ধদের আসরেও তাহার ডাক পড়িত। অতি ধীর প্রকৃতির লোক শিবপদ, এবং লেখাপড়াও কিছু কিছু নিজের চেষ্টায় সে শিখিয়াছিল, এইজন্য তাহার পরামর্শ প্রবীণেরাও গ্রহণ করিত। গ্রামের মধ্যে সম্মান কত তাহার! আর সেই শিবপদ ছিল রাধিকার ক্রীতদাসের মত। টাকাকড়ি সব থাকিত রাধিকার কাছে। তাঁতে বোনা কালো রঙের জমির উপর সাদা

সূতার খুব ঘন ঘন ঘরকাটা শাড়ি পরিতে রাধিকা খুব ভালবাসিত, শিবপদ বারো মাস সেই কাপড়ই তাহাকে পরাইয়াছে।

এই সময় কোথা হইতে দশ বৎসর নিরুদ্দেশ থাকার পর আসিল এই শম্ভু, সঙ্গে এই বাঘটা, একটা ছেঁড়া তাঁবু আর এক বিগতযৌবনা বেদেনী। বাঘ ও তাঁবু দেখিয়া সকলের তাক লাগিয়া গেল। রাধিকা প্রথম যেদিন শম্ভুকে দেখিল, সেদিনের কথা তাহার আজও মনে আছে। সে এই উগ্র পিঙ্গলবর্ণ, উদ্ধতদৃষ্টি কঠোর বলিষ্ঠদেহ মানুষটিকে দেখিয়া বিস্মিত হইয়া গিয়াছিল।

শম্ভুও তাহাকে দেখিতেছিল মুগ্ধ বিস্ময়ের সহিত ; সে-ই প্রথম ডাকিয়া বলিল, এই বেদেনী, দেখি তুর সাপ কেমন ?

রাধিকার কি যে হইয়াছিল, যে ফিক করিয়া হাসিয়া বলিয়াছিল, নাগরের সখ দেখি যে খুব। পয়সা দিবা ?

বেশ মনে আছে, শম্ভু বলিয়াছিল, পয়সা দিব না ; তু সাপ দেখালে আমি বাঘ দেখাব।

বাঘ ! রাধিকা বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল। কে লোকটা ? যেমন অদ্ভুত চেহারা তেমনই অদ্ভুত কথা ; বলে বাঘ দেখাইবে ! সে তাহার মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিয়াছিল, সত্যি বুলছ ?

বেশ, দেখ, আগে আমার বাঘ দেখ ! সে তাহাকে তাঁবুর ভিতর লইয়া গিয়া সত্যই বাঘ দেখাইয়াছিল। রাধিকা সবিস্ময়ে তাহাকে প্রশ্ন করিয়াছিল, ই বাঘ নিয়া তুমি কি কর ?

লড়াই করি, খেলা দেখাই।

হাঁ ?

হাঁ, দেখবি তু ?—বলিয়া সঙ্গে সঙ্গেই সে খাঁচা খুলিয়া বাঘটাকে বাহির করিয়া তাহার সামনের দুই থাবা হাতে করিয়া তুলিয়া বাঘের সহিত মুখোমুখি দাঁড়াইয়াছিল। বেশ মনে আছে, রাধিকা বিস্ময়ে হতবাক হইয়া গিয়াছিল। শম্ভু বাঘটাকে খাঁচায় ভরিয়া রাধিকার সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিয়াছিল, তু এইবার সাপ দেখা আমাকে !

রাধিকা সে কথার উত্তর দেয় নাই, বলিয়াছিল, উটা তুমার পোষ মেনেছে ?

হি হি করিয়া হাসিয়া শম্ভু সবলে তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিয়াছিল, হি, বাঘিনী পোষ মানাইতে আমি ওস্তাদ আছি।

কি যে হইয়াছিল রাধিকার, এক বিন্দু আপত্তি পর্যন্ত করে নাই। দিন কয়েক পরেই সে শিবপদর সমস্ত সঞ্চিত অর্থ লইয়া শম্ভুর তাঁবুতে আসিয়া উঠিয়াছিল। চোখের জলে শিবপদের বুক ভাসিয়া গিয়াছিল, কিন্তু তাহাতে রাধিকার মমতা হওয়া দূরে থাক, লজ্জা হওয়া দূরে থাক, ঘৃণায় বীতরাগে তাহার অন্তর রি-রি করিয়া উঠিয়াছিল। রাধিকার মা-বাপ, গ্রামের সকলে তাহাকে ছি ছি করিয়াছিল, কিন্তু রাধিকা সে গ্রাহ্যই করে নাই।

সেই রাধিকার আনীত শিবপদর অর্থেই শম্ভুর এই তাঁবু ও খেলার অন্য সরঞ্জাম কেনা হইয়াছিল। সে অর্থ আজ নিঃশেষিত হইয়া আসিয়াছে, দুঃখেই দিন চলে আজকাল ; শম্ভু যাহা রোজগার করে, সবই নেশায় উড়াইয়া দেয়, কিন্তু রাধিকা একটি দিনের জন্য দুঃখ করে নাই। আর বেইমান কিনা এই কথা বলিল ? সে একটা মদের বোতল বাহির করিয়া বসিল।

ওদিকে নূতন তাঁবুতে আবার বাজনা বাজিতেছে ! দোসরা দফায় খেলা আরম্ভ হইবে। মদ খাইয়া রাধিকা হিংস্র হইয়া উঠিয়াছিল, ওই বাজনার শব্দে তাহার অন্তরটা জ্বালা করিয়া উঠিল। উহাদের তাঁবুতে নিশীথ রাত্রে আগুন ধরাইয়া দিলে কেমন হয় ?

সহসা তাহাদের তাঁবুর বাহিরে শম্ভুর ক্রুদ্ধ উচ্চ কণ্ঠস্বর শুনিয়া সে মত্ততার উপর উত্তেজিত হইয়া বাহির হইয়া আসিল। দেখিল, শম্ভুর সম্মুখে দাঁড়াইয়া কিষ্টো। তাহার পরনে ঝকঝকে সাজ পোষাক, চোখ রাঙা, সেই তখন কথা বলিতেছিল, কেনে, ইথে দোষটা কি হল ? তুমরা বসে রইছ, আমাগোর খেলা হ্ছে। খেলা দেখবার নেওতা দিলাম, তা দোষটা কি হল ?

শম্ভু চিৎকার করিয়া উঠিল, খেল দেখাবেন খেলোয়াড়ী আমার ! অপমান করতে আসছিস তু !

কিষ্টো কি বলিতে গেল, কিন্তু তাহার পূর্বেই উত্তেজিত রাধিকা একটা ইট কুড়াইয়া লইয়া সজোরে তাহাকে লক্ষ্য করিয়া মারিয়া বসিল। অব্যর্থ লক্ষ্য, কিন্তু কিষ্টো অদ্ভুত, সে বলের মত সেটাকে লুফিয়া ধরিয়া ফেলিল, তারপর ইটটাকে লুফিতে লুফিতে চলিয়া গেল। বিস্ময়ে রাধিকা সামান্য কয়টা মুহূর্তের জন্য যেন স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল, সে ঘোর কাটিতেই সে বর্ধিত উত্তেজনায় আবার একটা ইট কুড়াইয়া লইল ; শম্ভু তাহাকে নিবৃত্ত করিল, সে সাদরে তাহার হাত ধরিয়া তাঁবুর মধ্যে লইয়া গেল। রাধিকা বিপুল আবেগে শম্ভুর গলা জড়াইয়া ধরিয়া ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিল।

শম্ভু বলিল, এই মেলার বাদেই বাঘ লিয়ে আসব।

ওদিকের তাঁবু হইতে কিষ্টোর কণ্ঠস্বর ভাসিয়া আসিল, খোল কানাৎ, ফেলে দে খুল্যে।

তাঁবুর একটা ছেঁড়া ফাঁক দিয়া রাধিকা দেখিল, তাঁবুর কানাৎ খুলিয়া দিতেছে, অর্থাৎ ভিতরে না গেলেও তাহারা যেন দেখিতে বাধ্য হয়। সে ক্রোধে গর্জন করিয়া উঠিল, দিব আগুন ধরাইয়া তাঁবুতে !

শম্ভু গম্ভীর হইয়া ভাবিতেছিল। কিষ্টো চলন্ত ঘোড়ার পিঠে দাঁড়ইয়া কসরৎ দেখাইতেছে। রাধিকা একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, নতুন খেলা কিছু বার কর তুমি, নইলে বদনামী হবে, কেউ দেখবে না খেলা আমাগোর।

শম্ভু দাঁতে দাঁত চাপিয়া বলিল, কাল পুলিশে ধরাইয়া দিব শালাকে। মদের সন্ধান দিব।

ওদিকে টিয়া পাখিতে কামান দাগিল, সেই মেয়েটা তারের উপর ছাতা মাথায় দিয়া নাচিল, বাঘটার সহিত কিষ্টো লড়াই করিল, ইঃ—একটা থাবা বসাইয়া দিল বাঘটা।

রাধিকা আপনাদের খেলার দৈন্যের কথা ভাবিয়া ঝর ঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল ! সঙ্গে সঙ্গে আক্রোশেও ফুলিতেছিল। তাঁবুটা আগুন ধরিয়া ধু-ধু করিয়া জ্বলিয়া যায় ! কেরোসিন তেল ঢালিয়া আগুন ধরাইয়া দিলে কেমন হয় ?

পরদিন সকালে উঠিতে রাধিকার একটু দেরি হইয়া গিয়াছিল ; উঠিয়া দেখিল, শম্ভু নাই ; সে বোধ হয় দুই চারজন মজুরের সন্ধানে গ্রামে গিয়াছে। বাহিরে আসিয়া সে শিহরিয়া উঠিল। কিষ্টোর তাঁবুর চারপাশে পুলিশ দাঁড়াইয়া আছে। দুয়ারে একজন দারোগা বসিয়া আছেন। একি ? সে সটান গিয়া দারোগার সামনে সেলাম করিয়া দাঁড়াইল। দারোগা তাহার আপাদ মস্তক দেখিয়া বলিলেন, ডাক সব, আমরা তাঁবু দেখব !

আবার সেলাম করিয়া বেদেনী বলিল, কি কসুর করলাম হুজুর ?

মদ আছে কিনা দেখব আমরা। ডাক বেটাছেলেদের। এইখান থেকেই ডাক।

রাধিকা বুঝিল, দারোগা তাহাকে এই তাঁবুরই লোক ভাবিয়াছেন, কিন্তু সে তাঁহার ভুল ভাঙিল না। সে বলিল, ভিতরে আমার কচি ছেলে রইছে—হুজুর—

আচ্ছা ছেলে নিয়ে আসতে পার তুমি। আর ডেকে দাও পুরুষদের।

রাধিকা দ্রুত তাঁবুর মধ্যে প্রবেশ করিয়া সেই দেখা জায়গাটার আলগা মাটি সবাইয়া দেখিল, তিনটা বোতল তখনও মজুত রহিয়াছে। সে একখানা কাপড় টানিয়া লইয়া ভাঁজ করিয়া বোতল তিনটাকে পুরিয়া ফেলিল এবং সুকৌশলে এমন করিয়া বুকে ধরিল যে, শীতের দিনে সযত্নে বস্ত্রাবৃত অত্যন্ত কচি শিশু ছাড়া আর কিছু মনে হয় না। তাঁবুর মধ্যেই কিষ্টো অঘোরে ঘুমাইতেছিল, পায়ের ঠেলা দিয়া তাহাকে জাগাইয়া দিয়া রাধিকা বলিল, পুলিস আসছে, ব'সে রইছে দুয়ারে, উঠ্যা যাও।

সে অকম্পিত সংযত পদক্ষেপে স্তন্যদানরত মাতার মত শিশুকে যেন বুকে ধরিয়া বাহির হইয়া গেল। তাহার পিছনে পিছনেই কিষ্টো আসিয়া দারোগার সম্মুখে দাঁড়াইল।

দারোগা প্রশ্ন করিলেন, এ তাঁবু তোমার ?

সেলাম করিয়া কিষ্টো বলিল, জী, হুজুর।

দেখব তাঁবু আমরা, মদ আছে কিনা দেখব।

মেলার ভিড়ের মধ্যে শিশুকে বুকে করিয়া বেদেনী ততক্ষণে জলবাশির মধ্যে জলবিন্দুর মত মিশাইয়া গিয়াছে।

শম্ভু গুম হইয়া বসিয়াছিল, রাধিকা উপুড় হইয়া পড়িয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতেছিল। শম্ভু তাহাকে নির্মমভাবে প্রহার করিয়াছে। শম্ভু ফিরিয়া আসিতে বিপুল কৌতুকে সে হাসিয়া পুলিসকে ঠকানোর বৃত্তান্ত বলিয়া তাহার গায়ে ঢলিয়া পড়িল, বলিল, ভেলকি লাগায়ে দিছি দারোগার চোখে।

শম্ভু কঠিন আক্রোশভরা দৃষ্টিতে রাধিকার দিকে চাহিয়া রহিল, রাধিকাব সেদিকে ভ্রূক্ষেপও ছিল না, সে হাসিয়া বলিল, খাবা, ছেলে খাবা ?

শম্ভু অতর্কিতে তাহার চুলের মুঠি ধরিয়া নির্মমভাবে প্রহার করিয়া বলিল, সব মাটি কবে দিছিস তু ; উয়ারে আমি জেহেলে দিবার লাগি পুলিসে বলে এলাম, আব তু কবলি এই কাণ্ড !

রাধিকা প্রথমটায় ভীষণ উগ্র হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু শম্ভুর কথা সমস্তটা শুনিয়াই তাহার মনে পড়িয়া গেল গত রাত্রির কথা। সত্যই, এ কথা শম্ভু তো বলিয়াছিল ! সে আর প্রতিবাদ করিল না, নীরবে শম্ভুর সমস্ত নির্যাতন সহ্য করিয়া উপুড় হইয়া পড়িয়া ফুলিযা ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

আজ অপরাহ্ণ হইতে এ তাঁবুতেও খেলা আরম্ভ হইবে।

শম্ভু আপনার জীর্ণ পুরাতন পোষাকটা বাহির করিয়া পরিয়াছে, একটা কালো রঙের চোঙার মত সরু প্যান্টালুন, আর একটা কালো রঙের খাটো হাতা কোট। রাধিকার পরনে পুরানো ঘাঘরা আর অত্যন্ত পুরানো একটা ফুলহাতা বডিস। অন্য সময় মাথার চুল সে বেণী বাঁধিয়া ঝুলাইয়া দিত ; কিন্তু আজ সে বেণীই বাঁধিল না, আপনাদের সকল প্রকার দীনতা ও জীর্ণতার প্রতি অবজ্ঞায় ক্ষোভে তাহার যেন লজ্জায় মরিতে ইচ্ছা হইতেছিল। উহাদের তাঁবুতে কিষ্টোর সেই বিড়ালীর মত গাল-মোটা, স্থবিরার মত স্থূলাঙ্গী মেয়েটা পরিয়াছে গেঞ্জির মত টাইট পাজামা, জামা, তাহার উপর জরিদার সবুজ সার্টিনের একটা জাঙ্গিয়া ও কাঁচুলি ঢঙের বডিস। কুৎসিৎ মেয়েটাকেও যেন সুন্দর দেখাইতেছে। উহাদের জয়ঢাকটার বাজনার মধ্যে কাঁসা-পিতলের বাসনেব আওয়াজের মত একটা রেশ শেষকালে ঝঙ্কার দিয়ে উঠে। আর এই কতকালের পুরানো একটা ঢ্যাপঢ্যাপে জয়ঢাক,

ছি— !

কিন্তু তবুও সে প্রাণপণে চেষ্টা করে, জোরে জোরে করতাল পেটে।

শম্ভু বাজানা থামাইয়া হাঁকিল, ও—ই ব—ড় বা—ঘ !

রাধিকা রুদ্ধ স্বর কোন মতে সাফ করিয়া লইয়া প্রশ্ন করিল, বড় বাঘ কি করে ?

শম্ভু খুব উৎসাহ ভরেই বলিল, পক্ষীরাজ ঘোড়া হয়, মানুষের সঙ্গে যুদ্ধ করে, মানুষের মাথা মুখে ভবে, চিবায় না।

সে এবার লাফ দিয়া নামিয়া ভিতরে গিয়া বাঘটাকে খোঁচা দিল, জীর্ণ বৃদ্ধ বনচারী সিংহক আর্তনাদের মত গর্জন করিল।

সঙ্গে সঙ্গে ও-তাঁবুর ভিতর হইতে সবল পশুর তরুণ হিংস্র ক্রুদ্ধ গর্জন ধ্বনিত হইয়া উঠিল। মাচার উপবে রাধিকা দাঁড়াইয়া ছিল, তাহার শরীর যেন ঝিম ঝিম করিয়া উঠিল। ক্রূর হিংসাভরা দৃষ্টিতে সে ওই তাঁবুর মাচানের দিকে চাহিয়া দেখিল, কিষ্টো হাসিতেছে ! রাধিকার সহিত চোখাচোখি হইতেই সে হাঁকিল, ফিন একবার !

ও তাঁবুব ভিতব হইতে দ্বিতীয়বার খোঁচা খাইয়া উহাদের বাঘটা এবার প্রবলতর গর্জনে হুঙ্কার দিয়া উঠিল। রাধিকাব চোখে জ্বলিয়া উঠিল আগুন। জনতা স্রোতের মত কিষ্টোর তাঁবুতে ঢুকিল।

শম্ভুব তাঁবুতে অল্প কয়টি লোক সস্তায় আমোদ দেখিবাব জন্য ঢুকিল। খেলা শেষ কবিয়া মাত্র কয়েক আনা পয়সা হাতে শম্ভু হিংস্র মুখ ভীষণ করিয়া বসিয়া রহিল। রাধিকা দ্রুতপদে মেলার মধ্যে বাহির হইয়া গেল। কিছুক্ষণ পবেই সে ফিরিল একটা কিসের টিন লইয়া।

শম্ভু বিবক্তি সত্ত্বেও সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিল, কি উটা ?

কেবাচিনি। আগুন লাগায়ে দিব উয়াদের তাঁবুতে। পুরা পেলম নাই, দু' সের কম রইছে। তাহার চোখ জ্বলিতেছে।

শম্ভুর চোখও হিংস্র দীপ্তিতে জ্বলিয়া উঠিল। সে বলিল, লিয়ে আয় মদ।

মদ খাইতে খাইতে রাধিকা বলিল, দাউ দাউ ক'রে জ্বলবেক যখন !

সে খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। সে অন্ধকারের মধ্যে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল, ওই তাঁবুতে তখনও খেলা চলিতেছে। তাঁবুর ছেঁড়া মাথা দিয়া দেখা যাইতেছিল, কিষ্টো দড়িতে ঝুলানো কাঠের লাঠিতে দোল খাইতে খাইতে কসরৎ দেখাইতেছে, উঃ, একটা ছাড়িয়া আর একটা ধরিয়া দুলিতে লাগিল ! দর্শকেরা করতালি দিতেছে।

শম্ভু তাহাকে আকর্ষণ করিয়া বলিল, এখুন লয়, সেই—নিষুত-রাতে !

তাহারা আবার মদ লইয়া বসিল।

সমস্ত মেলাটা শান্ত স্তব্ধ ; অন্ধকারে সব ভরিয়া উঠিয়াছে। বেদেনী ধীরে ধীরে উঠিল, এক মুহূর্তের জন্য তাহার চোখে ঘুম আসে নাই। বুকের মধ্যে একটা অস্থিরতায়, মনের একটা দুর্দান্ত জ্বালায় সে অহরহ যেন পীড়িত হইতেছে। সে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। গাঢ় অন্ধকার থম থম করিতেছে। সমস্ত নিস্তব্ধ। সে খানিকটা এদিক হইতে ওদিক পর্যন্ত ঘুরিয়া আসিল, কেহ কোথায় জাগিয়া নাই। সে আসিয়া তাঁবুতে ঢুকিল, ফস করিয়া একটা দেশলাই জ্বালাইল, ওই কেরোসিনের টিনটা রহিয়াছে। তারপর শম্ভুকে ডাকিতে গিয়া দেখিল, সে শীতে কুকুরের মত কুণ্ডলি পাকাইয়া অঘোরে ঘুমাইতেছে। তাহার উপর ক্রোধে ঘৃণায় রাধিকার মন ছি-ছি করিয়া উঠিল। অপমান ভুলিয়া গিয়াছে, ঘুম

আসিয়াছে ! সে শম্ভুকে ডাকিল না, দেশলাইটা চুলের খোঁপায় গুঁজিয়া, টিনটা হাতে লইয়া একাই বাহির হইয়া গেল ।

ওই পিছন দিক হইতে দিতে হইবে। ওদিকটা সমস্ত পুড়িয়া তবে এদিকে মেলার লোকে আলোর শিখা দেখিতে পাইবে। ক্রূর হিংস্র সাপিনীর মতই সে অন্ধকারের মধ্যে মিশিয়া শন শন করিয়া চলিয়াছিল। পিছনে আসিয়া টিনটা নামাইয়া সে হাঁপাইতে আরম্ভ করিল ।

চুপ করিয়া বসিয়া সে খানিকটা বিশ্রাম করিয়া লইল। বসিয়া থাকিতে থাকিতে তাঁবুর ভিতরটা একবার দেখিয়া লইবার জন্য সে কানাতটা সন্তর্পণে ঠেলিয়া বুক পাড়িয়া মাথাটা গলাইয়া দিল। সমস্ত তাঁবুটা অন্ধকার ! সরীসৃপের মত বুকে হাঁটিয়া বেদেনী ভিতরে ঢুকিয়া পড়িল। খোঁপার ভিতর হইতে দেশলাইটা বাহির করিযা ফস করিয়া একটা কাঠি জ্বালিয়া ফেলিল ।

তাহার কাছেই এই যে কিষ্টো একটা অসুরের মত পড়িয়া অঘোরে ঘুমাইতেছে ! রাধিকার হাতের কাঠিটা জ্বলিতেই লাগিল, কিষ্টোর কঠিন সুশ্রী মুখে কি সাহস ! উঃ, বুকখানা কি চওড়া, হাতের পেশিগুলি কি নিটোল ! তাহার আশেপাশে ঘোড়ার খুরের দাগ—ছুটন্ত ঘোড়ার পিঠে কিষ্টো নাচিয়া ফেরে ! ঐ যে কাঁধে সদ্য ক্ষতচিহ্নটা—ওই দুর্দান্ত সবল বাঘটার নখের চিহ্ন। দেশলাইটা নিবিয়া গেল ।

রাধিকার বুকের মধ্যেটা তোলপাড় করিয়া উঠিল, যেমন করিয়াছিল শম্ভুকে প্রথম দিন দেখিয়া। না, আজিকার আলোড়ন তাহার চেয়েও প্রবল। উন্মত্তা বেদেনী মুহূর্তে যাহা করিয়া বসিল, তাহা স্বপ্নের অতীত। সে উন্মত্ত আবেগে কিষ্টোর সবল বুকের উপর ঝাঁপ দিয়া পড়িল ।

কিষ্টো জাগিয়া উঠিল, কিন্তু চমকাইল না, ক্ষীণ নারীতনুখানি সবল আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিয়া বলিল, কে ? রাধি—

তাহার মুখ চাপিয়া ধরিয়া রাধিকা বলিল, হ্যাঁ, চুপ ।

কিষ্টো চুমায় চুমায় তাহার মুখ ভরিয়া দিয়া বলিল, দাঁড়াও, মদ আনি ।

না। চল, উঠ, এখুনই ইখান থেক্যে পালাই চল ।

রাধিকা অন্ধকারের মধ্যে হাঁপাইতেছিল ।

কিষ্টো বলিল, কুথা ?

হু-ই, দেশান্তরে ।

দেশান্তরে ? ই তাঁবুটাবু—

থাক পড়্যা। উ ওউ শম্ভু লিবে। তুমি উহার রাধিকে লিবা, উয়াকে দাম দিবা না ।

সে নিম্নস্বরে খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল ।

উন্মত্ত বেদিয়া—তাহার উপর দুরন্ত যৌবন—কিষ্টো দ্বিধা করিল না, বলিল, চল ।

চলিতে গিয়া রাধিকা থামিল, বলিল, দাঁড়াও ।

সে কেরোসিনের টিনটা শম্ভুর তাঁবুর উপর ঢালিয়া দিয়া মাঠের ঘাসের উপর ছড়া দিয়া চলিতে চলিতে বলিল, চল ।

টিনটা শেষ হইতেই সে দেশলাই জ্বালিয়া কেরোসিনসিক্ত ঘাসে আগুন ধরাইয়া দিল। খিলখিল করিয়া হাসিয়া বলিল, মরুক বুড়া পুড়্যা ।

নীল-খয়েরীর কেচ্ছা

প্রেমেন্দ্র মিত্র

লাল সবুজ নয়, নীল খয়েরী।

মাঠের ওপর এগারটা জার্সিতে না দেখলে যে রঙ-জোড়ের কথা মনেই থাকে না।

কিন্তু সেই নীল নীল খয়েরী নিয়েই সমুদ্রমন্থনের মত কাণ্ড হতে পারে তা কে ভাবতে পেরেছিল ?

সমুদ্রমন্থন বলছি অন্য কোনো দিকের মিলের জন্য নয়, 'নীল-খয়েরী'-র ছুতোটুকু ধরে অমন সব উল্টোপাল্টা আজগুবি কাণ্ড ঘটার দরুণ।

প্রথম যে কাণ্ডের কথা বলতে হয় তা নিশ্চয় পরাশবের হঠাৎ কপাল চিরে তার ওপর ভাগ্যদেবীর আশ্চর্য কৃপার কথা।

এ আশ্চর্য ব্যাপারের আমি নিজে একজন আকস্মিক সাক্ষী ছিলাম বলে ঘটনাটা একটু সবিস্তারে বর্ণনা করতে পারব।

দিন সাতেক আগের কথা। আগের দিন আমার সম্পাদিত সাপ্তাহিক পত্রিকা বার হচ্ছে এবং তাতে পরাশরের একটি কবিতা না ছেপে পারিনি বলে পত্রিকাটি নিজের হাতে দিতে পরাশরের খিদিরপুরের বাসায় গিয়েছিলাম।

গিয়ে দেখলাম তাকে তার ছাপান কবিতা পত্রিকাটি নিজে থেকে বয়ে এনে দিয়ে খুশি ও অবাক করার চেষ্টাটা সফল হয়নি।

তার পরিচারক বাইরের দরজা খুলে ভেতরে নিয়ে যাবার পর তার বসার ঘরে গিয়ে দেখলাম যে বিছানায় চিৎ হয়ে আমার সদ্য প্রকাশিত সাপ্তাহিকে তার নিজের কবিতাটি গভীর মনোযোগের সঙ্গে পড়ছে।

অর্থাৎ আমি যে তার কবিতা ছাপা পত্রিকাটি বার হবার পর তার কাছে নিজেই নিয়ে যাব জেনেও সে তার জন্যে অপেক্ষা করতে না পেরে পত্রিকাটি বাজারে বার হবার পরই আনার ব্যবস্থা করেছে।

যা বলতে যাচ্ছি তা অবশ্য পরাশরের এই সাধারণ কবিসুলভ দুর্বলতার কথা নয়। বলছি এর পরে সেদিন যা ঘটেছে তারই কথা। পরাশরের ছাপা কবিতা সমেত পত্রিকাটি সেদিন তাকে দিতে না গেলে এ ব্যাপারের সাক্ষী আমি হতে পারতাম না বলেই ও কথাটা আগে জানালাম।

আমি ঘরে ঢোকবার পর পরাশর বিছানা থেকে উঠে বসে তার কবিতাটি নির্ভুল ছাপবার জন্য কৃতজ্ঞতা, কিংবা কোথাও কোন মুদ্রণ প্রমাদ দেখিয়ে অভিযোগ হয়ত করত, কিন্তু তার সময় সে পেল না। কারণ তখনই তার পরিচারক আবার ঘরে ঢুকে বেশ একটু

সম্ভ্রমের সঙ্গে জানাল যে, যে-গাড়ি আসবার কথা ছিল সে গাড়ির ড্রাইভার এসেছে। গাড়িটা এ গলিতে ঢোকান যায়নি বলে বাড়ি পর্যন্ত আর আসতে পারেনি, বড় রাস্তাতেই রেখে এসেছে।

পরাশরের পরিচারক রতনের কথা শেষ হবার আগেই দরজা দিয়ে ঢুকে যে উর্দিপরা ড্রাইভার পরাশরকে সেলাম জানাল তার চেহারা পোশাকেই বোঝা গেল কত বড় খানদানি মনিবের কাছে সে কাজ করে।

প্রসন্ন হবার বদলে এ সেলামে পরাশরের মুখে বেশ একটা বিরক্তির আভাসই কয়েক মুহূর্তের জন্যে প্রথমে ফুটে উঠেছিল কিন্তু নিমন্ত্রণ যারই হক শেষ পর্যন্ত তা প্রত্যাখ্যান না করে সে আমাকেও তার সঙ্গে নিয়ে গেল।

পরাশরের বাসা নেহাৎ সাধারণ মধ্যবিত্ত রাস্তায়। তাকে নিতে আসা বিদেশী চোখ-ধাঁধানো গাড়িটা যেমন বেমানান, এই কলকাতারই একেবারে আমীর শাহি অঞ্চলে যে মঞ্জিলটায় আমাদের তা নিয়ে গেল সেটাও তেমনি চোখ-ধাঁধানো। যে লিফ্‌ট-এ আমাদের ওপরে তোলা হল সেটাও বোঝা গেল ও প্রাসাদের একেবারে বিশেষ আলাদা হুকুমদারিতে চলে। নামে এটা নাকি কোনো এক বড় সদাগরী কোম্পানির অফিস-কমপ্লেক্স কিন্তু অফিসের বদলে রাজবাড়ির সঙ্গে তার মিল বেশি। কায়দাকানুনও সেই রকম। আগেকার পালকির মত সাজানো লিফটে যে মহলে গিয়ে আমরা পৌঁছলাম তার মাঝখানে একটা সিংহাসন আর যিনি আমাদের অভ্যর্থনা করলেন তাঁর মাথায় পাগড়ির বদলে একটা পালক গোঁজা মুকুট হলেই যেন মানানসই হত।

এসব বর্ণনায় সময় নষ্ট না করে পরিবেশটার শুধু ইঙ্গিত দিয়ে আসল কথাটাই জানাই।

আসল কথাটা হল যিনি এত খাতির করে আমাদের আনিয়েছেন সেই ধন-কুবের পরাশরকে প্রায় তার নিজের ওজনের সোনা ফী হিসেবে দিয়ে এক বছর নিজের কাজে লাগিয়ে রাখতে চান। তাঁর কাজটা অবশ্য কি তা তিনি বুঝিয়ে বলার আগেই পরাশর একটু হেসে বাধা দিয়ে বলল, কি কাজ আমায় দিতে চাচ্ছেন তা আমি জানি শেঠ রতনমলজি।

আপনি জানেন—রতনমলজি সত্যিই অবাক হয়ে বললেন—কাজটা কি হবে তা আমি বসে আজই ঠিক করেছি, আর এখনও পর্যন্ত ঘুণাক্ষরে কাউকে জানাইনি।

আপনার মুখ থেকে না জানলেও—পরাশর আগের মতই হেসে বললে—আপনার চিন্তাভাবনা কি রাস্তায় চলে তার কিছুটা বুঝি, আর সেই সঙ্গে আমার কাছে কি কাজ আপনি চাইতে পারেন তাও অনুমান করতে পারি কিছুটা। এই দুদিকের হিসেব মিলিয়েই বুঝেছি আপনি বেশ কিছুদিনের জন্য আমায় কলকাতা শহর শুধু নয় পারলে এই ভারতবর্ষের বাইরে রাখতে চান। সে উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্যে আমার ওজনের সোনার দাম দেওয়া আপনার কাছে লাভের ব্যাপার।

পরাশরের কথা শুনতে শুনতে রীতিমত অবাক হলেও রতনমলজির মুখটা না লক্ষ করে পারিনি। আশ্চর্য ব্যাপার সেখানে রাগ বিরক্তি এমন কি বিস্ময়ের লেশ নেই। পরাশর মানুষটাকে কি একেবারে ভুল বুঝেছে না আমিই উল্টো বুঝেছি সব? সমস্ত ব্যাপারটা যেন নেহাৎই হাসি ঠাট্টা এমনভাবে রতনমলজি বললেন, ঠিক আছে ভার্মাজি। আপনার যা পছন্দ নয় এমন কাজ আপনাকে আমি করতে বলব কেন? তবে সকলের সব কিছু সন্দেহ না করে আমার প্রস্তাবটা ভেবে দেখলেও পারতেন। আমি সচমুচ আপনার একজন ভক্ত! আপনাকে কিছুদিন ভালো করে ছুটি ভোগ করতে দিয়ে আমার একটা

ছোট কাজও করিয়ে নেব এই ছিল আমার ইচ্ছা। কাজটা কি তাহলে শুনুন। আমার এক দুষমনের ওপর কিছুকাল তাকে কিছু না জানতে দিয়ে নজর রাখা, এখানে নয় সে তার ঘাঁটি হল নৈনিতালে। সেখান থেকেই সে আমার সঙ্গে দারুণ দুষমনি করছে।

বুঝেছি রতনমলজি!—পরাশর যেন একটু নরম হয়ে বললে, আর আপনাকে কিছু বলতে হবে না। এখানে একটু খুব ছোট ব্যাপারে আমি একটু আটকে আছি। সেটার একটু ব্যবস্থা করতে পারলে আপনার...

কি ছোট ব্যাপার ভার্মাজি—পরাশরকে তার কথা শেষ হতে না দিয়ে রতনমলজি একটু কৌতুকের সঙ্গে বললেন—মাঠের সব বড় বড় খেলা ত শেষ হয়ে গেছে। এখন সেখানে আর আপনার মাথা ঘামানর মত বড় ব্যাপার ত কিছু নেই।

আছে রতনমলজি আছে—পরাশর একটু বাঁকা হাসির সঙ্গে বললে—বড় দলের বড় খেলা শেষ হয়েছে। কিন্তু যাদের নামটাও কারুর মনে থাকে না এমন নেহাৎ বাজে টীমেব নিচেব ডিভিশন-এ নেমে যাওয়ার ওপর লাখ লাখ টাকার জুয়ার বাজি ধরাধরি চলছে।

তাই নাকি!—রতনমলজি তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললেন—এ রকম টীমের নাম ভি ত আমি জানি না।

যদি না জানেন ত একটা নাম বলে দিচ্ছি শুনুন—পরাশর বেশ গম্ভীর হয়েই বললে—নাম হল নীল-খয়েরী। লাল-সবুজ বা কাল-মেরুন গোছের মুখে মুখে ফেরার নাম নয়। নেহাৎ তাচ্ছিল্যের সঙ্গে কখনো সখনো মুখে আনা নাম, নীল-খয়েরী। নীল-খয়েরী যাদের জার্সির রঙ সে দলটা এমন যে তার প্রথম থেকে দ্বিতীয় ডিভিশনে নেমে যাওয়া প্রায় নিশ্চিত; সত্যিকার খেলা প্রেমিক কারুর সে দল নিয়ে কোনো মাথা ব্যথা নেই। মাথাব্যথা কিন্তু যা আছে তা এক জাতের জুয়াড়িদের যারা ও দলের দ্বিতীয় বিভাগে নামা না নামা নিয়ে হয় আমীর নয় ফতুর গোছের টাকার বাজি ধরছে...

মাপ করবেন ভার্মাজি—পরাশর তার কথা জানাবার সময় কয়েকটা ফাইল নিয়ে রতনমলজির এক আমিন-ই ঘরে ঢুকেছিলেন। বিনীত প্রতিবাদটা তাঁরই।

একবার পরাশর আর একবার মনিব রতনমলজির দিকে চেয়ে যেন অনুমতি নিয়ে আমিনজি পরাশরকেই এবার বললেন—আপনি যা বলছেন আমার কিন্তু মনে হয় তা নয় ভার্মাজি, নীলখয়েরীর নিচের ডিভিশনের নামার ওপর কোনো দরই এখন নেই বাজারে।

দর নেই!—রতনমলজি-ই বেশ যেন অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করেছেন এবার—কৈও, বাজার উল্ট গয়া কৈ সে।

না উল্টে যায়নি—আমিনজি বুঝিয়ে দিয়ে বললেন। তবে ছোট আব্বাস এখন টীমে আছে। আর নীল-খয়েরীর খেলা বাকি আছে মাত্র দুটো। এই দুটি খেলায় জিতুক না জিতুক, না হেরে শুধু 'ড্র' করলেই নীল-খয়েরীকে আর নিচের ডিভিশনে নামতে হবে না। তার জন্যে একমাত্র যা দরকার তাহল দুটি খেলাতেই ছোট আব্বাসের মাঠে নামা। সে যে তা নামছে তা নিশ্চিতভাবেই জেনেছি।

নিশ্চিত্ভাবে জেনেছেন—পরাশরের গলায় বিদ্রূপের সুরটা এবার বেশ স্পষ্ট—যে খেলার দুদিন শুধু কষ্ট করে মাঠে নামলেই নীল-খয়েরীর সব বিপদ কেটে যাবে মনে করছেন সেই ছোট আব্বাসকে খেলার মাঠে কেন এই শহরের কোথাও খেলার দিন পাওয়া যাবে কিনা তার কিছু ঠিক আছে? কোথাকার কাদের যাদুর মন্তরে এই মুলুক থেকেই তিনি হাওয়া হয়ে যেতে পারেন তা জানেন?

আমিনজি কি বলতে যাচ্ছিলেন, তাঁকে প্রায় ধমক দিয়ে থামিয়ে রতনমলজি বললেন—উনি কি বলবেন ? যা বলবার হামি বোলছি শুনেন। ছোট আব্বাসকে কেউ চোরী করে কোথাও লোপাট করে দেবে এই ত আপনার ভয় ? আমি আপনাকে বাৎ দিতে আছি, এ শহরের পুলিস মহল ত বটেই আমি আমার নিজের জিম্মাদারী এমন পাহারায় রাখব যে একটা মক্ষীও তার ফাঁক দিয়ে গলে যেতে পারবে না। ছোট আব্বাসকে আপনি যখন চান এই কলকাত্তা শহরেই পাবেন। কি ? করবেন আমার সাথে রফা ? আমি বাজি জিতলে এক বরিষের জন্যে আপনি আমার কাজ লিবেন, আর আমি হারলে আপনাকে আপনার যত ওজন তত দিব, কি বলেন সোনা না চাঁদি !

আচ্ছা ! আচ্ছা সে পরে বলব !—পরাশর যেন একটু অপ্রস্তুত হয়ে বললেন, আমি আজ রাতটা একটু ভেবে আপনার সঙ্গে কথা বলব, এখন...

হাঁ হাঁ, এখন আপনি ঘর যেতে চান এই ত !—রতনমলজি পরাশরের হার মানা অপ্রস্তুত অবস্থাটা বেশ উপভোগ করে বললেন—ঠিক আছে গাড়ি আপনার জন্যে মজুতই আছে তবে আগে কুছ খানাপিনা হোবে...

না, না—পরাশর নিজের অস্বস্তিটা স্পষ্টই বুঝিয়ে দিয়ে বেশ একটু অস্থিরভাবেই বললে আমার ... কি বলে... মানে একটা জরুরী....

ঠিক আছে। ঠিক আছে। —পরাশরকে তার অস্বস্তি থেকে বাঁচাবার জন্যেই উদার হয়ে রতনমলজি বেল টিপে এক কর্মচারীকে ডেকে আমাদের গাড়িতে পৌঁছে দেবার হুকুম দিয়ে পরাশরকে উদারভাবেই বললেন—বোঝাপড়া কিন্তু এই শুরু ভার্মাজি। মনে ত হচ্ছে আমাদের কোম্পানি ভালো জমবে।

হ্যাঁ ঠিক ঠিক—বলে যেন পালিয়ে যেতে পারলে বাঁচে এইভাবে পরাশর রতনমলজির অনুচরের পিছু পিছু আমাকে নিয়ে নিচে নেমে গেল। পরাশরেরই যখন এই অবস্থা তখন আমার দশা যে কি হয়েছে তা বোধ হয় আর বুঝিয়ে বলতে হবে না।

যে খানদানী গাড়ি আমাদের এনেছিল সেইটিই অপেক্ষা করছিল আমাদের জন্য নিচের গাড়ি বারান্দায় তলায়।

সেটিতে উঠে বাড়ি যাবার পরে পরাশর এমন গুম হয়ে বসে রইল যে তার সঙ্গে যা হয়ে গেল সে ব্যাপারটা নিয়ে কোনো আলোচনাই করতে সাহস হল না।

এরপরে একটা অত্যন্ত মানুষে গাড়িতে ঠাসা বড় রাস্তার ট্র্যাফিক জ্যামের মধ্যে আমাদের গাড়িটা থেমে থাকার সময় সে হঠাৎ যা করল তাতে আমি একেবারে থ।

গুম হয়ে বসে থাকতে থাকতে হঠাৎ এক সময়ে আমায় একটা ঠেলা দিয়ে ইঙ্গিত করে একদিকের দরজা খুলে সে গাড়ি থেকে নেমে 'জ্যাম'-এর সেই ভিড়ের ভেতর দিয়ে পাশের ফুটপাথে উঠে তারপর তাতে দুপা গিয়েই একটা সরু গলি পেয়ে তার ভেতর দিয়ে ছুট।

একেবারে দিশেহারা হয়ে ছুট আমাকেও দিতে হল তার পিছু পিছু। রতনমলজির গদিতে একরকম নাস্তানাবুদ হয়ে সে সত্যিই তখন একটু বেসামাল হয়ে পড়েছে বলে আমার সন্দেহ।

সন্দেহটা অবশ্য ভুল।

সেই আঁকাবাঁকা গলি দিয়ে বেশ কিছুটা যাবার পর একটা ছোট পার্ক গোছের জায়গা পেয়ে তারই ভেতরের একটা বেঞ্চিতে বসে পরস্পরের প্রাণখোলা হাসিতে তা বুঝলাম। বুঝলাম এর পরে সে যা যা করল তাতেও।

নিজের বাসায় আর ফিরে না গিয়ে শহরের অত্যন্ত ঘিঞ্জি দরিদ্র অঞ্চলের একটি অতি সাধারণ হোটেলে ক'দিন আমাদের আশ্রয় মিলল।

এরই মধ্যে লীগের অতি তুচ্ছ দুটো খেলাও হয়ে গেল এক হপ্তার মধ্যে দু'দিনে। এ দুটি খেলারই এক পক্ষ হল নীল খয়েরী 'জার্সি'র দল। দুদিনের খেলাতেই ছোট আব্বাসকে খেলতে দেখা গেল। আর কিছু না করুক চীনের প্রাচীরের মত একাই সে বিপক্ষ দলের সব আক্রমণ ঠেকিয়ে নীল-খয়েরীকে নিচের ধাপে নেমে যাওয়ার গ্লানি থেকে বাঁচাল। যেমন ছিল তেমনি প্রথম বিভাগেই টিকে রইল নীল-খয়েরী।

এরপর রতনমলজির কাছে পরপর যে ফোন করেছিল তা থেকেই সমস্ত ব্যাপারটার রহস্য কিছুটা হয়ত পরিষ্কার হতে পারে।

যতদূর মনে করতে পারছি, ফোনের আলাপটা শুনিয়ে দিচ্ছি...

...হ্যালো... হ্যালো। কে বলছেন, রতনমলজি। মাঝে মানে মাঝে যিনি ওমপ্রকাশ, আবার কখনো কখনো রিদয় সিং হন।

হ্যাঁ হ্যাঁ আমি পরাশর মানে ভার্মাজি বলছে। খুব দুঃখিত ওমপ্রকাশজি থুড়ি রতনমল থুড়ি রিদয় সিংজি। আপনার ওই প্যালেস-এ গিয়ে ভোজ খাওয়ার ভাগ্য আর বোধহয় হল না। যা হয়েছে তারপর কিছুদিন আপনাকে গা ঢাকা দিতে হবে বলে মনে হয়। তা যদি নাও হয় তবু খেলার ফাটকা ব্যবসা এখন অন্তত তেমন রমরম কবে আর বোধহয় চলল না।

বুদ্ধিটা অবশ্য খুব ভাল করেছিলেন আপনি। অতি রদ্দি একটা টীম। তার খেলা দেখতে টিকিট গছিয়ে দিলেও কেউ মার খেতে চায় কিনা সন্দেহ। সেই টীমের নিচের ডিভিশনে নেমে যাওয়া নিয়ে জুয়ার বাজি। টীমেব নাম নীল-খয়েরী। তাদের একমাত্র যাদুব কাঠি হল ছোট আব্বাস নামে এক হাফব্যাক। সে একাই একশ। বড় বড় ক্লাব তাকে পেলে লুফে নেয়, কিন্তু তার নিজের ক্লাবের ওপর আশ্চর্য টান। কোনো প্রলোভনেই তাকে সরানো যায় না। কিন্তু নীল-খয়েরীকে নামবাবার জন্যে তাকে সরানো একান্ত দরকার। কেমন করে সরানো হবে ? তাকে চুরি করে নিয়ে গিয়ে ? না অত কাঁচা ফন্দি রতনমলজির মাথা থেকে এবার বার হয়নি। চুরিই তিনি করার ব্যবস্থা করবেন, তবে ছোট আব্বাসকে নয়—আরেকজনকে।

সে আবার কে আরেকজন ? তাতে লাভ হবে কি ?

তাতে লাভ হবে এই যে পানি না ছুঁয়েই আসল মাছ ধরা হবে।

ব্যাপারটা আরও খুলে বলি—নীল-খয়েরীর আর দুটো খেলা মাত্র তখন বাকি। এ দুটো খেলাতে যদি ছোট আব্বাস নেমে পাহারা দেয় তাহলে আর কিছু না হোক একটা করে পয়েন্ট পেয়ে নীল-খয়েরী নিজের মান বাঁচাতে পারবে।

চুরি না করেও ছোট আব্বাসের এ দুটো খেলাতেই নামা বন্ধ করা যায় কি করে ? তাকে মেরে ধরে জখম করে, না, সে নেহাৎ সস্তা প্যাঁচ, আর তা ধরাও পড়তে পারে। তার চেয়ে মোক্ষম ফন্দি হল আরেক জনকে চুরি করা।

সে আবার কি কথা ? ছোট আব্বাসকে খেলায় নামতে না দিতে অন্য কাকে চুরি করবে ? তাতে কাজই বা হবে কি করে ?

একেবারে নিখুঁতভাবেই যে হবার কথা, প্ল্যানটা একটু খুলে বললেই তা বোঝা যাবে।

নীল-খয়েরীর তখনও দুটো খেলা বাকি।

প্রথম খেলাটা তাদেরই মত একটা রদ্দি টীমের সঙ্গে। চুরি করা হবে কিন্তু সেই

টীমেরই একটা রদ্দি খেলোয়াড়কে।

পাগলামি মন হচ্ছে। না, এই মাস্টার প্ল্যানই করেছে পরাশর—রতনমলজির অদ্ভুত ফন্দিটা ভণ্ডুল করতে।

কি ছিল রতনমলজির ফন্দি : ফন্দি ছিল নীল-খয়েরীর রদ্দি প্রতিদ্বন্দ্বী সফেদ গুলাবীর ওঁচা একটা খেলোয়াড় মাণিকলালকে লুকিয়ে মোটা ঘুষ দিয়ে একটা কাজে রাজী করাতে। কাজটা হল ছোট আব্বাসের সঙ্গে লেগে থেকে তাকে যখন তখন ধাক্কা কি ঠোক্কর দেওয়া। ছোট আব্বাসের অনেক গুণের মধ্যে একটা মহৎ দোষ তার ঠুনকো মেজাজ। বেয়াড়া একটু কিছু হলেই সে একেবারে ক্ষেপে যায়। এই ক্ষেপে যাওয়ার অপরাধে সে কতবার যে লাল কার্ড দেখেছে তার ঠিক নেই।

এ মরসুমে ক্লাবের জন্য প্রাণপণে নিজেকে সে সামলে রেখেছে এতদিন, কিন্তু মাণিকলাল তাকে এমন ক্ষেপিয়ে তুলবে যে সব সংযম হারিয়ে পাল্টা গুঁতো সে দেবেই। আর তা পাল্টা গুঁতো ত আর চোরা গুপ্তি নয়। তার দরুন ছোট আব্বাসকে লাল কার্ড দেখতে হবেই। আর সেটা দেখা মানেই পরের দিন তার খেলতে না পাওয়া।

খুব ভাল ফন্দিই করেছিল রতনমল, কিন্তু আর সব কিছু বাদ দিয়ে শেষ দুটি খেলার প্রথমটির আগে আর কাউকে নয় খোদ মাণিকলালকেই চুরি করে লুকিয়ে রাখার জন্য রতনমলের সব ফন্দি ভেস্তে গেল। দুদিনের খেলাতেই ছোট আব্বাস নামল আর গোল না দিতে পারুক তা ঠেকিয়ে নীল-খয়েরীকে চরম লজ্জা থেকে বাঁচিয়ে রতনমলজি থুড়ি রিদয় সিং, থুড়ি ওমপ্রকাশজিকে থুড়ি ঘুঘুমশাইকে লোকসানে অপমানে একেবারে দেশছাড়া করলে বলা যায়।

রাম রাম রতনমলজি। রাম রাম। থুড়ি পেন্নাম হই ঘুঘুমশাই, আপনার সুবুদ্ধি হোক এই দোয়া মাঙি।

কানা বসিরের ঘোড়া

নরেন্দ্রনাথ মিত্র

শীত পড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমরা সবাই উদগ্রীব হয়ে উঠলাম। আবার ঘোড়দৌড় দেখতে পাব। শীতের সময় আমাদের গ্রাম অঞ্চলে নানারকম আনন্দ-উৎসব হত। আমরা সার্কাস দেখতাম, লুকিয়ে লুকিয়ে যাত্রাগান শুনতাম, কবিগান শুনতাম, আর আমাদের গাঁয়ের মাঠে কি আশেপাশের গ্রামের মাঠে, চোমরদির মাঠে, কইডুবির মাঠে, হাতিমতলার মাঠে,—যখন যেখানে ঘোড়দৌড় হত আমাদের মন পক্ষিরাজ ঘোড়া হয়ে ছুটে যেত। মন ছুটে যেত। নিজেরা সশরীরে সব মাঠে আমরা যেতে পারতাম না। বাবার নিষেধ ছিল। তিনি বলতেন 'যেখানে সেখানে যেতে পারবিনে। আমাদের সঙ্গে যাবি।'

তাই কি হয়। সব সময় কি আর বাবার সঙ্গ ভালো লাগে। বাবাকে ভালোবাসিনে তা নয়, কিন্তু তাঁর চোখের আড়াল থেকেই ভালোবাসি।

শীতকালটা সত্যি বড় আনন্দ উৎসবের দিন ছিল। আমরা বই থেকে মুখস্থ করেছি বসন্ত হল ঋতুরাজ। কিন্তু মনে মনে সে কথা আমরা মোটেই মানতে পারিনি। রাজা যদি বলতে হয় বলি শীতকে। শীতের মত এমন কাল আছে না কি ? শীতের সময় গাছের শুকনো পাতা ঝরে তো ঝরুক, কিন্তু আমাদের নিজেদের গায়ে রাজপোশাক ওঠে। আমরা কোট পরতে পাই, রঙিন র‍্যাপার আসে কোন কোন বার। জুতো আসে মোজা আসে। বাপ্পু একবার টুপি আর মাফলারও আদায় করেছিল বাবার কাছ থেকে। ওর পোশাকের দিকে ভারি ঝোঁক। আর কানু ভোজন রসিক। নানাজাতের মাছ, বড় বড় মাছ পাওয়া যায় বলে শীতকাল ছিল ওর প্রিয়। ও নিজেও বঁড়শিতে মাছটাছ ধরতে পারত। কিন্তু শীতকালকে সবাই আমরা বেশি ভালোবাসতাম উৎসবের কাল বলে। বিশেষ করে ঘোড়দৌড়ের কাল বলে। সার্কাস তো আর রোজ দেখতে পেতাম না, যাত্রাও কালেভদ্রে শোনা হত। কিন্তু মুসলমান পাড়ার দুটি ঘোড়াকে আমরা প্রায় রোজই দেখতাম। দুটি ঘোড়া। একটি ছিল কানা বসিরের আর একটি ছিল সোনা মুনশীর। শেখ আর মুনশীদের মধ্যে ছিল রেষারেষি। কার ঘোড়া কত দামী, কার ঘোড়া কত তেজী ; কার ঘোড়া কত সুন্দর।

সত্যি ঘোড়া কী সুন্দরই না লাগত দেখতে। শুধু দামী দামী দৌড়ের ঘোড়া না, ভাঙার হাটের মোট টানা ঘোড়া, আমাদের পাড়ার মোটাসোটা রাম ভামারকে যে বেঁটে খাটো ঘোড়াটি বয়ে বেড়াত, সেই ঘোড়াও আমার মন হরণ করত। সব ঘোড়াই যেন সেই রূপকথার পক্ষিরাজের প্রতিনিধি। তেপান্তরের মাঠের সঙ্গী। ঘোড়ার জন্য

ইতিহাসের পাতাগুলি আমার কাছে রোমাঞ্চকর ছিল। আর দৌড়ের মাঠকে মনে মনে কল্পনা করে নিতাম যুদ্ধক্ষেত্র।

ছেলেবেলায় শীতকে যেমন ঋতুরাজের আসনে বসিয়েছিলাম, তেমনি পশুদের মধ্যে তখন ঘোড়াকেই সিংহাসন ছেড়ে দিয়েছিলাম। সিংহ তখনও দেখিনি। আরো বড় হয়ে কলকাতায় এসে দেখেছি তাকে চিড়িয়াখানায়। বন্দী সম্রাট। পশুদের মধ্যে রাজা না হোক, ঘোড়া যুবরাজ তো বটেই। যাত্রার আসরে রাজা মন্ত্রীর চেয়ে সেনাপতি আর যুবরাজের ওপরই আমার পক্ষপাত ছিল। এখনো তাই আছে।

কাজী বাড়ি আর মুনশী বাড়িতে ঘোড়া আসবার সঙ্গে সঙ্গে পাড়া ভবে সাড়া পড়ে যেত। কার্তিক অঘ্রান মাসে হরিছত্রের খেলা থেকে ঘোড়া কিনে আনত ওরা।

আবার মরশুম শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিক্রি করে দিত। প্রতিবছর আমরা নতুন ঘোড়া দেখতে পেতাম।

কাজী বাড়ি বসির মিঞার শ্বশুরবাড়ি। অল্পবয়সে রহমৎ কাজীর ঘরজামাই হয়ে এসেছিল বসির। বউয়ের সঙ্গে বাড়িঘর জমি-জমা সব পেয়েছে। কিন্তু পদবীটা পায়নি। সবাই তাকে বসির শেখই বলত। কানা বসির। দু চোখওয়ালা বসিরও একজন ছিল। তাই অশ্বপতি বসিরকে আলাদা করে চেনাবার জন্যে সবাই বলত কানা বসির। অবশ্য সামনে নয় আড়ালে। চিরদিনের জন্যে বুজে যাওয়া একটি চোখ বড় বিশ্রী দেখাত। কিন্তু ওর এই কানা চোখটি আমার কাছে ছিল রহস্যের আধার। প্রথম যৌবনে পুব সদরদির শিকদারদের সঙ্গে কাজিয়া করতে গিয়ে সড়কির খোঁচায় ডান চোখটি যায় বসিরের।

লম্বা চওড়া দাড়িওয়ালা বসির শেখকে বীরপুরুষ বলে মনে হত আমার। ভালো লাগত তার ওই বিশালতা। তার ওই কানা চোখে ঢাল সড়কিধারী এক যোদ্ধাকে দেখতে পেতাম আমি।

সোনা মুনশীও কেউকেটা ছিল না। বশিরের মত অত বলবান না, কিন্তু ভারী শৌখিন পুরুষ সোনা মুনশী। লম্বা ছিপছিপে চেহারা, ফরসা রং। মাথায় কোঁকড়ানো চুল। সোনা মুনশীর গর্ব ছিল সে লেখাপড়াজানা বনেদী পরিবারের ছেলে। সে কারো ঘরজামাই নয়। নিজের বাড়িতে নিজেই বাস করে।

বসির সে কথা শুনে বলত 'বাড়ি মানে তো ওই ভিটেটুকু। জমিজমা তো সব গেছে। আমার সঙ্গে জেদ করে বছর বছর ঘোড়া কেনে। কিন্তু তার দানাপানি জোটাতে ঘটিবাটি বাঁধা দিতে হয়।'

মুনশীদের পড়ন্ত অবস্থা, বসিরদের উঠতি ঘর। অনেক জায়গা জমি করেছে বসির। নিজেরাই চাষ আবাদ করে। অনেক লোকজন আছে। জোয়ান ছেলেই আছে তিনজন। দুই পরিবারের এই রেষারেষি—মানের সঙ্গে ধনের এই প্রতিযোগিতা আমরা খুব উপভোগ করতাম। ঘোড়দৌড় হত শুধু শীতের মুরসুমে। কিন্তু বসির শেখ আর সোনা মুনশীর মধ্যে দৌড়ের প্রতিযোগিতা চলত সারা বছর। শুধু কি সারা বছর ? সারা জীবন ধরে ওরা আড়াআড়ি করেছে। কে কার আগে যাবে। ওরা নিজেরাই যেন দুই দৌড়ের ঘোড়া।

সে বছরও দুটি ঘোড়া আসবার সঙ্গে সঙ্গে পাড়া চঞ্চল হয়ে উঠল। দুটি ঘোড়া তো নয়, যেন দুই অশ্বারোহী বাহিনী এসেছে আমাদের সদরদি গ্রামে। তাদের খুরের শব্দে আমাদের উত্তেজনা বাড়ে। বসির শেখ একই রংয়ের ঘোড়া প্রতি বছর আনে।

পাটকেলে রংই তার পছন্দ।

কিন্তু সোনা মুনশী বার বার রং বদলায়। এবার তার ঘোড়ার রং ধবধবে সাদা। ভারী সুন্দর দেখতে ঘোড়াটি। বসির শেখের ঘোড়ার চেয়েও ভালো দেখতে।

সেই রূপ দেখে আর রং দেখে কানু বাঞ্জু, সোনা মুনশীর দলে ভিড়ে গেল। ওরা বলতে লাগল, 'তুমি দেখে নিয়ো দাদা এবার ওই সোনা মুনশীই জিতবে। রাগে দুঃখে কানা বসিরের আর একটি চোখও যাবে এবার। বুক চাপড়ে মরবে।'

আমি বসিরের দলে বলে ওরা আমাকে খেপাত।

আমি বলতাম, 'বসির কোনদিন বুক চাপড়ায় না। ওর কত বড় চওড়া বুক দেখেছিস ? সে বুকে টোকা দিয়ে কথা বলে। বসির তোদের ওই ফিনফিনে প্যানপেনে সোনা মুনশী নয়। সে বীরের জাত। কে জানে হয়তো শেরশা ছিলেন ওর পূর্বপুরুষ।'

কানু বলল, 'হুঁ কত বড় বীর তা জানা আছে। তুমি যখন যাকে তোল তাকে একেবারে গাছের আগডালে তুলে দাও। সবাই জানে বসির মানুষ ভালো নয়। নানা রকম কূট-কচালে বুদ্ধি ওর মাথার মধ্যে ঘোরে। জমি-জায়গা নিয়ে আমাদের সঙ্গে পর্যন্ত বিবাদ করে। বাবাকে সামনে মেজোকর্তা বলে সেলাম দেয়, কিন্তু আড়ালে আবডালে নিন্দা করতেও ছাড়ে না। ও তো আমাদের শত্রু। তুমি সেই শত্রুর পক্ষ নিয়ে কথা বলছ।'

এ সব কথা আমিও জানতাম। তবু বসির আমার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করত। আদর করে ডাকত, 'বড়কর্তা।'

আমি তাতে মনে মনে খুশি। অত বড় লম্বা চওড়া মানুষটি আমাকে বড়কর্তা বলে সম্মান করে দেখে আমি খুব তৃপ্তিবোধ করতাম।

কিন্তু সোনা মুনশী আর বসির শেখ কদিনের মধ্যেই যেন আড়ালে পড়ে গেল। তারা মালিক হলে কি হবে ঘোড়ায় তো ওঠে না, ঘোড়া চালায়ও না। তারা শুধু ঘোড়ার মালিক হয়েই খুশি। কিন্তু আমরা বেশি মর্যাদা দিই ঘোড়ার যারা সহিস তাদের। তারাই আমাদের চোখে বীরপুরুষ ঘোড়সওয়ার। আমার আর বাঞ্জুর দুজনেরই স্বপ্ন ছিল অন্তত একবার করে ঘোড়সওয়ার হব। বাঞ্জু, সোনা মুনশীর ঘোড়ার পিঠে উঠবে, আমি কানা বসিরের। কানু গোড়া থেকেই বিচক্ষণ ছেলে। ও ওসব অবাস্তব কল্পনার ধারে ঘেঁষত না। ঘোড়া কোনদিন ও স্বপ্নে দেখেনি। আমার আর বাঞ্জুর অনেক অসফল স্বপ্নের মধ্যে সেই ঘোড়সওয়ার হওয়ার স্বপ্নও বিবর্ণ হয়ে মিশে আছে।

আমরা কেউ দৌড়নো ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হতে পারিনি, দাঁড়ানো ঘোড়ার পিঠে দু একবার উঠেছি। আমরা নিজেরা সওয়ার হতে না পারলেও দুজন সওয়ারের সঙ্গে আমরা প্রায় একাত্মা হয়ে মিশে গিয়েছিলাম।

সোনা মুনশীর সওয়ারের নাম মোবারক আর কানা বসিরের সওয়ার ছিল মীর্জা ইসমাইল। দুজনেই প্রায় সমবয়সী। বাইশ তেইশ বছর হবে বয়স। মোবারক দেখতে বেঁটেখাটো, গায়ের রং ঘোর কালো। আর মীর্জা ইসমাইল ঠিক তার উল্টো। ছিপছিপে লম্বা, গায়ের রং ফরসা। দুজনেই রঙিন লুঙ্গি পরত।

সবাই বলাবলি করত ইসমাইলকেই মানায় সোনা মুনশীর সাদা ঘোড়ার পিঠে। আর বদখত চেহারার মোবারকটা আসুক কানা বসিরের সওয়ার হয়ে। কিন্তু কেউ তা হয়নি। এই একটু বেমানান ধরন আমাদের চোখে সয়ে গিয়েছিল।

দুজনেই গরিবের ছেলে আর দুজনেই বেশ প্রভুভক্ত। বলা যায় নিজের ঘোড়ার ভক্ত। ঘোড়াকে ওরা যত যত্ন করত নিজেদের দেহের যত্নও যেন তত করত না।

ঘোড়াকে সময়মত নাওয়ানো, ছোলা খাওয়ানো, মাঠের সবুজ ঘাস খাওয়ানো, ওদের দৌড়ের অভ্যাস ঠিক রাখা, এই ছিল ওদের কাজ।

আমাদের নদীর ঘাটেই দুটি ঘোড়াকে ওরা নাওয়াতে আনত। আমাদের ঘাট কোন বাঁধা ঘাট না। লোকজন চলতে চলতে যেমন পথ তৈরি হয়, বহু লোক নাইতে নাইতে তেমনি ঘাট তৈরি হয়েছিল। বর্ষার দিনে খাল বেয়ে জল আমাদের বাড়ি পর্যন্ত আসত। বাড়িখানা সেই জলের ওপর ভাসত। আর বন্যা-টন্যা হলে বাড়িটি ডুবেও যেত। আবার শীতে গ্রীষ্মে সেই জল মরতে মরতে নদীর কোলে গিয়ে লুকোত। বর্ষার সময় আমরা যেমন খালের জলে ঝাঁপাঝাঁপি করতাম, সাঁতার কাটতাম, জল ছেড়ে উঠতে চাইতাম না, শীতের দিনে তেমনি উলটো। তেল টেল মেখে জলের ধারে যেতাম। কিন্তু ধারেই বসে থাকতাম। সহজে জলে আর নামতে চাইতাম না।

সেই ঘাটে বাঘে গরুতে অবশ্য একসঙ্গে জল খেত না, তবে গরু মোষ, মেয়ে পুরুষ একই ঘাটে নাইত। মেয়েদের দেখলে পুরুষরা সরে দাঁড়াত, শিংওয়ালা গরু মোষ দেখলেও লোকে তাদের সমীহ করত। কিন্তু শৃঙ্গী না হয়েও সবচেয়ে বেশি সম্মান পেত দুটি ঘোড়া। ওদের আমরা সবাই ঘাট ছেড়ে দিতাম, পথ ছেড়ে দিতাম। এই যুগল অশ্ব ছিল আমাদের পাড়ার গৌরব। ওরা যেন শুধু ওদের মালিকদেরই সম্পত্তি নয়, আমাদের সকলেরই সম্পদ।

নিজেদের নাওয়ার কথা ভুলে গিয়ে আমরা ঘোড়ার নাওয়া দেখতাম। মোবারক আর ইসমাইল জলে নেমে ওদের গা ডলে দিত। সযত্নে স্নান করাত। দৌড়ের মাঠে ওদের রেষারেষি থাকলে কি হবে নদীর ঘাটে ওদের মধ্যে বেশ মেলামেশা দেখতে পেতাম। ওরা নিজেদের মধ্যে হাসি তামাশা করত একজন আর একজনের গায়ে জল ছিটিয়ে দিত। সে সব তামাশার ভাষা আমরা বুঝতে পারতাম না। কিন্তু ওদের বন্ধুত্বের কথা বুঝতে পারতাম। ওদের মালিকদের মধ্যে যত ঝগড়াঝাঁটিই থাক, ওদের মধ্যে বেশ ভাব আছে। ভাব কি ওই দুটি ঘোড়ার মধ্যেই ছিল না!

চালাঘরের দুই বাড়ির দুটি আস্তাবলে ওরা বাঁধা থাকত। মাঝে মাঝে পা ঠুকত। কখনো বা বীরদর্পে, কখনো বা মশার কামড়ে বিরক্ত হয়ে। মাঝখানে শুকনো ছোট একটি খাল খটখট করত। হ্রীং হ্রীং করে পরস্পরকে দেখে ওরা ডাক ছাড়ত। সে আহ্বান শুধু যে দ্বন্দ্বযুদ্ধের তা আমার মনে হয় না, তাতে ওদের প্রীতিও প্রকাশ পেত।

নদী থেকে নেয়ে উঠবার পর সওয়ারকে পিঠে চড়িয়ে ওরা যখন পাশাপাশি হেঁটে বাড়ির দিকে যেত, মনে হত পিঠের সওয়ারের মত ওরাও নিজেদের মধ্যে মৃদুস্বরে গল্প করতে করতে চলেছে। সে ভাষা আমরা জানিনে। ওদের সহিসরাই কি জানে?

দু তিনটে দৌড় হয়ে গেল ছাতিমতলার মাঠে, পুর সদরদির মাঠে। সে সব মাঠে যাওয়ার এবারও আমরা অনুমতি পেলাম না। তবে সেজন্যে আমাদের বেশি আপসোসও নেই। ছোট মাঠের দৌড়। সে দৌড় তেমন জমেওনি। অল্পই ঘোড়া এসেছিল। তা ছাড়া কোন মাঠেই দুজনে একসঙ্গে ঘোড়া পাঠায়নি। কানা বসির আর সোনা মুনশীর মধ্যেই যদি দৌড়ের প্রতিযোগিতা না দেখতে পেলাম তবে আর কী দেখব।

সবচেয়ে শেষ দৌড় হবে পৌষ-সংক্রান্তিতে চোমরদির মাঠে। সেই দৌড় দেখবার জন্যে আমরা অপেক্ষা করতে লাগলাম।

অনাথ বলল, 'দেখব চোমরদির মাঠেও তোমাদের যাওয়া হয় কি না।'

অনাথ বাড়ির চাকর হলে কি হবে, আমাদের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা।

আমি গিয়ে ঠাকুরমার কাছে নালিশ করলাম, 'শোন দিদিভাই, অনাথ নাকি আমাদের চোমরদির মাঠেও নিয়ে যাবে না।'

দিদিভাই ভরসা দিয়ে বললেন, 'তাই কি হয় ? তোদের খেপাচ্ছে। বছর অন্তে একটা দৌড় তোরা দেখবিনে। মহিন্দিরকে বলে দেব, নিশ্চয়ই নিয়ে যাবে তোদের।'

আমরা কেউ আর এখন ছোট নই যে কোলে কাঁধে করে আমাদের নিয়ে যেতে হবে। পাড়ায় আর কত লোক যাবে। আমাদের সমবয়সী খেলার সঙ্গী বিনোদলাল প্রিয়লাল আমাদের চেয়ে একটু বড় নেছুদা বেচুদারা যাবে। বাড়ির কারো সঙ্গে না গিয়ে বরং ওদের সঙ্গে যেতেই মজা বেশি। অনুমতি যদি না পাই দলের সঙ্গে পালিয়ে চলে যাব। কিছু বকুনি না হয় খাব ফিবে এসে।

আমরা পৌষ-সংক্রান্তির প্রতীক্ষা করি, আর অনাথের সঙ্গে মাঝে মাঝে জল্পনা-কল্পনা চলে।

'কার ঘোড়া জিতবে বল তো অনাথ।'

অনাথ তো আর আমাদের মত স্কুলের ছাত্র নয়। আমাদের চেয়ে বয়সেও বেশ বড়। ও বাড়ির সব রকমের কাজ করে। সব মহলেই ওর আনাগোনা। সুবিধেমত ও পরামানিক প্রাণ শীলের আড্ডাতেও যায় আবার দাশু ধোপার বাড়িতে গিয়েও তাস খেলে। যে সব জায়গায় খবরের জন্ম, তার সর্বত্রই ওর যাতায়াত।

'কার ঘোড়া জিতবে অনাথ ?' আমি ওকে সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করি।

অনাথ যেন দৈবজ্ঞ।

সহজে ধবা দেয় না অনাথ। হেসে বলে, 'আমি কী করে জানব ? আমি কি গুনতে জানি ?'

'তবু বল না। তুমি তো অনেক খবর রাখো।'

অনাথ বলে, 'খবর টবর যা শোনা যাচ্ছে তাতে খোনা মুনশীরই জয়জয়কার।'

সোনা মুনশী একটু নাকি সুরে কথা বলে। তাই অনাথ ওর নাম দিয়েছে খোনা মুনশী। নামটা আস্তে আস্তে চালু হচ্ছে। এ নাম শুনে কানা বসিরই নাকি সবচেয়ে খুশি।

আমি বললাম, 'কেন খোনা মুনশীর জয়জয়কার কেন ?'

অনাথ বলল, 'কানা বসিরের কপাল মন্দ বলে।'

'কপাল মন্দ কেন ?'

'অত কেনর জবাব কে দেবে ? দিলেও তুমি বুঝবে নাকি ? সবটা কপালের দোষ না নিজের স্বভাবের দোষ। তোমার বাবা মেজোকর্তাকে গাইতে শোন না ? মিছে কেন দোষ হে কপাল, আপন আপন কর্মফলে কেউ বা রাখাল, কেউ বা ভূপাল। কানা বসিরের বেলাতেও তাই হয়েছে। গ্রামসুদ্ধু লোকের সঙ্গে মানুষটার বিবাদ। কারো সঙ্গে দেওয়ানী, কারো সঙ্গে ফৌজদারী লেগেই আছে। বিশেষ করে জমির সীমানা নিয়ে রায়দের সঙ্গে ওর লড়তে যাওয়া মোটেই ভালো হয়নি।'

আমি রললাম, 'লোকটা না হয় খারাপই আছে। কিন্তু ওর ঘোড়াটা তো খারাপ না, সওয়ারটা তো খারাপ না। মাঠ ভরে দৌড়বে তো ঘোড়াই। বসির নিজে তো আর দৌড়বে না।'

অনাথ পরম বিজ্ঞের মত বলল, 'দুনিয়াটা অত সোজা না। পৃথিবীটা মতি ময়রার দোকানের জিলিপি। অন্তত আড়াইটি প্যাঁচ তাতে আছে।'

সত্যি ব্যাপারটা আমি কিছু বুঝতে পারিনি। বুঝবার মত বয়স তখন ছিলও না। তবে শুনলাম এই নিয়ে নাকি দাশু ধোপাদের তাসের আসরে বাজি ধরা হচ্ছে। শুধু সন্দেশ রসগোল্লার বাজি নয়। নগদ টাকার বাজি। অনাথও আছে এই দলে। তারও নিশ্চিত ধারণা সোনা মুনশীর ঘোড়াই জিতবে। গুপী গুনিন বলেছে কিনা কে জানে। অনেক সময় তার কথা ফলেও যায়।

কিন্তু দুদিন বাদেই আমি ওসব কথা ভুলে গেলাম। কে জিতবে কে হারবে তা নিয়ে আর আমি মাথা ঘামালাম না। যেই জিতুক তাতে আমার কি, আমি তো আর বাজি রাখতে যাচ্ছিনে। আমরা দেখব দৌড়।

সংক্রান্তির দিন চোমরদির মাঠে ঘোড়াগুলিই দৌড়ায়। কিন্তু সংক্রান্তির দিনটি যেন মোটেই দৌড়াতে জানে না। বুড়ো মানুষের মত ধীরে ধীরে পা টিপে টিপে হাঁটে। পঞ্জিকার সংক্রান্তি পুরুষের ছবির কথা মনে পড়ে। হাতে লাঠি। দেহটা সামনের দিকে নোয়ানো।

শেষ পর্যন্ত এসে হাজির হল পৌষ-সংক্রান্তি। এই দিন মাঠে যেমন ঘোড়দৌড়ের উৎসব, আমাদের বাড়িতেও তেমনি আর একটি উৎসব অনুষ্ঠান ছিল। তখন বারমাসে শুধু তের কেন পার্বণের সংখ্যা আরো বেশিই হত। পৌষ মাসে কোন দেবদেবীর অর্চনা হয় না, শুধু সংক্রান্তির দিন বাস্তুপুজো আছে। বাস্তুর কোন মাটির মূর্তি নেই। বাড়ির সীমান্তে একটি জিকাগাছের চারদিকে মাটির বেদী বেঁধে সেখানে পুজো হত। প্রসাদ হত চৌরী। সেই গাছের তলায় উনুন তৈরি করে পুরোহিত দুধে আর চালে চৌরী বেঁধে বাস্তু দেবতাকে নিবেদন করতেন। পুজো শেষ হয়ে গেলে তা নরদেবতার ভোগে লাগত। কলার পাতায় করে আমরা সেই গাছতলায় চৌরী খেতে বসে যেতাম। তাতে কোন মিষ্টি থাকত না। না গুড় চিনি না বাতাসা। তবু কী অপূর্ব স্বাদ ছিল সেই চৌরীর। দিদিভাই বলতেন দেবতার ভোগ কিনা তাই অমৃত। দুপুরে সেই বিনা মিঠার চৌরী, আব সন্ধ্যার পর পিঠে পায়েস। মাঝখানে বিকেল বেলায় চোমরদির মাঠে ঘোড়দৌড়।

পৌষ-সংক্রান্তির দিনটি এই তিন উৎসবের মালা পরে আসত।

পেটভরে চৌরী-প্রসাদ খেয়ে দুপুরের পরেই আমরা এই চোমরদির মাঠের দিকে রওনা হলাম। যে যত আগে যেতে পারে সে তত ভালো জায়গা পাবে দাঁড়াবার। আমাদেব বাড়ি থেকে চোমরদির মাঠ মাইল দেড়েক দূর। ডিস্ট্রিক্টবোর্ডের রাস্তা ছাড়িয়ে আরো দু একখানা ছোট ছোট মাঠ পেরোতে হয়। পথে নেমেই দেখলাম সারা সদরদি গ্রাম চোমরদির দিকে এগিয়ে চলেছে। কাতারে কাতারে মানুষ। বালবৃদ্ধবনিতা। বনিতা অবশ্য নেই, কিন্তু বালকও আছে, বৃদ্ধও আছেন। কালো কুচকুচে মাথার আগে পিছে টাকমাথা আর সাদা মাথাও দেখা যাচ্ছে। কিশোর আর যুবকরা তো আছেই। উল্লাসে আনন্দে তারা নিজেরাই যেন এক একটি ঘোড়া, নিজেরাই যেন এক একজন ঘোড়সওয়ার।

দু চারটি ঘোড়াকেও যেতে দেখলাম আমাদের সঙ্গে। সহিসরা তাদের ধীরে ধীরে হাঁটিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এত ভিড়ে ছুটাবার জায়গা নেই।

বাবার পাশে পাশে হাঁটছিলাম। তাঁকে বললাম, 'বসিরের ঘোড়াটা কোথায় ?'

বাবা বিরক্ত হয়ে বললেন, 'তোর কেবল বসির আর বসির। বসিরের ঘোড়া ছাড়া কি আর কোন ঘোড়া নেই। বোধহয় আগে চলে গেছে তার ঘোড়া।'

বসির আমার প্রিয়পাত্র। আমাকে বড়কর্তা বলে ডাকে। আরো ছেলেবেলায় আদর

করে ওর ঘোড়ার ওপর আমাকে চড়িয়ে দিয়েছিল। অন্যের সহায়তায় শৈশবের সেই অশ্বারোহণে কোন শৌর্যবীর্য ছিল না। কিন্তু তার মাধুর্যটুকু এখনো মনে লেগে আছে। আমিও বসিরকে পারতপক্ষে কানা বলিনে। পারি তো তাকে কমলনয়ন বলে ডাকি। সামনে বলি বসির চাচা।

বাবার ধমক খেয়ে আমি চুপ করে রইলাম। আমাদের পাশে পাশে চন্দ্রেশ্বর রায়ও য'চ্ছিলেন। তিনি গ্রামের ধনী ব্যবসায়ী। গঞ্জে আছে তেলনুনের আড়ত ; মাঠেও জমিজমা বিস্তর। অনাথের কাছে শুনেছি এতবড় ধনীর সঙ্গেও জমির সীমানা নিয়ে বসির বিবাদ বাধিয়ে রেখেছে।

চন্দ্রেশ্বর রায় বেশ সুপুরুষ। কাশ্মীরী শালখানা তাঁর কাঁধে বেশ মানিয়েছে। আমি দেখতে দেখতে যাচ্ছিলাম।

হঠাৎ বাবা বললেন, 'কী রায়মশাই ? আজকে মাঠে দৌড়টা কি রকম হবে ?'

রায়মশাই হেসে বললেন, 'দেখতেই পাবেন মাঠে গিয়ে।' তারপর মাথা নীচু করে বললেন, 'বসিরের বড় বাড় বেড়েছে। ঘোড়া নিয়ে ওর দেমাকের সীমা নেই। একটু শিক্ষা না দিলে আর চলছে না।'

শুনে মনটা আমার দমে গেল। কী করে শিক্ষা দেবেন ওঁরা বসিরকে ? ওর ঘোড়াকে কি মাঠে দৌড়তেই দেবেন না ? ওঁরা বড়লোক মানুষ। সব পারেন। তা ছাড়া পুরস্কার-টুরস্কারও তো ওঁরাই দেন। যাদের ঘোড়া জেতে তারা কলসী পায়, সওয়ার পায় শাল আলোয়ান। যদিও চোমরদি গ্রামের দৌড় তবু আমাদের গ্রাম থেকেও দু একটা পুরস্কার যায়। রায়মশাইরাও ডোনার।

চোমরদির মাঠে গিয়ে দেখলাম আমাদের আগেই বহু লোক জড় হয়েছে। গ্রাম গ্রামান্তর থেকে লোক এসেছে ঘোড়দৌড় দেখতে। ধুতিপরা হিন্দু আর লুঙ্গিপরা পাজামা পরা মুসলমানরা সব পাশাপাশি দাঁড়িয়েছে। মুসলমানদের সংখ্যাই বেশি। ছোট ছোট ছেলেমেয়েকে কাঁধে নিয়ে দাঁড়িয়েছে কেউ কেউ। উঁচু থেকে দেখতে পাবে বলে কেউ উঠেছে গাছের ডালে কেউ উঠেছে ঘরের চালে।

মাইল দেড়েক লম্বা মাঠটা ঘোড়াগুলিকে ছুটিয়ে আনতে হবে। দুদিকে আড়াআড়িভাবে কাঁচা সবুজ বাঁশ বেঁধে দেওয়া হয়েছে। মাঝখানের পথটুকু দিয়ে ঘোড়া দৌড়বে। বাঁশের বেড়ার এপাশ থেকে দর্শকরা দেখবে। যে মাঠ দিয়ে ঘোড়া দৌড়ায় আমাদের অঞ্চলে তাকে বলা হত ছদ। আমার একবার ইচ্ছা হল ছদের গোড়াতেই থাকি, তাহলে ঘোড়াগুলি যেখান থেকে ছাড়বে দেখতে পাব। কিন্তু সব তো আমার ইচ্ছায় হবে না। প্রায় মাঝামাঝি জায়গায় আমরা দাঁড়ালাম। সেইখানেই দুই গাঁয়ের গণ্যমান্যরা সব রয়েছেন। সদরদির রায়েরা আছেন, চোমরদির চৌধুরীরা।

দৌড় আরম্ভ হওয়ার আগে সোনা মুনশী আর বসির শেখ দুজনেই আমাদের সঙ্গে দেখা করে গেল। দুজনেই আজ বেশ সেজে এসেছে। মাথায় টুপি, গায়ে রংচঙে জামা, পরনে পাজামা।

সোনা মুনশীকেই যেন বেশি খুশি খুশি মনে হল। কী জানি কিসের ভরসা পেয়েছে সে। বসিরকে দেখে বাবা জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি রকম মনে হচ্ছে বসির ? ঘোড়া জিতবে তো এবার ?'

বসির বলল, 'কী করে বলব মেজোকর্তা ? সব খোদার দোয়া আর আপনাদের মেহেরবানি। এ মাঠে তো কোনদিন হারিনি। তবে এবারে অনেক ভালো ভালো ঘোড়া

এসেছে। ঘোড়ার আমদানিও যথেষ্ট।'

বসির কিন্তু যাওয়ার আগে আমার দিকে একটু হেসে তাকিয়ে গেল। বলল, 'কী বড়কর্তা, তুমিও এসেছ ?'

ওর ঠোঁট ভালো করে দেখতে পেলাম না। কিন্তু এক চোখের সেই হাসিটুকু আমার চোখে অনেকক্ষণ পর্যন্ত লেগে রইল।

তারপর আরম্ভ হল দৌড়।

গোটা পঁচিশেক ঘোড়া নাকি এসেছিল সেবার। সবগুলি ঘোড়া তো আর একসঙ্গে দৌড়তে পারে না। জাত দেখে দাম দেখে আলাদা আলাদা দলে ওদের ভাগ করা হল। সব মিলিয়ে গুটি পাঁচেক গ্রুপ হল বোধহয়। চার পাঁচবার দৌড় দেখলাম আমরা। অন্য কোন ঘোড়াকেও চিনিনে, ঘোড়ার মালিককেও চিনিনে। তাদের সম্বন্ধে বিশেষ কৌতূহলও আমার নেই। আমাদের পাড়ার সোনা মুনশী আর কানা বসির কী করে তাই দেখবার জন্যেই আমি উৎসুক হয়ে ছিলাম।

সবচেয়ে উঁচু জাতের ঘোড়ার দৌড় সবচেয়ে শেষে। সেই জাতের মধ্যে দুজনেই আছে, কানা বসির আর সোনা মুনশী।

শেষ বারের মত চার পাঁচটি ঘোড়া আমাদের সমুখ দিয়ে বিদ্যুতের মত ছুটে চলে গেল। সবগুলিকে আলাদা ভাবে চিনতেও পারলাম না। শুধু লক্ষ করলাম সাদা ঘোড়াটাই আগে যাচ্ছে। দু তিনটি ঘোড়ার পিছনে আছে কানা বসিরের ঘোড়া। সওয়াররা উপুড় হয়ে রয়েছে ঘোড়ার পিঠের ওপর। ইসমাইল মির্জার অবস্থাও তাই। কিন্তু তার ঘোড়া সবাইকে ছাড়িয়ে যেতে পারছে কই। মাঠজুড়ে রব উঠেছে সোনা মুনশী সোনা মুনশী সোনা মুনশী।

ভাবলাম কানা বসির গেল তাহলে। কিন্তু গেল না। মাঠের একেবারে শেষের দিকে গিয়ে ইসমাইল মীর্জা তার ঘোড়া নিয়ে বেরিয়ে গেল। এবার অন্য নাম শোনা যেতে লাগল কানা বসির কানা বসির কানা বসির।

দৌড় শেষ হয়ে গেল কিন্তু আমরা সঙ্গে সঙ্গেই বেরোতে পারলাম না। ভিড় খানিকটা পাতলা হোক, তারপর বেরোব।

খানিক বাদে আবার আমরা বসির মিঞাকে সামনে দেখতে পেলাম। হাতে ঝকঝকে একটি পিতলের কলস। মুখে চিকচিক করছে হাসি।

বাবা বললেন, 'কী বসির এবারও ফার্স্ট। এবারে জিতে গেলে তাহলে।'

বসির বলল, 'খোদা তার বান্দার মান রেখেছেন কর্তা। মানুষ তাকে টেনে নামাতে অনেক কসরত করেছিল পারেনি।'

কে একজন অচেনা মুসলমান যুবক তার সঙ্গীকে বলল, 'বসিরের ঘোড়া এবারও জিতেছে। ইসমাইল হল এদিককার সেরা সওয়ার। সেই বসির মিঞাকে জিতিয়ে দিয়েছে।'

বসির তার দিকে তাকিয়ে হেসে বলল, 'মিঞাভাই, বল কানা বসির। দু চোখওয়ালা বসিরও তার ঘোড়া নামিয়েছিল মাঠে। তার ঘোড়া কান্দি কেটেছে।'

কান্দি কাটা মানে দৌড়ের মাঠ ছেড়ে অন্য দিকে চলে যাওয়া।

সন্ধ্যার পর সব রহস্য ভেদ হল।

দৌড়ের মাঠ থেকে ফিরে এসে সবাই বিশ্রাম করছিলাম। বাবা বারান্দায় বসে অনাথের সঙ্গে তামাক টানছিলেন হুঁকোয়।

কে যেন এসে তাঁর পায়ের কাছে বসে পড়ল। হ্যারিকেন জ্বলছিল একটু দূরে। তার আলোয় ইসমাইলের বিবর্ণ মুখ আমরা দেখতে পেলাম।

'মেজোকর্তা, আমাকে রক্ষা করুন।'

বাবা বললেন, 'আরে ইসমাইল যে। তোর এ দশা কেন। তুইই তো আজ দিগ্বিজয়ী সেকেন্দার শা।'

ইসমাইল সে কথায় কান না দিয়ে বলল, 'না মেজোকর্তা, আমাকে রক্ষা করতে হবে। আপনার কথা রায়মশাই শোনেন। আপনার সেরেস্তায় তাঁর মামলা মোকদ্দমা হয়। আপনিই পারবেন আমাকে বাঁচাতে।'

'কী করেছিস তাই বল দেখি।'

ইসমাইল বলল, 'ইচ্ছা করে করিনি হুজুর, বাধ্য হয়ে করেছি। রায়মশাইর ভিটে বাড়ির প্রজা তো আমি। আমি তাঁর হুকুমের গোলাম। তিনি একখানা দশ টাকার নোট আমার হাতে গুঁজে দিয়ে বললেন, খবরদার ইসমাইল, কানা বসিরের ঘোড়া যেন ছদের শেষ মাথা পর্যন্ত না যায়। হয় তাকে দিয়ে কান্দি কাটাবি না হয় সবচেয়ে পিছনে রেখে দিবি। তোর ঘোড়া তো তোর হাতের মধ্যে। যা বললাম করবি কিন্তু। নইলে পিঠের চামড়া থাকবে না। আমি বললাম—হুজুরের আজ্ঞা কি আমি অমান্য করতে পারি?'

বাবা বললেন, 'তারপর?'

ইসমাইল বলল, 'তারপর কর্তা দেখলেনই তো আমি খুব চেষ্টা করেছিলাম। লাগাম টেনে অনেক পিছনে রেখে দিয়েছিলাম ওকে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত জানোয়ারটা নিজের জোরে নিজেই বেরিয়ে গেল। তার সে কী রোখ, তার সে কী কুন্দি কর্তা। তাকে বাগ মানায় সাধ্য কার। তারপর ছদের ঘরের কাছাকাছি গিয়ে আমিও সব ভুলে গেলাম কর্তা। আত্মহারা হয়ে গেলাম। আমি যে কারো ভিটে বাড়ির প্রজা সে কথা ভুলে গেলাম। আমি যে মনিবের ধমক খেয়েছি টাকা খেয়েছি সে কথা আর মনে রইল না। আমি আর আমার ঘোড়া ছাড়া দুনিয়ার আর কিছু রইল না মেজোকর্তা।'

বাবা ওর মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে একটু হেসে বললেন, 'ঠিক আছে। ভাবিসনে, তামাক খাবি নাকি?'

হুঁকো থেকে কলকিটা তুলে নিয়ে ওর হাতে দিলেন বাবা।

ইসমাইল নিশ্চিন্ত হয়ে দু হাতের তালুর মধ্যে কলকিটা রেখে তামাক খেতে লাগল।

বীর ঘোড়সওয়ারকে এবার আমরা অনেক কাছ থেকে দেখতে লাগলাম। জীন থেকে এবার সে আমাদের মাদুরের ওপর নেমে বসেছে।

অভিজাতক

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

বোম্বাই শহর বড়মানুষের শহর। সেখানে পথে পথে নয়তলা দশতলা বাড়ি উদ্ধতভাবে দাঁড়িয়ে আছে ; মালাবার হিল্-এর প্রাসাদগুলি উচ্চ আসনে বসে আপন আপন গৌরব-গরিমা ঘোষণা করছে ; আবার তারই আশেপাশে চৌল আছে, যেখানে হীনজীবী মানুষ খোপের পায়রার মতন একটি কুঠরি নিয়ে বাস করছে ; অন্ধ গলির মধ্যে বস্তির অধিবাসীবা নিজেদের উলঙ্গ দীনতা লুকিয়ে রাখবার চেষ্টাও ছেড়ে দিয়েছে। প্রদীপের নীচেই অন্ধকার।

একটা স্যাঁতসেঁতে গলির মধ্যে ছোট একটি বাড়ি। দরজার দু'পাশে সুরকি-খসা দেয়ালেব জরাজীর্ণ নগ্নতা, রং-চটা দরজার কাঠের ওপর কাঁচা হাতে খড়ি দিয়ে লেখা—লোকনাথ সিংহ।

এই বাড়ির একটি ঘবে কেঠো তক্তপোশ ছাড়া আসবাব বলতে আর কিছু নেই। বালিশে পিঠ রেখে লোকনাথ বিছানায় হেলান দিয়ে শুয়ে আছে। মাঝে মাঝে খক্ খক্ কবে কাশছে। তার স্ত্রী কুসুম পিছন দিক থেকে স্বামীর কাঁধে হাত দিয়ে এমন ভাবে তাকে ধরে আছে যাতে সে কাশির বেগ সামলাতে পারে। লোকনাথের বয়স আন্দাজ ছত্রিশ, শরীর রোগ-জীর্ণ, সারা দেহে ক্লান্তির সুস্পষ্ট ছাপ।

কাশিব বেগ একটু কমলে কুসুম স্বামীকে একগ্লাস জল এনে দিল, তার জল খাওয়া হলে আঁচল দিয়ে তার মুখ মুছিয়ে দিল। লোকনাথ শূন্য দৃষ্টিতে দেয়ালের দিকে চেয়ে ক্ষীণস্ববে বলল—'শুনেছি জলে ডুবে মরার আগে মানুষ অতীত জীবনের ঘটনা ছবির মত দেখতে পায়। আমিও যেন আজ ঠিক সেই রকম দেখতে পাচ্ছি—'

কুসুম ব্যাকুল স্ববে বলে উঠল—'ওগো অমন করে বোল না, চুপ কর।'

তাব কথায় কান না দিয়ে লোকনাথ আপন মনেই বলে চলল—'ওই ছবিটা দেখলেই একটি দিনের কথা মনে পড়ে, বাবার সঙ্গে সেদিন—'

দেয়ালে একটি পুরানো ফটো—কম্পাউণ্ড-ঘেরা বড় বাড়ি, জমিদারের বাড়ি যেমন হয়, চারদিকে সুন্দর বাগান, বাগানের এক কোণে ফোয়ারা থেকে জল উৎসারিত হচ্ছে।

ফটোর দিকে চেয়ে লোকনাথ বলে চলেছে—'ওই ফোয়ারা দেখছ, বাবার সঙ্গে সেদিন ওবই কাছে বসে দাবা খেলছিলাম। দাবা খেলায় বাবার কী ভীষণ নেশা ছিল—'

স্মৃতির আলোয় দৃশ্যটি উজ্জীবিত হল। ফোয়ারার কাছে ছোট টেবিলের দু'পাশে বসে পিতাপুত্রের দাবা-খেলা চলছে। দু'জনেই খেলায় তন্ময়। বিশ বছরের যুবক লোকনাথ ; একনাথের বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি, চুলে পাক ধরেছে, মুখ দেখেই বোঝা যায় গর্বিত

কঠোর প্রকৃতির মানুষ, খেলার সময়েও তাঁর প্রচণ্ড ব্যক্তিত্ব নরম হয় না। তিনি পরাজয়ে অভ্যস্ত নন।

কয়েকবার চাল দেবার পর লোকনাথ মুচকি হেসে দান দিল, সহজ সুরে বলল—'কিস্তি। বাবা আপনি মাৎ হয়ে গেলেন।'

একনাথ ব্যগ্র বিস্ময়ে ছকের দিকে চেয়ে রইলেন। না, কোন সন্দেহ নেই, তিনি মাৎ হয়ে গেছেন। রাজার পালাবার রাস্তা নেই। তিনি বিড় বিড় করে বললেন—'আরে তাই তো, এটা কি রকম হল।' ছেলের দিকে ব্যর্থ চোখ তুলে তিনি হঠাৎ হো হো করে হেসে উঠলেন। 'ওহে ডাক্তার, এ কি কাণ্ড !'

পারিবারিক চিকিৎসক ডাক্তার পাণ্ডে বাড়ির দিকে যাচ্ছিলেন, একনাথের আহ্বানে কাছে এসে দাঁড়ালেন। ধীর শান্ত প্রকৃতির মানুষ, বুদ্ধিমান ও রসিক; বয়স আন্দাজ পঁয়তাল্লিশ।

একনাথের গলায় গর্ব এবং নৈরাশ্য একসঙ্গে ফুটে উঠল—'দ্যাখো ডাক্তার, কাণ্ডটা দ্যাখো। একটা কলেজের ছেলে কিনা আমায় মাৎ করে দিলে—'

লোকনাথ সসম্ভ্রমে উঠে নিজের চেয়ার ডাক্তারের দিকে এগিয়ে দিয়েছিল, তিনি হাসতে হাসতে লোকনাথের পিঠে চাপড় মেড়ে বললেন—'বাবুজি, আমাদের যৌবন ফুরিয়ে এল, এখন আমাদের হারের পালা। বিজ্ঞান বলে—'

'আরে রেখে দাও তোমার বিজ্ঞান। এ হচ্ছে বংশের ধারা। ছ্যাকড়া গাড়ির ঘোড়া রেসের বাজি জিততে পারে !'

ডাক্তার পাণ্ডে চেয়ারে বসে তর্ক জুড়লেন—'তা হয়তো পারে না, কিন্তু রেসের ঘোড়ার কুলুজি ঘাঁটলে দেখা যাবে গোড়ার কেউ না কেউ ছ্যাকড়া গাড়িই টানত।'

একনাথ হুঙ্কার দিলেন—'অসম্ভব। হতেই পারে না। রেসের ঘোড়ার বাচ্চাই রেসের ঘোড়া হয়। লোকনাথ, ঠিক কিনা ?'

লোকনাথ ঘাড় হেঁট করে রইল। একনাথ তখন বললেন—'তুমি আজ প্রমাণ করেছ বাঘের বাচ্চা বাঘ হয়। আমি খুশি হয়েছি। কি প্রাইজ চাই বল ?'

'প্রাইজ !' একটি প্রাইজের জন্যে তার মনে প্রবল লুব্ধতা ছিল, কিন্তু প্রবলপ্রতাপ বাপের সামনে সে-কথা উচ্চারণ করার সাহস হয়নি। এখন প্রাইজের কথা শুনে তার মুখ অরুণাভ হয়ে উঠল, সে একবার বাপের দিকে একবার ডাক্তারের দিকে চাইতে চাইতে মনে সাহস সঞ্চয় করতে লাগল। শেষে দাবার ঘুঁটি নাড়াচড়া করতে করতে জড়ানো গলায় বলল—'প্রাইজ দেবেন ? ঐ—'

একনাথ সাহস দিয়ে বললেন, 'বল, লজ্জা কি। কী নেবে—আরবী ঘোড়া, না হাল-ফ্যাশনের মোটরগাড়ি ?'

লোকনাথ আশান্বিত স্বরে বলল—'যা চাইব তাই দেবেন ?'

একনাথ হাসলেন—'যদি আমাদের সাধ্যে কুলোয়।'

লোকনাথ তখন লজ্জা-গদগদ কণ্ঠে বলল,—'বাবা, একটি মেয়ে আছে, আমি তাকে বিয়ে করতে চাই।'

নিমেষে একনাথের মুখের হাসি মিলিয়ে গেল, তিনি ভ্রূকুটি করে লোকনাথের পানে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে কড়া সুরে বললেন—'মেয়ে ? কার মেয়ে ?'

এখন আর পিছনো যায় না, লোকনাথ যথাসম্ভব ধীরভাবে বলল—'স্কুল-মাস্টারের মেয়ে, লখ্‌নৌতে বাড়ি। আমাদের বোর্ডিংয়ের কাছে বাসা ছিল।'

একনাথ অবিশ্বাসের সুরে বললেন—'স্কুল-মাস্টারের মেয়েকে বিয়ে করতে চাও ?'

লোকনাথ বলল—'তাতে দোষ কি ? ভিন্‌ জাতের মেয়ে তো নয়, ওরাও রাজপুত।'

ক্রুদ্ধ ব্যঙ্গের ভঙ্গিতে একনাথ বললেন—'তাহলেই হল ? দ্যাখো হে ডাক্তার, আজকালকার ছেলেরা দু'পাতা ইংরিজি পড়ে কি শিখেছে।'

একগুঁয়েমির বংশগত গরম লোকনাথের মাথায় চড়তে আরম্ভ করেছিল, ডাক্তারের দিকে চেয়ে সে বলল—'ইংরিজি পড়ার সঙ্গে এর কি সম্বন্ধ দেখতে পাচ্ছি না।'

একনাথের দৃষ্টি আরো কঠিন হয়ে উঠল—'চোখ থাকলে তো দেখবে। শোনো, আগে বংশের প্রতি কর্তব্য, তারপর অন্য কথা। স্কুল-মাস্টারের মেয়েকে বিয়ে করা চলবে না, সমান ঘরে বিয়ে করতে হবে। আমার কাছে বংশমর্যাদাই প্রধান।'

'কিন্তু—'

একনাথ গর্জন করে উঠলেন—'ব্যস্, অনেক শুনেছি, আর না ! আমি এ-বাড়ির মালিক, আমার কথা সবাইকে মেনে চলতে হবে। আমি যার সঙ্গে তোমার বিয়ে স্থির করব তাকেই বিয়ে করতে হবে। এই আমার শেষ কথা।' হাতের ঝট্‌কায় তিনি দাবার ঘুঁটিগুলো টেবিল থেকে নীচে ফেলে দিলেন, যেন এই ভাবেই উদ্যত বিদ্রোহকে ধূলিসাৎ করলেন।

লোকনাথ আর কোন কথা বলল না, কিন্তু তার মনের বিদ্রোহ মুখের ওপর প্রতিবিম্বিত হল। ডাক্তার পাণ্ডে এই পারিবারিক অগ্ন্যুদ্‌গারের সামনে পক্ষাহাতের মত বসে রইলেন।

রোগপাণ্ডুর লোকনাথ ছবির দিকে তাকিয়ে থেকে হাত বাড়িয়ে কুসুমকে কাছে টেনে নিল, আপন মনে বলে চলল—'আমার মাথার তখন ঠিক ছিল না, শুধু জানতাম কুসুমকে না পেলে আমি বাঁচব না। কাউকে না জানিয়ে তাকে বিয়ে করে বাড়ি ফিরে এলাম—'

বর-বধূ বেশে লোকনাথ ও কুসুম বাগানের রাস্তা দিয়ে ধীরে ধীরে বাড়ির দিকে আসছে।

বাড়ির বারান্দায় একনাথ অগ্নিস্তম্ভের মত জ্বলছেন, মুহূর্তে একটা বিপর্যয় হতে পারে। চারিদিকে থমথমে ভাব। কিছু দূরে ডাক্তার পাণ্ডে উদ্বিগ্ন মুখে দাঁড়িয়ে আছেন।

বর-বধূ বারান্দার সিঁড়ির কাছে আসতেই একনাথ বজ্রের মতন গর্জে উঠলেন—'এত সাহস তোমার ! এই মেয়েকেই বিয়ে করেছ ! তবে আমার কাছে এসেছ কেন ? যাও, এ বাড়িতে তোমার ঠাঁই নেই, আমার সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই। আজ থেকে তুমি আমার ত্যাজ্যপুত্র।'

পাণ্ডে ব্যাকুল হয়ে ছুটে এলেন—'বাবুসাহেব, এ আপনি কি করলেন ! আপনার একমাত্র সন্তান—'

'আমার সন্তান নেই। যাও, দূর হয়ে যাও, তোমার মুখ দেখতে চাই না।'

লোকনাথ স্থিরদৃষ্টিতে পিতার মুখের দিকে চেয়ে থেকে বলল—'তাই যাচ্ছি বাবা। আমিও প্রতিজ্ঞা করছি—আপনি ডেকে না পাঠালে কোনদিন ফিরে আসব না।'

জোড়হাতে নত হয়ে সে বাপকে প্রণাম করল, তারপর কুসুমের হাত ধরে ধীরে ধীরে গেট পার হয়ে চলে গেল।

বাড়ির ঝি-চাকরেরা এতক্ষণ এক জায়গায় দাঁড়িয়ে চুপ করে শুনছিল, তাদের মধ্যে কেউ কেউ চোখের জল মুছতে লাগল। বাড়ির পুরোহিতমশাই বারান্দার এক কোণ থেকে

সব দেখছিলেন, তিনি আর্দ্র চোখে গভীর নিশ্বাস ত্যাগ করলেন। একনাথ পরিজনদের দিকে ফিরে উগ্রস্বরে বললেন—'তোমাদের সাবধান করে দিচ্ছি, আমার ছেলের সঙ্গে যদি কেউ সম্পর্ক রাখো, তাকেও দূর করে দেব। ওর নাম এ বাড়িতে কেউ উচ্চারণ করবে না।'

লোকনাথ বিছানায় বসে আছে, কুসুম তার পিছন থেকে কাঁধে হাত রেখে দাঁড়িয়ে অতীতের দুঃস্বপ্ন দেখছে।

লোকনাথ বলছে—'...পনেরো বছর কেটে গেল, মনে হয় যেন সেদিনের কথা। এর মধ্যে কত ওলট-পালট হয়ে গেছে। সোমনাথ জন্মাল...আর আমি দিনে দিনে তলিয়ে যাচ্ছি...অভাব...রোগ...আমার দিন ফুরিয়ে আসছে—'

'ওগো চুপ কর।'

'তুমি যদি মনে কষ্ট পাও বলব না। কিন্তু মনকে তৈরি রাখাই ভাল।—সোমনাথ কখন ফিরবে?'

'তার স্কুলের ছুটি চারটেয়, আধঘণ্টার মধ্যে এসে পড়বে। তাকে কোন দরকার আছে?'

'তার সঙ্গে এক দান দাবা খেলতাম...হয়তো আর খেলা হবে না। দাবার ছক আর ঘুঁটি এনে রাখ তো।' বলতে বলতে দমকা কাশির বেগে সে অভিভূত হয়ে পড়ল।

ঠিক এই সময় বাড়ির বাইরে নোংরা সরু গলি দিয়ে ডাক্তার পাণ্ডে চলেছিলেন। বয়সের ভারে তাঁর গতি মন্থর, হাতে একটি খোলা নোট-বুক, বাড়ির নম্বর দেখতে দেখতে যাচ্ছেন।

ঘরের মধ্যে তখন লোকনাথ বিছানার ওপর ছক পেতে ঘুঁটি সাজাচ্ছে, কুসুম চুপ করে দাঁড়িয়ে দেখছে—

'...ডাক্তার পাণ্ডে বলতেন,—দাবা আর অহঙ্কার—এই দুটো আমাদের, মানে পুরন্দরপুরের সিংহদের আসল রোগ। ডাক্তার পাণ্ডেকে তুমি চেনো না, অতি সজ্জন, আমাদের বাড়ির ডাক্তার, তাঁকে চাচা বলে ডাকতাম। জানি না তিনি আছেন কিনা—'

বাইরে ডাক্তার পাণ্ডে দরজায় খড়ি দিয়ে লেখা নাম পড়ে থমকে দাঁড়িয়ে ছিলেন, নোট-বুকে নম্বর মিলিয়ে দরজার কাছে এসে বিষাদভরা বিস্ময়ে চেয়ে রইলেন, যেন বিশ্বাস করতে পারছেন না এমন একটা জীর্ণ নোংরা বাড়িতে লোকনাথ থাকতে পারে। তিনি দরজায় টোকা দিয়ে উদ্বিগ্ন মুখে দাঁড়িয়ে আছেন এমন সময় তাঁর পায়ের কাছে একটি ঘুরন্ত লাট্টু এসে ঘুরতে লাগল। ডাক্তার পাণ্ডে ফিরে দেখলেন একটি ছেলে, বয়স আন্দাজ চোদ্দ, বুদ্ধিতে জ্বল জ্বল করছে মুখ, পরনে প্যান্ট ও হাফশার্ট, কাঁধে বইয়ের ব্যাগ, হাতে লাট্টুর লেত্তি। লাট্টুর মালিক লাট্টু কুড়িয়ে নিয়ে সসম্ভ্রমে ডাক্তার পাণ্ডেকে জিজ্ঞেস করল—'আপনি কাকে খুঁজছেন?'

ডাক্তার পাণ্ডে সোমনাথকে স্নেহদৃষ্টিতে দেখে বললেন—'লোকনাথ সিংহ কি এই বাড়িতে থাকেন?'

সোমনাথ বলল—'আজ্ঞে হ্যাঁ। কিন্তু বাবার শরীর তো ভাল নেই।'

ডাক্তার দু'হাত বাড়িয়ে বললেন—'তুমি লোকনাথের ছেলে! দেখে আমার সন্দেহ হয়েছিল, কিন্তু বিশ্বাস করতে সাহস হচ্ছিল না।'

তিনি সোমনাথকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। ঠিক এই সময় কুসুম দরজা খুলে দেখল

একজন অপরিচিত ভদ্রলোক সোমনাথকে প্রগাঢ় আলিঙ্গনে ঢেকে ফেলেছেন। সোমনাথ কোন মতে মুখ বার করে বলল—'মা, ইনি বাবার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।'

সোমনাথকে ছেড়ে দিয়ে ডাক্তার কুসুমের দিকে ফিরলেন। কুসুম তাঁকে এক নজরে দেখে চোখ নীচু করল, মৃদু স্বরে বলল—'তাঁর শরীর খুব খারাপ, বাইরে আসতে পারবেন না।'

ডাক্তার বললেন—'শরীর খুব খারাপ! আচ্ছা তাকে বলো ডাক্তার পাণ্ডে দেখা করতে চান। পনেরো বছর আগে সে আমাকে চাচাজি বলে ডাকত।'

ঘরের ভেতর লোকনাথের কানে সব কথাই আসছিল, সে সানন্দে চিৎকার করে বলল—'চাচাজি! আপনি এসেছেন! কুসুম, ওঁকে ঘরে নিয়ে এস।'

কুসুম দোরের পাশে সরে দাঁড়াল, ডাক্তার পাণ্ডে ভেতরে প্রবেশ করলেন, তাঁর পেছনে সোমনাথ।

ঘরে প্রবেশ করে লোকনাথকে দেখেই ডাক্তার পাণ্ডে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। প্রবীণ ডাক্তার এক লহমায় বুঝতে পারলেন লোকনাথের কাছে মৃত্যুর পরোয়ানা এসে গেছে। তাঁর মুখের হাসি মিলিয়ে গেল।

বিছানার কিনারায় বসে ডাক্তার বাষ্পরুদ্ধ স্বরে বললেন—'বাবা লোকনাথ, এ কি অবস্থা হয়েছে তোমার! মুখ দেখে চেনা যায় না। কি—কী রোগ?'

লোকনাথ হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল—'চাচাজি, আপনি ডাক্তার, নিজেই পরীক্ষা করে দেখুন, আমার আর কত দিন।'

ডাক্তারের চোখ জলে ভরে উঠল—'এ কি—রাজরোগ?'

লোকনাথ বলল—'ঠিক ধরেছেন। একেবারে শেষ অবস্থা।' দাবার ছকের দিকে তাকিয়ে ফ্যাকাসে হেসে বলল—'এবারে কালো ঘুঁটির চাল। তিন চালে কিস্তিমাৎ।'

কুসুম ছেলের পানে তাকাল, তার কাঁধে হাত রেখে বলল—'আয় তোকে খেতে দিই।'

ওরা ঘর থেকে চলে গেলে ডাক্তার পাণ্ডে আস্তে আস্তে বলতে লাগলেন—'গত পনেরো বছর ধরে কত জায়গায় না তোমাকে খুঁজেছি। কোথাও তোমার পাত্তা পেলাম না। হতাশ হয়ে খোঁজা প্রায় ছেড়ে দিয়েছিলাম, হঠাৎ সেদিন একজনের মুখে শুনলাম, বম্বে শহরের এই গলিতে তোমার নামে একজন থাকে। খবর পেয়েই ছুটে এসেছি। কিন্তু তোমার যে এই দশা দেখব তা কি ভেবেছিলাম।'

লোকনাথ বলল—'চাচাজি, দুঃখ করবেন না, মানুষ নিজের ভাগ্য নিজেই তৈরি করে।' একটু থেমে বলল—'বাবা কেমন আছেন?'

ডাক্তার নিশ্বাস ফেলে বললেন—'তাঁর কথা আর কি বলব। তুমি চলে আসার পর মানুষটা একেবারে পাগলের মতন হয়ে গেছে। মেজাজ সব সময় সপ্তমে চড়ে আছে। শরীরও আর আগের মতন নেই, বাতের যন্ত্রণায় অধিকাংশ দিন বিছানা থেকে উঠতে পারেন না। এই পনেরো বছরের মধ্যে তিনি পনেরো দিন নিজের ঘর থেকে বেরিয়েছেন কিনা সন্দেহ। এখন আমি বলি কি, তুমি বাবা ফিরে চল।'

একটু চুপ করে থেকে লোকনাথ বলল—'বাবার কি তাই ইচ্ছে?'

ডাক্তার পাণ্ডে একটু বিব্রত হয়ে পড়লেন—'না, মুখ ফুটে কিছু বলেননি, তবে তাঁর মনের কথা তো জানি, তোমাকে দেখবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠেছেন। মনে মনে ছটফট করছেন। কিন্তু মুখে কিছু বলছেন না। জানো তো ওঁর স্বভাব, ভাঙবেন তবু মচকাবেন না—'

মলিন মুখে লোকনাথ খানিক চুপ করে রইল, তারপর শান্ত অথচ দৃঢ় স্বরে বলল—'চাচাজি, আমার রক্তেও তো ওই একই অহংকার রয়েছে। অপরাধীর মতন মাথা নীচু করে আমি ফিরে যাব না। আমি যা করেছি তার জন্যে আমার তিলমাত্র লজ্জা নেই। আমার স্ত্রীকে আপনি দেখেছেন, আমার ছেলে সোমনাথকেও দেখলেন। ওদের জন্যে আমি লজ্জা পাব ভেবেছেন! কখনো না।'

পাশের ঘরে সোমনাথ মেঝেয় পিঁড়িতে বসে এক মনে জলখাবার খাচ্ছে; কুসুম তার পাশে বসে আছে, কিন্তু তার কান পড়ে আছে ও-ঘরের দিকে। লোকনাথের গলা শোনা যাচ্ছে—'আপনি ঠাট্টা করে আমাদের বংশের দুটি দোষের কথা বলতেন। (দাবার ছকের দিকে আঙুল দেখিয়ে) একটি তো এই। নিজেই বুঝতে পারি, না মরা পর্যন্ত আমার এ নেশা ঘুচবে না।—সোমনাথ!'

পাশের ঘর থেকে সোমনাথ উত্তর দিল—'যাই বাবা।' মুখ মুছতে মুছতে সে কাছে এসে দাঁড়াল। লোকনাথ হাসিমুখে বলল—'খেলার জন্যে তৈরি?'

সোমনাথ সাগ্রহে বলল—'হ্যাঁ বাবা।'

'দেখা যাক কে হারে কে জেতে। হারলে আমার দুঃখ নেই, ছেলেরা চিরদিনই বুড়োদের হারিয়ে দেয়। চাচাজি, সংসারের এই নিয়ম, না? আপনাকে কিন্তু আম্পায়ার হতে হবে।'

পাণ্ডে বিষণ্ণভাবে ঘাড় নাড়লেন। খেলা শুরু হল। একাগ্র চোখে ছকের পানে তাকিয়ে দু'জনে ঘুঁটি চালছে, পাণ্ডেও মন দিয়ে খেলা দেখছেন। পাশের ঘরে কুসুম মাঝে মাঝে দোরের কাছে এসে ওদের দেখছে, আবার সরে যাচ্ছে।

রাস্তা থেকে বৈরাগীর সুর শোনা গেল—

কাকো বন্দো কাকো নিন্দো
দোনো পাল্লা ভারী।

পুরন্দরপুরের অর্ধ-নাগরিক পরিবেশের মধ্যে একনাথ সিংহের বাড়িটা যেন জরাহীন অমরত্বের জয়টীকা পরে দাঁড়িয়ে আছে। পনেরো বছরে তার তিলমাত্র ক্ষয়-ব্যয় হয়নি।

সদর বারান্দার মাঝখান থেকে দোতলার সিঁড়ি উঠেছে; দু'পাশে রেলিং দেওয়া সেকেলে ধরনের সিঁড়ি। দোতলায় সিঁড়ির মুখ থেকে লম্বা বারান্দা, তার একপাশে সারি-সারি দরজা, অন্য পাশে খোলা আকাশ। বারান্দার শেষ প্রান্তে একটি বড় টেবিলের ওপর নানা রকমের ফল সাজানো রয়েছে, টেবিলের সামনের দিকে রুপোর প্লেটের ওপর এক গেলাস শরবত ঢাকা রয়েছে।

একনাথের খাস চাকর গোবর্ধন টেবিলের কাছে উবু হয়ে বসে আছে এবং সতর্কভাবে একটা দরজার পানে তাকিয়ে আছে। সকালবেলা একনাথের শয্যাত্যাগের সময় হয়েছে।

খাবারঘরের দরজা ঠেলে অল্পবয়সী একটি ঝি বারান্দায় বেরিয়ে এল, এক হাতে বালতি-ভর্তি এঁটো গেলাস-বাটি, অন্য হাতে এঁটো থালা। গত রাত্রের উচ্ছিষ্ট বাসন সে মাজতে নিয়ে যাচ্ছে। বালতির মধ্যে বাসনগুলো দাসীর পা ফেলার তালে তালে ঝন্ ঝন্ শব্দ করছে।

গোবর্ধন তিড়িং করে লাফিয়ে উঠল, আঙুল তুলে চাপা তর্জনের সুরে বলল—'স্‌স্‌। তোর কি হাঁটার কোন ছিরিছাঁদ নেই! পা ফেলছে দেখ না, যেন রাজসভায় নাচতে

চলেছে! (একনাথের ভেজানো দরজার দিকে আঙুল দেখিয়ে) কর্তার কানে যদি যায়, তোর মুণ্ডু কেটে গেণ্ডুয়া খেলবেন।

ঝিয়ের নাম তারা, সে পা টিপে টিপে গোবর্ধনের কাছে এসে ফিসফিস করে বলল—'কর্তাবাবুর মেজাজ আজ কেমন ?'

গোবর্ধন বলল—'গোল করিস না। মেজাজ খুব খারাপ, সকাল থেকে ক্ষেপে আছেন। যে সামনে পড়বে তার আর রক্ষে নেই। —যা, নিঃসাড়ে সরে পড়।'

'যাচ্ছি দাদা। আজ যে কপালে কি আছে ঠাকুর জানেন!' তারা-ঝি বালতি এবং থালা সামলাতে সামলাতে সিঁড়ির পাশে চলল। যেতে যেতে পিছন ফিরে চাইতে লাগল। সিঁড়ি পর্যন্ত পৌঁছে হঠাৎ হোঁচট খেয়ে সে পড়ে গেল, বাসনগুলো বিপুল ঝনৎকার তুলে সিঁড়ি দিয়ে নীচে গড়াতে অরম্ভ করল। ভয় পেয়ে তারা-ঝি কঁকিয়ে কেঁদে উঠল। গোবর্ধন শিউরে উঠে দু'হাতে নিজের কান চেপে ধরল।

একনাথ সিংহের শয়নঘরটি লম্বায়-চওড়ায় বেশ প্রশস্ত। পুরানো ফ্যাশনের ভারী ভারী আসবাব, ঘরের মাঝখানে চাঁদোয়া দেওয়া প্রকাণ্ড খাট-পালঙ্ক। একনাথ খাটের উপর কোল পেতে বসে আছেন; তাঁর কোলে 'রামচরিত মানস'। তিনি মাঝে মাঝে দু-একটি দোঁহা গুণ গুণ শব্দে উচ্চারণ করছেন। পনেরো বছরে তাঁর চেহারার বিশেষ পরিবর্তন হয়নি, কেবল ঝাঁকড়া ভুরুতে পাক ধরেছে।

পড়তে পড়তে হঠাৎ তাঁর মেজাজ বিগড়ে গেল, তিনি ব্যঙ্গ-স্বরে বলে উঠলেন—'পিতৃ-আজ্ঞা পালনের জন্যে রাম বনে গিয়েছিলেন! মিথ্যে কথা—বাজে কথা! রাম বনে গিয়েছিলেন দশরথকে জব্দ করার জন্যে।'

কোল থেকে 'রামচরিত মানস' তুলে তাচ্ছিল্যভরে তিনি পাশে ফেললেন, ট্যাঁক থেকে ঘড়ি বার করে দেখেই উগ্রস্বরে হুঙ্কার ছাড়লেন—'গোবরা'!'

রুপোর থালার ওপর শরবতের গেলাস নিয়ে গোবর্ধন ঘরে ঢুকল—'এই যে শরবত।'

একনাথ কটমট করে তার পেছন পানে তাকালেন—'শরবত আনা হয়েছে ? ক'টা বেজেছে তার হিসেব আছে ?'

'আজ্ঞে সাতটা।'

'তাহলে আফিম কখন দেওয়া হবে ? তোমাকে রোজ মনে করিয়ে দেবার জন্যে কি একটা চাকর রাখতে হবে ?'

খাটের পাশে টিপাইয়ের ওপর শরবত রেখে গোবর্ধন ছুটে গেল ঘরের একটি দেরাজের দিকে। দেরাজ খুলে একটি চাঁদির কৌটো নিয়ে ছুটে এসে একনাথের সামনে দাঁড়াল। কৌটো খুলে লোকনাথ আফিমের গুলি পাকাতে লাগলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর বাক্যবাণ ছুটল। গোবর্ধন আবার শরবত হাতে নিয়ে কাঠের পুতুলের মতন দাঁড়িয়ে রইল।

একনাথ আফিমের গুলি মুখে ফেললেন, শরবতের সাহায্যে সেটি গলাধঃকরণ করলেন, তারপর গেলাস ফেরত দিয়ে বললেন—'ডাক্তার হতভাগা গেল কোথায় ? কেউ তার খবর জানে ?'

গোবর্ধন আফিমের কৌটো যথাস্থানে রাখতে রাখতে বলল—'আজ্ঞে তিনি তো পনের দিন ছুটি নিয়ে বাইরে গেছেন, আজ ফেরবার কথা।'

একনাথ বললেন—'আজ যদি না ফেরে ডাক্তারকে জবাব দেব। আমি বাতের যন্ত্রণায় মরছি, আর তিনি গায়ে ফুঁ দিয়ে ফুর্তি করে বেড়াচ্ছেন। অমন ডাক্তারে আমার দরকার

নেই।'

'আজ্ঞে কর্তা।'

'যাও, তুমি বেরোও এখন।'

গোবর্ধন ঝটিতে শরবতের গেলাস নিয়ে প্রস্থান করল।

বারান্দায় একজন চাকর ঝাঁট দিচ্ছিল, গোবর্ধন চোখ পাকিয়ে তাকে শাসন করল—'কর্তাবাবু বাতের যন্ত্রণায় মরছেন, আর তুই ঝাঁট দিচ্ছিস ? এত বড় আস্পর্ধা ! যা তোকে জবাব দিলাম—' সে প্রভুত্বপূর্ণ ভঙ্গিতে সিঁড়ির দিকে আঙুল দেখাল। ঝাড়ুদার ভৃত্যটিও রসিক ব্যক্তি, সে কপট বিনয়ের ভঙ্গিতে সেলাম করে ঝাড়ু বগলে নিয়ে নীচে নেমে গেল।

গোবর্ধন তখন নিরিবিলি আর এক গেলাশ শরবত তৈরি করে আত্মারামকে নিবেদন করবার উপক্রম করছে, নীচের দিকে নজর পড়ল, চারজন বেহারা একটি পাল্কী কাঁধে ফটক থেকে বাড়ির দিকে আসছে। ব্যাপারটা বুঝতে না পেরে সে সেই দিকে চেয়ে রইল। তার মনে প্রশ্ন জাগল—পাল্কী করে কে আসে ? এ বাড়িতে পাল্কীর পাট তো অনেক দিন উঠে গেছে।

বারান্দার সামনে বেহারারা পাল্কী নামাল। পাল্কীর দরজা খুলে বছর পাঁচেকের একটি মেয়ে লাফিয়ে বাইরে এল। তারপর আস্তে আস্তে পা বের করে বেরিয়ে এল একটি রোগা শুকনো চেহারার লোক ; বয়স আন্দাজ পঁয়ত্রিশ, শরীরের কাঠামো দেখে মনে হয় এককালে ভারি জোয়ান ছিল, কিন্তু এখন তার বুকে ও বাঁ হাতে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা, চোখ কোটরগত, গাল শুকিয়ে গেছে। লোকটি জমিদারবাবুর সর্দার লাঠিয়াল বসন্ত সিং, মেয়েটি তার কন্যা ললিতা।

বসন্ত সিংয়ের অবসন্ন শরীর নুয়ে পড়েছে, কোনমতে মেয়ের হাত ধরে সে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠল। সিঁড়ির মাথায় গোবর্ধন দাঁড়িয়ে ছিল, সে উৎকণ্ঠিতভাবে বলল—'সর্দারজি, এই রোগা শরীর নিয়ে আপনি এলেন কেন ? আপনার জখমের ঘা তো এখনো সারেনি।'

বসন্ত সিং গম্ভীর মুখে বলল—'মরার আগে এ ঘা আর সারবে না। মালিককে এত্তেলা দাও, তাঁর কাছে আর্জি আছে।'

গোবর্ধন উদ্বিগ্ন হয়ে বলল—'কিন্তু সর্দার, মালিকের মেজাজ আজ খুবই খারাপ, সকালবেলা উঠেই আমার মাথাটি চিবিয়েছেন। আপনি এসময় তাঁর কাছে গেলে...বরং আজ বিকেলবেলা—'

অধীর স্বরে সর্দার বলল—'আমার দেরি করার সময় নেই। তুমি যদি এত্তেলা না দাও, আমি বিনা হুকুমে মালিকের কাছে যাব।'

সর্দার একনাথের খাস কামরার পানে পা বাড়াল।

গোবর্ধন ভয় পেয়ে বলল—'না না, আমি খবর দিচ্ছি। এত্তেলা না দিয়ে গেলে কর্তা আমাকে খুন করবেন।' সে আগে আগে চলল, মেয়ের হাত ধরে সর্দার তার পিছনে রইল।

একনাথ আগের মতই বিছানায় বসে আছেন, কিন্তু তাঁর বসার ভঙ্গিটা আরো উগ্র, যেন তাঁর মনের কটাহে চিন্তাগুলো টগ্‌বগ্ করে ফুটছে। গোবর্ধনকে দেখে তিনি জ্বলে উঠলেন—'আবার কী ! কে তোকে ডেকেছে ?'

গোবর্ধন হাত কচ্‌লাতে কচ্‌লাতে বলল—'আজ্ঞে সর্দার বসন্ত সিং—'

একনাথ বললেন—'তার আবার কি হল ? মরে গেছে নাকি ?'

দোরের কাছে থেকে বসন্ত সিং বলল—'আজ্ঞে না, মরিনি এখনো, তবে বেশি দেরি নেই মালিক।' সে সামনে এসে জোড়হাতে মাথা নোয়াল, তারপর হাঁটু মুড়ে মেঝেয় বসে পড়ল। একনাথ কঠিন দৃষ্টিতে তাকে নিরীক্ষণ করে বললেন—'তুই আবার কি মনে করে এসেছিস। ভাল লোককে সর্দার লেঠেলের পদ দিয়েছিলাম। কোথায় শত্তুরের হাড় গুঁড়ো করবে, তা নয়, নিজেই মার খেয়ে ফিরে এসেছে। অপদার্থ কোথাকার ! যা, তোকে বরখাস্ত করলাম, তোর মতন লেঠেল আমার দরকার নেই।'

একনাথের রূঢ়বাক্যে তিলমাত্র বিচলিত না হয়ে বসন্ত সিং মেয়েকে কাছে টেনে নিল, বলল—'মালিক, বিশ বছর আপনার গোলামী করছি, কাজে কখনো ফাঁকি দিইনি। খুন জখম যখন যা হুকুম করেছেন হুকুম তামিল করেছি, কখনো পিছপাও হইনি, বুকের রক্ত দিয়ে কাজ হাসিল করেছি। কিন্তু এবারে চোটটা আমায় শেষ করে দিয়েছে। আপনাকে আর বরখাস্ত করতে হবে না স্বয়ং যমরাজ নোটিশ দিয়েছেন। আমি শেষ পর্যন্ত মালিকের সেবা করতে পেরেছি, আমার কোন দুঃখ নেই—'

'তবে হট্‌ করে আমার ঘরে ঢুকলি কেন ? কি চাস তুই ?'

'মালিক, আমার দিন ফুরিয়ে এসেছে। এই মেয়েটে ছাড়া (ললিতা চোখ তুলে নিরীহভাবে বাপের পানে চাইল) আমার নিজের বলতে কেউ নেই, তাই ওকে আপনার কাছে নিয়ে এসেছি, আজ থেকে আপনি ওকে পালন করবেন।'

একনাথ আকাশ থেকে পড়লেন—'অ্যাঁ, আমি তোর মেয়েকে মানুষ করব ?' তিনি আবার অগ্নিশর্মা হয়ে বললেন—'চালাকি পেয়েছিস ! তোকে কুকুরে কামড়েছে রে হতভাগা। যা—এই দণ্ডে আমার সামনে থেকে দূর হয়ে যা।'

বসন্ত সিং উঠে দোরের দিকে চলল—'তাই যাচ্ছি মালিক, কিন্তু মেয়ে রইল। ওকে আপনার বাঁদী করে রাখবেন।'

একনাথ চিৎকার করে উঠলেন—'ওরে হতচ্ছাড়া, যাচ্ছিস কোথায় ? মেয়েটাকে নিয়ে যা, ওকে আমি পুষতে পারব না। বাড়িতে একটা মেয়েছেলে নেই, কে ওকে দেখবে ?'

দোর পর্যন্ত গিয়ে সর্দার আস্তে আস্তে ফিরল, তারপর হঠাৎ মাথা ঘুরে মেঝেয় বসে পড়ল। তার চোখের জ্যোতি নিভে গেছে, সে অব্যক্ত কণ্ঠে বলল—'গোবর্ধন ভাই, একটু জল—'

গোবর্ধন এতক্ষণ ঘরের এককোণে দাঁড়িয়ে সব শুনছিল, চমকে উঠে এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল। একনাথ গর্জন ছাড়লেন—'ঘরের কোণে জলের কুঁজো দেখতে পাচ্ছিস না, হতভাগা উল্লুক—।'

গোবর্ধন ছুটে গিয়ে সোরাই থেকে জল নিয়ে যখন সর্দারের কাছে এল, সর্দার ততক্ষণে এলিয়ে পড়েছে। গভীর নিশ্বাসের সঙ্গে তার গলা থেকে বেরিয়ে এল—'সেলাম মালিক।'

গোবর্ধন তার মুখে জল ঢালবার চেষ্টা করল, কিন্তু জল মুখ থেকে গড়িয়ে পড়ল। ললিতা হঠাৎ ভয় পেয়ে 'বাবা' বলে কেঁদে উঠল। ঠিক এইসময় ডাক্তার পাণ্ডে ঘরে প্রবেশ করলেন।

ডাক্তার বসন্ত সিংকে মেঝেয় পড়ে থাকতে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন, একনাথ বলে উঠলেন—'দেখ তো ডাক্তার, মরে গেল নাকি !'

ডাক্তার হাঁটু গেড়ে বসে বসন্ত সিংয়ের নাড়ী টিপলেন, বুকে হাত দিয়ে দেখলেন,

তারপর উঠে দাঁড়িয়ে একনাথের পানে চাইলেন—'হ্যাঁ, বুকের স্পন্দন থেমে গেছে—' ডাক্তারের মুখে তিক্ত কঠিনতা ফুটে উঠল, তিনি কেটে কেটে কথা বললেন—'আর একটা দুঃসংবাদ আছে ; আপনার একমাত্র ছেলে লোকনাথও মারা গেছে।'

হঠাৎ ঘরের মধ্যে নিস্তব্ধ নীরবতা নেমে এল।

আধঘণ্টা কেটে গেছে। বসন্ত সিংয়ের শব সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, গোবর্ধন ললিতার হাত ধরে নিয়ে গেছে। এই আধঘণ্টার মধ্যে একনাথ ও ডাক্তার পাণ্ডে একটি কথারও বিনিময় করেননি, একনাথ নিশ্চল হয়ে চেয়ারের দিকে চেয়ে আছেন, ডাক্তারের অভিযোগ ভরা দৃষ্টি একনাথের ওপর নিবদ্ধ।

হঠাৎ গা-ঝাড়া দিয়ে একনাথ ডাক্তারের পানে আরক্ত চক্ষু তুললেন, বিকৃতস্বরে বললেন—'লোকনাথ যদি মরে গিয়ে থাকে তাতে আমার কি! আমার কিছুই আসে যায় না।'

ডাক্তার নিরুত্তাপ কণ্ঠে বললেন—'দারুণ অভাবের মধ্যে অসহায় অবস্থায় সে মারা গেছে।'

একনাথ ফেটে পড়বার উপক্রম করলেন—'এসব কথা তুমি আমাকে কেন শোনাচ্ছ? বলেছি তো লোকনাথ সম্বন্ধে আমার তিলমাত্র আগ্রহ নেই।'

ডাক্তারের গলা আরো ভারী হয়ে এল—'জানি। সে যে আমার কোলে মাথা রেখে শেষ নিশ্বাস ফেলল, একথা আমি ভুলতে পারছি না। তার বিধবা স্ত্রী আর ছেলে—'

একনাথ আর স্থির থাকতে পারলেন না, খাট থেকে লাফিয়ে নীচে নেমে চিৎকার করে উঠলেন—'শুনতে চাই না—ওরা আমার কেউ নয়—' হঠাৎ উঠে দাঁড়াবার ফলে তাঁর পায়ে বাতের ব্যথা তীব্র হয়ে উঠেছিল, তিনি পড়ে যাচ্ছিলেন, ডাক্তার তাঁকে ধরে খাটের পাশে বসিয়ে দিলেন। একনাথ দাঁতে দাঁত চেপে ডাক্তারের প্রতি বিষদৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন—'সবাই বজ্জাৎ সবাই দাগাবাজ শয়তান। আমি চিনি না। তোমাদের সবাইকে চিনি। তোমার ফন্দি আমি বুঝেছি। তার বিধবা স্ত্রী আর ছেলেকে আমার ঘাড়ে চাপাতে চাও!'

ডাক্তার বিষণ্ন মুখে মাথা নাড়লেন—'আমার কোন রকম ফন্দিফিকির নেই, থাকলেও কোন কাজে লাগত না। একটা কথা আপনি বোঝবার চেষ্টা করুন, আপনার নাতি বা আপনার পুত্রবধূ আপনাকে ভালবাসে না, আপনি যদি তাদের এ বাড়িতে আনতে চান, মনে হয় না তারা আসতে রাজী হবে।'

ক্ষণকালের জন্য গুম হয়ে গিয়ে একনাথ প্রচণ্ড অগ্নিকাণ্ডের মতন ফেটে পড়লেন—'কী যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা! আমার বাড়িতে আসতে রাজী হবে না! চুলের মুঠি ধরে টেনে নিয়ে আসব—' ডাক্তারের সংশয়পূর্ণ মাথানাড়া দেখে তিনি দ্বিগুণ জ্বলে উঠলেন—'আমার কথার ওপর কথা বলে এমন সাধ্য কার! যাও তুমি, এখনি তাদের ধরে নিয়ে এস।'

ডাক্তার দেখলেন ওষুধ ধরেছে, তিনি আরো দুঃখিতভাবে মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন—'বাবুজি, বম্বে শহরটা ঠিক পুরন্দরপুর নয়। সেখানে পুলিশ আছে, আইন-আদালত আছে। তাছাড়া আপনার নাতি আর পুত্রবধূ তো মাটির পুতুল নয় যে তুলে নিয়ে আসব। তারা জলজ্যান্ত মানুষ, তাদের স্বাধীন ইচ্ছা আছে—'

'স্বাধীন ইচ্ছা! আমার ইচ্ছাই তাদের ইচ্ছা, আমি এখন ওদের গার্জেন। যাও, এখনি আমার উকিলকে ডেকে আনো!'

'যে আজ্ঞে, যাচ্ছি—' মুখে উদ্বেগ ও মনে সন্তোষ নিয়ে ডাক্তার প্রস্থান করলেন। একনাথ আপন মনে গজরাতে লাগলেন—'আমার কথা অগ্রাহ্য করবে! দেখে নেব। এবার এমন শিক্ষা দেব যা জন্মে ভুলবে না। ...'

কয়েকদিন পরে।

সদর বারান্দার নিম্নতম ধাপের এককোণে বসে ললিতা আপন মনে পুতুল নিয়ে খেলছে, একটি পুতুলকে ফ্রক পরিয়ে কোলে শুইয়ে সুর করে ঘুমপাড়ানি ছড়া বলছে—

সাতসমুদ্র পার থেকে
ময়ূরপঙ্খী নৌকা চড়ে
আসবে খুকুর বর—

ললিতা পুতুলকে চাপড়ে চাপড়ে ঘুম পাড়াচ্ছে এমন সময় একটি ঘোড়ার গাড়ি এসে বারান্দার সামনে দাঁড়াল। ডাক্তার গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়ালেন, তারপর সোমনাথ নামল, সব শেষে নামল কুসুম। তার বিধবার বেশ, মুখে ঘোমটা। ললিতা খেলা থামিয়ে অবাক হয়ে তাদের পানে চেয়ে রইল।

পাণ্ডে আগে তাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চললেন, সকলের পিছনে সোমনাথ। সে ললিতার পাশ দিয়ে যাবার সময় ঘাড় বেঁকিয়ে তার পুতুল খেলার আয়োজন দেখল, একটু নাক উঁচু করে সিঁড়ি দিয়ে উঠে গেল। ললিতা বিক্ষুব্ধ চোখে চেয়ে রইল।

ওপরের বারান্দায় গোবর্ধন জোড়হাত মাথায় ঠেকিয়ে নীচু হয়ে কুসুমকে অভ্যর্থনা করল। তার মুখের ভাব গদগদ, সে ডাক্তারকে খাটো গলায় বলল—'কর্তাবাবু ঘরেই আছেন, তাঁকে এত্তেলা দেব?'

ডাক্তার বললেন—'দরকার নেই, উনি জানেন।'

গোবর্ধন কর্তার ঘরের পর্দা সরিয়ে একধারে দাঁড়াল, ডাক্তার কুসুমকে নিয়ে ঘরে প্রবেশ করলেন।

পুরানো ধরনের আরাম-কেদারায় একনাথ বসে আছেন, পরনে জমকালো পোশাক। ভুরু কুঁচকে তিনি গড়গড়ার নলে টান দিচ্ছিলেন, ডাক্তারের গলা-খাঁকারি শুনে সেই দিকে তাকালেন। কুসুমের ওপর চোখ পড়তেই তাঁর মুখ কঠিন হয়ে উঠল। পাণ্ডে কুসুমকে ইঙ্গিত করে এগিয়ে যেতে বললেন। কুসুম চোখ নীচু করে একনাথের পায়ের কাছে গেল, হাঁটু মুড়ে মাথা ঠেকিয়ে শ্বশুরকে প্রণাম করল। একনাথ একবার তার দিকে চেয়েই মুখ ঘুরিয়ে নিলেন, কড়া সুরে বললেন—'এই বাড়িতে তুমি থাকবে, আমার হুকুম। আমার সামনে কিন্তু কখনো আসবে না। যাও—অন্দরমহলে যাও!' তিনি রাজকীয় ভঙ্গিতে অন্তঃপুরের দরজার দিকে আঙুল দেখালেন।

কুসুম মাথা নীচু করে সেই পথে চলে গেল। একনাথ তখন পাণ্ডের দিকে ফিরে বললেন—'ছেলেটা কোথায়?'

ডাক্তার চমকে উঠলেন—'সোমনাথ? অ্যাঁ—কোথায় গেল। দেখছি।' তিনি তাড়াতাড়ি চলে গেলেন।

সোমনাথ নীচে ললিতার সঙ্গে সিঁড়ির কাছে দাঁড়িয়ে বেশ মুরুব্বিয়ানা চালে কথা বলছে, ললিতা সম্ভ্রমের সঙ্গে শুনছে। সোমনাথ লাট্টুতে লেত্তি জড়াতে জড়াতে বলল—'পুতুলখেলা আবার খেলা! ও তো সবাই পারে। তুমি লাট্টু ঘোরাতে পার?'

ললিতা হতাশ স্বরে বলল—'না তো। তুমি আমাকে শিখিয়ে দেবে?'

সোমনাথ বলল—'এ তুমি শিখতে পারবে না। ভারি শক্ত খেলা।'

ললিতার মুখ দেখে মনে হল সে এখনি কেঁদে ফেলবে। সোমনাথ তাড়াতাড়ি বলল—'আচ্ছা আচ্ছা, শেখাচ্ছি।—এই নাও, লেত্তি আঙুলে জড়িয়ে এই এমনি করে—ছুঁড়ে দাও।'

ললিতা লাট্টু ছুঁড়ল, লাট্টু সোমনাথের কানের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল। সে চোখ পাকিয়ে বলল—'আর একটু হলেই আমার মাথাটা ফুটো করে দিয়েছিলে।'

সে লাট্টু তুলে নিয়েছে এমন সময় ডাক্তার পাণ্ডে বললেন—'তুমি এখানে কি করছ? চল চল, তোমার ডাক পড়েছে।' তিনি ফিরে চললেন, সোমনাথ লাট্টু পকেটে রাখতে রাখতে তাঁর অনুগামী হল। ললিতা জলভরা চোখে চেয়ে রইল।

ওপরের ঘরে সোমনাথ বৃদ্ধের সামনে সোজা হয়ে দাঁড়াল, ভাবভঙ্গী নির্ভীক কিন্তু সম্ভ্রমপূর্ণ। একনাথ তার পানে ভ্রূকুটি করে চাইলেন, কিন্তু তাঁর চোখ বাষ্পাচ্ছন্ন হল। নিজের দুর্বলতায় বিরক্ত হয়ে রুক্ষ স্বরে বললেন—'তোমার নাম কি?'

'আমার নাম সোমনাথ, আমার বাবার নাম লোকনাথ সিংহ, আমার ঠাকুরদা পুরন্দরপুরের বাবুসাহেব একনাথ সিংহ।'

একনাথ কিছুক্ষণ নীরবে আত্মসংবরণ করলেন, শেষে বললেন—'তুমি লেখাপড়া শিখেছ?'

সোমনাথ বলল—'আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি ক্লাস এইট-এ পড়ি।'

একনাথ হাত তুলে তাকে কাছে ডাকলেন, সোমনাথ তাঁর পাশে গিয়ে দাঁড়াল! তিনি মৃদুস্বরে প্রশ্ন করলেন—'আমাকে চেন?'

'আজ্ঞে না।' সে ডাক্তার পাণ্ডের দিকে তাকাতে তিনি ধীরস্বরে বললেন—'ইনিই তোমার পিতামহ পুরন্দরপুরের বাবুসাহেব একনাথ সিংহ।'

সোমনাথ অবাক হয়ে চাইল, পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে বলল—'আপনি আমার দাদু? বাবার মুখে শুনেছি আপনি মস্ত বড়লোক, একজন রাজা। সত্যি আপনি রাজা?'

একনাথ এবার ভেঙে পড়লেন, তাঁর চোখ দিয়ে দরদর করে জল পড়তে লাগল। বাষ্পরুদ্ধ স্বরে তিনি ডাক্তারকে বললেন—'একে আমার সামনে থেকে নিয়ে যাও ডাক্তার।'

সোমনাথ চকিত হয়ে দু'জনের মুখের পানে চাইল। ডাক্তার তার হাত ধরে টেনে নিয়ে যেতে যেতে বললেন—'চল, সোমনাথ, তোমাকে বাড়িটা ঘুরিয়ে দেখাই।'

অন্দর-মহলে পূজার ঘর। গৃহদেবী শ্রীশ্রীচণ্ডীর বিগ্রহটি আকারে ছোট হলে কি হয়, প্রত্যহ খুব ঘটা করে তাঁর পূজা হয়।

পুরোহিতমশাই দেবীর সামনে স্তোত্রপাঠ করছেন, কুসুম জোড়হাতে তদগত ভাবে দেবীর মুখের পানে তাকিয়ে বসে আছে। দেবীর পদপ্রান্তে কয়েকটি পাত্রে রক্তজবা ফুল।

স্তোত্রপাঠ শেষ হলে বৃদ্ধ পুরোহিত হাসিমুখে বললেন—'মা, তুমি নিজের বাড়িতে এসে সংসারের ভার বুঝে নিয়েছ এ বড় আনন্দের কথা। গিন্নীমা-র মৃত্যুর পর ত্রিশ বছর কেটে গেছে, বাড়িতে এমন একজন মেয়ে নেই যে পূজার যোগাড়-যন্ত্র করে। এতদিন পরে তুমি এসে সব ব্যবস্থা করেছ, দেবী তোমার প্রতি প্রসন্ন হয়েছেন। এরপর দেখো, সব বিপদ-আপদ কেটে যাবে।'

কপালে হাত ঠেকিয়ে কুসুম বলল—'ঠাকুরের দয়া।'

সোমনাথের পড়ার ঘরে ফরাস-ঢাকা তক্তপোশের মাঝখানে বসে সে খাতার ওপর ঝুঁকে হাতের লেখা মক্স করছে। তক্তপোশের এক কোণে ললিতা বসে পুতুল খেলছে, কিন্তু পুতুলের চেয়ে সোমনাথের দিকেই তার মন পড়ে আছে বেশি। সে মাঝে মাঝে সোমনাথের পানে ঘাড় উঁচু করে চাইছে। একসময় সে বলল—'কি লিখছ?'

সোমনাথ মুখ না তুলে বলল—'হাতের লেখা রপ্ত করছি।'

'ও। —নিজের নাম লিখতে পার?'

সোমনাথ এবার মুখ তুলল—'এত বোকাব মতন কথা বলতে পারে এই মেয়েটা—'

ললিতা তাড়াতাড়ি বলল—'আচ্ছা, আচ্ছা, লিখতে পার! কিন্তু আমার নাম লিখতে পার কি?'

খানিকক্ষণ চোখ পাকিয়ে সোমনাথ বলল—'এদিকে আয়, দেখিয়ে দিচ্ছি লিখতে পারি কি না।'

ললিতা এসে হুমড়ি খেয়ে বসল, সোমনাথ খাতায় লিখতে লিখতে বলল—'ল-লি-তা। কেমন, লিখতে পারি?'

ললিতা সন্দিগ্ধভাবে বলল—'ঠিক লিখেছ তো?'

ঠিক লিখেছি মানে?' সোমনাথ হঠাৎ চোখ বড় করে বলল—'অ্যাঁ, তুই কি পড়তে জানিস না?'

ললিতা বলল—'না। কেউ তো আমায় শেখায়নি।'

'তাই নাকি! আচ্ছা, ঠিক আছে, আমিই শেখাব। আজ আমি তোর গুরু বুঝলি?' সোমনাথ ললিতার মাথায় হাল্কা একটা চাঁটি মারল।

এই সময় পাণ্ডে এলেন, সোমনাথকে প্রশ্ন করলেন—'কী, কেমন আছ?'

সোমনাথ বলল—'আজ্ঞে ভাল আছি। কিন্তু এই মেয়েটাকে কেউ লেখাপড়া শেখায় না কেন?'

পাণ্ডে একটু অপ্রস্তুত হয়ে বললেন—'কি জানো, তোমার দাদু মেয়েদের লেখাপড়া শেখা পছন্দ করেন না—'

'কিন্তু বোম্বাইয়ের সব মেয়েই তো স্কুলে যায়, লেখাপড়া করে। আমি দাদুকে বলব।'

'না না, তার দরকার নেই। তুমি যদি ললিতাকে লেখাপড়া শেখাতে চাও শেখাতে পার।' ডাক্তার চলে গেলেন।

সোমনাথ তখন ললিতার দিকে ফিরে গম্ভীর গলায় বলল—'মন দিয়ে শোন্। আগে তোকে বর্ণপরিচয় শেখাব। এদিকে আয়।'

ললিতা অনুগত ছাত্রীর মতন তার সামনে এসে বসল—'বলুন গুরুজি।'

সোমনাথ খাতায় বড় বড় করে অ লিখল, আঙুল দেখিয়ে বলল—'এই হল—অ।'

সামনে ঝুঁকে ললিতা অ দেখল, তারপর মুখ তুলে বলল—'অ। —একে অ বলে কেন?'

সোমনাথ বলল—'কেন বলে সে খবরে তোমার দরকার নেই। বল—অ।'

'আচ্ছা—অ। এবারে চল ঘোড়া খেলি।'

সোমনাথ ধমক দিয়ে বলল—'তোর মাথায় কি খেলা ছাড়া কিছুই ঢোকে না? চুপ করে বোস। বল—আ।'

বড় করে আ লিখে আঙুল দিয়ে দেখাল। ললিতা বলল—'আ। তুমি লাট্টু ঘোরাবে

না ?'

গর্জন করে সোমনাথ বলল—'না। বল—আ।'

নির্লিপ্তভাবে ললিতা বলল—'আ। একে আ বলে কেন ?'

গুরুজির পক্ষে আর ধৈর্যরক্ষা করা সম্ভব হল না, তিনি ছাত্রীর গালে চড় মারলেন। ছাত্রী ভ্যাঁ করে কেঁদে উঠল।

অন্তঃপুরের একটি ঘরে কুসুম মেঝেয় বসে প্লেটে খাবার সাজাচ্ছে। তার সামনে অনেকগুলি রুপোর রেকাবি ও খাবারের ঝুড়ি। গোবর্ধন গেলাসে জল ভরছে। সে এখন বেশ আনন্দে আছে।

কাজের সঙ্গে সঙ্গে গোবর্ধন কথা বলে চলেছে—'বৌদিদি, কর্তাবাবুর এত অল্প রাগ অনেকদিন দেখিনি। সকাল থেকে আজ এখনো আমাকে একটি বার গালাগাল দেননি। গড়গড়ার নল বন্ধ হয়ে গিয়েছিল তা শুধু বললেন—নল বদলে দে। অবাক কাণ্ড।'

মুখে একটু হাসি নিয়ে কুসুম গোবর্ধনের গল্প শুনছিল, এখন একটি রেকাবি তার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল—'এই নাও বাবার জলখাবার। সময়ের দিকে নজর রেখো। ঠিক সময়ে ঘরে নিয়ে যেও, এক মিনিট আগে নয় পরেও নয়। তুমি বরং খাবার নিয়ে দোরের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকবে, যেই ঘড়িতে ন'টা বাজবে, অমনি ঘরে ঢুকবে। তাহলে তিনি রাগ করবেন না।'

গোবর্ধন বলল—'যা বলেছ বৌদিদি। তুমি যদি গোড়া থেকে এসে আমাকে সব কাজ শিখিয়ে দিতে, তাহলে কর্তাবাবু কোনদিনই আমার ওপর রাগ করতেন না।'

এক হাতে জলখাবারের রেকাবি অন্য হাতে জলের গেলাস নিয়ে গোবর্ধন চলে গেল। কুসুম সেই দিকে চেয়ে থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

ওদিকে একনাথ নিজের বিছানায় অর্ধশয়ান হয়ে খবরের কাগজ পড়ছেন। বাতের ব্যথায় হাঁটু ফুলেছে, হাঁটুতে ফ্ল্যানেলের পটি জড়ানো, হাঁটুর নীচে তাকিয়া।

কাগজ ফেলে দিয়ে তিনি ডাকলেন—'গোবর্ধন !' গলার স্বর তেমন রুক্ষ নয়।

কিন্তু গোবর্ধনের সাড়া নেই। ভুরু কুঁচকে তিনি ঘড়ির দিকে তাকালেন। মেজাজ চড়তে শুরু করল। গাড়োলটা গেল কোথায়। তিনি আবার কড়া সুরে ডাকলেন—'গোবর্ধন !'

এবারও গোবর্ধনের দেখা নেই। রাগে ফুলতে ফুলতে তিনি বিছানা ছেড়ে উঠলেন, খোঁড়াতে খোঁড়াতে কোনরকমে গিয়ে আরাম-কেদারায় বসে পড়লেন—'হতভাগা গাড়োলটাকে আজ দূর করে দেব।'

এই সময় ঠং ঠং করে ন'টা বাজল। গোবর্ধন রেকাবি ও গেলাস হাতে প্রবেশ করল।

একনাথ বাঘের মতন চোখ পাকিয়ে চাইলেন, তারপর গোবর্ধনের হাত থেকে গেলাস আর রেকাবি ছিনিয়ে নিয়ে মেঝেয় আছাড় মারলেন—'এতক্ষণ কোথায় আড্ডা দিচ্ছিলি রে হারামজাদা উল্লুক ?'

গোবর্ধন বলল—'আজ্ঞে আমি তো দোরের ঠিক বাইরে দাঁড়িয়েছিলাম।'

একনাথ এবার অবাক হলেন, তারপর খিঁচিয়ে উঠলেন—'দাঁড়িয়ে ছিলি তো সাড়া দিচ্ছিলি না কেন ?'

গোবর্ধন বলল—'আজ্ঞে বৌদিদি বললেন যে ঠিক ন'টা বাজলে জলখাবার নিয়ে ঘরে ঢুকতে।'

রাগে দিশাহারা হয়ে একনাথ গর্জন ছাড়লেন—'বেরিয়ে যা—দূর হয়ে যা আমার সামনে থেকে, বেকুব কোথাকার !—যাচ্ছিস !'

গোবর্ধন আর দাঁড়াল না, একদৌড়ে কুসুমের কাছে উপস্থিত হল। কুসুমের খাবার সাজানো তখনো শেষ হয়েনি, সে মুখ তুলল। গোবর্ধন হাঁপাতে হাঁপাতে বলল—'সর্বনাশ হয়েছে বৌদিদি, কর্তাবাবু খাবার ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আমাকে যা-নয়-তাই বলে তাড়িয়ে দিয়েছেন।'

'খাবার ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছেন ?'

'সব ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছেন। আমি খাবার নিয়ে দোরের বাইরে দাঁড়িয়েছিলাম, যেই ঠং ঠং করে ন'টা বাজল অমনি ঘরে ঢুকলাম। কিন্তু কর্তা তখন চটে লাল—'

কুসুম বলল—'বুঝেছি। তোমাকে আর কিছু করতে হবে না। তুমি বরং সোমনাথ আর ললিতাকে ডেকে আন। বাবার খাবার নিয়ে আমি যাচ্ছি।'

গেলাস ও প্লেট তুলে নিয়ে কুসুম দৃঢ়পদে শ্বশুরের ঘরের দিকে চলল। গোবর্ধন শঙ্কিত মুখে চোখ গোল করে চেয়ে রইল। একনাথ কুসুমকে তাঁর সামনে যেতে বারণ করে দিয়েছেন, তুব সে পাচ্ছে। এইবার বুঝি একটা কুরুক্ষেত্র কাণ্ড বাধল।

চেয়ারে বসে একনাথ আপন মনে তর্জন-গর্জন করছিলেন, কুসুম পাশের দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকল। সেই দিকে তাকিয়ে একনাথের বাচনিক বাহ্বাস্ফোট বন্ধ হয়ে গেল, তিনি স্তম্ভিত বিস্ময়ে চেয়ে থেকে দেয়ালের দিকে চোখ ফিরিয়ে প্যাঁচার মতন বসে রইলেন।

কুসুম তাঁর বাঁ-পাশে এসে চুপ করে দাঁড়াল। একনাথ প্রথমে তার দিকে তাকালেন না। তারপর আড়চোখে একবার খাবারের দিকে তাকালেন। কুসুম নিঃশব্দে রইল।

হঠাৎ একনাথ তিরিক্ষি সুরে বললেন—'কি চাও ?'

কুসুম মৃদুকণ্ঠে বল —'খাবার এনেছি।'

'দরকার নেই।'

কুসুম চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। একনাথ কিছুক্ষণ পরে আড়চোখে দেখলেন কুসুম যায়নি, বললেন—'কথা কানে যায়নি, কাঠের পুতুলের মত দাঁড়িয়ে আছ কেন ?'

কুসুম নির্বিকার দাঁড়িয়ে রইল। একনাথের মুখে আষাঢ়ে মেঘের অন্ধকার, চোয়াল বজ্রের মতন কঠিন ; এ অবস্থায় তিনি কি করবেন ভেবে পাচ্ছেন না। হঠাৎ হাত বাড়িয়ে তিনি কুসুমের হাত থেকে প্লেট কেড়ে নিয়ে খেতে আরম্ভ করলেন। মুখ কিন্তু বজ্রগম্ভীর হয়ে রইল।

খাওয়া শেষ হলে কুসুম প্লেট নিয়ে গেলাস এগিয়ে ধরল। একনাথ গেলাসে চুমুক দিয়েছেন এমন সময় ডাক্তার পাণ্ডে দোরের সামনে এসে দাঁড়ালেন।

দৃশ্যটি দেখে ডাক্তারের মুখ ক্ষণেকের জন্যে উদ্ভাসিত হয়েই আবার শান্ত নির্লিপ্ত ভাব ধারণ করল। তিনি এগিয়ে এলেন। একনাথ জলের গেলাস কুসুমকে ফেরত দিয়ে ডাক্তারের প্রতি ভীষণ ভ্রূকুটি করে বললেন—'তোমার আবার কি দরকার ?'

কুসুম গেলাস ও রেকাবি নিয়ে চলে গেল, দোরের কাছ থেকে একবার ফিরে তাকাল। ডাক্তার হাসিমুখে এগিয়ে এসে বললেন—'কিছু না বাবুসাহেব, রোজের হাজিরা দিতে এসেছি। পায়ের ব্যথাটা কেমন ?'

একনাথ বললেন—'সে-কথা বলে লাভ কি ? রোগই যখন সারাতে পার না তখন রোজ এসে জেরা করার কি দরকার ?'

ডাক্তার প্রশ্নটা এড়িয়ে গিয়ে বললেন—'চেয়ারে বসলে দেখছি আপনার যন্ত্রণাটা কম

থাকে। ওষুধ ঠিকমত খাচ্ছেন তো?'

একনাথ বললেন—'তোমার ওষুধ খেলে ছাই হয়। ও ওষুধ আমি গোবর্ধনকে খাওয়াচ্ছি, ওর বুদ্ধিশুদ্ধি যদি একটু খোলে।'

পাণ্ডে সজোরে হেসে উঠলেন। একনাথের ভ্রূকুটি আবার গভীর হল—'এতে হাসির কী আছে? তোমার ওই রদ্দি ওষুধ আমার দরকার নেই, তোমার রোজ রোজ এসে খোঁজ-খবর নেবারও দরকার নেই। তোমার ডাক্তারি বাদ দিয়েও আমি ভাল থাকতে পারি।'

'সে তো খুবই ভাল কথা, আমিও তাই চাই। এখানে আসতে না হলে অন্য রোগীগুলোর দিকে নজর দিতে পারি।—প্রকৃতিই সবচেয়ে বড় ডাক্তার, বাবুসাহেব। আচ্ছা চলি।' ডাক্তার পিছু ফিরলেন।

একনাথের গলা থেকে শব্দ বার হল—'হুম্।'

বাগানে ফোয়ারা থেকে জল উঠছে, পনেরো বছর পরে ফোয়ারা থেকে আবার জল উৎসারিত হচ্ছে। সকালবেলা বাগানের এক পাশে ঘাসেব ওপর পা ছড়িয়ে বসে ললিতা কোঁচড়ে একরাশ ফুল নিয়ে মালা গাঁথছে। ছুঁচ-সুতোর সাহায্যে মালাটি প্রায় দুই হাত লম্বা হয়েছে।

পিছন দিক থেকে সোমনাথ হামাগুড়ি দিয়ে তার দিকে আসছে। ললিতার পাশে এসে সে ঘোড়ার মত চিঁহি চিঁহি শব্দ করে বলল—'ঘোড়া হাজির।'

ললিতা আহ্লাদে তড়াক করে লাফিয়ে উঠল, কোঁচড়ের ফুলগুলি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। ললিতা সোমনাথের পিঠে চড়ে বসল, ফুলের মালা লাগামের মতন তার মুখে পরিয়ে দিয়ে মুখে টক্ টক্ শব্দ করে বলল—'আগে বঢ়ো—আগে বঢ়ো—'

হামা দিতে দিতে সোমনাথ বলল—'সওয়ারী যাবে কোন দিকে?'

ললিতা বলল—'সওয়ারী যাবে ফোয়ারার দিকে। তার তেষ্টা পেয়েছে, জল খাবে। টক্ টক্।'

ঘোড়ার মতন অঙ্গভঙ্গী করে চিঁহি চিঁহি শব্দ করতে করতে সোমনাথ ফোয়ারার দিকে চলল।

ফোয়ারার চারিদিকে গোল করে সিমেন্ট বাঁধানো, চৌবাচ্চায় লাল মাছ ঘুরে বেড়াচ্ছে।

ঘোড়া ও আরোহিণী পাশাপাশি হাঁটু মুড়ে বসে আঁজলাভরে জল তুলে মুখে দিল, তারপর সিমেন্টের ওপর বসে গল্প করল। সোমনাথ বলল—'আমার পকেটে একটা জিনিস আছে।'

ললিতা সাগ্রহে প্রশ্ন করল—'কি জিনিস ভাই?'

সোমনাথ ধমক দিয়ে বলল—'আবার! গুরুজি বলতে পার না!'

ললিতা শুধরে নিয়ে বলল—'কি জিনিস গুরুজি?'

ভারিক্কি চালে সোমনাথ পকেট থেকে একটি দেশলাইয়ের বাক্স বার করল—'এতে কী আছে জান?'

'কি আছে, দেশলাইয়ের কাঠি?'

'না—আরশোলা।'

ললিতা অমনি কুঁকড়ে গেল। সোমনাথ বলল—'এটাকে পুষব ভাবছি।'

ললিতা বলল—'আরশোলা কেউ পোষে নাকি!'

'পুষলেই হল। লোকে কুকুর পোষ, পাখি পোষে, আরশোলা পুষলে দোষ কি?'

'আরশোলা ঘেউ ঘেউ করে ডাকবে? বুলবুলের মতন গান গাইবে?'

'বলতে পারি না, হয়তো শেখালে শিখবে।' বাক্সটি সন্তর্পণে একটু খুলে সোমনাথ ভেতরে উঁকি মারল—'দ্যাখো, কেমন গোঁফ নাড়ছে।'

দু'জনে মাথা ঠেকাঠেকি করে দেখতে লাগল। ললিতা বলল—'মনে হচ্ছে তেষ্টা পেয়েছে। একটু জল দিলে হয়।'

সোমনাথ বলল—'দূর বোকা! আরশোলা কি জল খায়! ওরা তেল খায়!'

দূর থেকে গোবর্ধনের গলা শোনা গেল—'এখানে তোমাদের কী হচ্ছে?'

সে কাছে এসে দাঁড়াতেই সোমনাথ বলল—'গোবর-দা, কী সুন্দর একটা আরশোলা!'

গোবর্ধন অমনি পশ্চাৎপদ হল—'অ্যাঁ—আরশোলা! ফেলে দাও—ফেলে দাও। আরশোলা ভারি পাজি জন্তু—ওটাকে জলে ফেলে দাও—'

সোমনাথ হাসতে হাসতে উঠে দাঁড়িয়ে বলল—'তুমি বুঝি আরশোলাকে ভয় কর?'

গোবর্ধন আর একটু পিছিয়ে গিয়ে বলল—'ভয় আমি কাউকে করি না—কিন্তু—' দেশলাইয়ের বাক্স হাতে সোমনাথ এগিয়ে আসছে দেখে সে আবার পিছু হটতে লাগল—'এ আবার কি...এরকম ঠাট্টা আমার ভাল লাগে না...আরশোলা দু'চক্ষে দেখতে পারি না—দেখলেই গা সিরসির করে—ছোটবাবু, ভাল হবে না বলছি—।' চকিতে পিছন ফিরে গোবর্ধন দৌড় মারল। সোমনাথ ও ললিতা হাসতে হাসতে তার পিছনে ছুটল।

অন্তঃপুরের একটি ঘরে মেঝের ওপর একটি আসনে বসে ডাক্তার পাণ্ডে আহার করছেন, হাত-পাখা নিয়ে তাঁর সামনে বসে কুসুম খাওয়া তদারক করছে।

খেতে খেতে পাণ্ডে কথা বলছেন—'এই দু'মাসেই বাবুসাহেব অনেক বদলে গেছেন।'

কুসুম চোখ নীচু করে বলল—'সে আপনি ভাল বলতে পারেন।'

পাণ্ডে বললেন—'হ্যাঁ মা, বোঝা যায়। এখন ওঁকে দেখে বেশ প্রফুল্ল মনে হয়, শরীর অনেক ভাল হয়েছে। মা, ওষুধপত্র কিছু নয়; আসল হল মন-মেজাজ ভাল থাকলে সব ভাল থাকে। গত পনেরো বছর বাবুসাহেবের মুখে হাসি দেখিনি; আশা হচ্ছে শিগগিরই ওঁর হাসিমুখ দেখতে পাব।'

অশ্রুরুদ্ধ স্বরে কুসুম বলল—'মা চণ্ডী তাই করুন।'

একনাথ নিজের ঘরে মোটা লাঠিতে ভর দিয়ে এদিক ওদিক ঘুরছেন, ঘড়ির দিকে তাকিয়ে ডাকলেন—'গোবর্ধন!'

গোবর্ধনের দেখা নেই। একনাথ কিছুক্ষণ দোরের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন, তারপর মেঝেয় লাঠি ঠুকতে ঠুকতে কতকটা আত্মগত ভাবেই বললেন—'কোথাও আড্ডায় বসেছে হতভাগা! নাঃ, ওকে দিয়ে আর চলবে না।'

তাঁর আফিমের সময় হয়েছে। তিনি নিজেই গিয়ে দেরাজ খুলে আফিমের কৌটোটি তুলে নিলেন। দেরাজে আরো অনেক টুকিটাকি জিনিস রয়েছে, অনেকদিন তিনি নিজের হাতে দেরাজ খোলেননি, আজ ওইগুলির ওপর তাঁর দৃষ্টি পড়ল। সবই ধুলোয় ঢাকা পুরানো জিনিস, তার মধ্যে দাবার ও ঘুঁটির বাক্স রয়েছে। একটু দ্বিধা করে তিনি সে দু'টি বার করলেন, ফুঁ দিয়ে ধুলো উড়িয়ে স্নেহের ভঙ্গিতে তাদের গায়ে হাত বুলোতে লাগলেন। অজ্ঞাতসারে একটা চাপা নিশ্বাস পড়ল।

হঠাৎ বন্ধ জানলার খড়খড়ি দিয়ে নীচে থেকে একটা হল্লার আওয়াজ এল। একনাথ

ভ্রূকুটি করলেন, দাবার ছক ও ঘুঁটি নামিয়ে রেখে জানলার কাছে গেলেন, জানলার পাল্লা খুলে নীচে দিকে তাকালেন।

জানলার ঠিক নীচে বাগানের এক কোণে সোমনাথ ও ললিতা গোবর্ধনের সঙ্গে কানামাছি খেলছে। বাড়ির অন্য ঝি-চাকর—তাদের মধ্যে তারা-ঝিও আছে—পাশে দাঁড়িয়ে মজা দেখছে। গোবর্ধনের চোখে ঝাড়ন বাঁধা, সে হাতড়ে বেড়াচ্ছে, আর ললিতা ও সোমনাথ তার মাথায় চাঁটি মেরে পালিয়ে যাচ্ছে। গোবর্ধন তাদের ধরতে পারছে না। খেলা বেশ জমে উঠেছে। ঝি-চাকরেরা খেলা দেখতে দেখতে উঁচু গলায় হেসে উঠছে।

জানলা থেকে অলক্ষিতে একনাথ এই দৃশ্য দেখছেন। তাঁর মুখ গম্ভীর।

এই সময় সোমনাথ পকেট থেকে দেশলাইয়ের বাক্সটি নিয়ে পা টিপে টিপে গোবর্ধনের পিছন দিকে গেল, আরশোলা বার করে তার ফতুয়ার মধ্যে ছেড়ে দিয়ে পালিয়ে এল। গোবর্ধন চিড়িক মেরে উঠল—'ওরে বাবা, এটা কি রে! পিঠের ওপর সড় সড় করছে—'

সোমনাথ খিল খিল করে হেসে বলল—'গোবর-দা, চিনতে পারলে না? আ-র-শো-লা!'

নিমেষে চোখের বাঁধন খুলে ফেলে গোবর্ধন লাফালাফি আর চিৎকার করতে লাগল—'ওরে বাবা রে, গেছি রে—এই যে কাঁধের ওপর—আরে, পেট খামচাচ্ছে—'

জানলায় দাঁড়িয়ে একনাথ মৃদু মৃদু হাসছেন। পনেরো বছর পরে প্রথম তাঁর মুখে হাসি দেখা দিয়েছে।

নীচে থেকেও যৌথ হাসির কলধ্বনি আসছে। হঠাৎ গম্ভীর হয়ে একনাথ হাঁক দিলেন—'গোবর্ধন!'

সকলের চোখ একসঙ্গে জানলার পানে উঠল। তারপর চক্ষের পলকে দাস-দাসীরা অন্তর্হিত হল। ললিতা ও সোমনাথ জানলার দিকে চেয়ে হাততালি দিয়ে হাসতে লাগল। গোবর্ধন ভব্যিযুক্ত হয়ে বলল—'আজ্ঞে যাই বাবু।'

জানলা থেকে সরে এসে একনাথ বিছানায় বসে আফিমের গুলি পাকাতে লাগলেন, তাঁর মুখে হাসি-হাসি ভাব লেগে রইল।

গোবর্ধন এসে মনিবের সামনে দাঁড়াল। তার গা ভরা অস্বস্তি, মাঝে মাঝে গা-ঝাড়া দিচ্ছে, আরশোলাটা বোধহয় এখনো তার জামার মধ্যে আছে।

একনাথ কড়া চোখে তার পানে তাকিয়ে বললেন—'কি হয়েছে? অমন চিড়িক মারছিস কেন?'

গোবর্ধন বলল—'আজ্ঞে না, ও কিছু নয়—'

'কিছু নয় তো চুপ করে দাঁড়া।'

হঠাৎ গোবর্ধন পেটের জামা মুঠোতে চেপে ধরে চেঁচিয়ে উঠল—'ধরেছি ব্যাটাকে—ধরেছি—!' বলেই কর্তার দিকে চেয়ে থেমে গেল।

কর্তা বললেন—'কী ধরেছিস? তোর পেটে কী হয়েছে? পেট কামড়াচ্ছে?'

গোবর্ধন তখন কাতর স্বরে বলল—'আজ্ঞে না বাবু, পেট কামড়াচ্ছে না—একটা আরশোলা—ছোটবাবু জামার মধ্যে আরশোলা ছেড়ে দিয়েছেন।'

হাসি চাপার চেষ্টায় একনাথের মুখ ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল। তিনি বললেন—'তুই নিজে একটা আরশোলা। জল দে, আফিম খাব।'

গোবর্ধন সোরাই থেকে জল ঢেলে আনল, একনাথ আফিমের গুলি মুখে দিয়ে জল খেলেন। গোবর্ধন সোরাইয়ের মুখে গেলাস চাপা দিয়েছে এমন সময় আবার আরশোলা

তার বগলে সড় সড় করে উঠল ; সে বগল চেপে ধরে একটা অর্ধোচ্চারিত চিক্কুর ছেড়ে লাফাতে লাফাতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল্। এবার একনাথের গলার মধ্যে হাসির মতন একটা চাপা আওয়াজ শোনা গেল।

সোমনাথ ঘরে ঢুকল ; একনাথ অমনি গম্ভীর হলেন। সোমনাথ বলল—'দাদু, গোবর-দা'র নাচ দেখলেন ?'

একনাথ গম্ভীর মুখে বললেন—'ওর পেছনে লেগেছে কেন ? আরশোলা নিয়ে এ কি খেলা ! কোথায় পেলে আরশোলা ?'

সোমনাথ উৎসাহ ভরে বলল—'নীচে ভাঁড়ার ঘরে কাঠের সিন্দুকটার মধ্যে অনেক আরশোলা আছে দাদু।' দেরাজের দিকে যেতে যেতে—'এটা অনেক পুরানো দেরাজ, এর মধ্যেও আরশোলা আছে।'

দেরাজের ওপর দাবার ছক ও ঘুঁটি দেখে সে অবাক দৃষ্টিকে একনাথের পানে চাইল, ঘুঁটির কৌটো হাতে নিয়ে বলল—'দাদু, আপনি দাবা খেলতে জানেন ?'

হাস্যকর প্রশ্ন। একনাথ বললেন—'ফাজিল ছেলে ! তুমি জান ?'

সোমনাথ বলল—'জানি। বাবা শিখিয়েছিলেন।'

একনাথের চোখের ওপর বাষ্পচ্ছায়া পড়ল, তিনি নিশ্বাস চেপে বললেন—'তোমার বাবাকে আমি শিখিয়েছিলাম।'

সোমনাথ ছক আর ঘুঁটির কৌটো নিয়ে একনাথের পাশে এসে দাঁড়াল—'আমার সঙ্গে এক দান খেলবেন দাদু ?'

আয়ত চোখে চেয়ে থেকে একনাথ বললেন—'তুমি খেলবে আমার সঙ্গে ! তোমার সাহস তো কম নয় ! আমি চোখ বুজে খেললেও তুমি হেরে যাবে।'

সোমনাথ উত্তেজিত হয়ে বলল—'কখ্খনো না, আপনি হারাতে পারবেন না। বাজি রাখুন, আমি যদি আপনাকে হারিয়ে দিই কী দেবেন বলুন ?'

একনাথ ক্ষণেকের জন্যে চোখ বুজলেন, লোকনাথের সঙ্গে শেষ দাবা খেলার কথা মনে পড়ে গেল। তিনি চোখ খুলে বললেন—'কী নেবে তুমি ?'

'একটা টাট্টুঘোড়া।'

'বেশ, তাই হবে। আর তুমি যদি হেরে যাও আমাকে কী দেবে ?'

সোমনাথ ভ্রূ কুঁচকে কিছুক্ষণ ভাবল, তারপর পকেট থেকে লাট্টু বের করে বলল—'এই লাট্টুটা আপনাকে দেব।'

সোমনাথের সীরিয়াস মুখের দিকে চেয়ে একনাথের ঠোঁটের কোণ নড়ে উঠল, তিনি বললেন—'টাট্টুর বদলে লাট্টু ! বেশ, বাজি রইল। —বোর্ড লাগাও।'

সোমনাথ মহানন্দে টেবিলের ওপর ছক পেতে ঘুঁটি সাজাতে লাগল। প্রশ্ন করল—'কোন ঘুঁটি আপনি নেবেন ? সাদা না কালো ?'

বিছানা থেকে নামতে নামতে একনাথ বললেন—'কালো—আমি চিরদিন কালো ঘুঁটি নিয়ে খেলি।'

তিনি একটু খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে এসে টেবিলের সামনে বসলেন ; ছকের ওপর ঘুঁটির অবস্থান পরিদর্শন করে বললেন—'ঠিক আছে। তুমি আরম্ভ কর।'

সোমনাথ মন্ত্রীর ঘরের বোড়ে চারের ঘরে এগিয়ে দিয়ে একনাথের মুখের পানে চাইল। একনাথ রাজার ঘরের বোড়ে চারের ঘরে এগিয়ে দিলেন। সাদা কালো দুই বোড়ে মুখোমুখি বসল। খেলার লড়াই শুরু হয়ে গেল।

অন্তঃপুরের উঠোনে কুসুম পায়রাদের গম খাওয়াচ্ছে। কোঁচড় থেকে গম নিয়ে উঠোনে ছড়িয়ে দিচ্ছে, একঝাঁক পায়রা গুঁতোগুঁতি করে তাই খাচ্ছে।

পুরোহিতমশাই পুজোর ঘরে স্তব পাঠ করছেন। গোবর্ধনের সংহত গলা শোনা গেল—'বৌদিদি—'

কুসুম ফিরে চাইল। গোবর্ধন চোখ বড় বড় করে কাছে এসে দাঁড়াল। তার মুখ দেখে মনে হয় ভীষণ একটা কিছু ঘটেছে। কুসুম শঙ্কিত হয়ে বলল—'কী হয়েছে গোবর্ধন ?'

মাথা নেড়ে গোবর্ধন বলল—'তুমি বিশ্বাসই করতে পারবে না বৌদিদি, আমি নিজের চোখে দেখেছি তা আমারই বিশ্বাস হচ্ছে না—'

কুসুমের আতঙ্ক বাড়ছে—'সোমনাথ কোথায় ?'

'আহা সেই কথাই তো বলছি বৌদিদি—'

ব্যাকুল স্বরে কুসুম বলল—'শিগগির বল—সোমনাথ কোথায় ?'

'কর্তাবাবুর সঙ্গে দাবা খেলছে। ভগবানের কী লীলা ! স্বপ্নেও ভাবা যায় না। ঘরে উঁকি দিয়ে দেখি দাদা আর নাতি মুখোমুখি বসে দাবা খেলছেন। এ বাড়িতে আগে যেমন হত ঠিক তেমনি পুরানো আমল কি আবার ফিরে এল বৌদিদি ?'

কুসুমের চোখে জল এসে পড়ল, সে আঁচল দিয়ে মুখ মুছল।

ওদিকে দাদু-নাতি দাবা খেলায় মগ্ন। সোমনাথ ছকের ওপর ঝুঁকে আছে, চোখে একাগ্র তন্ময়তা। একনাথ মাঝে মাঝে চোখ তুলে দেখছেন ; তাঁর মনে বিভ্রম জাগছে—এ কি সোমনাথ, না লোকনাথ ?

লোকনাথই চাল দিচ্ছে, তারপর সোমনাথের গলার আওয়াজ আসছে—'দাদু, এবার আপনার চাল।'

আচ্ছন্নের মতন একনাথ চাল দিচ্ছেন। মাথার মধ্যে ঘুরছে—লোকনাথ—সোমনাথ—আমার ছেলে—আমার নাতি—লোকনাথ যেন ছেলেকে আমার কাছে প্রতিনিধি পাঠিয়েছে ; নিজে এল না, বড় অভিমানী ছিল—

জলখাবারের দুটি রেকাবি হাতে নিয়ে কুসুম ঘরে ঢুকল। পিছনে গোবর্ধন। সে কুসুমের দিকে চোখ বেঁকিয়ে চাইল ; যেন বলল—'দেখলে ? কী বলেছিলাম !'

কুসুম ইশারা করল, গোবর্ধন একটি ছোট টিপাই এনে খেলার টেবিলের পাশে রাখল। কুসুম রেকাবি দুটি টিপায়ের ওপর রেখে খেলোয়াড়দের দিকে চাইল, কিন্তু খেলোয়াড়দের কোন দিকেই লক্ষ নেই। কুসুমের মুখ শান্ত, সে অনুচ্চ স্বরে বলল—'বাবা, আপনার জলখাবার।'

একনাথ মুখ না তুলেই বললেন—'বাইরে অপেক্ষা করতে বল, এখন আমি ব্যস্ত আছি।'

কুসুম ও গোবর্ধন মুখ চওয়া-চাওয়ি করল, তারপর কুসুম একটু গলা চড়িয়ে বলল—'আপনার খাবার এনেছি বাবা।'

একনাথ বিরক্ত স্বরে বললেন—'তাকে কাল আসতে বল, আজ আমার সময় নেই।' এক ঘর গজ এগিয়ে দিয়ে বিজয়ীদীপ্ত কণ্ঠে বললেন—'কিস্তি।'

সোমনাথ একটু বিপদে পড়েছে ; চারিদিকে শত্রু। কিন্তু পরিত্রাণের রাস্তা এখনো খোলা আছে। সে গজের মুখ থেকে রাজাকে সরিয়ে নিয়ে একনাথের পানে চেয়ে মিটিমিটি হাসল—অর্থাৎ কী এমন কিস্তি দিয়েছ !

এই সময় ডাক্তার পাশে বাইরের দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকলেন, ঢুকেই থমকে দাঁড়ালেন। দাদু ও নাতি দাবা খেলায় মগ্ন, বাহ্যজ্ঞানশূন্য! কুসুমের পানে চেয়ে তাঁর মুখ হাসিতে ভরে উঠল, তিনি ভ্রূ তুলে নীরব প্রশ্ন করলেন—'কাণ্ডটা কী?'

কুসুম মৃদু হেসে খেলোয়াড়দের পানে চেয়ে রইল। ডাক্তার এসে একনাথের পিছনে দাঁড়িয়ে খেলা দেখতে লাগলেন।

হঠাৎ খেলার মোড় ঘুরে গেল। সোমনাথ নিজের মন্ত্রীকে কোণাকুণি দু'ঘর এগিয়ে দিয়ে বলল—'কিস্তি।'

একনাথ চমকিত হয়ে নিজের রাজা নিয়ে পালাবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু কোন ফল হল না, আরো দু' চাল পরে সোমনাথের মন্ত্রী একনাথের রাজার সামনে চেপে বসল, সোমনাথ বলল—'কিস্তি মাৎ।'

অত্যন্ত বিপন্ন ভাবে একনাথ ছকের ওপর ঝুঁকে পড়ে দেখলেন সত্যিই তিনি মাৎ হয়ে গেছেন, আর রাজা নিয়ে পালাবার রাস্তা নেই। ওদিকে সোমনাথ নাচতে শুরু করেছে, নাচছে আর বলছে—'দাদুকে হারিয়ে দিয়েছি, দাদু মাৎ হয়ে গেছেন—'

একনাথের মুখে কথা নেই, তিনি হতবুদ্ধি হয়ে ছকের দিকে তাকিয়ে আছেন। কুসুম ঠোঁটের ওপর আঁচল চাপা দিয়েছে, গোবর্ধন দন্ত-বিকশিত করে মাথা চুলকোচ্ছে। ডাক্তার হঠাৎ সজোরে হেসে উঠলেন।

সোমনাথ তখনো নাচছে—'দাদুকে হারিয়ে দিয়েছি—মা তুমি সাক্ষী, ডাক্তারবাবু সাক্ষী—দাদু, আমাকে ঘোড়া দিন।' সে একনাথের সামনে হাত পাতল।

একনাথ মুখ তুলে বোকার মতন বললেন—'ঘোড়া!'

'হ্যাঁ। বাজি রেখেছিলেন হেরে গেলে টাট্টুঘোড়া দেবেন!' সে টপ করে খাবারের প্লেট তুলে নিয়ে খেতে আরম্ভ করল।

একনাথ লজ্জিত ভাবে ছক থেকে সোমনাথের পানে চাইলেন। বিড় বিড় করে বললেন—'অনেকদিন খেলিনি...দুধের ছেলের কাছে হেরে গেলাম—'

সোমনাথ খেতে খেতে বলল—'দাদু, আমার ঘোড়া?'

'দেব রে বাপু, দেব। কিন্তু কাল আবার খেলা বসবে, তোকে গজচক্র অশ্বচক্র করে ছেড়ে দেব—'

তিনি খাবারের প্লেট তুলে নিলেন। তাঁর মুখে একটু হাসির ঝিলিক খেলতে লাগল, মৃদু হাসি ক্রমে বাড়তে লাগল, শেষে একেবারে হো হো করে অট্টহাসি হাসতে লাগলেন। যেন বহুকালের রুদ্ধ উৎসমুখ হঠাৎ খুলে গিয়ে জলের উচ্ছ্বাস চারিদিকে উৎসারিত হল।

বাষ্পাচ্ছন্ন চোখে কুসুম তাঁর পানে চেয়ে রইল। ডাক্তারের চোখও আর্দ্র হল, তিনি জানলার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন।

সোমনাথের ঘোড়া কেনা হয়েছে, দুধের মত সাদা টাট্টুঘোড়া। সহিসের ব্যবস্থাও হয়েছে। ঘোড়ার পিঠে জিন চড়িয়ে মুখের লাগাম ধরে সহিস দাঁড়িয়ে আছে, আর যোধপুরী ব্রিচেস পরে চাবুক হাতে নিয়ে সোমনাথ ঘোড়ায় চড়বার চেষ্টা করছে।

ঘোড়ার পিঠে চড়া সহজ কাজ নয়, তা হোক না সে টাট্টুঘোড়া।

যতবারই সোমনাথ ঘোড়ার পাশে গিয়ে লাফ মেরে পিঠে চড়বার চেষ্টা করছে, ততবারই সে সরে সরে যাচ্ছে। বাড়ির কয়েকজন গোমস্তা ও চাকর দাঁড়িয়ে ঘোড়ায় চড়া দেখছে ও নানা রকম মন্তব্য করছে।

গোবর্ধন বলল—'ঘোড়াটা দেখছি ভারি দুষ্টু। ছোটবাবু, আমি বরং তোমাকে কোলে করে ওর পিঠে তুলে দিই।'

'না, আমি নিজেই চড়ব।' সোমনাথ আবার লাফ দিল, কিন্তু ঘোড়া আবার সরে গেল।

একজন গোমস্তা বুদ্ধি দিল—'একটা টুল আনলে ভাল হয়, টুলে চড়ে সহজে ওঠা যাবে।'

দ্বিতীয় গোমস্তা বলল—'ছোটবাবুর হাতের চাবুক দেখেই ঘোড়া ভয় পাচ্ছে। ওটা ফেলে দিলেই তো ল্যাটা চুকে যায়।'

সোমনাথ রাগ করে বলল—'তোমাদের আর বুদ্ধি দিতে হবে না, আমি যেমন করে পারি উঠব।'

গোবর্ধন বলল—'আমি বলি কি, ঘোড়াব পা-গুলো চেপে ধরলে হয় না?'

গোমস্তা বলল—'ঘোড়ার পায়ে ধরতে চাও তুমিই ধর না বাপু।'

সকলে হেসে উঠল।

দোতলায় নিজের জানলা থেকে একনাথ সব দেখছেন আর অসহিষ্ণু হয়ে উঠছেন। যত সব অপদার্থ! একটা ছেলেকে ঘোড়ায় চড়াতে পারে না।

তিনি হাঁক দিয়ে বললেন—'দাঁড়া সোমনাথ, আমি আসছি—'

তিনি বকতে বকতে দোরের দিকে চললেন।

নীচের বারান্দায় ললিতা একটি কাঠের ঘোড়ায় চড়ে দোল খাচ্ছিল, একনাথ সিঁড়ির রেলিং ধরে আস্তে আস্তে নীচে নেমে এলেন; পা ঠিক পড়ছে না। একটু খোঁড়াচ্ছেন। বারান্দা পার হয়ে তিনি বাগানের দিকে চলে গেলেন। ললিতা হাঁ করে চেয়ে রইল। সে আগে কখনো একনাথকে নীচের তলায় নামতে দেখেনি।

ওদিকে কুসুম ঠাকুরঘর থেকে পুজোব ফুল সাজিতে নিয়ে একনাথের ঘরে গেল। বিছানার পাশে সাজি রেখে সে চারদিকে তাকিয়ে দেখল, ঘরে একনাথ নেই। সে আশ্চর্য হয়ে ভাবল—বাবা আবার কোথায় গেলেন! ঘর ছেড়ে কোথাও তো যান না! জানলা খোলা দেখে সে গিয়ে নীচে উঁকি মারল।

একনাথ বাগানে পৌঁছে গেছেন, সোমনাথকে লক্ষ্য করে তিনি বলছেন—'দাঁড়া, ওরকম করে ঘোড়ায় চড়ে না—এই দ্যাখ, আমি শিখিয়ে দিচ্ছি।'

কুসুম গালে হাত দিয়ে জানলা থেকে সরে এল—'ওমা কি হবে, বাবা একেবারে নীচে নেমে গেছেন! মা চণ্ডী, রক্ষে করো।'

কুসুম ছুটতে ছুটতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

বাগানে চাকর-গোমস্তারা একনাথকে আসতে দেখে যে-যার সরে পড়ল। একনাথের কোনদিকে দৃষ্টি নেই, তিনি গিয়ে সহিসের হাত থেকে লাগাম নিয়ে সোমনাথকে বললেন—'অমন করে ঘোড়ায় চড়ে না। এদিকে আয়, আমার কাঁধে ভর দে—হ্যাঁ—এবার ডান হাতে জিনের মুঠ ধবে লাফিয়ে ওঠ—এই তো ঠিক হয়েছে—'

ঘোড়া মানুষ চেনে, সে এবার সবে গেল না। সোমনাথ রেকাবে পা দিয়ে ঘোড়ার পিঠে উঠে বসল। একনাথ তার হাতে লাগাম দিয়ে বললেন—'লাগামে বেশি ঢিল দিস না। হ্যাঁ, এবার বাগানের মধ্যে চক্কর দে; প্রথমেই ছুট দিস না—ধীর কদম—'

সন্তুষ্ট বিচারকের দৃষ্টিতে অশ্বারূঢ় নাতিকে পরিদর্শন করে একনাথ বাড়ির দিকে ফিরে চললেন।

বারান্দার সিঁড়ির মুখে ডাক্তার পাণ্ডের সঙ্গে দেখা। পাণ্ডে বাইরে ফটকের দিক থেকে আসছিলেন, একনাথকে নীচের তলায় দেখে হন্তদন্ত হয়ে এগিয়ে গেলেন—'আরে এ কি কাণ্ড! আপনি একেবারে নীচে নেমে এসেছেন!'

'কেন আমি কি নীচে নামতে পারি না!' তাঁর মনে যতই তেজ থাক শরীরের শক্তি কমে গিয়েছিল, তিনি ক্লান্ত ভাবে সিঁড়ির প্রথম ধাপে বসে মুখে বিক্রম দেখিয়ে বললেন—'তুমি ভেবেছ কী? আমি অক্ষম অকর্মণ্য?'

ডাক্তার তাড়াতাড়ি বললেন—'না না, বাবুসাহেব, কিন্তু আপনার পায়ের ব্যথাটা—'

'কে বলে আমার পায়ে ব্যথা!' তিনি তড়াক করে উঠে দাঁড়িয়ে সিঁড়ি দিয়ে ওঠবার উপক্রম করলেন, কিন্তু এক ধাপ উঠেই তাঁকে দাঁড়িয়ে পড়তে হল, মুখ বিকৃত করে পায়ের যন্ত্রণা দমন করলেন। সিঁড়ি দিয়ে নামা যত সহজ, ওঠা তত সহজ নয়।

ঠিক এই সময় কুসুম দ্রুতপদে নেমে এল। সে কোন কথা না বলে একনাথের একটা বাহু তুলে নিয়ে নিজের কাঁধের ওপর রাখল, বলল—'এবার আমার কাঁধে ভর দিয়ে উঠুন—আস্তে আস্তে উঠুন—'

একনাথ গলার মধ্যে একটা 'হুম্' শব্দ করলেন, কোন আপত্তি করলেন না। ডাক্তার পিছন থেকে বললেন—'আমিও আসব নাকি? দু'দিক থেকে দু'জন ধরলে আরো সহজে উঠতে পারবেন।'

একনাথ কড়া সুরে বললেন—'না না, তোমাকে দরকার নেই।'

সিঁড়ির মাথায় উঠে একনাথ দাঁড়ালেন, কুসুম তাঁকে ছেড়ে দিল। ডাক্তারও পিছন পিছন উঠছিলেন, একনাথ তাঁর পানে বিজয়গর্বিত চোখে চেয়ে বললেন—'দেখলে তো, পাখির মত উড়ে চলে এলাম।'

ডাক্তার মিটি মিটি হেসে বললেন—'হ্যাঁ বাবুজি, একেবারে বাজপাখির মত। এবার চলুন, বিছানায় শুয়ে একটু বিশ্রাম করবেন।'

'আমার পা কিন্তু ঠিক আছে।'

ডাক্তার আশ্বাস দিয়ে বললেন—'তাতে কোন সন্দেহ নেই। চলুন—চলুন—'

নিজের ঘরে ঢুকে নিজের বিছানায় শুলেন, ডাক্তার ও কুসুম খাটের দু'পাশে। একনাথের মেজাজ আবার চড়ে গেল, তিনি ডাক্তার পাণ্ডের পানে কটমট চক্ষে চেয়ে বললেন—'তোমার অত্যাচার আর আমি সহ্য করব না। রাতদিন একটা ঘরের মধ্যে আমাকে আটক করে রেখেছ। আমি কি জেলখানার কয়েদী? তুমি যাও, নিজের চিকিৎসা আমি নিজেই করতে পারব—ফের যদি তুমি এসে আমার পিছনে লাগো, হুলস্থূল কাণ্ড বেধে যাবে—'

পাণ্ডে প্রসন্ন স্বরে বললেন—'না না বাবুজি, আর আমি আপনাকে বিরক্ত করব না। কথা দিচ্ছি আপনি ডেকে না পাঠালে আর আমি আসব না। কেমন, তাহলে হবে তো? আচ্ছা আজ চলি।' কুসুমের দিকে চেয়ে একটু হেসে তিনি বিদায় নিলেন।

ডাক্তার চলে যাবার পর একনাথ একটা হাঁটু তুলে সন্তর্পণে হাত দিয়ে অনুভব করলেন, মনে হল বাতে আক্রান্ত হাঁটুটা ফুলেছে। তিনি হাঁক ছাড়লেন—'গোবর্ধন।'

কুসুম খাটের আরো কাছে এসে বলল—'বাবা, গোবর্ধনকে ডেকে দেব? কি দরকার আমাকে বলুন না।'

মুখ গোঁজ করে একনাথ বললেন—'হাঁটুর ব্যথা বেড়েছে। ডাক্তারের ওই দুর্গন্ধি ওষুধ আর লাগাব না। গোবর্ধনকে বল একবাটি তেল গরম করে এনে হাঁটুতে মালিশ করে

দিক।'

কুসুম বলল—'আমি এক্ষুনি গরম তেল এনে মালিশ করে দিচ্ছি, আপনি চুপ করে শুয়ে থাকুন।'

একনাথ উঠে বসার উপক্রম করে বললেন—'কিন্তু—'

কুসুম তাঁকে আবার শুইয়ে দিয়ে বলল—'আপনি শুয়ে থাকুন, আমাকে আপনার পদসেবা করতে দিন।' সে দ্রুতপদে চলে গেল।

একনাথ বাষ্পাকুল চোখে ঊর্ধ্বে চেয়ে রইলেন।

বাগানে একটা গাছের ছায়ায় ঘোড়ার পিঠে বসে সোমনাথ বিশ্রাম করছে ; সহিস পাশে দাঁড়িয়ে অছে। সে ও ঘোড়ার সঙ্গে সঙ্গে দৌড়েছিল।

সহিস কপালের ঘাম মুছে বলল—'এইবার নামুন ছোটসাবে। আবার বিকেলে চড়বেন।'

সোমনাথ বলল—'আর একটা চক্কর দেব। তোমার সঙ্গে যাবার দরকার নেই, তুমি এখানেই থাকো। পনেরো মিনিটের মধ্যেই আমি ফিরে আসছি।'

লাগাম নেড়ে সে ঘোড়াকে চালু করল।

একনাথ পূর্ববৎ বিছানায় চিৎ হয়ে শুয়ে আছেন। একটি বাটিতে সর্ষের তেল এবং লম্বা এক টুকরো ফ্ল্যানেল কাপড় নিয়ে কুসুম ঘরে ঢুকল, তার পিছনে জ্বলন্ত কাঠকয়লার আংটা নিয়ে গোবর্ধন। কুসুম ইশারা করল, গোবর্ধন একটি টিপাইয়ের ওপর আংটা রেখে টিপাই খাটের পাশে এনে রাখল। কুসুম আঁচের ওপর তেলের বাটি বসিয়ে একটি ছোট প্যাকেট খুলে অল্প কর্পূর তেলের মধ্যে ফেলে দিল, গোবর্ধনকে বলল—'গোবর্ধন, বাবুসাহেবের হাঁটুর নীচে বালিশ দাও।'

একনাথ এতক্ষণ ঘাড় ফিরিয়ে দেখছিলেন, বিরক্ত মুখে বললেন—'এসব কি হচ্ছে ?'

কুসুম বলল—'গরম তেল কর্পূর দিয়ে হাঁটুতে মালিশ করব।'

'কী হবে মালিশ করে ?'

'ব্যথা সেরে যাবে।' খাটের কিনারায় বসে কুসুম গরম তেলে আঙুল ডুবিয়ে মালিশ করতে শুরু করল, অনুযোগের সুরে বলল—'এই শরীরে কি বাড়াবাড়ি সহ্য হয়। আমি জানতে পারলে হরগিস নীচে নামতে দিতুম না। —গোবর্ধন, বাবুসাহেবের কপালে ঘাম হচ্ছে দেখতে পাচ্ছ না ? পাখা দিয়ে মাথায় বাতাস কর।'

একনাথ বকুনি খেয়ে চোখ বুজে শুয়ে রইলেন। গোবর্ধন তাঁর মাথায় বাতাস করতে লাগল।

কুসুম তেল মালিশ করছে আর আংটায় ফ্ল্যানেল তাতিয়ে সেঁক দিচ্ছে। সে কতকটা যেন নিজ মনেই বলতে লাগল—'বাতের ব্যথা কি সহজ ব্যথা, অনেক যত্ন নিলে তবে সারে। তারপর সেরে গেলে যা ইচ্ছে করা যায়। —ব্যথা কি একটু কম মনে হচ্ছে ?'

একনাথ হাঁটু একটু নাড়াচাড়া করে বললেন—'হুম, আর তেমন চিড়িক মারছে না। তুমি যাও, আর সেঁকের দরকার নেই।'

কুসুম বলল—'সে কি বাবা, আরো আধঘণ্টা সেঁক দিতে হবে। আজ সারা দিন বিছানা থেকে উঠতে পাবেন না। গোবর্ধন, যাও, আরো কাঠকয়লা নিয়ে এস।'

গোবর্ধন চলে গেল। একনাথ মুখ গোমড়া করে বললেন—'বেশ, লাগাও মালিশ,

তোমারই কষ্ট, আমার কি ! আমি দশদিন বিছানা থেকে উঠব না।'

এই সময় গোবর্ধন ছুটতে ছুটতে এসে বলল—'সর্বনাশ হয়েছে, ছোটবাবু ঘোড়া থেকে পড়ে গেছেন !'

একনাথ খাড়া উঠে বসলেন—'কি বললি, সোমনাথ ঘোড়া থেকে পড়ে গেছে ! কি করে পড়ল ? কোথায় পড়ল ?'

গোবর্ধন বলল—'তা তো জানি না হুজুর, সহিস ছুটে এসে বলল,—ছোটবাবু ঘোড়া থেকে পড়ে গেছেন।'

একনাথ বিছানা থেকে নামতে নামতে বললেন—'যত সব অপদার্থের দল—'

কুসুম বাধা দিয়ে বলল—'বাবা, আপনি খাট থেকে নামবেন না। আপনার পা—'

'চুলোয় যাক পা! ছেলেটা বাঁচল কি মরল কেউই দেখছে না, কেবল চেঁচাচ্ছে—'একনাথ বিছানা থেকে নেমে দাঁড়ালেন।

কুসুম ছুটে এসে বাধা দিল—'বাবা, আপনি ঘরে থাকুন, আমি নীচে গিয়ে দেখছি কী হয়েছে। দেখেই আপনাকে খবর দেব। ছেলেরা কত পড়ে যায়, কত হাত-পা ভাঙে, তার জন্য এত ভাবনার কী আছে !'

কোন কথায় কান না দিয়ে একনাথ বললেন—'গোবর্ধন, লাঠিটা দে।—কোন কথা শুনতে চাই না—আমি নীচে যাচ্ছি। ছেলেটার যদি কিছু হয়ে থাকে কাউকে আস্ত রাখব না—'লাঠি ধরে একনাথ খোঁড়াতে খোঁড়াতে ঘর থেকে বেরুলেন।

কুসুম তেলের বাটি ইত্যাদি তুলে নিতে নিতে বলল—'গোবর্ধন, তুমি ওঁর সঙ্গে সঙ্গে যাও, নইলে হয়তো পড়ে যাবেন। আমি আসছি।'

গোবর্ধন ছুটে বেরিয়ে গেল।

একনাথ তখন সিঁড়ির রেলিং ধরে আস্তে আস্তে নামছেন। গোবর্ধন, তাড়াতাড়ি নেমে এসে তাঁর অনুগামী হল।

সিঁড়ির নীচে কাঠের ঘোড়ায় চড়ে ললিতা দোল খাচ্ছিল, একনাথ সেখানে নেমে এক গর্জন ছাড়লেন—'শম্ভু ! গজাধর ! রঘুয়া ! কোথায় গেল হতভাগারা ! দৌড়ে যা, দ্যাখ সোমনাথ কোথায়—'

গর্জনের প্রথম ধাক্কাতেই ললিতা ঘোড়া থেকে উল্টে পড়ে গেল। একনাথের সেদিকে লক্ষ নেই, তিনি পা টেনে টেনে বাগানের দিকে চললেন। তিনচার জন চাকর তাঁর দিকে ছুটে আসছে দেখে তিনি আবার চিক্কুর ছাড়লেন—'এদিকে আসছিস কেন রে অলপ্পেয়ের দল, সোমনাথ কোথায় আগে দ্যাখ—'

চাকরেরা পাকসাট খেয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল।

ওদিকে কুসুম তাড়াতাড়ি নেমে এসে দেখল ললিতা কাঠের ঘোড়া উল্টে সিঁড়ির নীচে চুপটি করে পড়ে আছে, সে তাকে হাত ধরে তুলে একনাথের কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

একনাথ হতাশ স্বরে বললেন—'ভগবান জানেন কোথায় পড়ে আছে ছেলেটা ! সহিসটাই বা কেমন !—'

এই সময় ঘোড়ার ক্ষুরের টগবগ্ আওয়াজ শোনা গেল। একনাথ কথা থামিয়ে সেইদিকে তাকালেন। কদম-চালে ঘোড়া চালিয়ে সোমনাথ আসছে। একনাথ মহা উল্লাসে দু'হাত তুলে বললেন—'আরে এই তো সোমনাথ ! তবে যে হতভাগারা বলল ঘোড়া থেকে পড়ে গেছে !'

সোমনাথ এসে একনাথের সামনে ঘোড়া থামাল, একমুখ হাসি নিয়ে ঘোড়ার পিঠ

থেকে নামল, বলল—'হ্যাঁ দাদু, ঘোড়াটা আমায় ফেলে দিয়েছিল। এই দ্যাখো গায়ে ধুলো লেগেছে। কিন্তু আমি তখনি আবার উঠে এক লাফে তার পিঠে চড়ে বসলাম। কি করে ঘোড়ার পিঠে চড়তে হয় এখন আমি শিখে নিয়েছি, আর আমাকে ফেলতে পারবে না।'

আনন্দে আত্মহারা হয়ে একনাথ সোমনাথকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন, বললেন—'শাবাশ ! এই তো পুরন্দরপুরের সিংহ বংশের ছেলে ! বৌমা, দেখেছ, ছেলে কাকে বলে !'

কুসুম দেখবে কী, তার দুই চোখে তখন কান্নার বান ডেকেছে।

ব্যস্তসমস্ত ভাবে ডাক্তার পাশে এসে উপস্থিত হলেন—'এ কি, আবার আপনি নেমে এসেছেন ! পায়ের ব্যথাটা কি সারতে দিতে চান না ?'

'যাও যাও ডাক্তার, তোমার ডাক্তারি আর আমার দরকার নেই। তোমার চেয়ে ঢের ভাল ডাক্তার আমি পেয়েছি।' একনাথ সগর্বে কুসুমের পানে চাইলেন—'হাঁটুতে অ্যায়সা গরম তেল মালিশ করেছে যে ব্যথা দেশ ছেড়ে পালিয়েছে।'

একনাথ নাতির কাঁধে হাত রেখে প্রায় স্বাভাবিক চালে সিঁড়ির দিকে চললেন, কুসুম তাঁদের পিছন পিছন গেল। ডাক্তার কিছুক্ষণ নির্বাক দাঁড়িয়ে রইলেন, তারপর তাঁর মুখ পরম তৃপ্তির হাসিতে ভরে উঠল।

মানুষের জীবনে দশটা বছর অল্প কাল কী দীর্ঘকাল তা নির্ণয় করা কঠিন। সুখী দম্পতির জীবনে দশটা বছর চক্ষের পলকে কেটে যায়, আবার কয়েদীর জীবনে দশ বছর কেটেও কাটতে চায় না। সবই আপেক্ষিক।

পুরন্দরপুরের জমিদার-বাড়িতে সকলের বয়স দশ বছর বেড়ে যাওয়া ছাড়া বিশেষ কোন পরিবর্তন ঘটেনি। পুরোহিতমশাই গৃহদেবীর পূজা করেন, স্তোত্রপাঠ করেন। গোবর্ধনের কানের কাছে চুলে পাক ধরেছে, তবু সে মাঝে মাঝে তারা-ঝি'র হাত ধরে হঠাৎ নাচতে আরম্ভ করে, কর্তা অনেকদিন তাকে গলমন্দ করেননি।

কর্তা রোজ সকালবেলায় নীচের তলায় দপ্তরখানায় চৌকিতে এসে বসেন। পিছনে ও দু'পাশে মোটা তাকিয়া, হাতে গড়গড়ার নল। নায়েব হিসেবের খাতা খুলে আয়-ব্যয়ের বয়ান শোনায়। একনাথের বয়স এখন সত্তর, কিন্তু তাঁর শরীরে বার্ধক্যের শিথিলতা আসেনি ; মুখের উগ্র গাম্ভীর্য যেন একটু নরম হয়েছে। দশটা বছর তাঁর শরীরের ওপর দিয়ে অতি লঘুপদে চলে গেছে, কোথাও পদচিহ্ন রেখে যায়নি। ছেলেকে হারিয়ে তিনি যে মানসাগ্নিতে দগ্ধ হচ্ছিলেন, নাতিকে পেয়ে সে-দাহ শীতল হয়েছে।

বিকেলবেলা কুসুম ললিতার চুল বাঁধতে বসে। ললিতার বয়স এখন পনেরো-ষোলো ; চেহারাটি ভারি স্নিগ্ধ। কৈশোরের উপকূলে দাঁড়িয়ে সে আসন্ন যৌবনের সোনার তরীর অপেক্ষা করছে।

চুলবাঁধার সময় ললিতা প্রশ্ন করে—'বৌমা, বাবু কবে ফিরে আসবে ?'

কুসুম বলে—'কলেজের ছুটি হলেই আসবে।'

'এবার তো একবারে ছুটি, পড়া শেষ, আর কলেজে ফিরে যেতে হবে না ?'

'না, আর ফিরে যেতে হবে না।'

ললিতা কুসুমকে বৌমা বলে বাড়ির অন্য সকলের দেখাদেখি। সোমনাথকে ছোটবাবু বলত, এখন শুধু বাবু বলে।

চার মাস পরে পরীক্ষা দিয়ে সোমনাথ বাড়ি ফিরে এল।

ডাক্তার পাণ্ডে তাকে তিন মাইল দূরের রেলস্টেশন থেকে আনতে গিয়েছিলেন। জমিদার বাড়িতে একজন স্থায়ী রুগীর অভাবে ডাক্তার পাণ্ডে এখন আর নিয়মিত আসেন না, তবে জরুরী ফাই-ফরমাস খাটার সময় তাঁর তলব পড়ে।

ঘোড়ার গাড়িতে চড়ে সোমনাথ উপস্থিত হল। একনাথ সদর ফটকের সামনে ছাতা মাথায় দিয়ে পরিজন বেষ্টিত হয়ে অপেক্ষা করছিলেন। সোমনাথ একলাফে গাড়ি থেকে নেমে একনাথকে প্রণাম করল, একনাথ তাকে বুকে জড়িয়ে নিলেন।

সোমনাথের দেহে স্বাস্থ্যভরা যৌবনের দীপ্তি, মুখে নির্ভীক আনন্দের হাসি। একনাথ তার মুখের পানে সগর্ব চোখে চেয়ে গলার মধ্যে একটা শব্দ করলেন—'হুঁ। পরীক্ষা কেমন হল ?'

সোমনাথ প্রফুল্ল স্বরে বলল—'ভাল হয়নি দাদু। তবে পাস করে যাব বোধহয়।'

একনাথ আবার গলার মধ্যে শব্দ করলেন—'খালি হকি আর ফুটবল খেলেছ। যাও, এখন মুখ-হাত ধুয়ে খাও গিয়ে, তোমার মা খাবার নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন।'

সোমনাথ একদৌড়ে বাড়ির দিকে চলে গেল। একনাথ ডাক্তারের দিকে ফিরে বললেন—'তুমিও এসো ডাক্তার। আজ এখানেই মধ্যাহ্ন-ভোজন করবে।'

কুসুম আর ললিতা দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়েছিল, সোমনাথ এসে মা'কে প্রণাম করল। তারপর ললিতার পানে চেয়ে কেমন যেন ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেল। চার মাস আগে সে যে-ললিতাকে দেখে গিয়েছিল, এ যেন সে-ললিতা নয়। তার বুকের স্পন্দন একটু দ্রুত হল, কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটে উঠল। কিন্তু সে চট্ করে নিজেকে সামলে নিয়ে কুসুমকে বলল—'মা, এ মেয়েটা কে ? একে তো আগে কখনো দেখিনি !'

কুসুম একটু হেসে ঘরের দিকে পা বাড়াল, বলল—'খাবার সাজিয়ে রেখেছি, খাবি আয়।'

ললিতা সোমনাথকে দেখে হঠাৎ জড়সড় হয়ে পড়েছিল, তার মুখে একটু ভীরু হাসি ফুটে উঠেছিল। কিন্তু সোমনাথের কথায় তার হাসিটুকুও শুকিয়ে গেল। সোমনাথ যে মনের উচ্ছ্বাস চাপা দেবার জন্যে ঠাট্টা-তামাশার আশ্রয় নিয়েছে তা সে বুঝতে পারল না। সে ভাবল সোমনাথ সত্যিই তাকে চিনতে পারেনি।

'বাবু ! তুমি আমায় চিনতে পারলে না ?'

'না। তোমার নাম কি ?'

ললিতার চোখ জলে ভরে উঠল, সে চোখে আঁচল দিয়ে দ্রুতপদে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে গেল।

'এই ললি—'ব্যগ্রভাবে সোমনাথ তার অনুসরণ করতে গেল, কিন্তু ঘর থেকে মায়ের ডাক এল—'সোমনাথ !'

সোমনাথ সিঁড়ি দিয়ে নামতে গিয়ে থেমে গেল, মায়ের আহ্বানে খাবার ঘরে গিয়ে ঢুকল।

বাগানে একটা গাছের তলায় পাথরের বেদী, ললিতা সেই বেদীর ওপর বসে উদাস চোখে অদূরে ফোয়ারার পানে চেয়ে আছে। অভিমানে তার বুক ফুলে ফুলে উঠছে। বাবু তাকে চিনতে পারল না। চার মাসে ভুলে গেল।

পিছন থেকে সোমনাথ নিঃশব্দে এসে তার চোখ টিপে ধরল। ললিতা প্রথমে চমকে

উঠল, তারপর চুপ করে বসে রইল। সাড়াশব্দ নেই।

সোমনাথ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে বলল—'আমি কে?'

ললিতা ভারী গলায় বলল—'জানি না।'

চোখ ছেড়ে দিয়ে সোমনাথ ললিতার পাশে বসল, বলল—'রাগ হয়েছে?'

ললিতা উত্তর দিল না, অন্যদিকে চেয়ে রইল। সোমনাথ তখন বলল—'সত্যিই কি আমি তোমাকে চিনতে পারিনি! তুমি এই ক'মাসে এতবড় হয়ে গেছ যে আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলাম।'

'তবে কেন আমায় ভয় দেখালে?' জল-ভরা চোখ সোমনাথের পানে ফিরিয়ে ললিতা তার কাঁধে মাথা রাখল। সোমনাথ তার কাঁধ জড়িয়ে নিয়ে স্খলিত স্বরে বলল—'আর ভয় দেখাব না।'

তাদের মন গঙ্গা-যমুনার মতন সঙ্গমের পানে ছুটে চলেছে। ছেলেবেলার সহজ সাহচর্যের প্রীতি অন্যরূপ ধারণ করেছে। স্থির সমুদ্র সহসা উত্তাল হয়ে উঠেছে।

দপ্তরখানার চৌকিতে বসে বিকেলবেলা একনাথ তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে তামাক খাচ্ছেন। সামনে ডাক্তার পাণ্ডে। পাণ্ডের সামনে রুপোর রেকাবিতে পান, তিনি মাঝে মাঝে পান তুলে মুখে দিচ্ছেন। অলসভাবে গাল-গল্প হচ্ছে। জল হাওয়া চাষবাসের অবস্থা এইসব নিয়ে আলোচনা।

গোবর্ধন আফিমের কৌটো আর জলের গেলাস নিয়ে এল। একনাথ আফিমের গুলি পাকিয়ে মুখে দিলেন, একঢোঁক জল খেলেন, তারপর আবার গড়গড়ার নল তুলে নিলেন। গোবর্ধন কৌটো গেলাস নিয়ে চলে গেল।

তারপর এলেন দেওয়ান। তাঁর হাতে কয়েকটা চিঠি। একনাথ প্রশ্ন করলেন—'জরুরী চিঠি কিছু আছে?'

দেওয়ান বললেন—'আজ্ঞে দু'খানি চিঠি জরুরী বলা চলে। ছোটবাবুর জন্যে পাত্রীর খবর আছে।'

একনাথ বললেন—'ও...কারা খবর দিয়েছে? কেমন লোক? ইদানীং যেসব সম্বন্ধ আসছে আমার তেমন পছন্দ নয়। বংশমর্যাদা না থাকলে তো মেয়ে আনা যায় না।—কারা চিঠি লিখেছে?'

দেওয়ান বললেন—'আজ্ঞে পড়ে শোনাচ্ছি।—এটি লিখেছেন তেজপুরের নরোত্তম সিংহ, পাত্রী তাঁর তৃতীয়া কন্যা—'

একনাথ চিন্তা-মন্থর স্বরে বললেন—'তেজুপরের নরোত্তম সিংহ...তাদের বরাবরই জানি, আমাদের সমান ঘর বলা যায়। কিন্তু জ্ঞাতিগোষ্ঠীর সঙ্গে মামলা-মোকদ্দমায় প্রায় সবই গেছে। (দেওয়ানকে) যতদূর মনে পড়ে ওদের একটা সম্পত্তি আমাদের কাছে বন্ধক আছে, তাই না? (দেওয়ান ঘাড় নাড়লেন) বড়ই দুঃখের কথা, কিন্তু এমন ভাঙন-ধরা ঘর থেকে সোমনাথের বৌ আনতে পারি না।'

দেওয়ান চিঠিখানি সরিয়ে রেখে অন্য চিঠি নিলেন—'এটি লিখেছেন রায় গোপীকিশোর, ও বি ই, কে সি আই ই।'

'ইনি কে? নাম তো কখনো শুনিনি।'

পাণ্ডে বললেন—'খুব বিখ্যাত লোক, দিল্লীর একজন বড় ব্যাংকার। অনেকগুলো কাপড়ের কলের মালিক, প্রচুর টাকা করেছেন।'

একনাথ বললেন—'তা না হয় হল। কিন্তু বংশ কেমন ? বংশের কথা কিছু আছে ?'

চিঠির ওপর চোখ বুলিয়ে দেওয়ান বলেন—'বংশের কথা কিছু দেখছি না। কেবল লিখেছেন মেয়েটি তাঁর একমাত্র সন্তান। জামাইকে চার লক্ষ টাকা যৌতুক দেবেন। মেয়েটি দেখতে খুব সুন্দরী, দরকার হলে ফটো পাঠাবেন।'

মুখে বিরক্তিসূচক শব্দ করে একনাথ বললেন—'যতসব ভুঁইফোঁড় বড়লোক। টাকা দেখাচ্ছে। বংশগৌরব নেই, বড়ঘরে মেয়ে দিয়ে জাতে উঠতে চায়। উঁহু বাদ দাও। —পাণ্ডে, দেখছ সমাজ কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে ? বনেদী ঘরের লোক যারা তাদের হাতে পয়সা নেই, আর যাদের পয়সা আছে তাদের বংশগৌরব নেই। বিদেশী রাজা রোজ নতুন আইন তৈরি করছে, সাবেক যা কিছু ভেঙে চুরমার হয়ে যাচ্ছে। এসব কি ভাল ?'

পাণ্ডে বললেন—'কিন্তু বাবুসাহেব, সময় বদলে যাচ্ছে, তার সঙ্গে পা ফেলে চলতে হবে তো। পরিবর্তন না হলে চলবে কেন ? ভেবে দেখুন, সেখালে মানুষ গরুর গাড়ি চলে দেশ থেকে দেশান্তরে যেত, এখন রেলগাড়ি চড়ে যায়। এটা কি মন্দ ?'

একনাথ বললেন—'না না, এসব তোমার বাজে যুক্তি। রেলগাড়ি চড়ুক তাতে কিছু আসে যায় না। কিন্তু সমাজের খুঁটি হল পরিবার—বংশ। সেই খুঁটি যদি উপড়ে ফেলে দাও তাহলে কী থাকবে ? সব লণ্ডভণ্ড হয়ে যাবে।' কিছুক্ষণ ভুরু কুঁচকে বসে থেকে বললেন—'আমার ছেলে একটা মস্ত ভুল করেছিল, তার ফল সে পেয়েছে। আমি এখন সেই ভুল শোধরাতে চাই। কালির দাগ মুছে ফেলতে হবে।'

পাণ্ডে বললেন—'কিন্তু শুধু বংশই নয়, মানুষের ব্যক্তিগত সত্তাও তো আছে। স্বতন্ত্র সাধ আহ্লাদ, স্বাধীনতা—সবই কি বংশের জন্যে বিসর্জন দিতে হবে ? সমাজ বলুন, বংশ বলুন, সবই তো মানুষের জন্যে—'

কড়া সুরে একনাথ বললেন—'না, বংশই হল সমাজের মূল, বংশ নিয়েই সমাজ দাঁড়িয়ে আছে।'

দুঃখিতভাবে মাথা নেড়ে পাণ্ডে বললেন—'বাবুসাহেব, আপনার এ ধারণা বর্তমান যুগে একেবারে অচল। পৃথিবী দ্রুত পাল্টে যাচ্ছে, এখন আর কেউ একা বিচ্ছিন্নভাবে থাকতে পারে না। সব মানুষ মিলিয়ে সমাজ, আমরা সবাই যেন এক পরিবারের মানুষ। নিজের বংশমর্যাদার অহংকারে কেউ যদি আলাদা থাকতে চায়, ক্ষতি তারই—'

একনাথ বললেন—'তোমার এসব যুক্তি আমি মানি না। সিংহ চিরদিন সিংহই থাকবে, কখনো শেয়ালের সঙ্গে কুটুম্বিতা করবে না। এই হল আমার কথা। যতদিন বেঁচে থাকব, আমার বাড়িতে এই রেওয়াজ চলবে, অন্য কারুর কথা খাটবে না।'

পাণ্ডে বিষণ্ণভাবে মুখ নীচু করে বসে রইলেন। একজন টেলিগ্রাফ পিওন এসে সেলাম করে দাঁড়াল। দেওয়ান প্রশ্ন করলেন—'তার আছে ?'

রসিদ সই করে দেওয়ান তার হাতে নিলেন, একনাথের পানে চাইলেন। একনাথ বললেন—'খুলে দেখ, ভাল খবর কি মন্দ খবর।'

পিওন বলল—'ভাল খবর হুজুর, বকশিস দিতে হবে।'

পাণ্ডে খাম ছিঁড়ে টেলিগ্রাম পড়লেন—'ভাল খবর। সোমনাথ এম-এ পাস করেছে, ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছে।'

একনাথের উৎকণ্ঠিত মুখ আনন্দে ভরে উঠল—'অ্যাঁ! পাস করেছে! আমি জানতাম পাস করবেই। দেওয়ান, যাও, পিওনকে পঁচিশ টাকা বকশিস দাও।'

পিওন বকশিসের বহর দেখে চোখ গোল করে দাঁড়িয়ে রইল। দেওয়ান পকেট থেকে

পঁচিশ টাকার নোট নিয়ে পিওনকে দিলেন। পিওন আভূমি সেলাম করে চলে গেল।

একনাথ টেলিগ্রামের দিকে হাত বাড়িয়ে বললেন—'দেখি, দাও।'

একনাথ ইংরেজি জানেন না, তবু পরম যত্নে টেলিগ্রামটি চোখের সামনে রেখে তার রসাস্বাদন করলেন। গদ্গদ স্বরে বললেন—'ছেলেটির বুদ্ধি আছে, কি বল?'

পাণ্ডে বললেন—'সে আর বলতে! কোন্ বংশের ছেলে! ওর বাপও তো এই বয়সে এম-এ পাস করেছিল।'

একনাথ একটু থমকে গিয়ে বললেন—'হ্যাঁ, তা বটে।—সোমনাথ কোথায়? যাই, আমি নিজে গিয়ে তাকে খবরটা শোনাই। তার সঙ্গে বাজি ছিল—' মুচকি হাসতে হাসতে একনাথ উঠে ঘরের বাইরে গেলেন।

পাণ্ডে একটা নিশ্বাস ফেলে গম্ভীর মুখে জানলার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন, বাইরে আকাশের দিকে চেয়ে রইলেন। দেওয়ান তাঁর কাছে এসে বললেন—'আকাশের পানে চেয়ে কী দেখছেন?'

ডাক্তার বললেন—'সিঁদুরে মেঘ।'

কুসুম নিজের ঘরের বিছানায় বসে কাপড়ের ওপর ফুল তুলছে, ললিতা তার পিছনে হাঁটু গেড়ে তার মাথা থেকে পাকা চুল তুলছে।

কুসুম বলল—'হয়েছে, অনেক তুলেছিস।'

ললিতা চুল তুলতে তুলতে বলল—'আর কয়েকটা হলেই শেষ, তোমার মাথা একেবারে কালো হয়ে যাবে।'

মুখ তুলে কুসুম হেসে বলল—'কালো মাথা আমার দরকার নেই। ছেলে বড় হল, দু'দিন পরেই নাতির মুখ দেখব।'

ললিতা একটু থতমত খেয়ে জড়িত স্বরে বলল—'তার এখনো অনেক দেরি আছে।'

কুসুম বলল—'সে যা হোক, আমার মাথা ছেড়ে তুই একবার বাইরে গিয়ে দ্যাখ্ সোমনাথ কোথায়, তাকে ডেকে নিয়ে আয়।'

ললিতা একটু উসখুস করে বলল—'ও এখন বাগানে পাখির ঘর তৈরি করছে। দিনরাত তাতেই লেগে আছে। পাখির ঘর ছাড়া অন্য ভাবনা নেই।'

কুসুম বলল—'যা ডেকে নিয়ে আয়। তাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করব।'

ললিতা উঠে দোরের দিকে যাচ্ছে, বাইরে থেকে একনাথের গলায় ডাক এল—'বৌমা! বৌমা!'

ললিতা এখনো একনাথকে ভয় করে, সে তাড়াতাড়ি দোরের পাশে লুকিয়ে পড়ল। কুসুম মাথায় আঁচল টেনে উঠে দাঁড়াল—'বাবা।'

টেলিগ্রামখানা নাড়তে নাড়তে একনাথ ঘরে ঢুকলেন—'খবর শুনেছ, ছোঁড়া পাস করেছে, ফার্স্ট ক্লাস—এইমাত্র তার এল। আমি ওর সঙ্গে বাজি রেখেছিলাম ও পাস করতে পারবে না যদিও মনে মনে জানতাম পাস করবেই। হ্যাঁ! হ্যাঁ!'

দোরের আড়াল থেকে খবর শুনে ললিতার মুখে আনন্দের বিদ্যুৎ খেলে গেল, সে একনাথের চোখ এড়িয়ে নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

একনাথ বললেন—'একটা কিছু করা দরকার—আমোদ-আহ্লাদ হৈ-চৈ খাওয়া-দাওয়া ধুমধাম। তুমি পুরুতঠাকুরকে এই হপ্তায় একটা ভাল দিন দেখতে বল, সেদিন বাড়িতে উৎসব হবে—বাঈনাচ, বাজী পোড়ানো, গাঁয়ের মাতব্বরেরা আসবে, খাওয়া-দাওয়া হবে,

বাড়ি জমজমাট হবে। কি বল ?'

কুসুম ক্ষীণ স্বরে বলল—'আপনার যা ইচ্ছে তাই হবে বাবা।'

একনাথ বললেন—'বেশ। কিন্তু সোমনাথ গেল কোথায় ? বাড়িতে কোথাও দেখছি না।'

কুসুম বলল—'শুনলুম বাগানে কোথায় নাকি পাখির ঘর বানাচ্ছে।—ডেকে পাঠাচ্ছি।'

'না না, আমি নিজেই যাচ্ছি। একেবারে চমকে দেব।—পাখির ঘর বানাচ্ছে। হুঁ হুঁঃ—নিজের ঘর বানাবার সময় হয়েছে কিনা—' গলার মধ্যে হাসি চেপে রেখে একনাথ চলে গেলেন।

বাগানের এককোণে ঝোপঝাড়ের মধ্যে সোমনাথ বাঁশের খুঁটোর ওপর তক্তা দিয়ে পাখির বাসা তৈরি করছে। অনেকটা পায়রার খোপের মতন। ছোট ছোট পাখিরা এসে তার মধ্যে বাসা বাঁধবে, ডিম পাড়বে, বাচ্চা ফোটাবে, এই তার লক্ষ্য।

ললিতা ছুটতে ছুটতে সেই দিকে আসছিল, কাছাকাছি এসে সে পা টিপে টিপে ঝোপের মধ্যে ঢুকল। সোমনাথ তখন ঠকাঠক হাতুড়ি পেরেক ঠুকছে, ললিতা পিছন থেকে তার চোখ টিপে ধরল।

'এই ললি, কী হচ্ছে !'

ললিতা তার কানে কানে বলল—'একটা ভারি সুখবর এনেছি, কী খাওয়াবে বল ?'

চোখ থেকে ললিতার হাত ছাড়িয়ে সোমনাথ ফিরে দাঁড়াল, কিছুক্ষণ ললিতার হাসিভরা মুখের পানে চেয়ে থেকে গম্ভীর মুখে বলল—'কী খাওয়াব ? এমন খাবার খাওয়াব যা খেতে খুব মিষ্টি কিন্তু পেট ভরে না।'

ললিতা অবাক হয়ে এক পা কাছে সরে এল, বলল—'সে আবার কী খাবার ?'

'কী খাবার জান না ?' সোমনাথ নিজের আঙুল ললিতার ঠোঁটে ঠেকিয়ে সেই আঙুল নিজের ঠোঁটে স্পর্শ করল, বলল—'এই খাবার।'

লজ্জায় লাল হয়ে ললিতা এক পা পিছিয়ে গেল। বলল—'যাও, তুমি ভারি দুষ্টু।'

সোমনাথ মুখ টিপে হাসল—'কই, কি সুখবর বলবে না ?'

ললিতা আবার এগিয়ে এল—'দাদুর কাছে তার এসেছে, তুমি পাস করেছ, ফার্স্ট ক্লাস।'

ওদিকে একনাথ টেলিগ্রামের হলদে রঙের কাগজখানা হাতে নিয়ে সোমনাথকে খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন, ঝোপের মধ্যে সোমনাথ ও ললিতাকে দেখতে পেয়ে হঠাৎ স্থানুবৎ দাঁড়িয়ে পড়লেন। ওরা তাঁকে দেখতে পায়নি, সোমনাথ ললিতার কাঁধে হাত রেখে খাটো গলায় কথা বলছে, ললিতার চোখ দুটি সোমনাথের মুখের দিকে উঠতে উঠতে আবার নত হয়ে পড়ছে। দু'জনের মুখেই ভঙ্গুর হাসি। তারপর সোমনাথ ললিতাকে আরো কাছে টেনে নিল, ললিতা তার বুকে মুখ লুকলো।

একনাথ দেখলেন, কিছুই বুঝতে বাকি রইল না। ক্রোধে তার মুখ রক্তবর্ণ হয়ে উঠল, তিনি ধৈর্য হারিয়ে ওদের দিকে পা বাড়ালেন। কিন্তু এক পা গিয়ে তিনি থমকে গেলেন, তারপর পিছু ফিরে বাড়ির দিকে চলতে আরম্ভ করলেন। টেলিগ্রামের কাগজটা অজ্ঞাতসারে তাঁর হাতে ধরা রইল।

সোমনাথ তখন ললিতার দুই কাঁধে হাত রেখে মুখের কাছে মুখ এনে সুর করে

বলছে—

উঠিতে কিশোরী বসিতে কিশোরী
কিশোরী গলার হারা
কিশোরী ভজন কিশো পূজন
কিশোরী নয়ন তারা।

নিজের ঘরে ফিরে গিয়ে একনাথ বিক্ষিপ্ত চিত্তে পায়চারি করতে লাগলেন। পঁচিশ বছর আগে যা ঘটেছিল, আবার কি তার পুনরাবৃত্তি আরম্ভ হল। লাঠিয়ালের মেয়েকে সোমনাথ— ! কি কুক্ষণে মেয়েটোকে বাড়িয়ে আশ্রয় দিয়েছিলেন।

হাতে টেলিগ্রামের কাগজটার ওপর নজর পড়ল। ইচ্ছে হল কাগজখানা ছিঁড়ে টুকরো করে ফেলেন। কিন্তু তা না করে পকেটে রাখলেন। তারপর একটা চেয়ারে বসে পড়লেন। দুরবগাহ্ দুশ্চিন্তায় তাঁর মন ডুবে গেল।

ঘরের মধ্যে সন্ধ্যের ছায়া নেমেছে এমন সময় গোবর্ধন এসে দোরের কাছে দাঁড়াল—'বাবু তামাক সেজে আনব ? আপনার আফিম খাবার সময় হয়েছে।'

সুপ্ত বাঘের ঘাড়ে পা দিলে যেমন হয়, একনাথ গর্জে উঠলেন—'হতভাগা উল্লুক ! কে তোকে ডেকেছে ?'

গোবর্ধন থতমত খেয়ে বলল—'আজ্ঞে— !'

'বেরিয়ে যা—দূর হয়ে যা !' একনাথ আরক্ত চোখে চেয়ার থেকে ওঠবার উপক্রম করলেন।

গোবর্ধন একনাথের এমন উগ্র মূর্তি অনেক দিন দেখেনি, সে ভড়কানো ঘোড়ার মতন ছুটে পালাল।

কুসুম ঠাকুরঘরের প্রদীপ জ্বেলে বাইরে এসে দেখল গোবর্ধন মুখ কালো করে দাঁড়িয়ে আছে। সে একটু আশ্চর্য হয়ে বলল—'কি হয়েছে গোবর্ধন ?'

গোবর্ধন বলল—'আর বৌদিদি, যা হবার তাই হয়েছে। এতদিন পরে কর্তাবাবু আবার রেগে গেছেন।'

কুসুম শঙ্কিত হয়ে বলল—'কি বলবে খুলে বল।'

গোবর্ধন খুলে বলল। শুনে কুসুমের মন নানারকম সন্দেহে ভরে উঠল। সে প্রশ্ন করল—'সোমনাথ কোথায় ?'

গোবর্ধন বলল—'তা তো জানি না বৌদিদি। দেখব ?'

'না, থাক—বাবার ঘরে আলো দিয়েছ ?'

'না বৌদি। তাঁর এখন আফিমও খাওয়া হয়নি। বাঘের মতন চেহারা দেখেই পালিয়ে এসেছি।'

'তোমাকে আর যেতে হবে না, আমি দেখছি।'

একনাথ অন্ধকার ঘরে বসেছিলেন, কুসুম কেরোসিনের টেবিল-ল্যাম্প নিয়ে ঘরে ঢুকল, টুলের ওপর ল্যাম্প রেখে বলল—'বাবা, আফিম দেব ?'

নিরাসক্ত সুরে একনাথ বললেন—'দাও।'

দেরাজ থেকে আফিমের কৌটো এনে কুসুম একনাথের হাতে দিল, কুঁজো থেকে জলের গেলাস ভরে পাশে এসে দাঁড়িয়ে রইল। একনাথ গুলি পাকিয়ে মুখে দিলেন, জল খেয়ে গেলাস ফিরিয়ে দিতে দিতে কতকটা যেন নিজ মনেই বললেন—'সব ভেঙে পড়ছে,

আবার সব ভেঙে পড়ছে—'

কুসুম চেয়ারের পাশে নতজানু হয়ে ব্যগ্র স্বরে বলল—'কিছু ভেঙে পড়বে না বাবা, সব ঠিক থাকবে। এ বাড়িতে কারুর সাহস নেই আপনার কথার ওপর কথা বলে। আপনি যা বলবেন তাই হবে।'

একনাথ মনে একটু সান্ত্বনা পেলেন, আস্তে আস্তে কুসুমের মাথার ওপর হাত রাখলেন।

সে রাত্রে কিন্তু আফিমের প্রভাব সত্ত্বেও তাঁর চোখে ঘুম এল না।

বাড়ির সামনের খোলা জায়গায় উৎসবের আয়োজন শুরু হয়েছে। প্রকাণ্ড একটা শামিয়ানা খাটানো হচ্ছে। চারিদিকে জন-মজুরের ভিড়। শহর থেকে বাঈজি আসবে, বাঈ-নাচ হবে, বাজীওয়ালা আসবে, বাজী পোড়ানো হবে। আশেপাশের গণ্যমান্য সকলের কাছে নিমন্ত্রণ-পত্র গিয়েছে। দেওয়ান নিজে দাঁড়িয়ে থেকে কাজ তদারক করছেন।

বাগানের এক পাশে গোলাপের কেয়ারি। সোমনাথ সেই দিক দিয়ে যেতে যেতে একটি রাঙা গোলাপ ফুল তুলে নিয়ে তার আঘ্রাণ নিল, তারপর সেটা হাতে নিয়ে ঘোরাতে ঘোরাতে পাখির খাঁচার দিকে চলল।

খুঁটোর ওপর জাল দিয়ে ঢাকা খাঁচার মধ্যে একঝাঁক মুনিয়া পাখি খেলা করছে, ললিতা খাঁচার সামনে দাঁড়িয়ে মুগ্ধ চোখে তাদের দেখছে। সোমনাথ তার পাশে গিয়ে দাঁড়াল।

ললিতা বিগলিত আনন্দে বলল—'কি সুন্দর পাখি !'

সোমনাথ গোলাপ ফুলটি তার চোখের সামনে ধরল—'আর এটা ? সুন্দর নয় ?'

ললিতা ফুল দেখে বলল—'খুব সুন্দর। কিন্তু এ তো দাদুর বাগানের ফুল ! কারুর হাত দেবার হুকুম নেই।'

'জানি। আমি চুরি করেছি। এখন তুমি চোরাই মাল রাখো, আমি দাদুর কাছে চললাম।'

ললিতা চোখ বিস্ফারিত করে বলল—'দাদুর কাছে ! কেন ?'

সোমনাথ বলল—'দাদুকে বলতে যাচ্ছি তুমি তাঁর গোলাপ ফুল চুরি করেছ।'

'অ্যাঁ—না, সত্যি বল না কেন দাদুর কাছে যাচ্ছ ?'

সোমনাথ গম্ভীর হবার চেষ্টা করে বলল—'জরুরী কাজ আছে। জরু-রী কাজ।'

হঠাৎ হেসে উঠে ললিতার থুতনি নেড়ে দিয়ে সে চলে গেল।

কুসুম দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে জলসা-মণ্ডপের নির্মাণ কার্য দেখছিল, ওদিকে একনাথ নিজের ঘরে কপালে হাত দিয়ে বসে দুশ্চিন্তার জালে জড়িয়ে পড়েছিলেন। বাইরে উৎসবের আনন্দ-তৎপরতা, কিন্তু ঘরের কোণে দুর্ভাবনার উপচ্ছায়া।

কুসুম বারান্দা থেকে দেখল সোমনাথ বাগান পেরিয়ে বাড়ির দিকে আসছে। তার পদক্ষেপ এবং গতিভঙ্গিতে দৃঢ়তার ব্যঞ্জনা, যেন সে একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজে যাচ্ছে। কুসুমের মন কৌতূহলী ও উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠল।

সোমনাথ দোতলায় উঠে এসে একনাথের দোরে টোকা দিল—'দাদু, আসব ?'

ঘরের মধ্যে একনাথ চমকে উঠলেন। তাঁর মনে হল তিনি আজ এক প্রচণ্ড সঙ্কটের সম্মুখীন হয়েছেন। একটু দম নিয়ে তিনি সহজ স্বরে ডাকলেন—'আয়—ভেতরে আয়।'

সোমনাথ পর্দা সরিয়ে ঘরে প্রবেশ করল। কুসুম বারান্দা থেকে দেখছিল, আস্তে আস্তে গিয়ে দরজার পাশে দাঁড়াল। তার মনে অনেক রকম অস্পষ্ট উৎকণ্ঠার যাতায়াত শুরু হয়েছিল।

ঘরের মধ্যে সোমনাথ একনাথের চেয়ারের পাশে হাঁটু গেড়ে বসেছিল। একনাথ আতঙ্ক ভরা চোখে তার পানে চাইলেন। সোমনাথ বলল—'দাদু, আপনি বলেছিলেন পাস করলে আমাকে প্রাইজ দেবেন—'

একনাথ ভয়ার্ত চোখে চাইলেন। পঁচিশ বছর আগের একটা দিনের কথা মনে পড়ে গেল। লোকনাথ—সে-ও প্রাইজ চেয়েছিল।

একনাথ অস্ফুট গলায় বললেন—'প্রাইজ—অ্যাঁ—অ্যাঁ—বলেছিলাম বটে—তা তাড়া কিসের—'

সোমনাথ বলল—'তাড়া নেই। কিন্তু আমি যে-প্রাইজ চাইব আপনি দেবেন তো ?'

একনাথ এবার ভেঙে পড়লেন। তাঁর অসহিষ্ণু উগ্র স্বভাবে কোথায় ঘুণ ধরেছিল, হঠাৎ মড় মড় করে ধূলিসাৎ হল। তিনি সোমনাথের একটা হাত চেপে ধরে ব্যাকুল স্বরে বলে উঠলেন—'ওরে, আমি জানি তুই কি চাইবি। কিন্তু তার আগে আমার কথাটা শোন। আমি বুঝতে পেরেছি তুই ললিতাকে চাস। কিন্তু এই বুড়োটার একটা কথা মন দিয়ে শোন। আমি তোর দাদু, তুই আমার নাতি—'

প্রবল আবেগে তাঁর কণ্ঠরোধ হয়ে গেল। সোমনাথ বিস্ময়ভরে চক্ষু বিস্ফারিত করে চাইল। এত বিচলিত এমন অভিভূত অবস্থায় তাঁকে সে আগে কখনো দেখেনি। উপরন্তু সে কী চায় তা তিনি বুঝতে পেরেছেন। কেমন করে বুঝলেন ?

দোরের বাইরে মাথা নীচু করে কুসুম সব শুনছে।

সোমনাথ কোন কিছু বলার আগেই একনাথ আবার বলে উঠলেন –'ললিতা আমার লাঠিয়ালের মেয়ে একথা তুই জানিস ?'

সোমনাথ অবাক হয়ে চাইল –'কেন জানব না। একথা তো সবাই জানে, আমিও গোড়া থেকে জানি। কিন্তু—'

একনাথ বাধা দিয়ে বললেন—'থাম—আগে আমাকে বলতে দে।—তুই আমার একমাত্র নাতি, আমি তোকে প্রাণের চেয়েও বেশি ভালবাসি। তোর বাবাকেও ভালবাসতাম। সে ছিল আমার একমাত্র বংশধর, উত্তরাধিকারী। কিন্তু আমার কাছে নিজের ভালবাসার চেয়ে বংশের মর্যাদা ঢের বেশি বড়। এরই জন্যে আমি ছেলেকে ত্যাজ্যপুত্র করেছিলাম।' তাঁর গাল বেয়ে জল পড়তে লাগল—'মা চণ্ডী জানে, কী নরক-যন্ত্রণা আমি ভোগ করেছি। কিন্তু যা করেছি বংশের জন্যে করেছি, বাপ-পিতামহের মর্যাদা রক্ষার জন্যে করেছি। তাঁরা তোরও পূর্বপুরুষ, তোর জন্যে তাঁরা এই অগাধ ঐশ্বর্য সঞ্চয় করে রেখে গেছেন। তাঁদের প্রতি কি তোর কোন কর্তব্যই নেই ?'

'কিন্তু দাদু—'

'আমার কথাগুলো শেষ পর্যন্ত শোন। তোর সঙ্গে আমি তর্ক করতে চাই না। জানি তোরা এ যুগের ছেলে, তোদের রীতি-নীতি সবই আলাদা। তাকিয়ে দেখ, আমার চুল সব সাদা হয়ে গেছে, আমার এ মাথাটি ধুলোয় লুটিয়ে দিস না।' হঠাৎ সোমনাথের হাত চেপে ধরে তিনি বললেন— 'আমাকে আগে মরতে দে। ক'দিনই বা বাঁচব। তারপর তুই হবি এই সংসারের কর্তা। তখন তোর যা মন চায় করিস, কেউ তোকে বাধা দিতে আসবে না।'

শুনতে শুনতে সোমনাথের চোখের পাতা ভিজে উঠেছে। কিন্তু সে মুখ ফুটে কিছু বলতে পারছে না। একনাথ তার মুখের পানে ব্যাকুল চক্ষে চেয়ে বলে উঠলেন—'দাদু, তুই ছাড়া আমার সংসারে আর কেউ নেই, তুই আমার একটা কথা রাখবি না ?'

এবার সোমনাথ তার কণ্ঠস্বর ফিরে পেল, উঠে দাঁড়িয়ে কম্পিত অধরে বলল—'দাদু, আপনি যাতে কষ্ট পান সে-কাজ আমি কখনো করব না।'

একনাথ থর থর করে কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়ালেন, নাতিকে বুকে জাপটে নিয়ে স্খলিত স্বরে বললেন—'বেঁচে থাক—বেঁচে থাক—'

বাইরে দাঁড়িয়ে কুসুম সব শুনল, তারপর ঠোঁট কামড়ে চোখ মুছতে মুছতে চলে গেল।

নিজের ঘরে গিয়ে কুসুম দেখল ললিতা দাঁড়িয়ে আছে, তার হাতে একটি গোলাপ ফুল। ললিতা বলল—'বৌমা, আমার খোঁপায় ফুল পরিয়ে দাও না।'

কুসুম তাকে জড়িয়ে ধরে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল—'ওরে, কেন তোরা বড় হয়ে উঠলি, ছোট হয়েই থাকলি না কেন ?'

শামিয়ানার মধ্যে নাচ-গানের আসর বসেছে। চারিদিকে আলো ঝলমল করছে। বাগানেও অসংখ্য গ্যাসলাইটের দীপদণ্ড। সভায় অনেক গণ্যমান্য অতিথির সমাগম হয়েছে, চিকের আড়ালে মহিলাদের স্থান। একনাথ সভায় বসে রুপোর গড়গড়ায় তামাক খাচ্ছেন। মধুকণ্ঠী বাঈজি লহর তুলে গান গাইছে, সঙ্গে সারেঙ্গীর সঙ্গত। বাঈজির পায়ে ঘুঙুর, সে গাইতে গাইতে ঘুরে বাহু বিলোলিত করে নাচছে। সকলের চক্ষুকর্ণ বাঈজির ওপর বিন্যস্ত।

একনাথ অলসভাবে সভার চারিদিকে চোখ ফরালেন। দেখলেন সোমনাথ সভার এক কোণে বসেছিল, কখন অলক্ষিতে উঠে গেছে। একনাথের কপালে একটু ভ্রূকুটি দেখা দিল, তিনিও আস্তে আস্তে উঠে সভার বাইরে গেলেন। সবাই বাঈজির সঙ্গীতসুধা পানে মোহাচ্ছন্ন, কেউ লক্ষ্য করল না।

বাগানের কোণে পাখির ঘরের ঝোপের মধ্যে দাঁড়িয়ে ললিতা আর সোমনাথের কথা হচ্ছিল। দূর থেকে গ্যাসলাইটের ঝিলমিল আলো তাদের মুখের ওপর খেলা করছে। সোমনাথ ললিতার কাঁধে হাত রেখে ব্যগ্রস্বরে বলছিল—'এই উৎসব—নাচ গান—এসব আমার কাছে অর্থহীন—আমি তোমাকে চাই—ললি, আমি তোমাকে চাই। কিন্তু দাদু—'

একনাথ ঝোপের বাইরে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে শুনলেন। ললিতা বলছে—'দাদু আমাকে চান না।'

সোমনাথ বলল—'ললি, তুমি দাদুকে ভুল বুঝো না। তিনি সাবেক কালের মানুষ, তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী আমাদের মতন নয়। কিন্তু তিনি জীবনে অনেক দুঃখ পেয়েছেন, আমি তাঁকে আর দুঃখ দিতে পারব না। দাদুর সঙ্গে আমার কথা হয়েছে, তিনি যতদিন বেঁচে আছেন আমি তোমাকে বিয়ে করব না।'

কিছুক্ষণ কোন কথা নেই, দূর থেকে বাঈজির গানের কলি ভেসে আসছে। একনাথ উৎকর্ণ হয়ে আছেন।

শেষে সোমনাথ বলল—'তুমি জানো, দাদু আমাকে কত ভালবাসেন। আমি যদি তাঁর কথা না শুনি, তিনি হয়তো মারা যাবেন...সে আমি পারব না। আর ক'দিনই বা তিনি বাঁচবেন। ললি, তুমি আমার কথা বুঝতে পারছ ?'

কান্নাভরা গলায় ললিতা বলল—'পারছি।'

'আমরা দু'জনে এক বাড়িতেই থাকব, কিন্তু দূরে দূরে থাকব। আমাদের ভালবাসা তো কেউ কেড়ে নিতে পারবে না।'

'না।'

রাত্রির উৎসব শেষ হয়েছে, আলো নিভে গেছে, যারা উৎসবে যোগ দিয়েছিল, সকলে চলে গেছে। উৎসব-মণ্ডপ অন্ধকারে আবৃত হয়ে শূন্য পড়ে আছে।

বাড়িও সুষুপ্ত অন্ধকার। কেবল একনাথ জেগে আছেন। তাঁর চোখে নিদ্রা নেই। তিনি নিজের ঘরে একাকী পায়চারি করছেন। পায়চারি করতে করতে কখনো তিনি পালঙ্কের পাশে বসছেন, কখনো চেয়ারে বসছেন। তাঁর মন যেন ঝড়ের সমুদ্রে ওঠা-পড়া করছে।

সকাল হল, রোদ উঠল। একনাথ স্নান ও প্রাতঃকৃত্য সমাপন করে চেয়ারে এসে বসলেন। বেশ প্রশান্ত মূর্তি, বাইরে থেকে কিছু বোঝা যায় না। গোবর্ধন আফিমের কৌটো ও জলের গেলাস নিয়ে অপেক্ষা করছিল, চেয়ারের পাশে টিপাইয়ের ওপর জলের গেলাস রাখল। একনাথ আফিমের কৌটো খুলে গুলি পাকাতে পাকাতে বললেন—'গোবর্ধন, তুই যা, ডাক্তার পাণ্ডেকে একবার ডেকে নিয়ে আয়।'

গোবর্ধন উদ্বিগ্ন চোখে একবার তাঁর পানে তাকাল, কিন্তু কোন প্রশ্ন করতে সাহস করল না, 'আজ্ঞে' বলে চলে গেল।

আধঘণ্টা পরে ব্যাগ হাতে ডাক্তার এলেন। হাসিমুখে বললেন—'কাল রাত্রে মজলিশ খুব জমেছিল। আপনি তো ন'টা বাজতে না বাজতেই উঠে গেলেন।—কি ব্যাপার বলুন তো, ঠাণ্ডা লেগে গেছে নাকি?'

একনাথ বললেন—'না, ঠাণ্ডা লাগেনি। বোস, বলছি।

ডাক্তার বসলেন। একনাথ খানিক চুপ করে থেকে বললেন—'ডাক্তার, আমার শরীরটা একবার ভাল করে পরীক্ষা কর দেখি। আমি জানতে চাই আর কতদিন বাঁচব।'

ডাক্তার হেসে বললেন—'এখনো অনেকদিন বাঁচবেন। গত কয়েক বছর আপনার তো সর্দি-কাশি পর্যন্ত হয়নি। আপনারা দীর্ঘায়ুর বংশ, এরই মধ্যে মৃত্যুচিন্তা কেন?'

একনাথ বললেন—'দীর্ঘায়ুর বংশ হলেও সবাই তো সমান বাঁচে না। আমার ঠাকুর্দা তিরানব্বুই বছর বেঁচে ছিলেন, বাবা উনআশিতেই গিয়েছিলেন, আর লোকনাথ—। কিন্তু যাক। তুমি একবার পরীক্ষা কর।'

'একবার কেন, দশবার করব। কিন্তু আমি আপনার ধাত জানি, আশঙ্কার কোন কারণ নেই।'

'আশঙ্কার—কারণ—নেই। হুঁ।' একনাথ একবার ডাক্তারের মুখের পানে চাইলেন। ডাক্তার কি করে বুঝবে তাঁর মনের গোপন কথা!'

তারপর ডাক্তার প্রায় আধঘণ্টা ধরে পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে পরীক্ষা করলেন একনাথের শরীর। বুক পেট হৃদযন্ত্র ফুসফুস রক্তচাপ সব দেখলেন। লোহার ভাঁটার মতন নিরেট শরীর, কোথাও দুর্বলতার চিহ্ন নেই।

লম্বা দীর্ঘশ্বাস ফেলে পাণ্ডে বললেন—'আপনার বয়স কত জানি, তিয়াত্তর বছর। কিন্তু শরীরটা পঞ্চাশ বছরেই আটকে গেছে, আর বাড়েনি।'

একনাথ বিরক্ত স্বরে বললেন—'হেঁয়ালি কোরো না, স্পষ্ট করে বলো আর কতদিন

বাঁচব।'

ডাক্তারের মুখে কৌতুকের হাসি ফুটে উঠল—'যদি আত্মহত্যা না করেন, এখনো পনেরো-কুড়ি বছর বাঁচবেন।'

'পনেরো-কুড়ি বছর!' বলতে বলতে একনাথের নিশ্বাস ফুরিয়ে গেল, তিনি যেন বিভীষিকা দেখছেন এমন ভাবে চেয়ে রইলেন—'আরো পনেরো-কুড়ি বছর বেঁচে থাকব!'

ডাক্তার ব্যাগের মধ্যে যন্ত্রপাতি ভরতে ভরতে বললেন—'তাতে কোন সন্দেহ নেই। আমি পাড়াগাঁয়ে প্র্যাকটিস করি বটে, কিন্তু একেবারে হেতুড়ে নই। আমার কথা বিশ্বাস না করেন, শহর থেকে বড় ডাক্তার আনিয়ে পরীক্ষা করাতে পারেন—আচ্ছা চলি এখন. অনেকগুলো রুগীকে ডাক্তারখানায় বসিয়ে রেখে এসেছি।' তিনি ব্যাগ নিয়ে প্রস্থান করলেন।

কিছুক্ষণ একনাথ অসাড় বসে রইলেন, তারপর উঠে পায়চারি করতে আরম্ভ করলেন। তাঁর মাথার মধ্যে চিন্তার বিষক্রিয়া চলতে লাগল—পনেরো-কুড়ি বছর...তখন দাদুর বয়স হবে চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ...না না, এ হতে পারে না...কিন্তু—বংশের অমর্যাদা আমি নিজের চোখে দেখব? না না, এ হতে পারে না...'

সন্ধের সময় একনাথ সোমনাথের দোরে টোকা দিলেন—'দাদু. ঘরে আছিস?'

সোমনাথ ঘরে একলা বসে ধূসর ভবিষ্যতের কথা ভাবছিল, তাড়াতাড়ি এসে দোর খুলল—'এই যে দাদু।'

সোমনাথ বেরিয়ে এল। একনাথ তার কাঁধে হাত রেখে বললেন—'চল আমার ঘরে, এক দান দাবায় বসা যাক। সেদিন তুই আমায় মাৎ করেছিলি, আজ আমি তোকে মাৎ করব। এমন মাৎ করব যে চিরদিন মনে থাকবে।'

সোমনাথ মুখে হাসি এনে বলল—'বেশ তো দাদু, বেশ তো। দেখা যাক কে কাকে মাৎ করে।'

একনাথের ঘরে গিয়ে সোমনাথ দেখল বিস্তীর্ণ পালঙ্কের মাঝখানে দাবার বোর্ড পেতে ঘুঁটি বসানো হয়েছে। তখনো দিনের আলো অটুট ছিল। একনাথ পালঙ্কের শিয়রের দিকে বসে হাঁক দিলেন—'গোবর্ধন!'

গোবর্ধন এসে দাঁড়াল—'আজ্ঞে?'

'আলো দে। আর আমার আফিম রেখে যা।'

'আজ্ঞে।' গোবর্ধন চলে গেল।

সোমনাথ খাটের উপর বসল। আধা-অন্ধকারে খেলা আরম্ভ হল। তারপর গোবর্ধন আলো এনে টিপাইয়ের মাথায় রাখল, দেরাজ থেকে আফিমের কৌটো নিল, গেলাসে জল ঢেলে একনাথের হাতের কাছে রেখে চলে যাচ্ছিল, একনাথ বললেন—'ভাল কথা, গোবর্ধন, দাদুর পাস করার জন্যে তোকে বকশিস করা হয়নি।—এই নে।' ফতুয়ার পকেট থেকে একতাড়া একশো টাকার নোট নিয়ে তিনি গোবর্ধনের হাতে দিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে খেলায় মগ্ন হয়ে গেলেন।

গোবর্ধন নোটের তাড়া দেখে ঘাবড়ে গেল, বিহ্বল ভাবে একবার নোটের পানে একবার একনাথের পানে তাকিয়ে উদ্বিগ্ন স্বরে বলল—'বাবু, এ যে অনেক টাকা—!'

একনাথ দাবার ছক থেকে চোখ তুললেন না, হাত নেড়ে তাকে বিদেয় করলেন। সোমনাথের মন খেলায় নিবিষ্ট, সে কিছু লক্ষ করল না।

কিছুক্ষণ নীরবে খেলা চলল। কয়েক চাল পরে একনাথ নিজের ঘোড়াকে আড়াই ঘর

এগিয়ে সোমনাথের রাজার সামনে বসালেন, বললেন—'কিস্তি।'

কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে সোমনাথ গলার মধ্যে শব্দ করল—'হুম।' একনাথ হাসি হাসি গলায় বললেন—'কেমন বেড়াজালে পড়েছিস ! চাল খুঁজে পাচ্ছিস না।'

সোমনাথ উত্তর দিল না, বোর্ডের ওপর ঝুঁকে একমনে চাল ভাবতে লাগল। একনাথ তীক্ষ্ণচোখে তার পানে চাইলেন, তারপর আফিমের কৌটো তুলে নিয়ে কৌটো খুলে সমস্ত আফিম মুখে দিলেন। কৌটোয় প্রায় দেড় ভরি আফিম ছিল। একঢোঁক জলের সাহায্যে আফিম গলাধঃকরণ করে একনাথ বিজয়ীর চোখে নাতির পানে চাইলেন, বললেন—'তোরা আজকালকার ছেলেরা খুবই চালাক-চতুর, কিন্তু আমরা বুড়োরাও বড় কম যাই না, এখনো তোদের হারাতে পারি। —ভাল কথা, ডাক্তার আজ একটা ভারি দামী কথা বলেছিল। বলেছিল, যদি আত্মহত্যা না করি, পনের-কুড়ি বছর বাঁচব—হাঃ হাঃ হাঃ ! এই আংটিটা রাখ, ডাক্তার পাণ্ডেকে দিবি।' নিজের আঙুল থেকে হীরের আংটি খুলে তিনি সোমনাথের দিকে এগিয়ে ধরলেন—'এই নে।'

সোমনাথের তখন 'কাদের সাপ' অবস্থা। সে অন্যমনস্কভাবে আংটি নিয়ে বলল—'আংটি—কি হবে ?'

একনাথ বললেন—'ডাক্তার পাণ্ডেকে দিবি—আমার উপহার।'

'ও—আচ্ছা—' আংটি পকেটে রেখে সোমনাথ আবার বোর্ডের ওপর ঝুঁকে পড়ল।

আরো কিছুক্ষণ খেলা চলার পর, একনাথ পিছনে তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে বসে চোখ বুজলেন। তাঁর ঘুম আসছে, ঘুমের জোয়ারে তাঁর চেতনা যেন ডুবে যাচ্ছে। সম্মুখে শান্তি পারাবার—

'দাদু, এবার আপনার চাল।'

একনাথ চোখ টেনে টেনে চাইলেন, তারপর উঠে বসে ছকের ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন। কিছুক্ষণ কাটবার পর তিনি গলার মধ্যে হাসির মতন একটা শব্দ করলেন, কম্পিত হাতে নিজের মন্ত্রী কোণাচে ভাবে দু'ঘর এগিয়ে দিয়ে বললেন—'কিস্তি—মাৎ। দাদু, তুই হেরে গেলি।'

একনাথ পিছনের তাকিয়ার ওপর আবার এলিয়ে পড়লেন, আফিমের শূন্য কৌটো হাত থেকে স্খলিত হয়ে বিছানায় পড়ল।

সোমনাথ বোর্ড থেকে চোখ তুলে লজ্জিত ভাবে একনাথের পানে চাইল, সঙ্গে সঙ্গে তার চোখে উদ্বেগের ছায়া পড়ল। একনাথের এলিয়ে পড়ার ভঙ্গিটা স্বাভাবিক নয়।

সোমনাথ বলে উঠল—'দাদু। কী হয়েছে ?'

একনাথ সাড়া দিলেন না। সোমনাথ তখন উঠে গিয়ে তাঁর গায়ে নাড়া দিয়ে ডাকল—'দাদু ! দাদু !'

এবারও একনাথের কাছ থেকে সাড়া এল না। সোমনাথ স্তম্ভিত ভাবে খানিক দাঁড়িয়ে রইল, তারপর তার চোখ পড়ল আফিমের কৌটোর ওপর। সে সেটা তুলে নিয়ে দেখল, কৌটো শূন্য। সে হঠাৎ ভেঙে পড়ে বলল—'এ আপনি কী করলেন দাদু !' তারপর চিৎকার করে উঠল—'গোবর-দা, গোবর-দা, শিগগির এস।'

গোবর্ধন ছুটে এল। সোমনাথ তাকে ডেকে বলল—'যাও শিগগির ডাক্তারবাবুকে ডেকে আনো। জলদি—জলদি ! দাদু অসুস্থ হয়ে পড়েছেন !'

গোবর্ধন একবার একনাথের পানে চাইল, তারপর ছুটে বেরিয়ে গেল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে উৎকণ্ঠিত ভাবে কুসুম ঘরে ঢুকল, তার পিছনে ললিতা।

কুসুম উৎকণ্ঠা ভরা গলায় বলল—'কী হয়েছে—কী হয়েছে সোমনাথ ?'

সোমনাথ প্রায় কেঁদে উঠল—'মা,. সর্বনাশ হয়েছে—দাদু—এই দ্যাখো।' সে আফিমের শূন্য কৌটো খুলে দেখাল। কুসুম তাই দেখে হু হু শব্দে কেঁদে উঠল, কাঁদতে কাঁদতে বলল—'অ্যাঁ ! এ কি হল ! মা চণ্ডী, তুমি এ কি করলে— !'

ললিতা তাকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরল।

আধঘণ্টা কেটে গেছে। ঘরে কয়েকটা বড় বড় ল্যাম্প জ্বালা হয়েছে। একনাথের দেহ খাটের ওপর লম্বা ভাবে শোয়ানো হয়েছে। গোবর্ধন তাঁর পায়ের ওপর মুখ গুঁজে ফুলে ফুলে কাঁদছে। ডাক্তার পাণ্ডে খাটের শিয়রে দাঁড়িয়ে একনাথের পানে চেয়ে আছেন, তাঁর মুখে কঠিন গাম্ভীর্য। পাশে কুসুম আর ললিতা পরস্পরকে যেন আগলে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। খাটের পায়ের কাছে সোমনাথ, তার চোখে মাঝে মাঝে জল উথলে উঠছে। সে কাপড়ের খুঁটে চোখ মুচছে। ঘরে এই পাঁচজন ছাড়া আর কেউ নেই।

অবশেষে সোমনাথ ভাঙা ভাঙা গলায় বলল—'আমরা যাতে সুখী হই তাই তুমি এভাবে চলে গেলে। দাদু, হেরে গিয়েও তুমি মাথা নীচু করলে না। তুমিই সত্যিকার অভিজাতক। ভগবান তোমায় শান্তি দিন।'

রোডল

সিদ্ধার্থ ঘোষ

রিংকু আজ সাত বছরে পড়ল। এবারে তার জন্মদিনে বাবার উপহার রোডল। দু' বছর ধরে সে বায়না করছে রোডল কিনে দেওয়ার জন্যে। তার বন্ধু সোনি তো তিন বছর বয়স থেকেই রোডল নিয়ে খেলা করছে। দুটো রোডল ভেঙেও ফেলেছে ইতিমধ্যে। এখন তিন নম্বর রোডল তার সঙ্গী। রিংকুর বয়সী আর কেউ এই সুপাররাইজ বিল্ডিঙে নেই যার এখনো রোডল জোটেনি।

শুধু রিংকু কেন, তার মা-ও যত অবাক তত খুশি। তাই বোধহয় মা-মেয়ে কেউ খেয়ালই করেনি যে রোডলের বাঁ চোখটা পাথরের মতো নীল। পলক পড়ছে না।

বাবা প্যাকিং কেস্ খুলে রোডলকে বার করেছেন। হাত পাগুলো জুড়ে তাকে দাঁড় করিয়ে পেটের মধ্যে ব্যাটারি ভরে সুইচ টিপতেই তার কান দুটো নীল হয়ে উঠেছে।

রিংকু হাততালি দিয়ে মা-কে জড়িয়ে এক পাক ঘুরে নিল, "এবার হাঁটবে, এবার হাঁটবে!"

কিন্তু বাবা আবার রোডলের পেট থেকে ব্যাটারি বার করে নিয়েছেন। রিংকুর দিকে তাকিয়ে বাবা বললেন, "রোডলের কান নীল হয়ে গেলে ওকে আর তখন কোনো হুকুম করবে না। তখন হুকুম করলে ও একেবারে বিগড়ে যেতে পারে।"

"কিন্তু আমি তো ওকে কিছুই বলিনি, তা হলে কান নীল হয়ে গেল কেন?"

"তুমি বলনি, কিন্তু আমি ওকে আজ অনেকটা হাঁটিয়েছি।"

"হাঁটিয়েছ! তা হলে আমায় নিয়ে গেলে না কেন? আমিও দেখতে পেতাম।"

"ভেবেছিলাম, দু'জনে মিলে হাতে হাত ধরে হাঁটতে হাঁটতেই ঘরে ঢুকে পড়ব। তোমাকে চমকে দেবো। একটু দাঁড়াও, ব্যাটারিটা চার্জ ক'রে দিলেই রোডল আবার চলাফেরা শুরু করবে।"

মাত্র আধ ঘণ্টা হেঁটেই রোডলটা যেভাবে খোঁড়াতে আরম্ভ করেছিল রিংকুর বাবা তাতে ভয় পেয়ে যান। তাই তাড়াতাড়ি সুইচ অফ্ ক'রে আবার প্যাকিং বাক্সে ভরে ট্যাক্সি চড়ে বাড়ি ফিরতে হয়েছে তাঁকে।

আরও কিছুক্ষণ চার্জে রাখলে ভাল হতো জেনেও রিংকুর তাগাদায় রোডলকে চালু করে দিতে হল।

রোডলের কি নাম হবে রিংকু তা আগে থেকেই ঠিক ক'রে রেখেছিল। প্রথমেই সে রোডলকে শিখিয়ে দিল, 'টুটু' বলে ডাকলেই সে যেন সাড়া দেয়। রিংকু এখন রোডলের হাত ধরে দাঁড়িয়ে আছে। যতক্ষণ না সে 'থ্যাংক ইউ রিংকু' বলছে, হাতটা ধরেই থাকতে

হবে। এর পর থেকে রিংকু তাকে ছুঁলেই সে জেগে উঠবে। শুধু রিংকু ছুঁলে—আর কেউ তাকে জাগাতে পারবে না। আর কারুর কথা শুনবে না, কারুর আদেশ মানবে না। শুধু রিংকুর গলা আর তার স্পর্শ।

বিকেল বেলায় রিংকুর বন্ধুরা এল। কেক কাটা হয়ে গেছে। রিংকু টেবিলে সাতটা মোমবাতি জ্বেলে বলল, "টুটু ! টুটু ! আজ আমার জন্মদিন। যাও ! মোমবাতি নেভাবে না ?"

রোডল বলল, "কেক কই ?"

রিংকু হেসে গড়িয়ে পড়ে, "টুটুকে ঠকানো বেশ শক্ত দেখছি !"

রিংকু গম্ভীর গলায় বলল, "মোমবাতি নিভিয়ে দিতে বলছি না !"

টুটু গুটিগুটি পায়ে টেবিলের কাছে এল তারপর চেয়ার টেনে তার উপর উঠল। মুখ নিচু করেও আবার সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করল, "তোমার বয়স কত ?"

রিংকুর বাবা যেন নিশ্চিন্ত হয়ে শ্বাস ফেললেন। মা জিগ্যেস করলেন, "কী হল ?"

"না, কিছু না। রোডল যদি ওই প্রশ্নটা না করেই ফুঁ দিত তা হলে বুঝতাম পুরো ঠকিয়ে দিয়েছে।"

"চুপ করো ! রিংকুর সামনে এসব কথা কখ্‌খনো বলবে না।"

মোমবাতি পর্ব শেষ, রিংকু তবু টুটুর উপর নানা শাসন আর হুকুম চালিয়ে যাচ্ছে।

বন্ধুরা চলে যাবার পরে বাবা বললেন, "রিংকু তুমি তো জানো, রোডলরা শুধু খেলার জন্য নয়। তুমি ওর কাছ থেকে অনেক কিছু শিখতে পারবে। তোমার অনেক কাজেই ও সাহায্য করবে।"

রিংকু বলল, "সে তো জানি কিন্তু কী যে শিখি কিছুই তো মাথায় আসছে না।"

মা বলল, "কেন ! তোর বন্ধুরা যে অত ফুল দিয়ে গেল, কোন্‌টার কি নাম সে তো আমিও জানি না।"

"ঠিক বলেছ ! ঠিক বলেছ !" রিংকু মা-র গলা জড়িয়ে ঝুলে পড়েছে।

বেগুনি রঙের উপর কালো স্ট্রাইপ দেওয়া এক-পাপড়িওলা ফুলটা নাকের কাছে ঠেকিয়ে টুটু বলল, "অ্যান্ড্রোমিডার পাঁচ নম্বর পৃথিবী থেকে পেড়ে এনেছে।" তারপর একটা ক'রে ফুল তোলে আর বলে যায়, "নীল গন্ধরাজ, ভেগাস থেকে। বুরুহিলা—স্যান্ডাস এম-এর মেজো চাঁদ থেকে।"

কিন্তু সবচেয়ে মজার যে ফুলটা—গোলাপী নরম একটা বলের মতো আর সারাক্ষণ ধুকপুক করছে—কুঁকড়ে যাচ্ছে আর ফুলে উঠছে—সেটা হাতে নিয়ে টুটু যেন অবাক হয়ে বসে রইল। ঘাড় কাত ক'রে বারবার তার ডান চোখটা দিয়ে পর্যবেক্ষণ করছে। তারপর আবার ভাবছে। কিছু বলছে না।

রিংকুর বাবা বললেন, "ওটার নাম ও জানে না। ফুলটা সরিয়ে নাও, রিংকু।"

"না, ওকে বলতেই হবে। এসব দুষ্টুমি চলবে না। এই ফুলটার নাম তো সবাই জানে। আমিও জানি। কত শক্ত শক্ত নাম বলে দিল আর এটার বেলায়...."

বাবা টুটুর সুইচ অফ্ করে দিলেন।

"শোনো রিংকু, তুমি এরকম করলে তো হবে না। তাতে তোমার টুটুরই খারাপ হবে। তুমি জানো, টুটু মানুষ নয়। যন্ত্র। ওকে যা শেখানো হয়েছে সেইটুকুই জানে। ও যখন তৈরি হয় তখনো মানুষ বিটা গ্যালাক্সিতে পা দেয়নি। টুটু কি ক'রে জানবে বলো বিটা

গ্যালাক্সির কোন্ পৃথিবীতে মাটির নিচে এই ফুল ফোটে ?”

বাবা ভেবেছিলেন রিংকু ঠিক জিগ্যেস করবে, তুমি পুরনো রোডল কিনলে কেন।

রিংকু কিন্তু আবার টুটুকে চালু করে দিয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে বসে আছে আর আপন মনে বলছে, “টুটু, বুঝলি তুই একটা সেকেলে রোডল। তোর দামও নিশ্চয় কম। তা হোক—টুটু খুব ভাল।”

দিন রাত টুটুকে নিয়ে হইচই জুড়লে সমস্যা হতো। ব্যাটারি চার্জ করার খরচ যোগাতে ফতুর। বিশেষ করে এই মডেলের রোডলগুলো খুব ইকনমিক নয়। কিন্তু রিংকু তা করেনি। টুটু বেশি পরিশ্রম করতে পারে না সেটা সে বোঝে আর তাই রিংকু তাকে যখন-তখন খাটাতে চায় না।

রিংকু এখন রোজকার টিফিনের পয়সা থেকে কিছুটা জমাতে পারে। সেই জমানো পয়সায় সপ্তাহে একদিন আইসক্রিম খায়। টুটুই তাকে হিসেব করে বলে দেয় কবে কি খাবে। তাতে পেটও ভরে, পুষ্টির জন্য প্রয়োজনীয় ক্যালরি, প্রোটিন, ভিটামিন ইত্যাদিরও অভাব হয় না. আবার সস্তাও হয়। রবিবার বিকেলে আইসক্রিম কেনে রিংকু।

আজ সেই রবিবার। টুটু কিন্তু ওদের চিন্তায় ফেলে দিল। কখন বেরিয়েছে কিন্তু ফেরার নাম নেই। সবাই ছটফট করছে। আজই তাকে প্রথম একা রাস্তায় বেরোতে দেওয়া হয়েছে। রিংকু এক মাসের মধ্যেই তাকে রাস্তাঘাট চিনিয়ে দিয়েছে।

কাল খেলার সময়ে পায়ে লেগেছিল বলে রিংকু বেরোয়নি। পাঁচ মিনা দিয়ে টুটুকে বলেছে আইসক্রিম কিনে আনতে। মিনিট পনেরোর বেশি তো লাগার কথা নয়। এদিকে এক ঘন্টা হতে চলল।

টুটুর পায়ের পরিচিত চপাস চপাস শব্দ শুনেই সকলে উঠে দাঁড়াল। পা-টা যেন একটু টেনে টেনে হাঁটছে। হতেই পারে যে ব্যাটারির চার্জ কমে এসেছে। এতক্ষণ লাগবে কে ভেবেছিল !

“টুটু ! এত দেরী করলে কেন ?”

কৈফিয়ৎ চাইল রিংকু।

“রাস্তায় তোমার বন্ধুরা আমায় আটকে রেখেছিল। কত প্রশ্ন—কবে তোমাদের বাড়ি এসেছি, আমার বাঁ চোখটা ওরকম কেন—একের পর এক। তোমার এ-বন্ধুরা আমায় আগে দেখেনি।”

রিংকু টুটুকে নিয়ে কখনো খেলার মাঠে যায়নি বলেই বোধহয় ওরা কেউ খেয়াল করেনি তারও একটা রোডল লাভ হয়েছে।

“তার জন্য এত দেরী ?”

“ওরা যে বলল আমি বাসী আইসক্রিম কিনেছি—বাজে জিনিস—তাই টেস্ট করে দেখাতে হল সেটা সত্যি নয়।”

টুটু হাত বাড়িয়ে আইসক্রিম অফার করল।

“একী ! দুটো কাপ ! দুটো কিনলে কী ক'রে ?”

“ডাউন-টাউন শপ থেকে। ওখানে জিনিসের দাম কম।”

রিংকু বাবার মুখের দিকে তাকালো। দাম কম হলেও ওরা আইসক্রিম কেনার জন্য কখনো অতটা পথ হাঁটার কথা চিন্তাও করবে না।

টুটু বলে উঠল, “কাপ দুটো আগে ফ্রিজে ঢুকিয়ে দাও। একটু গলে গেছে বোধহয়।”

প্লে-গ্রাউন্ডে এসে রিংকু প্রথমেই ক্যারাটে খেলা শুরু করে দিল। সিনথেটিক ঘাসের সবুজ নরম মাঠ। ওর বন্ধুরা সকলেই এতদিনে যে-যার রোডলের সঙ্গে প্র্যাক্‌টিশ ক'রে ওস্তাদ হয়ে উঠেছে।

সোনি ছুটে এল, "রিংকু ! তুই রোডল কিনেছিস ? বলিসনি তো ? কি মজা !"

সোনি এর আগে কয়েকবার তার রোডলের সঙ্গে রিংকুকে খেলার সুযোগ দিয়েছিল।

রিংকু খুব গম্ভীর মুখে জানালো, "টুটুর সব ভাল কিন্তু একটু বুড়ো হয়ে গেছে। একটুতেই টায়ার্ড হয়ে যায়।"

সোনি বলল, "সো হোয়াট ! প্যাঁচগুলো শিখে নেওয়াই আসল কথা। তারপর তো..."

সোনি যাই বলুক রিংকু জানে নতুন রোডলরা অনেক নতুন নতুন প্যাঁচ শিখেছে।

কিছুক্ষণ বাদে মাঠের উপর ফুরফুর ক'রে উড়ে এল একটা লাল হেলিকপ্টার। ক্রমেই নিচে নেমে আসছে। রিংকু মুখ তুলে তাকালো। হেলিকপ্টারের খোলা দরজায় একটা লোক দাঁড়িয়ে, হাতে হোঁৎকা চেহারার ক্যামেরা।

বাচ্চারা হাততালি দিয়ে অভ্যর্থনা জানালো। চেঁচামিচি জুড়েছে—ভিডিও ক্যামেরা, আমাদের ছবি তুলছে...

হেলিকপ্টার থেকে মাইক্রোফোন হেঁকে উঠল, "তোমরা ওপর দিকে না তাকিয়ে খেলায় মন দাও। আমরা রোডল কম্পানির লোক। তোমাদের খেলার ছবি তুলতে এসেছি। পরশু কমার্শিয়াল প্রোগ্রামে দেখতে পাবে। আটটা পঞ্চান্ন।"

রিংকু আবার টুটুর সঙ্গে লড়াই জুড়ে দিয়েছিল কিন্তু চমকে উঠল মাইক্রোফোনের শব্দে। একেবারে কানের কাছে।

"এই যে শোনো..."

রিংকু দেখে হেলিকপ্টারটা ঠিক তার মাথার উপরে এসে দাঁড়িয়েছে। তার খোলা দরজা দিয়ে একটা লোক তাকেই লক্ষ্য করে হাত নেড়ে সরে যেতে বলছে।

মাইক্রোফোন আবার বলে উঠল, "হ্যাঁ হ্যাঁ, তোমাকেই সরে যেতে বলা হচ্ছে। তুমি মাঠের বাইরে গিয়ে দাঁড়াও। ছবি তোলা শেষ হলে তখন এসো।"

ব্যাপারটা রিংকুর মাথায় ঢোকে না।

"কী হল ? শুনতে পাচ্ছ না ? তোমরা ওই বুড়ো রঙ-চটা রোডল থাকলে আমাদের ছবিটাই মাটি হবে। বাবাকে বলো, নতুন রোডল কিনে দিতে। এসব অচল হয়ে গেছে।"

চারধার থেকে সবাই হেসে ওঠে। "বুড়ো রোডল ! রঙ-চটা ! রিংকুর রোডল বুড়ো রোডল।"

রিংকু কারুর দিকে তাকায় না। ঘাড় সিধে করে পা ঠুকে ঠুকে টুটুর হাত ধরে মাঠ ছেড়ে বেরিয়ে আসে। খেয়াল করেনি সোনি কখন অ্যাম্বির হাত ধরে তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।

"মন খারাপ করিস নি, রিংকু। অনেক কষ্টে তোর বাবা..."

"অ্যাটাক্ টুটু ! অ্যাটাক্ !"

সোনির রোডল অ্যাম্বির দিকে আঙুল তুলে হঠাৎ চিৎকার ক'রে ওঠে রিংকু।

সোনি থতমত খেয়ে যায়। সে তো ভাল কথাই বলেছে...

টুটু জাপটে ধরে অ্যাম্বিকে। গায়ের জোরে চেপে গুঁড়িয়ে দিতে চায়।

সোনি ভয় পেয়ে বলে, "অ্যাম্বি ! সাবধান। লড়াই করো। লড়াই। ফাইট ব্যাক্ !"

সঙ্গে সঙ্গে অ্যাম্বিও ধস্তাধস্তি জুড়ে দেয়।

সোনি বলে, "ভাল চাস্‌তো টুটুকে থামতে বল্ রিংকু। অ্যাম্বির গায়ে ওর চেয়ে ঢের বেশি জোর। টুটুকে ও মেরে ফেলবে।"

রিংকু পাগলের মতো চেঁচায়, "টুটু, ওকে হারাতেই হবে। হারাতেই হবে। চালিয়ে যাও—চালিয়ে যাও—"

অ্যাম্বির ডান হাতের ঘুঁসি এসে পড়ে টুটুর ওপর। এতক্ষণে তার বাঁধন একটু ঢিলে হয়েছে। রিংকু বুঝতে পারে, অ্যাম্বির চেয়ে টুটুর ওজন বেশি, তার গায়ের লোহার চামড়াও আধুনিক রোডল অ্যাম্বির চেয়ে অনেক পুরু। টুটুও বোধ হয় সেটা বোঝে, জানে যে, এটাই তার অ্যাডভান্টেজ। ক্ষিপ্রতায় অ্যাম্বিকে সে ঠকাতে পারবে না। তার একমাত্র সুযোগ আলিঙ্গনের চাপ থেকেই আসতে পারে। টুটু তাকে যত জাপটে ধরতে যায়, অ্যাম্বি ততই বাঁধন খুলে সরে আসার চেষ্টা করে, ঘুঁষি চালায়, ছটফট করে। হঠাৎ অ্যাম্বি তার ডান পা-টা হাঁটুর কাছে একটু ভাঁজ করার জায়গা ক'রে নিয়ে টুটুর তলপেটে আঘাত করল। টাল সামলাতে পারল না টুটু। মাটিতে পড়ে গেল। অ্যাম্বি সেই ফাঁকে এক লাফে পাশে সরে গিয়ে লাথি কষাল টুটুকে। টুটু একটু সরে গেলেও আঘাত লাগল। হুমড়ি খেয়ে পড়ল। অ্যাম্বি ছুটে এসে পিছন থেকে তার গলা আঁকড়ে ধরল।

রিংকু দেখল, টুটুর কানটা নীলাভ হয়ে উঠেছে। সোনি বলল, "রিংকু ! টুটুকে যদি বাঁচাতে চাস—"

রিংকু কান্না চেপে বলে উঠল, "ফিনিশ্ হিম্ টুটু ! ফিনিশ্ হিম্ !"

টুটু তার সমস্ত শক্তি দিয়ে অদ্ভুত এক প্যাঁচ মেরে ছিটকে ফেলল অ্যাম্বিকে। অ্যাম্বি লড়ছে তার যৌবন দিয়ে, টুটু লড়ছে অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে।

টুটুর কানটার নীল রঙ আরও গাঢ় হয়ে উঠেছে।

টুটু টলমল ক'রে এগিয়ে যাচ্ছে অ্যাম্বির দিকে। ছুটছে না কেন ! ছুটে যাও টুটু ! ছোটো !

টুটুর কানটা টকটকে বেগুনি।

অ্যাম্বি মাটি থেকে উঠে দাঁড়ানোর আগেই টুটু যদি ওকে ধরে ফেলতে পারে...

কিন্তু অ্যাম্বি উঠে দাঁড়িয়েছে। দু'পায়ে ভর রেখে নতুন করে লড়াই শুরু করার জন্য তৈরি।

হঠাৎ থমকে দাঁড়ালো টুটু। তারপর দু' হাঁটু ভাঁজ ক'রে বসে পড়ল মাটিতে। নীল্-ডাউনের ভঙ্গি। তারপর সামনের মাটিতে দু'কনুইয়ের ভর রেখে মাথাটা ঝুলে পড়ল। কপালটা এসে ঠেকেছে মাটিতে।

অ্যাম্বি তাচ্ছিল্যভরে নিচু হয়ে এক হাতে তাকে টুটি ধরে টেনে দাঁড় করালো।

রিংকু ফিসফিস করে বলে, "হিট্ হিম নাউ !"

টুটু ডান হাতটা মুঠো ক'রে অসতর্ক অ্যাম্বির চোয়ালে একটা হুক করার জন্য যেন স্লো মোশন ফিল্মের মতো হাত বাড়াল। কিন্তু ঘুষিটা মাঝপথেই ফুরিয়ে গেল টুটুর প্রাণের মতোই।

"চলে আয়, অ্যাম্বি !"

সোনি রিংকুর দিকে ফিরে তাকাল, "আমার কোন দোষ নেই। যেচে ঝগড়া বাধালি

সোনির কথা রিংকুর কানে যায়নি। সে আপন মনে বলছে, "ওয়েল ডান্ টুটু। হোক্ না বুড়ো, সেকেন্ড হ্যান্ড—ফুল্ চার্জ থাকলে নিশ্চয় জিততো।"
